আর্য্যপ্রভা

(হিন্দু সংস্কৃতির কথা)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

১৯৩৮

ল্য ৪॥০

Published by
SURENDRANATH SEN,
34|B, Sarkar Lane, Calcutta

Printer P C RAY,
SRI GOURANGA PRESS,
Chintamani Das Lane,
Calcutta

সা সত্যব্রত সেন।
১৪. ৮. ৫৯.

ভূমিকা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে নানা ভাষায় নতুন সাহিত্যেব সৃষ্টি হয়েছে। এই বর্ষব্যাপী পুণ্য অনুষ্ঠানে 'আর্য্যপ্রভা' গ্রন্থকাবের ব্যক্তিগত উদ্যম। এ বকম নানা বিষয়েব আলোচনা একজনের দ্বাবা সম্ভব হয় না। সুতবাং আর্য্যপ্রভায় যে বহু ত্রুটি থেকে যাবে তাহা গ্রন্থকাবেব অবিদিত নেই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সমিতিব উচিত ছিল যোগ্যতব ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন কবা।

প্রায় পাঁচ বৎসব পূর্ব্বে পার্শিবাগান শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ সমিতিব সাপ্তাহিক অধিবেশনে ধাবাবাহিক প্রবন্ধ পাঠ আবম্ভ করি। ইহাবও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাব কোন প্রবাসী বন্ধুব সঙ্গে প্রবন্ধেব বিষয়গুলি নিয়ে পত্র বিনিময় হয়। তাহাব ফলে প্রবন্ধগুলি প্রশ্নোত্তব আকাবে লিখে ফেলি। ঐ প্রশ্নোত্তবমালাই সমিতিতে পড়া হয়। সমিতিব নির্দ্দেশে প্রবন্ধপাঠ প্রায় দুই বৎসব কাল চলে। প্রত্যেক অধিবেশনের পর যে সব অতিবিক্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হত তাব মধ্যে কতকগুলিব উত্তব পববর্ত্তী অধিবেশনে দেওয়া হত। এইরূপে বিষয়াতিবিক্ত অনেক কথার আলোচনা অবশ্যম্ভাবী হয়েছে এবং নতুন শ্রোতাব নতুন প্রশ্নেব উত্তবের জন্য পুনরুক্তিও হয়েছে। ঐগুলি লিখিত হয়ে মূলপ্রবন্ধে যুক্ত হয়েছে।

কলিকাতা টাউন হলে শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে মহতী সভা হয়, তাহাব প্রায় নয়মাস পূর্ব্বে আর্য্যপ্রভার সমস্ত পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় প্রেবিত হয় ও ঐগুলি ঐখানেই এতাবৎ ছিল। নানা কারণে আর্য্যপ্রভা প্রকাশে বিলম্ব হল। প্রশ্নগুলি বাদ্ দেওয়ায় সমস্ত বিষয়টি টানা প্রবন্ধাকাবে লিখতে হয়েছে। 'পথ নির্ণয়' প্রবন্ধগুলি সমিতিব ১ম বাবেব শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে লেখা হয় ও সমিতিতে পড়া হয়। কয়েকজন বন্ধুব অনুরোধে 'মন্ত্রবিদ্যা'ব কতক অংশ পবিবর্দ্ধিত হয়েছে। 'পাদুকাতত্ত্ব' ও 'চক্রভেদ' প্রবন্ধদ্বয় সমিতিতে পড়া হয় নি।

মূল প্রবন্ধগুলিতে সব স্থলে শাস্ত্রপ্রমাণ দেওয়া ছিল না। শতবার্ষিকী উপলক্ষে গ্রন্থাকারে ঐগুলি প্রকাশ করবার ইচ্ছার সঙ্গে প্রমাণ সংগ্রহ করবার চেষ্টা হয়। এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদন আমার দ্বারা অসম্ভব হত, যদি না জন্ ডিকেন্সনের সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সাহায্য পেতাম। তিনি ঋগ্বেদ সংহিতা—মূল ও ভাষ্য, অথর্ব্ববেদ সংহিতা—মূল ও ভাষ্য, ৺ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অনূদিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী অনূদিত শতপথ ব্রাহ্মণ, মূল কুলার্ণব তন্ত্র ও অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থ একে একে আমাকে এনে দেন। তিনি যে কেবল প্রমাণ সংগ্রহে সাহায্য করেছেন তা নয়, নিজের কাজ মনে ক'রে গ্রন্থপ্রকাশে তিনি যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ ক'রেছেন তার জন্য গ্রন্থকার তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। সেইরূপ, প্রবন্ধগুলি টানা লেখার সময়ে, সমিতির সম্পাদক পরম স্নেহভাজন শ্রীমান সত্যেশচন্দ্র মিত্র, আমাকে কয়েকখানি উপনিষদ্ সংগ্রহ ক'রে দেন। এজন্য আমি সত্যেশ ভায়ার নিকটও কৃতজ্ঞ। প্রুফ্ দেখার সময়ও কিছু প্রমাণ সংগৃহীত হয়।

মৎপ্রণীত 'ভারতধারা'র মুখবন্ধে বলেছি যে, যে সব মহান্ চরিত্র দেখেছি, তাঁদের ছবি কোন তুলিকায় চিত্রিত হওয়া অসম্ভব। ঐ সকল মহাজনের পদতলে ব'সে যা শুনেছি, যা শিখেছি, যা বুঝেছি, তাহারই মাত্র আংশিক ভাবকে আর্য্যপ্রভায় রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। এই সমস্ত বুঝে সাধুভক্ত ও সজ্জনগণ যেন গ্রন্থকারের ত্রুটি মার্জ্জনা করেন।

আর্য্যপ্রভায় একস্থানে শ্রীচৈতন্যকে পুরী সম্প্রদায়ের বলা হয়েছে। এই ভুলটি কোনক্রমে প্রবিষ্ট হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী, সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতী। কবি কর্ণপুর তাঁকে মাধ্বসম্প্রদায়ের সাধক বলেছেন, যদিও অনেকে কর্ণপুরের কথায় আস্থা স্থাপন করেন নি। মহাপ্রভু যে সম্প্রদায়েরই হোন্, তাতে কিছু এসে যায় না। দক্ষিণে শ্রীরামানুজাচার্য্য যে ভক্তিবাদের তরঙ্গ তোলেন, সমস্ত পরবর্ত্তী ভক্তিবাদে ঐ তরঙ্গের হিল্লোল বর্ত্তমান।

বর্ত্তমান হিন্দুর ধর্ম্মাচার ও সংস্কৃতিতে তন্ত্রের প্রভাব স্পষ্ট। সেই জন্যই তন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে বলবার জন্য সমিতি অনুরোধ করেন। কুনবাদ ও উত্তর এশিয়া (মঙ্গল) প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন মতবাদ প্রভাবে অনুরঞ্জিত স্থান ছাড়া (মহাযান) বৌদ্ধতন্ত্র ও শাক্ত-শৈবাগমে তত্ত্বগত পার্থক্য নেই। ঐ তন্ত্রের 'শূন্যতা'='তৎ'।

অনুষ্ঠানাদি হ'তে জাতির মনস্তত্ত্ব ও সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত সহজে বোঝা যায়। সুতরাং আর্য্যপ্রভায় ঐগুলির স্থান আছে মনে করি। তারিখ বা সময় নিয়ে বেশী মাথা ঘামাই নি। সংস্কৃতিগত মূল ভাব ঠিক্ থাক্‌লেই হল। তারিখগুলি যেটি যেমন পেয়েছি সেই অনুসারে বিচার করেছি মাত্র।

সমিতিতে রাজনীতি চর্চ্চা হয় না। সংস্কৃতিগত পার্থক্য দেখাবার জন্য যেটুকু রাজনীতিজ্ঞানের দরকার, মাত্র সেইটুকুই আর্য্যপ্রভায় স্থান পেয়েছে। প্রধানতঃ হিন্দুশাস্ত্রকে ভিত্তি ক'রে আর্য্যপ্রভায় সব কথা আলোচিত হয়েছে। আশা করি অন্যান্য ধর্ম্মবিশ্বাসীগণ তাঁদের নিজ নিজ শাস্ত্রগুলিকে ভিত্তি ক'রে ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা করবেন।

আর্য্যপ্রভায় শ্রীমদ্ স্বামী বিবেকানন্দকে সর্ব্বস্থানে 'স্বামীজি' বলা হয়েছে। সেই রকম 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' স্থানে মাত্র 'লীলাপ্রসঙ্গ' লিখেছি। ইতি

জুলাই
১৯৩৮

গ্রন্থকার

চিত্রসূচী

সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

শুদ্ধিপত্র

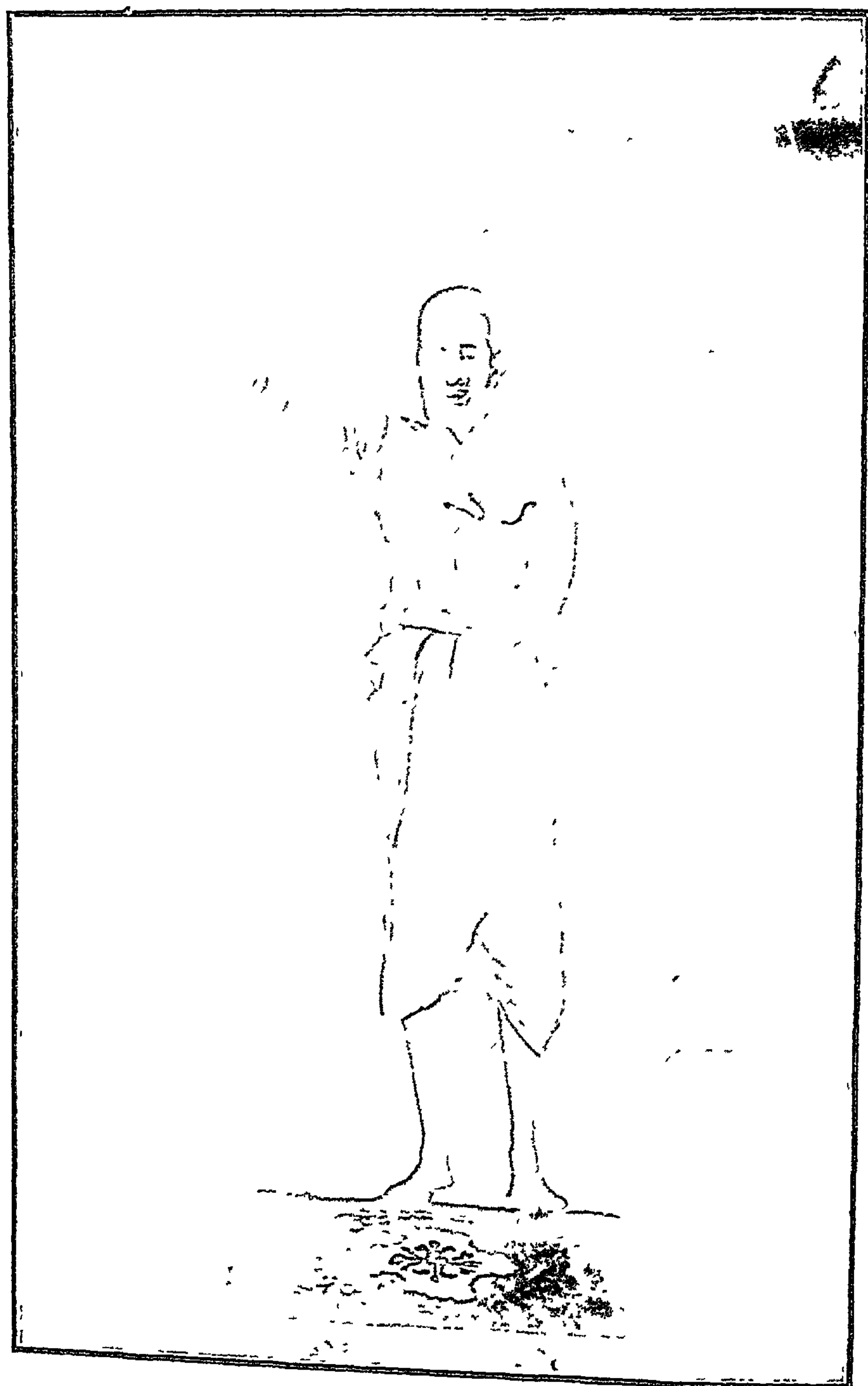
প্রুফ্ দেখার দোষে কতকগুলি ভ্রম থেকে গেছে। যেগুলি আমার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নি, সেইগুলি সংশোধন ক'রে নিয়ে দেওয়া হল। যে ভুলগুলি কয়েকবার মাত্র হয়েছে সেইগুলিতে তারকা চিহ্ন (*) দেওয়া হয়েছে। 'আরও' স্থানে 'আরো' হয়েছে। ছাপার দোষে কয়েক স্থানে বিসর্গের ন্যায় (ঃ) চিহ্ন পড়েছে।

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	শুদ্ধ
ব্যাকারণ*	৪	১৯	ব্যাকরণ
নিদ্দিষ্ট	৪	২৫	নির্দ্দিষ্ট
যেঃ	৪	২৬	যে
বদ্ধ	১৬	১১	বর্দ্ধ
মনীষি*	১৭	১২	মনীষী
যাওয়াই	১৮	৩	যাওয়াই
অপ্তবাক্য	১৯	২	আপ্তবাক্য
Pyrricle	২০	১৯	Pyrrhic
Triteacle	২০	১৯	Tribrach
re	২৪	২৩	are
প্রসিদ্ধ	২৬	১১	প্রসিদ্ধ
কামস্তগ্রে	২৬	১৪	কামস্তগ্রে
তসমাবৃত	২৬	২৮	তমসাবৃত
ওতপ্রেত	৩৬	১৭	ওতপ্রোত
ধর্ম্মণুপ্রেক্ষা	৪১	১৫	ধর্ম্মাণুপ্রেক্ষা
কৃমারী	৪২	২৬	কুমারী
নানে	৪৭	২	নামে
প্রবজ্যা	৫৪	২২	প্রব্রজ্যা
অত	৫৫	১	অথ
স্মত্র	৫৬	১৭	সূত্র
জ্ঞনাতীত	৫৭	১৫	জ্ঞানাতীত
দর্শ্ন	৫৭	২৩	দর্শন

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শুদ্ধ
একামাত্র	৬০	১১	একমাত্র
ঐঃ	৬২	৪	ঐ
ফলকাঙ্ক্ষী	৬৭	৯	ফলাকাঙ্ক্ষী
জ্যেতিষ	৭৫	২৭	জ্যোতিষ
ঋগ্বেদ	৭৬	২৮	ঋগ্বেদ
সতৎ সংকল্প	৭৯	১৫	সত্যসংকল্প
আর্য্যকবণ	৮০	২৯	আর্য্যীকবণ
কাবিরুষ	৯২	১২	বাবিরুষ
উচ্ছৃঙ্খল	৯৭	৪	উচ্ছৃ্ঙ্খল
হোতি	৯৮	২১	হোতৃ
আর্য্যায়িত	১০৪	১৪	আর্য্যায়িত
ব্রহ্মনড়ীতে	১০৯	২২	ব্রহ্মনাড়ী
অনুকীটে*	১৩৫	২৪	অণুকীটে
অনু	১৪১	৭	অণু
জাভা	১৪২	২৯	জাভায়
নেবুগুলির	১৭১	১৪	নেবুলিগুলির
অস্ত	১৭৯	২৫	অন্ত
ধর্ম্মা	১৮০	২৯	ধর্ম্মী
ইভাম্প্যা	১৮৮	৬	ইভান্স
যায়	২০৭	২৮	যায়
সর্ব্বভূতাস্তরাত্মা	২১০	১৪	সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
নাচিকেতাকে*	২১০	১৯	নচিকেতাকে
শক্তি	২১৩	৭	শাক্ত
অপো	২১৮	১৭	আপো
মিষত	২১৯	২৮	মিষত
হওন	২৩০	১২	হউন
এ-ঐভাবে	২৩৩	৩	ঐভাবে
'আর্য্য' 'দেব'—সভ্যতাই	২৪০	২৫	আর্য্য বা 'দেবসভ্যতাই
স্রুতি	২৪২	২৯	শ্রুতি
গুরুপদিষ্ট	২৮১	৬	গুরূপদিষ্ট
কাশ্মির	২৮৩	৫	কাশ্মীর

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শুদ্ধ
বিশিষ্টাদ্বৈতমত	২৮৩	১৩	অদ্বৈতমত
ভোতৃত্ব	২৮৭	৬	ভোক্তৃত্ব
বিবর্ত্তি	২৯১	২৪	বিবর্ত্তিত
স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনের	২৯৬	৭	ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণের
হেসৌ	৩০২	২৫	হেসা
মদ্বিয়াবলম্বন	৩০৪	৭	মদ্বিষয়াবলম্বন
শুদ্ধবুদ্ধি	৩১৫	১৩	শুদ্ধবুদ্ধি
নালমাম্ব্য	৩৪১	৫	নালমালম্ব্য
প্রফটিত	৩৪৪	১৪	প্রস্ফুটিত
পূজার	৩৪৯	১৬	পূজায়
একত্মা	৩৫০	৯	একাত্মা
অবিক্রত	৩৫২	১৭	অতিক্রত
তান্ত্রিক সাধনা—১	৩৬৯—৭০	(শিরোনামা দ্রঃ)	গুরুতত্ত্ব
ত্বেনামি	৩৭০	৮	ত্বেনাপি
ভূতশুদ্ধির্নিজাভিলির্ষত	৩৭০	১৪	ভূতশুদ্ধিনিজাভিলিষিত
গ্রহণ	৩৭০	১৬	গ্রহণং
অপরিগ্রহ	৩৮৪	১৬	পরিগ্রহ
তান্ত্রিক সাধনা	৩৮৩—৮৪	(শিবোনামা দ্রঃ)	তান্ত্রিক সাধনা—২
কুণ্ডলিনীর চক্র	৩৮৪—৪০১	(শিবোনামা দ্রঃ)	তান্ত্রিক সাধনা—২
দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতং নয়	৪৩৯	২৬	দ্বৈতাদ্বৈতবর্জ্জিতম্
প্রধান্য	৪৫৭	২৯	প্রাধান্য
উচিৎ*	৪৬৮	১৯	উচিত
প্রতিদ্বন্দ্বীতা	৪৯৩	২২	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
অন্তবিরোধ	৪৯৭	১৫	অন্তর্বিরোধ
তাঁহা ৫২	৫০০	১	তাঁহা ৫৩
বাস্তব*	৫০৩	৭	বাস্তব
গুণকে	৫০৭	৬	গুণকে
নির্দো ষ	৫১৬	১৭	নির্দোষ
দুরুহ	৫২১	১৫	দুরূহ
জাগ্রত-বুদ্ধি	৪২৬	২৩	জাগ্রৎবুদ্ধি
religion	৫২৮	২৭	*religio*

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শুদ্ধ
তুর্লজ্ব	৫৩৭	৫	তুর্লজ্ব্য
অন্ত্রবস্ত্রাভাবে	৫৩৭	১৬	অন্নবস্ত্রাভাবে
সতিব	৫৩৮	২৫	সতীর
স্পেনেব, আবার	৫৪৬	২৬	স্পেনের আবাব
আত্মশ্লাঘাময়	৫৫৫	১৭	আত্মশ্লাঘায়
কুন্তিব*	৫৬১	২	কুন্তীব
জুপিটার। প্রধান	৫৮২	৯	জুপিটার প্রধান
পক্ষী জাতি*	৫৯২	৯	পক্ষি জাতি
শ্রমজীবি	৫৯৪	৭	শ্রমজীবী
বেদপন্থি*	৫৯৬	২৬	বেদপন্থী
বিবোধী	৫৯৭	৩	বিরোধী
গ্রাস	৬০৬	২৪	গ্রীস
তাঁর	৬১১	১৭	তার
৫১১	(পৃষ্ঠার নিম্নে দ্রঃ)		৬১১
পরায়ং	৬২২	৯	পাবায়
াবশ্বাস	৬২৫	১৫	বিশ্বাস
ব্রহ্মবাদিণীর	৬৪১	২৪	ব্রহ্মবাদিনীর



আর্য্য প্রভা

(হিন্দুর জাতীয় সংস্কৃতির কথা)

বেদ

১

ওঁ—নমস্তস্মৈ সদেকস্মৈ কস্মৈ চিন্মহসে নমঃ।
যদেতদ্বিশ্বরূপেণ রাজতে গুরু রাজতে ॥

আর্য্য সংস্কৃতির ইতিহাস অর্থাৎ ভারতীয় আর্য্যকৃষ্টির ধারা যাতে বোঝা যায়, এমন সব কথা এবং বিশেষ ক'রে, তন্ত্র সম্বন্ধে ধারাবাহিক বলবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছি। সাধ্যমত এ সমস্ত বিষয়, ক্রমশঃ বোঝবার চেষ্টা করা যাবে।

'সত্য'কে আমরা দুভাবে দেখি। একটি জাগতিক সত্য—বাস্তব সত্য; এ সত্য মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির গোচর ও "তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত" (বিজ্ঞান বা science)। আর একটি অতীন্দ্রিয় সত্য—"সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য"। এই "প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে বেদ বলা যায়। ·· ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন, তাহার নাম বেদ।···আর্য্যজাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদ নামক শব্দরাশির সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নহে, তাহাই বেদ" (স্বামীজি)। ঋগ্বেদাদি শব্দরাশিকে বেদ আখ্যা দেওয়া হয়। বেদবিহিত কর্ম্মের স্তুতি, নিন্দা বা বিধি নিষেধ ইত্যাদিকে অর্থবাদ বলে। তন্ত্রের ভাষায়, 'পর' (পরা) শব্দই বেদ। মায়িক বা বাস্তব সত্যে, জ্ঞানে বহুত্ব রয়েছে—পরিণাম বা পরিবর্ত্তন আছে। যে জ্ঞানের পরিণাম হয় না, পরিবর্ত্তনহীন যে জ্ঞান তাহাই বেদ—নিত্য সত্য।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১ম প্রঃ ৩য় অ) ও মাধবাচার্য্যের মতে ঐতিহ্য —স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণাদি গ্রন্থ। বেদতত্ত্ব বা অতীন্দ্রিয় সত্য উপনিষদেই

বর্ত্তমান। ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা, আর যা কিছু সমস্তই অপরা বিদ্যার অন্তর্গত; তাই উপনিষদকে 'বেদ শির' বলা হয়। "তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো, ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।" (মুণ্ডক—১।১।৫)। ঐ চারি বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে 'পুরুষ-যজ্ঞ' হ'তে ঋক্, যজুঃ, সাম ও ছন্দসমূহের আবির্ভাব হয় আর ঐ গুলিই অথর্ব্বসংহিতার কারণ। ঐ বেদ চতুষ্টয় হতে সর্ব্বপ্রকার অপরা বিদ্যার উৎপত্তি হয়।

অনিত্যতার তিন লক্ষণ, (১) সংসর্গ নিত্যতা, (২) পরিণাম নিত্যতা, (৩) প্রধ্বংস নিত্যতা। জবা ফুলের সংসর্গে স্ফটিক লাল দেখায়, ফুল সরিয়ে নিলে, স্ফটিকের নিজরূপ প্রকাশ হয়, ফল পাকলে ফলের পূর্ব্ববর্ণের পরিণতি হয়—রঙ্ বদলে যায়, জিনিষ সম্পূর্ণ ধ্বংস হলে, তার উপাদানগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। নিত্যের দুই লক্ষণ, (১) যা ধ্রুব বা স্থির, কূটস্থ, (কূটঃ লৌহপিণ্ডঃ ইব তিষ্ঠতি যঃ স কূটস্থ=নিত্য, নির্ব্বিকার, উদাসীন), অবিচালি (দেশান্তর প্রাপ্তিবিহীন—যা অন্যত্র গমন করে না), উৎপত্তিহীন, বৃদ্ধিহীন ও অক্ষয়, (২) যার তত্ত্ব বিনষ্ট হয় না। ("ধ্রুবং কূটস্থমবিচাল্যনপায়োপ জন বিকার্য্যনুৎপত্যবৃদ্ধ্যব্যয় যোগী যত্তনিত্যমিতি"—মহাভাষ্যম ১ম আঃ)। 'তদ্ভাবস্তত্ত্বম্', তদ্ভাবই তত্ত্ব—যার যা ধর্ম্ম তার নামই তত্ত্ব; আকৃতিতেও, তত্ত্ব বা আকৃতিত্ব বিনষ্ট হয় না। অগ্নির দাহিকা শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত। স্বতঃস্ফূর্ত্ত সত্য বা জ্ঞানই 'বেদ', সর্ব্বত্র বিরাজিত নিত্য অস্তি ('সৎ')—এই বোধের ('চিৎ' এর) নাম 'বেদ'। শব্দরাশিরূপী বেদ, তপস্যার ওপর জোর দিয়েছেন—তপস্যা ভিন্ন ঐ সত্যজ্ঞান স্ফুরণ হয় না—তপস্যার স্বরূপই বেদ। শ্রদ্ধাসম্পন্ন হৃদয়ে একাগ্রবুদ্ধি ধারণ করবার অবিরত চেষ্টাই তপস্যা। 'তদ্ভাব'—তাই হওয়া ও হয়ে যাওয়া—Being and Becoming—একাগ্রবুদ্ধি ভিন্ন হয় না; সুতরাং তপস্যার ফল, সংস্কার বিমুক্ত নির্ম্মল বুদ্ধি বা শুদ্ধ বুদ্ধি। 'তত্ত্ব', শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। মনবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির চাপে 'স্বতঃস্ফূর্ত্ত' আবরিত থাকে, তপস্যার বা সাধনদ্বারা ঐ চাপ দূর হয়ে সত্য উপলব্ধি হয়, প্রত্যক্ষ হয়। সত্যদ্রষ্টাই 'ঋষি'—মন্ত্রদ্রষ্টা। আবিষ্কার করবার কিছুই নেই—সবই রয়েছে, প্রয়োজন কেবল চাপ সরাবার।

ঋগ্বেদাদি শব্দরাশির চরম শিক্ষাই—তত্ত্বোপদেশই বা তত্ত্বই— বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ। উপনিষদ মানে, যে ব্রহ্মবিদ্যা গুরুর কাছে সমিৎপাণি হয়ে শ্রদ্ধার সহিত শিখতে হয়। সকল আচার্য্যেরা উপনিষদকেই 'বেদশির' ব'লে স্বীকার করেছেন। আর্য্যকৃষ্টির মূলই বেদ। কোন হিন্দুই বেদ-বিরুদ্ধ কথা গ্রাহ্য করেন না। তত্ত্বজ্ঞান প্রবোধক উপাসনার কথাও উপনিষদে আছে। 'শব্দরাশি' বেদের মন্ত্রভাগই 'ঋগ্বেদাদি সংহিতা, ও যাতে মন্ত্র ব্যাখ্যা আছে তার নাম 'ব্রাহ্মণ'। উপনিষদ্, ঐ মন্ত্রভাগের ও ব্রাহ্মণভাগের শেষে অতি সামান্য অংশ অধিকার ক'রে আছে বর্ত্তমানে। মুক্তিকোপনিষদে, রামচন্দ্র ১১৮০ খানি উপনিষদের কথা ব'লে, তন্মধ্যে ১০৮ উপনিষদের নাম করেছেন। কথিত আছে কলির প্রারম্ভে ১১৮০ খানি উপনিষদ্ বর্ত্তমান ছিল।

'বেদ', অপৌরুষেয়, সুতরাং অনাদি ও নিত্য। 'শব্দরাশির' মধ্যে ঐতিহ্য অংশ বেদ নয়, কিন্তু সব অনুষ্ঠান, যথা যজ্ঞ, হোম, উপাসনা, পূজা, স্তুতি, জীবনী ও পুরাণ কথা প্রভৃতি—সব ব্যাপারের উদ্দেশ্য তত্ত্বজ্ঞানকে ব্যবহারগম্য করা। 'তদ্‌ভাব' ও একাত্মবোধের (Being and Becoming-এর) আর্ট বা কৌশলই 'ঐতিহ্য', এইজন্য ঐতিহ্য ও বেদাংশ নামে পরিচিত। 'সংহিতা' ও 'ব্রাহ্মণ'—দুইই 'বেদ' নামে আখ্যাত; মাত্র মন্ত্রে কোন কাজ হয় না, যদি মন্ত্রগুলির অর্থ প্রয়োগ জানা না থাকে।

বেদাঙ্গ ৬টি, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ। শিক্ষা—উচ্চারণ করবার শাস্ত্র; কল্প—যজ্ঞাদি নিরূপণ শাস্ত্র; নিরুক্ত— বৈদিক শব্দাভিধান। উচ্চারণ যাতে ঠিক হয়, সে বিষয়ে শাস্ত্রকারদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সে সময়ে প্রাদেশিকতাও ছিল, যেমন 'গম' ধাতুকে সুরাষ্ট্রদেশে 'হম্ম' ধাতু ও প্রাচ্য মধ্যদেশে 'রংহ' ধাতু বলত; 'শব' (মৃতদেহ) এই ধাতুটি কাম্বোজদেশে গতিকর্ম্মক (গমনার্থক) বোঝাত। এই রকম, দুজন ঋষি 'যদ্বা' স্থানে 'যর্ব্বা' ও 'তদ্বা' স্থানে 'তর্ব্বা' উচ্চারণ করায়, তাঁদের নাম হল 'যর্ব্বা' ঋষি ও 'তর্ব্বা' ঋষি। অন্যসময়ে উচ্চারণ যেমনই হোক, যজ্ঞাদি কালে উচ্চারণ নির্ভুল হওয়া চাইই, কারণ, যে শব্দের যে উচ্চারণ, সেই শব্দের অনুরূপ উচ্চারণে অর্থ ও ফল বদলে যেতে পারে; এইজন্য 'শিক্ষা' শাস্ত্র জানা দরকার। দেবোদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগই 'যজ্ঞ'।

ব্রাহ্মণগ্রন্থে যজ্ঞ বিবরণ আছে। কোন্ অনুষ্ঠানে কি দরকার, মন্ত্রগুলি কিরূপে ও কোন্ মন্ত্র কোথায় প্রয়োগ করতে হবে এ সমস্ত জানা যায় ব্রাহ্মণগ্রন্থ হতে। বিভিন্ন মতের মীমাংসা করা হয়েছে মীমাংসা দর্শনে। ঐ প্রকার অনুষ্ঠানাদির নাম কর্ম্মকাণ্ড। ব্যাপক বা উচ্চভাব সকলে ধারণ করতে পারে না। উচ্চভাব ধারণোপযোগী উচ্চ আধার চাই—দেহ মন চাই—সেইজন্য ভারতে সকাম সাধনার উদ্দেশ্য, যাতে ইহজীবনে বা পরজীবনে আধার বড় হয়, যাতে ত্যাগরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানে ভোগ সমাপ্তির পর—কর্ম্মক্ষয়ের পর—উচ্চাধিকার লাভ হয়। ভারতেতর বহু স্থানে এই যজ্ঞানুরূপ অনুষ্ঠান দৃষ্ট হলেও, কোন স্থানেই সকাম সাধনার উদ্দেশ্য আর্য্যের ন্যায় ছিল না। দেবোদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগ ব্যাপার দুভাবে গৃহীত হত, একটি সকাম বা সঙ্কীর্ণভাবে, অপরটি নিষ্কাম বা ব্যাপকভাবে। ব্যাপকভাবে 'যজ্ঞ' মানে 'ত্যাগ'; সেখানে বিশ্বই দেবতা ও আত্মাই দ্রব্য অর্থাৎ বিশ্বের জন্য আত্মাহুতিই 'যজ্ঞ'। এইরকম যজ্ঞের উপরই ছিল সমাজ প্রতিষ্ঠিত। বেদের ঐ ষড়ঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান। ষড়ঙ্গ সহিত বেদাধ্যয়ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। লোভ বা কোন প্রয়োজনের জন্য বেদাধ্যয়নে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। হেতুশূন্য হ'য়ে (তপস্যার ভাবে) বেদাধ্যয়ন ক'রে জ্ঞান লাভ করলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়—("ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যয়ো জ্ঞেয়শ্চিতি ··ব্রাহ্মণেনাবশ্যং শব্দা জ্ঞেয়া ইতি"—মহাভাষ্য)। ব্যাকারণজ্ঞান ভিন্ন যজ্ঞাদি হয় না। বেদে অগ্নি দেবতার চরু নির্ব্বাপণের মন্ত্র, "অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি।" সূর্য্যদেবতার মন্ত্র, ঐ স্থলে হবে, "সূর্য্যায়···নির্ব্বপামি"। এই যে বাক্য প্রয়োগের প্রভেদ, ব্যাকারণ জ্ঞান ভিন্ন জানা যায় না। বেদে লিঙ্গ ও বিভক্তি অনুসারে সব উক্ত হয় নি, এজন্যও বৈদিক ব্যাকারণ জানা দরকার। তা ছাড়া ব্যাকারণে উচ্চারণস্থান নির্ণয় করা আছে, হ্রস্ব দীর্ঘ নিরূপণ করা আছে, অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণ নির্দ্দিষ্ট করা আছে (ক বর্গ হতে প বর্গ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ১ম ৩য় ও ৫ম বর্ণ 'অল্পপ্রাণ' এবং ২য় ও ৪র্থ বর্ণ, 'মহাপ্রাণ')। যে বর্ণের যে উচ্চারণ, সেই বর্ণের সেই উচ্চারণই থাকে, কোন অবস্থায় বদলায় না, যুক্তাক্ষরের বেলাতেও না। এই জন্য উচ্চারণবৈকল্য, 'দোষ' বলে গণ্য হত। ব্যাকরণ নিয়ে অনেক বিচার আছে। এখানে আভাস মাত্র দিয়ে ক্ষান্ত হতে হবে।

"লক্ষ্য লক্ষণে ব্যাকারণম্" (মহাভাষ্য); লক্ষ্য লক্ষণকে ব্যাকারণ বলে। শব্দই লক্ষ্য, সূত্রই লক্ষণ; সূত্র ধরেই লক্ষ্যে পৌছুতে হয়। এই লক্ষ্যলক্ষণ সমুখ ভাবই ব্যাকারণ, লক্ষ্যলক্ষণযুক্ত অবয়ব নয়। অবয়ব লক্ষ্যেই প্রযুক্ত হয়ে ভিন্নার্থ হয়, লক্ষ্যের অক্ষর বা রূপ বদলায় না।

[উদাহরণ স্বরূপ 'বঙ্গ' শব্দটি গ্রহণ করা যাক্। বঙ্গ = লক্ষ্য; 'সূত্রানুসারে 'বঙ্গে বাস করে যে সে বাঙ্গালী' = অবয়ব। এখানে 'বঙ্গ' শব্দটিতে ঙ + গ, এই যুক্তাক্ষর আছে, ঐ যুক্তাক্ষর মিলিত শব্দই 'লক্ষ্য', অবয়বে যদি 'লক্ষ্যের' রূপ বদলে যায় বা স্থান বিশেষে অক্ষর পরিবর্ত্তন করতে হয়, ঐ সূত্রানুসারে ভুল হয়, (যেমন কোন স্থানে 'বাঙালি', কোন স্থানে 'বাঙ্গালী' ইত্যাদি)। বাঙ্গালায় অনেক পূর্ব্ব রীতির পরিবর্ত্তন হয়েছে, এমন কি স্বরানুসারে অধ্যয়নের রীতিও অপ্রচলিত। বহু পণ্ডিতের মত যে ঐ স্বরানুযায়ী রীতি প্রচলিত থাকলে অর্থবোধের বিশেষ সৌকর্য্য হয় ও 'লক্ষ্যের' ভাব সর্ব্বদা সম্মুখে থাকে, নতুবা ভাব সৌন্দর্য্যের হানি হয়]।

ধ্বনি অনুযায়ী শব্দের ঝঙ্কার তোলা ভারতেতর কোন স্থানে নেই, একই লক্ষ্যে সকলের গতি, এ ভাব ও অন্যত্র নেই। মাত্র ম্লেচ্ছদেশের Phonetic হিসাবে বানান ও উচ্চারণ অবৈজ্ঞানিক আত্মঘাতি ও 'লক্ষ্য' হীন।

নিরুক্ত শব্দাভিধানে, শব্দের অর্থ বেদ হতেই সঙ্কলিত। ঐ সব শাস্ত্রের সকলগুলিতে ব্যুৎপত্তি লাভ ক'রে বেদাধ্যয়ন করা একজনের পক্ষে কঠিন। তাই ব্যবস্থা হল যে, অন্ততঃ ঐ সমস্ত শাস্ত্রের মূলতত্ত্ববোধ (Principle এর বোধ) ও ত্যাগপূত জীবন থাকা চাই। বেদ বলেন, 'বেদ আবৃত্তিতে কোন ফল নেই, একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানেই জীবনের সার্থকতা।' বেদের এই নির্দ্দেশ ভুলেই আমাদের ব্যবহারিক জীবনে পঙ্গুতা এসেছে। যে বেদ আর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ ভূমি, সেই বেদের ঐ রকম উক্তি 'আবৃত্তিতে ফল নেই',—এত বড় সাহসিকতা ও সত্যনিষ্ঠা, ভারতেই সম্ভব, অন্যত্র কোথাও এ ভাব নেই। ভাবের ঐক্য, একই ভাবের প্রবাহ—আর্য্যের মধ্যে সকল দিকে, সব জিনিষই আর্য্যের কাছে একটি কৌশল—আর্ট বা ললিত কলা বিশেষ।

বেদ (সাধন নীতি)

২

ললিত কলা—আর্ট—বাহিরের ও অন্তরের সৌন্দর্য্য প্রকাশক। ঐ কলাকে তিন ভাবে দেখা যায়—সাধারণ শিল্প, মানস শিল্প ও অধ্যাত্ম শিল্প হিসাবে। ঐ শিল্পত্রয়ের বিভিন্ন লিঙ্গ, পৃথক সূত্র কিন্তু লক্ষ্য একই, সুতরাং ঐ তিন শিল্পের প্রত্যেকটি 'সাধন'। যে সাধনভাবে সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধ ক'রে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের আস্বাদ আনে ও সেইভাবে জীবনকে গঠন করে, তাকে 'মানস শিল্প' বলা যায়। যোগ একটি মানস শিল্প। নিষ্কাম হ'য়ে, পবিত্র চিত্তে, শ্রদ্ধা ও বৈরাগ্যের সহিত যে সাধনভাব আনা যায় ও তদ্ভাবে ভাবিত জীবন হয়, তাকে অধ্যাত্মশিল্প বলা যায়।

সাহিত্য, নিজভাব বা আদর্শকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করে, শিল্প—ভাবকে বা আদর্শকে রূপ দেয়। আদর্শকে আকার দেওয়াই শিল্পের বিশেষত্ব। আদর্শভাবাত্মক শিল্পই ললিত কলা (আর্ট)। তার ভাষা লিঙ্গাত্মক বা ইঙ্গিতাত্মক। ঐ ভাষায়, সুন্দর ভাবকে, উচ্চ ও মহান্ ভাবকে রেখা ও বর্ণে প্রকাশ করে, আর যা প্রকাশ করে তার সমস্ত গুণ ও লক্ষণকে রূপ দিয়ে নতুন ছাঁচ (*type*) গঠন করে। একাগ্র ও একনিষ্ঠ কর্ম্মকৌশলই যোগ—মানস শিল্প। এই শিল্প সহায়ে, ভাবকে—সাধনাকে—যথাযথ বিনিযোগ করতে পারা যায়, অন্তরের মানুষটি মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হবার চেষ্টা পায়; আসে তখন শ্রদ্ধার ভাব, আত্মশ্রদ্ধাও জেগে ওঠে। শ্রদ্ধার জাগরণে, পবিত্রতা স্বপ্রকাশ হয়, কারণ, পবিত্রতাই ভেতরের স্বভাব। একনিষ্ঠার একান্ত অভাবে বা উচ্ছৃঙ্খলতায়, পাঁচটা ভাব এলোমেলো ভাবে মিশে, উদয় হয় যেটা, সেটা অপবিত্রতা বা অশুদ্ধতা। এই যে অন্তর বাহির এক হয়ে একনিষ্ঠ বা শুদ্ধভাব জাগিয়ে তোলা অর্থাৎ 'মনমুখ এক করা', ইহাই অধ্যাত্ম শিল্প।

অধ্যাত্মভাব রূপক হয়, যতক্ষণ তা কল্পনায় থাকে। কবিকল্পনায় ইহা সুন্দর ও মধুর, কিন্তু যখন উহা সাধক জীবনে প্রতিফলিত হয়, তখন সেটি বাস্তব সত্য। ব্রজভাব কবি কল্পনায় কমনীয় ও মধুর, মহাপ্রভুর জীবনে ব্রজভাব চলমান সত্য।' কবি, কল্পনাকে মাত্র সুষমা মণ্ডিত করতে পারেন,

সাধক তাকে প্রত্যক্ষ করেন। কল্পনার ডাক্, তার তোড় জোড়, সবই হৃদয বৃত্তির সুষমা বিকাশের জন্য ; আবাহন ও স্থাপন হয় প্রাণবন্তেরই।

ধোলোর যুক্তি, "কল্পনার খপ্পরে পোড়ো না, Idealistic হ'য়ো না, সেটি Unnatural, অস্বাভাবিক ; বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য Nature বা দৃশ্য প্রকৃতিই Realistic বা বাস্তব, অতএব, সাধনা Realistic এরই হওয়া উচিৎ।" শিল্প মানে যদি একমাত্র Nature বা বাস্তবকে আকার দেওয়ার প্রচেষ্টাতে পর্য্যবসিত হয়, সেটি কি ঐ Nature এর একটা অনুকরণ প্রয়াস মাত্র নয় ? অনুকরণই কি তৃপ্তিদায়ক, তাতে কি জীবনের সার্থকতা আনে ? আমাদের বিশেষত্ব, আমাদের মৌলিকত্ব, আমাদের অন্তর্নিহিত উদ্ভাবনী শক্তির কৌশল—আমাদের Creative art—কি প্রস্ফুটিত হবে অনুকরণে ? উচ্চভাবের প্রকাশ, মানবতার ইঙ্গিত, কি মাত্র অনুকরণে হয়, না হতে পারে ? আর, কল্পনার নামে নাক সেঁটকাবার কি আছে, অনুকরণেও ত কল্পনার দরকার, বর্ণ ও রেখা ফলাতে গেলেও ত মাথা ঘামাতে হয় ? ঐ রকমে কল্পনায় রূপ দেখা দিলে, সেটি হয় বাস্তব, আর উচ্চ মহান্ ভাবকে রূপদান করাটাই বুঝি অবাস্তব, অস্বাভাবিক ? ধোলো natural (স্বাভাবিক) ত তিনটিকে বোঝায়, যথা, (১) জীবন সংগ্রাম (Struggle for Existence), (২) বেঁচে থাকবার সহজাত বোধ (Instinct of Self-preservation), (৩) বংশবৃদ্ধি (Reproduction of Species) ঐ তিনটি জিনিষ যাতে বজায় থাকে তাহাই ধোলোর natural (স্বাভাবিক), আর তার ফলে আসে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the fittest)। জীবন সংগ্রাম, বেঁচে থাকবার ইচ্ছা ও বংশ বৃদ্ধি—ঐ তিনটিই—উদ্ভিদ, কীট, অনুকীট ও জন্তু জানওয়ার হতে মানুষ পর্য্যন্ত—সর্ব্বস্থানেই রয়েছে ও তার ফলে যে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন হয়, তার মানে ত দাঁড়ায়,যে দৈহিক বলে বলবানেরই আছে বেঁচে থাকবার অধিকার—বুদ্ধির খরচটাও হয় ঐ জন্যে। গতানুগতিক জীবনকে তুচ্ছ ক'রে আপন আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে ও জয় করতে, নবনব উপায় আবিষ্কার করতে সদা অগ্রসর যে মানব, সেই মানুষে জৈব প্রয়োজনের (Biological necessity র) সব বিধি খাটা কি কখন সম্ভব ? মানব মন, চায় সর্ব্বজয়ী হয়ে লাভ করতে তৃপ্তি। ধোলো 'স্বাভাবিকতা', দেহ রক্ষার জন্যই জীবনসংগ্রামে প্রায় সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে।

সেখানে কোথায় সৌন্দর্য্য বোধের অবসর, কোথায় বা তৃপ্তি? উল্লিখিত ঐ তিনটিকে ভারত দেখেছেন অন্য দৃষ্টিতে। বেঁচে থাকবার ইচ্ছা মানে অন্তর্নিহিত একটি প্রবল প্রেরণা; আর সেই প্রেরণাবশেই আসে জীবন সংগ্রাম। অণু পরমাণু হতে সর্ব্ববস্তু নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে—সর্ব্বত্রই ঐ ইচ্ছা, অতএব অমরত্বই সর্ব্ববাস্তবের প্রয়োজিকা শক্তি। ধোলো বলেন, যে, জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমেরাই টেঁকে যায় (Survive করে)। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে কিন্তু আমরা দেখি যে Death, মৃত্যুই বরাবর সকলকে Survive করে, মৃত্যুই চিরজীবী; তা হলে কি Death মৃত্যুই Fittest যোগ্যতম বস্তু? এইখানে উত্তর আসে যে, জীব বংশধারা বজায় রেখে মৃত্যুকে ফাঁকি দেয়। এই রকম যুক্তিতে ইহাই প্রমাণ হয় যে ব্যক্তিগত হিসাবে, মৃত্যু সকলের টুঁটি চেপে ধরে, কিন্তু বংশধারা বা প্রবাহরূপে অমরত্বই টেঁকে থাকে। কিন্তু তাও কি সর্ব্বাবস্থায় ঠিক্? জীব জগতের সর্ব্বক্ষেত্রে এক একটি জাতির লোপ হয় কেন? জগৎ হতে তাদের অস্তিত্ব মুছে যায় কেন? কোথায় এখন পৃথিবীর আদিম অবস্থার উদ্ভিদ বা জীবজন্তু? কোথায় পুরাতন ভারতেতর জাতির সভ্যতা?

ভারত বলেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্য বিশ্বের, এই Natureএর—বস্তু-মাত্রেরই—লক্ষণ অনিত্যতা অর্থাৎ সমস্তই, প্রত্যেকটিই পরিণামী ও পরিবর্ত্তনশীল—'জড়'। পরিণাম প্রাপ্তি ও পরিবর্ত্তনশীলতা থাকবেই জড়ে, সর্ব্বাবস্থায়। এই পরিণাম প্রাপ্তি প্রভৃতিকে মৃত্যু (Death) আখ্যা দেওয়া হয়। পরিণাম প্রাপ্তি, পরিবর্ত্তন মানে 'বহুত্ব'; অতএব বহুত্ব বন্ধ হলেই, তার পথ রুদ্ধ হলেই, অর্থাৎ তার গতিকে মোড় ফিরিয়ে একত্বের দিকে চালিয়ে দিয়ে ঐ মূল প্রয়োজিকা শক্তির সঙ্গে একাত্মতা বোধ এলেই, আসে অমরত্ব। বেদ বলেন "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি", 'তাকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়'; এইটি জানা মানে, প্রকৃতির স্বরূপ জানা। এই মৃত্যুকে জয় করা রূপ কৌশলই অধ্যাত্মশিল্প; এস্থলে বংশ ধারার (Reproduction of Species বা Multiplicationএর) প্রশ্নই আসে না—একত্বে বহুত্বের স্থান কোথায়? ঐ কৌশল অবশ্য ব্যক্তিগত, কিন্তু ঐ প্রয়োজিকা শক্তি প্রত্যেককেই একত্বের পথে চালিত করছে। প্রকৃতির রহস্যই তাই, উদ্দেশ্যও তাই। অধ্যাত্মশিল্পী, ত্যাগ প্রেম ও সংযমের জীবন যাপন ক'রে দেখিয়ে

দেন—তপস্যার দ্বারা প্রতিপন্ন করেন, যে জৈব সংস্কারকে অতিক্রম করাই স্বাভাবিকতা প্রাপ্তি, বহুত্বে হাবুডুবু খাওয়াটাই অস্বাভাবিক অবস্থা। বেদ বলেন "দ্বৈতাৎ ভয়ং"—বহুত্বেই ভয়, বহুত্বেই সংগ্রাম, বহুত্বই অশান্ত অবস্থা। একত্বেই নির্ভীকত্ব, একত্বেই শান্তি, একত্বেই আত্মশ্রদ্ধা, একত্বেই আত্মপ্রত্যয়।

শ্রদ্ধা ভিন্ন চিত্তপ্রসন্নতা আর কিসে বেশী হয়? চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি, সৌন্দর্য্য, কি শুধু মাংসপেশীর সঠিক চিত্রে? চিত্রের পেছনে আসল মানুষটির—যেটি সব চেয়ে বাস্তব—সেটির রূপ ফুটিয়ে তোলা কি সূক্ষ্ম ও গভীর সৌন্দর্য্যের পরিচয় নয়? অধ্যাত্মশিল্প শাশ্বতকে রূপ দেয়। এই প্রচেষ্টাতে ধ্যান এনে দেয়—যে ধ্যান ঐ শিল্পের সঞ্জীবনী শক্তি। ধ্যানে যে রূপ প্রকাশিত হয় তাতে সর্ব্ববৃত্তির চরম তৃপ্তি আসে—অপবিত্রতা সেখানে ঘেঁসতেই পারে না। তাতে একাত্মতার, মানবতার, স্ফুরণ হয় বলেই সেটি দেশকালজয়ী চির নতুন, সেটি অন্তরের আর্ট, মানব প্রাণের রূপ। সেটি কোন ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ নেই বলেই, সনাতন ও সত্যস্বরূপ। অধ্যাত্মশিল্পী বলেন যে তন্ময়তা—হৃদয়ের আত্যন্তিক আগ্রহ—আর্টকে প্রত্যক্ষ করায়, বর্ণ ও রূপে আর্ট সামনে এসে দাঁড়ায়, বাস্তব হ'য়ে দাঁড়ায়। এই যে সাধন পথ তার অর্থ টিকি বা হাঁচি টিকটিকির ব্যাখ্যার মত রূপক নয়। ললিতকলা বা আর্ট, ভাবকেই রূপ দেয়; শিল্পীর আদর্শ ফুটে ওঠে। প্রশ্ন এই যে, অধ্যাত্ম আর্ট কি সেই রূপকে চলমান জীবন্ত প্রাণসম্পন্ন বাস্তবে পরিণত করিতে পারেনা?

আর এক দিক্ দিয়ে ঘোলো Survival of the fittestটি বোঝবার চেষ্টা করা যাক্। কীট পতঙ্গ, জন্তু জানওয়ার, জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে বাঁচে, একটা আর একটাকে মেরে। মানুষকে জীবন রক্ষা করতে হলে ঐ উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ক'রে এগুতে হয়। মানুষ কি ঐ পশুনীতি অতিক্রম করতে পারেনা? ও রকম জীবন সংগ্রাম মানে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ। পরিবর্ত্তন ও পরিণাম মানে মৃত্যু। যুদ্ধ ও সংঘর্ষ বরণ ক'রে, মৃত্যু বরণ ক'রে, বেঁচে থাকবার যে ইচ্ছা, তার মানে কি? মৃত্যু বরণ ক'রে কি Survive করা যায়? 'বংশধারা রক্ষাতেই মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়া যায়', এই ঘোলো যুক্তি মেনে' নিলে দাঁড়ায়, (১) মার ধোর ক'রে বেঁচে reproduction ক'রে fittest হওয়া, ও Survive করা, (২) বংশধারা

বজায় রাখাতেই রয়েছে অমরত্ব। 'অমরত্বই' কি তা হলে fittest নয়? ভারত বলেন, সংগ্রাম থাকবেই কিন্তু

"সংগ্রাম অপার সদা পরাজয় তাহা না ডরাক্ তোমা
চূর্ণহোক্ স্বার্থ সাধ মান হৃদয় শ্মশান নাচুক তাহাতে শ্যামা।"

ঐ কবিতার অর্থ নিয়ে আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয়, উক্ত দুই লাইনের অর্থ পরিষ্কার। আর এক কথা; fitness বা যোগ্যতা আছে ব'লেই সংগ্রামরত দল সংঘর্ষে অগ্রসর হয়, fitness আছে ব'লেই একজন বা উভয়েই Survive করে। Fitnessটি সর্ব্বদাই আছে। দেখা যায়, মানুষের মধ্যে সৈন্য-শক্তিদুর্ব্বল অথবা যুদ্ধোপকরণ-দুর্ব্বল দলও, বুদ্ধিবলে জয়ী হয়—fit হয়। এখানে পশুবল অপেক্ষা বুদ্ধিবল প্রধান, পশুজগতের নিয়ম মানুষ এস্থলে অতিক্রম করেছে। জীব হলেই জৈবিক প্রয়োজন থাকবে। এই প্রয়োজনবোধ সহজাত। পশু তার প্রয়োজন বা অভাবকে কমাতে জানেনা ও পারেনা। অভাব মেটাবার জন্য লড়াই করতে সে বাধ্য। মানুষের কিন্তু এমন শক্তি আছে যার সহায়ে সে তার সমস্ত অভাবকেই—তার তাড়নাকেও—অতিক্রম করতে পারে ও জানে। অভাব তৃপ্তির কৌশলও সে জানে। পশুর জীবন রক্ষার বিধি মানুষে খাটালে, মানুষ পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। ভারতের Struggle for Existence মানে আত্মরক্ষা—আত্মাকে রক্ষা—'পাকা আমি'কে দেহমনবুদ্ধিবদ্ধ কাঁচা আমির তাড়নার অভিযান হতে রক্ষা করা, বজায় রাখা—পাকা আমিত্ব প্রাপ্ত হওয়া। ভারত বলেন—সংঘর্ষ ও লড়াই, তাই তোমার কাঁচা আমির সঙ্গে, তোমার অন্তঃ প্রকৃতির ও বহিঃ প্রকৃতির সঙ্গে। কাঁচা আমির গোলামী করাকে স্বাধীনতা বলেনা। 'স্ব' কে ফুটিয়ে তোলাই—দেহমনবুদ্ধির ঐ 'স্ব' এর অধীন হয়ে চলাই—স্বাধীনতা। যে শক্তি সর্ব্বত্র ঠেলা দিয়ে ক্রমাগত আত্ম বিকাশ করবার চেষ্টা করছে, তা রয়েছে সকলের মধ্যে, অতএব যোগ্যতা আছে সকলের। জীবের মধ্যে মানুষেই ঐ শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বিকশিত বা উন্নত ব'লেই, মানুষই ঐ একত্ব পাবার যোগ্যতম আধার। মানুষ যে অমৃতের অধিকারী ইহা জানা দরকার প্রত্যেকের। এই জানা মানে কেবল তোতাপাখীর মত বচন আবৃত্তি নয়, খালি মাথা দিয়ে বুঝে নেনা নয়। বেদ বলেন

"তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা
বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্‌"। (কেন ৩৪।৮)

সত্যায়তন সাঙ্গ বেদ—তপস্যা, দম (বৈরাগ্য) ও কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। অতএব, জানা মানে, সাধন ফল। যাঁরা বলেন যে সত্য লাভের জন্য তপস্যার দরকার নেই, বা উপাসনাদি কর্ম্মের দরকার নেই—সে সব চেষ্টারও আবশ্যকতা নেই, ঐ সব লোকের সঙ্গে ব্যবহারে, শাস্ত্রকারেরা সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছেন. তন্ত্র শাস্ত্র ত তাঁদের 'ভণ্ড' 'প্রবঞ্চক' ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করেছেন। শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এক জিনিষ নয়, আলোচনা ও জানা এক বস্তু নয়। আদর্শকে ছোট ক'রে দেখবার অধিকার কারোর নেই। জীবনযাপন চেষ্টা-বিহীন মুরুব্বিয়ানা বড় বড় কথার মূল্য কতটুকু ?

বেদ

৩

সাধন দ্বারাই সত্যজ্ঞানের উদয় হয়, অনিত্যতার আবরণ অপসারিত হয়, নিত্যতার স্ফূর্ত্তি হয়। 'শিল্প' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে, জীব মাত্রেই শিল্পী। জোনাকী পোকা আলো দিয়ে আহার অন্বেষণই করুক বা নিজ প্রিয়কে আহ্বানই করুক, সে তার ভেতরের আকর্ষণী শক্তিকেই কাজে লাগাচ্ছে ; মানুষ যখন শিল্প সহায়ে এই 'নিহিত বীর্য্য'কে সামনে ধরবার চেষ্টা না ক'রে মাত্র অনুকরণ করে ও বাহিরের রূপটি মাত্র প্রকাশ করে—সেটিকে সাধারণ শিল্প বলা যায়। এই রকম সাধারণ শিল্প বা কারুশিল্পও, বর্ণ ও রেখায় নয়নানন্দদায়ক হয়, শিল্পীর চেষ্টা থাকে সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবার। অনুকরণের বস্তুকে যখন চেনবার, বোঝবার চেষ্টা হয়, তখন ঐ শিল্পী আর এক ধাপে ওঠেন। তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হয়। ভাবের সঙ্গে মিশে গেলে, ভাব আয়ত্তের মধ্যে আসলে, অনুকরণ আর অনুকরণ থাকে না, সেটি বাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। মানসশিল্পের উদ্দেশ্য, শিল্প ও শিল্পীকে এক করা, একাত্মকরা—ঐ 'নিহিত বীর্য্যকে' প্রকাশ করা, ঐ নিদ্রিত ভুজঙ্গকে জাগ্রত করা। ভারতেতর দেশে, সর্ব্বত্র, আজও, ঐ কারুশিল্পের প্রথম দুটি ধাপ শিল্পী অতিক্রম ক'রতে পারেন নি,

মানস শিল্পের আভাস মাত্র পেয়ে তাঁরা ক্ষান্ত হয়েছেন। ক্বচিৎ কোথায় কে অতিক্রম করেছেন তার কথা হচ্ছে না। গোড়া হতেই ভারতের আদর্শ, অধ্যাত্মশিল্প। ভারতের শিল্পী, সর্ব্বত্র বহুতে একেরই প্রকাশ দেখবার জন্য লালায়িত। অধ্যাত্ম শিল্পের রূপই দেখাতে তাই তাঁরা চেষ্টা করেছেন চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, জীবনের প্রত্যেক খুঁটি নাটিতে। অন্যত্র, বহুকে পৃথক পৃথক ভাবে বোঝাবার চেষ্টায়, রূপ ও বিভূতি, মানুষের ভোগ সাধনে—মানুষের সুখ সুবিধার জন্য—নিয়োজিত। ভারত অন্তরের রূপকে—'সত্যং শিবং সুন্দরম'কে—ধ'রে বহুর মধ্যে বিচরণ করেছেন। অন্তরের 'সুন্দরে' তিনি মুগ্ধ, বাহিরের রূপ হয়ে গেছে তাঁর কাছে তুচ্ছ তখন, ভুলেছেন তিনি সব, ঐ 'সুন্দর' অন্তর ও বাহিরে সর্ব্বত্র। অন্যত্র, বাহিরের রূপই প্রধান, বহির্জগতের সঙ্গে ব্যবহারে যে ভাব ফুটে ওঠে তারির প্রকাশে শিল্পী যত্নবান। এখন সময় এসেছে ঐ উভয়ের আদান প্রদানের।

অধ্যাত্মশিল্পরূপ সর্ব্ব প্রাচীন সঙ্কলিত শব্দরাশি বেদ, জ্ঞানকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডে বিভক্ত, জ্ঞানকাণ্ডকে ব্যবহারগম্য করবার জন্যই উপাসনা ও কর্ম্মকাণ্ড। বেদ তিন, কিন্তু অতি বৃহৎ বিধায়, অধ্যয়নের ও অন্যান্য সুবিধার জন্যই ব্যাসদেব দ্বাপরে বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন, প্রত্যেকটির পৃথক নাম দেন। অধিকাংশ ঋক্ (সাধারণতঃ আহুতির মন্ত্র) যাতে আছে, তার নাম 'ঋক্ সংহিতা', যে সব ঋক্ গীত হয়, তার নাম সামসংহিতা, গদ্যাংশ একত্র ক'রে নাম হয়েছে 'যজুঃ সংহিতা'; অবশিষ্ট মন্ত্র যাতে আছে তার নাম 'অথর্ব্ব সংহিতা'। অথর্ব্ববেদে, যেমন 'শান্তি' 'অভিচার' আদি মন্ত্র আছে, তেমনি ব্রহ্মতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্যও আছে। ব্যবহারিক প্রয়োগ ও প্রকরণ বশে ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদের মধ্যে কতকগুলি সাম ও যজুর্মন্ত্র আছে, সামবেদের মধ্যেও কতকগুলি ঋক্ ও যজুঃ আছে, যজুর্বেদের মধ্যেও কতকগুলি ঋক্ ও সাম আছে। মন্ত্রের প্রাধান্য অনুসারে বেদের নামকরণ হয়েছে। বর্ত্তমানে ঐ সংহিতা চতুষ্টয়ই চতুর্ব্বেদ নামে পরিচিত।

ঋক্ সংহিতায় আছে ১০ হাজার মন্ত্র সংখ্যা, অথর্ব্ববেদের কিছু কম ৬ হাজার।

মহাভাষ্য (পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত—উদ্বোধন ১ম বর্ষ দ্রঃ) হ'তে জানা যায় যে সবহস্ত চতুর্ব্বেদ বহু প্রকার; অধ্বর্য্যুর (যজুর্ব্বেদের) শাখা ১০০, 'সামবেদের ১০০০ হাজার, বাহ্বচ্য ২১ প্রকার, 'অথর্ব্ববেদ' ৯ রকম। এ ছাড়া 'বাকোবাক্য' (উক্তি প্রত্যুক্তিরূপ গ্রন্থ), 'ইতিহাস' (পূর্ব্বতন লোকের চরিত্র বর্ণনগ্রন্থ), 'পুরাণ' (প্রাচীন কথা) ও 'বৈদ্যক' (চিকিৎসা শাস্ত্র) শাস্ত্র আছে। বিভিন্ন শাস্ত্রের নামের শেষে 'বেদ' এই শব্দটি যুক্ত আছে—সকলগুলির লক্ষ্য এক—যথা, জ্যোতির্ব্বেদ, ধনুর্বেদ ইত্যাদি। পণ্ডিতেরা বলেন যে ঋগ্বেদে প্রক্ষিপ্ত নেই বল্‌লেই হয়, তার কারণ, ঋগ্বেদের শ্লোক সংখ্যা, প্রতি শ্লোকের পদসংখ্যা, শব্দাংশের পরিমাণ, প্রত্যেক সূক্তে কতগুলি অকারান্ত, ইকারান্তাদি পদ আছে তা সমস্তই নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে। পৈল শিষ্য—ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কল—ঋক্ সংহিতাকে দুভাগ করেন, শেখবার সুবিধার জন্য। বাস্কল আবার তাকে চারিভাগ করেন ও তাঁর ৪ জন শিষ্যকে শেখান; মাণ্ডুককে শেখান ইন্দ্রপ্রমতি। শৌনক 'চরণব্যূহ' নামে বই লেখেন, তিনি লিখেছেন যে ঋগ্বেদের ৮টি শাখা থাকলেও, অধিকাংশ পূরো পাওয়া যায় না—৫টি শাখা লুপ্ত। সামবেদের 'উত্তর' ও 'পূর্ব্ব' এই দুই শাখার বহু প্রশাখা ছিল, এখন মাত্র দুটি পাওয়া যায়। 'কৌথুমী' ও 'রাণায়ণ' নামে ২ জন ঋষি ছিলেন। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ কৌথুমী শাখার অন্তর্গত। অথর্ব্ববেদেরও অনেক অংশ এখন পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের ৮টি শাখাকে 'ভেদ' বা 'স্থান' বলা হয়।

বেদ বিভাগ করায়, ব্যাসদেবের নাম হয় 'বেদব্যাস', তিনি শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক। ব্যাসদেব নিজের চার শিষ্যকে বেদ পড়ান; শিষ্যেরা,— পৈল—ঋগ্বেদ; জৈমিনী—সামবেদ; বৈশম্পায়ন—যজুর্ব্বেদ, সুমন্ত্র—অথর্ব্ববেদ। ঐ সব শিষ্যেরা আপন আপন শিষ্যকে পড়ান ও তাঁরা পুনরায় বেদকে নানাভাবে বিভক্ত করায় তাঁরা ও 'বেদব্যাস' নামে পরিচিত হন। যাজ্ঞবল্ক্য নিজগুরু বৈশম্পায়নের কাছে একটি শাখা পান। গুরুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ মতভেদ হয়। যাজ্ঞবল্ক্য সে শাখা ত্যাগ করেন, গুরুর কাছে অভিশপ্ত হয়ে চলে যান ও অধীত বিদ্যা ভুলে যান। তিনি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। সূর্য্যদেব 'বাজী' (অশ্ব) রূপ ধারণ ক'রে, তাঁর 'বাজ'

(কেশব) হ'তে বিদ্যা দান করেন। যাজ্ঞবল্ক্য যা পান তাঁর নাম 'বাজসনী' আর মন্ত্রগুলি 'বাজসনেয়'। এই নতুন শাখার নাম শুক্লযজুর্ব্বেদ ; যেটি তিনি ত্যাগ করেছিলেন তার নাম কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ। অধিকাংশ উপনিষদগুলি, ব্রাহ্মণভাগের বা 'মন্ত্রভাগের' শেষে আছে, কিন্তু 'বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ' আছে, শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতার শেষে। এই বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের মধ্যে 'ঈশোপনিষৎ'কে পণ্ডিতেরা সর্ব্বপ্রথম ও শ্রেষ্ঠস্থান দেন।

ব্রহ্মার এক মানসপুত্র ভৃগু, অথর্বা ঋষি নামে বিদিত। অথর্বার পরে অঙ্গিরা ঋষিত্ব লাভ করেন। 'অথর্বা' হয়ে যায় 'আসনের' নাম, সেই রকম 'অঙ্গিরা'ও একটি 'আসন।' যেমন Magistrate একটি আসনের নাম, কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়। সেই রকম, ২০জন 'অথর্বা' ও 'অঙ্গিরার' নাম পাওয়া যায়। ঐ ২০ জনের হৃদয়ে 'বেদ' প্রকাশিত হন, ইহাই 'অথর্ব্ববেদ' বা 'অথর্ব্বাঙ্গিরস'। এই বেদের ৫টি উপবেদ। সকাম ও নিষ্কাম সাধক—সকলের জন্যই সাধনক্রম তাতে আছে। অথর্ব্ববেদের পূর্ব্ব ও উত্তরকাণ্ডের মধ্যে, সায়ন পূর্ব্বকাণ্ডের টীকা করেছেন। উত্তরকাণ্ড এখন দুষ্প্রাপ্য, লুপ্ত না হলেও।

ব্যাপক ভাবে, বৈরাগ্যময় জীবনই যজ্ঞ। ত্যাগ কর্ম্মের নাম আহুতি। অগ্নিতে ঐরূপ প্রক্ষেপই আহুতি। 'স্বাহা' উচ্চারণ ক'রে আহুতি দিতে হয়। ব্যাপক ভাব বরাবর আছে। পুরাণে, 'স্বাহা' অগ্নির স্ত্রী। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ (গৌড়ীয় বৈষ্ণব) মতে, 'স্বা শব্দেন চ ক্ষেত্রজ্ঞো হে তি চিৎ প্রকৃতি পরা।' স্বা=জীবাত্মা—শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় এই শব্দের প্রয়োগ আছে। তন্ত্রে, 'বিশ্বস্য লয়ঃ স্বাহার্ণকে ভবেৎ স্বাহা'—'স্বাহা' এই বর্ণেই বিশ্ব লয় হয়। যাঁর হিতের জন্য যজ্ঞ করা হত, তাঁর নাম যজমান। ঋত্বিক (যাজক) করতেন যজ্ঞ। বড় বড় যজ্ঞে তিনজন ঋত্বিক থাকতেন। ঋগ্বেদী প্রধান যাজক বা 'হোতাই' দেবতার আহ্বানকারী, তিনি আহুতি দেন না। যজ্ঞের উপযোগী দ্রব্য—'হব্য'—প্রস্তুত করা ও যথাসময়ে 'হব্য' অগ্নিতে প্রক্ষেপ করা ছিল অধ্বর্য্যুর কাজ (অধ্বর=স্বর্গের পথ প্রদর্শক)। বেদি নির্ম্মাণাদিতেই 'যজ্ঞ-শরীর' নির্ম্মিত হয়। " যিনি ইহা করেন, তিনিই 'অধ্বর্য্যু'। হব্যাদি প্রক্ষেপের সময় যজুর্মন্ত্র বলতে হত, সুতরাং অধ্বর্য্যু

ছিলেন যজুর্ব্বেদী ঋত্বিক। বড় বড় ক্রিয়ায় তাঁব সহকাবী থাকত। বেদ পাঠে বাণী শুদ্ধ চাই, সুতবাং সুস্পষ্ট উচ্চাবণ কবতে হত। ঋঙ্‌মন্ত্র, উচ্চৈস্ববে, যজুর্মন্ত্র, নিম্নস্ববে বলতে হয় ও, সাম, গীত হয়। সাম গানেব প্রধান ঋত্বিকই 'উদ্‌গাতা'। সর্ব্ববেদীয় ঋত্বিকেব ভুল ভ্রান্তি দেখাবাব জন্য বা সংশোধন কববাব জন্য—সর্ব্বোপবি একজন ঋত্বিক্ থাকতেন, তাঁকে বলা হত 'ব্রহ্মা', সুতবাং 'ব্রহ্মা' হতেন ত্রিবেদী। ব্রহ্মাব এই পর্য্যবেক্ষণ অথবা ত্রুটি সংশোধন ক্রিযাব নাম 'ব্রহ্মক্রিযা'। 'হোতৃক্রিযা' ঋঙ্‌মন্ত্রে, 'উদ্‌গান ক্রিয়া' সামমন্ত্রে ও 'ব্রহ্মক্রিযা' অথর্ব্বমন্ত্রে হত।

স্বর্গ কামনায অনেক সময়ে যজ্ঞ হত, বলা বাহুল্য, বেদেব 'স্বর্গ' ও পুবাণেব 'স্বর্গ' এক জিনিষ নয়। বেদে স্বর্গ = জ্যোর্তিলোক। নিরুক্ত না পডলে বৈদিক মন্ত্রেব পদবিভাগবীতি, এমন কি বাচনিক অর্থও বোধগম্য হয় না—তখনকাব অর্থ এখন সব সময়ে নেই। উদাহবণ স্বরূপ ঋক্ ১।১।৪।২ এ ('ঘৃতাচীং' এব) ঘৃত = উদক বা জল—যাস্ক ও সায়ন মতে। কিন্তু ধোলো অর্থ অনুসবণ ক'বে, পণ্ডিত বমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উদ্ধৃত ঋকেব অর্থ কবেছেন, "পূতদক্ষ মিত্র ও শত্রুনাশক বরুণকে আমবা এসে প্রার্থনা কবছি, তাঁবা এসে ঘি দিয়ে আহুতি দিন"; যাস্ক ও সায়ন মতে মানে হয যে তাঁবা 'উদক' প্রেবণারূপ কর্ম্ম সম্পাদন কবেন অর্থাৎ পূতদক্ষ মিত্র ও রিপুনাশক বরুণকে আহ্বান কবা হচ্ছে যেন তাঁবা প্রেবণা দেন।

[(পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণের নিরুক্ত সম্বন্ধে লেখা দ্রঃ) মিত্র ও বরুণ বেদেব দুই দেবতা, সূর্য্যেরই দুই রূপ। সূর্য্য যখন শিরোভাগে, তখন তিনি 'মিত্র' যখন অধোভাগে, তখন 'বরুণ'। এইরকম চন্দ্রের আব একটি নাম 'গন্ধর্ব্ব' ও সূর্য্যের যে সমুদয় রশ্মি চন্দ্রকে দীপ্তিমান কবে তার নাম 'সুষুম্ন'।]

বৈদিক বৈযাকবণদেব মধ্যে 'যাজক' শব্দটিব একটি বিশেষ অর্থ ছিল। 'প্রজাজ' মন্ত্র সব বিভক্তি যুক্ত ক'বে ব্যবহাব কবতে হত ও যিনি বাক্যকে পদানুসাবে এবং বর্ণানুসাবে ব্যবহাব কবেন তিনি 'আত্বিজীন' অর্থাৎ যাজক বা যজমান।

বেদেব আব একটি নাম 'শ্রুতি'। ঋষিমুখ নিঃসৃত সিদ্ধ বাণীব নাম 'আপ্তবাক্য'; আপ্তবাক্য, বেদবৎ প্রামাণ্য। শ্রুতি দ্বিবিধ—বেদ ও তন্ত্র

(মনু—কুল্লুকভট্ট)। বেদতত্ত্বে অধিকার, মাত্র ত্রিবর্ণের, মানব মাত্রেরই অধিকার তন্ত্র সাধনায়, এই মাত্র প্রভেদ। উপনিষদের 'ব্রহ্মণ,' 'আত্মন', ও তন্ত্রের 'শক্তি' শব্দগুলির ন্যায় ব্যাপক অর্থের শব্দ কোন ভাষাতে নেই। মোক্ষমুলার সাহেবের মতে, 'ব্রহ্মণ' ও 'আত্মন' শব্দদ্বয় বহু প্রাচীন—সংস্কৃত ভাষার প্রাগ্ঐতিহাসিক স্তরের, তাঁর মতে, 'ব্রহ্মণ' শব্দের আদি ধাতু জানা না থাকলেও, 'ব্রহ্মণ' শব্দের গোড়ার অর্থ=যা স্ফুটীকৃত হয়, ভেঙ্গে পড়ে, তা সে চিন্তার আকারেই হোক্, বাক্যের আকারেই হোক্ অথবা সৃজনী শক্তির আকারেই হোক্ বা দৈহিক বলের আকারেই হোক্।

[(উক্ত সাহেবের The Vedanta Philosophy দ্রঃ)। সাহেব দেখাচ্ছেন যে, 'বৃহ', বৃধ্=বর্দ্ধনার্থ, 'বৃধ', 'বর্দ্ধ'=Latin Verbum, Latinএ 'ধ' স্থানে 'ফ' বা 'ব' উচ্চারিত হয়, তা হলে 'রুধির=''Rufees' বা 'Ruber'—ইং, 'Red', যখন 'ধ' স্থানে ইংরাজিতে 'দ' হয়, তখন 'বর্দ্ধ'=Word। অর্থাৎ 'ব্রহ্মণ', 'Verbum', 'Word—সবই ঐ 'বৃহ' বা 'বৃধ্' ধাতু হতে এসেছে ও একই অর্থ প্রকাশ করে।]

সাহেব আরো বলেছেন যে 'ব্রহ্মণ' শব্দ হতে ক্রমশঃ ভারতীয় আর্য্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আসে 'bursting forth of the world', 'বিশ্ব স্ফুটিকৃত হয়েছে'—এই ভাব, যার পরিণতি 'স্ফোট বাদ'—'বাক্' এর স্ফুট্। বহু বহু পরে Alexandrian Schoolএর ভেতর অনুরূপ ভাব প্রস্ফুটিত হয়েছে দেখা যায়। মোক্ষমুলার সাহেব বলেন যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে, উভয় জাতিই স্বাধীন চিন্তার ফলে একই তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, কেউ কারোর কাছে ঋণী নন। ভারতের বেলায়, ধোলোর 'স্বাধীন' চিন্তাও সংকুচিত হয়ে যায়! একই তত্ত্ব যে বিভিন্ন দেশে দেখা যেতে পারে না, তা নয়; কিন্তু যে দেশে একটি নতুন চিন্তা ওঠে, সেটি ঐ দেশের আবেষ্টনী ও ভাবধারার ফল, অন্যত্র যদি অনুরূপ ভাবধারার সৃষ্টি হয়, তবেই সে দেশে ঐ রকম মৌলিক চিন্তা দেখা দিতে পারে, যদি বিপরীত ভাবধারা হয়, একই রকম তত্ত্ব আবিষ্কৃত হতে পারে না। যিশুর ভাব, যিশুর দেশে ছিল না, কিন্তু তাঁর জীবন গঠিত হয় অন্য এক আবেষ্টনীর মধ্যে, যেখানে তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের অনুকূল ভাবধারার সৃষ্টি হয়েছিল। মোক্ষমুলার সাহেব

নিজেই প্রমাণ করেছেন যে, Socrates অন্ততঃ একজন ভারতীয়ের সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বাদানুবাদ করেছিলেন, যে ভারতের সঙ্গে গ্রীসের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ সম্বন্ধ (পারসীকদের বা জরথুষ্ট্রবাদীদের মধ্য দিয়ে) স্থাপিত হয়েছিল সক্রেটিসের পূর্ব্বে (Theosophical or Psychological Religion. Lecture III-Maxmuller দ্রঃ), আর ঐ ভাবধারার অর্থাৎ ভারতের ভাবধারার সম্পর্কে আসার পরে Alexandrian Schoolএর উদয় গ্রীসে সম্ভব হয়েছিল। এ বিষয়ে পরে আমরা আরো ভাল ক'রে বুঝতে চেষ্টা করব। Socratesএর জীবন গ্রীসে নতুন প্রাণ এনে দেয়; তিনি ছিলেন আত্মজ্ঞ পুরুষ। দুই বিবাহ সত্বেও, তাঁর নিষ্কাম ও নিস্পৃহ জীবন আজও সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। গ্রীসে ওরকম ভাব আসে কোথা হতে, যে দেশের শিল্প কলাও (Hellenic Art) কামভাবোদ্দীপক ও আচার বিলাস পঙ্কিল? অধুনা বহু মনীষি সক্রেটিসকে 'বেদান্তী' বলে মনে করেন। সক্রেটিস যে ভাবধারা প্রবর্ত্তন করেছিলেন, গ্রীস তাহা গ্রহণ করতে পারেনি, ধ'রে রাখতেও পরে পারেনি! ভারতে, শক্তিগঠনের মূল ভাব 'ব্রহ্মচর্য্য,' তা অন্যত্র কোথায়? ভারতের ভাব অন্যত্র গিয়েছে কিন্তু ভাবকে ধরে রাখতে গেলে ভারত যে উপায় অবলম্বন করেন, অন্যত্র কেউ সে দিক্ দিয়ে যান নি। প্রত্যেক নতুন ভাব গ্রহণের পূর্ব্বে, ভারতে, একটি 'সংস্কার' নিতে হত অর্থাৎ ভাব গ্রহণে অধিকারী হবার জন্য সাধনার দ্বারা সেই ভাবকে একটি সংস্কারে পরিণত করা হত, যাতে জীবন পবিত্র ভাবে গঠিত হয়। এমন কি, ব্যাকারণাদি পড়বার পূর্ব্বেও, একটি সংস্কারের মধ্য দিয়ে যেতে হত। ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়ে 'আর্য্য' 'আর্য্য' বলে চেঁচালেই হয় না। ভারতের ন্যায় অনেক জাতিও গরুকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করেছে, কিন্তু ভারতে যজ্ঞাদিতে দুধ, ঘিএর অপর্য্যাপ্ত ব্যবহার হত, আর্য্যেরা দুধের গুণ জানতেন। ভারতে 'দুহিতাই' ঘরে ঘরে গো-দোহন করত, কিন্তু ঈজিপ্টে, গ্রীসে বা রোমে কোথাও গোদোহনের রীতিও ছিল না। ভাব গিয়েছে, আচারও ছিল না আর্য্যের মত।

গোড়া থেকেই ভারত অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভকে জীবনের আদর্শ করেছেন। ঘোরো মনীষিরা ইহা বুঝতে না পেরে ভারতের ইতিহাসে ভাবসঙ্কট

উপস্থিত করেছেন। 'আপ্ত বাক্য,' 'সম্যক্‌দর্শন' (সাক্ষাৎকার), 'অমরত্ব' এই শব্দগুলিতে কি বোঝায় ? মন্ত্রদ্রষ্টার সিদ্ধান্ত বাক্যই আপ্তবাক্য।

[আপ্নোতি, পাওয়া হওয়া, ও হয়ে যাওয়াই—Being and Becoming = সৎ ও সম্ভূতি = লাভ

"প্রতিবোধ বিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥" কেন।]

প্রতিবোধবিদতই 'মত' বা জ্ঞান। প্রতিবোধ = বোধে বোধ—প্রত্যেক বোধের (প্রত্যয় বা বুদ্ধিবৃত্তির) বোধ। বোধে বোধই 'মত', ইহাই জ্ঞান, ইহাই সাক্ষাৎকার বা সম্যক্‌দর্শন, প্রত্যেক বোধ কেন্দ্রীভূত হয়ে প্রকাশিত হওয়াই সম্যক্ দর্শন ('তৎমত')। ইহাই সমস্ত বোধের বা প্রত্যয় সমূহের প্রত্যাগাত্মরূপ বা ব্রহ্মের প্রকাশকরূপ। এই যে আত্মা (জ্ঞান), ইহার দ্বারাই বীর্য্যলাভ হয়, অন্য কোন শক্তি বা উপায় দ্বারা মৃত্যুকে জয় করা যায় না, যথার্থ বীর্য্য লাভ হয় না—আত্মজ্ঞান দ্বারাই মৃত্যু অভিভূত হয়; সুতরাং এই আত্মজ্ঞান রূপ বিদ্যাই অমরত্ব আনায়। 'মত' মানে অনুভূতি লব্ধ জ্ঞান। ঋষি বা মন্ত্রদ্রষ্টার অর্থ ও আমরা বুঝতে পারি এইখানে।

[কৈয়ট বলেন, বুদ্ধি প্রতিভাস = "যদা যদা শব্দ উচ্চারিতস্তদা তদর্থকারা বুদ্ধিরূপজায়তে ইতি প্রবাহ নিত্যত্বাদর্থস্য নিত্যমীত্যর্থঃ" (মহাভাষ্য) অর্থাৎ 'শব্দার্থ বুদ্ধির প্রতিভাসক, যখনই শব্দ উচ্চারিত হয়, তখনই অর্থাকারা বুদ্ধি জন্মায়, এই প্রকার নিত্যতা বশতঃ অর্থের নিত্যতা, সুতরাং অর্থ-বোধরূপা বাক্য ও 'নিত্য'। এই নিত্য, জগতের দিক্ দিয়ে। ইঙ্গিতেও মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, কিন্তু উচ্চ চিন্তার জন্য বর্ণাত্মক ভাষার সাহায্য অত্যাবশ্যক।]

ঐ বোধে বোধ আনবার জন্যই সাধকের আর্ত্তি। ভক্তির দিক্ দিয়ে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি 'বোধে বোধ' টি প্রস্ফুটিত করেছেন তাঁর আর্ত্তিতে, "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।"

"যস্মিন সর্ব্বাণিভূতান্যাত্মৈবাভুদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ('ঈশ')।

'যার সমস্ত ভূত জগৎ আত্মাই হয়ে যায় ('আত্মাএব অভূত') এবং সর্ব্বভূতে আত্মার অনুদর্শন হওয়ায় 'এক' জ্ঞান (বিদ্যার) উদয় হয় (জানেন বা বুঝতে পারেন

—'বিজানত'), তাঁব মোহই বা কি শোকই বা কি ? এই অবস্থাপ্রাপ্ত মহাজনই 'আপ্ত', তাই অপ্তবাক্যকে অভ্রান্ত বলা হয়। ঐ বিদ্যাব নামই ব্রহ্মবিদ্যা। এই ব্রহ্মবিদ্যাব ধাবা চলে আসত ও এসেছে ববাবব গুরুপবম্পবায়, তাই বেদ, 'শ্রুতি' নামে আখ্যাত। মনে বাখতে হবে যে বিদ্যা বা জ্ঞানই চলে আসত, মুখস্থ বা কণ্ঠস্থ বিদ্যাটি নয়। ভাবতে বহু নিবক্ষব মহাপুরুষ জন্মেছেন, এটিও এই সঙ্গে মনে বাখতে হবে।

ধোলো কবেছেন এই খানে গোল। ধোলো বলেন যে তখন লিপি ছিলনা তাই বেদবিদ্যা চলে এসেছে শুনে শুনে বংশ-পবম্পবায়। তাই বেদেব নাম 'শ্রুতি'। শুনে শুনে চলে আসতে পাবে গান, হাতেনাতে চলে আসতে পাবে বাজনা ও সুবতালেব সংযোগে কণ্ঠস্থ হতে পাবে অসংখ্য কবিতা, কিন্তু, বর্ণাত্মক ভাষা, অতবড ভাষাত্মক বেদেব শব্দবাশি চলে আসে বংশ পবম্পবায কেমন কবে লিপি বিনা? যদি এই মত সত্য হয়, তা হলে মানতে হবে যে, তখন লিখন প্রণালী না থাকলেও শব্দবাশি শেখান হত ঠিক্, তবে শেখাবাব বীতি ছিল স্বতন্ত্র, তা হলে স্বীকাব কবতে হয় যে, তখন এই জাতি অত্যদ্ভূত মেধাবী ছিল, তখন না লিখে পডে সব হত সংযমী ও ইন্দ্রিয়জয়ী, আব এখন? এখন লেখা পডাব এত সবঞ্জাম ও সুবিধা সত্ত্বেও পশুত্ব ঘোচেনা—আমবা ঘবেব কথাও ভাবতে অক্ষম! তখন দ্বিজাতিব বিবাহই হত না বেদ অধ্যয়ন না কবলে—ব্রহ্মচর্য্যান্তে ও গুরুগৃহবাসান্তে ঘবে না ফিবলে মূর্খেব সমাজে স্থান হত না। কত সহজে তখন বিদ্যা অবশ্যশিক্ষণীয় বীতিতে পবিণত হয়েছিল! ধোলো আবো বলেন যে তখন লিপি না থাকলেও, ছিল ছন্দ, কিন্তু ছন্দ থাকলে কি হবে? ছন্দেব কোন নিযম মেনে ঋষিনামধেয় ব্যক্তিবা চলেন নি, কোন নিয়মেব বাঁধ তাঁরা মানেন নি—বেদ যে চাষাব গান—ঋষি ত কৃষক ছিলেনই। চাষাব গানে যদি এই হয—যাব নমুনা অন্যত্র কোথাও নেই—তখনকাব উন্নত শ্রেণীব লোকেব জ্ঞান ছিল কেমন তা হলে?

অতীন্দ্রিয় বোধকে ভাষায নানা ভাবে প্রকাশ কবতে হলে যে সর্ব্বপ্রকাব নিয়মেব শৃঙ্খলাকে অতিক্রম কবতে হয়, ইহা অসম্ভব কিসে? বাঙ্গালীব 'কীর্ত্তন' কি স্ববলিপিতে সব ফেলা যায আজও? এই সে

দিনকার কথা, বাঙ্গালী জয়দেবের "প্রলয় পয়োধিজলে" কবিতাটি কি ছন্দের কোন নিয়ম মেনেছে, ছন্দ বিধিকে কি অতিক্রম করে যায়নি? কষ্ট কল্পনা ক'রে পণ্ডিতেরা সমস্ত গানটিকে ভেঙ্গে বিভিন্ন ছন্দে এক রকম করে দেখিয়েছেন।

[(পণ্ডিত চন্দ্রমোহন সংকলিত 'ছন্দঃসার সংগ্রহঃ' দ্রঃ) । 'প্রলয়- পয়োধিজলে' কবিতাটি সম্পূর্ণ তুলে তিনি বলছেন যে ওটি কি কোন ছন্দে লেখা? তার পরই বলছেন "The sweetness of its cadence and the regularity of its periods would at once indicate its place there . ..But where is to be placed ?"]

অর্থাৎ 'সুরমাধুর্য্য ও তালের কালিক নিয়মের নির্দ্দিষ্টতায় নিশ্চয়ই ইহার একটা স্থান নির্দ্দেশ করা যায়, কিন্তু কোথায় ইহার স্থান দেওয়া যায়'? তিনি বলছেন যে ঐ রচনাকে 'সমবৃত্তম্' 'অর্দ্ধসমম্', 'বিষমম্' পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। তা হলে ইহা একটি 'জাতি'? এটা কোন 'আর্য্যা' ও নয়, 'বৈতালিয়ম্' বা তার প্রকারভেদ ও নয়, 'মাত্রাসমকানির' অন্তর্গত করা যায় না। এইরূপে ছন্দ শাস্ত্রের কোন পর্য্যায়ে ফেলা যায় না, কিন্তু কাণে বাজে যে ছন্দ? সুতরাং পণ্ডিতজি একটিকে 'অতিরিক্ত মাত্রা ছন্দ', অপরটিকে 'অনুষ্টুভতুঙ্গ', কোনটিকে 'বৃহত্যাং কমলা বা 'মাত্রাসমক', 'জগত্যাংতামরস' ইত্যাদি বিভিন্ন অংশে দেখিয়েছেন।

[ছন্দ শাস্ত্রানুসারে লঘুকর বর্গ = Pyrricle and Triteacle, প্রমাণবর্গ = Iambus, দুটি সূত্র (পিঙ্গলা বলেন)—গ্লিতি সমনী, গ্লিতি প্রমানী = Trochaic and Iambic measures, সমাবৃত্ত ছন্দ—Blank Verse ইত্যাদি।]

এখানে এইমাত্র বললেই হবে যে বৈদিক ছন্দের পরিমাপ, 'মাত্রার' দ্বারা নিয়মিত নয়। বৈদিক ছন্দকেও 'অপৌরুষেয়' বলা হয়। পানিনীয় অষ্টাধ্যায়িতে ঋগ্বেদের ভাষাকে 'ছান্দস্' বলা হয়েছে, ও সংস্কৃত বর্ণমালাকে 'মাহেশ্বরী সূত্র' বলা হইয়াছে; কারণ, ব্রহ্মা যেমন যোগতন্ত্রের আদি উপদেষ্টা, শিবই সেই রকম প্রথম সবল ধ্বনিকে অর্থযুক্ত সাঙ্কেতিক আকার দেন। বৈদিক ছন্দ কোন বিধি মেনে চলে নি, তার লক্ষ্য যেমন সর্ব্বশৃঙ্খলার পারে, ছন্দের গতি ও সেই রকম অবাধ। যা 'অপৌরুষেয়' নয় তাহাই

'লৌকিক ছন্দ' ('গণছান্দ', 'মাত্রাছন্দ', 'অক্ষব ছন্দ'—'বৃত্তম', 'জাতি' বা 'মাত্রাছন্দ')। যাই হোক্, বৈদিক মন্ত্র গুলিতে লঘুগুরুবর্ণবিন্যাসপদ্ধতি (metre) আছে। ধোলো মতে, ঐ বকম ভঙ্গিব জন্যই মন্ত্রগুলি শুনে শুনে চলে আসতে পেবেছে। চাষাঋষি বেচাবিদেব তা হলে লঘুগুরু হিসাবে বচনাব বুদ্ধিটুকু যুগিবেছিল, আব, বংশপবম্পবায় বিদ্যাব ধাবা বক্ষা কবা দবকাব, এ বুদ্ধিটিও ঘটে এসেছিল, যদিও ঋষি বা আচার্য্যকে, অত শব্দবাশি লিপি বিনা শিষ্যদেব কণ্ঠস্থ কবাতে, কি দুর্ভোগই না পেতে হয়েছিল !! বেদ অধ্যয়ন কবতে হত। যখন লিপি ছিল না, তখন 'অধ্যযন' মানে শুধু আবৃত্তি। আব বাববাব আবৃত্তি কবাতে সব কণ্ঠস্থ হত ও এই রকমে বংশপবম্পবায় শুনে শুনে চলে আসত! ঋক্, ১ম, ১৭০ সূক্তেব ("ননূনমস্তি নো শ্ব ··") অনুবাদ দত্ত মহাশয় এইরূপ করেছেন, "অদ্যতন বা কল্যতন কিছুই নাই। অদ্ভুত কার্য্যেব কথা কে বলিতে পাবে? অন্য লোকেব মন অত্যন্ত চঞ্চল, যাহা উত্তমরূপে পাঠ কবা যায়, তাহাও ভুলিয়া যাওয়া যায়।" পাঠ বা আবৃত্তি কবাটা কি বিনা লিপিতে বা বিনা গ্রন্থে হত?

বেদ বলেন যে বেদপাঠ বা আবৃত্তি ও অপব বিদ্যা।

["নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া বহুধা শ্রুতেন " (কঠ ২য়।২৩)। প্রবচনেন = "অনেক বেদ স্বীকরণেন"]

তন্ত্রে ও বহু স্থানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে বহু শাস্ত্রাদি পাঠে কিছুই হয় না—জ্ঞানই একমাত্র মোক্ষেব কাবণ। 'অধ্যয়ন', মাত্র আবৃত্তি নয়। "অধ্যয়নং চ স্বাধ্যায় সংস্কাবঃ" (মহাভাষ্য)। স্বাধ্যায় বলতে বোঝায় বেদ। "স্বাধ্যায়ভ্যাসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে" (গীতা), বেদাভ্যাসই বাঙ্ময় তপস্যা। জ্ঞানি গৃহস্থ সর্ব্বদা বাক্যে প্রাণবায়ু ও প্রাণে বাক্য আহুতি দেন।

[কথা বলবার সময় = "বাচি প্রাণং জুহোমি", চুপ্ ক'বে থাকলে = "প্রাণে বাচং জুহোমি"—(মনু ৪।২৩।২৪ দ্রঃ)]

বেদেব 'সংস্কাবকার্য্যই' অধ্যয়ন। বেদজ্ঞান লাভ কববাব জন্যই পুরুষার্থচতুষ্টয়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—ও তাব সাধন চাই, অর্থাৎ বেদজ্ঞানরূপ ভিত্তিব উপবেই পুরুষার্থ দণ্ডায়মান। ঘেদেব দ্বাবাই সাধন হয় বলেই, অধ্যয়ন দ্বাবাই বেদেব 'সংস্কার্য্য' সিদ্ধ হয়। এই অধ্যয়নেব

সাক্ষাৎ ফল, বেদ-রূপ বর্ণরাশির স্বরূপ জ্ঞান, যাতে বিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয়। অনুষ্ঠানাদিতেও (কর্ম্মকাণ্ডে) অর্থ বোধ চাই। চার রকমে বিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয়, (১) 'আগম কালেন'—বেদবিদ্যা গ্রহণ কাল দ্বারা, (২) 'স্বাধ্যায় কালেন'—অভ্যাস কাল দ্বারা, (৩) 'প্রবচন কালেন'—অধ্যাপন কাল দ্বারা, (৪) 'ব্যবহার কালেন'—প্রয়োগ কাল দ্বারা। এই যে প্রথা, ইহা কি বংশপরম্পরায় বা গুরুপরম্পরায় চলে আসতে পারে না? লিপি সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে কেন? জড়-বিজ্ঞান শাস্ত্র (Science) বুঝতে গেলে, শুধু বই পড়ে হয় না, গুরুর কাছে বিদ্যা নিতে হয়, লেকচার কাণে শুনতে হয়, হাতেনাতে অভ্যাস করতে হয়, অপরকে বোঝাবার মত স্পষ্ট ধারণা আনতে হয়, প্রয়োগ বা ব্যবহার জানতে হয়। গুরু বা আচার্য্যমুখে শুনে বোঝাকে—আয়ত্তীকরণকে—কি "শ্রুতি" বলা অসঙ্গত?

বেদে ছন্দ আছে, লঘুগুরু স্বরক্রম আছে, সাম গীত হয়, অতএব তখন সঙ্গীতবিদ্যা ও ছিল। প্রথম গানই সামগান। ব্রহ্মা হতে আসে বেদতত্ত্ব—বাক্ স্ফুটিত হয় প্রথম ব্রহ্মার মুখ হতে, শব্দের প্রকাশ হয়। শব্দ চার রকম, 'দ্রব্য', 'গুণ' 'ক্রিয়া' 'জাতি'—যার মূল স্থানের নাম শব্দব্রহ্ম; তাই শব্দব্রহ্মের প্রকাশমুখ চার; ব্রহ্মার চারি বদন— "পুরাণস্য কবেঃ চতুর্ম্মুখ সমীরিতং ..", তাই ব্রহ্মার শক্তি 'বাক্‌দেবী', তাই অধ্যয়নই 'ব্রহ্মযজ্ঞ'।

[শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, 'এই যে ব্রহ্মযজ্ঞ, বাক্যই এই যজ্ঞের জুহু, মন ইহার উপভৃৎ, চক্ষু ইহার ধ্রুবা, মেধা ইহার স্রুব, সত্যই ইহার অবভৃথ স্নান, স্বর্গলোক ইহার উদয়ন বা সমাপ্তি। ঋগ্ মন্ত্র এই যজ্ঞের ক্ষীরাহুতি, যজুর্ মন্ত্র ইহার সোমাহুতি, অথর্ব্বাঙ্গিরস ইহার মেদাহুতি, পুরাণ ইতিহাসাদি ইহার মধু আহুতি।" (যজ্ঞকথা—৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী দ্রঃ)]।

সৃষ্টিতত্ত্ব

(বেদ ও তন্ত্র)

মানুষেব নানা ভাব। 'মত', নানা ভাবেব মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি ভাবকে উপলব্ধি কবাতে, হয় সম্প্রদায়সৃষ্টি—নানা গুরুব বিশেষ বিশেষ ভাবধাবা। সাম্প্রদায়িক মতামত বা বিবোধেব আভাষমাত্র বৈদিক ভাবতে দেখা দিলেও, অন্যান্য সব যাযগাব মত, দলদেবতা (tribal god) নিয়ে সংগ্রাম দেখা দেয়নি। ধোলো মতে, ঐরূপ সংঘর্ষেব প্রমাণ বেদে না থাকলেও, নিশ্চযই তা প্রাগৈতিহাসিক যুগে ছিল। তাঁবা বলতে চান যে সমস্ত সভ্যতাই একই ভাবে, একই নিয়মানুসাবে বিবাদ বিসম্বাদেব মধ্য দিযে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি ক'বে সব যাযগায় বিকশিত হয়েছে, সুতবাং ভয হতেই এসেছে 'ধর্ম্ম'! সর্ব্বত্রই কেন যে একই নিয়মে সভ্যতাব উৎপত্তি ও গঠন হবে, তাব কাবণ ধোলো নির্দ্দেশ কবেন না। বিকাশে ক্রম থাকবে এটা বোঝা যায়, কিন্তু সেই ক্রমটা যে সকল স্থানেই এক ঘেয়ে ভাবে দেখা দেবে, তাব মধ্যে কোন বিচিত্রতা থাকবেনা, এটা কোন্ প্রাকৃতিক বিধি অনুসাবে—যখন বৈচিত্র্যই প্রকৃতিব লক্ষণ, যখন বহিঃ প্রকৃতিব অগণন বিচিত্রতাব সঙ্গে অন্তঃ প্রকৃতিব অন্তহীন রূপসম্ভার বিবাজিত ?

ধোলো মতে, নীহাবিকারূপে দৃষ্ট ব্যোমপথে ঘূর্ণ্যমান তাপ ঘনীভূত হলে সূর্য্যাদিব উৎপত্তি হয়, তাপ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হলে, ঐ বৃহৎ জড পিণ্ডেব মধ্যে জলস্থল দেখা দেয়, ধীবে ধীবে সেখানে বৃক্ষলতাদিব জন্ম হয, জলস্থল ক্রমশঃ অসংখ্য জীবে পূর্ণ হয়। এখানে আমাদের মনে বাখতে হবে যে, ঐ অসংখ্য জীবেব প্রত্যেকটিব অভাব বোধ বিভিন্ন, প্রত্যেকটিব জীবনসংগ্রামেব ধাবা বিভিন্ন, প্রত্যেকটিব অভিব্যক্তি প্রণালী বিভিন্ন। এই বিভিন্নতাব মধ্যে শক্তিব ও বুদ্ধি বিকাশেব তাবতম্য দেখা যায়। ধোলো দেখাচ্ছেন যে, জড় ও জডেব প্রকাশ সৃষ্টিতে প্রথম, চৈতন্যেব আগমন পবে, আব মানবে ঐ চিৎসত্তাব বা চৈতন্যেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ। তা হলে মানবেব মধ্যে যে বুদ্ধি বিকাশেব তর তম থাকবে ও কোন স্থানে যে তাব বিশেষ বিকাশে মৌলিকতা থাকবে বা থাকতে পাবে তা অসম্ভব হয় কিসে? চেতনাব বিকাশ পবে, প্রথম ছিল না—এই সেকেলে ধোলো মতবাদ আজ্ ডাঃ জগদীশচন্দ্র খণ্ড বিখণ্ড

করেছেন, চেতন বীজ সর্ব্বস্থানে দেখিয়েছেন। বর্ত্তমান যোরোপ মনীষিরা বলছেন যে সবই শক্তি-তরঙ্গ, (Quanta of energy) এবং 'জড' তার লক্ষণ মাত্র (Symptom)। অবশ্য যোরোপের 'শক্তি', চেতন সত্ত্বা নয়। কোন বস্তু বুঝতে হলে দুটি প্রণালী অবলম্বিত হয়—অনুলোম (Analytical) ও বিলোম (Synthetical), ভারতছাড়া সর্ব্বত্রই বিজ্ঞানসম্মত সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝাবার জন্য প্রথম প্রণালী (Analytical) অবলম্বিত হয়েছে। একমাত্র ভারত বিলোম প্রণালী গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ 'এক' হতে বহুর প্রকাশ দেখিয়েছেন। এইটি আর্য্য ভারতের বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রেও। সেই জন্য এখানে সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে অধ্যাত্মভাব পূর্ণমাত্রায় জড়িত। য়াহুদি ধর্ম্মে, হুকুমবাদ—ঈশ্বরের আদেশেই সৃষ্টি।

ঋগ্বেদে, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র আদি বহু দেবতার উপাসনা দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ সমস্ত দেবতাকে একেরই বিকাশ বলা হয়েছে—"একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।" যে সাধক যে দেবতার উপাসক, তাঁর কাছে সেই দেবতা 'সৎ' স্বরূপ। 'ইষ্টদেবে' বীজ এইখানে। প্রত্যেক দেবতাই সেই নিত্যসত্তার প্রতীক, এই নিত্য সত্তাকে নাম দেওয়া হয়েছে 'আদিত্য'। আর্য্য—ভয়, পাপ ও পাপের জন্য 'ক্ষমা',—এসব ভাবকে প্রশ্রয় দেন নি। মাত্র একটি যায়গায় বরুণের কথায় এই ভাবের বীজ—মাত্র ক্ষীণ বীজ—দেখা যায়, কিন্তু যখন সবই একেরই প্রকাশ, তখন ঐ সব ভাব দাঁড়ায় কোথায় ?

["And in the case of Varuna there is another idea, just the germ of one idea, which came but was immediately suppressed by the Aryan mind and that was the idea of fear. In another place we read they re afraid and they have sinned and ask Varuna for pardon These ideas were never allowed·· to grow on Indian Soil, but the germs were there, the idea of fear and the idea of sin" (Vedanta and Sankhya—Swamiji]

তাই বেদ বলেন 'অভয়ং অমৃতম্'। আর্য্য সভ্যতার সমগ্র ইতিহাস অন্তর্মুখী মনের পরিচয়। ভারতে আগে তত্ত্বোপলব্ধি—সত্ত্বাধার স্পর্শ, তার পর পুরাণাদি (Mythology)। ভারতে, ভাবকে স্থায়ী আকার দেবার

জন্য তিনটি উপায় অবলম্বিত হয়েছে, (১) মনমুখ এক করে ক্ষুরধার বিচারপ্রণালী—মনস্তত্ত্বের গঠন (Philosophy and Psychology) ও তাকে স্বায়ত্তীভূত করবার জন্য জীবন যাপন—অর্থাৎ (Realisation)—দর্শন বা লাভ; (২) ঐ সব চিন্তার উদ্দীপক ঘটনাবলী—সত্যদর্শীর চরিত্র বর্ণনাদি—পুরাণাদি (Mythology), (৩) যাতে ঐ সব চিন্তা ও উচ্চ ভাব নিজ জীবনে প্রতিফলিত হয়, তার সাধন ও আচার প্রকাশ—ক্রিয়া অনুষ্ঠানাদি (Ritual)। ঐ তিন উপায় ভারতেতর দেশে ও আছে, কিন্তু সে সব স্থানে ক্রম বিভিন্ন। সেখানে আগে Mythology—ভয় হতে উৎপত্তি, দলদেবতা হতে উৎপত্তি প্রভৃতি, Mythologyর পর আসে Ritual—Mythologyর অর্থ নতুন হয়, সর্ব্বশেষে দেখা দেয় মনস্তত্ত্বের বিচার বা Philosophy, তখন আবার পূর্ব্বের অনেক ভাব বর্জ্জিত হয়। বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী ভাব হিসাবে যেমন সভ্যতার দুটি পৃথক রূপ আছে, ঐ তিনটির প্রয়োগে তেমনি সংস্কার ও সভ্যতা হিসাবে পার্থক্য বিদ্যমান।

ঋগ্বেদে সৃষ্টিতত্ত্বের কথায় মাঝে মাঝে কতকগুলি গভীর প্রশ্ন করা হয়েছে (১০ম মণ্ডল দ্রঃ) দেখে ধোলো বলেন যে, সৃষ্টিরহস্য বোঝবার প্রথম চেষ্টা আর্য্যসভ্যতায় সেই সময় আসে। তাঁরা দেখেন না যে, প্রশ্নের পরে উত্তরও দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন দেখলেই যে মনে করতে হবে ওটি সন্দিগ্ধ মনের উন্মেষ চেষ্টা, ইহা বা কেন বলা হয়, উত্তর আছে কিনা না দেখে? বোঝার ভুল ধোলোর হয় এইজন্য যে, ধোলোর যা কিছু সবই Investigation—বস্তু বিশ্লেষণ ও তদ্দ্বারা বস্তুর সত্তানুসন্ধান, আর্য্যের, ইহার বিপরীত—তপস্যা ও ধ্যান এবং তদ্দ্বারাই বস্তুর স্বরূপানুসন্ধান, তত্ত্বানুসন্ধান Meditation and Realisation, সুতরাং আর্য্যের প্রশ্ন করার ধরণও অন্যরূপ। তাতে তাঁর অন্তঃকরণের একটা প্রবল উৎকণ্ঠাই প্রকাশ পায়—হতাশের সন্দেহ নয়। এই রকম, কেণোপনিষদে প্রথমেই প্রশ্ন আছে, উত্তর আছে পরে। ঋগ্বেদ, দর্শনশাস্ত্র নয়, ইহাও যেন আমরা না ভুলি। (ঋগ্বেদ ১ম। ১৬৪) কয়েকটি প্রশ্ন আছে, (১) পৃথিবীর পরম অন্ত কোথায়? (২) বিশ্বের 'নাভি' কোথায়? (৩) অভীষ্ট ফল প্রদানকারী 'অশ্বের' ('বৃষ্ণ অশ্বস্য') রেতবিষয়ে জিজ্ঞাসা করি, (৪) পরম ব্যোম স্বরূপ বাক্ কি? উত্তরে বলা হয়েছে যে (১) এই বেদিই

পরম অন্ত, (২) এই যজ্ঞই ভুবনের নাভি, (৩) 'বৃষ্ণো অশ্বস্য রেত', (৪) "'ব্রহ্মা' ইহাই বাক্যের পরম ব্যোম।

[ঋগ্বেদে 'অশ্ব' = (১) বায়ু বা বায়ুর 'অশ্ব', (২) বাহন, পুষণ দেবতা ; (৩) পর্জ্জন্য। নাভি = উৎপত্তিস্থান, রেতঃ = মূল উপাদান (সায়ন)। চিদাকাশই পরম ব্যোম।]

"মূর্দ্ধা দিবো নাভিরগ্নিঃ পৃথিব্যা" (ঋক্ ১৷৫৯৷২)।

[মূর্দ্ধা = 'শিরোবৎ প্রধানভূতো ভবতি'। (সায়ন)]

অর্থাৎ ব্যোমস্থ জ্যোতির বা দীপ্তির (দিবো) উৎপত্তি স্থল অগ্নি।

ইহা কি নভোব্যাপ্ত নীহারিকাদির কথা নয়, যা হতে পৃথ্বী আদির জন্ম হয়? ঐ ৩য় মণ্ডলে আছে যে গূঢ় তমসা ভিদ্য হয়ে মহাজ্যোতির (ব্রহ্মের) প্রকাশ হল। প্রসিদ্ধ 'নাসদসীয়' সূক্ত ও পরের সূক্তটিতে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে।

["নাসদাসীন্নোসদাসীওদানী নাসীদ্রজো ন ব্যোম পরো যৎ .. ..."।] (ঋক্ ১০ম৷১২৯), তার পরই" ·...কামান্তদগ্রে।" (ঐ ৪র্থ ঋক্)।

সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রমতে সৃষ্টি অনাদি, সুতরাং কর্ম্মও অনাদি। নাসদসীয় সূক্তে সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তখন সৎ বা অসৎ, পৃথ্বী বা ব্যোম, দিক্ বা দেশ (আবরণ) কিছুই ছিল না, তা হলে সেটি কিরূপ ছিল, কোথায় ছিল? সেই 'গহন গভীর' কি সলিলব্যাপ্ত ছিল?" ("ন মৃত্যুরাসীৎ ··· কামস্তদগ্রে"), তখন মৃত্যু ছিল না, অমরত্ব ছিল না, রাত্রি বা দিবা বা তাদের ভেদ ছিল না, ছিল মাত্র তাঁর শ্বাসবায়ু—সেই পরমাত্মা, ছিল তখন অন্ধকারে আবৃত গূঢ় অন্ধকার, ব্যাপ্ত সলিল, 'তুচ্ছের' দ্বারা আবরিত। 'তুচ্ছ' মানে অবিদ্যমানতা—সৎ বা অসৎ কিছুই নয়—অনির্ব্বচনীয় মহা তমঃ। ইহাই কি মহাকুণ্ডলি? যাইহোক্ একটি জিনিষ বোঝবার আছে। কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না, কার্য্য কারণে থাকে। 'যা হেথা আছে তা সেথা আছে'। সুতরাং 'অহং', ও 'ত্বংরূপ' যে দুই ভাব দেখি আমরা, তা সর্ব্বকারণকারণেও আছে—সর্ব্বকারণকারণে ঐ দুইটি একীভূত, কার্য্য, কারণে লীন—একাত্ম—নিষ্ক্রিয়। 'অহং' 'ত্বং' বা 'অহং', 'ইদং' মহতসমাবৃত। তপস্যার শক্তিতে, যে শক্তি তাঁর নিজস্ব (স্বশক্তি), সেই সর্ব্বগ্রাসী পরমাত্মা স্বমহিমা প্রকট্ করলেন। অগ্রে

তখন মনেব উপাদান (বীজ) 'কাম' ছিল। কবিগণ (সাধ্যগণ) প্রজ্ঞাবলে হৃদয়ে অনুধ্যান করে সৃষ্টিবহস্য বুঝলেন যে, 'অসৎ'ই 'সতেব' আববণ বা বন্ধন ইত্যাদি। এই ধবণেব প্রশ্নোত্তবে ও ঋষিবা সন্তুষ্ট হন নি। অতি সাহসিকতাব সহিত তাঁবা অগ্রসব হয়েছেন, প্রশ্ন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁবা কোথাও থামেননি। 'সেই অগ্রজাত হিবণ্যগর্ভই ভূত সমূহেব পতি, তিনি 'আত্মদা', 'বলদা'—জীবন ও মৃত্যু তাঁব ছায়া"। (ঋক্ ঐ-১২১)। বিভিন্ন রুচি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট সাধক-চিত্তেব যত বকম স্তব হতে পাবে সমস্তই দেখতে পাওয়া যায় ঋগ্বেদে; কিন্তু ঐ সব প্রশ্ন এসেছে প্রকৃতি হতে—বহির্জগৎ হতে। অন্তর্জগতেব স্বরূপ অনুসন্ধানে বত হয়ে ঋষিবা ঐ সবেব উত্তব খুঁজেছেন অতীন্দ্রিয় বাজ্যে। "সেই ব্যোমস্থ পুরুষ সৃষ্টি আদৌ কবেছেন কি না কবেছেন, তা তিনি জানতেও পাবেন, না জানতেও পাবেন।" (ঐ ১২৯।৭)। এই বকম অমীমাংসিত প্রশ্ন সব আসে যতক্ষণ দৃশ্য জগৎকে সৎ বা নিত্য বলে বোধ থাকে, সুতবাং অতীন্দ্রিয় বাজ্যেব অনুভূতি চাই—Being and Becoming, সৎ ও সম্ভূতি চাই। এই তত্ত্ব উপনিষদে ক্রমশঃ পবিস্ফুট হয়েছে।

এই বাব তন্ত্রের কথায় আসা যাক্। এককে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে দুই দেখায়; দুটি থাকলে আব একটি হয়—এক হতে বহু হয়। ব্যষ্টি অহং বা ছোট আমিব পবিসব বৃদ্ধি হলে বা ব্যাপ্ত হলে তাকে বলা হয় 'বড অহং' বা 'পাকা অমি'—সমষ্টি বোধের অহং। ধ্যান চিত্তে যখন এই ব্যষ্টি হতে সমষ্টি অবধিব ধাবা রুদ্ধ হয়ে যায়, সুতবাং, তখন হয তা 'অবাঙ্‌মনসোগোচবম্'। এই বড অহংই ব্যষ্টিব কাছে—আমাদেব দিক দিয়ে—'ত্বং' বা 'তুঁহু'—তত্ত্বমসি। আবাব যখন সমষ্টিভাবে বড় অহং আছেন, তখন সেই অহং এব 'ত্বং' (আমিব তুমিও) আছেন—এক জ্ঞান থাকলে দুই জ্ঞান থাকে। আমাদেব দৃষ্টিতে দেখলে 'ত্বং' কে আমবা 'ইদং' বলি। এই বড অহং ও ইদং (আমি ও আমিব 'তুমি') অনাদি ও নিত্য বর্ত্তমান। নিশ্চল অবস্থা ও সচল অবস্থা, নিষ্ক্রিয় অবস্থা, ও সক্রিয় অবস্থা। স্থিব অবস্থা = অহং, চেতন বা ক্রিয়াশীল = ত্বং—ত্বংই মহাশক্তি। ঐ অহং-চ্যুত স্বতন্ত্র 'ইদং', বা প্রকৃতি, 'জডা'—আববণী ও বিক্ষেপ শক্তির খেলায় মোহগ্রস্ত। আববণী ও বিক্ষেপ শক্তিব খেলাতেই জগৎটি প্রবাহরূপে

নিত্য বোধ হয়। বীজ হ'তে গাছ হয়, গাছ হতে ফল হয়, তা হতে বীজ হয়, সেই বীজ হ'তে আবার গাছ হয়, কারণ হতে কার্য্য, কার্য্য হতে কারণ—এই যাওয়া আসা। কারণ কার্য্যে থাকে, কার্য্যও কারণে থাকে।

স্থূলের, সূক্ষ্ম হওয়াকে, মৃত্যু বলে, সূক্ষ্ম, স্থূল হলে হয় জন্ম। জন্মমৃত্যুর এই অনাদি প্রবাহ চলেছে। একত্বে পৌঁছলে, কার্য্য কারণের একাত্ম হলে, জ্ঞানস্বরূপ হলে, এই জন্মমৃত্যু আয়ত্তাভূত হয়, কর্ম্মের প্রতাপ থাকে না, জন্মমৃত্যু দূরে পালায়। ইহাই অমৃতত্ব প্রাপ্তি। সৃষ্টি বোধে, স্থূল সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম স্থূল, আবর্ত্তন বিবর্ত্তন রয়েছে। সুতরাং যে অবস্থায় এ সব রুদ্ধ, সে অবস্থায় 'অহং' ও 'ইদং' লীন অবস্থায় স্থিত, ঐ দুই তত্ত্বের ('অহং' ও 'ইদং' এর) কোন কার্য্যই নেই। ইহাই ব্রহ্মের 'চণকাকার' ভাব। (চণক=ছোলা বা মটর, দুটি দানা এক হয়ে আছে)। উহার বিভিন্ন নাম—'আত্মরতি', 'পরানন্দ', 'শ্রীগুরু', 'পরশিব', 'মহাদেব' প্রভৃতি। ঐ ভাবকে তিনভাবে বোঝা বা সাধন করা যায়, (১) পুং ভাবে—পুরুষভাবে, (২) শক্তিভাবে—নারীভাবে বা স্ত্রীমূর্ত্তিতে, (৩) সচ্চিদানন্দ-ভাবে। (শিব-মহাবোধা—কুলার্ণব তন্ত্র দ্রঃ)। শিবই গুরু।

চণকাকার নির্গুণ, কেননা সেখানে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা—পরস্পর পরস্পরের দ্বারা পরাভূত হয়ে নির্গুণ। নির্গুণ হলেও, ইহাকে নির্বিকল্প বলা যায় না, কারণ ঐখান হতেই অহং ইদং রূপ দ্বিত্ব, ও তা হতে আবার আবরণী ও বিক্ষেপশক্তি আদির আবির্ভাব সম্ভাবনা রয়েছে। চণকাকার দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতং নয়। 'চণকাকার'ই, ভাব-সমাধির শেষ সীমা—দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতমের আভাষ। অহং ইদং (দ্বং) এখানে লীনাবস্থায় একাকার। দ্বন্দ্বাতীত স্থান বলেই এই ভূমি অদ্বৈত বা আনন্দস্থান, সুতরাং 'জ্ঞানমূর্ত্তিং'—সাধনকালে সহস্রারেই ইহা চিন্তনীয়। তন্ত্র বলেন, এই সহস্রার 'পূর্ণ পূর্ণেন্দু শুভ্রং' আর পঞ্চাশদ্বর্ণরূপী হয়ে 'তরুণরবিকলাকান্তকিঞ্জল্কপুঞ্জং'—বালসূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। সঙ্গীতময়ী কুণ্ডলিনী মূলাধার হতে উত্থিত হ'য়ে, ঐ স্থানেই সংযুক্ত হন; ঐ স্থানেই আছেন 'দেবঃ পরমশিবঃ'। তিনি 'সর্ব্বাত্মা' হ'য়ে অজ্ঞানান্ধকার দূর করছেন ও সেইস্থান হতেই "সুধাধারং নিরবধি বিমুঞ্চন্নতিতরাম্। যতেঃ স্বাত্মজ্ঞানং দিশতি ভগবন নির্ম্মলমতে।" অর্থাৎ সেইস্থান হ'তে কৃপামৃতধারা

প্রবাহিত হচ্ছে, তাঁর (শ্রীগুরুর) সুধাময় বাক্যে মোহনাশকারী আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হচ্ছে। শব্দব্রহ্মময় সে স্থান। সে স্থান সকলেরই উপাস্য, কারণ, "শিবস্থানং শৈবাঃ পরম পুরুষঃ বৈষ্ণবগণাঃ লপন্তীতিপ্রেযো হরিহরপদং কেচিদপরে…"শৈব বলেন 'শিবস্থান', 'বৈষ্ণব', 'পরম পুরুষস্থান', কেহবা 'হরিহরপদস্থান', 'দেবীভক্তেরা', 'দেবীস্থান', যুগলানন্দ রসিক ভক্তেরা, হরগৌরীর 'শ্রীচরণকমল', মুনি ও পণ্ডিতেরা 'প্রকৃতি-পুরুষস্থান' বলেন। চরণকারাবব্রহ্মই সচ্চিদানন্দ স্থান। বেদ বলেন—

["তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস বাহ্যতঃ," ঈশ।৫]

'তাহা কাঁপে আবার কাঁপে না, দূরে আবার নিকটে, সকলের বাহিরে আবার সকলের অন্তরে!' স্থির বা নির্গুণভাবই 'চণকাকার'। নির্গুণভাবে ক্রিয়া নেই—নিষ্কম্প। দ্বন্দ্বাতীতং—দ্বৈতহীন—বহুত্বরহিত, সুতরাং 'পরমসুখদং'—'অভয়ং অমৃতং'—ভয়রহিত আনন্দস্থান। সক্রিয়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব —একেরই দুই দিক্।

ঐ যে বালসূর্য্যের মত দীপ্তিমান, অথচ 'শুদ্ধরূপ প্রকাশশক্তি', যা হতে নিরন্তর সুধাধারা বর্ষিত হচ্ছে তার নাম 'শশিকলা'। ঐ শশির (চন্দ্রের) ষোড়শ কলা অর্থাৎ (কলা) ১৬ ভাগে বিভক্ত। সেটি "বিদ্যুদামসমানকোমলতনু" এবং অধোমুখী। অধোমুখী, কারণ সৃষ্টিমুখী —গানের অবরোহ। সাধক সূক্ষ্ম দৃষ্টি সহাযে দর্শন করেন যে মস্তিষ্কের মধ্যভাগে এক 'পরম ধমনী' আছে, সেই ধমণীর মধ্যবর্ত্তিতায় 'পরমানন্দ রস', উপলব্ধি-হয়, সেখান হতেই "পূর্ণানন্দ পরম্পরাতি বিগলৎ পিযুস ধারাধরা"—পিযূষধারা বর্ষিত হয়। শশিকলার মধ্যভাগে যেটি স্থিত, তাহাই 'নির্ব্বাণকলা।' এই কলা "চন্দ্রার্দ্ধসমানভঙ্গুররতীসর্ব্বার্কতুল্য প্রভা।" (ভঙ্গুররতী—যা সময়ে সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে দৃষ্ট হয)। এই কলাই "নিত্যপ্রবোধোদযা"—জীবের চেতনা বা প্রবোধজনক জ্ঞানকে উদয় করায়। ঐ নির্ব্বাণ শক্তির "মধ্যান্তরালে শিবপদমমলং শাশ্বতং যোগীগম্যং নিত্যানন্দাভিধানং সকলসুখময়ংশুদ্ধবোধস্বরূপং" রয়েছেন। নির্ব্বাণশক্তিই 'পরশক্তি', তদন্তরালস্থ 'শুদ্ধবোধস্বরূপ'ই 'পরশিব।' তন্ত্র বলছেন যে ঐ স্থানকে কেহ কেহ নাম দেন 'ব্রহ্মস্থান', বৈষ্ণবেরা বলেন 'বৈষ্ণব স্থান',

বোধ আনায়, (৩) 'রাগ'—আকর্ষণ বিকর্ষণ এনে মোহ জন্মায়, (৪) 'পুরুষ' (বিদ্যা)—সর্ব্বজ্ঞকে অল্পজ্ঞ দেখায়, (৫) 'কলা'—সর্ব্ব পরিচালনক্ষম সামান্য কর্ত্তৃত্বে মত্ত। ঐ পঞ্চভাবের খেলায় 'অহং' 'ইদং' সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। তখন অহং, ইদংগত—ইন্দ্রিয়বোধাত্মিকা অহং—কাঁচা আমি, ছোট আমি। পাকা ঘুঁটি কেঁচে যায় এই খেলায়। অতএব, 'পাকা আমি' বা 'বড় অহং' তখন সাধনবস্তু হয়ে যায়, অর্থাৎ ব্যষ্টিদেহযুক্ত মন, বৈচিত্র্যের জ্বালায় অস্থির হয়ে, বিরাট বা বিশ্বমনের দিকে যেতে চায়—ঐ অহংএ মিশে শান্তি পেতে চায়।

ব্রহ্মের দুই লক্ষণ, স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। দুই ভাবের সাধনার গন্তব্য স্থান এক। সত্তামাত্র, নির্ব্বিশেষ, অবাঙ্মনসোগোচর যা তাহাই 'স্বরূপ' লক্ষণ—বিশ্বে 'সৎ' রূপে প্রতিভাত; যাঁর সমদৃষ্টি সর্ব্বত্র, যিনি দ্বন্দ্বভাব পরিশূন্য, নির্ব্বিকল্প, দেহাত্মাধ্যাসবর্জ্জিত, তিনি সমাধিগম্য—ইহাই 'তটস্থ' লক্ষণ। ইহারই সত্ত্বাহেতু, সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। (মহানির্ব্বাণ, ৩য় উঃ ৭।৮ দ্রঃ)। ইনিই 'সগুণব্রহ্ম', সর্ব্বদেবতাময়, "গুণাতীতং গুণৈর্যুক্তং সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকং", সর্ব্বমন্ত্রময়, সর্ব্বকামদ, মহাজ্যোতির্ম্ময় সহস্রদলস্থ 'বিন্দু'।

বেদের 'সোহকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়,' এই সিসৃক্ষা বা আদি 'ইচ্ছা'ই, তন্ত্রে দেবী 'আদ্যা' বা 'ত্রিপুরা' (ষোড়শী)। তন্ত্রে, সাধক ও সাধনা হিসাবে শক্তির নানা বিভাগ আছে। 'ত্রিপুরসুন্দরী', 'মহাত্রিপুরসুন্দরী' বা 'ষোড়শী', 'মহাষোড়শী'—একই সুন্দরী বিদ্যার অন্তর্গত—ষোড়শীর অন্তর্গত। দেবীর দুই পাদবিক্ষেপ। প্রথম পাদবিক্ষেপে সৃষ্টি—সর্ব্বসৌন্দর্য্যের প্রকাশ, তাই দেবী ষোড়শী সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী, মায়ের সৌন্দর্য্য ব্রহ্মাণ্ডে গড়িয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বহুত্বের প্রকাশ, খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য্যের মনবিমোহিনী শক্তি, বহুত্বে একত্বের ভাববিচ্ছিন্নতা—এ সমস্তেই মোহরূপ হলাহলের উৎপত্তি। সেই হলাহলের উগ্রতায় 'বহুর' একত্বে ফিরে যাবার আশা লুপ্ত, হলাহলে সর্ব্বভাবময়ী মায়ের দিব্যরূপ আবরিত। তাই সঙ্গে সঙ্গে দেবীর দ্বিতীয় পাদবিক্ষেপ। এই অসীম করুণামণ্ডিত পাদবিক্ষেপই 'গুরুশক্তি'! ঐ হলাহলের সম্পূর্ণ দমন ও বিনষ্ট করবার জন্য এই দ্বিতীয় পাদবিক্ষেপ—শ্রীগুরুমূর্ত্তির উদয়—শবরূপী 'অহং' সচেতন,

মূর্ত্ত। বহুব পথ অনুলোম প্রণালীতে ; দেবীব গতি বিলোমে; তাই "বিপবীত বতি"। তন্ত্রে, শ্রীগুরুই আদি শক্তি।

ধোলো পণ্ডিতদেব মধ্যে বিখ্যাত গণিতবিদ্ Sanderson সাহেবই অনুমান কবেন যে "Time, matter and space are but a point"—কাল, জড ও দেশ, একটি বিন্দুমাত্র। 'নির্ব্বাণ কলাব' কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। ঐ 'নির্ব্বাণ কলাব' উর্দ্ধেস্থিত নির্ব্বাণশক্তি, তদূর্দ্ধে 'বিন্দু' ও 'বিসর্গ'। এই পর্য্যন্তই গুকশিষ্য সম্বন্ধ, তাবপব শিবেব ৭ম মুখ অব্যক্ত। বিন্দু শূন্যগর্ভ। সেই শূন্য, অব্যক্ত—পূর্ণ। বিকৃত বৌদ্ধ শূন্যবাদ, তথা ধোলো শূন্যবাদ ও হিন্দুব শূন্যবাদ—এই দুই শূন্যবাদে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ধোলো শূন্য, মানে 'অনস্তি', হিন্দুব, 'নিত্য অস্তি'। প্রবহমান নদীব উপমা দেওয়া হয—নদীব স্রোত চলেছে, জল স্থিব নেই, নতুন নতুন জল প্রতিবাবে আসছে প্রতিক্ষণে—মাঝে দাঁডিযে 'আমি'—প্রতি পলেব সঙ্গে সময় যাচ্ছে, বয়সও বেডে চলেছে, কিছুই স্থিব নেই। বৌদ্ধ বলেন, "সুতবাং 'বর্ত্তমান' ব'লে কিছুই নেই, আছে শুধু অতীত ও ভবিষ্যৎ"! উত্তবে হিন্দু বলেন, "অতীত ও ভবিষ্যৎ ঠিক কব্‌ছে কে ও কি দিয়ে? তোমাব অতীত ও ভবিষ্যৎ ঠিক কববাব স্থাপিতমানই (standard ই) যে বর্ত্তমান। তা ছাডা, কালকে ভাগ ক'বে দেখছে কে? সবই যে শক্তিব ক্রিয়া, যা বোধ হচ্ছে নানা ভাবে, নানা অবস্থায়, বিভিন্ন আধাবে। নিত্য অস্তি, নিত্য বর্ত্তমান না থাকলে, সকল বোধেব, সব গতিব (standard) স্থাপিতমান কোথায়?" তাই মহাকাল, 'যোঽহমস্মি'—এই যে আমি—'একলা আমি,' এই বোধস্বরূপ, যা সব বোধকে সম্ভব কবে, আনন্দবিগ্রহ, আত্মচেতন নিত্য অস্তিব প্রশান্ত-'স্থিবেব' প্রথম চেতনানন্দ, শ্রুতিব ভাষায—"আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্ববসঃ সর্ব্বমিদম-ভ্যাত্তো অবাকী অনাদবঃ"। (ছা। ৩।১৪।২)। "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" (ব্রহ্মসূত্র, ১।২৩)। ব্যাপ্তজ্ঞান—চিদাকাশই লিঙ্গ (লক্ষণ)। আকাশই (চিৎই) ব্রহ্ম—'জ্যায়' ও 'পবাযণ', শ্রেষ্ঠ ও পবমগতি। তিনি পূর্ণ প্রকাশ, তিনি সব প্রকাশ কবেন।

[আ = সম্যক্, কাশতে = প্রকাশ পান বা কাশয়তি = প্রকাশিত করেন (রামানুজ)। প্রাণ = 'প্রণয়তি সর্ব্বাণি ভূতানি,' (বিশ্বে প্রেরণা দেন)—রামানুজ।]

"অতএব প্রাণঃ" (ঐ ১।২৪), সমস্ত ভূত যাতে লয়প্রাপ্ত হয়, যা হতে সব আবার জাত হয় (ছা।)। প্রাণই ব্রহ্ম। এইরূপে সবই ব্রহ্ম—বলা হয়েছে। তৎ এজতি—কম্পনের প্রসার, কম্পনের বিস্তার, কম্পনে কম্পনে বেগ বর্দ্ধিত—তরঙ্গময়। বিশ্বমনের একাংশই ব্যষ্টিমন, তাই তা তরঙ্গময়। এই তরঙ্গের জন্যই 'নিত্য' ও 'অনিত্য', 'বস্তু' ও 'গুণ' বোধ আসে—মন বাছাই করে। কোথায় থাকে দ্বন্দ্বভাব বা মন, যখন সব নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়? ভাবাভাবের পারকে মন তাই ধরতে পারে না, তাই তা বাক্য মনের অতীত। তাই Art হচ্ছে "ভূঃ স্বাহা" (সত্তামাত্র)—Being and Becoming। বিশ্ব—ঐ নিত্য অস্তির কাছে—আপাতপ্রতীতি (apparent), 'সৎ'ই—নিত্য বর্ত্তমান, নিত্য অস্তিই—Real—আসল। মন ভাগ করে, ভাগের পরিচয় হয় লক্ষণ দিয়ে, যার নাম 'গুণ', ক্রিয়াকে দেশে সাজায়। এটাও গতি, নাম, 'দূরত্ব' 'নৈকট্য' প্রভৃতি। গতিকে কালে সাজায়, নাম দেয় 'মুহূর্ত্ত', 'ক্ষণ', 'ঘণ্টা' ইত্যাদি, এখানে (standard) স্থাপিতমান সূর্য্য—গতিরই একটি ফল। কেন্দ্রীভূত গতির নাম স্থূল, তার কারণগুলিকে আলাদা করে দেখলে নাম হয় সূক্ষ্ম। ঐ রকম জড় ও চেতন পৃথক করে দেখা হয়, যেটি apparent (প্রতীতি) মাত্র, Real (বাস্তব সত্য) হচ্ছে শক্তি, যেটি সর্ব্ব চৈতন্য।

যখন শক্তির মধ্যে সমগ্র বিশ্ব বিলীন, তখন তমসার দ্বারা তমসা আবৃত—"অন্ধকার উগরে আঁধার"। বেদ বলছেন "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকম্", অর্থাৎ স্বধার সহিত একীভূত অবস্থায় ব্রহ্মচৈতন্য (আণীৎ= চৈতন্য) ছিলেন। (স্বধা='স্ব'কে 'ধারণ'=শক্তি, রূপ, আকার)। সমস্ত রূপ ধৃত হয়ে, ছিল অভেদভাবে নিজ শক্তিতে (স্বধা)। এই চৈতন্যময় অভেদ 'গূঢ়' 'তমস'ই দেবী আদ্যাশক্তি—আদ্যাকালিকারূপা। প্রলয়ের ঐ গূঢ় অন্ধকার—স্থির নিবাত—যাতে ভবিষ্যৎ দেশ কালাদি বীজ নিহিত—তাঁকে 'মহাতমোগুণ' বলা হয়, ইনি মহাপ্রলয় মূর্ত্তি। ইনিই "মহত্তত্ত্ব'রূপী 'মহাকাল ভৈরব'। আদ্যাকালি, মহাকালে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বিপরীত (প্রলয়ের বিপরীত=সৃষ্টি) ক্রীড়ায় রতা হন, নিহিত শক্তি আক্রমিত হ'য়ে প্রকাশ হতে আরম্ভ হয়, তাই প্রথম ঐ 'গূঢ় তমস'। ক্রিয়া ব্যতীত শক্তির প্রকাশ বোঝা যায় না, বস্তুতে এই শক্তি ধৃত

হয়। এই ধারণশক্তির নাম 'আধারশক্তি'—পূজার 'আসন' (যাতে সাধকের প্রার্থনা, 'ধারয় মাং নিত্যং'—আমাকে সদা ধারণ কর)। এই নিহিত অসীম শক্তির অস্তিত্বই সৃষ্টিক্রিয়ার কারণ।

বেদে আছে, "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষৎ বহু স্যাং প্রজায়েয়" অর্থাৎ দ্বিতীয়হীন 'সৎ' অগ্রে ছিলেন, তিনি 'ঈক্ষণ' করলেন—আমি বহু হয়ে প্রজাত হব। "ঈক্ষতের্ণাশব্দম্" [ব্রহ্মসূত্র ১।১।৫ ('ঈক্ষণ' দ্বারা 'সৎ'এর বহুরূপে পরিণত হবার কথা, ভূতাদি সৃষ্টির কথা ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে, অ। ৬।২।৩ হতে বিশদ বর্ণনা আরম্ভ হয়েছে]। সেই 'সৎ' পুনঃ পুনঃ ঈক্ষণদ্বারা সর্ব্বত্র গূঢ়রূপে অন্তঃপ্রবিষ্ট হলেন। শ্রীশঙ্কর বলেন, 'ব্রহ্ম জ্ঞানময়', সুতরাং সচ্চিদেরই এই মনন বা বিবর্ত্তন।

আমরা দেখতে পাই যে সমস্ত অবতার পুরুষদের, সব মহাপুরুষের, করুণা উথ্‌লে ওঠে জগতের দুঃখকষ্ট দেখে, তাই তাঁরা আজীবন কর্ম্ম ক'রে যান। ঐ করুণাই তাঁদের ঈক্ষণ ও করুণ হৃদয়ই 'কাম'—জগতের জ্বালা নিবারণই তাঁদের ঈপ্সিত বস্তু। জগতটার প্রকাশ যখন প্রলয়ের পর আবার হবার উপক্রম হয়, তখন বিশ্ববীজের নানাত্ব দেখে, সেই চিচ্ছক্তির বা মহাশক্তির আসে অনুকম্পা, তাই ঈক্ষণ করেন ও 'অকাময়েৎ'। ইহার নামই 'কাম'—গুরুহৃদয়। তন্ত্রে ইহার নাম 'শিবকাম', ভক্তিশাস্ত্রে 'অপ্রাকৃতকাম' (প্রেম), তাই শ্রীকৃষ্ণের 'কামবীজ'। "তৎসবিতুর্বরেণ্যম ··· ·প্রচোদয়াৎ" (ঋক্ ৩য় ম ৬২।১০ সূঃ)—'আমাদের ধীশক্তিকে যিনি প্রেরণা দেন।' ছান্দোগ্য ৪।১০।৫ এ ব্রহ্মকে 'প্রাণ' বলা হয়েছে, 'কাম'ও বলা হয়েছে। জীবে এই প্রেরণা আসে কোথা হতে? "তন্নিষ্ঠস্য-মোক্ষোপদেশাৎ" ' (ব্রহ্মসূত্র ১।১।৭) 'ব্রহ্মনিষ্ঠের উপদেশ হতে।' গুরু বা আচার্য্য—এই দুজনের সম্বন্ধের কথা বেদে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। শিষ্য গুরুর কাছে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে যান ঐ কামের প্রেরণায়, গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেন—যাতে তার মহাকল্যাণ হয়—'কামে'রই প্রেরণ। 'কাম'ই দাতা (গুরু), 'কাম'ই গ্রহিতা, 'কাম'ই সর্ব্বত্র দ্রষ্টারূপে থেকে সকলকে পূর্ণকাম করেন, 'কাম'ই প্রতিগ্রহিতা, 'কাম'ই সেই অপার ইচ্ছাসাগর, 'কাম'ই আবার সেই সমুদ্রে বিলীন হন। অনুগীতায় ৩৭ অধ্যায়ে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধের কথায় বাসুদেব অর্জ্জুনকে বলছেন, 'আমিই গুরু, আমার মনই শিষ্য'।

মন, মননশীল—বিচার পরায়ণ—তাই চঞ্চল, ক্রিয়াশীল। মন চায় কার্য্য কারণ সম্বন্ধ। কার্য্যকারণের পারে যা, তা অব্যক্ত। অব্যক্তের বহির্গতি মানে শক্তির বহির্গতি—শক্তির ক্রিয়া। শক্তির বহির্গতি হয়; শক্তি পূর্ব্বাবস্থায় থাকে না—শক্তি 'নিষেধব্যাপাররূপা'। নানা গতির স্পন্দনে প্রকাশশক্তির আবির্ভাব হয়। শক্তির বহির্গতি—মন দুই ভাবে ভাগ ক'রে বোঝবার চেষ্টা করে, একটির নাম 'প্রাণ', অপরটি 'আকাশ' (ব্রহ্মোপনিষৎ ১৯)। দুই-ই ব্যাপক—অসীম। ঐ 'ঈক্ষণ'ই, 'কাম'ই, 'প্রাণ'ই সমষ্টিভাবে বিশ্বকুণ্ডলিনী, ব্যষ্টিতে, ব্যষ্টির কাছে তার নাম 'কৃপাদৃষ্টি', সাধকের শ্রদ্ধা, জীবের কুণ্ডলিনী। আমরা যত রকম শক্তি-ক্রিয়া দেখি সে সকলের মূল স্থানই প্রাণ, বিশ্ববীজ—সর্ব্ব সংস্কারের বীজ—যাকে আমরা জড়রূপে প্রকাশিত দেখি—ঐ সবের মূলস্থানই 'আকাশ'। আকাশে প্রেরণা আসে, আকাশের ওপর প্রাণের স্পন্দন হয়—বিশ্ব প্রকাশিত হয়। নানা ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়ে শক্তির ক্রিয়া বিন্দুরূপে ফুটে ওঠে, বহির্গতি হয়, প্রতিবিম্বিত মনে আবার ফিরে আসে—প্রকাশ-বোধ আসে। অন্তর্গতিই বর্হির্মুখী হয়।

[চিৎ = জ্ঞান। বিজ্ঞানমাকাশং = চিদাকাশ (ব্রহ্মোপনিষৎ, ৩২ দ্রঃ)। বলা হয়েছে যে, চিদ্রূপী স্বচ্ছ আকাশস্বরূপ ব্রহ্ম (তৎ) হৃদ্যাকাশে প্রতিভাত হন। অবকাশাত্মক 'ভূতাকাশ' নয়, কিন্তু যাতে সজগৎপ্রপঞ্চ ওতপ্রেত ভাবে বিদ্যমান, যে আকাশে ব্রহ্ম বিচরণ করেন, সেই আকাশই জ্ঞাতব্য। হৃদয়ের লক্ষণ = "হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াদ্বিশ্বস্যায়তনং মহৎ" বিশ্বের মহৎ আয়তন, যা হতে বিশ্ব প্রসূত হয়। হৃদয়ই পরমাত্মার ধ্যানভূমি। চিদাকাশই মূল আকাশ।]

সব আছে হৃদয়ে—অন্তরে। নিম্নস্তরে, সংস্কার সব জটিলতা পূর্ণ, মলিনতাপূর্ণ। বহির্গতির অন্তর্গতি হলে সব সংস্কার প্রাণময় হয়ে যায়, তখন শুদ্ধবুদ্ধির উদয় হয়, 'ঈক্ষণ' কি উপলব্ধি হয়, 'কৃপার' বা 'করুণার' অর্থ প্রকাশ পায়, 'প্রেম' স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়।

তন্ত্রে প্রধানতঃ তিন প্রকার ধ্যানের ব্যবস্থা আছে। (১) নির্গুণ ধ্যান—'ওঁ তৎসৎ' বা যে কোন 'মহাবাক্যের' ধ্যান, সাক্ষিস্বরূপের— 'দ্রষ্টার' ধ্যান, (২) বিরাটের ধ্যান = সমষ্টির ধ্যান, (৩) স্থূলের ধ্যান—চিন্ময়ী 'মূর্ত্তির' ধ্যান, 'জ্যোতির' ধ্যান, 'প্রণবের' ধ্যান। সৃষ্টির প্রকাশ আমরা দুভাবে দেখি, (১) বাহ্য জগৎ, (২) অন্তর্জগৎ—মনবুদ্ধির জগৎ। এই দুই-ই

স্বপ্রকাশ। এই অন্তর বাহিরে প্রকাশমান শক্তির, এই সমষ্টির নামই 'বিরাট'। সুতরাং 'বিরাট'ই সর্ব্বান্তর্য্যামী (অন্তরাত্মা) ও সর্ব্বব্যাপি—সত্য। এই সত্যকে ধরবার জন্যই, সত্যকে অংশে অংশে, বহুভাবে বুঝতে হয়, তখন প্রত্যেক বস্তুর স্বাতন্ত্র্য বোধ আসে। এই বোধ, প্রতি বস্তুর অবয়বের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত, যে, এই খণ্ডিত বোধ বা কাঁচা আমির জ্ঞানকে জ্ঞেয় বস্তুর সঙ্গে পৃথক করা যায় না—বিচারে স্বতন্ত্র বোধ হলেও। কিন্তু ঐ সমষ্টিরূপী বিরাট 'অহং'এ জ্ঞেয় ও জ্ঞান একাত্ম অর্থাৎ ঐ বড় 'অহং'ই বিজ্ঞাতা বা সর্ব্বজ্ঞ। ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা ঐ জ্ঞানকে বোঝা যায় না, কারণ, ইন্দ্রিয় তাঁকে ছুঁতে, ধরতে, দেখতে পায় না; ইনি 'দ্রষ্টা', 'সাক্ষিচৈতন্য', 'স্বসংবেদ্য'—সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের আশ্রয়। বিরাট, জাগ্রতাভিমানী পুরুষ; ইঁহার নিদ্রা, জাগরণ বা কোন অবস্থার পরিবর্ত্তন নেই। পরিবর্ত্তন হয় জ্ঞান ও জ্ঞাতার সম্বন্ধে—ঐ দুয়ের সম্পর্ক আলো ও অন্ধকারের ন্যায়। আলো সরিয়ে নিলে কিছুই দেখা যায় না, জ্ঞানকে সরিয়ে নিলে জ্ঞেয় পালাবে। একই বহুরূপে প্রতীয়মান; প্রমাণ—সাধনসম্ভূত প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

দেবী কালিকায়, 'নিমেষ' 'উন্মেষ' শক্তি মিলিত, 'উন্মেষই' 'বিরাট'। চরাত্মক ব্রহ্মশক্তির নাম হিরণ্যগর্ভ—স্বপ্নাভিমানী, জড়াত্মক ব্রহ্মশক্তিই 'আকাশ'। চিৎ ও জড়ের (চিজ্জড়ের) স্বস্থিতি ব্যাপার সম্ভব হয় যে শক্তিতে সেই শক্তির নাম 'প্রাণ'। প্রাণ ও আকাশের মিলনভূমির নাম 'ঈশ্বর', অতএব ঈশ্বরেরই সৃষ্টি কল্পনা। সৃষ্টি ব্যাপারে প্রধানতঃ দুটি শক্তির খেলা দেখা যায়, (১) দৃশ্যশক্তি বা জড়শক্তি, যেমন চূণে হলুদে মেশালে লাল হয়, (২) সূক্ষ্মশক্তি বা অদৃশ্যশক্তি (মানস শক্তিও অদৃশ্য), যেমন হজম বা রক্ত চলাচল ব্যাপার, জীবের অজ্ঞাতসারেই হয়। ঐ দুই শক্তির নাশেই প্রলয়। তখন সূক্ষ্মশক্তি বা মানস শক্তি স্বকারণে লয় হয়। এই লয় অবস্থায় মানসশক্তির উপাদানকারণের নাম 'প্রাণ', আর জড়শক্তির উপাদানকারণের নাম 'আকাশ'। আকাশ হতেই পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হয়, আর ঐ 'প্রাণই' ভূত শরীরে পাঁচভাগে বিভক্ত হ'য়ে পঞ্চ বায়ু (দশ বায়ু=বহির্বায়ু) নামে প্রকাশ পায়।

[সমস্ত করণের (ইন্দ্রিয়ের) সাধারণ অর্থাৎ মিলিত বৃত্তিই পঞ্চপ্রাণ =প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, (সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ২য় অঃ। ৩১ দ্রঃ)। মহর্ষি

কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা। ঐ দর্শন সম্বন্ধে মূল তিনটি বই প্রসিদ্ধ, (১) অতি সংক্ষিপ্ত, ২২টি সূত্রে গ্রথিত 'তত্ত্বসমাস', (২) ঈশ্বর কৃষ্ণাচার্য্যের 'সাংখ্য কারিকা' (৭২টি সূত্র)। এই কারিকাটি গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত ও প্রাচীন, (৩) সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, কপিলের শিষ্য আসুরি, আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য কর্ত্তৃক বিস্তৃতভাবে সাংখ্যকারিকার সমুদয় তত্ত্ব এবং তত্ত্বসমাসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা যাতে আছে তাহাই "সাংখ্যপ্রবচন' নামে পরিচিত।]

দর্শনশাস্ত্র

আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মূল ভিত্তি। ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে মোক্ষই পরম পুরুষার্থ। চিত্তশুদ্ধির কারণ কর্ম্ম। বেদের কর্ম্মকাণ্ড নিয়েই মীমাংসাদর্শন। জৈমিনী এই দর্শনশাস্ত্রের প্রণেতা। কর্ম্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য স্বর্গাদি লাভ ও চিত্তশুদ্ধি। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, এই তিনটি চিত্তশুদ্ধির উপায়। প্রথমে বিষয়টি শুনতে হয়, তার পর চিন্তা করতে হয়, বিচার করে যুক্তি দিয়ে বুঝতে হয়, তার পর সতত ধ্যানপরায়ণ হতে হয়। ধ্যান দ্বারাই সত্যজ্ঞানের স্ফুরণ হয়। চিত্তশুদ্ধি না হলে জীবন গঠিত হয় না। ঐ তিন উপায়ের দ্বারাই আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। শুধু 'আপ্তবাক্যের' দোহাই দিলে হয় না, সেটি বিচার ও নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান দ্বারা জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হয়। জীবনকে গঠন করা নিজের হাতে, তাই দর্শনশাস্ত্রের আর এক নাম 'মননশাস্ত্র'। এই শাস্ত্র সহায়ে তত্ত্বজ্ঞান আসতে পারে, কিন্তু মাত্র তত্ত্ববুদ্ধির দ্বারা প্রত্যক্ষ আত্মভ্রম—ইন্দ্রিয়গত অহংবোধ—যায় না, সুতরাং চাই সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষাত্মক তত্ত্বজ্ঞান, যাতে ঐ ভ্রম দূরীভূত হয়।

ছয়টি দর্শনশাস্ত্র প্রসিদ্ধ—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত। ন্যায় ও বৈশেষিককে 'সমান তন্ত্র' বলা হয়। সাংখ্য ও পাতঞ্জল এক শ্রেণীভুক্ত, সাধারণ নাম—সাংখ্যপ্রবচন। পাতঞ্জলদর্শনকে 'সেশ্বর সাংখ্য' বলা হয়, কপিলের সাংখ্যদর্শন 'নিরীশ্বর সাংখ্য' নামে বিদিত। (সাংখ্য = সম্যক্‌জ্ঞান)। মীমাংসা ও বেদান্ত "শ্রুতিপ্রমাণকে অবলম্বন ক'রে বিচার করেছেন, অন্যান্য দর্শন কেবল যুক্তির দ্বারাই বুঝিয়েছেন।—

মাধবাচার্য্য, তাঁর সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে ১৫টি দর্শনশাস্ত্রের নাম করেছেন; তাঁর অন্য একটি গ্রন্থে 'শাঙ্কর দর্শনের' উল্লেখ করেছেন। অতএব হয় ১৬টি দর্শন অর্থাৎ ঐ প্রসিদ্ধ ষডদর্শন ও আরো ১০খানি দর্শন। চার্ব্বাক দর্শন, আর্হত (জৈন) দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, রামানুজ দর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন, রসেশ্বর দর্শন ও পাণিনি দর্শন—এই ৭খানি, ষডদর্শনের অতিরিক্ত দর্শন। পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন ও শৈব দর্শন, বেদান্তের 'প্রস্থান' বিশেষ বলে গণ্য। বেদ যেমন সকল দর্শনের মূল ভিত্তি, তন্ত্রের মধ্যেও তেমনি সমস্ত দর্শনের মূল তত্ত্ব বিদ্যমান। পূর্ব্বমীমাংসা বা কর্ম্মমীমাংসা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়েই তার মীমাংসা করেছেন। এই শাস্ত্রে জ্ঞান থাকলে তবে কর্ম্মকাণ্ড বোঝা যায়। কর্ম্মমীমাংসার আর একটি নাম 'অধ্বর-মীমাংসা', আর ব্যাস প্রণীত মীমাংসা দর্শনের নাম 'উত্তর মীমাংসা' বা 'শারীরিক মীমাংসা' বা 'বেদান্ত দর্শন'। অতএব মীমাংসাশাস্ত্র একটি ও তার দুটি অংশ। 'বেদ অপৌরুষেয়'—ইহা সকলে স্বীকার করেন।

কর্ম্মমীমাংসা মতে বেদরাশি নিত্য অর্থাৎ শব্দ নিত্য। ধ্বনি ঐ শব্দের অভিব্যক্তি মাত্র। শব্দ নিত্য, শব্দের বোধ, পরে প্রকাশ পায় উচ্চারণে।

[পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শন, ১ম অ, ১ম পা, ১৮ সূ]

ঐ ২১ সূত্রে, 'অনপেক্ষত্বাৎ', অর্থাৎ শব্দ কোন বস্তুর অপেক্ষা রাখে না। যোগীজনগম্য 'অনাহত' শব্দও আছে, সুতরাং শব্দ সর্ব্বাতীত ও নিত্য।

['বর্ণাত্মকা নিত্যাঃ শব্দাঃ'—(পরশুরাম কল্পসূত্র—১।৭।) 'মন্ত্রাণামচিন্ত্যশক্তিতা'—ঐ ১।৮ দ্রঃ]

'গমন', একটি 'স্ফোটশব্দ'। 'গ' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ ধ্বনির লয় হয়, 'ম' ও 'ন'—প্রত্যেকটি পৃথক ধ্বনি, পরে পরে লয় হয়। পৃথক পৃথক ধ্বনিগুলি, ধ্বনি মাত্র, কিন্তু ঐ তিনটির সংযোগে যে অর্থ প্রকাশ পায় সেটি বক্তার বুদ্ধিতে আরূঢ় হয়ে একটি ধ্বনি উচ্চারিত হয় মাত্র—পূর্ব্ব হতেই সেটি ছিল,—অতএব, 'স্ফোট' ও 'ধ্বনি' একবস্তু নয়। শব্দ ও শব্দার্থবোধের সম্বন্ধ নিত্য। তন্ত্রমতেও শব্দ নিত্য, শব্দের যথার্থ প্রকাশকই মন্ত্র এবং মন্ত্রের অচিন্ত্যশক্তি।

যেরূপ কর্ম্ম কারোর দুঃখের কারণ হয়না অথচ কর্ত্তার অভ্যুদয় হয়—এইরূপ কর্ম্মের প্রেরণাই 'বিধি' ও তদনুসরণই 'ধর্ম্ম'—ইহাই জৈমিনীর মত।

["চোদনা লক্ষণোঽর্থ ধর্ম্ম"—১ম অ, ১ম পা ২য় সূ। (চোদনা = প্রেরণা—অভ্যুদয় জনকত্ব)]

অন্যের দুঃখ উৎপাদক কোন কর্ম্মে সুখফলদাতা স্বর্গলাভ হয় না। সুতরাং, বোঝা যায় যে, কর্ম্মকাণ্ডে যেখানে অভিচার, মারণ, উচ্চাটনাদির কথা আছে সেগুলি 'ধর্ম্ম' নয়—সেগুলির উদ্দেশ্য অন্য। এটি মনে রাখতে হবে। জৈমিনি, বৈদিক বাক্যকে ৫ ভাগে বিভক্ত করেছেন—'বিধি', 'নামধের', 'মন্ত্র', 'অর্থবাদ' ও 'নিষেধ'। বিধি তিনপ্রকার,—'উৎপত্তি বিধি', 'নিয়ম বিধি' ও 'পরিসংখ্যা বিধি'। এই 'পরিসংখ্যা বিধি'র কথা স্মরণ রাখতে বলি, কারণ তন্ত্রেও এই বিধির প্রয়োগ আছে। 'পরিসংখ্যা বিধি' মানে, কার্য্যসাধক বহু বিধি থাকলে যেগুলি শ্রেষ্ঠ, মাত্র সেইগুলিকে গ্রহণ করা।

চার্ব্বাক দুষ্ট বুদ্ধির আশ্রয়ে বেদের বচনগুলি তুলে এ রকম ব্যঙ্গ বা কদর্থ করেছেন যা অনুসরণ করলে স্বেচ্ছাচারজীবন হয়। চার্ব্বাক বেদ মানেন নি, সুতরাং তাঁর দর্শন 'নাস্তিক দর্শন' নামে আখ্যাত। চার্ব্বাক মতটি ঠিক্ (Epicurus) এপিকিউরাসবাদ যেন। (Epicurus—341—270 B.C. খৃঃ পূঃ ৩৪১—২৭০)। চার্ব্বাক মত, লোকায়তবাদের মত, গদ্যে ও পদ্যে নিবদ্ধ। মহাভারতেও 'চার্ব্বাক' শব্দটি দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, ২৪ জন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়; সুতরাং, এই হিসাবে, গৌতম বুদ্ধ বা শ্রীবুদ্ধের বহু বহু পূর্ব্ব হতে ভারতে একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় ও মত প্রচলিত ছিল। জৈন মত বহু প্রাচীন। ইহা প্রথমে সম্পূর্ণ বেদানুগ ছিল। যোগবাশিষ্টে, রামচন্দ্র জৈন সাধুর প্রশংসা করছেন দেখা যায়। আদি জিন (জিনমোক্ষ) বা আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের কথা ভাগবতে পাই। প্রিয়ব্রতের পুত্র আগ্নীধ্র, তৎপুত্র নাভি এবং নাভির পত্নী মেরুর গর্ভে ঋষভদেবের জন্ম হয়। এই ঋষভদেব, নগ্ন প্রকীর্ণকেশ ব্রহ্মব্রতী মৌন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ছিলেন। ঋষভের চরিত্রে ঈর্ষাযুক্ত হয়ে কোন রাজা বেদ বিরুদ্ধ আচার ও নিজমত প্রবর্ত্তন করেন। ইহাই পরবর্ত্তী জৈনধর্ম্ম। জৈন, চৈতন্য ও জড়, এই দুই সত্তা স্বীকার করেন, (প্রমাণ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ)। জড়ের কর্ম্ম নেই, সুতরাং মোক্ষ ও নেই। অতএব, জীবতত্ত্ব বা জীব, 'ক্ষেত্রাবগাহী' অর্থাৎ জড় পদার্থ মিশ্রিত থাকা পর্য্যন্ত মোক্ষ হয় না। মোক্ষ মানে "কৃৎস্নকর্ম্ম বিয়োগো লক্ষণো মোক্ষঃ"—

সমস্ত কর্ম্মের বিযোগ বা সম্যক বিনাশ। জীবতত্ত্বের বিপরীত আজীবতত্ত্ব। শুভাশুভ কর্ম্মদ্বারস্বরূপ 'আস্রবকে' বিনাশ করতে হলে 'অনুপ্রেক্ষারূপ, সাধন সহায়ে মনকে নিশ্চল করতে হয়। ইহার নাম 'মনোগুপ্তি'; বাগেন্দ্রিয় বশীভূত হওয়াই 'বাক্‌গুপ্তি' ও শরীরকে কর্ম্ম হতে সম্পূর্ণ বিরত রাখাই 'কায়গুপ্তি', যাতে ধীরে ধীরে দেহক্ষয় হয়ে মৃত্যু হয়। জৈনধর্ম্মে আত্মা= জীবতত্ত্ব বা জীব, লঘু, স্বাভাবিক উর্দ্ধগতিসম্পন্ন—কর্ম্মপরমাণু হতে অব্যাহতি পেলে সিদ্ধি লাভ হয়। 'নির্ব্বাণ' বা মোক্ষ সময়ে সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্ত জীব, ব্যাপ্ত হয়ে কর্পূরবৎ উপে গেলে, আত্মা দেহ হতে মুক্ত হয়ে 'সিদ্ধশিলায' যায় আর ফেরে না—ইহাই মুক্ত বা 'সিদ্ধ ভগবান'। জৈন সাধনে ('অনুপ্রেক্ষায়') সমস্তই অনিত্য চিন্তা করতে হয়, (পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু ভোগে অনুশোচনা)—দ্বন্দ্বভাব হতে 'ধর্ম্ম'ই রক্ষা করতে সমর্থ। আরো ভাবতে হয় যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হর্ত্তাকর্ত্তাবিহীন ও অনাদি। সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান, সম্যক চারিত্র, অহিংসাধর্ম্ম অর্থাৎ সত্য, ক্ষমা, বিনয়, ব্রহ্মচর্য্য, উপশম, নিয়ম, দান, অপরিগ্রহ প্রভৃতি আচরণ দ্বারা মোক্ষ সুখ পাওয়া যায় বা 'ধর্ম্মানুপ্রেক্ষা' লাভ হয়। আজীব, একটি পরমাণু। মিশ্রণ ঘটায় একমাত্র কর্ম্ম পরমাণু। ধর্ম্ম নিত্য, কিন্তু গুণবোধরূপ ধর্ম্ম অনিত্য অর্থাৎ ধ্বংসশীল। জৈন 'ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ' মতে, জগৎ দৃশ্য মাত্র—গুণমাত্র—অতএব ধর্ম্মকে আশ্রয়—ইহার কোন অধ্যায় নেই। ২৪জন তীর্থঙ্করের মধ্যে শেষ তীর্থঙ্কর নাতপুত্ত মহাবীরস্বামীর নাম প্রসিদ্ধ। ২৪জন বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত বুদ্ধের নাম ও প্রচলিত। শাক্যবংশের শ্রীবুদ্ধই আজ জগতে পূজিত। তিনি ধ্যান ও সাধনের উপর, কর্ম্মজীবনের উপর জোর দিয়েছেন, নিজে অবিদ্যাতত্ত্বের সাক্ষাৎকার ক'রে 'অহংতত্ত্ব' বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন যে, নির্ব্বাণতত্ত্ব অবিদ্যার পারে। যাই হোক্, জৈনমত ও বুদ্ধমত ভারতে পাশাপাশি বর্দ্ধিত হয় ও আশ্চর্য্য নয় যে ঐ উভয় মত পরস্পর পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত। আচার ও মত পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁরা হিন্দু।

জৈন প্লাবনে, এক সময়ে দাক্ষিণাত্যের 'বীর শৈব' সম্প্রদায়কে দুর্ব্বল করে। ঐ সম্প্রদায় ও প্রাচীন। ইঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, কিন্তু বৈদিক যজ্ঞাদি বা শ্রাদ্ধকর্ম্ম মানেন না। এটা ভুল ধারণা যে হিন্দুমাত্রই বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের সবটাই মানেন। "স্বয়ম্ভু আগমে" বীর-

শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান পঞ্চ আচার্য্যের নাম ও বর্ণনা পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণে বীরশৈবের লক্ষণ, "যো হস্তপীঠে নিজলিঙ্গমিষ্টং বিন্যস্ত তল্লীন মনঃ প্রচারঃ। বাহ্যক্রিয়াসঙ্গ বিবর্জিতাত্মা সম্পূজয়ত্যঙ্গ স বীর-শৈবঃ।" বীরশৈবেরা বলেন যে তাঁদের 'লিঙ্গায়েৎ' বা 'লিঙ্গাবনতক' নাম মুসলমান বিজেতারা দেন। বীরশৈব মত, 'শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত' নামে পরিচিত। নীলকণ্ঠ শিবাচার্য্য (বীরশৈব) 'শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত' লেখেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্যও রচনা করেন। শাঙ্কর ভাষ্যে নীলকণ্ঠের নাম পাওয়া যায়। শঙ্কর, নীলকণ্ঠ মতের সমালোচনা করেছেন। বীরশৈব মতে, শিব-প্রমথগণ কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায় গঠিত হয়। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের কথোপকথনে, এই সম্প্রদায়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়। বীরশৈব আচার গ্রহণে—ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের—সকলেরই অধিকার, কেবল 'দীক্ষা-সংস্কার' নিয়ে সম্প্রদায়ভুক্ত হবার সময় ব্রাহ্মণাদির জন্য নিয়ম, "বর্ষত্রয়ং ব্রাহ্মণং তু ক্ষত্রিয়ং বর্ষষটকম্। নববর্ষং পরং বৈশ্যং শূদ্রং দ্বাদশবর্ষকম্"। (বীরশৈব কৌস্তুভ)। ঐরূপ নিয়ম, পরীক্ষার জন্য—কেবল নবাগত বা অপরিচিত ব্যক্তিদের জন্য। পৌরহিত্য প্রভাবে স্ত্রী-শূদ্রের অধিকার বন্ধ করা হলেও এবং ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকলের অধিকার সংকুচিত করা সত্ত্বেও, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে—বিশেষ যেখানে যেখানে তন্ত্রের প্রভাব বর্ত্তমান সেই সকল স্থানে—সকলের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করবার বিশেষ চেষ্টা হয়েছে।

ভারতের আচার্য্যেরা 'সংস্কারের' ওপর জোর দিয়েছেন, কারণ, সকল সংস্কারই অভ্যুদয়জনক, তবে ইহাও মনে রাখতে হবে যে, যাতে মানবচিত্তের উন্নতি আনে না বা যা অভ্যুদয়জনক নয়, সেগুলি 'সংস্কার' নয়।

শিবলিঙ্গের পূজা দেখে অনেকের বিষম ভ্রান্তধারণা আছে যে, ভারতে বুঝি একসময়ে 'লিঙ্গ'পূজা ছিল (সাধারণ অর্থে)। বেদে 'শিশ্নোপাসক'দের উপর কটাক্ষ আছে।

["বৈদিক যুগের বিবাহপ্রথায়, কুমারী কন্যার মাতৃশক্তি বিকাশের অধিকারিণী হইবার প্রথম পরিচয় প্রাপ্তিমাত্র 'গর্ভং ধেহি সিনিবলি' ইত্যাদি মন্ত্রে তাহার মাতৃমুখের' পূজাদির বিধান থাকায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ কাল হইতেই ভারত, নারীতে মাতৃপূজা করিয়া আসিতেছে। মাতৃমুখ বা স্ত্রীচিহ্নের বেদোক্ত ঐ পূজা

যে দ্রাবিড় জাতির মধ্যগত স্ত্রী চিহ্নের পূজার ন্যায় ছিল না ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। উদ্দেশ্যের প্রভেদ দেখিয়াই ঐ কথা অনুমিত হয়। বৈদিকী পূজার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মাতৃশক্তির সম্মান, প্রাচীন দ্রাবিড়ী অনুষ্ঠান সকলের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র জায়ার ভিতর দিয়া প্রকাশিত নারীশক্তিরই পূজা, এবং তান্ত্রিকী পূজার লক্ষ্য, মাতা এবং জায়া উভয়ভাবে প্রকাশিতা নারীশক্তিরই মহিমা প্রচার। বেদে ঐরূপে নারীর মাতৃত্বশক্তির পূজা বিধান অল্পবিস্তর প্রাপ্ত হইলেও দ্রাবীড় জাতির ন্যায় স্ত্রী-পুং চিহ্নের কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় না। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন ঐ উপাসনা সুমের এবং তচ্ছাখা দ্রাবিড় জাতিরই নিজস্ব সম্পত্তি—বৈদিক আর্য্যদের নহে, নতুবা বেদেই উহার প্রমাণ পাওয়া যাইত। তিনি আরও বলিতেন, লিঙ্গাইত শৈব-সম্প্রদায়-লিঙ্গোপাসনা বেদবিরুদ্ধ নহে এবং অথর্ব্ববেদনিবদ্ধ যূপস্কম্ভের (স্তম্ভের) উপাসনাই 'লিঙ্গোপাসনা' বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ঐ কথা (যূপস্কম্ভের উপাসনাকে 'লিঙ্গোপাসনা' বলিয়া স্থির করা) সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় না, কারণ, যদি ঐরূপই হইবে তবে বেদের অন্য কোন স্থলেই স্ত্রী-পুং চিহ্নের পূজা-পরিচায়ক কোনও মন্ত্র বিধানাদি প্রমাণস্বরূপে পাওয়া যায় না কেন? শিবলিঙ্গের পূজা যে পুংচিহ্নের পূজা নহে তাহার অন্য কারণ উহার পূজা কালে পূজকের "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং"—ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান ধারণা করা। এজন্য বেদোক্ত বহুপ্রাচীন শিবপূজার সহিত বৌদ্ধযুগের স্তূপসমূহের সংযোগ করিয়াই যে কালে বর্ত্তমান লিঙ্গোপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ইহা স্বামীজি যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন।"—(ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ)। (উক্ত গ্রন্থে যে সামান্য মুদ্রণদোষ আছে তা সংশোধিত ক'রে উদ্ধৃত হল। দুঃখের বিষয়, ফ্রান্সে ফরাসী ভাষায়, যূপস্কম্ভ সম্বন্ধে স্বামীজির মূল বক্তৃতা এ পর্য্যন্ত অনূদিত হয় নি)।

জৈন প্রভাব একসময়ে বাঙ্গালায় খুব বিস্তার লাভ করলেও, এখন বাঙ্গালায় জৈনশাস্ত্রের আলোচনা অত্যন্ত কম। অন্যান্য দর্শনের আলোচনা কমবেশী থাকলেও, বর্ত্তমানে অদ্বৈত বেদান্তের ও তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা বাঙ্গালায় আরম্ভ হয়েছে, তবু অনেকে 'বীরশৈব' সম্প্রদায়ের নাম পর্য্যন্ত জানেন না।

'আধ্যাত্মিক', 'আধিভৌতিক', 'আধিদৈবিক'—জীব এই ত্রিতাপদগ্ধ। দেহমনের অভাবজাত তাপ আধ্যাত্মিক তাপ, দস্যু তস্কর ... । জী...র

উৎপাৎজনিত দুঃখই 'আধিভৌতিক' তাপ, নৈসৰ্গিক কাৰণে উপজাত দুঃখই 'আধিদৈবিক', যেমন ঝড়, প্লাবন, ভূকম্প ইত্যাদি। জীব, এই ত্ৰিতাপ হতে মুক্তি পেতে চায়। তাই মুক্তিৰ অন্বেষণে বিবিধ উপায়ে মানব সদা ৰত। মুক্তি—নিৰ্ব্বাণ মুক্তি ছাড়া—চাৰিপ্ৰকাৰ, (১) সালোক্য—একই লোকে বা স্বৰ্গে বাস কৰা, (২) সামীপ্য—সৰ্ব্বদা নিকটে থাকা, (৩) সাযুজ্য—একসঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা, বিম্বেৰ মত, (৪) সাৰ্ষ্টি—কল্পান্তে ব্ৰহ্মে লীন হয়ে যাওয়া। সাধকেৰ বাসনা অনুসাৰে ঐগুলি এক একটি ধাপ, অদ্বৈত বেদান্ত মতে, অবিদ্যাৰ সম্পূৰ্ণ নিৰ্ব্বাণ ও আত্মজ্ঞানই জীবকে ত্ৰিতাপ হতে মুক্ত কৰতে পাৰে, স্বৰূপে স্থিত কৰতে পাৰে, তখনই, তখনই কেবল জন্মমৃত্যুৰ প্ৰবাহ বন্ধ হতে পাৰে যখন অবিদ্যাৰ নাশ হয়। স্বৰূপস্থিতিই নিৰ্ব্বাণ মুক্তি। সকল দৰ্শনশাস্ত্ৰেৰই এক একটি মত আছে, কিন্তু তাঁদেৰ এই আপাত-প্ৰতীয়মান মতভেদ সত্ত্বেও, সকলেই এক বাক্যে স্বীকাৰ কৰেন যে, আত্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না। ৰসায়ন শাস্ত্ৰ, পদাৰ্থ-বিদ্যা বা বা জ্যোতিষশাস্ত্ৰ—সমস্তই একই বিজ্ঞানশাস্ত্ৰেৰ অন্তৰ্গত, কিন্তু যে শাস্ত্ৰেৰ যে অধিকাৰ, সেই দিক্ দিয়েই ঐ শাস্ত্ৰ আলোচিত হয়েছে—সকলে একই কথা খুঁটিনাটি ব্যাপাৰে বলতে পাৰেন না। দৰ্শনশাস্ত্ৰেৰ মতভেদজনিত কূট তৰ্কেৰ সময় এইটি মনে ৰাখা দৰকাৰ, নতুবা বৃথা বাক্‌জাল বিস্তাৰ হয়। বৈশেষিক মতে, 'আত্মা'=দেহ ও ইন্দ্ৰিয়াদিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী সঞ্জীবনী শক্তি। 'আত্মা' দুৰকম—জীবাত্মা ও পৰমাত্মা। জীব=প্ৰাণী। সকলেৰ পৰম বা শ্ৰেষ্ঠ আত্মা বা পৰম প্ৰভু (ঈশ্বৰ)=পৰমাত্মা। আত্মানুভূতিতেই সৰ্ব্বপ্ৰকাৰ দুঃখেৰ নিবৃত্তি হয়, তখন 'সত্য' প্ৰকাশ পায়। এই সত্যানুভূতিই আত্মজ্ঞান—মুক্তিৰ কাৰণ। ন্যায়শাস্ত্ৰ প্ৰণেতা মহৰ্ষি গৌতমেৰ মতে, জীবাত্মা অপেক্ষা পৰমাত্মা বা পৰমেশ্বৰেৰ অসীম ক্ষমতা, অসীম প্ৰভাব আছে, বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন জীবাত্মাৰ অধিষ্ঠান। 'আত্মা' যে শৰীৰ নয় —এই জ্ঞান উদয়ে দুঃখেৰ নিবৃত্তি হয় অৰ্থাৎ মুক্তি হয়, তখন জন্মমৃত্যুৰ অধিকাৰ আৰ থাকে না। মীমাংসাদৰ্শন, এক উচ্চতম ভূমিৰ—উচ্চতম অবস্থাৰ কথা স্বীকাৰ কৰেন, কিন্তু নিৰীশ্বৰবাদী। মীমাংসামতে, দেবতাৰ (ঈশ্বৰই হোন্ আৰ যেই হোন্) মন্ত্ৰময় কায়া। শাস্ত্ৰবিধি অনুসাৰে মন্ত্ৰ-সাধনায়, জীব উচ্চাৎ উচ্চতৰ ভূমিতে আৰোহণ ক'ৰে নিজেৰ গন্তব্য স্থানে উপনীত

হয়। সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিলেব মতে, জীব যখন ত্রিতাপদগ্ধ, তখন জীবেব কর্ত্তব্য ঐ ত্রিতাপ-জ্বালা হতে মুক্ত হবাব চেষ্টা কবা। তবে ইহাব জন্য জীবাত্মাব অতিবিক্ত—জীবাত্মা হতে স্বতন্ত্র—একজন সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বাতীতকে মানবাব দবকাব নেই। তা ছাড়া, যুক্তিব দ্বাবা 'ঈশ্বব' প্রমাণিত হয় না। 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি'কে বিকৃত ক'বে বোঝবাব জন্যই জীব ত্রিতাপ হতে মুক্তিলাভ কবতে পাবে না। তত্ত্বজ্ঞান এলে—'পুরুষ ও 'প্রকৃতি' কি উপলব্ধ হলে, উক্ত ত্রিতাপ ধ্বংস হয। শবীব দুই বকম—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল শবীব = দৃশ্য পঞ্চভূত + সূক্ষ্মপঞ্চভূত , সূক্ষ্মশবীব = মন + বুদ্ধি + অহংকাব + পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয + পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয + পঞ্চতন্মাত্রা (মূল ছাঁচ)। প্রকৃতি হতেই বুদ্ধি ও অন্যান্য তত্ত্ব পবে পবে আসে। সত্ত্ব, বজঃ ও তম—এই ত্রিগুণেব সাম্যাবস্থার নাম 'মূলপ্রকৃতি'। 'পুরুষ' চেতন, 'প্রকৃতি' জড। জড নিষ্ক্রিয হলেও, 'পুরুষ' হতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। 'পুরুষেব' সান্নিধ্যবশতঃ, 'প্রকৃতি' হন চেতন ও তখন সৃষ্টি হয়। 'প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত জীবরূপী 'পুরুষ' অসংখ্য। এই অসংখ্যেব মুক্তিব জন্যই প্রকৃতিব ক্রীডা। পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্ববাদ ছাডা আব সমস্তই সাংখ্যেব অনুরূপ। পাতঞ্জল মতে, প্রকৃতি হতে আলাদা একজন দ্রষ্টা বা 'সাক্ষী' আছেন। তিনিই সাধকেব অভীষ্ট পূবণ কবেন। শ্রীশঙ্কব মতে, জীবাত্মা ও পবমাত্মায ভেদ নেই—সৃষ্টিজ্ঞানেব জন্যই এইভেদ বোধ হয়। ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্মজ্ঞানই নির্ব্বাণ মুক্তি।

একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণীত হয়ে ঐ সকল দর্শনশাস্ত্র হতে অসংখ্য সম্প্রদায়, অসংখ্য মতবাদেব সৃষ্টি হয়েছে ও এখনও হচ্ছে, এইবকম ক'বেই আর্য্যপ্রভা ভাবতময বিকীর্ণ হযেছে, এইবকম ক'বেই সমগ্র হিন্দু জাতি একই লক্ষ্যে ছুটেছে, এইবকম ক'বেই বিনা বক্তপাতে, আর্য্যজাতি ভাবতকে গ'ডে তুলেছেন ভাবতেতব অপব কোন জাতিব উপব লোলুপ দৃষ্টি না বেখে।

'হিন্দু' নামটি বিদেশীব দেওয়া। বেদানুগ ধর্ম্মেব একটি সাধাবণ নাম ছিল—'আর্য্যধর্ম্ম,' 'সনাতন ধর্ম্ম'। যাইহোক, হিন্দু নামটি যেবকম মনোভাব নিয়ে দেওয়া হয়েই থাকুক, ঐ নামটি পবে একটা বিশিষ্টতাব পবিচয় হয়ে দাঁডায। স্বামীজি চিকাগো ধর্ম্মসভায় (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) বলেছিলেন যে, হিন্দু শব্দটি হিন্দুব কাছে যে অর্থে গৃহীত ভাবতে আজ, তাব অর্থ

"বৈদিক যুগ হইতে আর্য্যকৃষ্টি ধারা।" সকল জাতিরই একটা বৈশিষ্ট্য আছে, ভারতের প্রত্যেক অন্তর্জাতিরও একটা বিশেষত্ব আছে, সে সব বৈশিষ্ট্যের কারণ—আবহাওয়া, ভূসংস্থান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জীবনসংগ্রাম বা এই রকম অনেক কিছু। ভারতের বিশিষ্টতা মানে মৌলিকতা—যা অন্যত্র কোথাও নেই। এই মৌলিকতা সকল জাতির—বিগত, বর্ত্তমান ও অনাগত—বৈশিষ্ট্যকে কুক্ষিগত করতে সমর্থ, কারোর বিশিষ্টতায় বা ভাবে আঘাত না দিয়ে। 'বৌদ্ধধর্ম্ম' নামে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন ধর্ম্ম ভারতে কোন কালে ছিল না। শ্রীবুদ্ধের বাণী ও তাঁর বৈরাগ্যময় জীবনের জন্য তিনি দশ অবতারের মধ্যে একজন। শ্রীবুদ্ধের মত, বেদসম্মত। যে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিতে, পরে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি মহাবিপন্ন হয়, ভারতকে—সমগ্রজাতিকে—মাত্র একটি ভাবে গঠিত করবার চেষ্টা হয়, আচার্য্য শঙ্কর সেই তথাকথিত বৌদ্ধ নামে পরিচিত মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান প্রথম। শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজ আবার চতুর্ব্বর্গের প্রচার ক'রে, সমাজ তথা জাতিকে রক্ষা করেন। একঘেয়ে গোঁড়ামির ভাব ভারতের ভূমিতে ফলপ্রসূ কোন কালে হয় নি। শ্রীবুদ্ধের নাম নিয়ে, আজও যে বৌদ্ধধর্ম্মকে একটি পৃথক ধর্ম্ম বলে প্রচার করা হয়, তার উদ্দেশ্য—ভগিনীনিবেদিতার মতে—নিছক ধোলোনীতি (এশিয়ার)।

"The idea that there were once in India two rival religions known as Hinduism and Buddhism respectively, is a neat little European fiction, intended to affect Asiatic politics in the way that is dear to the European heart It cannot be too often repeated that there never was a religion in India known as Buddhism with temples and priests and dogmas of its own —(Nivedita—Vide Probuddha Bharata Vol XI, May 1935)

আজও বুদ্ধগয়ার মন্দির খাড়া হয়ে রয়েছে কেমন করে, কেন আজও তা হিন্দুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, কেন তা বরাবর ইংরাজ আমলেও ছিল শঙ্কর সম্প্রদায়ের হাতে? এগুলি কি ভাববার বিষয় নয়? নিবেদিতা আরো বলেন যে, ভারতের অদ্বৈতবাদ সর্ব্বপ্রকার প্রতীককে রক্ষা করে, কিন্তু পাশ্চাত্যের 'প্রোটাস্টেন্ট' বা 'ইউনিটেরিয়ান' ধর্ম্ম স্ব স্ব মতবাদের একটু এদিক্ ওদিক্ সহ্য করতে পারে না।

[বক্তৃতার শেষে আপনারা একটি প্রশ্ন করেছেন। তার উত্তর সংক্ষেপে এই যে, জৈন প্লাবনের বেগরুদ্ধ করেন বাসব নামে একজন বীরশৈব। বীরশৈবদের মতে, বাসবদেব ছিলেন একজন শিবপ্রেরিত প্রমথ। বাসব কিছুদিন কল্যাণ রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন (দ্বাদশ শতাব্দী 12th century A D)। যূপস্তম্ভটি ব্রহ্মের প্রতীক। যজ্ঞাগ্নি, ধূম, অগ্নিশিখা, ভস্ম, সোমলতা, শিবের বাহন বৃষ, যজ্ঞকাষ্ঠ, শিবের শুভ্র জটাজাল প্রভৃতি সব নিয়েই 'শিব-তনু', শিবের নীলকণ্ঠ, যূপস্তম্ভাদি সমস্তটাই 'শিবলিঙ্গ'। শিবের নাম ঋগ্বেদে আছে, 'পশুপতি' নাম ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে আছে, বিশেষ যজুর্ব্বেদে এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট। 'পশুর' 'পাশ' বলিপ্রদত্ত হয় জ্ঞানাগ্নিতে, আর, ঐ বলিভূক কালাগ্নিই 'নন্দী'। শিবলিঙ্গকে 'জ্যোতির্লিঙ্গ' ও বলা হয়, যে জ্যোতিঃ অনন্ত ও সীমাহীন। বহুস্থানে এই সব তত্ত্ব পল্লবাকারে বহু বিস্তৃত দেখা যায়।]

অধ্যাত্মবিজ্ঞানে সৃষ্টিতত্ত্ব

সংক্ষেপে অনেক কথার আলোচনা হয়েছে। এইবার আপনাদের ইচ্ছায় একটু বিস্তার ক'রে বোঝবার চেষ্টা করা যাবে। কত উগ্র তপস্যার কৃচ্ছ্র, কত কঠোর সাধনার ক্লেশ সহ্য ক'রে আর্য্যভারত মৌলিকতা অর্জ্জন করেছেন। মনে পড়ে সেই সর্ব্বংসহা জনকদুহিতার কথা—ভারতমাতার কথা। ভারত আজ সর্ব্বজাতির জননী।

ধোলো বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে যে সব নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন ও করছেন—সে সমস্তই অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিধ্বনি। ভারতের অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও ধোলোর বস্তুবিজ্ঞান আজ মুখোমুখী। গ্রীক্ মন ক্রম পরিস্ফুটিত হয়ে আজ যে অপরূপ রূপে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ও যার প্রভাবে আজ ধরা আলোড়িত, সেইটি বিশেষভাবে ভারতকে নিজস্ব করে নিতে হবে। ধোলোর ব্যবহারিক দিক্—অদম্য উৎসাহ, সুন্দর সুঠাম গ্রীক-বলিষ্ঠদেহ—এ সমস্তই ভারতকে গ্রহণ করতে হবে ভারতের নিজস্বভাবে।

ইন্দ্রিয়াদি করণ সকলের শক্তি পরিমিত ও সীমাবদ্ধ,, সুতরাং বহু দ্বন্দ্বময়। ঐ দ্বন্দ্বের ঘাত প্রতিঘাতে জীবের সুখদুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। দুঃখবর্জ্জিত স্থানই বেদের 'স্বর্গ'। ঋগ্বেদাদিতে 'নরক' নেই। এই স্বর্গপ্রাপ্তি অল্পকালস্থায়ী, ভোগশেষে আবার দেহ-ধারণ (জন্ম) ও দ্বন্দ্বময় জীবন হয়।

"রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টি"—রাগ (আসক্তি) হতেই সৃষ্টি, বিরাগ হতে যোগ। (সাংখ্য প্রবচন সূত্র, ২অ।৯।)। সৃষ্টি মানে বৈচিত্র্য, প্রতি বৈচিত্র্যই সীমাবদ্ধ। অতএব ইহার বাহিরে মোক্ষ—সর্ব্ব বন্ধন হতে মুক্তি। "বিবক্তস্য তৎসিদ্ধি" 'বিবক্তেরই তাতে সিদ্ধি'—বৈরাগ্যেই মুক্তি। "ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশ বিধি", 'বদ্ধভাবই যদি জীবের স্বভাব হয়, মোক্ষোপদেশ বৃথা' (ঐ ঐ ১মঅ।৭)। যার যা নেই তার তা আসবে কেমন করে, কোথা হতে? কারণ না থাকলে কার্য্য হয় না। বহুর মধ্যে 'সামান্যীকরণ' (Generalisation) ক'রে 'এক' দেখবার চেষ্টা মানুষের কেন? উন্নতি মানে কি? মোক্ষ—নিত্য ও স্বভাব সিদ্ধ, এছাড়া সবই অনিত্য, অস্বাভাবিক—সংস্কাররঞ্জিত দৃষ্টি।

সৃষ্টি ব্যাপারে, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি—দুইই মিশ্রিত। যেমন অনুকম্পা বা কৃপা আছে, তেমনি কঠোরতা ও ভীষনতা আছে। "যা কিছু দেখছ, সবই প্রাণের কম্পনে নিঃসৃত হয়েছে, যাঁরা এই প্রাণাখ্য ব্রহ্মকে মহৎ ভয় স্বরূপ উদ্যতবজ্রের ন্যায় জানেন, তাঁরাই অমৃতত্ব লাভ করেন।" (কঠ ৩।২)। ইহার ঠিক পূর্ব্বের বল্লিতে উপনিষদ্ বলছেন, "যিনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ও এক হয়েও, অবিকৃত থেকে ও বহুরূপে বর্ত্তমান, সেই তাঁকে যিনি হৃদয়ে দেখেন, তিনি শান্তি লাভ করেন, তিনিই পরম সুখলাভ করেন।" (ঐ-২।৯।১২।১৩)। ভীমবক্ত্রা মহাঘোরা মুক্তকেশী দেবী কালিকা-বিগ্রহে বরাভয় হস্ত ও আছে—একই অবয়বে বিপরীত ভাবের সমাবেশ! দ্বন্দ্বকে যিনি পৃথক না ভেবে, সবই ঐ একেরই রূপ ব'লে জানেন, তিনি অমর হন। "দ্বৈতাৎ ভয়ং", দ্বন্দ্বেই প্রকাশিত হয়েছে বিশ্ব, তাই "তাঁরই ভয়ে (মাত্র দ্বন্দ্বরূপী থাকায়) অগ্নি ও সূর্য্য তাপ দিচ্ছেন···।" (ঐ)। এখানে বলা হচ্ছে না যে ভয়ই আধ্যাত্মিকতার মূলে, বলা হচ্ছে যে দ্বৈত বোধ হতেই ভয় এবং "অভয়ং অমৃতম্।" সবই মায়ের রূপ—মা। সুখ, নিজে সুখ ভোগ করেনা, দুঃখ, নিজে দুঃখ ভোগ করেনা—কোথায় অস্তিত্ব তাদের, দ্বন্দ্বের সংস্কার ছাড়া? দ্বন্দ্ববোধই, অতএব, ভয়।

"জন্মাদস্য যতঃ" (ব্রহ্মসূত্র)। 'যাঁ হতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হয়'। ইহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ, "সদ্ভাণং স্বরূপং"—সতের 'ভাণ' বলা হয়েছে (তন্ত্রে)। "দ্বে ব্রহ্মণ বেদিতব্যো পরশ্চাপরশ্চ।" এখানে 'পর'

ও 'অপব' এই দুই ভাবে ব্রহ্মেব সাধনা হয়, এই বলা হয়েছে—দুজন ব্রহ্ম নয়। বিশ্ব ব্যাপাবই যখন তটস্থ লক্ষণ, তখন সুখ দুঃখৰূপ, নানা দ্বন্দ্ব থাকায় তাতে যেমন অনুকম্পা বা করুণা আছে, তেমনি আবাব 'মহাঘোবা' ও 'ভীমা' ৰূপও আছে, অথচ 'সত্তা' বিচ্যুত নয়। তটস্থ লক্ষণ দ্বাবা ব্রহ্মপ্রাপ্তি সমাধিলভ্য (মহানির্ব্বাণ ৩য় উ।১০)। দ্বন্দ্বভাব, সংকল্প বিকল্প ও দেহে আত্মাভিমানবর্জ্জিত সাধকই সমাধিযোগে স্বৰূপতা লাভ কবেন (ঐ, ঐ।১০)। একটি জিনিষ লক্ষ্য কবা যায় যে, অনুষ্ঠান-বহুল সাধকদেব মধ্য হতেই জগতে বেশী মহামানবেব আবির্ভাব হয়েছে, কাবণ, তাঁবা অনুকম্পাময় হয়ে যান ও তাঁদেব মধ্যে কখনও শুষ্কতা আসে না, তাঁবা স্বৰূপ-ভাব হতেও বিচ্যুত থাকেন না। কিন্তু যাঁবা স্বৰূপ ভাবকে শুধু কবিত্বেব মধ্য দিয়ে ভবসাগব পাব হতে চান, তাঁদেব বিবেকচূড়ামণিব সাবধানবাণী সর্ব্বদা স্মবণ বাখা উচিত, আব উচিত তাঁদেব, যাঁবা মনে কবেন, বিনা বৈবাগ্যেও সব হয়ে যায় :—

"আপাত বৈরাগ্যবতো মুমুক্ষূণ্ ভবাব্ধিপাবং প্রতি যাতুমুদ্যতান্।
আশাগ্রহো মজ্জয়তেঽন্তরালে, নিগৃহ্যকণ্ঠে বিনিবর্ত্ত্যবেগাৎ ॥" (বিবেকচূড়ামণি)

'বৈবাগ্য আশ্রয় না ক'বে যে সাধক ভবসাগব পাব হতে উদ্যত হন, বাসনাৰূপ গ্রহ তাঁকে টুঁটি ধ'বে বলপূর্ব্বক ঐ সাগবে ডুবিয়ে দেয়।' স্বরূপ ভাবেব ঠিক্ ঠিক্ সাধক জগতে বিবল, তবু স্বৰূপ ভাব কি, তা বোঝবাব চেষ্টা কবাও ভাল, তাতে আদর্শেব দিকে লক্ষ্য ঠিক থাকে। স্বৰূপতা লাভ ক'বে ও যাঁবা বিশ্ব কল্যাণে বত থাকেন তাঁবা বিশেষ আধিকাবীক পুরুষ। সাধনাব উদ্দেশ্য সৃষ্টিতত্ত্বেব অতীত হওয়া, তাই প্রথম সাধনতত্ত্ব শোনা চাই, ভাবা চাই।

"জন্মাদস্য যতঃ।" কাবণ কার্য্যৰূপে প্রকট হয়, অতএব 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—ইহা জীব ভুলে যায়। মায়াটা কি? তন্ত্র বলেন, মায়া একটি শক্তি বিশেষ—যে শক্তিব দ্বাবা বস্তু বহুৰূপে দৃষ্ট হয়। তাব লক্ষণ, (১) 'বিক্ষেপ' (Projection)—বাইবে আসা, যেন বহু হচ্ছেন, (২) 'আববণ'—'স্ব' কে প্রচ্ছন্ন বাখা, তাব ফল 'ত্বং' বা 'ইদং' আপনাকে স্বতন্ত্র বোধ কবেন ও পাকা অহংকে ভুলে যান, সুতবাং 'ইদং গত অহং' (কাঁচা আমি) তখন নিজেকে বদ্ধভাবে গণ্ডীগত বোধ কবেন। আবাব

যখন ঐ কাঁচা আমি নিজের স্বরূপ জানতে চান—'পাকা আমি'কে পেতে চান অর্থাৎ (৩) 'বরণ' করেন—আবরণমুক্ত হতে চান—তখন দরকার হয় সাধনা। 'আবরণী' ও 'বিক্ষেপ শক্তির' ফলে নানাত্ব ও জগতের অনাদিত্ব বোধ আসে। 'বরণ' শক্তিতে, সমষ্টিবোধে একত্ব জ্ঞান ও প্রবাহরূপে নিত্যত্ব বোধ উদ্রিক্ত হয়ে সাধক আরো অগ্রসর হন। 'মায়াশক্তি' যখন আবরণ ও বিক্ষেপ করেন তখনই সৃষ্টি কল্পনা সম্ভব, সুতরাং সৃষ্টি অর্থে 'আবরণী ইচ্ছা'। অতএব, ঈশ্বর মায়াশক্তির মধ্যে থেকেও 'মায়াধীশ'। 'আকাশ' কে 'লিঙ্গ' বা লক্ষণাক্রান্ত বা 'শিব' এবং 'প্রাণকে' 'যোনি' বা শক্তির আধার বলা হয়। শক্ত্যাধার ব'লেই 'প্রাণ' ক্রিয়াশীল বা চঞ্চল। চিদাকাশ—আভাষ বা প্রকাশ বোধরূপ ব্যাপ্তভাব। আকাশকে তিন ভাবে দেখা হয় (১) 'মহাকাশ'—বাহ্য জগৎ বা বাহ্য জগতের যা কিছু সমস্তই মহাকাশে বর্ত্তমান, (২) চিত্তাকাশ—চিন্তা ও সিদ্ধান্তাদির স্থান মন, অতএব এই মনোময়ত্বই চিত্তাকাশ, (৩) চিদাকাশ—জ্ঞানময় আকাশ—পূর্ণ জ্ঞানভূমি। স্থূল সূক্ষ্মাদি শরীরধারী 'অহং' দেশে অবস্থিত, 'চেতন অহং' কালে অবস্থিত, সুতরাং দেশ কাল বা আকাশ—এই 'অহং' এরই একাংশ, এই 'অহং'ই দেশ ও কালের আধার। বলা বাহুল্য সাংখ্যের 'জড়া প্রকৃতির' 'জড' ও ধোলো বা সাধারণ ধারণার 'জড'—এই দুয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

সাংখ্যদর্শন জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন দর্শনশাস্ত্র। জগতের সর্ব্বপ্রকার দর্শনশাস্ত্র বা মনস্তত্ত্বের মূল এই সাংখ্যদর্শন।

[পাইথাগোরাস (জন্মকাল খৃঃ পূঃ ৫৮২-cir 582 B c.) ভারতে এসে সাংখ্যতত্ত্ব শিখে গিয়ে গ্রীকদের শেখান। পাইথাগোরাসের পূর্ব্বে থেলস্ (Thales born circa 640 B c. খৃঃপূঃ ৬৪০,) ও পরে সক্রেটিশ (খৃঃ পূঃ ৪৬৯—৩৯৯), ষ্টোয়িক জিনো (Zeno the Stoic—খৃঃ পূঃ ৩৫০—২৫৮) প্রভৃতি সকলেই ভারতের কাছে ঋণী। আমরা ক্রমশঃ দেখব যে ভারতের সংস্পর্শে সমস্ত জাতিই এসেছিলেন]।

আমরা দেখেছি যে ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়ে মোক্ষ লাভই সাংখ্যের উদ্দেশ্য। দুঃখই মূল, সুখ মানে দুঃখের অভাব। দুঃখ নিবৃত্তির যে সব সৃষ্ট উপায় অবলম্বিত হয়, তার কার্য্য ক্ষণিক—দুঃখের

আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। দুঃখের সঙ্গে সুখ জড়িত, সুখের সঙ্গে দুঃখ জড়িত, অতএব সুখদুঃখ—এই দুয়েরই নিবৃত্তি হওয়া চাই। যার যা স্ব-ভাব, তা কখনও বদলায় না। আসলরূপ বদলায় না, মাত্র একটি শক্তির উদ্ভব (প্রকাশ) ও অন্যরকম শক্তির অনুদ্ভব (অপ্রকাশ) হয় (সাংখ্যপ্রবচন সূত্র-১ম অ।১১)। ভর্জ্জিত বীজও যোগশক্তি বলে তার স্বভাব ফিরে পায়। নিত্য যেটি তার সঙ্গে কোন অনিত্য বস্তুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না, কারণ নিত্য হচ্ছে অখণ্ড, অতএব বন্ধনহীন। সম্বন্ধ মানে বন্ধন। 'পুরুষ' অসঙ্গ [ঐ, ১।১৫]। দিক্ কালাদি 'জন্য' বস্তু—আকাশ হতে উৎপত্তি। 'পুরুষ' বা 'আত্মা' জন্য বস্তু নয়। 'পুরুষ', স্বমুক্ত—তাঁকে মুক্তি দেবে কে? প্রকৃতি, 'পরতন্ত্র'। 'পর' বা পুরুষের জন্যই প্রকৃতির চেষ্টা। ["অস্ত্যাত্মা, নাস্তিত্ব সাধনাভাবাৎ" (ঐ ৬ অ। ১। ঐ-১ম অ-৪৯ দ্রঃ)]। আত্মা আছেন, নেই—ইহা প্রমাণ হয় না বরং অনুকূল প্রমাণ—আত্মপ্রতীতি। আত্মার গতি নেই—তিনি নিষ্ক্রিয় (কঠ-২।১।১১)। শ্রুতিতে যে আত্মার গতির কথা আছে, যথা "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানে যাতি সর্ব্বতঃ।" তার মানে, দেশ কাল উপাধিযোগে গতি বিশিষ্ট মনে হয় (সা. প্র. সূ. ৬।৫৯) গতি, প্রকৃতির কার্য্য, ঘট নাড়লে, ঘটস্থিত স্থির আকাশ গতিশীল ব'লে প্রতীয়মান হয়। গতিশীলতা অবয়বের—স্বরূপের নয়। এই 'বন্ধ'-টি অবিবেকজনিত (ঐ ১।৫৫)। এই অবিবেক, 'প্রধানের' বিকাশরূপ কার্য্য হতে আসে (ঐ ১।৫৭)। আত্ম-সাক্ষাৎকার বিনা ঐ 'বাধ্' দূর হয় না, যেমন দিগ্‌ভ্রমের মূঢ়তা সহজে যায় না (ঐ ১।৫৯)। অতএব, এই জগতের স্বরূপ জানা চাই, যাতে, অনাত্মবস্তুকে আত্মার সঙ্গে পৃথক বোধে, বিবেকের উদয় হয়। বিবেকের প্রতিষ্ঠা সাংখ্য দেখতে চান।

স্থূল, সূক্ষ্মে পরিণত হয়, সূক্ষ্মই স্থূলরূপে দৃষ্ট হয়, অতএব সূক্ষ্মাবস্থাই স্থূলের কারণ। ধ্বংস মানে স্থূলের সূক্ষ্মাবস্থা। কোন জিনিষের একান্ত ধ্বংস বা নিঃশেষ অবস্থা হয় না। একটি বিরাট জড়সমুদ্র পড়ে রয়েছে। এই জড়ের সূক্ষ্মতম অবস্থা হতেই সৃষ্টির বিকাশ। সংসারের উৎপত্তি আছে, ইহা শ্রুতি সিদ্ধ। বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্ত, অনাদি প্রবাহ সম্বন্ধেই খাটে, সুতরাং জীবের সংসার সম্বন্ধ অনাদি হতে পারে না—অবিদ্যা জীবের

স্বরূপগত নয়। জগতে আমরা তিন রকম শক্তির ক্রিয়া দেখতে পাই —সত্ত্ব, রজঃ ও তম। যে শক্তিতে সব প্রকাশ পায় তার নাম সত্ত্বগুণ। রজোগুণের লক্ষণ চাঞ্চল্য। তমোগুণ আবরক। ঐ গুণত্রয়ের স্তব্ধাবস্থার (মিলিত একত্বে স্থিতির অবস্থার) নাম 'প্রকৃতি'—ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা (ঐ ১।৬১)। সৃষ্টিক্রম—সূক্ষ্মতম অবস্থা হতে পর পর ক্রমাবতরণ, যথা— 'প্রকৃতি', 'মহৎ' (মহত্তত্ত্ব), 'অহঙ্কার, (অহংতত্ত্ব), 'পঞ্চতন্মাত্র', 'মন', 'পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়' ও 'পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়', 'পঞ্চমহাভূত'—এই ২৪টি ও 'পুরুষ'। এই ২৫টির নাম 'গণ বা 'তত্ত্ব'। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম— এই পঞ্চ ভূতাত্মক জগৎ, এই স্থূলের সূক্ষ্মাবস্থার নাম 'তন্মাত্র' বা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। ঐ পাঁচটিকে বিভিন্ন স্থানে ও ভাবে যেটি গ্রহণ করে তার নাম 'ইন্দ্রিয়'। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ—৫টি কর্মেন্দ্রিয়। এই দুই রকম ইন্দ্রিয় বিভাগ ও তন্মাত্র অপেক্ষা সূক্ষ্ম—অহং তত্ত্ব বা অহংকার ('অভিমান')।

["যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্"—গৌতম সূত্র, (ন্যায়দর্শন) ১ম অ ১ম আ ১৬)। ন্যায় ও সাংখ্যাদির 'প্রমাণের' ইহাই একটি 'সামান্যতোদৃষ্টের' উদাহরণ।]

শব্দ স্পর্শাদি, ইন্দ্রিয়াদির স্ব স্ব বিষয়ের সন্নিকর্ষ হলেও, তদ্বিষয়ে জ্ঞান যুগপৎ উৎপত্তি—সমকালে—হয় না। এই সহকারী নিমিত্তই 'মন'। একসঙ্গে সকল ইন্দ্রিয়ের বোধ আত্মায় প্রতিভাত হয় না, অতএব, এমন একটা কিছু আছে যা আত্মার ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগকে নিয়মিত ক'রে ঐ বোধ আনায়, ইহার নামই 'মন'। মনের সংযোগ না হলে কোন ইন্দ্রিয়ার্থের বোধ হয় না। মন, ঐ অহংতত্ত্বের বিকার। 'অহংকার' এক প্রকার বোধ, যা আরো সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। এই ব্যাপক বোধ বা 'অন্তঃকরণ'কে 'মহত্তত্ত্ব' বলা হয়।

[করণ=বহিঃসংঘাতকে যা ইন্দ্রিয়ের কাছে নিয়ে যায়। ইন্দ্রিয় (Nerve-Centre) ভেতরে, করণ, বাহিরের চক্ষু, কর্ণাদি। বুদ্ধি+অহংকার+মন=অন্তঃকরণ। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়—এই ১০টি, বাহ্যকরণ (বাহ্যবিষয় আহরণ, ধারণ ও প্রকাশের কারণ)। এই ত্রিবিধ করণের বিষয় বর্ত্তমান কালে স্থিত, কিন্তু অন্তঃকরণ ত্রিকালকেই বিষয় করে। (সাংখ্যকারিকা ৩২।৩৩)। অনুমান প্রমাণ তিন

রকম—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতোদৃষ্ট (গৌতম)। দৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধীয় ব্যাপ্তিজ্ঞান সহায়ে, অদৃষ্ট অনুরূপ জাত্যন্তবীয় বস্তু বিষয়ে যে অনুমান হয় • তাহাই 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমান। যেমন করণেব সাহায্য ভিন্ন কর্ত্তা কার্য্য কবতে পাবেন না, কিন্তু কর্ত্তার দর্শন শ্রবণাদি কার্য্য ও আর একটি কবণ দ্বারা সাধিত হয়, এই রকমে ইন্দ্রিয় সকলের অস্তিত্ব ঠিক কবা 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমান দ্বাবা সিদ্ধ হয়। ইত্যাদি।]

সাংখ্য, প্রকৃতিকে 'সংজ্ঞামাত্রম্' বলেছেন। [সাংখ্য প্র. সূ. ১ম।৬৮]। "প্রকৃতি' অব্যক্ত। পুরুষ ও প্রকৃতি—উভয়ই সমান—অলিঙ্গ ও নিত্য (ঐ, ঐ, ৬৯)। প্রভেদ এই যে, 'পুরুষ' অবিকাবী, 'প্রকৃতিব' বিকাব হয়। প্রকৃতি জডা সুতবাং তা হতে যা কিছু আসে সবই জড। 'চিদ-বসানো ভোগঃ' (ঐ ১ম।১০৪)। ভোগেব শেষ, চিৎস্বরূপতায়। অহংকাবেব বিকৃতিতে সত্বাংশে 'মন আবির্ভূত হয় (ঐ ২য়।১৮)। অন্তঃকবণেব বৃত্তি সমুদায়েব নিবৃত্তিতে 'পুরুষেব' উপবাগ শান্ত হয় ও স্বরূপে স্থিতি হয় (ঐ ২য়।৩৩।৩৪)। অহংতত্ত্ব+১১টি ইন্দ্রিয়+পঞ্চতন্মাত্র—এই সপ্তদশ তত্ত্বেব সম্মিলনে লিঙ্গশবীব গঠিত হয় (ঐ ৩য়।৯)। কেহ কেহ 'মহত্তত্ত্ব'কে নিয়ে ১৮টি বলেন। এই লিঙ্গশবীর খুব সূক্ষ্ম—স্থূলদেহেবই সূক্ষ্মাবস্থা সুতবাং ইহাও জীবদেহ (ঐ, ৩য়।১১)। "জ্ঞানান্মুক্তি" (ঐ ৩য়।২৩)। বৈবাগ্য ও অভ্যাস দ্বাবাই ইন্দ্রিয বৃত্তিব নিবোধ হয (ঐ, ৩য়।৩৬)। উট্ যেমন পবেব জন্য কুঙ্কুম ভাব বহন কবে, প্রকৃতি ও সেই বকম পুরুষেব বন্ধন দূব করবাব জন্য এই সৃষ্টিকার্য্যে সেবাবতা থাকেন (ঐ ষষ্ঠঅ।৪০)। অহং-কাবই কর্ত্তা, অতএব অহংকাবকৃত কর্ম্মেবই ভোগ হয়, সুতরাং অহংকাবেব অবসানে আত্মজ্ঞান স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয় (ঐষষ্ঠ ৫৪,৫৫)। 'প্রমাণ' তত্ত্বজ্ঞানেব প্রধান সহায়। দুই পক্ষেব মধ্যে এক পক্ষেব বা একটিব যে নিশ্চিত 'পবিচ্ছিত্তি' (ধাবণা বিজ্ঞান) তার নাম 'প্রমা'। প্রমা বা বোধ যাবদ্বাবা সিদ্ধ হয় তাহাই 'প্রমাণ'। প্রমাণ ফলই প্রমা=বোধ। প্রমাণ ত্রিবিধ (১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান (৩) আপ্তবাক্য। আপ্তবাক্যেব নাম 'শব্দপ্রমাণ'। বিষয়েব সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযোগেব নাম 'বৃত্তি'। যাব সঙ্গে বিশিষ্ট সম্বন্ধ হয় ও বুদ্ধিব তদাকাব ধাবণরূপ বিজ্ঞানেব নাম 'প্রত্যক্ষ' (ঐ ১ম অ।৮৯)। সত্বগুণ প্রকাশক, সুতবাং ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির্ব তমোগুণ অভিভূত হ'যে সত্বগুণ উদ্ভব হলে, তা তদাকাব ধাবণ কবে বা প্রকাশ পায়। এই যে সত্ত্বেব সমুদ্ভব, ইহাব

নাম 'অধ্যবসায়' (বৃত্তি+জ্ঞান)। বুদ্ধির বৃত্তিরূপ জ্ঞানই প্রমাণ। ঐ জ্ঞানে 'চিৎ' এর যে প্রতিবিম্বন তাহাই 'বোধ' বা 'প্রমা'। প্রকৃতি জড, সুতরাং বুদ্ধিসত্ত্ব বা বুদ্ধির অধ্যবসায় ও জড। 'পুরুষ' চেতন ও অপরিণামী, অপরিণামী পুরুষের জ্ঞান বা বৃত্তিরূপ পরিণাম হতে পারে না। বুদ্ধি, বিষয়াকার, বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশের সঙ্গে বিষয়ের প্রকাশ হয়। তাই সব সময়ে সর্ব্ববিষয় প্রকাশ পায় না। তমোগুণ মলিন। তাই 'চিৎ' এর প্রতিবিম্ব, তমোগুণে অভিভূত বুদ্ধিসত্ত্বে পড়ে না; রজোগুণ চঞ্চল—স্থির প্রতিবিম্ব সেখানে অসম্ভব, সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, তাই 'পুরুষের' প্রতিবিম্ব সেখানে পড়বামাত্রই চিত্তের উজ্জ্বলতা আসে বা প্রকাশ স্বরূপতা প্রকাশ পায়। তাই তখন বুদ্ধিসত্ত্বের ধর্ম্মও 'পুরুষের' ধর্ম্ম বলে মনে হয়। মহর্ষি কপিল বলেন যে সকাম বা নিষ্কাম কর্ম্ম—এই উভয়ের কোনটির দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না (ঐ ১ম অ। ৮৫)। ইহা কেবল আত্মানাত্ম বিবেকেই হয়। নিষ্কাম কর্ম্মে যদি এই বিবেক না থাকে বা বিবেক উদয় না হয়, তা হলে মুক্তি আসে না, কারণ জড, জড়ই উৎপাদন করে।

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (ব্রহ্মসূত্র)। বিবেক বৈরাগ্যের পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা (ব্রহ্মকে জানবার ইচ্ছা) আসে। সাধন দরকার। সব রকম সাধনেই চরম লক্ষ্যে পৌছান যায়। সাধনচতুষ্টয় যে সকলেরই অবশ্যকরণীয় তা নয়, অথবা বেদাধ্যয়ন ও কর্ম্মকাণ্ডাদি অনুষ্ঠানের পর যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আসে তা ও নয়। বেদাধ্যয়ন ও কর্ম্মকাণ্ড সাধনের মধ্যে যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে, ও গুলির মূল্য কতটুকু? "যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেত্তৈক্ক।" (জাবালোপনিষৎ-৪র্থ।৪)। 'যখনই বৈরাগ্য আসবে তখনই প্রবজ্যা অবলম্বন করবে।' জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে, যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ করছেন যে, ব্রহ্মচর্য্য শেষে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করতে হয়, তার পর বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করতে হয়, আবার ব্রহ্মচর্য্যের পরই প্রবজ্যা গ্রহণ করতে পারা যায়, কিন্তু যদি ব্রহ্মচারির অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম না ক'রেও, সাধক বৈরাগ্যযুক্ত হন, তা হলে তিনি সাঙ্গ বেদ সমাপ্ত করুন বা নাই করুন, স্নাত বা অস্নাতই থাকুন, সাগ্নিক বা নিরগ্নিক হোন্—যখনই বৈরাগ্যোদয় হবে তখনই প্রবজ্যাগ্রহণ করবেন। ইহার সত্যতার ভূরি ভূরি নিদর্শন বৈদিক যুগ হতে আজ পর্য্যন্ত রয়েছে।

['অথ' — সব সময়ে 'অনন্তব' নয়। বিজ্ঞান ভিক্ষু তাঁব বিজ্ঞানামৃত ভাষ্যে 'অত', হেত্বর্থে না ক'বে ৫মী ক'বে মানে কবেছেন, "এই সূত্র হতে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।" (শতপথ ব্রাহ্মণ, ২য় কা, ৪ প্র, ২ ব্রা ইহা সমর্থন করেছেন। পণ্ডিত বিধুশেখব ভট্টাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় অনূদিত শতপথ ব্রাহ্মণকেই অধিকাংশ সময়ে এই গ্রন্থে অনুসবণ কবেছি)। ত্রিবর্ণেরই বেদে অধিকাব. ইহা তন্ত্রশাস্ত্রই প্রথম অস্বীকাব কবেন। তন্ত্র সাধনায় মনুষ্য মাত্রেরই অধিকাব। ইহাও কঠোব সত্য যে সর্ব্ববর্ণ হতেই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, এই বাস্তবটি তন্ত্রশাস্ত্র স্পষ্ট ক'বে বলেছেন মাত্র]।

সাংখ্য বলেন যে প্রকৃতি হতে বিকাব আসে—প্রকৃতিই আদি কাবণ। ব্রহ্মসূত্রে (জন্মাদস্যসূত্রে), ব্রহ্মশক্তিকে 'কাবণ' বলা হয়েছে। সাংখ্যমতে 'পুরুষ' কখন 'কাবণ' 'হতে' পাবে না—কার্য্যই যখন সূক্ষ্মরূপে 'কাবণ' হয়। কার্য্য মানে বিকাব। 'পুরুষ' অবিকাবী। সাংখ্যমতে 'পুরুষ' অসংখ্য—প্রতি অবয়বে অধিষ্ঠিত, প্রত্যেক 'পুরুষই' অনাদি, অনন্ত ও চৈতন্যময। সাংখ্য, এই পর্য্যন্তই বলেছেন। ইহাব অতিবিক্ত কথা অদ্বৈতবেদান্ত বলেছেন; তাই এইখানেই অদ্বৈতবেদান্তেব সঙ্গে সাংখ্যেব বিবোধ। 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি' দুইই অনাদি ও অনন্ত—এই সংশয়ে আমাদেব কয়েকটি জিনিষ বোঝা দবকাব :—(১) সাংখ্য উপাধি যোগে 'পুরুষেব' গতি স্বীকাব কবেছেন, গতি মানেই বিকাব, উপাধি মানেই নানাত্ব, অতএব, উপাধি-বিশিষ্ট বহু পুরুষ 'প্রকৃতিতে' প্রত্যক্ষ। পুরুষ কিন্তু অপবিণামী, (২) সাম্যাবস্থা মানে সমতা (Equilibrium), সে অবস্থায বিকাব নেই, সুতবাং অব্যক্ত—'পুরুষেব' বিকাব কোন অবস্থাতে হয না; উপাধিযোগে 'পুরুষেব' বন্ধ অবস্থা হয; এই বদ্ধাবস্থাব অসহায়তা হ'তে মুক্ত কববাব জন্য প্রকৃতিব কার্য্য বা বিকৃতি, প্রকৃতিব কোন নিজ কর্ম্মচেতনা নেই—পুরুষেব সন্নিধ্যেই তাঁব ক্রিযা। বাছুব সন্নিধ্যে যেমন গাভিব দুধ্ আপনা হ'তে ক্ষবিত হয় অচেতন সত্ত্বেও, প্রকৃতিব কর্ম্মচেষ্টা পুরুষেব সন্নিধ্যেই হয়। দুধ্ অচেতন, অথচ ক্ষবিত হয় বৎসেব জন্যই (সাংখ্যকাবিকা ৫৭।৫৯দ্রঃ)। বহুরূপী পুরুষই বৎস। সৃষ্টি ব্যাপাব সম্ভব হতে গেলে চাই 'পুরুষ', চাই 'প্রকৃতি'। ('পুরুষ' বা 'প্রধান' = আত্মা বা চিৎ)। চিচ্ছক্তি বা ব্রহ্মশক্তি হতেই সৃষ্টি, ইহা অদ্বৈতবেদান্ত ও তন্ত্রসম্মত। সাংখ্য ও স্পষ্ট বলছেন যে 'পুরুষ', 'প্রকৃতি'—এই দুই থাকলেও মুক্ত পুরুষেব কাছে প্রকৃতিব নিবৃত্তি হয

—তখন থাকেন একমাত্র 'পুরুষ'। গোল এই যে, বহু অসীম হয কেমন ক'রে? সাংখ্য দ্বৈত স্বীকাব কবেন, কিন্তু তাব ভেদক কি তা বলেন নি এই মাত্র। দ্বৈতেব দিক দিয়ে সাংখ্য ঐ পর্য্যন্তই বলেছেন, তাঁব উদ্দেশ্য বিবেকখ্যাতিব প্রতিষ্ঠা কবা, এই পর্য্যন্ত বলাতেই সেটি সিদ্ধ হযেছে। স্বামীজি বলেন, সাংখ্য যে সৌধ নির্ম্মাণ কবেছেন, তাতে বালি চূন প্রভৃতি ধবানো অদ্বৈতবেদান্তেব সহজ হযেছে (Vedanta and Sankhyaদ্রঃ)। সাংখ্যেব ইঙ্গিত কিন্তু গিযেছে বহুদূব। "প্রকৃতি ও পুরুষ—এই দুযেব বা একেব প্রতি ঔদাসিন্যেই মোক্ষ" (সাংখ্যদর্শন ৩যঅ।৬৫)"। "যাব আত্ম-সাক্ষাৎকাব হয নি, সে 'ইতব' অর্থাৎ প্রকৃতি সঙ্গদোষে বদ্ধ" (ঐ, ঐ, ৬৪)। প্রকৃতিব নিবৃত্তি হলে থাকেন একমাত্র 'পুরুষ', 'পুরুষেব' নিবৃত্তি হয না, কাবণ তিনি চেতনস্বরূপ, কিন্তু উভযেব নিবৃত্তি মানে কি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম? অথবা 'পুরুষেব' প্রতি ঔদাসিন্য প্রকৃতিলীন মহাপুরুষকে বলা হয়েছে এবং উভয়েব প্রতি ঔদাসিন্য মানে উভয়কে অভিন্ন ভাবা—দুটি স্বতন্ত্র, এই ভেদ বোধে ঔদাসিন্য?

সাংখ্য, একজন কর্ত্তা ঈশ্বব (Personal God) মানেন না বা মানা নিষ্প্রয়োজন বলেন। কযেকজন পণ্ডিতদেব মতে, সাংখ্যদর্শনেব (৩যঅ) ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫ ও ৯৬ সূত্র মিলিয়ে পডলে, 'তৎ' শব্দটি ঈশ্ববকেই লক্ষ্য কবা হয়েছে দেখা যায অর্থাৎ সাংখ্যেব 'পুরুষ' ও 'ঈশ্বব' একার্থবাচক। সাংখ্যমতে, যাঁবা মুক্ত হতে চেষ্টা কবছেন, তাঁবা প্রকৃতিলীন হয়ে থাকলে, কল্পান্তে তাঁদেব মধ্যে সৃজনী শক্তি ছাডা আব সব শক্তি আসে। তাঁদেব মধ্যে এক এক জন তখন 'কল্পেশ্বব' হযে জীবনে মুক্তিব পথ দেখান। ধোলো যাকে Design Theory বলেন, সাংখ্য তাকে প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ কবেছেন।

ব্রহ্মবিজ্ঞানে বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ

আমবা গুরুতত্ত্বেব ও অন্যান্য দর্শনেব মূলতত্ত্ব বোঝবাব চেষ্টা কবেছি। পুবাণ, ব্রহ্ম-বিজ্ঞান বুঝিযেছেন গল্প গাথাব মধ্যে দিয়ে। বেদকে সকলেই প্রামাণ্য বলে স্বীকাব কবেছেন।

ঈশ্বরবাদ নিয়ে জগতের সকল ধর্ম্মের আরম্ভ। এ সম্বন্ধে প্রধানতঃ কয়েকটি মত দেখা যায়। এই জগৎ বর্ত্তমান, সুতরাং ইহার একজন স্রষ্টা নিশ্চয়ই আছেন, আর, জগতে যখন বহুত্ব রয়েছে, আর যখন তার কার্য্য দেখা যাচ্ছে, তখন ঐ বহুত্বের মধ্যে একটা 'অশরীরী' কিছু আছেই। এ ভাবটি আদিম ভাব। ভারতীয় দর্শন আরম্ভ হয়েছে এই ভাবের অধিকতর বিকাশাবস্থা হতে। ভারতে প্রধানতঃ তিনটি 'বাদ' দেখা যায়, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ, অন্যান্য যত 'বাদ'—ঐ তিনটির মধ্যে একটিতে পড়ে। সব দর্শন সৃষ্টি রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা পেয়েছেন —সৃষ্টির উপাদান অন্বেষণে চিন্তারাজ্যের উচ্চ হতে উচ্চতম ভূমিতে গিয়ে স্তব্ধ হয়েছেন। ঋগ্বেদে প্রশ্ন ও উত্তর আমরা দেখেছি—শূন্য হতে সৃষ্টি হতে পারেনা।

ব্রহ্ম দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্—দুই বা এক হীন। 'এক' জ্ঞান থাকলে 'দুই' জ্ঞান থাকে। যেখানে জ্ঞান বোধ আছে, সেখানে অজ্ঞান বোধও আছে। জ্ঞান অজ্ঞান বোধহীন যা তাই ব্রহ্ম—জ্ঞানাতীত, জ্ঞান অজ্ঞান বিবর্জ্জিত, বাক্যমনাতীত। দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিতমের কোন সাধনা বা উপাসনা হয় না। 'আমিই সেই' —এই পর্য্যন্তই সাধনা। অস্তিনাস্তিহীন, সর্ব্বহীন, সর্ব্ববিরতি, অনুচ্ছিষ্ট যা, তার সাধন হয় না। ব্রহ্ম অপরিণামী—পরিণাম হয় না। পরিণাম অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্তি যদি বোঝা যায়, সেটি বোধাতীত হয় না। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে গিয়ে তাকে 'একং' বলা হয়; তার জোড়া আর 'এক' থাকলে সেটি সসীম হয়ে যায়। অতএব 'একং' মানে অসীম, অনন্ত। 'বেদ' বা অদ্বৈতকে এই বোধভাবের ভেতর দিয়ে বোঝবার যে চেষ্টা তাই হচ্ছে ভারতীয় দর্শন।

দেশ, কাল, নিমিত্ত—এই তিন নিয়ে জগৎ, জগৎরূপী একই অবয়বের দুটি বিভাগ করা হয়—বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ। ঐ তিনের সমষ্টির নাম 'মায়া'—নামরূপ। ব্রহ্ম, মায়া, জগৎ—একটির পর একটি, বুদ্ধির স্তর হিসাবে উচ্চনীচ। তা হলে, যখন 'ব্রহ্ম' আছেন, তখন মায়া বা জগৎ নেই—জগন্মিথ্যা। ব্রহ্মানুভূতিতে অন্য কিছুরই স্থান নেই। আবার, জগতের দিক্ দিয়ে দেখলে মায়াকে সত্য বলতে হয়—মায়া বাস্তব ঘটনার বিবৃতি

মাত্র, কিন্তু সন্দেহ ও থেকে যায়। যার পরিণাম, অবস্থান্তর প্রাপ্তি বা মৃত্যু নেই, তার নামই 'সত্য', মায়াকে অথচ মিথ্যাও বলা যায় না—সমস্ত ইন্দ্রিয় গ্রামের 'বোধ' ইহার সত্যতা বুঝিয়ে দেয়। 'বোধ', প্রকাশক। 'সৎ' বা অস্তিকে অপরিণামী ব'লে বুঝতে পারার নামই 'চিৎ'—সৎ ও চিৎ এখানে অভিন্ন। কিন্তু মায়াকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না, অর্থাৎ যখন মায়া সৎরূপে প্রতিভাত হন, তখন তিনি চিন্ময় বা চিন্ময়ী, অসৎরূপে প্রতিভাত হলে, জড়—দ্বিত্ব, বহুত্ব। এই যে আসলরূপ যা ভ্রমক্রমে দৃষ্ট হয় সেটি অনির্ব্বচনীয়—সম্বিৎ বা প্রজ্ঞা। ফল পড়লো বলা যায় তখন, যখন ফল, স্থানাদি আছে, 'কেন' ও 'কি' জিজ্ঞাসা করা যায় যখন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ থাকে। ব্রহ্মে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নেই—প্রশ্নই হয় না। অতএব, ব্রহ্মদৃষ্টিতে জগন্মিথ্যা। যতক্ষণ মায়া বোধটি আছে, ততক্ষণ সবই আছে, যখন থাকবেনা, তখন থাকবেনা—নিজেকে নিজে ডিঙ্গোতে পারা যায় না। অখণ্ড খণ্ড হন্ নি, খণ্ডভাবে প্রতিভাত হচ্ছেন। জগতের দিক্ দিয়ে বুঝতে গেলে মনে হয়, সবেরই পরিণতি আছে—বাস্তব সত্য। দেশ, কাল, নিমিত্তের বোধ, 'আমার' বোধের উপর নির্ভর করে—আমিই দেশকালনিমিত্ত দেখি। নিত্য বস্তু কারোর অপেক্ষা রাখেনা—নিরপেক্ষ। অথচ দেশকালনিমিত্তকে স্বতন্ত্র ভাবে বোঝা ও যায় না। এই হেঁয়ালির মত যে বোধ, তার নাম মায়া। ব্রহ্ম, 'অজ্ঞেয়' বলা হয়—জানা যায় না। সাধারণতঃ আমরা যাকে অজ্ঞানাবস্থা বা মূর্চ্ছাবস্থা বলি, সেই অবস্থায় কোন জিনিষ জানা যায় না, এটি সে রকম নয়। যা জানলে সব জানা হয়, সেটি নিশ্চয় জ্ঞানস্বরূপ—জানার ও অধিক। 'অহং' বোধ না থাকলে কোন বোধ হয় না—'আমি' টা সর্ব্ব নিকটতম ও প্রিয়তম বস্তু—সদা বর্ত্তমান, সুতরাং, 'সমষ্টি অহং' (পাকা আমি) সর্ব্বপ্রকাশক ও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই তার অংশ। অংশ দেখে সমষ্টিজ্ঞান হয় না, তাই সেটি অজ্ঞেয়।

ঋগ্বেদে, "অপ্রকেতং সলিলং গূঢ় তমসাবৃতং'—গূঢ় তমসাবৃত অজ্ঞান সমুদ্রের কথা আছে। ঐ অজ্ঞানসমুদ্র বা মহান্ধকার দ্বারা পরমাত্মা আবৃত। এই আবরণ বা আচ্ছাদন পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির সংস্কার জন্য। তার পর, "সর্ব্বাভীরাপঃ মহো অর্ণঃ সুপ্রকেতং সলিলং"—সর্ব্বব্যাপ্ত অখণ্ড

জ্যোতির্ম্ময় সমুদ্র—জ্ঞান বা অমৃত সাগর—পরমাত্মার জ্যোতি ; সেই ব্রহ্ম-জ্যোতিতেই সব জ্যোতিষ্মান।

[—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চ চন্দ্র তারকম্। কে মা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ॥ তমেব ভান্তি অনুভাতি সর্ব্বম্। তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ॥ (কঠ ২য়।২।১৫)]।

ঋগ্বেদের ১০।৮১।১ সূক্তে আছে যে বিরাট পুরুষ নিজ স্বরূপ আবৃত ক'রে বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হলেন। 'মায়া' শব্দটি ঋগ্বেদে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত, কোন স্থানে 'মায়া'—'পালনীশক্তি', কোন স্থানে 'ইন্দ্রজাল' বা 'ছলনা' ইত্যাদি। মায়াবাদ শ্রীশঙ্করের নয়, তিনি যুক্তিসঙ্গত একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন মাত্র। 'মায়া', অবিদ্যা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মায়াধীন অবস্থায় থেকে মায়াতীত অবস্থার—উপলব্ধি হয় কখন ?

মায়া, মিথ্যা বা অবাস্তব নয়। দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়—'অধ্যাস' ও 'বিবর্ত্ত'। 'অধ্যাস' হচ্ছে পূর্ব্বদৃষ্ট জিনিষের যে স্মৃতি, তার অনুরূপ অবভাস, যেমন শুক্তিতে রজত ভ্রম, রজ্জুতে সর্পভ্রম। ঐ সব স্থানে 'রজত' বা 'সর্প' বোধের আরোপ হয়েছে, ভ্রমটি ইন্দ্রিয় দোষ। ভ্রমটি হয়, সব দিক না দেখে, না বুঝে। আবার, পূর্ব্ব কল্পিত ভ্রমকে আশ্রয় ক'রে ও অবিদ্যা বা অজ্ঞান উপজাত হয়। 'বিবর্ত্ত' মানে বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তি না হলেও অন্যরূপ দেখা, 'বিকার' মানে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়া ও সেই অবস্থান্তরে অন্যরূপ জ্ঞান হওয়া। 'ভ্রম' বলে একটি নতুন জিনিষ দেখা দেয়। ভ্রমটি আসল জিনিষের আবরক। সেটি দূর হলে আসল রূপটি প্রকাশ পায়। কার্য্যকারণ সম্বন্ধহীন ব্রহ্ম, বিশ্বের কারণ হতে পারে না, জগৎ সুতরাং ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, ব্রহ্মের পরিণাম নয়। মায়াই বিশ্বের মূল কারণ। মায়া, মিথ্যা বা অস্তিত্বহীন নয়, কারণ অস্তিত্বহীনে অধ্যাস হয় না। এইজন্য শ্রীশংকর একটি ব্যবহারিক সত্তা মেনেছেন, কিন্তু ইহাও ঠিক্ যে জ্ঞানোদয়ে মায়া থাকেনা। এই হল অদ্বৈতবাদীদের কথা। পূর্ব্বে বলেছি যে সব রকম মনস্তত্ত্ব বেদে পাওয়া যায়। একই বেদান্তের—একই ব্রহ্মসূত্রের—উপর ভিত্তি করে নানা মত উঠেছে। আচার্য্য শঙ্কর যেমন অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ প্রচারক, বিশিষ্টাদ্বৈতের তেমনি শ্রীরামানুচার্য্য। বিশিষ্টাদ্বৈত—অদ্বৈতের বিশেষ অর্থাৎ গুণ। এইমতে সৃষ্টি, ব্রহ্মের গুণ বা শক্তি। চিৎ বা গুণ

প্ৰতি জীবে বৰ্ত্তমান, জড মানে 'অচিৎ'। অবিদ্যা সৃষ্টিব কাবণ হ'তে পাবেনা—অজ্ঞানে সৃষ্টি সম্ভব নয়। গুণগুলি সত্য ও নিত্য, কিন্তু সৰ্ব্বাবস্থাতে ঈশ্বৰাধীন। ব্ৰহ্ম চিণ্ময় (জ্ঞানময়), তিনিই জ্ঞাতা, আর এই বহুত্ব, তাঁব গুণফল। কৰ্ম্মপ্ৰভাবে গুণেব প্ৰভাব বা সংকোচ হয়। ব্ৰহ্ম, সত্য ও অবিকাবী, আব যা কিছু সমস্ত অসত্য বা পবিণামী। বিকাশ ও সংকোচ ব্যাপাবেব নাম পবিণাম, 'বিবৰ্ত্ত' নয়। ব্ৰহ্মেব দুই অবস্থা। প্ৰলয়ে তিনি সৎ—অস্তিমাত্ৰ, জগৎ তাঁব মধ্যে সুপ্ত। "স ঐক্ষৎ বহু স্যাং প্ৰজায়েৱ ইতি',—এই শ্ৰুতি বাক্যে বোঝা যায় তাঁব দ্বিতীয় অবস্থা বা সৃষ্টিসংকল্প। ইহাই তাঁব 'অন্তঃপ্ৰবেশ'। সমভাবে ও নিবপেক্ষভাবে সকলকে কৰ্ম্মফল দান কবাই সৃষ্টিব উদ্দেশ্য, সৃষ্টি, তাঁব 'লোকবৎ লীলা কৈবল্যং'—তাঁব স্বভাব নয় (যেমন শংকব বলেন)। ব্ৰহ্মই একামাত্ৰ সৃষ্টিব উপাদান ও নিমিত্ত কাবণ—মাযা বা অবিদ্যা নয়। সূক্ষ্মাবস্থায কাৰ্য্যকাবণেব একীভাব থাকে, পবে পবিণাম দেখা দেয। বিচাবে সত্য নিৰ্ণয হয না। আজ যা যুক্তিতে সত্য বলে বোধ হয, কাল তা খণ্ডিত হয। অতএব, বিচাবেব উপবেও একটি জিনিষ আছে—শ্ৰীভগবানেব প্ৰত্যাদেশ—প্ৰকট বাণী। ইহাই সত্য নিৰূপণেব একমাত্ৰ উপায়। অপর ব্ৰহ্ম বা কাৰ্য্যব্ৰহ্ম= মায়া, বামানুজ বলেন যে ব্ৰহ্মকে এবকম ছোট বড ভাবে বিভাগ কবা অন্যায। তাঁব পবিবৰ্ত্তন নেই, আছে গুণগুলিব। শ্ৰীশংকব মতে, বৃহদাবণ্যকেব 'নেতি নেতি'=গুণগুলিব নিঃশেষ, শ্ৰীবামানুজ মতে, ব্ৰহ্ম অজ্ঞেয, তাই 'ন ইতি ন ইতি' তিনি 'সত্যস্য সত্যং'। প্ৰাণই সত্য, জীবাত্মাই সত্য, কিন্তু পবমাত্মা 'সত্যস্য সত্যং'—অপবিণামী। অবিদ্যা কখন চিণ্ময়েব উপব ক্ৰিয়া কবতে পাবে না, "সদসৎ অনিৰ্ব্বনীয়' মানে, কিছু বিশেষ বোঝা যায় না যা। অজ্ঞান, কৰ্ম্মজাত। বামানুজ 'মায়াবাদ' স্বীকাব কবেন না। মুক্তিব একটি বিমুক্ত পথ 'প্ৰপত্তি' বা ঈশ্ববে সম্পূৰ্ণ অত্মসমৰ্পণ—সৰ্ব্বপ্ৰকাব বিদ্যা বা সাধনা ইহাব অন্তৰ্গত। ভগবদ্ অনুগ্ৰহ বিনা মুক্তি হয় না। দৃঢবিশ্বাস ও কৃপা ভিন্ন জীবেব অসহায় অবস্থা দুব হয় না। 'প্ৰপত্তি'ই, জীবকে কৰ্ম্মপ্ৰভাব হতে বক্ষা কবে, কৰ্ম্মপ্ৰভাবকে বিনষ্ট কবে। 'প্ৰপত্তি' ভক্তিব ও উৰ্দ্ধে। শ্ৰীবামানুজেব বহু বহু পূৰ্ব্ব হ'তে—যীশুজন্মাবাব পূৰ্ব্ব হতে, এইবকম ঈশ্ববে পূৰ্ণ নিৰ্ভবতাসম্পন্ন মহাজনদেব আবিৰ্ভাব হয়েছিল

দাক্ষিণাত্যে—বামানুজেব দেশে। ইহারা 'আল্‌ওয়াব' নামে পবিচিত। তাঁবা সংস্কৃত জানতেন না। তামিল ভাষায তাঁদেব বচনা আজও দাক্ষিণাত্যেব অনেক মন্দিবে পঠিত হয়, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদেব কাছে তাঁদেব বচনা প্রিয। আলওয়াবদের মধ্যে সর্ব্বজাতিই আছেন—শূদ্র, এমন কি 'পাবিয়া'ও বাদ পড়ে নি। সংস্কৃতজ্ঞ না হয়ে ও, তাঁবা উপনিষদেব সগুণ ব্রহ্মবাদ বেশ বুঝতেন। জনসাধাবণেব মধ্যে অধ্যাত্মবিজ্ঞান প্রচাবের ব্যবস্থা তখন ছিল, নানা উপাযে। শ্রীশংকব, ব্রাহ্মণেব উপব ঝুঁকেছেন, কিন্তু শ্রীবামানুজেব হৃদয় অন্ত্যজদেব জন্য ও ব্যথিত হয়েছে।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে, জড়েব তিন বকম পবিণতি আছে, (১) 'শুদ্ধ সত্ত্ব'—অপবিত্রতা এখানে নেই, ইহা তাঁব 'নিত্যবিভূতি (নিত্যলীলাভূমি); (২) 'মিশ্রসত্ত্ব'—পবিত্রতা, অপবিচ্ছন্নতা ও তমসাব স্থান—এই জগতেব ('লীলাবিভূতি'), (৩) গুণশূন্য অবস্থা—'কাল'। 'দেশ', আকাশের অন্তর্গত। জীব, বহু অবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়ে মুক্ত হয বা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকাব লাভ কবে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীবা, সাংখ্যেব বহুপুরুষবাদ মানেন না। বামানুজসম্প্রদায আজ ও ভাবতেব ধর্ম্মজগতে প্রভাব বিস্তাব কবছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়েব মূল, ঐ রামানুজ-সম্প্রদায।

এইবাব আমবা ঐ সব বিভিন্ন মতেব তুলনা সংক্ষেপে বোঝবাব চেষ্টা কবতে পারি। সকলেই 'পূর্ণং' এব বিভিন্ন দিক্ দেখিয়েছেন। যিনি যে দিক্ দেখেছেন তিনি সেই দিকটিব উপব জোব দিয়েছেন। সাংখ্যমতে —প্রকৃতি হতে পবমাণু পর্য্যন্ত—সমস্তই 'জড়'। 'পুরুষেব' অবিবেক মূল গুণসঙ্গেব নাম 'হেয়' আব সম্যক্ বিবেক-প্রাপ্ত বা গুণসঙ্গ বর্জ্জিতাবস্থাব নাম 'হান' বা মুক্তি। সুতবাং অবিবেক = 'হেয় হেতু', আব 'বিবেক' = 'হানোপায়'।

['শক্তিতশ্চেতি।' 'তদ্ধানে প্রকৃতি পুরুষো বা।' তয়োরন্যত্বে তুচ্ছত্বম্।' —সাংখ্যপ্রবচনসূত্র (সাংখ্যদর্শন) -১মঅ ১৩২।১৩৩।১৩৪।সূত্র]।

অর্থাৎ পবিমিত শক্তিবিশিষ্ট বস্তু অপব শক্তিব ঘাত প্রতিঘাত ও মিলন হতে উদ্ভব হয় বা নষ্ট হয়। মহদাদি ও পবিমিত শক্তি সম্পন্ন, সুতবাং তাও অপব শক্তিব কার্য্য। ১ মহদাদিরূপে তখনই প্রকাশ থাকে না যখন প্রকৃতি অথবা পুরুষতা প্রাপ্তি হয়, বিশেষ শক্তিমত্ত্বাব অভাবে। 'প্রকৃতি'

ও 'পুরুষ' ছাড়া আর যা কিছু, সবই 'তুচ্ছ'—'তুচ্ছ', জগৎ কারণ হতে পারে না। (তুচ্ছ=নগণ্য, অল্প শক্তি)। অতএব প্রকৃতিই মূল শক্তি, কিন্তু 'হেয়হেতু' বা 'জড়'। যখন পুরুষতা প্রাপ্তি হয়, তখন 'প্রকৃতি' কোথায় এ বিষয়ে সাংখ্য নীরব। ঐ দুই 'প্রাপ্তি', অব্যক্ত, অথচ দুটি পৃথক (পুরুষ ও প্রকৃতি)। পুরুষ প্রকৃতির সংযোগে সৃষ্টি। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের মতে, সবটা নিয়ে ব্রহ্ম অর্থাৎ 'ঈশ্বর'+'আত্মা'+'জগৎ'=ব্রহ্ম। ইহারা উপনিষদের সগুণ ব্রহ্মের উপাসক। অদ্বৈতবাদীদের মতে, জগৎ—ব্রহ্মের বিকার নয়—ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। তন্ত্রের সঙ্গে কোন মতের বিরোধ নেই, কিন্তু তন্ত্র, আর এক দিক্ দেখেছেন। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে তন্ত্রশাস্ত্র, 'সাধনশাস্ত্র'। সাংখ্য ২৫টি তত্ত্ব স্বীকার করেছেন, তন্ত্র করেছেন ৩৬টি তত্ত্ব। 'দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্' সর্ব্বপ্রকার 'বাদের' অতীত। 'বাদ' কথা, সিদ্ধান্ত ও প্রকাশের জন্য। তন্ত্রে, 'সদাশিব', 'শিব', 'পরশিব' প্রভৃতি শব্দগুলি কখন বিভিন্ন অর্থে, কখন বা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কখন বা 'শিব'কে সগুণ ও 'পরশিব'কে নির্গুণ, কখন বা শিব= নির্গুণ পরশিব বলা হয়েছে। ব্যবহার ও প্রয়োগ অনুসারে অর্থ বুঝতে হয়। শক্তি নিঃশেষরূপে গুটিয়ে 'পরশিবে' অবস্থিতি করেন। এই অবস্থান জন্য পুনঃসৃষ্টি—পুনঃপ্রকাশ—সম্ভব হয়। নিষ্ক্রিয়ত্ব অর্থাৎ শক্তিহীনত্ব বা 'শূন্য' সৃষ্টির কারণ হয় না। নিষ্ক্রিয়ত্ব, যাকে 'শূন্য' বলা হয়, সেই শূন্যের মধ্যে শক্তির অবস্থান হেতু, শূন্যতা দূর হয়ে 'উচ্ছুনতা' অর্থাৎ প্রসার বা স্ফীতি আনায়। তার পর আরম্ভ হয় 'লম্ফঝম্প আবর্ত্ত উচ্ছ্বাস', কম্পনের ফলে। সূক্ষ্ম বা স্থূলরূপে প্রকাশের কারণ তিনটি—'ইচ্ছা', 'জ্ঞান', 'ক্রিয়া'। ইচ্ছা ভিন্ন প্রকাশ হয় না—কার্য্যের ইচ্ছা থাকা চাই, কার্য্যের উপাদান বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা চাই, নতুবা শৃঙ্খলা আসে না, আর শৃঙ্খলার অভাব বা বিচ্যুতি মানে ধ্বংসমুখ—সৃষ্টির বিপরীত। তার পর আসে ক্রিয়া। শক্তি যদি জ্ঞানময়ী না হন, ঐ জ্ঞান আসে কোথা হতে? সাংখ্য বলেন, চিৎ সান্নিধ্যে ঐ চেতনা উপজাত হয়। চেতনা থাকলে যে সমাবেশ কৌশল থাকবে তা প্রমাণ হয় না, তা ছাড়া প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যবোধ, ও অণুপরমাণুর আকর্ষণ বোধ (যেমন Positive ও Negativeএ হয়), বিজাতীয়কে দূরে রাখার বোধ ইত্যাদি সংস্কারের কার্য্য হয় কেমন করে?

অতএব, তন্ত্র বলেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্নসম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত—অগ্নি ও দাহিকাশক্তির ন্যায়। 'জগৎ' ও 'ব্রহ্মে' আত্যন্তিক ভেদ নেই'। জগৎ মিথ্যা নয়, মিথ্যা—জগৎ ও ব্রহ্মে ভেদ কল্পনা, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত নয়—একেরই বহুরূপে প্রকাশ—একই বহু হয়েছেন। শক্তিই জগতের কারণ—শক্তির পরা অবস্থাই ব্রহ্ম। অতএব, শক্তির মধ্যে বিপরীত ভাবের একসঙ্গে সমাবেশ সম্ভব হয়েছে। তন্ত্রমতে 'শূন্য' কোন তত্ত্বের অন্তর্গত নয়—তত্ত্বাতীত। 'বহু হব' এই ইচ্ছাই ১ম তত্ত্ব—শিবতত্ত্ব। তত্ত্বের উদয় সিসৃক্ষার পর হয়। সিসৃক্ষা বা ইচ্ছাশক্তির নাম 'শক্তিতত্ত্ব'—২য় তত্ত্ব, তৃতীয় তত্ত্বে, বিশ্ব 'অহংরূপে' স্ফুটিত হয়—'সদাশিবতত্ত্ব', জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পৃথকীকৃত 'ইদং' বোধ—৪র্থ তত্ত্ব—ঈশ্বরতত্ত্ব; 'আমিই জগৎ'—অহন্তা ও ইদন্তার ঐক্যবোধ বা সদাশিবের বৃত্তি, ৫ম তত্ত্ব—বিদ্যাতত্ত্ব; 'অহং' হতে 'ইদং' পৃথক, ঈশ্বরের এই বৃত্তি—ষষ্ঠ তত্ত্ব—মায়াতত্ত্ব; বিদ্যার আবরণকারিণী ও বিবোধিনী শক্তি—৭ম তত্ত্ব—অবিদ্যাতত্ত্ব। এই পর্য্যন্ত এখানে বলা যথেষ্ট। বিভিন্ন মতে ঐ বিভাগ সম্বন্ধে একটু আধটু এদিক্ ওদিক্ আছে। যাই হোক্, তন্ত্র ঐ সমস্ত তত্ত্বগুলিকে শক্তিরূপিণী বলেছেন, 'বিদ্যা', 'মায়া' ও 'অবিদ্যা'—এই তিনটিকে পৃথক্ ক'রে দেখিয়েছেন। অদ্বৈতবাদীর মতে দৃশ্য জগৎ, প্রতীতি মাত্র (apparent)। বিভিন্ন সাধনপথ নিয়ে, ভারতে সমাজ-বিপ্লব ও ব্যাপক রক্তপাত না হলেও, সাম্প্রদায়িকতার গোঁড়ামির অভাব হয় নি। সেই জন্য নতুন যুগ-তন্ত্র বলেন যে, প্রত্যেক সাধনার বিভিন্ন অবস্থা, সেই সেই অবস্থানুযায়ী সত্য—ভ্রম নয়। স্বামীজি একস্থানে বলেছেন যে যদি সূর্য্যের ফটো—একবার দশমাইল উপরে গিয়ে, পরে পরে এইরূপে লক্ষ মাইল ও আরও উর্দ্ধে উঠে—নেওয়া হয়, প্রত্যেক ফটোই হবে একই সূর্য্যের ফটো, কিন্তু কত বিভিন্ন। আমরা ভ্রম হতে সত্যে যাই না, অল্প সত্য হতে অধিকতর সত্যে যাই। তন্ত্রমতে, সর্ব্বজ্ঞই অল্পজ্ঞ হন—'জ্ঞ' নিত্য বর্ত্তমান। তাই 'অল্পজ্ঞ' সদা উন্মুখ, 'জ্ঞ'যে ফিরে যাবার জন্য, তাই 'শিবোঽহং' জ্ঞানে সাধকের সাধনা সার্থক হয়।

তন্ত্র, শক্তিকে 'মা' বলেছেন। তাই সাধক যাহাই অর্চ্চনা করুন, তিনি মায়ের পূজাই করেন, তাই যে কোন বস্তু অবলম্বন করাই হোক্

না কেন, ব্রহ্মেরই অর্চ্চনা করা হয়—ফলাসক্তের পূজাও ব্রহ্মেরই অর্চ্চনা।। (মহানির্ব্বাণতন্ত্র ১০ম উ।২১০।২১১)। ইহাই প্রতীকোপাসনা—জড়ের পূজা নয়, 'পৌত্তলিকতা' বা ধোলো 'Animism' ও নয়, এই রকম অর্চ্চনা কল্পিত বস্তুতে 'আরোপ' ও নয়—এ হচ্ছে যেন ন্যায়শাস্ত্রের 'প্রতিজ্ঞা' ও 'নিগমন'। এই রকম সিদ্ধান্তে অনেক 'অধিকরণ সিদ্ধান্ত' (corrolary) ও উদিত হতে পারে।

[ন্যায়দর্শন বলেন যে সিদ্ধান্তে আসতে গেলে ৫টি জিনিষ দরকার—'প্রতিজ্ঞা', 'হেতু', 'উদাহরণ', 'উপনয়' ও নিগমন', যথা (১) প্রতিজ্ঞা—ঐ পর্ব্বতে বহ্নি আছে (ইহা প্রমাণ করতে হবে)। (২) হেতু—ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। (৩) উদাহরণ—যেখানে ধোঁয়া থাকে, সেখানে বহ্নি থাকে (যেমন রান্নাঘর)। (৪) উপনয়—পর্ব্বত ও ধূমবান। (৫) নিগমন—অতএব, ঐ পর্ব্বতে বহ্নি আছে।

এই স্থলে 'প্রতিজ্ঞা' ও 'নিগমন' এক, মাত্র 'অতএব' যোগ করা হয়েছে। ইহা 'সাধ্য ধর্ম্ম ভাবী দৃষ্টান্ত'। অন্য প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারাও (১) ও (৫) সমান। 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি।' সিদ্ধ বস্তুই সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করতে হয়]।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি জড়, কিন্তু উপমা দিয়েছেন ধেনু ও বৎসের মত প্রকৃতির সঙ্গে অসংখ্য 'পুরুষের' সম্পর্কে। তন্ত্রে, শক্তি জগন্মাতা—বহুর সম্পর্কে, কিন্তু তিনি শিব-সঙ্গিনী, মহাকাল রমণী। সাংখ্যে 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি'র সম্বন্ধ এইভাবে বর্ণিত, "প্রকৃতিকে দর্শন বা ভোগ করবার জন্য 'পুরুষ' আর 'পুরুষের' মুক্তি সাধনের জন্য পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ হয়, এই সংযোগ পঙ্গু ও অন্ধের সহকারিতার ন্যায়" (সাংখ্যকারিকা ২১)। অন্য স্থলে প্রকৃতিকে গুণবতী, নিঃস্বার্থ বলা হয়েছে, আবার বলা হয়েছে যে প্রকৃতির মত লজ্জাশীলা আর নেই। (ঐ—৬০—৬১)। "প্রকৃতিকে সর্ব্বপ্রকারে দেখার (ভোগ করার) পর, 'পুরুষ', প্রকৃতি হতে উপরত হন, তখন প্রকৃতিও আর নিজের কার্য্য দেখান না" (ঐ ৬৬)। সাংখ্যের 'প্রকৃতি'র নিজের ইচ্ছা নেই—জড়; তন্ত্রে, দেবীও ব্রহ্মের ইচ্ছামাত্র অবলম্বন ক'রে সৃষ্টি করেন ("তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব..." মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৩য়, ২৯), প্রভেদ এই যে, দরকার হলে, বলপূর্ব্বক বিপরীত বিহারে তিনি মহাকালের চেতনা সম্পাদন করেন। প্রয়োজনটিও দেবীর নয়—প্রয়োজন কারুণ্য প্রকাশ। সাংখ্যাচার্য্যেরা সাংখ্যশাস্ত্রের 'আর একটি নাম দেন—"ষষ্টি তন্ত্র" অর্থাৎ ৬০টি বিষয় প্রতিপাদন করা হয়েছে। শংকর মতকে

যে হিসাবে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলা যায়, সাংখ্যকেও সেই হিসাবে প্রচ্ছন্ন তন্ত্রবাদও বলা যেতে পাবে। সাংখ্য ও তন্ত্রেব এই দিক্ হতে যদি হিন্দুসমাজকে দেখা যায়, বিবাট হিন্দুসমাজ যে 'মহামায়াব ছায়া' ইহা বুঝতে পাবা যায়।

[স্বামীজি 'জীববাদ' বা দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলব (Sankhya and Vedanta নামে বক্তৃতাব—Mayvatı Edıton—পৃঃ ৫৯—৬৬ এবং ৯৪—১০০ দ্রঃ)]।

দ্বৈতবাদীব মতে, জগৎ ও জীব—এই উভয়েব একমাত্র প্রভু 'ঈশ্বব'। ঈশ্বব সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, সর্ব্বজ্ঞ, বিশ্বেব একমাত্র নিয়ন্তা। সৃষ্টি অনাদি, সুতবাং 'জীব'ও অনাদি। 'জীব' স্বভাবতই পবিত্র, কিন্তু কর্ম্মফলেব আববণে সেই পবিত্রতা ঢাকা পড়েছে। পুণ্যকর্ম্মদ্বাবা ঐ স্বাভাবিক পবিত্রতা 'জীব' লাভ কবতে পাবে। 'প্রাণ' ও 'আকাশ' সর্ব্বত্র বর্ত্তমান—সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট। খণ্ডখণ্ডরূপে আকাশেই সমগ্র বিশ্ব ভাসছে। 'প্রাণই' 'আকাশ'কে বহুরূপে পবিবর্ত্তন করছে। স্থূল ভাবে, 'প্রাণে'ব অভিব্যক্তিব জন্য আকাশ হতে গঠিত হয়েছে এই স্থূলরূপী যন্ত্র বা শবীব। চলা, বসা কথা কওয়া ইত্যাদি, প্রাণেবই অভিব্যক্তি। চিন্তারূপে প্রাণেব অভিব্যক্তিব জন্য, সূক্ষ্মশবীব আকাশেব সূক্ষ্ম হতে নির্ম্মিত। স্থূল দেহ, তাবপব সূক্ষ্ম দেহ, তাবপব 'জীব'। 'জীব'ই আসল মানুষ। স্থূল দেহ স্বল্পকাল স্থায়ী, সূক্ষ্ম দেহ যুগ যুগ স্থায়ী, 'জীব' অতি সূক্ষ্ম। দ্বৈতবেদান্তমতে, 'জীব' ও 'ঈশ্বব' নিত্যকাল স্থায়ী; প্রকৃতিও তাই, কিন্তু পবিবর্ত্তনশীল। প্রকৃতির মূল বস্তু—প্রাণ ও আকাশ—অনন্তকাল স্থায়ী; কিন্তু অনন্তকাল যাবৎ বিভিন্ন আকাবে পবিবর্ত্তন হচ্ছে। 'জীব', প্রাণ বা আকাশ হতে উদ্ভূত হয় নি, 'জীব' মিশ্র পদার্থ নয়, অজড়, সুতবাং 'জীবেব' জন্ম বা মৃত্যু নেই, স্থূল বা সূক্ষ্মদেহ মিশ্র পদার্থ, তাই তাদেব উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে। সমগ্র প্রকৃতিতে অসংখ্য অসংখ্যরূপে ঈশ্ববাধীনে এই 'জীব' বর্ত্তমান। জীব সৃষ্ট পদার্থ নয়। কর্ম্মদ্বাবা পবিত্রতা লাভ কবলে, 'জীব' দেবযানে যায়। 'বাক্য' ভিন্ন চিন্তা সম্ভব নয়, তাই তখন 'বাক্' মনে প্রবিষ্ট হয়, 'মন' প্রাণে পবিণত হয়, 'প্রাণ' হয 'জীবে'। 'জীব' তখন দেহ হতে বেবিয়ে সূর্য্যলোকে যায়। এই বিশ্বেব বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন

'লোক' আছে। সূর্য্যলোক হতে জীব যায় বিদ্যুল্লোকে; সেখানে আর একটি 'জীব'—যিনি পূর্ণত্ব লাভ করেছেন—ঐ 'জীব'কে স্বর্গের উচ্চতম ভূমি 'ব্রহ্মলোকে' নিয়ে যান। ব্রহ্মলোকে জন্মমৃত্যু নেই, আছেন সেখানে বিশ্বপ্রভু শ্রীভগবান। সেখানে 'জীব' সৃজনী-শক্তি ছাড়া, আর সব শক্তি লাভ করেন। তখন যদি 'জীব', শরীর ধারণ ক'রে বিশ্বের কোন এক স্থানে আসতে চান, আসতে পারেন। দ্বৈতবাদীদের মতে, এই অবস্থাই মানুষের চরম অবস্থা; ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন ভাবা—'সোঽহং' বা 'শিবোঽহং' ভাবা—মহা অপরাধ। 'জীব' কখনও ঈশ্বরত্ব লাভ করতে পারে না। ঐ চরম অবস্থাপ্রাপ্ত জীব অপেক্ষা নিম্নস্তরের জীব আছেন। ইহারা সর্ব্ববাসনা ত্যাগ করেছেন, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, সম্পূর্ণ পবিত্র, ইহারা শ্রীভগবানের পূজা ও তাঁর ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই চান না। তার পরের থাকে আছেন ফলকামী ভক্ত জীব। মৃত্যুর পর ইহাদের আর একরকম গতি হয়। 'বাক্' মনে প্রবেশ করে, মন যায় 'প্রাণে', প্রাণ যায় 'জীবে', জীব যায় 'চন্দ্রলোকে', সেখানে কর্ম্মজনিত ভোগক্ষয়ে আবার নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী, নরলোকে জন্মগ্রহণ করে। এই চন্দ্রলোকের জীবেরাই 'দেবতা' নামে আখ্যাত, ইহারাই খৃষ্টান ও মুসলমানদের 'angel' বা স্বর্গদূত। ঐ 'দেবতা' এক একটি 'পদ' (আসন), বৈদিক দেবতা ইন্দ্রাদির নামে ঐ 'পদগুলির' নাম দেওয়া হয়। স্বর্গে মাঝে মাঝে অসুরের উৎপাৎ হয়। এই উপদ্রব ছাড়া জীবেরা সেখানে সুখেই থাকেন। মানবদেহেরই কর্ম্ম ও কর্ম্মফল আছে। দেবশরীরে কর্ম্মের ফলভোগ হয় মাত্র, নতুন কর্ম্ম হয় না। দেবশরীরে, ফলাকাঙ্ক্ষীর ফলভোগ ছাড়া আর কিছুই হয় না। এই সব দেবতা অপেক্ষা অসুরেরা অনেক বিষয়ে ভাল—দেবতারা প্রায় কামুক।

[স্বামীজী বলছেন, "In all mythologies you read how these demons and gods fought although many times, it seems, the demons did not do so many wicked things as the gods In all mythologies, for instance, you will find the Devas fond of women" পুরাণাদি পাঠে জানা যায় যে অসুরেরা থাকত পাহাড়ে, মরু প্রান্তরে বা সমুদ্রে (সমুদ্রের ধারে)। ঐ সমস্ত স্থানই অনুর্ব্বরা। অসুরেরা হত বোম্বেটে, লুট পাট করাই ছিল তাদের কার্য্য।

তারা ছিল সুস্থ, বলবান—দেবতাদের চেয়ে শারীরীক বলে বলীয়ান। দেবতাদের ছিল বুদ্ধি বেশী। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে দেবতাদের পরাজয় ঘটত, কিন্তু শেষে বুদ্ধিবলে অসুরেরা বিতাড়িত হত। অসুরেরা সকলকে নিজ মতে আনবার চেষ্টা করত, বিপরীত মত তারা সহ্য করতে পারত না। তারাও ছিল ব্রহ্মা, শিব আদির উপাসক আর্য্যের মত, তবে তারা ছিল ঐশ্বর্য্যাকাঙ্ক্ষী। পররাজ্য লুণ্ঠনে তারাই হত, অনেক সময়ে, অগ্রগামী। অনেক আর্য্যবংশীয় সন্তানেরা ও অসুরবৃত্তি অবলম্বন ক'রে হত অসুর। অসুরদের মধ্যেও তপস্যাপরায়ণ ভক্ত ও উচ্চ সাধক জন্মেছেন—ভারতের বা আর্য্য-সংস্কৃতির বাহিরে তাঁরা কেহই ছিলেন না। অসুরেরা ছিল মাত্র উৎকট ফলকাঙ্ক্ষী, দুর্দ্ধর্ষ ও বীর]।

পতন হ'লে, দেবতারা মেঘ বৃষ্টির মধ্য দিয়ে বীজ বা বৃক্ষে প্রবিষ্ট হন, তখন মানুষ বা অন্য প্রাণীর দ্বারা ভুক্ত হয়ে মর্ত্তে জন্মান। পূর্ব্ব সুকৃতি ও সুসংস্কার দ্বারা পুণ্য অর্জ্জন ক'রে কর্ম্মক্ষয়ান্তে ব্রহ্মলোকে তাঁর গতি হয়। এইরূপে সৃষ্টি প্রবাহ চলেছে—স্ব স্ব কর্ম্মফল সবাই ভোগ করে, ঈশ্বর তার জন্য দায়ী নন।

দ্বৈত মতের সঙ্গে সাংখ্যের কোথায় কোথায় মিল আছে লক্ষ্য করলেই আমরা বুঝতে পারব। গীতাতে ও এই মতের প্রসঙ্গ আছে। উহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সৃষ্টির উপাদান তিনটি—'সত্ত্ব', 'রজঃ' ও 'তম'। এই গুলি উপাদান (Elements), কার্য্য দেখে আমরা ইহাদিগকে 'গুণ' বলি। 'তম' হচ্ছে 'আকর্ষণ,' যাতে জমাট বাঁধায়, 'রজঃ' হচ্ছে 'বিকর্ষণ' বা 'প্রতিক্ষেপ,' যাতে নতুন নতুন জিনিষের উৎপত্তি হয়, অপ্রয়োজনীয়কে বার ক'রে দেয়, ঐ 'তম' ও 'রজঃ' শক্তিদ্বয়ের মাত্রা ঠিক রাখে যা, তার নাম 'সত্ত্ব'শক্তি (গুণ), সত্ত্ব শক্তিতে সাম্য আনায়। তাই রহুর চাঞ্চল্য হতে ঊর্দ্ধে যেতে হলে চাই সত্ত্বগুণের বিকাশ। এই তত্ত্বটি সবাই স্বীকার করেছেন; 'জীব' যে স্বভাবতঃই পবিত্র, ইহাও দ্বৈতবাদীরা স্বীকার করেন। প্রত্যেক সাধনক্রম, লক্ষ্য স্থানে পৌঁছবার এক একটি ধাপ্; প্রত্যেক ভাবই স্ব স্ব ক্ষেত্রে বড। বড ছোট বলা দরকার হয় জল্প কথায়, তুলনামূলক সমালোচনায়—সাধন সময়ে নয়। প্রত্যেকের কাছে তার নিজস্ব ভাব—স্ব ইষ্ট—শ্রেষ্ঠ সাধন ক্ষেত্রে। এই ইষ্ট-বাদ ভাবতের ঘোর দ্বৈতবাদীরাও স্বীকার করেন, অর্থাৎ, স্বীকার করেন—

'একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'। 'পাবমার্থিক' ও 'ব্যবহাবিক' দিক বলা হয়; কিন্তু ব্যবহাব কোনটিব ? পবমার্থেবই প্রযোগ, ইহা আমবা ভুলে যাই।

সব জিনিষেব নিজ সত্ত্বা (Thing in itself) অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। জলে ঢিল্ পড়ল, তবঙ্গ ঢিলেব দিকে গেল। তবঙ্গ, ঢিলেব ন্যায় একবাবেই নয—সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই তবঙ্গ ব্যাপাবটি অজ্ঞেয়। তোমাকে আমি দেখছি। 'তুমি' সত্ত্বা হিসাবে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়—'ক'। 'ক' আমাব মনে এসে আঘাত কবলে, যে দিক হতে আঘাতটি এল, 'মন' সেই দিকে তবঙ্গ ছোটালে। তখন তবঙ্গটিব নাম হল 'অমুক মহাশয়'। বোধেব দুটি দিক্ বয়েছে, একটি বাইবেব, অপবটি আসছে ভিতব হতে, আব, দুটিব সংযোগ ফল হচ্ছে 'ক'+'মন'=বহির্জগৎ। ক্রিযা থাকলেই প্রতিক্রিয়া থাকবে। সব জ্ঞানই প্রতিক্রিয়াব দ্বাবাই উপজাত হয়। 'আমি' সত্ত্বা ও সেই বকম অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয—'খ'। যখন আমি নিজেকে 'অমুক লোক' বা 'অমুক নামে' বুঝি, তখন 'খ'+'মন'=অন্তর্জগৎ। অতএব ক+খ=বহির্জগৎ+অন্তর্জগৎ=সমগ্র বিশ্ব, অর্থাৎ, দেশ, কাল ও নিমিত্তেব জন্যই এই বোধটি হচ্ছে। দেশ, কাল, নিমিত্ত—এই তিন তুলে নাও, দেখবে মনও নেই, সুতবাং 'ক' ও 'খ' কে, মনই বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ ৰূপে দেখাচ্ছে। 'ক' ও 'খ' মনেব অতীত সত্ত্বা বলেই, অভেদ ও এক, ঐ সত্ত্বা মন হতে জাত হয় নি। 'গুণ', মনজাত, অতএব 'ক' ও 'খ'—এই দুযে কোন গুণ আবোপ কবা যায় না—'একই' আছেন। নামৰূপ বা দেশকালনিমিত্ত হতেই বুদ্ধি (মহৎ), মনও আব সব। একই বহু হযেছেন, "তমেব ভান্তি, অনুভাতি সর্ব্বং"—'সর্ব্বং' টিও সেই।

[শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উদাহবণ :—বাম, সীতা ও লক্ষণ। সীতা মাঝখানে। সীতা না সবলে, লক্ষণ রামকে দেখতে পান না। সীতা কিন্তু ইচ্ছা মাত্রেই লক্ষণকে দেখতে পান, আব, বামেব দিকে তিনি ত চেয়েই আছেন। ব্রহ্ম, মায়া, জগৎ। যাব শুধু 'জগৎ' বোধ, মায়াকে সে 'আববণ' দেখতে বাধ্য। যে জগৎ ও মায়ার অভেদত্ব দেখে বা যার একাত্মবোধ হয়, তার ব্রহ্মদৃষ্টি খুলে যায়]।

বৈদিক যুগ-প্রসঙ্গ

জগতেব ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কব ব্যাপাব এই যে, ভারতেব সমস্ত আস্তিক দর্শনগুলিই বেদ সম্মত; অতএব বেদের ভাব সকলেব আগেই জাতিব মধ্যে বিস্তাব লাভ কবেছিল; আবাব ঐ দর্শনগুলিব মধ্যে প্রাচীনতম দর্শন, সাংখ্য। ব্রহ্মবিজ্ঞানেব সম্প্রসাবণকার্য্য কত দিন ধ'বে চলেছিল, কে জানে? যাই হোক্, ব্রহ্মবিজ্ঞানেব উচ্চতম ভাব যে স্মবণাতীত যুগ হতে ভাবতে চলে আসছে সে বিষয়ে সন্দেহ কববাব কিছু থাকে না।

ধোলো মনীষিদেব মতে, ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন হলেও, তাব মধ্যে সব 'মণ্ডল'গুলি সে বকম প্রাচীন নয়, ও মণ্ডলগুলির মধ্যে যেথানে যেথানে উচ্চভাব আছে সে গুলি অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বা আধুনিক। একটা চেষ্টা হয়েছিল, মণ্ডলেব ক্রম অনুযায়ী সময় নির্দ্দেশ কববাব; কিন্তু তাতে তাঁদেব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয না দেখলেন—যথা, ৩য় মণ্ডলেব কোন সূক্তেব ঋষি হচ্ছেন বিশ্বামিত্র, কোন সূক্তেব ঋষি তাঁব ছেলে মধুচ্ছন্দা, এই মধুচ্ছন্দা আবাব নবম মণ্ডলেব একজন ঋষি; ১০ম মণ্ডলেব একজন ঋষি হচ্ছেন কুশিক—মধুচ্ছন্দাব প্রপিতামহ—উচ্চভাব পবে উদয় হয়েছে প্রমাণ কবা বডই দুষ্কব!

শব্দগঠনেব সময় শব্দেব বা ধাতুব মূল অর্থ বুঝলে, বোঝা যায় যে ঐ মূল ভাবটি জাতিব মধ্যে আসবাব বহু পবে শব্দটি গঠিত হয়েছে অর্থাৎ ভাষাব শব্দ বা ধাতু অপেক্ষা ভাবটি আবো প্রাচীন। ঋগ্বেদেব ১ম মণ্ডলেই 'অদিতি' শব্দটি আছে। (অদিতি=দ্বৈতহীন)। ঐ মণ্ডলেব ১৬৪ সূ। ৪।৫।৬।৭। ঋক্ গুলিতে প্রাণ ও আত্মাব কথা আছে। আদিত্যকে সর্ব্বব্যাপি ও তেজোময় বলা হয়েছে; ৪১ সূক্তে 'গৌবী' শব্দ আছে, অর্থ—'বাক', যিনি একপদী, দ্বিপদী, চতুষ্পদী বা নবপদীপরূপে সর্ব্বদিক ব্যাপ্ত হয়ে বয়েছেন। এ বকম ভাব ১০ম মণ্ডলেও পাওয়া যায়, অথর্ব্ববেদেও পাওয়া যায়। গৃৎসমদ ঋষিব নাম ১ম মণ্ডল, ২য় মণ্ডল, নবম মণ্ডল ও ১০ম মণ্ডলেও পাওয়া যায়। তাঁবা যে একই নামেব ভিন্ন ভিন্ন ঋষি তার কোন প্রমাণই নেই। 'ঋত' শব্দটি ১ম মণ্ডলেই আছে। 'ঋতকে' প্রজ্ঞা প্রদান, কববার জন্য আহ্বান

কবা হচ্ছে ('ঋত-ঘোষা')। নবম মণ্ডলেব সঙ্গে সামবেদেব ও ১০ম মণ্ডলেব সঙ্গে অথর্ব্ববেদেব সম্বন্ধ স্পষ্ট বোঝা যায়। গৃৎসমদ, ঋষি অঙ্গিবা বংশোদ্ভব, শুনহোত্রেব ছেলে। ইন্দ্র একসময়ে তাঁকে অসুবদেব হাত হতে বক্ষা কবেন, তিনি ভৃগুবংশীয শুনকেব আশ্রয় গ্রহণ কবেন, তাই নাম হয তাঁব শৌনক। ভৃগুবংশীয যজমানেব কথা ১ম মণ্ডলেও দৃষ্ট হয (সূ, ১৪৩।৪)। পববর্ত্তী পৌবাণিক যুগেব মত কাহিনী ঋগ্বেদেও আছে। উদাহবণ স্বরূপ দীর্ঘতমা ঋষিব গল্প, এ গল্পটি বলেছেন সায়ন। পণ্ডিতেবা বলেন যে ওবকম গল্প ঋগ্বেদে নেই, অথচ পববর্ত্তী ১৫২ সূক্তে ঐ গল্প সম্বন্ধীয 'মমতাব' কথা আছে। গল্প, পল্লবিত হযে পবে বেড়ে যেতে পাবে, কিন্তু প্রচলিত কোন কথা যে ছিলনা, তা এ সব খোলো যুক্তিতে প্রমাণ হয় না। 'অসুব' শব্দটিব মানে ছিল পূর্ব্বে ভাল—১০ম মণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। ৺পণ্ডিত বমেশচন্দ্র দত্ত দেখিয়েছেন, 'অসুব' = বলবান শক্র (১০ম অষ্টক ৫৪।৪), 'অসুবত্ব' = ক্ষমতা (৯৯।২, (১৩২।৪) 'অসুব' = মিত্র, তাবপব ১৩৮।৩ হতে 'অসুব' = দেবশক্র। পৌবাণীক যুগে অসুবেব এই শেষ অর্থটি গৃহীত হয়েছে। একই শব্দেব ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ও তাব বিভিন্ন প্রয়োগ দেখেই ঐ পণ্ডিতেবা ঠিক্ কবে বসলেন যে ১০ম মণ্ডল আধুনিক। ১০ম মণ্ডলে ৫০ সূক্তে 'অসুব' = 'দেবশক্র' বোঝালেও, ৫৫, ৫৬, ৭৪ হতে ১২৪ পর্য্যন্ত ভাল অর্থেই ব্যবহৃত, কখন তাব অর্থ 'সূর্য্য', কখন দেবগণ সম্বন্ধীয, কখন 'ইন্দ্র' কখন 'মিত্র' ইত্যাদি। ১ম মণ্ডলে 'অসুব' নানা অর্থে ব্যবহৃত—'রুদ্র', 'ইন্দ্র', 'স্বর্গ' ইত্যাদি, ২য মণ্ডলে 'বৃকদ্বব' = অসুব। এই বকম নানা অর্থ ছেড়ে দিয়ে একটি মাত্র অর্থ গৃহীত হয়—ইহা অসম্ভব কেন? 'পুরুষ সূক্ত' (নাবায়ণ ঋষি, ১০ম মণ্ডল।৯০) কেও ঐসব পণ্ডিতেবা আধুনিক বলেন। তাঁদেব যুক্তিব সাব কথা, (১) অপবাপব ঋকেব মত ভাষাব কাঠিন্য নেই, (২) জাতিভেদ প্রথাটি সমর্থন কববাব জন্যই ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণেব কথা এই অংশটিতে পবে যোগ কবা হয়েছে, কাবণ ঋগ্বেদ-যুগে জাতিভেদও ছিলনা, পৌবহিত্য প্রথাও ছিল না। Muir সাহেব বলেন যে 'পুরুষকে' বিশ্বপ্রভু বলা হযেছে, অথচ তাঁকে ধ'বে বলি দেওযাব কথা বলতে ঋষিবা লজ্জাবোধ কবেন নি, এই 'Profanity' বোধ (হীনতা বোধ) ও তাঁদেব মাথায় আসেনি। ইহা

ঠিক্ ধোলো সংস্কৃতিব সংস্কাবেব কথা, বিদেশী বিজাতীব কথা। যাই হোক্, এ সম্বন্ধে বক্তব্য, (১) পবিস্কৃত (সংস্কৃত) ভাষা গঠনের কথা ১০ম।৭১সূ।২ এ পাই ; ঐ ১০।৩।১ এ দেখি যে 'যজ্ঞদ্বাবাই ভাষাব পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়' বলা হয়েছে ('বাক্‌স্তুতি') ; এই সূক্তটিকে কিন্তু আধুনিক বলা হযনি। ভাষা, নবভাবে পুনর্গঠনেব সময় সহজ হয়, ভাষা সজীব থাকলেই ইহা হয। অল্পদিনেব মধ্যে বর্ত্তমান কালে বিদ্যাসাগবী ভাষাব চল প্রায় নেই। (২) জাতিভেদ তখন না থাকতে পাবে, কিন্তু—'ভেদ' নয়—জাতি বিভাগেব নামকবণও কি দোষেব ? নামকবণ দেখেই তাকে 'আধুনিক' আখ্যা দেওয়া যায কি ? ১০ম।৭১।৯ এ, 'ন ব্রাহ্মণাসঃ স্বুতে কবাণঃ'—মূলেব ঐ 'ব্রাহ্মণ' শব্দটিব মানে কি 'বেদ্‌বিদ্' বা 'স্তোত্রবিশাবদ' নয় ? সকল পণ্ডিতমণ্ডলীব গৃহীত এই অর্থ 'পুরুষ সূক্তে' থাকায় দোষ কোথায় ? "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ," 'তাঁব মুখই ছিল ব্রাহ্মণ', এখানে বংশগত ব্রাহ্মণেব কথা আসে কোথা হতে ? 'অগ্নিমীডে পুবোহিতং', ঋগ্বেদেব প্রথমেই আছে, এখানে 'পুবোহিত' কি অর্থে প্রযুক্ত ? 'পুরুষ-সূক্তে,' যেমন চন্দ্র, সূর্য্য, ব্যোম আদি যা কিছু সমস্তই 'পুরুষ' হতে জাত, তেমনি ব্রাহ্মণাদি বিভাগ সবই ঐ পুরুষ হতে উৎপন্ন—ঐ সব বিভাগেব মূলে 'পুরুষ', এই বলা হয়েছে। এ বকম বর্ণনা, মাত্র 'পুরুষেব' বিভিন্ন অংশেব নামকবণ নয় কি ? যাঁবা যুদ্ধকার্য্যে, দেশবক্ষা প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকেন তাঁদেব বলা হল ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। জাতি থাকলে কার্য্যেব বিভাগ বা শ্রেণীও থাকে, নামকবণও আবশ্যকমত দবকাব হয। ১০ম মণ্ডলেব ৯ সূক্তে 'ঋক্', 'সাম', ও 'যজু'ব কথা আছে, এটিও বলা হয় পবে বচিত, কাবণ, ধোলো মত তাই।। ১৬ সূক্তে বলা হয়েছে যে 'পুরুষ-যজ্ঞই' আদি যজ্ঞ—যজ্ঞদ্বাবাই যজ্ঞ—ইহাই প্রথম ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণাদি যদি 'পুরুষেব' দেহজাতই হন, তাতে কি বোঝায না যে ত্যাগরূপ যজ্ঞেই সমস্ত অনুষ্ঠানেব বীজ বর্ত্তমান ? ভাবতীয আর্য্যেব বোঝবাব দিকই ছিল স্বতন্ত্র, ইহা যেন আমবা না ভুলি। ভাবতে আগে সত্য উপলব্ধি, তাবপব সেই সত্য ঋষিমুখ নিঃসৃত। বেদবিভাগ বহু পবে হলেও, পৃথক পৃথক নামে বিভক্ত হলেও, ঋকেব যে অংশ গীত হত তাকে 'সাম' নামে অভিহিত কবা হত গোডা থেকেই ইত্যাদি—এটা ভুলে যাই কেন ?

ঐতিহ্যের উদ্দেশ্য, জীবন ও নানাপ্রকার প্রসঙ্গ দ্বারা উপলব্ধ সত্যকে বিস্তার করা। বেদতত্ত্ব অনাদি, সুতরাং তাকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টায় সময়ের অগ্রপশ্চাৎ বিচার্য্য নয়—আর্য্যের এই ভাব; এটা আগে, ওটা পরে, তাতে কি এসে যায়? তা ছাড়া, ঘটনা ও রচনা-কাল যে একই সময়ে হবে তার মানে কি? 'মোক্ষমুলার সাহেব ঋগ্বেদ (Vide Sacred Books of the East Vol. Lxxxii Part I, ১০ম ম-১২১।অ, ৮, অ, ৭ বর্গ ৩।৪) তুলে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তার মর্ম্ম এই যে ঐ সূক্তে যখন একেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতের কথা রয়েছে, তখন ওটি পরে নিশ্চয়ই রচিত, কারণ, প্রথমে বহু ঈশ্বরবাদের বা দেবতার কল্পনা আসে, পরে আসে একেশ্বরবাদ—ইহা সব যায়গায় ইতিহাস প্রমাণ করে। বেশ কথা, কিন্তু ভারত সম্বন্ধে তার প্রমাণ আছে কি? অন্যান্য দেশের ইতিহাসে যা ঘটেছে, ভারতেও তাই হতেই হবে তার মানে কি? তার প্রমাণ কোথায়? জগতের সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদেও কি তা আছে? পূর্ব্বে বলেছি যে একবার দলাদলির আভাষমাত্র পেয়েই, আর্য্য মনীষিরা তা একেবারে দাবিয়ে দেন—এ দৃষ্টান্তও ইতিহাসে প্রথম। কেন তাঁরা দাবিয়ে দিতে পেরেছিলেন? যাই হোক্, মোক্ষমুলার সাহেব স্বীকার করেন যে ঐ সব মন্ত্রগুলি পরে রচিত হলেও, 'আধুনিক' নয়—ঐগুলি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের, এমন কি মন্ত্রযুগের পূর্ব্বে রচিত হয়। আর্য্য সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতি থাকলেও, অদ্বৈত বেদান্তের উপর শ্রদ্ধা থাকলেও, মনীষি মোক্ষমুলার অনেক গোল করেছেন, সময়ে সময়ে ঘোলো প্রণালী ঘোলের দিক্ দিয়ে ভারতীয় গবেষণায় খাটাতে গিয়ে, ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে ইতিহাসের বিচার করতে গিয়ে।

উচ্চভাব ঋগ্বেদের সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে আছে। ১০ম ম। ১৩০।৪।৫ ঋকে ছন্দের উৎপত্তি বর্ণিত আছে,—'অগ্নি' হতে 'গায়ত্রী, 'দেব সবিতা' হতে 'উষ্ণিক', 'সোম' হতে 'অনুষ্টুপ', 'সূর্য্য' হতে 'উকথ', বৃহস্পতির 'বাক' হতে 'বৃহতী', 'মিত্রাবরুণ' হতে 'বিরাট', সর্ব্বদেব ('বিশ্বান্দেবা') হতে 'জগতী'। ইহাকেও 'আধুনিক' বলা হয়েছে, কারণ অত প্রাচীন যুগে, ঘোলো মতে, ৮টি ছন্দ ও উচ্চ ভাবার্থক দেবতার কল্পনা অসম্ভব, কারণ, ভারতেতর দেশে এটা অসম্ভব। মার্জ্জিত বা পরিষ্কৃত (সংস্কৃত) ভাষার কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। ১ম ম ১৪১।১ঋক্ বলেন যে 'ভর্গদেবের'

সাক্ষাৎকাবেব জন্যই ('দর্শতং দেবস্য ভর্গ') বলিষ্ঠ ('বলিখা') শবীব দবকাব, ভর্গতেজ দ্বাবাই জ্ঞান সিদ্ধ হয়, এই হেতু অগ্নিব উপাসনা দবকাব। ২য় ঋকে অন্ন ও শবীবে নিত্য অগ্নি বর্ত্তমান বলা হয়েছে, তিনি "সপ্তশিবাসু মাতৃষু"—সপ্তমাতৃকাতেও আছেন আব বয়েছেন 'বৃষভস্য দোহসে'—বৃষভেব দোহনার্থে, ৩য় ঋকে বলা হয়েছে যে মহাযজ্ঞ হতে হয় অগ্নির উৎপত্তি। উৎকৃষ্ট অন্নেব জন্যই অগ্নিব প্রণয়ন (৪ঋক) ইত্যাদি। 'দিকাদি' মাতৃস্থানীয় (৫ম ঋক্)। ৩য় ম ৫।১১ ঋকে বৈশ্বানবকে 'বৃষরূপী' বলা হয়েছে। অগ্নিকে 'বৃষভ' ও 'ধেনু' উভয় স্বরূপই বলা হয়েছে। "অসচ্চ সচ্চ পবমে ব্যোম দক্ষস অগ্নির্হ নঃ প্রথমজা ঋতস্য পূর্ব্ব আয়ুনি বৃষভশ্চ ধেনু" (৭অা।১০মা।৫সূ)—'অগ্নি সৎ অসৎ উভয়ই,—ব্যোমে সূর্য্যরূপে প্রকাশমান ঋতেব প্রথম রূপ, যজ্ঞেব পূর্ব্ববর্ত্তী, বৃষভ ও ধেনু উভয়ই'। ২য় ম। ২৪।২৫।২৬ সূক্তে "ব্রহ্মণস্পতি" দেবতাব ও উল্লেখ দেখি, তিনি সর্ব্বতো-ব্যাপ্ত, সর্ব্বকামী, তিনি সত্যরূপ জ্যা-বিশিষ্ট, তিনি সবল ও দুর্ব্বলেব বক্ষা কর্ত্তা ইত্যাদি। ব্রহ্মণ্যস্পতি হতে 'ব্রহ্মণ্যদেব' ও তদুপাসক ব্রাহ্মণেব কল্পনা কি অসম্ভব? 'ব্রহ্মণ্যস্পতি', 'জ্যা বিশিষ্ট' ও 'বাণক্ষেপী' —এই উপমাটিও লক্ষ্য কববাব বিষয়।

[২য় ম।১৬।৫।৬।৭ ঋকে 'বৃষ' শব্দেব বাববাব ব্যবহাব আছে—ইন্দ্রই বৃষ, বজ্রই বৃষ, যজ্ঞেব সবই বৃষ ইত্যাদি]।

ঋগ্বেদাদিতে দেখি প্রথম ক্ষাত্রশক্তি, তাব পব ক্ষাত্রশক্তি হতে পৃথক ব্রহ্মণ্যশক্তিব কল্পনা। ইহা আমবা পাই জীবন দেখে ও অন্যান্য নানাদিক্ দেখে। বৈদিক যুগে ঋষি যোদ্ধা ও দেখি আবাব যুদ্ধ পাবদর্শিনী ঋষিপত্নিও দেখি। সমাজস্থিতিব জন্যই প্রধানতঃ গুণকর্ম্মানুযাযী বর্ণ বিভাগ হয়। যখন বংশেব বৈশিষ্ট্য, বংশেব শিক্ষা বক্ষা কববাব চেষ্টা হল, তখন বর্ণকে বংশগত কববাব ইচ্ছা হওয়াটা স্বাভাবিক; কিন্তু সে সময়েও গুণকর্ম্মেব আদব বর্ত্তমান। বৈদিক যুগেব প্রথম অবস্থায় গুণকর্ম্মানুসাবে নামকবণ পর্য্যন্ত ছিল না। গুণ ও কর্ম্মকে নির্দ্দেশ কববাব জন্যই পবে হয় নাম কবণ। 'পুরুষ যজ্ঞে' আমবা ঐ নামকবণটি দেখতে পাই (যখন ঋষি 'পুরুষ যজ্ঞ' দর্শন কবলেন, অর্জ্জুনেব বিশ্বরূপ দর্শনের ন্যায়)। এই নামকবণে ছোট বড ভাব নেই, কাবণ দেহেব প্রতি

অঙ্গই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রধান। সমাজের আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব—'পুরুষের মুখ'। দেখা যায়, বংশের বিশেষ ধারা বজায় রাখবার জন্য বংশ হিসাবে বর্ণনার সূত্রপাত আরণ্যক যুগে, বংশানুসারে নাম থাকলেও গুণগত কর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। বোঝা যায় যে, এই সময়ে জনশক্তির উদয় ও সমাজ-শক্তির অভ্যুদয় হয়।

[মনুষ্যের ন্যায় দেবগণও চারিবর্ণে বিভক্ত, দেবগণের মধ্যে অগ্নি বৃহস্পতি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ('অগ্নে মহান্ অসি ব্রাহ্মণ ভারত'—তৈঃ ব্রাং ৩।৫।৩, 'ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতি'—তৈং সং ২।২।৯।১), ইন্দ্র বরুণ সোম প্রভৃতি ক্ষত্রিয় (তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজৎ ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবতা ক্ষত্রাণীন্দ্রোবরুণঃ সোমোরুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশানঃ') বসু রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বদেব ও মরুৎ প্রভৃতি বৈশ্য ('সবিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজ্যতানি গণশ আখ্যায়ন্তে, বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বদেবা মরুতঃ'), পূষা, প্রভৃশি—শূদ্র ('সশৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণমিতি'— —শতপথ ১৪।৪।২।২৩৫)—(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১ম পঙ্কিকা দ্রঃ—৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)। 'মরুতেরা' দেবগণের বৈশ্য, 'অদিতি' ও 'গায়ত্রী'—ক্ষত্রিয় (ঐ দ্রঃ)। দেখা যায় যিনি একসময়ে ক্ষত্রিয়, অন্য সময়ে তিনিই আবার বৈশ্য। বৈদিক অনুষ্ঠান, যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞই ব্রহ্ম। অগ্নিই যজ্ঞের মুখ, সুতরাং অগ্নি ব্রাহ্মণ। বৈদিক দেবতা ৩৩ :—অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্‌কার। এই ৩৩ জন সোমপায়ী দেবতা। অসোমপায়ী দেবতা ৩৩ :— একাদশ প্রয়াজ, ১১ অনুযাগ, ১১ উপযাজ। এ ছাড়া প্রাণীদিগকে 'দেবী' বলা হয়েছে। 'দেবিকা'ও আছেন। (৺পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অনূদিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ দ্রঃ)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যে যে স্থানে প্রসঙ্গ আছে. অধিকাংশ স্থলে—প্রায় সর্ব্বস্থানে—ঐ কৃত অনুবাদ, পাদটীকা ও পরিশিষ্ট হতে উদ্ধৃত হয়েছে]।

বোলোর অধ্যবসায় অদ্ভুত। তাঁদের অনুসন্ধানের ফলে অনেক নতুন আলোক এই তন্দ্রালস জাতির চ'খে পড়েছে, তার জন্য সকলেই কৃতজ্ঞ, কিন্তু খোলোমত খুব সাবধানে নিতে হয়। ঋগ্বেদ ৭ম, ২।৯ সূক্তে ('একা চেতৎ আসমুদ্রাৎ'), বলা হয়েছে যে সরস্বতী নদী পর্ব্বত হতে উৎপন্ন হয়ে সমুদ্রে পড়েছে, কিন্তু অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ (Professor Macdonell,) 'সমুদ্র' মানে করেছেন "Collection of waters"—জমাজল! বিদুষী রোগোজিন (Rogozin) করেছেন 'সিন্ধুনদের পঞ্চশাখার সম্মিলিত জল'। অথচ

'সবস্বতী' সিন্ধুনদে পড়ে নি! তখন বাজপুতানা সমুদ্রেব অংশ ছিল, আবব সাগবেব বাহু সেখানে প্রবেশ কবেছিল ও 'সবস্বতী' সেই খানেই মিশেছিল। পুণাব পণ্ডিত কেটকাব (Mr, V. B. Ketkar) জ্যোতিষেব সাহায্যে গণনা ক'বে দেখিয়াছেন যে পুবাণ বর্ণিত 'রাজপুতানা সাগব' ও 'গাঙ্গ সাগব' (Gangetic Sea), যা দক্ষিণ ভাবত বা জম্বুদ্বীপকে পৃথক কবেছিল, খৃঃ পূঃ ৭৫০০ বৎসরেব পবে বিলুপ্ত হয়। তা হলে, 'সবস্বতী' ঐ সময়েব বহু বহু পূর্ব্ব হতে সমুদ্রে পড়ত। 'সবস্বতী' এখন বাজপুতানা মরুভূমিব মধ্যে বিলুপ্ত। Macdonell সাহেব বলেন যে 'মৎস্য' শব্দটি মাত্র একবাব ঋগ্বেদে বব্যহৃত হযেছে, অতএব তিনি ঠিক ক'বে ফেললেন যে 'সমুদ্র' মানে 'জমা জল'। তা যদি হয়, ঋগ্বেদে "চতুঃসমুদ্রেব" কথা আসে কোথা হতে? না হয় 'মৎস্য' কথাটি একবাব আছে। সিন্ধুনদ বিষয়ক কথা ও অনেকবাব—চাবিবাবেব বেশী—বলা হয়েছে। "সকল সিন্ধুগণ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়েছে", স্পষ্ট আছে (ঋগ্বেদ ৮।৯২ ও ৩।৩৬।৭ দ্রঃ)। সবস্বতী হচ্ছে আর্য্যদেব 'দেবকৃত যোনী' এবং সবস্বতী ও দৃশদ্বতীব মধ্যস্থিত ভূভাগ—'দেবনির্ম্মিত দেশ'। (Vide Ṛgvedic India—A. C. Das—2nd. Edition)। এই বকম, ধোলো পণ্ডিতেবা এক একটি শব্দেব স্বকপোল কল্পিত অর্থ ক'বে বিষম গোল বাধিয়েছেন। ঐ সব শব্দেব অর্থ আর্য্যেবা যে ভাবে গ্রহণ ও প্রয়োগ কবেছেন, ঐ পণ্ডিতেবা সে ভাবে গ্রহণ কবেন নি সব সমযে। তাঁবা কবেছেন অর্থ (যেমন, 'আর্য্য' 'অনার্য্য', 'সুব', 'অসুব', 'যবন', 'ম্লেচ্ছ' ইত্যাদি) বক্তেব দিক্ দিয়ে, ভাবতে কবা হয়েছে সংস্কৃতিব দিক্ দিয়ে।

['আর্য্য' ও 'ঋষি' শব্দদ্বয়ের নানা অর্থেব জন্য মৎপ্রনীত 'ভারত ধাবা' ২য় খণ্ড—বিবিধপ্রসঙ্গ দ্রঃ)। সুখের বিষয় যে দেশী পণ্ডিতেরা যথাসম্ভব ভারতীয় দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করছেন। 'যবন', 'মেচ্ছ' শব্দদ্বয় বর্ত্তমানে যে অর্থে গৃহীত, পূর্ব্বে সেরূপ অর্থ ছিল না।]

মহাভাবতেব যুগেও 'কালযবন' নাম পাওয়া যায়। তিনি ও ছিলেন হিন্দুদেবোপাসক। 'যবনাচার্য্যেব' নাম জ্যোতিষ শাস্ত্রে ও আছে। 'যবন সিদ্ধান্ত', জাত স্কন্ধ বিষয়ক 'তাজিক' নামে পবিচিত গ্রন্থাদি ও আছে। 'বোমক সিদ্ধান্ত' হতে জানা যায় যে ব্রহ্মাব কাছে সূর্য্য শিক্ষা পান,

আব, ঐ গ্রন্থকর্ত্তা যবন, সূর্য্যেব নিকট হতে যা উপদেশ পান, তাব নামই 'তাজিক'। 'সদ্ধায়ন-বত্ন' বই হতে 'তাজিকে'ব কথা জানা যায়— একটি শ্লোক আছে তাব অর্থ যে, জ্যোতিষশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হলে যবন বা ম্লেচ্ছ ও ঋষিতুল্য হন। ঐ শব্দগুলি Heathen এব মত ঘৃণাবাচক নয়। সেই ববকম 'হিন্দু' শব্দটি অভাবতীয়েবা, যে ভাবেই প্রথম ব্যবহার করুন, এই জাতিব গৃহীত অর্থ, 'ভাবতীয় আর্য্যেব মানসবংশধব—একই কৃষ্টিব অন্তর্গত, একই সংস্কৃতিব ধাবা-প্রবাহেব মধ্যে যাঁবা বাস কবেন'। ধোলো পণ্ডিতেবা এক বকম জোব ক'বেই আব একটি মত চালিয়েছেন যাব কোন প্রমাণ পাওয়া যায না, যেটি তাঁদেব অনুমান মাত্র। সে মতটি, আর্য্যেব ভাবতে আগমনেব কথা। স্বামীজি ও এ বিষয়ে বলেছেন। ঐ সব পণ্ডিতদেব মতে, ভাবতেব বাহিব হতে আর্য্যজাতিব একটি বড দল প্রথম ভাবতে আসেন, ভাষাগত সাদৃশ্য—বিভিন্ন জাতিব—তাব প্রমাণ ইত্যাদি। এটা তাঁদেব মনে হয না যে, যখন বৈদিক সভ্যতাব উদয হয়েছিল, তখন অন্য স্থানে অনেক জাতিব জন্মই হয় নি। কেন মনে হয না যে ভাবতীয় সভ্যতাব প্রসাবেব সঙ্গেই, বিভিন্ন জাতি সংস্পর্শে আসায়, সেই সব জাতি ভাষা জ্ঞান ও, আর্য্যের কাছ হতে পেযেছেন? এখনও যে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ এসিযাব ও চিন ছাডা সমস্ত পূর্ব্বএসিযাব ভাষা-গঠন প্রণালী সংস্কৃতানুরূপ? ধোলোব বোঝবাব দিকই অন্যবকম, সেইজন্য তাঁবা গোলযোগে পডেন, যেমন 'মৎস্য' কথাটিব একবাব প্রযোগ দেখেই ঠিক কবলেন সমুদ্র মানে সাগব নয়। এ বকম ভ্রম হওয়া তাঁব স্বাভাবিক, কাবণ, অন্যান্য জাতিব ইতিহাস প্রমাণ কবে যে নদী বা সমুদ্রোপকূলবাসীবা মৎস্য প্রিয় হয়, কিন্তু আর্য্যেবা ছিলেন মাংসপ্রিয়, মৎস্যপ্রিয মোটেই নয়, আজও উত্তব পশ্চিমাঞ্চলেব জাতিগুলিব সেই রুচিপ্রিয়তা বর্ত্তমান। ইহাও আশ্চর্য্য যে ভাবত অসংখ্য সম্প্রদায় অবাধেই গডতে দিয়েছেন, কিন্তু সাম্প্রদাযিকতাব প্রশ্রয় দেন নি ও কখন অপবেব ধর্ম্মবিশ্বাসকে চুর্ণ কববাব জন্য যুদ্ধাভিযান কবেন নি।

ঋগ্বেদ ১।২৪।১৪ মন্ত্রে 'হেলঃ' শব্দ দৃষ্টি হয়।

[('তে হ সুরাঃ হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্ব্বন্তঃ পবাবুভুস্তমাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিত বৈ ম্লেচ্ছিত বৈ নাপ ভাষিত বৈ ম্লেচ্ছো হবা এষ যদপশব্দঃ · ')]।

"হে অবয়ঃ" স্থানে ভুল ক'বে বলেছিল "হে অলয়ঃ (হেলয়ঃ)" ; 'র' স্থানে ল এবং স্ববপ্লুত 'হে' পদটিব সন্ধি কবেছিল, যেটি ব্যাকবণে,অসিদ্ধ, সুতবাং যে ওবকম উচ্চাবণ ভঙ্গী কবে, সে ম্লেচ্ছ শব্দেব উচ্চাবণ কবে (মহাভাষ্য দ্রঃ)। "হেলঃ শব্দেব অর্থ সাযন 'ক্রোধ' কবেছেন।...প্রথম যথন আর্য্যেবা আফ্গানিস্থান কাশ্মীব এবং পশ্চিম তুকিস্থানে একত্রে বাস কবতেন তখন 'অসুব' শব্দেব অর্থ ছিল 'বলশালী,' 'দেব' শব্দেব অর্থ 'দ্যুতিমান' এবং 'হেল' শব্দেব অর্থ ছিল 'তেজঃ'"। বিবাদেব পব অর্থ বদলে যায়। "১।২৫।২ মন্ত্রে সায়ন 'জিহীলান' শব্দেব ধাতু অনাদারার্থক √হেল কবেছেন।...বৈদিক শব্দানুশাসন বিধিতে দেখা যায়—সেই সুবেবা হেলি (হেলয়ঃ) হেলি বলতে বলতে পলাযন কবেন। · কিন্তু মন্ত্র সকলেব মধ্য হতে এইরূপ ইতিহাসেব আবিষ্কাবেব দ্বাবা বেদেব অনাদিত্ব অসিদ্ধ হয় না এবং পূর্ব্বোক্ত মত সকল অধিকতব আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেবও সম্মত নয়। ভাবতবর্ষেও এইরূপ প্রশ্ন এক সময়ে উঠেছিল। জৈমিনী তাঁব পূর্ব্ব-মীমাংসা সূত্রে (১।২।৩৯) এই পূর্ব্ব পক্ষ তুলেছেন যে 'কীকট জনপদ', 'নৈচশাখানগব', 'প্রমংগদ বাজা' 'ববব প্রবাহিনী' প্রভৃতি অনিত্য দেশ ও লোকেব নাম যদি বেদে দেখা যায়, তা হলে বুঝতে হবে, বেদ তাব পবে লেখা'। তাতে তিনি উত্তব দেন, 'বববাদি যে অনিত্য' শব্দ বেদে দেখা যায় তা, শব্দ সামান্য মাত্র। সেখানে অনিত্য বববাখ্য কোনও পুরুষ বিবক্ষিত হয না। 'ববব' একটি শব্দেব অনুকবণ মাত্র। 'ববব' অর্থে ভবভব শব্দকাবী বায়ুকেই বলা হচ্ছে। সেই ববব বায়ুই প্রবাহনি অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বহনশীল। এই ভাবে সকল নাম ও দেশেব অর্থ ক'বে নিতে হবে। (সায়নকৃত ঋগ্বেদ উপোদ্‌ঘাত ভাষ্য)।" (উদ্বোধন, অগ্রহায়ন—৩৬বর্ষ ১১শ সংখ্যা দ্রঃ)। ভাষাতত্বের দিক দিয়ে বিচাব কখন নির্ভুল হয না। ভাষা গৃহীত হয়, ভাষা ঘাডে চাপানো যেতে পাবে, জেতাব জেদে পুবাতন ভাষা লোপ পেয়ে নতুন ভাষা দেশীয় ভাষা বলে অনুমিত হতে পাবে—ধোলো মনীষিবা ইহাও দেখিয়েছেন।

বৈদিক ভাব প্রসার

(ভারতে)

ভারতে, অপরা বিদ্যা বিস্তারে সমাজের প্রধান লক্ষ্য ছিল—মানুষ কি উপায়ে বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করতে পারে। ব্রহ্মচর্য্য সাধনই—উপস্থসংযমই—ছিল প্রথম ও মূল উপায়। সমাজে তখন সংহতশক্তির উদয় হয়েছে। এই সংহতশক্তির উপরই ছিল সমাজ দণ্ডায়মান। সমাজ চাইতেন যাতে সমাজান্তর্গত প্রত্যেকে সমষ্টি-রূপী সমাজকল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে জীবন যাপন করেন। ভারত প্রথম হতেই বুঝেছিলেন যে, সমষ্টির কল্যাণেই ব্যষ্টির কল্যাণ। তাই সমাজে বাস করতে হলে সমাজের নিয়ম মেনে চলতে হয়। সমাজের আর একটি লক্ষ্য ছিল—প্রত্যেক ব্যক্তিকে সত্যসংকল্প করা, নির্ভীক করা। ঋগ্বেদে (২ম।২৭।১১। ১৪।১৬) ঋষির কাতর প্রার্থনা, 'যেন, অভয় জ্যোতিঃরূপ লাভ করতে পারি', 'যেন দীর্ঘ তমিস্রারদ্বারা আক্রান্ত না হই, যেন অভয় জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হই, যেন বীরের ন্যায় মায়াপাশ অতিক্রম করতে পারি, যেন হিংসা রহিত হয়ে থাকতে পারি'। সমাজ, কল্পনার রাজ্যে বা ছায়ালোকে ভ্রমণ করতেন না—আদর্শ-জীবন দেখতে চাইতেন, যাতে সকলে প্রকৃতির মোহকে জয় ক'রে সর্ব্ববন্ধন মুক্ত হতে পারেন। তাই তাঁরা সকলকে আপন করে নিতে পারতেন, তাই তখন সামাজিক নিয়ম সংকীর্ণতা-দোষদুষ্ট ছিল না। তাই বৈদিক ধর্ম্ম কারোকে বাদ দিতেন না।

ব্রহ্ম, বাক্য মনের অতীত—তাঁর 'ইতি' করা যায় না। এইটি উপলব্ধি করতে হলে চাই তপস্যা, চাই ব্রহ্মচর্য্য, চাই মনমুখ এক। "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম" (মু ।১।১।৮)। অথর্ব্ববেদ ১১কা।৩অা।১ম সূক্ত হতে কয়েকটি সূক্তে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচর্য্য মাহাত্ম্য বর্ণনা কালে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা হ'তেই ব্রাহ্মণাদি সৃষ্ট হয়েছে,

[ঐ ৫ সূত্রে, "পূর্ব্ব জাতে ব্রহ্মণো ব্রহ্মচারী ঘর্ম্মং · ·সাকম্।" সায়ন টীকায় বলেছেন, "যৎ সর্ব্বজগৎ কারণং ব্রহ্ম · ।তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ ব্রহ্মচারী পূর্ব্বোজাতঃ । স চ উৎপন্না ঘর্ম্মং দীপ্তং রূপং বসানঃ আচ্ছাদয়ন তপসা

. উত্থিতবান। তস্মাৎ ব্রহ্মচর্যাত্মনা তপস্ত্যপমানাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণানাং স্বভূতং জ্যেষ্ঠং ...ব্রহ্ম বেদাত্মকং জাতং প্রাদুর্ভূতং... "]।

ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবেই বেদতত্ত্ব আচার্য্যহৃদয়ে প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মচর্য্যেই তা পুষ্ট হয (ঐ ১০।) ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবেই মেঘ সঞ্চবিত হয, বরুণদেব "অমাং ঘৃতং কৃণুতে কেবলমাচার্য্যো ভূত্বা . ..." (ঐ ১৫)। ঘৃত—"ক্ষবণশীলং উদকং"—সায়ন। এই ব্রহ্মচর্য্যেই বাষ্ট্র বর্দ্ধিত হয—

["ব্রহ্মচর্য্যেন তপসা বাজা বাষ্ট্রং বি বক্ষতি ....." (ঐ ১৭)। সায়ন বলেন, "......যস্য বাজ্ঞো জনপদে ব্রহ্মচর্য্যেন যুক্তাঃ পুরুষাস্তপশ্চরন্তি তদীয় রাষ্ট্রং অতি বর্দ্ধতঃ ইত্যর্থঃ।" ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবেই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ইত্যাদি]।

এখানে আমবা কয়েকটি কথা পাই, 'বাজা', 'বাষ্ট্র', 'মেঘ', ইত্যাদি। রাজধর্ম্মেব উপযোগী হবাব জন্য বাজাকে ব্রহ্মচর্য্যপবায়ণ তপস্বী হতে হত। বাষ্ট্রেব মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্ম বিশ্বাসী থাকতে পাবে, কিন্তু বাজাব সমদর্শিত্ববোধ জাগ্রত হত ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যাব দ্বাবা। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাব জন্য তখন গুরুগৃহে বাস কবতে হত। শিষ্যেব হৃদয়ে যাতে শ্রদ্ধা জাগে, শিষ্য যাতে সত্যনিষ্ঠ, সতৎসংকল্প হন, গুরু তাব চেষ্টা কবতেন, শুধু গ্রন্থ পাঠ বা কণ্ঠস্থ কবতেন না। শিক্ষাব সঙ্গে যে বকম জীবন-প্রণালীব মধ্য দিয়ে শিষ্য গড়ে উঠতেন, তাবই নাম ছিল ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষা। 'ব্রহ্মচর্য্য' শব্দটিব নানা অর্থ থাকলেও ব্যবহাবিক জীবনে এইটিই ছিল মূলতত্ত্ব। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাব পব শিষ্য গৃহী বা বনবাসী হতেন স্বেচ্ছায়। মেঘ দবকাব অন্নেব জন্য। অন্নেব কথা আমবা আগে পেয়েছি। অন্ন সংস্থানেব জন্য গৃহী মাত্রকেই সচেষ্ট হতে হত। ব্রহ্মচর্য্য ও অন্নপুষ্ট দৃঢ়শবীবে বাস কবত দৃঢ় বীর্য্য।

অথর্ব্ববেদ সংহিতাব পঞ্চদশ কাণ্ডে 'ব্রাত্য' মহিমা বর্ণিত দেখি।

[সায়ন, ঐ কাণ্ডেব সাব মন্তব্যে বলেছেন, "ব্রাত্যো নাম উপনয়নাদি সংস্কারহীনঃ পুরুষঃ। সোঽর্থাৎ যজ্ঞাদি বেদবিহিতাঃ ক্রিয়ার্কত্তুং নাধিকারী। ন স ব্যবহাব যোগশ্চেত্যাদি জনমতং মনসি-কৃত্য ব্রাত্যোধিকারী ব্রাত্যো মহানুভাবো ব্রাত্যো দেবপ্রিয়ো ব্রাত্যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়র্ব্বচসো মূলা কিং বহুনা ব্রাত্যো দেবাধিদেব এবেতি প্রতিপাদ্যতে। বত্র ব্রাত্যো গচ্ছতি বিশ্বং জগদ্ বিশ্বে চ দেবাস্তত্র তমনুগচ্ছতি তস্মিনস্থিতে তিষ্ঠন্তি তস্মিংশ্চলতি তে চলন্তি। যদা স গচ্ছতি ...গচ্ছতীত্যাদি। .."]।

বৈদিক সমাজে ছিল ব্রহ্মবিদ্যার আদর, ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যার মহিমা, ঋষিত্বের মর্য্যাদা। আদর্শ জীবনই ছিল লক্ষ্য। বুদ্ধদেব হতে মনীষি রামমোহন পর্য্যন্ত, সকলেই 'আচার'কে 'ধর্ম্ম' ব'লে ভুল করেছেন। বৈদিক যুগে সে ভুল হয় নি। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভেদ বা বাঁধাবাধির কঠোরতা তখন ছিলনা। ধর্ম্মলাভ করতে হলে শিক্ষার দরকার। এক একটি শিক্ষা-প্রণালীর নাম ছিল 'সংস্কার', তাই 'সংস্কার' লাভান্তে উচ্চাধিকারীর যোগ্যতা স্বীকৃত হত। যাঁরা ঐ সব সংস্কারকে উপেক্ষা করতেন বা যাঁদের সংস্কার নেওয়া হত না, তাঁরাই ছিলেন অনার্য্য। যে সব আচার জীবনগতিকে প্রাণ দিতে সমর্থ সেগুলির সম্মান ছিল ও সেই গুলির নামই 'সদাচার'। ঐ সব 'সংস্কারের' উদ্দেশ্য ছিল, অনুষ্ঠান সহায়ে মানুষের অন্তর্নিহিত স্বভাব-পবিত্রতাকে উন্মেষ করা। তদ্বিপরীত অনুষ্ঠান বা আচারের নাম 'অপসংস্কার' বা 'কুসংস্কার'। যাই হোক্, সায়ন 'ব্রত' অর্থে, তপস্যা বা উপবাসাদি কৃচ্ছ্র পালন বলেছেন। জনসাধারণের মধ্যে যাঁরা উপনয়নাদি সংস্কারবিহীন ও বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডে অনধিকারী, তাঁরা ব্রতপরায়ণ হলে, 'ব্রাত্য' নামে পরিচিত হতেন। ষোল বৎসর বয়সের পরও যদি উপনয়ন না হয়, সে ব্যক্তি ও 'ব্রাত্য', পতিত ব্রাহ্মণ বা 'সাবিত্রী পতিতেরাও 'ব্রাত্য'। এই সব ব্যক্তিরা 'ব্রাত্যস্তোম' বিধি পালন করলে 'আর্য্যবিশ' ভুক্ত হতেন।

[অতি বৃহৎ পরিবারের বস্তি, গ্রাম, আদান প্রদান সংশ্লিষ্ট বহু গ্রামের সমাজ = 'বিশ' (ঋগ্বেদ ১।২৬।১০)। বহু বিশ = জনসমাজ। (উদ্বোধন – ১৩৪০, ভাদ্র দ্রঃ)]।

অনার্য্যের মধ্যে যাঁরা অনাচারী ও গুণ্ডা প্রকৃতির লোক ছিলেন, অথচ আর্য্যভাব ও আর্য্যসংস্কারে শ্রদ্ধাবান, উচ্চসাধনা গ্রহণেচ্ছু, তাঁদের জন্য একটু কঠোরতা ছিল; ঐ 'ব্রাত্যস্তোম'কে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ক'রে, তাঁদের জন্য এই নতুন 'ব্রাত্যস্তোম বিধি' প্রচলিত হয়। এইটি গ্রহণ করলে তাঁরাও 'আর্য্য' বলে গণ্য হতেন। ব্রাত্য গৃহপতি, এই একাহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন। এই যজ্ঞের দ্বারাই দলে দলে জনসাধারণ আর্য্যকৃষ্টিভুক্ত হতেন। এই উপায়ে সমগ্র উত্তর ভারতের অধিকাংশ 'আর্য্য' নামে পরিচিত হন। এই রকম ক'রে ভারতে আর্য্যাকরণ প্রথা

চলতে থাকে। কেবল যে উত্তর ভাবতে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়, তা মনে হয় না। ঋগ্বেদ সংহিতায় দেখা যায় যে সে সময়েও 'দক্ষিণাপদের' (দাক্ষিণাত্যের) পথ ছিল পশ্চিম উপকূল দিয়ে। ইহা যে মাত্র বাণিজ্য পথ ছিল তা নয়, উভয় দিক্ হতে ঐ পথ ছিল সৈন্যাভিযানের বর্ত্ম। আর্য্যের গতি যখন অতদূরেও ছিল, তখন যে আর্য্যকৃষ্টির প্রসার ঐ দিকে হয় নি, ইহা বলা যায় না।

'ব্রাত্যস্তোম' অনুষ্ঠানে, আর্য্যের অধিকার লাভ হত। এ অধিকার মানে আদর্শ জীবন গঠন প্রচেষ্টা। তন্ত্রেও দেখি 'পশু' সাধককে 'সংস্কার' নিয়ে উচ্চাধিকার লাভ করতে হয়। বৈদিক যুগে গুণকর্ম্মানুযায়ী যে জাতি বিভাগ ছিল, তাতে সম্ভব হত—একই বংশের মধ্যে এক ছেলে হয়ত ব্রাহ্মণ, অন্য ছেলে ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। 'ক্ষত্র' ও 'রাজন্য' এই দুই শব্দ পাওয়া যায় (অথর্ব্ববেদ ১৫ কা ২ অ। ১। ১১ ও অন্যান্য স্থান দ্রঃ)। ব্রহ্মবিদ্যার বিশেষ আলোচনা ছিল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে (ভারতধারা ১ম খণ্ডে পরশুরামের উক্তি দ্রঃ)। 'রাজন্যবন্ধু' বা 'ক্ষাত্রবন্ধু', সব সময়ে যে ব্রাত্যদের বোঝাত তা নয়। অরুণের পুত্র শ্বেতকেতু প্রবাহণ জৈবিলীর কাছে উপদেশ নিতে গিয়ে ফিরে এসে পিতাকে বলেন, "রাজন্যবন্ধু আমাকে যে পাঁচটি প্রশ্ন করেন, আমি তার একটিও উত্তর দিতে পারিনি।" তখন পিতাপুত্রে ঐ রাজার কাছে গেলেন। সেই দিনের পরের দিনে রাজা উত্তর দিলেন যে, ঐ বিদ্যা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের কাছে ছিল না ও সেই জন্যই সমস্ত লোক ক্ষত্রিয়ের শাসনাধীন।

["যথেয়ং প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্র সৈব প্রশাসন ভূদিতি…"। ঐ 'রাজন্যবন্ধু' নিজেকে 'ক্ষত্রিয়' বলে পরিচয় দিচ্ছেন। (ছান্দোগ্য ৫।৩।৫ ও ৫।৩।৭ দ্রঃ)। 'রাজন্য বন্ধু"=নিন্দিত ক্ষত্রিয় নয় (আপঃশ্রৌ ১।১৯।১ শতপথ ব্রা ১২ পাদটীকা দ্রঃ)।

ব্রহ্মবিদ্যা প্রবোধক পঞ্চাগ্নি বিদ্যাও ব্রাহ্মণের কাছে ছিল না। ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ তপস্বী সাধক জীবন যাপনের সঙ্গে, রাজা স্বভাবতই ব্রহ্মবিদ্যারত থাকতেন। ঋত্বিক বা ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের—ক্রিয়াকাণ্ড প্রচারের—ভাব নিয়ে থাকতেন। তখন জাত্যাভিমান, আভিজাত্যাভিমান, অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করবার আগ্রহ বেশী ছিল, তাই ব্রাহ্মণও সমিৎপাণি হ'য়ে

ক্ষত্রিয়ের কাছে শিক্ষার্থী হয়ে যাওয়াকে গৌরবই মনে করতেন। ব্রহ্মবিদ্যা (বেদতত্ত্ব) ছিল 'গুপ্তবিদ্যা'। 'গুপ্ত' বলতে সায়নও বুঝেছেন, 'যা আচার্য্য হৃদয়ে নিহিত'। যে বিদ্যা সাধনলব্ধ ও চরম অনুভূতিগম্য, সে বিদ্যা চিরদিনই 'গুরুমুখী' বা 'গুপ্তবিদ্যা' থাকবে। শাস্ত্র প'ড়ে বা শাস্ত্র আলোচনা মাত্র ক'রে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না, পাণ্ডিত্যের মূল্য তপস্যালব্ধ জ্ঞানের কাছে অতি অকিঞ্চিৎকর। ভারত, বরাবর দেখতে চেয়েছেন জীবন। তাই পরবর্ত্তী কালে ব্রহ্মবিদ্যা পুনরুদ্ধারের জন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নকেও তপস্যা ক'রে ঐ বিদ্যা লাভ করতে হয়েছিল। ব্রহ্মবিদ্যা 'গুপ্ত' বরাবরই। ব্রাত্যেরাও আর্য্যান্বিত হবার গুণে এই বিদ্যা লাভ করেছিলেন। অর্থ প্রতিপত্তি ও বুদ্ধিতে ব্রাত্যেরা কম ছিলেন না, তবুও কেন তাঁরা আর্য্যসংস্কার গ্রহণ করেন? উন্নততর জীবন লাভ করবার জন্যই কি তাঁরা স্বেচ্ছায় আর্য্য-পর্য্যায়ভুক্ত হন নি? উন্নততর জীবন, অতএব, প্রথমে আর্য্যের মধ্যেই ছিল। এই আর্য্যীকরণ ব্যাপারে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রশ্নই উঠতে পারেনা। সাধক জীবন, উন্নত জীবন—ধর্ম্মবিশ্বাস যার যাই থাকুক না কেন—ইহাই চাইতেন বেদপন্থী সমাজ। যে কোন স্থান থেকে রত্ন সংগ্রহ করাই ছিল উদ্দেশ্য; বিদ্যালাভে গোঁড়ামি করতে গেলেই ঠকতে হয়। উন্নত জীবন লাভ করবার জন্যই 'সংস্কার'—উন্নত জীবন লাভেচ্ছা বর্জ্জিত যে কোন 'সংস্কার', 'সংস্কারই' নয়। 'সংস্কার' উপায় মাত্র। হিন্দু, আদর্শ বিহীন অকর্ম্ম পরিণত 'সংস্কার' বিশ্বাস করেন না, তিনি চান প্রগতি—অগ্রগতি। একটা আদর্শকে হেয় ও ঘৃণ্য ব'লে ত্যাগ ক'রে অন্য আদর্শকে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র বলায় নিষ্ঠাহীনতারই পরিচয়, এরূপ বলারও কোন সার্থকতা নেই। যাঁরা আদর্শ জীবন দেখিয়ে জগৎকে ধন্য করেছেন, তাঁরা কোন ধর্ম্মবিশ্বাসকে ঘৃণা করেন নি। একই নানারূপে ব্যক্ত—একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি—ইহাই যখন আর্য্যধর্ম্মের বিশেষত্ব, তখন আর্য্যের আত্মীকরণ স্বাভাবিক, দলবৃদ্ধি তার ফল মাত্র। বলপ্রকাশে দলবৃদ্ধি আর্য্যেরা কখন করেন নি। যাঁরা সকল দেবতাকে, একেরই অভিব্যক্তি ব'লে জেনেছিলেন, যাঁরা সংকীর্ণতা ও ভেদমূলক সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেননি, তাঁরাই প্রথম উপনিষদ্ বক্তা। 'অদিতি', ঋগ্বেদের অতি প্রাচীন শব্দ ব'লে সকলেই স্বীকার করেন—'অদিতি', মানে 'অখণ্ড', আবার 'অদ্', ধাতু ভক্ষণার্থে

প্রযুক্ত, পুনঃ 'অদিতি' হচ্ছেন 'মাতা', যিনি সর্ব্বদেবতাময়ী, সর্ব্বদেবাত্মিকা হিরণ্যগর্ভ, প্রাণশক্তিরূপিণী মাতা (কঠ—২অ।১।৭।)—যাঁরা প্রথম সর্ব্বভূক অখণ্ড বিশ্বমাতার কল্পনা করেছিলেন, প্রথম বিশ্বশক্তিকে মাতৃরূপে পেয়েছিলেন, প্রথম জগৎকে নারীত্বের মর্য্যাদা দিয়েছিলেন, তাঁরাই প্রথম উপনিষদ্‌বক্তা, সাধনরাজ্যের সম্রাট্, আচার্য্য ও লোকগুরু। অদিতি পিতা, অদিতি মাতা, অদিতি পুত্র, অদিতি বিশ্বদেব, অদিতি পঞ্চলোক, অদিতি জন্ম ও জন্মের কারণ (ঋগ্বেদ, ১০ম ম।৮৯।১০)। সাধকের প্রার্থনা উঠেছে, "যেন আমরা কাণে কল্যাণকর বাক্যই শুনি, চক্ষে যেন কল্যাণরূপ দেখি, দৃঢ়িষ্ঠ শরীর যেন আমাদের হয় .." (ঐ ৯ সূ)। এই রকম 'আত্মন', 'ব্রহ্মণ', 'বাক্' প্রভৃতি কত শব্দ ও ভাব ভাণ্ডার আছে, যাঁরা এই সব শব্দের অর্থ বুঝেছিলেন, সাক্ষাৎকার লাভ করেছিছেলন, সম্পূর্ণ আত্মগোপন ক'রে—অজ্ঞাত থেকে—জগতকে ঐ ভাণ্ডার বিতরণ করেছিলেন, তাঁরাই উপনিষদ্-বক্তা, তাঁরাই নিঃস্বার্থ, তাঁরাই প্রেমিক! আজ ও সাধকসম্প্রদায় মধ্যে সিদ্ধ জীবন দ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যা রক্ষিত ও সেই বংশধরের দ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারিত হয়ে এসেছে। ব্রহ্মবিদ্যার ধারা এইরূপে প্রবাহিত হয়ে, ভারতের সর্ব্বত্র নতুন বল, নতুন আলোক, নতুন প্রাণ এনে দিতে সমর্থ হয়েছিল। ব্রাত্য মহিমা প্রবুদ্ধ জনশক্তিরই মহিমা। ব্রাত্য মহিমা সাধন রাজ্যেরই মহিমা, প্রশস্ত আর্য্যহৃদয়েরই মহিমা। ব্রাত্যদের মধ্যে অত্যুন্নত জীবন লাভ করা বা উপনিষদ্ বক্তা হওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নয়, কারণ, ব্রহ্মবিদ্যা আদর্শ জীবন সাপেক্ষ—কারোর এক চেটে নয়। ব্রাত্যেরাও যখন ভারতবাসী, তাঁরা যখন 'আর্য্য', তখন রক্ত হিসাবে বিচার নিরর্থক।

বাবিরুষ (বাবিলোনিয়া) সভ্যতার প্রবর্ত্তক প্রাচীন সুমেরীয় জাতির নাম অনেকে জানেন। তাঁরা ছিলেন সিন্ধুনদের উপত্যকাবাসী (ধোলোমতে খৃঃ পূঃ ৪০০০ বৎসর অন্ততঃ)। তাঁরা সেমিটিক নয়, ইহা ঠিক্। ঋগ্বেদ সংহিতায় (৩।৫৩।১৪) 'কীকট' দেশের নাম পাওয়া যায়। কীকট মগধের প্রাচীন নাম। নিরুক্তকারের সময় এই স্থান অনার্য্যভার প্রধান ছিল। অথর্ব্ববেদে অঙ্গ ও মগধের নাম পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আচার ভ্রষ্ট 'পুণ্ড্র' নামে একটি জাতির নাম পাওয়া যায়। এই জাতির প্রধান আড্ডা ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে (উত্তরবঙ্গে)। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ,

মগধ ও চেরবাসীরা 'পক্ষি' নামে অভিহিত হত। ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত একটি জাতি এখনও নিজেদের চের জাতির বংশধর বলে পরিচয় দেন। ধোলো পণ্ডিতদের মতে, এই জাতিতে দ্রবিড় রক্ত বহুল প্রমাণে আছে, আর দ্রাবিড় জাতিও 'আর্য্য' নয়। কিন্তু মনুসংহিতার প্রাচীন অংশ মতে, দ্রবিড়রা ছিলেন 'আর্য্যক্ষত্রিয়', বেদচর্চ্চা ত্যাগ করায় পতিত হন। বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র হতে জানা যায় যে, বঙ্গ, কলিঙ্গ সৌবীর আদি দেশে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। বাঙ্গালীদেরই নাম ছিল 'পক্ষি'। এই 'পক্ষি' জাতি যে অনার্য্য, তা কোথাও পাওয়া যায় না। ধোলো পণ্ডিতেরা বলেন যে, আর্য্যজাতি ভারতে প্রবেশ করবার পূর্ব্ব হতেই এই 'পক্ষি' জাতি বঙ্গোপসাগর হতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত যাতায়াত করতেন। অতএব, ইঁহারাও ভারতবাসী আর্য্য। পরবর্ত্তীকালে, দেবী ভাগবত ও পুরাণাদিতে দেখা যায় যে, এই জাতির ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা ও মেধা দেখে, সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে চীনা প্রাচীর জাপানের বোমায় বিস্ফারিত হওয়ায় ঐ দেওয়ালের গহ্বর হতে, রক্ষিত অবস্থায়, বৈদিক ভাষায় লিখিত প্রাচীন মনুসংহিতা (বৃদ্ধ মনুসংহিতা ?) বা তার অংশ পাওয়া যায়। (Sir Augustus Fitz George) স্যার অগাষ্টস্ জর্জ্জ সাহেব উক্ত পুঁথি এনে বৃটিশ মিউজামে রাখেন। পণ্ডিতদের মতে উক্ত মনুসংহিতার (পুঁথির) বয়স খৃঃ পূঃ ৮৫০০ বৎসর অন্ততঃ। (Amrita Bazar Patrika, অমৃত বাজার পত্রিকা, ২৪শে এপ্রেল ১৯৩৬ দ্রঃ। যথাস্থানে ইহা উদ্ধৃত করা যাবে)। যাঁরা মনে করেন যে আর্য্যেরা 'অধ্যাত্ম' 'অধ্যাত্ম' ক'রে, এক ভাবলোক সৃজন ক'রে ও তার মধ্যে বাস ক'রে, তাঁদের জীবনকে আড়ষ্ট করে ফেলেছেন তাঁদের এসব কথা চিন্তা করতে বলি। কেবল ছুটোপাটি করাই জীবনের চিহ্ন নয়। বেদে যেমন 'ঋষি যোদ্ধা আছেন, তেমনি মুদ ঋষির পত্নীর মত "সহস্র যুদ্ধে জয়িনী" অদ্ভুতকর্ম্মা নারীও দেখতে পাওয়া যায় (ঋক্ ৮।অ।৫ অ।১০।১০২ দ্রঃ)। ঐ ঋগ্বেদেই এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যেখানে নারীযোদ্ধার পা কেটে লোহার পা ক'রে দেওয়া হয়।

বৈদিকযুগে দাক্ষিণাত্যে আর্য্যকৃষ্টির প্রসার বন্ধ হয়ে যায় নি। রামচন্দ্রের পূর্ব্বেও আরো দুজনের নাম পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে যান ঋষি অগস্ত্য। তাঁর প্রভাব আজও সমস্ত দাক্ষিণাত্যে বর্ত্তমান। কেবল তাই নয়,

নিকটস্থ ভাবতমহাসাগবেব দ্বীপপুঞ্জেও তাঁব প্রভাব বিস্তৃত হয়। তাব নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান। যখন বামচন্দ্রের সঙ্গে অগস্ত্যেব দেখা হয়, তিনি বামচন্দ্রকে বলেছিলেন যে ৫০০ যোজন ব্যাপি সমস্ত দণ্ডকাবণ্যটি, দণ্ডক নামে একজন বামচন্দ্রেবই পূর্ব্বপুরুষ এসে অযোধ্যা-রাজশক্তিব অন্তর্গত কবেন, কিন্তু তাব পব হতে ঐ স্থানেব উপর কাবোব দৃষ্টি নেই। এই কথায়, সেই অবধি দণ্ডকাবণ্যেব উপব বামচন্দ্রেব নজব থাকে। অগস্ত্য ঋষি আগমনেব পব, এই দণ্ডকারণ্যে, স্থানে স্থানে, ঋষিদেব আশ্রম স্থাপিত হয়। দণ্ডকাবণ্য তখন লোকেব বসতিশূন্য ছিল না। বামচন্দ্রেব চবিত্র-প্রভাবেই যে সমস্ত দাক্ষিণাত্য আর্য্যকৃষ্টিভুক্ত হয়ে যায়, তা বামায়ণ হতেই জানা যায়। আর্য্যেব আত্মীকবণ ব্যাপাব চরিত্রবলেই হয়, পশুবলে নয়।

[দণ্ডকারণ্য :—চিত্রকূট পর্ব্বত হ তে তামিল দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগ। (ভারতধারা—২য় খণ্ড—বিবিধ প্রসঙ্গ দ্রঃ। এই সঙ্গে জনস্থান, পঞ্চবটী ও চিত্রকূট দ্রঃ)]।

একমাত্র 'ব্রাত্যস্তোমেব' দ্বাবাই যে আর্য্যেব আত্মীকবণ নীতিব প্রয়োগ হযেছিল, তা নয়। কালে 'ব্রাত্যস্তোম' চাপা পড়ে যায়। ধর্ম্মবিশ্বাসে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান ও জীবনে স্ব স্ব আদর্শ ফুটিয়ে তোলায় সকলকে সাহায্য কবাই ছিল আত্মীকবণ নীতি। এই জন্য ভাবতে অসংখ্য সম্প্রদায়েব অভ্যুত্থানে বক্তপাত হয় নি। মনু তাই ভাবতকে "দেবনির্ম্মিত" দেশ বলেছেন ও বিষ্ণুপুবাণ মতে "সহস্র জন্মান্তে মুমুক্ষুব ভাবতে জন্মাতে হবে।" আধ্যাত্মিক জীবন লাভ ক'বে কর্ম্মক্ষয় কবাই ছিল সকল সম্প্রদায়েব লক্ষ্য, তাই কর্ম্মক্ষয়েব স্থান ভাবতেব মত আব কোথায়? ভোগক্ষয়েব নানা উপায়েব মধ্যে—পুণ্য অর্জ্জনেব মধ্যে—একটি উপায়, তীর্থভ্রমণ। প্রত্যেক সম্প্রদায়েব তীর্থ ভাবতে আছে, আবাব সাধাবণ তীর্থও আছে। সাধাবণ সব তীর্থ ভ্রমণ কবলেই ভাবত পবিক্রমা হয—অধ্যাত্মময় বিরাট দেহকে প্রদক্ষিণ কবা হয়। আমবা দুটি জিনিষ এখানে বুঝতে পাবি; (১) হিন্দুব দেশহিতৈষিণা বা স্বদেশপ্রীতি চিণ্ময় সত্তায় স্থাপিত ছিল, সে হিতৈষিণা সত্তাধাব স্পর্শ কবেছিল, আব, ভক্তহৃদয়েব মত, ভারতভূমি সেই চিণ্ময় বা চিণ্ময়ীব লীলাস্থল; অতএব, হিন্দুব স্বদেশপ্রীতি নিছক ভৌগলিক জ্ঞানেব উপব স্থাপিত নয়। (২) ভাবতেব

বাইবে হিন্দুর তীর্থ নেই। ঋগ্বেদেও যে পবিত্র নদীসমূহের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা দেখা যায়, তা সমস্ত ভাবতব্যাপি। প্রথমটিব ভাব এখনও ভাবতব্যাপ্ত। ভাবতে ধর্ম্মেব নামে জাতি গঠিত হয়েছে, স্থানবিশেষেব বা দেশেব নামে নয়—বাঙ্গালী, বিহাবী প্রভৃতি নাম ভাষা ও প্রাদেশিক আচাবেব পবিচয় মাত্র। এই ধর্ম্মেব নামে জাতিগঠন এশিয়াব্যাপী হযেছে। আর্য্যকৃষ্টিব আত্মীকবণ প্রয়াস এই দিক্ দিয়েও প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন সংস্কৃতিব অন্তর্গত হলেও, আজও ভাবতে ধর্ম্মেবই নামে জাতিব পবিচয় হয। আর্য্যেবা যদি ভাবতেব বাইবে হতেই কখন এসে থাকেন, সে সব স্থানে তাঁদেব তীর্থ নেই কেন? ঋগ্বেদাদিতেও ঐ সব বাইবেব দেশে কোন পবিত্র স্থানেব বা নদীব নাম পর্য্যন্ত নেই কেন?

[থিওসফিকাল সোসাইটি (Theosophical Society) দেখান্ যে সপ্তলদ্বীপে, অর্থাৎ শ্বেতদ্বীপে আর্য্যদেব আশ্রম ছিল। সেই বকম কথিত আছে, মক্কায় হিন্দুব প্রাচীন মন্দির এখনও আছে। এই গুলি তীর্থ নয়। এই গুলি, আর্য্য কৃষ্টিব প্রসাবই প্রমাণ করে]।

ভাবত 'পুণ্যভূমি'রূপে পবিচিত হলেও, দেখা যায, এক এক সময়ে এক একটি প্রদেশকে 'নিষিদ্ধ' বলা হযেছে, বলা হযেছে যে ধার্ম্মিক লোকদেব বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে যাওযা ছাডা সে সব দেশে বাস কবা বা শ্রাদ্ধাদি কবা উচিত নয়। আজ যে স্থান নিষিদ্ধ, অন্য সমযে সেই স্থানও প্রসিদ্ধ। অনাচাবী ও বেদ-ধর্ম্ম বহির্ভূত স্থানগুলিব এই ছিল শাস্তি। 'ম্লেচ্ছ দেশ' মানে ছিল, বেদ-ধর্ম্ম বহির্ভূত, চতুবাশ্রম বর্জ্জিত স্থান। মিশ্রাচাবী, কদাচাবী ও অনাচাবীদেব বলা হত 'ম্লেচ্ছ', 'যবন' ইত্যাদি। উত্থান ও পতন, উন্নতি ও অবনতি, ব্যক্তি-জীবনেব মত সমাজ-জীবনেও আছে। যে 'ব্রাত্য' নাম এক সময়ে উন্নত জীবনেব পবিচয় ছিল, তা অন্য সমযে 'যবন', 'ম্লেচ্ছ', 'অনার্য্য', 'অসুব' ইত্যাদি শব্দগুলিব মত তিবস্কাবসূচক কথায পবিণত হয়। যতদিন জাতিভেদ অর্থাৎ জাতিব মধ্যে ভেদবুদ্ধি দেখা দেয় নি, যতদিন অধিকাববাদেব বৃথা আস্ফালন সমাজে প্রবেশ কবেনি, যতদিন—ঐ জাতীয অভিসম্পাৎ—পতিত পৌবহিত্যকে যেন তেন প্রকাবেণ বজায় বাখবাব কৌশলকল্প—ছুৎমার্গ, ধর্ম্মেব আববণে সমাজকে গ্রাস কবে নি, ততদিন ঐ 'ব্রাত্য' উপাধি ছিল মর্য্যাদাব চিহ্ন।

মুসলমানযুগেও 'ব্রাত্য' উপাধি অনেকেব ছিল, এখনও লোপ পায নি। এবাব গুটিকতক কথা বলে অত্রকাব বক্তব্য শেষ কববো। আমবা দেখতে পাই যে, শ্রীশংকবেব সময় দলে দলে আর্য্যেতর জাতির আর্য্যীকবণ ব্যাপাব সংঘটিত হয। আজ তাঁবা হিন্দুসমাজান্তর্গত, কিন্তু কোন ধর্ম্ম-বিশ্বাসেব শত্রু নন, কোন ধর্ম্মবিশ্বাসকে হীনচক্ষে দেখেন না। তাবপব আর্য্যীকবণ নীতি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। বর্ত্তমানে তাকে পুনরুজ্জীবিত কববাব চেষ্টা হচ্ছে। ইহা সুখেব কথা। কিন্তু, দলপুষ্টিব মতলব ও নানাবকম কৌশলে যেমন 'ব্রাত্যেবা'ও উপনিষদ বক্তা হন নি—হওযা অসম্ভব যা—তেমনি অপব ধর্ম্মেব উপব বিদ্বেষভাব নিয়ে কোন সংস্কাবকার্য্য হয় না। চাই আর্য্যীকবণ, ধর্ম্মান্তব গ্রহণ নয। ইহাই জগৎ আজ চায়। যে সব যাযগায় শিক্ষাব অভাব, সে সব স্থানে সদাচাবেব প্রবর্ত্তন চাই। সদাচাবেই শিক্ষাব সংস্কাব সহজ হয়। যেখানে দাবিদ্র্য সেখানে দলপুষ্টিব মতলব ছেডে দিয়ে দুঃখ নিবাবণেব উপায দেখাতে হবে, সেবাধর্ম্ম গ্রহণ ক'বে অভাবেব বিরুদ্ধে দাবিদ্র্যেব সঙ্গে লডতে হবে। শিক্ষা, চবিত্রবল, হৃদয়েব প্রসাবতা না দেখে দলপুষ্টিতে আবো বিশৃঙ্খলা আসতে পাবে। অবশ্য বিরুদ্ধশক্তিকে বোধ কবতে হবে, কিন্তু বক্তপাত দ্বাবা নয়। এই যে বলপূর্ব্বক অপবেব দ্বাবা ধর্ম্মান্তবগ্রহণে ব্যক্তি বাধ্য হয়, তাব মূল কাবণ অধিকাংশ স্থানে ঐ ছুৎমার্গ—তথাকথিত স্পর্শদোষ অর্থাৎ ঐ স্পর্শদোষেব জন্যই ব্যক্তিকে সমাজত্যাগী হয়ে থাকতে হয়। তাব পব নাবী-সমস্যা। এসব সমস্যা সমাজকে শীঘ্রই সমাধান কবতে হবে। দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা ও ভণ্ডামিকে আব প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না, ইহা প্রাণে প্রাণে সর্ব্বক্ষেত্রে সবাই বুঝছেন। ব্রহ্মচর্য্য পালন ভিন্ন হিন্দুব কোন সংস্কাবেবই মূল্য নেই। অতএব, সংস্কাব-প্রার্থীদেব মধ্যেও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাব প্রচলন আগে হওয়া দবকাব। নাবীবক্ষা-কল্পে সর্ব্বজাতিব—পুরুষ ও নাবীব—একত্র মিলিত হওয়াব জন্য চেষ্টা দবকাব। নাবীব অপমান, যে কোন সভ্যতাব অপমান, এই ভাব দৃঢ হওয়া উচিত।

বৈদিক ভাব প্রসার—ভারতের বাহিরে

সাম্প্রদায়িক বিরোধের কথা পূর্ব্বে বলেছি। শ্রুতিতে ইন্দ্র-বিরোচনের গল্প আছে। একই গুরুর কাছে, একই রকম শিক্ষা পেয়ে, ইন্দ্র হলেন আত্মবিৎ, আর বিরোচন দেহকেই 'আত্মা' মনে করলেন। এই বিরোধের ফলস্বরূপ বিরোচনের দল নতুন সম্প্রদায় স্থাপন করলেন ও সাম্প্রদায়িকতার ঈর্ষায় বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। ইন্দ্রপূজা ও সোমযাগ বহু প্রাচীন, এই উভয়ের সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ। আর্য্যদের মধ্যেই একদল ইন্দ্র-বিরোধী হয়ে দাঁড়ান, কিন্তু সোম ভক্ত থাকেন। উভয়েই গোড়ায় ছিলেন সপ্ত-সিন্ধুবাসী। প্রথমে আর্য্যদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিরা ঐ বিরোধ মিটমাট করতে অগ্রসর হন। নতুন দলের গোঁ ও গোঁড়ামিতে সব মিটমাটের ব্যবস্থা পণ্ড হয়। ইন্দ্র-বিরোধী দলকে ভারত ছেড়ে যেতে হয়। তাঁরা 'আর্চেসিয়া' (পারস্য) বা ইরাণে চলে যান। সেখানে সোম হলেন 'হাওম', মিত্র হলেন 'মিথ্র' ইত্যাদি। ভারতে সোম, "যজ্ঞস্য আত্মা" (ঋগ্বেদ ৯।২।১০, ৬, ৮), বেদের ত্বষ্টা বা অগ্নি, আদিত্য ও মিত্র হলেন ইরাণীদের 'ত্বষ্ট্র', 'অহুরমজদা' (অসুরমঘবা = অহুরমজুরা) ও 'মিথ্র'। ঋগ্বেদে ইন্দ্র হচ্ছেন 'আদিত্য'—অগ্নি অররবী, ত্বষ্টা বা অগ্নি, নরলোকের বা পৃথিবীর। জরতত্বষ্ট্ হলেন জরতুষ্ট্র (জোরোয়াষ্টার। নতুন দলের 'অহুরমজদার' সংক্ষেপ নাম হল 'অরমাজদ্', 'আহিরিম্যান' হলেন পাপ দেবতা ইত্যাদি)।

কয়েস সাহেব তাঁর লেক্‌চারে বলেছেন যে, (J. C. Coyace, B. A. L. L. B.—The Gatha Society Publication) জরথুষ্ট্রধর্ম্মের প্রথম অবস্থায়, ভগবানের কাছে দুটি প্রার্থনীয় বস্তু ছিল, (১) আত্মার অমরত্ব অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মার পরলোকে স্থিতি, তাঁদের মতে, সৎকর্ম্মের পরিমাণ বেশী হলে অসৎ কর্ম্মের প্রভাব ক'মে যায়। (২) স্বাস্থ্য। এ দুটি ছাড়া, শেষের দিনে বিচারের কথা আছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারত কখন ধর্ম্মবিশ্বাস নিয়ে বিবাদ করেন নি। জরথুষ্ট্রবাদীদের 'ধর্ম্মযুদ্ধ' (যে নাম নতুনদলই দিয়েছিলেন) সম্বন্ধে উক্ত সাহেব মহোদয় কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করতে বলেছেন, (১) উহা মতবাদের বা ধর্ম্মবিশ্বাসের ঝগড়া নয়, কিন্তু ঐ বিবাদ সভ্যতার দুটি ধারা নিয়ে, (২) উহা বহুকাল

হতে চলে আসছিল। এই বিরোধ জোরোয়াষ্টার (Zoroaster) আরম্ভ করেন নি, কিন্তু তাঁর প্রভাবে—আত্মশক্তিবলে—তিনি প্রাচীন ধারা উল্টে দিয়েছিলেন। (৩) প্রতিদ্বন্দ্বীদল—অহুরাবিশ্বাসী ও দেব-বিশ্বাসীরা—প্রতিবেশী ছিলেন, বস্তুতঃ তাঁদের মধ্যে অন্তর্মিশ্রণ ছিল ("indeed they were intermingled)"। জরথুষ্ট্রের নির্দ্দেশে, কতকগুলি সর্ত্তে তুরানীদের এই নব ধর্ম্ম দেওয়া হত। ইরাণীরা "স" স্থানে "হ" বলতেন—ওদেশে বাস করায় তাঁদের উচ্চারণ-বৈকল্য দেখা দেয়। জোরোয়াষ্টার নামে একাধিক মহাজনের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে উদিত হন ও জরথুষ্ট্র ধর্ম্মের পুষ্টি সাধন করেন। তাঁদের বিস্তৃত বিবরণ এখানে নিস্প্রয়োজন, তবে একজন জরথুষ্ট্রের নাম পাওয়া যায় ইরাণীদের জারদুস্ত (Zardusht) গ্রন্থে। তাতে আছে যে ঈশ্বর জরথুষ্ট্রকে বলছেন, "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, 'ব্যাস' নামে একজন ভারত হতে এসে যখন তোমাকে প্রশ্ন করবেন, 'ঈশ্বর এক সঙ্গে সব সৃষ্টি করেন নি কেন, তখন তুমি উত্তর দিও,—ভগবানের প্রথম সৃষ্টি—'শক্তি'—পরে সেই শক্তি সহায়েই সমস্ত সৃষ্টি হয়েছে।' ঐ গ্রন্থের টিপ্পনিতে আছে যে, বালখ্ নগরে গুস্তাস্প (Gustasp) নামে রাজার সঙ্গে ব্যাস দেখা করেন। রাজা দেশের সমস্ত জ্ঞানীলোককে আহ্বান করেন, জরথুষ্ট্রও আসেন। গুস্তাস্প রাজার সময়েই জরথুষ্ট্র ধর্ম্ম রাষ্ট্রধর্ম্ম (State Religion) বলে গৃহীত হয়। এই ব্যাসের আগমনে জরথুষ্ট্র ধর্ম্মে শক্তিবাদ দেখা দেয়, শক্তিবাদ গৃহীত হলেও, ঐ শক্তিবাদ ভারতের ভাবে অনুপ্রাণীত হতে পারে নি—তাহা ঐ দেশের ভাবেই স্বীকৃত হয়। গ্রীকরা গুস্তাস্পকে বলত Hystaspes, আর, পণ্ডিতদের মতে, তার সময় খৃঃ পূঃ ৫০০ বর্ষ। (প্রাচীন বাহ্লিক= ব্যাক্‌ট্রিয়া)। (৺দুর্গাদাস লাহিড়ীর পৃথিবীর ইতিহাস—ভারতবর্ষ দ্রঃ)।

ইরাণে চলে যাবার বহু পরে জরথুষ্ট্রের জন্ম হয়। ইহা তাঁর বংশলতা হতে জানতে পারা যায়। তিনি তিনবার বিবাহ করেন ও অনেকগুলি ছেলেমেয়ে তাঁর হয়। বাইবেলের Paradise শব্দটি এসেছে আবেস্তার Paridēza হতে, Cyrus এর নাম অন্ততঃ ১৪ বার বাইবেলের Exita Books এ পাওয়া যায়। Darius একাধিক পারস্য রাজার নাম; এই Darius এর নামও অন্ততঃ ১৩বার আছে, ঐ রকম Xerxes as Ahsuerus

ও Artaxerxes নামও ৭ বাব বা ঐ বকম আছে। জবথুষ্ট্ৰেব জন্মস্থান উরুমিয়া (Urumiah), সীবিয়া ও আববা ভাষায় লিখিত এই নাম নিয়ে বেশ বাদ বিতণ্ডা আছে। তাঁব উপনযন (পৈতা) ও হযেছিল। জবথুষ্ট্র নামে অনেক সংস্কাবক ছিলেন।

[জরথুষ্ট্র বাদে যুগ বিভাগ ছিল—এক্ এক্ যুগ তিন হাজার বৎসবে বিভক্ত অর্থাৎ, চাবিযুগ ১২০০০ বৎসব ("Farvarshi")। গ্রীক পণ্ডিতদের মতে. জরথুষ্ট্র খৃঃ পূঃ ৬০০০ বর্ষে ছিলেন, বড প্লিনি (Pliny the Elder) বলেন খৃষ্টাব্দ ২৩—৭, Endoxud of Cudus, খৃঃ পূঃ ৩৬৮, Aristotle (এরিষ্টট্ল)—খৃঃ পূঃ ৩৫০ এবং Hermippus বলেন খৃঃ পূঃ ২৫০, হার্মিপ্পাস লিখেছেন যে প্লেটোব মৃত্যুর ৬০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ট্রোজান মহাযুদ্ধেব (Trojan War এব) পাঁচ হাজাব বর্ষ পূর্ব্বে জরথুষ্ট্র বর্ত্তমান ছিলেন। Lactantius বলেন যে, জরথুষ্ট্রেব বন্ধু Hystaspes, বোম সম্রাজ্য গঠন হবাব বহু পূর্ব্বে মিডিয়ার (Media ব) বাজা ছিলেন। স্থইডাস (দশম শতাব্দী, 10th century A D.) বলেন যে দুজন জোরোয়াষ্টাব ছিলেন, একজন ট্রোজান মহাযুদ্ধের ৫ হাজার বৎসব পূর্ব্বেব লোক, আব একজন নিনাসেব (Ninusএর) সময়ে জ্যোতির্ব্বিদ। Georgius Syrcellus বলেন যে, জরথুষ্ট্র বাবিলন দেশস্থ রাজা ছিলেন। একজন জবথুষ্ট্র ব্যাক্ট্রিয়ার রাজা ও যাদুবিদ্যায় পাবদর্শী ছিলেন]।

এই বকম প্রাচীন পণ্ডিতেবা অনেকে জবথুষ্ট্রেব নাম কবেছেন। উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিববণ হতে বোঝা যায যে, পবোক্ষভাবে ভাবতীয় ভাব কতদূব বিস্তৃতি লাভ কবেছিল। ধোলো পণ্ডিতেবা জবথুষ্ট্রেব সময় বলেন, খৃঃ পূঃ ৮০০ বর্ষ, কোন কোন পণ্ডিতেব মতে জবথুষ্ট্র ও বিশতাস্প খৃঃ পূঃ ৬৬০ বর্ষে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁবা সব প্রাচীন মত উডিয়ে দিয়ে একটি মতই স্থাপন কবেছেন। সময় কমিযে দেখাতে তাঁ'দব কৃতিত্ব আছে, যাতে সবই বাইবেলেব সৃষ্টি যুগেব অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩।৪০০০ বৎসব পবে হয। আধুনিক পণ্ডিতেবা অনেক পূর্ব্বমত উল্টে দিচ্ছেন, কিন্তু ভাবতে সাধাবণ সমাজে আজও পূর্ব্বমত বেশ চলেছে।

মিলস্ সাহেব বলেন, (A story of the Five Zarathrustian Gathas by Lawrence Mills D. D. দ্রঃ), যে, পববর্ত্তী যাহুদি (Jewish) ও খৃষ্টমতবাদেব উপব জবথুষ্ট্র ধর্ম্ম অসীম প্রভাব বিস্তাব কবেছেন।

তিনি আরো দেখিয়েছেন Sadduceism, 'স্যাডুসিবাদ' এর স্বাধীন চিন্তা হতেই ক্যাথলিক মতবাদের রক্ষণশীলতা এসেছে; জরথুষ্ট্রবাদ বা পারসীকবাদ (Parsism) য়াহুদি মতবাদের (Judaismএর) পরিবর্ত্তিত নাম 'ফারিসাইবাদ' (Pharisaism)। মিল (Mills) সাহেব তাঁর Zarathustra and the Greeks গ্রন্থে বলেন যে ঈজিপ্ট হতে বহুদূরে অবস্থিত ভারতের 'বেদ'এর সঙ্গে 'অবেস্তার' সাদৃশ্য বর্ত্তমান, এমন কি উভয়ে একই প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়, যথা 'আদিত্য' ও তাঁর মাতা 'অদিতি'—এই দুই শব্দ। 'অদিতি'র আদি অর্থ অখণ্ডত্ব, অসীমত্ব, অপ্রতিহত শক্তি ("Unboundedness, Infinitude, unfettered Power"), এই রকম 'ভাগ' (সংস্কৃত ভাগ্য) শব্দটির মনে 'সৌভাগ্য', ঐ অখণ্ড ও অসীম সর্ব্ববন্ধনমুক্ত স্বাধীন শক্তিকে 'মাতা' বলা হয়েছে। সাহেবের মতে, ইহাকে ফাইলোবাদের পুনরভ্যুদয় না ব'লে বৈদিক মতের পুনরুক্তি বলাই ঠিক্। তাঁর মতে, বেদের 'ঋত',—অবেস্তার 'আশা'—একটি যথার্থ ইণ্ডো-ইরাণী 'লোগাস' ('a true Indo-Iranian Logos')—শব্দটি বৈদিক ঋকে প্রায় তিনশত বার ব্যবহার হয়েছে, ফাইলো যখন ঈজিপ্টে বাস করেন, ঐ 'লোগাস'টি তা অপেক্ষা অন্ততঃ ৫০০ বা ৮০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। 'ক্ষাত্র' শব্দটিও—বেদেও 'ক্ষাত্র'—প্রায় ৪৪ বার ব্যবহার হয়েছে, এই রকম বহু দৃষ্টান্ত সাহেব দিয়েছেন। বৈদিক ঋষি "বহুমনঃ" ই, অবেস্তায় 'বহুমানা' হয়েছেন। সাহেব বলছেন যে, ফাইলোর যথার্থ গুরু প্লেটো, ভারতীয়দের ও ইরাণীদের সম্বন্ধ ভাল ক'রে জেনে তাঁর মতবাদ গঠন করেন। সাহেব স্পষ্ট স্বীকার করেছেন যে, যে সময় ভারতীয় ঋষির মুখে সামগান গীত হয়, তখন গ্রীসে বা ঈজিপ্টে কোথাও কোন বিদ্যালয় পর্য্যন্ত ছিল না! অবেস্তা, য়াহুদি-গ্রীকের উপর ত নির্ভর করেই না, বরং ফাইলোই অবেস্তার কাছে ঋণী, এমন কি এই কারণে (পারসিক সভ্যতার জন্য) বাবিরুর সভ্যতার গ্রাস হতে মোদের সভ্যতা রক্ষা পেয়েছে। ("saved our own from an absorption in the Babylonian")।

সাহেব তাঁর অপর একটি গ্রন্থে ("Zaroastra, Philo, the Achæmendes and Israel") বলেন যে যদিও বিভিন্ন দেশে, আবেস্তায়, এমন কি বৈদিক লিপিতে সেমিটিক প্রভাব বর্ত্তমান বলা হয়, ইহা

নিশ্চয় যে ইবানী ও যাহুদি শিক্ষাব, কর্ষণাব ও বংশপবম্পবাগত কিম্বদন্তির উৎপত্তিস্থল এক। এই বকম, অক্ষবেব বিষয় ছেড়ে দিযে পহ্লবী ভাষাতে সেমিতিক প্রভাবেব কথা বলা হলে, আমাদেব শোনান হয় যে সেখানে পদগুলিই অক্ষব—পৃথক পৃথক অক্ষব নয়। সুদূব অতীতে সেমিতিক চিহ্ন বা সংকেত ব্যবহাব দ্বাবাই ঐ সব জাতিব মধ্যে আদান প্রদান বোঝা যায়, পবে নব্য পাবসিকদেব (New Persian) পদগুলিতে সেমিতিক প্রভাব বর্ত্তমান। সাহেব এইখানে বলছেন যে, যদি ঐ মতটি ছেড়ে দেওয়া যায়, আবেস্তাব মধ্যে কোথায় সেমিতিক গন্ধ? আবেস্তায় সেমিতিক ভাষাব একটি শব্দও নেই, কিন্তু বাইবেলময় ঝুড়ি ঝুড়ি পাবসীক ভাষাব শব্দ বযেছে। সাহেবেব মতে 'আক্কাদ' ও 'সুমেব' জাতিদ্বয—যাদেব আদিম ভাষায আর্য্য শব্দেব অত্যন্ত প্রয়োগ আছে, তাবা কাবিকুযেব চেযে, অন্ততঃ কিছু প্রাচীন বা পূর্ব্ববর্ত্তী।

["নিয়ত বর্দ্ধমান সুমেব জাতিবই এক ভাগ ক্রমে বাসের জন্য 'সুজলা সুফলা' দেশ বিশেষেব অন্বেষণে নির্গত হইয়া স্ত্রী-পুং চিহ্নেব উপাসনাদি লইয়া ভারতে প্রবেশ কবিল। অনেক কাল সমৃদ্ধিশালী হইয়া ভাবতে বাসের পব উহাবই এক শাখা আবাব মালাবাব উপকূল হইতে নৌযানে মিসরে যাইয়া নীলনদী তীরে অপব এক বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন কবিল"। (ভাবতে শক্তিপূজা—স্বামী সাবদানন্দ)]।

এই সুমেববাই বাবিকষকে কৃষিবিদ্যা শেখান। আসুবীয় জাতিবাও এই সুমেবদেব কাছে তাদেব সভ্যতাব জন্য ঋণী। এই সুমেব জাতিব ধর্ম্ম ও পুবাণ (গল্পগাথা) য়াহুদিবা তাঁদেব দেশে নিয়ে যান। ঐ দ্রবিড ও পণিদেব মিশ্রণে 'খলদে' (Chaldeans) জাতিব উদ্ভব হয়। যাইহোক, সাহেব আবো কযেকটি কথা ব'লে সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছেন। একজন সম্রাটেব নাম 'পতেশি' (Pateshi), অবেস্তায় হযেছে 'পয়েতিশ' (Pa(i)tish)। এমন কি, বাবিরুযেব গোডাব সৃষ্টিতত্বে ও সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্রেব মধ্যে যে 'অপসু' শব্দটি বয়েছে, সেটি সংস্কৃত 'অপ', বাইবেলেব 'Taimet' (তাইমেত) মানে 'তমস' বা অন্ধকাব, ইবাণীতে অর্থ—পীডাদাযক, 'সমস্ত পীডাব কাবণ' (Torment), আবাব, অবেস্তাব 'Adar' শব্দটি বাইবেলে হুবহু উদ্ধৃত হযেছে। ইত্যাদি।

সেমিতিক ভাষাব কোন্ গঠন প্রণালীর ছায়া বৈদিক লিপিতে ধোলো

পণ্ডিত দেখতে পান ? প্রমাণ কোথায় ? ভাবত হতে কি ভাষা বা লিপি যেতে পাবে না ? ভাবত কি পবেও অনেক জাতিকে ভাষা দান কবেন নি ?, প্রমাণ কোন্ দিকে বেশী ? ভাষা, স্বস্থান ভ্রষ্ট হলে, লিপিব ভঙ্গী কি অন্যরূপ ধাবণ কবতে পাবে না ? তার প্রমাণ কি আজও দেখা যায না ? 'ব্রাহ্মী ভাষাকে'ও সেমিতিক বলা হত পূর্ব্বে। এখন প্রমাণ হয়েছে যে উহা ভাবতেব নিজস্ব। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—নবসংস্কবণ দ্রঃ)—বায বাহাদুব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন)।

আমরা দেখেছি যে "হে অবয়ঃ' স্থানে 'হে অলয়' ও 'হেলয' উচ্চাবণ কবায় যেমন 'হেলয়' শব্দটিকে 'ম্লেচ্ছ' বা ম্লেচ্ছ উচ্চাবণ ভঙ্গী বলা হয়েছিল, সেই বকম ইবাণীবা 'অসুব' শব্দটিকে 'অহুব' উচ্চাবণ কবায এবং তাঁবা আর্য্য বিবোধী হওয়ায়, অসুব শব্দটিব অর্থ, ভাবতে বোঝাতে আবম্ভ কবে 'দেব-শত্রু'। জবথুষ্ট্র ধর্ম্মেব প্রাচীন গাথায 'অহুবা মজদা'='একমাত্র ঈশ্বব বয়েছেন দুজন প্রভু' ('Payu'); এই দুই প্রভুই দুবকমেব স্রষ্টা (Yasna XIX, 9)। পবে 'অব মাজাদ' ও 'আহিবীমান্'কে পৃথক সত্বা মেনে নিয়ে ঐ দুজনেব বিরোধ বর্ণিত হল—একজন হলেন 'ভাল দেবতা' (Good God), আব একজন হলেন 'মন্দ দেবতা' (Bad God)='স্পেণ্টামৈন্যু' ও 'আংগ্রামৈন্যু'। সেমিতিকদেব মধ্যে তাঁবা হলেন 'God and Satan', ভগবান এবং শযতান। জরথুষ্ট্র দেখেছিলেন যে জগৎ উৎপত্তিব দুটি কাবণ আছে, কিন্তু ঐ দুই সত্বা বযেছে 'একেবই' মধ্যে। বেদে, ব্রহ্মেব সগুণ ও নির্গুণ ভাবের কথা আছে, কিন্তু উহা 'একেবই' দুভাবে সাধনাব কথা, সাধকেব রুচি ও মানস অধিকাব হিসাবে—পৃথক সত্বা নয়। মৈত্রায়ণ উপনিষদ্ (৬।২২) এ দেখি ব্রহ্মকে দুভাবে ধ্যান করবাব উপদেশ আছে। ভাবতে, ঐ বকম ভাবেব উপদেশে চিন্তার পার্থক্য থাকলেও, সাধন ক্ষেত্রে অভেদ ও অভিন্ন ভাবে ধ্যেয়। ইবাণীয় 'লোগাস'বাদেব ('বাক্'এব) মূল পাওয়া যায় মৈত্রায়ণেব ঐ উপদেশে, যা পবে আবেস্তা থেকে ফাইলো পান ও Alexandrian School এব 'লোগাস' হয়—ঐ দেশেব সংস্কাবানুযায়ী। ভাবতেব সংস্পর্শ ফলে ইহা সম্ভব হয় প্রথম ইবাণে, পবে, অন্যত্র। ইবাণীবা 'আস্থবীয়দেব' (Assyriansদেব) ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসেছিলেন। জবথুষ্ট্রবাদীদেব 'য়াষ্ট' (Yasts) গ্রন্থেব সাজানোর রীতি অবিকল শিবোজাব (Shirozaব) মত। মাসকে ৩০ দিনে ভাগ ক'বে, প্রত্যেক দিন এক একটি

দেবতার নামে নামকরণটি সেমিতিক জাতি হতেই গৃহীত (Sacred Books of the East—The Zend Avesta, Part II-Max Muller দ্রঃ)। জরথুষ্ট্র ধর্ম্মের সঙ্গে যাহুদি ধর্ম্মের বহু সাদৃশ্য থাকায়, বহু মনীষিরা অনুমান করেন যে উভয় ধর্ম্মেরই উৎপত্তিস্থল অভিন্ন।

লেযার্ড সাহেব (A popular Account of Discoveries at Ninevah—Chap V—By Austin Henry Layard Esq. D C L. দ্রঃ) বলেন যে সম্ভবতঃ ঈজিপ্‌সিয়ানদের মত আসিরিয়ানরাও বিভিন্ন বর্ণদ্বারা পুরোহিতের ও অপরের, জাতি এবং লিঙ্গ নিরূপণ করতেন। সাহেব বলছেন যে, অন্যান্য মূর্ত্তির সঙ্গে দুটি মূর্ত্তি পাওয়া যায়, ঐ মূর্ত্তিদ্বয় সামনাসামনি দণ্ডায়মান, মধ্যে একটি 'পবিত্র বৃক্ষ' আর তার উর্দ্ধে রয়েছে ভগবৎ প্রতীক স্বরূপ পাখীর ডানা ও পুচ্ছযুক্ত একটি নরাকার মূর্ত্তি, ঐ ডানা পুচ্ছ দিয়ে বৃত্তাকারে বেষ্টিত। এইটি, 'অরমাজদের' লিঙ্গস্বরূপ ইরাণীরা নিয়েছেন। (ঐ দ্রঃ)। হিন্দুর পুরাণে গরুড়ের কথা আছে, কিন্তু গরুড় বিষ্ণুর বাহনমাত্র, একটি বৃক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপী দুই পাখীর কথা বেদে আছে, হিন্দুশাস্ত্রে কল্পবৃক্ষের কথাও আছে। ভারতে যে সব কথাগুলি আত্মজ্ঞানের উদ্দীপক, অন্যত্র সেই ধরণের গল্পগুলি কি বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে না? সাহেব লিখছেন যে, এক যায়গায় খুঁড়তে খুঁড়তে একটি রাজমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। রাজার গলায় ঝোলান ৫টি 'পবিত্র চিহ্ন'—সূর্য্য, নক্ষত্র, অর্দ্ধচন্দ্র, ত্রিশূল ও শৃঙ্গাকার টুপি—নরমুখী বৃষের যে রকম টুপি থাকে, টুপির আকার সেই রকম।

[গ্রন্থের পাদ-টীকায় সাহেব বলছেন যে যদি শৃঙ্গাকার টুপিটি বাদ দেওয়া যায়, ভারতবর্ষে ও ঐ সব প্রতীক চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়, যা 'বৃষ' প্রতীকের সঙ্গে যুক্ত হলে, আসিরিয়ানদের সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্যের কথাই মনে পড়ে। ভারতে শৃঙ্গাকার টুপি (horned cap) নেই, আর বেদে 'বৃষ'' মানে ঈপ্সিত ফলবর্ষী'—(ঋগ্বেদ ৯ম।৬৪।১।২।৩ ঋকে বৃষকে, 'সোম', 'দ্যু', 'ধর্ম্ম', 'সত্য' ইত্যাদি বলা হয়েছে)। বৃ=বৃদ্ধি, ষ=অন্ত। কারণ ও কার্য্য। কার্য্য=সৃষ্টি বা বৃদ্ধি। কারণ=লয়, অন্ত। কারণ কার্য্য, কার্য্য কারণ, এই আবর্ত্তন শক্তিই 'বৃষ'। ইনি অভীষ্ট ফল দেন]।

পুরাণের বৃষ, বৈদিক বৃষের প্রতীক মাত্র'। Layard বলছেন যে ইরাণীদের ও আসিরিয়ানদের পোষাকও ছিল একইরকম, আর, পারসীক

রাজাদের টুপি (নাম 'Cidars') ফ্রিজিয়ান বা স্বাধীনতা-প্রতীক-ফ্রেঞ্চ টুপির মত ছিল ("resembled the Phrygian bonnet or the French Cap of Liberty")। আসিরিয়ানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসায় পারসীকরাও যে 'অসুর' আখ্যা পান, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ইহাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে ইরাণীরা সেমিতিক স্পর্শে এসে 'অসুর' স্থানে করেন 'অহুর', কিন্তু আসিরিয়ানরা সংস্কৃত 'অসুর' শব্দটি, ও তার উচ্চারণটি, ঠিক্ রেখেছিলেন অর্থাৎ আসুরীয়েরা সেমিতিক উচ্চারণভঙ্গী গ্রহণ করেন নি। ভারতীয় চিন্তাধারা—বৈদিক ভাব-ধারা—কতদূর চলেছিল ও স্থানে স্থানে কি ভাবে গৃহীত হয়েছিল, তা বেশ্ বোঝা যায় এই সব হতে। পুনঃ, যখন ঐ সব ভাব ঘুরে মিশ্রিত হয়ে বা 'ম্লেচ্ছদেশ' হতে ভারতে ফিরে এসেছে, তখন ঐ সব ভাব, ভারত কি ভাবে গ্রহণ করেছেন, এ সব অনুধাবন করা প্রত্যেক ভারতবাসীরই উচিৎ। ভারতের ভাস্কর্য্যেও বৈশিষ্ট্য আছে, ঐক্য আছে, সমস্ত অপরাবিদ্যার আলোচনায় আজকাল যে সব নব নব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে এই সত্যটি দৃঢ় হচ্ছে।

ভাব সঞ্চরণ ব্যাপার এই প্রকারে অগ্রসর হয়েছিল। ঈজিপ্টে এমন এক যুগ দেখা দিয়েছিল যখন ঐ দেশের দেবস্তুতিতে উচ্চ বা আধ্যাত্মিক অর্থ সংযোগ করবার চেষ্টা চলেছিল। "শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র দেবতার"— মহিমা বর্ণনায়, একাদশ বংশের শেষভাগে, ফারোয়া রাজা খু-ন-এটেন (khu-n-Aten) ভাষায় প্রাণ ও ভাব সঞ্চার করেছিলেন, কিন্তু এই অধ্যাত্ম-প্রাণ ভাবটি এশিয়া হতে আমদানি হয়েছিল ("But the impulse to the reform came from Asia"—The Religion of Ancient Egypt and Babylonia—Sayce.)। খু-ন-এটেনের মা ছিলেন 'বিদেশী'। এশিয়ার ধর্ম্মভাব ঈজিপ্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা বিফল হয়েছিল। সূর্য্যকে ভগবৎ-প্রতীক ব'লে জোর করে—ঐ ফারোয়া রাজের সমস্ত রাজশক্তির পীড়নের দ্বারা—চালাবার চেষ্টা এটেনের জীবদ্দশা পর্য্যন্তই স্থায়ী হয়েছিল। এই রকম ক'রে ভাবপ্রচার কখন ভারতে হয় নি। ঐ অত্যাচার বিশেষ ফলপ্রসূ না হলেও দুটি ভাব শিক্ষিতদের মনে গ্রথিত হয়ে উঠছিল, (১) শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝতে আরম্ভ করেন যে সাধারণ

দেবালয়াদিতে যে নানা দেবতা রয়েছেন—তাঁরা সকলেই একেরই অভিব্যক্তি মাত্র, (২) এইজন্য তাঁরা প্রাচীন বিশ্বাসে কখন আঘাত দেন নি। পরে কিন্তু এভাব ছিল না। তাঁদের তখন মনে এল যে, যতই হোক ঐ দেবমূর্ত্তিগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপমাত্র, রূপ বা আকার বাদ্ দিলে, ঐগুলির মধ্যে ঈশ্বরের সত্ত্বা কিছুই নেই। রাজাই দেবতা, রাজাই—এমন কি—ঈশ্বরের অবতার, এই মূল বিশ্বাসটি ঈজিপ্টের ফারোয়ারা আনেন এবং ঐ বিশ্বাসই আদিম বাবিরুষ কৃষ্টির সঙ্গে ফারোয়া সভ্যতার একটি যোগসূত্র। বাবিরুষে, মৃত্যুর পর রাজা 'দেবতা' বলে গণ্য হতেন। বাবিরুষের অধিকাংশ রাজা—যাঁরা দেবতার সম্মান পেতেন, সকলেই সেমিতিক ছিলেন। সেই জন্যই, সম্ভবতঃ এই ভাবটি সেমিতিক জাতি হতেই এসেছে, আর, সম্ভবতঃ, সুমের জাতি প্রথমে এইভাব গ্রহণ করায়, সুমের ও সেমিতিক সভ্যতার মিশ্রণে বাবিরুষ জাতিরও কৃষ্টির উদ্ভব হয়। রাজার জীবদ্দশাতেই ঐরূপ গণ্য হবার ভাব খৃঃ পূঃ ৩৮০০ বর্ষেও বর্ত্তমান ছিল ('সার্গন' ও 'নারমিসিন' সময় অবধি—"Can be traced back as far as Sargon and Naramsin"—Ibid)। পেরুর 'ইন্কাসদের' মত ফারওয়া ছিলেন সূর্য্যবংশোদ্ভব। বাবিরুষদের বিশ্বাস ছিল যে, মানবদেহ দেব-দেহের সাদৃশ্যে সৃষ্ট, তাই বাবিরুষের দেবতারা নরাকৃতি। ঈজিপ্টে ছিল কিন্তু ঠিক্ ইহার বিপরীত, সেখানে প্রায় সব দেবতাদেরই পশুর আকার।

ভারতে ও রাজশরীরে দেবত্ব আরোপিত হত, সে শরীরও ছিল পবিত্র। রাজা ছিলেন, ভারতে, ঋষিকুলের অধীন—'তপোবল সহায়' পুরোহিতের অধীন। রাজাদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা খুব ছিল। আমরা তা দেখেছি। তাঁরা দেহকে নশ্বর মনে করতেন। কিন্তু, ভারত ছাড়া অপর অনেক দেশে সে শরীরের মৃত্যু হয় না, তাই সে শরীর বিনষ্ট হবার পরও, রক্ষা করবার জন্য কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছিল।

স্বামীজি বলেছেন, "পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিযাছে যে, ঐ যে কটিতট-আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্য্যজাতি॥ উহারা আর আমাদের নহে॥!" (বর্ত্তমান ভারত)। অধ্যাপক দাস মহাশয় তাঁর Rgvedic India গ্রন্থে (২য় সংস্করণ) কয়েকটি তথ্য সুন্দর ভাবে নিরূপণ করেছেন। ঐ সমস্ত সুস্পষ্ট প্রমাণ হতে বেশ বুঝতে পারা যায় যে কেন

ঈজিপ্ট আদি দেশে প্রথম উচ্চ ভাব আসে ও পরে সে সব কেন বিকৃত ভাব ধারণ করে। দাস মহাশয় দেখিয়েছেন যে ঋগ্বেদের সময় 'দাস'; 'দস্যু' 'দ্রবিড়' প্রভৃতি জাতিদের আদিম বাসস্থল ছিল দক্ষিণ ভারতে। তারা আর্য্যজাতিদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল দল মাত্র—অসভ্য ও বর্ব্বর পর্য্যটক ("Aryan nomads in Savage condition"), অথবা, আর্য্যমতের সঙ্গে তাদের সম্পূর্ণ মিল ছিল না। 'পনিরা' ছিল সপ্তসিন্ধু নিবাসী আর্য্য বৈশ্য (বণিক)। তারা দাক্ষিণাত্যে গিয়ে পাণ্ড্য ও কোলদের মধ্যে আর্য্যসভ্যতার বিস্তার করে। ঐ দ্রবিড় জাতিরাই ঈজিপ্ট ও মেসোপোটেমিয়ায় যান আর পণিদের উপদেশে ঈজিপ্ট ও বাবিরুষে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেন। 'Punic race' নামে খ্যাত এই পণিরাই পরে (Syria) সিরিয়ায় যায় ও সেখানে তাদের নাম হয় ফিনিসিয়ান। এইরকম, কাশীয়, হিত্তিতি, মিত্তানি, ফ্রিজিয়ান ও লিডিয়ান প্রভৃতি জাতি—যাঁদের নাম ভারতের বাইরেও প্রচার আছে—সকলেই আর্য্যশাখা, কিন্তু ঐ সব জাতিরা সেমিতিক জাতিদের সঙ্গে মিশে যান, ফলে, সেমিতিক সভ্যতা তাঁদের গ্রাস করে।

[দাস মহাশয় "The Kossæns, the Hithities, the Mittanis, the Phryginas and the Lydians প্রভৃতি জাতিদের "Pure Aryan immigrants" (খাঁটি আর্য্য) বলেছেন, কিন্তু তাঁরা "Completely absorbed by the great Semitic race" হয়]।

আর্য্যের ঐ প্রকার অভ্যুদয় কত কাল পূর্ব্বে হয়েছিল! দাস মহাশয় (Rgvedic India-২য় সংস্করণে) দেখিয়েছেন, বহু প্রমাণ সহ, যে উহা সংঘটিত হয়, ৫০—২৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে অন্ততঃ। দাস মহাশয় আরো বলেন যে পশ্চিম কিম্বা মধ্য এশিয়া হতে আর্য্যের আগমন ব্যাপার এই জন্য অসম্ভব যে সে সময়ে ঐ সব স্থানের অস্তিত্ব ছিল না—অর্থাৎ উত্তর মেরুর নিকট পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটি সমুদ্র ছিল—ভূতত্ত্বই ইহার প্রমাণ। তখন 'এশিয়ার ভূমধ্য সাগর' ও 'ইউরোপের ভূমধ্য সাগর' ছিল (Asiatic Mediterranean Sea" ও 'European Mediterranean Sea'), ও তাদেরই পূর্ব্ব নিদর্শন স্বরূপ বল্‌ফবাস সাগর, আরল সাগর, কৃষ্ণ সমুদ্র ইত্যাদি বর্ত্তমান—ভূতত্ত্ববিদ্যা (Geology) ইহা সমর্থন করে।

ইউবোপেব পশ্চিমাংশে বিভিন্ন জাতিব বাস ছিল। প্ৰস্তব যুগে জন্ত জানোয়াবেব পবিষ্কাব ছবি থাকলেও, পববৰ্ত্তী যুগে সে সব কিছুই নেই। এটাতে মাঝখানে অন্য জাতিব আগমন ও প্ৰভাব বোঝা যায। অতএব, এক যুগেব একটা আদৰ্শ দেখে, পবে তাব নিদৰ্শন না পেলে বলা সঙ্গত নয যে প্ৰথম যুগেব আদৰ্শটি পবে প্ৰক্ষিপ্ত হযেছে। যখন যে ভাব যে জাতিব মধ্যে প্ৰবল হয, সেই ভাবেব দাগই সেই জাতি বেখে যায। তা ছাড়া, এক্ এক্ জাতিব বিশেষ সংস্কাব আছে, যেমন Esquimax (এস্কিমো) জাতি সুন্দব নক্সা কবতে পটু ("fair draughtsman"), কিন্তু Polynesians (পলিনিসিয়ানবা) বহু বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত হলেও, নিজেবা ফিট্‌ফাট্ থাকতে শিখলেও, নিজেদেব অস্ত্রে শস্ত্রে বেশ শিল্পেব বাহাদুবী দেখাতে পাবলেও, তাদেব মধ্যে বৃক্ষলতা বা কোন চিত্র অঙ্কন দক্ষতা নেই বা এখন অতি সামান্য ভাবে পবিস্ফুট।

[On the origin of Civilizations and primitive Condition of Man-by Right Hon Averbury P C F. R. S. D C. L. L L D দ্রঃ]

উক্ত মনীষী বিভিন্ন দেশেব আদিম মানুষেব আচাব ব্যবহাব ও ধৰ্ম্ম বিশ্বাসাদিব কথা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে মানব-প্ৰকৃতি-নিহিত সহজাত জ্ঞান প্ৰসূত আচাব ও প্ৰথা অনেক স্থানেই প্ৰাযই এক বকম। ঐ সব আচাব হতেই কোন কোন স্থানে ভাষাব উৎপত্তি হয়েছে। পেরুভিযানবা দুই ফুট লম্বা সুতোব সঙ্গে এক একটি বঙিন সুতোব গাঁঠ বেঁধে ভাব প্ৰকাশ কবতো। সাহেবেব অনুমান, যে, ঐ বকম গোলাকাব গাঁঠ স্মৃতিশক্তিব সহাযক এবং ঐ বকম গাঁঠ বাঁধা প্ৰথা হতেই আদিম চীনা ভাষাব উৎপত্তি, যাব নাম Hotu ও Loshi ('হোত্তি' ও 'লোশি'); এই বকম গাঁঠ বাঁধা প্ৰথা পশ্চিম আফ্রিকা ও আমেবিকাব বহু আদিম জাতিতে বৰ্ত্তমান। এখানে বলা যেতে পাবে যে, স্মৃতিশক্তিব উদ্বোধকস্বৰূপ আজও বাঙ্গালীব কাপড়ে গাঁঠ (গেবো) বাঁধাব বীতি, বিশেষ নাবীদেব মধ্যে, আছে। যা হোক্ এ সব সত্বেও পাৰ্থক্য দেখা যায়, অতএব, যাব যা বৈশিষ্ট্য, যাব যা সংস্কাব, সেই দিক্ হতে তথ্যানুসন্ধান করা দবকাব, তবেই সত্য পাওয়াব আশা কবা যায়।

ঈজিপ্টেব প্ৰাগৈতিহাসিক যুগ—খৃঃ পূঃ ৮০০০—৫৫০০ বৰ্ষ পৰ্য্যন্ত। ভাবহীন জড়তাপূৰ্ণ এই যুগে কলাবিদ্যাব কোন অগ্ৰগতি-চিহ্নও নেই।

প্রথম বংশেব সময়—খৃঃ পূঃ ৫৫০০ বর্ষে—এক নতুন জাতি এসে নতুন সভ্যতা স্থাপন ক'বে জাতিতে প্রাণসঞ্চাব কবেন। ঐ সময় হ'তে সাঙ্কেতিক্ লিপিব আমদানি হয ও ঐ লিপিব দ্রুত উন্নতি হয় ও উহাই লিখিত ইতিহাসেব আবম্ভ যুগ।

["Arts and Crafts of Ancient Egypt by Flinders Petric]

ঈজিপ্ট বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে, ভূমধ্যসাগবেব আশেপাশেব কোন স্থানে স্বর্ণ পাওয়া যায না, অথচ ঈজিপ্টেব প্রথম বংশ হতে স্বর্ণালঙ্কাব ব্যবহাব দেখা যায়। সাহেবেব অনুমান যে নিউবিযা ও এশিয়া মাইনব হ'তেই 'এশিয়াব সোণা' ('Asiatic Gold') আমদানি হ'ত। এই বকম স্বর্ণালঙ্কাবেব ব্যবহাব ববাবব চলে এসেছে। তাব পব 'ত্রিচন্নপল্লী' ধাঁজেব অলঙ্কাবেব ব্যবহাব দেখা দেয় ও তা বোমানদেব সময় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

["One new art appears, the plating of gold wire chains, in what is now commonly called Trichnopoly pattern This method was continued down to Roman times"]

খৃঃ পূঃ ৭০০ বর্ষে তামাব কাজেব মধ্যে সোণা বসান কাবিকুবী পাওয়া যায়, যা ভাবতেব সাধাবণ প্রথা।

["This is a common system in India"-ঐ]।

এই অলঙ্কাবগুলিকে 'Keft work' বলা হয়। কাবণ, নাইল নদী হতে Keftই ছিল ভাবতে বাণিজ্যযাত্রাব পথ। যাকে আমবা এখন চীনামাটিব বাসন বলি, সেই জিনিষেব আশ্চর্য্যরকম বহুপ্রকাব সূক্ষ্ম শিল্পেব আবির্ভাব হয ও বহুল প্রচলন হয়, আব, সেই সময়ে তাম্রসূত্র দিয়ে গ্রথিত কবা নতুন ধবণেব টালি দিয়ে বাড়ী ঘব তৈবী হ'তে আবম্ভ হয খৃঃ পূঃ ৫৫০০ বর্ষে (১ম বংশে)। ষষ্ঠ বংশে, খৃঃ পূঃ ৪০০০ বর্ষে, ভাবতজাত 'নীল' দেখা দেয় ("a dark Indigo-blue")। খৃঃ পূঃ ১০ হাজাব বর্ষে 'বাদবিয়ান্' (Badarian Dynasty) বংশেব সময়ে ঈজিপ্টে পোত চলাচল কবত। ভাবত হ'তে তখন যে ভাব সঞ্চাবিত হয়েছিল তাব কথা আমবা যথাসময়ে জানাব। যাই হোক, ঐ যুগ সভ্য ছিল ও ঐ সভ্যতা দীর্ঘ ২০০০ হাজাব বৎসব স্থায়ী ছিল এবং তাবপব অন্ধকাব যুগ আবম্ভ হয় খৃঃ পূঃ ৮০০০ বর্ষ

হ'তে খৃঃ পূঃ '৫৫০০ বর্ষের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত। Sayce সাহেব বলেন যে ঈজিপ্টের ধর্ম্ম, নানা জাতি, বিভিন্ন কৃষ্টি ও বিভিন্ন চিন্তার মিশ্রণে উৎপন্ন।"

(Gifford Lectures—Lecture II; by A H Sayce D. D L. L. D Professor of Assyriology, Oxford, author of the Religions of Ancient Egypt and Babylonia)

এশিয়াবাসী কারয়োয়াতেই শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল ও তার ফলে যে ঐক্য এসেছিল তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রভাবমাত্র (ঐ)। এখানে বলা বাহুল্য যে, ঈজিপ্ট কোন ভাবকে আত্মস্থ ক'রে একটি মহান্ জীবনাদর্শরূপে পরিণত করতে সমর্থ হয় নি।

ভারতেতর অন্যান্য বহু প্রাচীন জাতির মধ্যে বিভিন্ন সভ্যতা ও বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘাত দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভারতে একই ধারা আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। অন্যস্থানে, আদিম মানব নৈসর্গিক ব্যাপার দেখে ভয়ে সেগুলিকে 'দেবশক্তি'র খেলা মনে করেছে, অনন্যোপায় হ'য়ে ঐ 'দেবশক্তির' আরাধনা করেছে—বাস্তবকে (Real-কে) আদর্শরূপে খাড়া করেছে (idealise করেছে), বৈজ্ঞানিক Kepler সাহেবও এ হ'তে রক্ষা পান নি। এই ভয়-প্রসূত Animism হ'তেই, ধোলো মনীষীরা বলেন, 'রিলিজনের' (Religion-এর—ধর্ম্মের) উৎপত্তি। ভারতে, আর্য্য, গোড়া হতেই, সর্ব্বত্র একেরই প্রকাশ দেখেছেন, এক সত্ত্বাই প্রত্যক্ষ করেছেন, একই তাঁদের আদর্শ, ভাবমুখে তাঁরা বহুর মধ্যে এককেই পেয়েছেন—ideal-কে realise করেছেন। নানাত্বের বা বিভিন্ন ভাবেরই ক্রমপরিণতি হয়, এক তত্ত্বোপলব্ধির (Being and Becoming-এর) পথে বহুরই ক্রমাবরণ মুক্তি হতে পারে। ভারতে Animism হ'তে Religion-এর উৎপত্তি নয়—তার কোন প্রমাণও নেই। ধোলো Religion-এর অনুবাদ 'ধর্ম্ম' নয়।

রামায়ণে দেখি, সুগ্রীব কর্ত্তৃক দেশবিদেশে—অতি দূরদূর দেশে—'বানর' সৈন্য প্রেরিত হয়েছিল। রামায়ণ পড়লে মনে হয়, তখন ভারত আর একবার সমস্ত পৃথিবীর—সমস্ত মানবজাতির—সংস্পর্শে এসেছিলেন। আরো জানা যায় যে ঐ সব 'বানর' সৈন্যদের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণাবয়বী জাতি ছিল ও তারা অনেকে ভারতের বাহির হ'তে এসেছিল—তাদের

নানা প্রকার বর্ণই ইহা প্রমাণ করে। বানররাজ সুগ্রীবের প্রভাবও কতদূর বিস্তৃত ছিল তারও ইহাই প্রমাণ। ঐসব দূর দূরান্তর স্থান তখন অজ্ঞাত ছিল না অর্থাৎ ঐ সব স্থানের বিবরণ পূর্ব্ব হতেই অনেকে জানত। ইহা হতে স্পষ্ট বোঝা যায়, যে, তখন ভারতের সঙ্গে ভারতেতর দেশের বহু প্রকারের আদান প্রদান ছিল। বলা বাহুল্য, আদান প্রদান যেভাবেই হোক্, ভাববিনিময় অবশ্যম্ভাবী। পবিত্রতা, সত্যনিষ্ঠা ও চরিত্রবলেই রামচন্দ্র সকলকে আপন ক'রে নিয়েছিলেন; যে চরিত্রবল ও নেতার প্রতি একান্ত নিষ্ঠা দেখা দিয়েছিল, তার দৃষ্টান্তও ভারতেতর দেশে এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়নি।

মানব-বিজ্ঞানবিৎ (Anthropologists) ও তদন্তর্গত জাতি-বিজ্ঞানবিৎ (Ethnologists) ধোলো পণ্ডিতদের মধ্যে বিষম মতভেদ দেখা যায়। এক দলের মত যে, আদিম বর্ব্বর জাতিই প্রথম অশ্বকে পোষ মানায়, অন্য দল বলেন যে, আর্য্যেরাই প্রথম ঘোড়াকে পোষ মানায়, কারণ, বৈদিক 'অগ্ন্যাধানে' ঘোড়ার দরকার হত, অপর এক দল ব'লে বসলেন যে মধ্য এশিয়ার (Central Asia র) লোকই প্রথম পোষ মানায—ওদেশের লোকের পক্ষে এইটিই স্বাভাবিক; অমনি আর একটি দল ব'লে উঠলেন, তা হলে ঐ স্থান হ'তে আগত এস্কিমো জাতির ইতিহাসে সে সংস্কারের চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না কেন? আবার, জন কতক পণ্ডিত, ঐতিহাসিক প্রমাণ উদ্ধৃত ক'রে দেখালেন যে ও সব কাল্পনিক কেচাকেচি ছেড়ে দিযে নিশ্চিতরূপে বলতে পারা যায় যে খৃঃ পূঃ ৩০০০ বর্ষ পূর্ব্বে বাবিরুষে ঘোড়া পোষ মানানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সব পণ্ডিতদের সহায়তা করতে নামলেন ভৌগলিক ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা। এই চেষ্টার ফলে ইহাই দৃঢ়রূপে প্রমাণ হল যে এশিয়ার সঙ্গে সমস্ত পাশ্চাত্য জগতের সম্বন্ধ অতি প্রাচীন। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের গৃহপালিত জন্তু জানওয়ারের পূর্ব্বপুরুষ এশিযা হ'তেই এসেছে, আলাস্কা হ'তে টিরাডেল ফিউগো পর্য্যন্ত স্থানের প্রত্যেক কুকুরটি নেকড়ে হতে এসেছে; বেরিং প্রণালী পার হ'য়ে এশিয়া হ'তে কলার (কদলির) মত অনেক ফলমূল এশিয়ার লোকই এনে প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগে রোপণ করেছে, এ ব্যাপার আবার ওশেনিয়া ও আফ্রিকাতে দেখা যায়। বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত মোক্ষমূলার সাহেব তাঁর Science of Religion গ্রন্থে দেখালেন যে

'Old World' ও 'New World' এ ভাষাগত ও ধর্ম্মগত যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় যে, কোন স্মরণাতীত প্রাগ্‌ ঐতিহাসিক্‌ যুগে এশিয়া হ'তে আমেরিকায় কোন এক জাতির আমদানি হয়েছিল। তিলক প্রমুখ পণ্ডিতেরা ঐ সব দেখে অন্য প্রমাণ উপস্থাপিত করলেন, যথা, ঋগ্বেদে যখন দীর্ঘ ঊষা, দীর্ঘ দিন রাত্রির বর্ণনা আছে, তখন আর্য্যেরা প্রথম উত্তর মেরুদেশেই ছিলেন। ঠাণ্ডা দেশ হ'তে আগত ব'লেই তাঁরা অগ্নি-প্রিয় ছিলেন! তার পূর্ব্বে গোলো পণ্ডিতেরা অনুমান করলেন যে মধ্য এশিয়া হতে আর্য্যজাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, কারণ, সেখান হতেই ছড়িয়ে পড়াটা সহজ ছিল; সেখানে কাস্পিয়ান হ্রদের আশে পাশের কেরাসিনের খনি হতে আগুন জ্বলে ওঠা দেখে আর্য্যেরা অগ্নিকে 'দেবতা' ঠাওরালেন, তাই গ্রীক্‌ অগ্নিদেবতা Hesta র পূজা—অগ্নিকে জিয়াইয়া রাখবার প্রথা। রোমের অগ্নিদেবতা Vesta র ও সেই ব্যবস্থা দেখা যায়, কারণ গ্রীক্‌ বা রোমনরা ও ছিল নাকি আর্য্যশাখা। এটি 'Animism' এর আর এক প্রমাণ। আশ্চর্য্যের বিষয়, এটা কারোর নজরে পড়ল না যে ভারতীয় আর্য্যেরা অগ্নিকে কোন্‌ দৃষ্টিতে দেখতেন, উপাসনার মন্ত্রগুলিতে 'অগ্নি' কি ভাবে বর্ণিত, আর অগ্নি উপাসকদের মধ্যেও, ওসব দেশে, ত্যাগ বৈরাগ্যের ভাব একেবারে নেই বল্‌লেই হয়। ভারত হতেই ত আর্য্য সব যায়গায় যেতে পারেন এবং ঐ সব স্থানে, লোকেরা তাদের নিজ নিজ ভাবে আচার গ্রহণ করেছিল, অথবা আর্য্য শিক্ষা পেয়েও, সাধন প্রণালীর অভাবে, বৈদিক ভাব আত্মস্থ করতে পারেনি—এটা অসম্ভব কিসে? আর্য্যাবর্ত্তে, পাহাড়ের জঙ্গলে ও অরণ্যানীতে আপনি আগুন জ্ব'লে ওঠে, ঋগ্বেদে বাড়বানলের কথাও আছে—এ সব তাঁদের নজর এড়িয়ে যায় কেন? অগ্নিহোত্রের আহুতি মন্ত্র, "ভূ ভুবঃ স্বঃ ওঁ অগ্নির্জ্যোতিঃ জ্যোতিরগ্নি স্বাহা"—এই অর্থে কি অন্যত্র অগ্নি গৃহীত হত? 'শ্রদ্ধা হোম'—যাতে 'সত্যই' মিথুন, যাঁর সহায়ে সাধক ত্রিলোকজয়ী হতে পারেন—এই মানস হোমের অনুরূপ কোন ভাব ও কি ঐ সব স্থানে ছিল?

ভারত হ'তে যে সমস্ত অভিযানের কথা বলা হয়, সেইগুলিকে সভ্যজাতির অভিযান বলা যেতে পারে। আমরা দেখেছি যে সেই স্মরণাতীত যুগে ও, মানব, জন্তু জানওয়ারকে পোষ মানিয়ে কাযে লাগাতে শিখেছে, তাদের প্রিয় গাছ পালা অন্য স্থানে নিয়ে গিয়ে রোপণ করেছে, ভাষা ও ধর্ম্ম বিস্তার

কবেছে। মানবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেবা ভাবত হতে অসভ্য জাতিব ঐরূপ বিস্তৃতিব কথা বলেন ; কিন্তু তাঁবা অনেকেই ভাবতীয় সভ্য আর্য্যজাতির আর্য্য-সংস্কৃতি-বিস্তাবেব বেলায় নীবব। পূর্ব্বে তাঁবা মনে কবতেন যে বৌদ্ধযুগেব আগে আর্য্য ভাব ভাবতেব বাহিবে বিস্তাব লাভ কবেনি। তাঁদেব মতে, ভাবতে আর্য্যজাতি প্রবেশ কববাব পূর্ব্বে সমগ্র ভাবতময় এক কৃষ্ণকায় জাতিব বাস ছিল। এই কৃষ্ণকায জাতিব বংশধববাই নাকি দ্রবিড় জাতি। এই দ্রবিড জাতিব এক শাখা সিংহলে গিয়ে বাস কবে, তখন সিংহলে বাস কবত তদপেক্ষা ঘোব কৃষ্ণকায জাতি 'বেদ্ধা'। বেদ্ধাদেব জ্ঞাতিবা অষ্ট্রেলিয়াব আদিম নিবাসী। জাতি-বিজ্ঞানেব জনকতক পণ্ডিতেবা বলেন যে, আর্য্যেবা ভাবতে এসে ঐ দ্রবিডদেব ঠেঙাতে ঠেঙাতে দাক্ষিণাত্যে বিতাডিত কবলে, পবে সেখান থেকেও ঠেঙানিব চোটে তাবা Eastern Peninsula, Indonesia ও Oceaniaতে—Malanesian বা যাদেব আধুনিক প্রতিনিধি—এবং অন্যদিকে Further India, Maldives ও Madagascar প্রভৃতি স্থানে—ছডিযে পড়ল। এবাই হল Malayo-Polynesian Family বা মালাওপলিনিসিয়ান সম্প্রদায়েব অন্তর্ভুক্ত জাতি।

[Vide Polynesian Journal, vol iv, December 1895 An article by Dr John Fraser, L L D] উক্ত সাহেবের মতে, Madagascar এব ভাষা South Sea ব অন্তর্গত সামাওয়াদেব (Samoa) মত অনেকটা]।

ঐ সব স্থানেব ভাষা দ্রবিড ও পালি মিশ্রিত। আব একদল বোঝাবাব চেষ্টা কবেছেন যে আর্য্য সংস্কৃতি ও সভ্যতাব মূল আর্য্যকৃষ্টি নয। মোহেন-জোদাডো, হবপ্পা ও অন্যান্য নানা স্থানে যে সব নব নব তথ্য পাওবা যাচ্ছে তাতে ধোলো ধাবণায় বিষম চাঞ্চল্য এসেছে, কিন্তু অনেকে তাঁদেব পূর্ব্ব বুলি এখনও পূবো ছাড়েন নি। তাঁদেব মতে, ভাবতে আর্য্যেব আগমন হয অপবাপব একাধিক জাতিব বহু পবে। তাঁবাও বলেন যে ভাবতেব আদিম নিবাসীবা ছিল বেঁটে 'কালা-আদমি'—'নিগ্রেটো'। তাদেব বাস ছিল সমুদ্রেব উপকূলে। বর্ত্তমান যুগেও তাদেব বংশধব, পাবস্যে, দক্ষিণ ভাবতে, আণ্ডামানে, এমন কি সুদূব নিউগিনি দ্বীপেও পাওয়া যায। আসামেব পথ দিয়ে 'অষ্ট্রিক' নামে আব এক জাতি ভাবতে আসে। তাবা ছিল অনেকটা সভ্য অর্থাৎ বড বড নৌকা তৈবী ক'বে সমুদ্রে পাডি মাবত,

তাদের একটা ভাষা ছিল, ধর্ম্ম বিশ্বাসও ছিল আর যুদ্ধ করতেও জানত। বর্ম্মার স্থানে স্থানে এদের সভ্যতার প্রসার ও উন্নতি হয়। ভারতে প্রবেশ ক'রে এরা ক্রমশঃ সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে যায়; বাঙ্গালা দেশে এদের সভ্যতার একটি বিশিষ্টরূপ ফুটে ওঠে ও গঙ্গানদীর দুই উপকূলে সেটি বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই অষ্ট্রিক জাতির অভিযান শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হ'য়ে, নানা মিশ্রিত ভাষার সৃষ্টি ক'রে, ইন্দোনেসিয়া, নিউজিলাণ্ড পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। বর্ত্তমান সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতিদের ভাষা 'অষ্ট্রিক' ভাষারই এক শাখা—ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে পণ্ডিতেরা ইহা প্রমাণ করেন। যাই হোক্, তাঁদের মতে, ভারতে আর্য্যের আগমন এই অষ্ট্রিক জাতির বহু পরে। আর্য্যের আগমন সম্বন্ধে কয়েকটি মতের কথা পূর্ব্বে বলেছি। আর এক দলের মত, আর্য্যেরা বেরিয়ে পড়েন জার্ম্মাণি বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হতে। এ সম্বন্ধে তাঁরা আর যা বলেন তা বর্ত্তমানে উড়ে গিয়েছে, অতএব তা বলা অনাবশ্যক। ভারতে এসে কিন্তু এই সভ্য অষ্ট্রিক্ পরে আর্য্য ভাষা গ্রহণ করে ও ক্রমশঃ আর্য্যান্বিত হতে আরম্ভ করে। নদী পাহাড়ের নামকরণ নাকি অষ্ট্রিকরাই প্রথম করে ও আর্য্যভাষা গ্রহণ করবার পর নামগুলি সেই মত রূপান্তরিত করে।

অষ্ট্রিকরা আগে এসেছিল, বেশী সভ্য ছিল, তবে তারা আর্য্যান্বিত হয় কেন? সাঁওতালাদির ভাষার মধ্যেও সংস্কৃত শব্দমূলক শব্দ পাওয়া যায় কেন? কেন অষ্ট্রিকরা আর্য্যভাষা গ্রহণ করে? এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। তবে ধোলো এইখানে একটি অনুমান এনেছেন, অর্থাৎ আর্য্যেরা সভ্যতায় হীনতর হলেও, তাঁদের নাকি সংহতি-শক্তির জোর ছিল ও খুব উদ্ভাবনী শক্তি ছিল। তা হলে 'সভ্যতা' মানে কি? সংহতি-শক্তি আছে, কল্পনা-শক্তি আছে, উদ্ভাবনীশক্তি আছে, সুতরাং উন্নততর সমাজ-শক্তিও আছে, তবে সভ্যতায় হীনতর কেন? তবে কি ঠেঙানির চোটে অষ্ট্রিকরা সায়েস্তা হয়েছিল ও জেতার ভাষা তাদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল? তা হলেও ত, ধোলো হিসাবে, আর্য্যরাই বেশী সভ্য হয়ে যান না কি? ঠেঙানির কৌশল ও ঐ সব গুণই ত বর্ত্তমান 'সভ্যতা' শব্দের অর্থ; কিন্তু এ সম্বন্ধে ধোলো প্রায় নীরব। আর্য্যের একদল না হয় জার্ম্মাণী বা অন্যত্র হতে ছড়িয়ে পড়তে পারে, কিন্তু ঐ সব স্থানে আর্য্যের বৈশিষ্ট্য

কোথায়? অন্যত্র আর্য্য-আচাবেব অনুকবণটা থাকতে পাবে, কিন্তু কোথায় জীবনকে পবিত্র কববাব, সাধন ক'বে সব প্রত্যক্ষ কববাব প্রবল সংস্কার, ওসব দেশে? ভাবতেব বাইবে আর্য্যেবা যখন একত্র ছিলেন (যেমন বলা হয়), তখন তাঁদেব বৈশিষ্ট্য দেখা দেয নি, আব তা ফুটে উঠল ভাবতে ঢুকেই? তাবপব, ধোলো বলেন যে আদি দ্রাবিডীদেব লম্বা মাথা, কিন্তু ভাবতীয় দ্রাবিডীদেব গোল মাথা—ইহা যে কেমন ক'বে হল, তাব কাবণ আজও নিরূপণ হয নি। অথচ দ্রবিড ভাষাব সঙ্গে বেলুচিস্থান অঞ্চলেব ব্রাহুই জাতিব ভাষাগত সাদৃশ্য দেখতে পাওযা যায়, এমনি কি রুষদেশেও দক্ষিণভাবতেব একটি ভাষাব সাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্য থাকতে পাবে অনেক কাবণে; ঐ বকম অনুমান ক'বে সিদ্ধান্তে আসা কি বৈজ্ঞানিক প্রণালী? বৈজ্ঞানিক প্রণালীব বিচাব হয় বাস্তব ধ'বে, বস্তুকে বিশ্লেষণ ক'বে ও সেই বাস্তব ও বিশ্লেষণেব মধ্যে থাকতে পাবে অনুমান সামান্য, সিদ্ধান্তেব সহায়তা কববাব জন্য। ঐতিহাসিক ঐ বকম ব্যাপাবে বাস্তবই বা কি, আব নির্দ্দিষ্ট বস্তুই বা কি? সবই যদি আন্দাজ করা হয় ও তাকেই যদি যুক্তি বলা হয়, অন্য অনেক বকম আন্দাজ কবা যেতে পাবে, যেগুলি অপেক্ষাকৃত সহজ, স্বাভাবিক ও সঙ্গত। বক্তমিশ্রণের ফলেই হোক্ বা যে কাবণেই হোক্, গোল মাথা বা লম্বা মাথাই হোক্, আর্য্যেব ও মিশবীদেব মাথাব খুলিব সাদৃশ্য থাকুক্ আব নাই থাকুক্—যেখানে আর্য্যেব বৈশিষ্ট্য নেই সেখানে—কোন হিন্দুই শাস্ত্রানুসাবে 'আর্য্য' এই আখ্যা দেবেন না। আব, ঐ সব হাড মাস চামডা ও বক্তেব দিক্ দিযে বিচাব কবলেও, ইহা বুঝিয়ে দেওয়া দবকাব—কেন ঐ সব স্থানে আর্য্য-সংস্কাব-বৈশিষ্ট্যেব একান্ত অভাব, কেন ভাবত, সাধনেব বৃহৎ সমবক্ষেত্র আব কেন অন্যত্র পশুবলেব সংগ্রামভূমি।

এই বকম ফিনিসিযানদেব কথাও আছে। হেবোডোটাসেব মতে, ইউফ্রেটিস্ ও তাইগ্রীস নদীব উপকূলেই ছিল তাদেব আদিম নিবাস। বংশপবম্পবায় সেখানে বাস কবায় তাবা তাদেব আদিম ভাষা ভুলে যায়। এই ফিনিসিয়ানবাই কাচপ্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কাব কবে ও ধোলো প্রভৃতি একমতে তাবাই প্রথম লিপি বা লিখনপ্রণালীব আবিষ্কাবক। এই ফিনিসিয়ানবাই গায়ে প'ড়ে আর্য্যদেব সঙ্গে ঝগডা বাধাত তাবও বৃহতব প্রমাণ পাওয়া

যায়। যাই হোক্, লিপি ছিল অনেক প্রাচীন জাতির, কিন্তু, ধোলো মতে, ছিল না ভারতীয় আর্য্যের। স্বেচ্ছায় তাল্‌কাণা সাজলে তার উপায় কি? ঋগ্বেদ (৪ অষ্টক।২।১২) তে আছে যে বাহুর ছায়া সূর্য্যকে বিদ্ধ করে। এই যে গণনা বা বেদি আদি নির্ম্মাণে যে গণিতবিদ্যার দরকার হত— তাও কি না লিখে হত? ব্রাহ্মণগ্রন্থে 'পংক্তি' শব্দ পাওয়া যায়, তাও কি শুনে শুনে ঠিক করা হত? রক্তের দিক্ দিয়ে, গ্রীক্‌দেরও আর্য্য বলা হয়, বলা হয় উভয় সভ্যতার মূল এক। আদর্শ বা ভাবের ঐক্য বা সাদৃশ্য কোথায়? গ্রীক্-পুরাণে দেখা যায়, দেবতারা আত্মীয়স্বজনের মাংস খেয়ে তৃপ্তি লাভ করেন। বেদপন্থীর মধ্যে এরকম ভাব কোথায়? ঋগ্বেদে মৃতের সংকার দুরকম ভাবে হত—দাহ করা ও কবর (সমাধি) দেওয়া। এই দুই প্রথা ভারতে আজও বর্ত্তমান। সন্ন্যাসীর দেহ সর্ব্বস্থানে দাহ করা হয় না, সমাধি দেওয়াই (জলসমাধি দেওয়া বা কবরস্থ করা) হয়। সম্প্রদায় হিসাবেও বিভিন্ন প্রথা আছে। বীরশৈবেরা মৃতকে কবরস্থ করেন আজও। আচারের বাহ্য সাদৃশ্য বা শব্দার্থের সাদৃশ্য দেখে তাকে প্রমাণ ব'লে খাড়া করা নিরাপদ নয়। বৈদিক ভাব প্রসার কত দিক্ দিয়ে, কত রকমে হয়েছে তা দেখাবার ক্রমশঃ চেষ্টা পাব। আমরা ভারতীয় পণ্ডিতকুলকে সানুনয়ে ইহার ধারাবাহিক বিবরণ দিতে আহ্বান করছি।

ভাব ও ভাবসঙ্করণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কৃষ্ণকায় জাতিদের ঠেঙানির কথা পূর্ব্বে ব'লেছি। ধোলো সভ্যতার ইতিহাস তথা অন্যান্য জাতির ইতিহাস, এই ঠেঙানি-বৃত্তি মূলক। এই মূল বৃত্তি আজও পুরোমাত্রায় বর্ত্তমান, শুধু সেই বৃত্তি Diplomacyর (কূটনীতির) পোষাক পরেছে। ধোলোর মধ্যে যাঁরা ঐ বৃত্তিকে সংযত করতে চান, আজ তাঁরাও অপরাপর তাঁদের 'ভাইব্রাদারদের' সামলাতে পারছেন না। বোধ হয় ঐ মনোবৃত্তির জন্যই তাঁরা সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে

ঐ বৃত্তিটি দেখতে চান। কিন্তু ভারতের কোন আর্য্যগ্রন্থে অমন ক'বে কৃষ্ণকায বা অন্য কোন জাতিদেব ঠেঙানিব কথা বা ঠেঙিয়ে তাডিয়ে দেবাব কথা পাওযা যায় না। বামচন্দ্রেব সমযেই দেখা যায় যে, 'বানব', 'ঋক্ষ' আদি জাতি সীতা অন্বেষণে ভাবতেব বাইবেও যান ও বামচন্দ্রেব লঙ্কা বিজযেব পব, তাঁদেব মধ্যে কতক স্বেচ্ছায় বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বাস কবেন। বানবাদি বাহিনী নিয়ে বামচন্দ্রেব যে বিবাট বাহিনী তৈবী হয়, সেই বাহিনীব সৈন্তেবা, বিশেষ সেনানায়কেবা সকলেই বামভক্ত হযে দাঁডান, স্বেচ্ছায় তাঁবা বামচন্দ্রেব চিবসেবক হয়ে যান। সহাযহীন, সম্বলহীন, বল্কলধাবী, অযোধ্যা হ'তে বহুদূবে স্থিত, অযোধ্যাবাজশক্তিব সহায ও প্রভাব হতে সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য, সর্ব্বত্র শত্রুদ্বাবা বেষ্টিত, একমাত্র সহায় অনুজ লক্ষ্মণ—এবকম অবস্থায় পতিত বামচন্দ্রেব কোন্ গুণে ঐ বাহিনী তাঁব একান্ত ভক্ত ও সেবক হয়ে যায়? বামচন্দ্রেব সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢতা, চবিত্রবল ও আচণ্ডালে অগাধ ভালবাসাই—প্রেমই—কি ইহাব কাবণ নয? ঐ যে নানা জাতিদেব—তাঁবা বক্ত হিসাবে অনার্য্যই হোন্, কৃষ্ণকায় হোন্, দ্রবিডই হোন্ আব যাই হোন্, তাঁদেব সঙ্গে বামচন্দ্রেব ব্যবহাব ও সম্পর্ক কি ছিল?

আমাদেব সর্ব্বদা স্মবণ বাখতে হবে যে, ভাবতীয আর্য্যেব লক্ষণ অন্য কোন জাতিতে নেই, অন্য সব জাতি হতে আর্য্য একটি স্বতন্ত্র জাতি। এটি স্বীকাব কবেছেন পণ্ডিত মোক্ষমূলাব। তিনি বলেন যে, উপনিষদেব জীবন বাস্তব, যে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভেচ্ছু সকলেব জন্যই দ্বাব মুক্ত ছিল, যে, সত্য বটে নিম্নজাতিদেব ব্রহ্মবিদ্যা দেওযা হত না, কিন্তু মনে বাখতে হবে যে, যেমন ঐ বিদ্বদ্‌জনমণ্ডলীব মধ্যে একজন বর্ব্ববকে স্থান দিলে তাব যে দুর্দ্দশা হয়, তেমনি নিম্ন জাতিদেব ব্রহ্মবিদ্যা দিলে সেই অবস্থাও তাদেব হত। 'গুপ্ত' ব'লে কিছুই ছিল না। আর্য্য জাতিব জাতীয় ভিত্তি ছিল স্বতন্ত্র।

["In India, the truth was open to all who thirsted for it Nothing was kept secret, no one was excluded from the forest of truth . It is true that the lowest class and . were excluded . To admit them to a study of the Veda would have like admitting naked savages to the lecture room of the Royal Institution. . All this shows a *distinct historical*

back-ground and however fanciful some of the details may seem to us, we get the impression that *the life described in these Upanishads was a real life,* that in the very remotest times the settlers in that beautiful and overfertile country were occupied in reasoning out the thought which are recorded in the Upanishads, that *they were really a race different from us, different from any other race* . and that kings and princes among them really descended from their thrones and left their palaces in order to meditate in the dark and cool grooves of their forests on the unsolved problems of life and death"—The Vedanta Philosophy—F Max Muller (Italics চিহ্ন আমাদের).]

রাজা রাজড়াদেরও জীবন বৈরাগ্যময় ছিল, এ দৃষ্টান্ত আর কোথায়? যাই হোক্, মোক্ষমূলার বৈদিক যুগের নিম্ন জাতির কথাই বলেছেন। এখন ঘোলো সভ্যতার যে চোখ্-খোলা বিদ্যা এসেছে, তাতে ভারতের সৌভাগ্যক্রমে, নিম্ন জাতিদের জন্যও, সকল বিদ্যা অর্জ্জনের পথ উন্মুক্ত। নিম্ন জাতিরা অজ্ঞ ব'লেই তাদের ভাল শিক্ষা দিতে হবে আগে, অজ্ঞ ক'রে রাখা হয়েছে ব'লেই তাদের বিদ্যার্জ্জনের সকল পথ খুলে দেবার জন্য, সদাচার ও ধর্ম্মশিক্ষার জন্য উচ্চবর্ণদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে, দাবিয়ে রাখা হয়েছে এতদিন ব'লেই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাদের সেবার ভার নিতে হবে আগে উচ্চবর্ণদের, তবে যাবে বর্ত্তমান হাহাকার, দারিদ্র্যের কঙ্কাল নৃত্য। যথার্থ প্রার্থীদের তবু বৈদিক ঋষিরা বিমুখ করতেন না, আর এখন? ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ হতে বিচ্যুত দুষ্ট পুরুতরা এখন নিম্ন বর্ণের মধ্যে একটা দেওয়াল তুলে দিয়েছেন, আর, নিজেদের সুখ সুবিধার জন্য সমাজ তাঁদের এত দিন প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন, যাদের মধ্যে জাতির জীবনীশক্তি তাদের পঙ্গু করে রেখেছেন। ফলও হাতে হাতে সবাই পাচ্ছেন।

যাই হোক্ মানবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ সত্ত্বেও, তাঁরা এক বিষয়ে একমত, নানা প্রকার পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে তাঁরা সিদ্ধান্তে এসেছেন, যে, মানুষ সভ্যই হোক্ বা বর্ব্বরই হোক্—মানুষের মস্তিষ্ক গঠিত হয়েছে সার্ব্বভৌম ভাব ধারণ করবার উপযোগী হয়ে। এই সত্যটি আর্য্য বুঝেছিলেন অন্য দিক্ দিয়ে। সমাজতত্ত্বের কথা অন্য সময়ে বোঝাবার চেষ্টা

করা যাবে। এখানে হিন্দু-জাতিতত্ত্বের মূল ভাবটি জেনে রাখলে, পরে অনেক বিষয় সহজ হতে পারে।

প্রত্যেক মানুষের আকার, প্রকৃতি ও রুচি বিভিন্ন। প্রত্যেক জীবই তথা প্রত্যেক মানুষই বিভিন্ন সংস্কার নিয়ে জন্মায়। এই হিসাবে প্রত্যেক মানুষই এক একটি 'জাতি'। ফলিত জ্যোতিষের 'জাতি' ও 'বর্ণ' নাম —ঐ দিক্ দিয়ে। পাঁজিতে জাতকের জন্ম সময় ধরে এগুলি নিরূপণ করা হয়। দর্শনশাস্ত্রের 'জাত্যন্তর পরিণাম' এর জাতিই এই জাতি। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে যেমন এক বর্গের বৃক্ষলতাদিগকে সমবর্গে ফেলে সম-জাতীয়ত্ব দেখান হয় ও শ্রেণী বিভাগের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়, সেই রকম জাতি-নিরূপণে কতকগুলিকে সমজাতীয়ত্বের লক্ষণাক্রান্ত ব'লে অঙ্গীকার করা হয়। উদ্ভিদ একটা বৃহৎ জাতি, তার অন্তর্গত বহু সমবর্গ শ্রেণী। মানুষ তেমনি অপর একটি বৃহৎ জাতি, যাতে মানবতার লক্ষণ পরিস্ফুট। এপ্রকার জাতি-বিভাগ বিভিন্ন চিত্ত দলের পরিচয় মাত্র; বৃহত্তর জাতির সঙ্গে একাত্ম বোধ আনাতেই জাতি-জীবনের—ঐ জাতি বিভাগের—সার্থকতা। তাই আর্য্যের জাতি-সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য, মানবতা, সুতরাং কোন এক দলের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য অপর কোন দলকে দাবিয়ে রাখা বা পীড়ন করা, উক্ত সমস্যার বিষয় নয়, উক্ত সমস্যার একমাত্র বিষয় মানুষ দুঃখ পাচ্ছে কিনা দেখা, কোথায় দুঃখ পাচ্ছে, কেন দুঃখ পাচ্ছে তার অনুসন্ধান করা ও দুঃখ দূর করবার জন্য সেবায় লেগে যাওয়া। মানুষ—দল নয়—ইহাই উক্ত সমস্যার বিষয়। এই ভাবে চিত্ত-দলের বিভিন্ন থাক্ সাজিয়েছেন তন্ত্রশাস্ত্র সাধনকাণ্ডে। কুণ্ডলিনীর ছবি, এই চিত্ত-দলেরই ছবি; এক একটি বিভিন্ন সংস্কার নিয়ে এক একটি দল, আর সব দলই—প্রত্যেকটি—এক ব্রহ্মনাড়ীতে গ্রথিত, সব দলেরই একই লক্ষ্য, একই গতি—মাত্র ক্রমাবরণ মুক্তি। 'দলের' সার্থকতা ঐ ক্রমাবরণ মুক্তির জন্যই, স্বার্থলোলুপতায় 'মানুষ'কে নষ্ট করবার জন্য নয়—আবরণের উপর আবরণের চাপে অন্ধকারে ফেলে দিশেহারা করবার জন্য নয়। অতএব, আর্য্যের বিশ্বাস যে, বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার চিত্রদলই এক সূত্রে গ্রথিত, সবই বাস্তব, সবই এক লক্ষ্যে চলেছে, ভেদটা আপাত-প্রতীয়মান—অবস্থান ও অবস্থার ভেদমাত্র। শাস্ত্রে, গুণগুলির লক্ষণ দেওয়া আছে ও সেগুলির বর্ণনাও আছে, সেই অনুসারে জাতি বিভাগে জাতির 'বর্ণ'

নির্দ্দেশ করা হয় মাত্র। পঞ্জিকাগুলিতে আজও এই ভাবে জাতকের 'বর্ণ' নির্দ্দেশ করা হয়। চামড়ার রঙ্ দিয়ে আর্য্যত্ব বা অনার্য্যত্ব ঠিক হয় না।

আকার বা শব্দার্থের সাদৃশ্যকে প্রমাণ ব'লে খাড়া করা যায় না, পূর্ব্বে বলেছি, ভাবের দিক্ও দেখতে হয়। গ্রীক্ পুরাণে, সেখানকার বিবাহ-প্রথার কোন বিধির সঙ্গে হিন্দু-বিবাহ-বিধির সাদৃশ্য আছে দেখে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না। বেদে 'সর্পরাজ্ঞী' কথাটি পাই। অন্যান্য সব দেশে সাপের পূজা ছিল, অতএব, আর্য্যেরা ও সর্প-উপাসক ছিলেন—ইহা ঠিক্ করা হয় কেন? ব্রাহ্মণগ্রন্থে 'সর্পমন্ত্র' আছে, সে অন্য উদ্দেশ্যে। 'সর্পরাজ্ঞী' কাকে বলা হয়েছে ও আচার্য্যেরা ইহার কোন্ অর্থ দিয়েছেন তা জানা দরকার নয় কি? বেদে নরকের কল্পনাও নেই, কিন্তু অন্যান্য স্থানে ভীতিমূলক নরকের বর্ণনা আছে। নরকের কথা, সাপের কথা প্রভৃতি অনেক রকম কথা ভারতে আমদানি হয়েছে পরে—পুরাণাদিতে। অনেক বিষয়, বেদে যা স্পষ্টতঃ রূপক, পুরাণাদিতে সেগুলি বাস্তব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ও সেই সঙ্গে বহু গল্প বিস্তৃতি লাভ করেছে।

[(আমরা শতপথ ব্রাহ্মণে বিধুশেখর বাবুর অনুবাদ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৺ত্রিবেদী মহাশয়ের অনুবাদ অধিকাংশস্থলে অনুসরণ করেছি, পূর্ব্বে বলেছি, অতঃপর তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন)। সর্পরাজ্ঞী—শতপথ ব্রাহ্মণ ২য় কা, ১ প্র, ৪ ব্রা ১।৪—২৯ দ্রঃ। সর্পরাজ্ঞীর ঋক্ সমূহের উপস্থাপন (মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ)। পাদ টীকায়—দ্রঃ ঐ ব্রা ৫।৫।৫, এস্থানে সর্পরাজ্ঞী অর্থে 'পৃথিবী' (মূল শতপথ পরবর্ত্তী কাণ্ডিকা দ্রঃ)। কেননা, এই পৃথিবী 'সর্পতো রাজ্ঞী' অর্থাৎ গমন প্রবৃত্ত স্বামিনী, কারণ ইহা তাহাকে ধারণ করে। সায়নমতে, 'সর্পরাজ্ঞী' ভূমির অবতার রূপ কোন দেবতা, এই ভূমি দেবতা শরীর গ্রহণ ক'রে ব্রহ্মবাদিনী হয়েছিলেন। সায়ন ঋগ্বেদ ভাষ্যে (১০।১৮৯) 'সর্পরাজ্ঞী'কে ঋষি বলেছেন ও তাণ্ড ব্রাহ্মণে (৯।৮।৭) ব্রহ্মবাদিনী লিখেছেন। এখানে তাঁর ব্যাখ্যা, সর্পণ = গমনশীল (প্রাণীদের রাজ্ঞী)। মহীধর মতে (বা. স. ৩।৬), সর্পরাজ্ঞী = পৃথিব্যাভিমানিনী কদ্রু। দ্রঃ আর্ষেয় ব্রা।৩।২০। ঋগ্বেদ ১০।২৮৯।৩য় সূক্তের দেবতা 'সূর্য্য' বা 'সপরাজ্ঞী')]।

'সর্প' কথাটি দেখেই ভড়্কে যাওয়া ঠিক্ নয়। 'সর্প' ব্যক্তি বিশেষের নামও দৃষ্ট হয়, যেমন 'সর্প উবাচ'—পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, "বেদ্যং সর্প পরং ব্রহ্ম নির্দ্দুঃ * * * (মহাভারত বনপর্ব্ব ১৮০।২২), হে, সর্প জেনো পরমব্রহ্ম সুখদুঃখ হীন।'

[ঋগ্বেদ, ১০।১৯০।১ মন্ত্রগুলির নাম সর্পরাজ্ঞী মন্ত্র। ভূমি দেবী এই মন্ত্র সাক্ষাৎকারের পর, নানা বর্ণের বৃক্ষ ও ওষধি সমূহ পেয়ে লোমযুক্ত হয়েছিলেন। ভূমিই সর্পরাজ্ঞী, কারণ ভূমি সর্পণশীল (গতিশীল) সর্ব্ব জীবের রাজ্ঞী (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ২৪ অধ্যায়, ৪র্থ খণ্ড দ্রঃ) সর্পিঃ = ঘৃত বা তেজ (ঐ ঐ ৩৯। ষষ্ঠ খণ্ড, ক্ষত্রিয়ের মহাভিষেক দ্রঃ। সর্প এক জন ঋষি। সর্প ঋষির মন্ত্রও আছে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ২৬শ অধ্যায়, ১ম খণ্ড—গ্রাবস্তুতের কার্য্য]।

সর্পঋষি, ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৯৪ সূক্তের দ্রষ্টা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উদ্ধৃত অধ্যায়েই বলা হয়েছে যে সর্পঋষির মন্ত্রে সোমে মত্ততা আনায় ও সেই মাদকতা বিষ দূর করবার জন্য দেবতারা ১।৯১।১৬ মন্ত্রদ্বারা 'শোধন' করেন—তুলনা করা হয়েছে সাপের খোলস ছাড়ার সঙ্গে। সর্পরাজ্ঞী মন্ত্র (ঋ ১০।১৮৯) সূর্য্যের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। 'অহি' মানেও সাপ। রূপকে বিদ্যুৎকেও সাপ বলা হয়। বৃত্র বিষয়ক 'অহি' = অন্তরীক্ষের দেবতা (ঋ. ২।৩৬।৬); সেখানে অহিকে দেবতা বলা হয়েছে। অধ্যাপক দাস মহাশয়, তাঁর (Ṛgvedic India তে বহু যুক্তির অবতারণা ক'রে প্রমাণ করেছেন,

"The ancient Babylonian worship of the earth in the emblem of a serpent, is therefore, not indegenous to the land or Southern India nor peculiar to the Dravadians."

অর্থাৎ সাপের পূজা ভারতে আমদানি হয়েছে বাইরে থেকে; এটা ভারতের নয়, দক্ষিণ ভারতেরও নয়, দ্রবিড়দের মধ্যেও এ ভাব ছিল না। প্রাচীন বাবিরুষেই সর্প-প্রতীক পৃথ্বীর পূজা ছিল। বাহির হ'তে যখন এসে পড়ল, তখন ভারত ঐ সব ভাবকে "ঈশা বাস্যং" করে নিলেন—Animismএর দৃষ্টিতে নয়!

Taylor প্রমুখ ধোলো পণ্ডিতেরা মোক্ষমুলারাদি বিদ্বদ্‌জনের 'আর্য্য-নিবাস' সম্বন্ধে মতবাদ মানেন নি, বরং ঐ মতটিকে ("Mischievous"), দুষ্ট বুদ্ধি প্রসূত বলেছেন। বহু ধোলো পণ্ডিতেরা ভুলে যান যে ভারতে গৌরবর্ণ (শ্বেত) বলতে বোঝায় স্বর্ণকান্তি—একেবারে সাদা নয়। 'হেমনিভ' 'হেমপ্রভা', 'চম্পক বরণী' প্রভৃতি কথাগুলির বহুল প্রয়োগ আছে। 'সুন্দর' বলতে বরং দুধে আলতার রঙ্ ভারত পছন্দ করেন এখনও বৈদিক

সাহিত্যের 'হিরণ্ময়' বা 'স্বর্ণকান্তি' ইউরোপে নেই, মেণ্ডেল (Mendel) মতের 'dominant factor' নীলচক্ষু ভারতীয় আর্য্যের নেই। সোমলতার জন্মস্থান কাশ্মীর, পৃথিবীর অন্যত্র উহা পাওয়া যায় না ("Vedic India"—Rogozin দ্রঃ)। দক্ষিণ আফ্রিকায় হটেনটসরা শ্বেতবর্ণ, সাইবিরিয়ার মঙ্গোলরাও শ্বেতকায়। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা দেখাবেন যে রক্ত মিশ্রণ ফলে ও বিভিন্ন আব্‌হাওয়ার জন্যই চামড়ার রঙ্ নানারকম হয়। আর, ঐ যে 'কর্পূর কুন্দ ধবল' রূপ শিবের, বলা হয়, ইহা সাধকের ভাবানুসারে—হিমালয়ের মাথায় বরফের সঙ্গে তুলনা ক'রে, নতুবা অন্যত্র শিবের রূপ 'হেমনিভং হরং' বলা হয়েছে। ভারতের একমাত্র লক্ষ্য, কিসে মানুষ ত্রিতাপ হ'তে মুক্ত হয়, কিসে মানুষ মানবতা লাভ করতে পারে।

বাইবেলে Solomonএর সময় যে সব জিনিষের নাম পাওয়া যায় তার অনেকগুলি হিব্রু নয়, যথা Sandal Woods, চন্দন কাঠ,, একমাত্র দাক্ষিণাত্যে মালাবার উপকূলেই পাওয়া যায়, এই রকম ivory (হাতির দাঁত) apes (বানর), peacock (ময়ূর) প্রভৃতি বহু শব্দ, মোক্ষমূলারের মতে, সংস্কৃত হতে হিব্রু ভাষায় গৃহীত। Dr. Caldwick সাহেবের মতে, ঐগুলি দ্রাবিড়ী ভাষা হতে সংস্কৃতে এসেছে। Professor Sayceএর মতে, সাইবিরিয়ার পূর্ব্ব উপকূল হতে স্কাণ্ডিনেভিয়া ও পশ্চিম রুষ পর্য্যন্ত যে সবভাষা আছে, তাদের উৎপত্তি হয়েছে একটি সাধারণ ভাষা হতে। অন্যত্র তিনি বলেছেন, (Science of Language Vol II—Sayce) যে সেমিতিক গোষ্টির ভাষা, উত্তর ও দক্ষিণ, এই ভাবে ভাগ করা যায়, যথা, উত্তর বিভাগে আসিরিয়া, বাবিলোনিয়া হিব্রু ও সিরিয়া ভাষা এবং দক্ষিণ বিভাগে আরবী ও আবিসিনিয়ার ভাষা। এইত গেল সেমিতিকদের কথা। বিদুষী Rogozin জিজ্ঞাসা করেছেন যে তা হলে আক্কাদের মধ্যে উচ্চতর সভ্যতা এসেছিল কোথা হ'তে? অধ্যাপক শ্রুডার (Professor Shruder) ও দেলিৎজ (Delitz) সাহেবের মতে, সেমাইটরাই ঐ সভ্যতা আনে, কিন্তু ফ্রান্সিস্ লেনারমূত (Francis Lenarmout) প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে, ঐ সভ্যতার মূল উৎস ভারত (Vide 'The story of Chaldœa')। ঐ সব মনীষীদের পরে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, ঐসবে ইহাই প্রমাণ হয় যে (১) সেমাইট অপেক্ষা আক্কাদরা

সভ্যতব জাতি ছিল, যে, (২) সেমাইটবা আক্কাদ জাতিব কাছে বিদ্যাবুদ্ধিব জন্য বহু বিষযে ঋণী, যে, (৩) আক্কাদ্‌বা বাণমুখো লিপিতে (Cuneiform inscriptions এ) যে সব স্তুতি লিখে বেখে গেছে—যা আজও বর্ত্তমান—সেই সব প্রার্থনা যেন ঋগ্বেদেব বহু প্রার্থনাব অনুবাদ। চীনদেশেব প্রাচীন ইতিহাস হতে যতদূব জানা যায—ঐ দেশেব পণ্ডিতদেবও মত—যে চীনাবা কোন পশ্চিম দেশ হতে এসেছেন। হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে যে 'চীন' নাম পাওয়া যায়, তা বর্ত্তমান চীন নয়, হিমালয়েব কোন উত্তবাংশ (স্বামীজিব 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' দ্রঃ)। চীনাবা কি তবে ভাবতীয় কোন যাযাবাব বংশধব, যাঁদেব বাসভূমি ছিল ভূস্বর্গ হিমালয়? চীনাবা কি এই জন্যই নিজেদেব 'স্বর্গ নিবাসী জাতি' (Celestial people) বলেন? বাজকীয় ভাবে 'চীনা' নামটি ঘোষণা কবেন থস্ম (Thsm) বংশেব একচ্ছত্র সম্রাট শিহোয়াংটি (Shihoungti—খৃঃ পূঃ ২৪৭)। সম্প্রতি জাপানী বোমাব দ্বাবা ভগ্ন চীনা প্রাচীবে বৈদিক ভাষায় 'লিখিত' যে মনুসংহিতা পাওযা গেছে তাতে চীনেব সঙ্গে ভাবতেব সম্পর্ক দৃঢ়তব ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ইহাতে প্রমাণ হয়েছে যে খৃঃ পূঃ ৮৫০০ বর্ষ পূর্ব্বেও ভাবতেব বিদ্যা, ভাবতেব ভাব, ঐদেশে সঞ্চবিত হয়েছিল। ইহাতে প্রাচীন চীনেব ইতিহাস—যা এতদিন বিস্মৃতিব গর্ভে ছিল—জানা যায়। ঐ ইতিহাসকে একজন গোঁড়া চীনবাজা—চীন্ ইজে ওয়াং (Chin Ize Wang)—নষ্ট কবতে চান, কিন্তু একজন পুবোহিত উহা বক্ষা কবেন। এখন ঐসব হস্তলিখিত দলিল বিলাতে—লণ্ডনে—রক্ষিত হয়েছে। ডাবউইনেব ক্রমোন্নতিবাদ—যাকে নতুন বলা হয়—তখনও চীনদেশে অবিদিত ছিল না।

["The Darwinian theory of evolution was known and accepted in China seven thousand years ago Laws of Manu written in Vedic language about ten thousand years ago were the basis of Chineese Law at about the same period These far reaching discoveries of ancient Chineese civilization were made possible by a Japaneese bomb, which blew off a part of the Chineese Wall some four years ago Underneath the wall deep down in the earth was a canister, which contained the most valuable

manuscript laying bare the forgotten treasures of Chineese civilization The history of this manuscript is explained by its priest author Emperor Chin Ize Wang wanted it to be known to posterity that all the achievements of the Chineese civilization were made during his reign .. ..So he got all ancient history books destroyed . It was the ingenuity of a priest-author of the period which made possible for us to know of the state of civilization before the Emperor He buried his own manuscript in a canister and explained in a prefactory manuscript the conditions under which it was written.

The manuscript, which was bought by Sir Augustus Fitz George, was duly brought to London and handed over to a group of Chineese experts headed by Professor Anthony Graeme After a long period of research and translation, the secret of the manuscript is now announced for the public 'When I showed the first translations to Sir Wallace Budgge of the British Museum', said Professor Graeme, 'he said that the manuscript was of even greater value than the Codex Sinaiticus In the manuscript I find direct reference to the Laws of Manu which were first written in the Vedic language 10,000 years ago These in turn, refer to the theory of Darwin put forward . Further discoveries include the secret of long life It is now believed that they lived on a secret diet. We find reference in the manuscript to the juices of the Cypress tree which is to-day regarded as a *tree of death.* We have also found—and proved—that in those days there waa a distinct relationship between the people of India, America and China. We actually found reference to the ruined cities which have been found in the centre of the Peruvian forests'."—The Amrita Bazar Patrika, Friday, April 24, 1936.

ইউনাইটেড প্রেস্ এই সংবাদটি Air Mailএ লণ্ডন হতে উক্ত পত্রিকাকে পাঠান] ।

নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে খৃঃ পূঃ ৮৫০০ বর্ষে ও ভাবতেব সঙ্গে চীন ও আমেবিকা—পেরুব—একটা গাঢ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল, এমন কি সেই অতীত যুগেও মনুব বিধানেব উপব ভিত্তি ক'বেই চীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। (ইহাও প্রমাণিত হযেছে যে হোমাব লিখিত কাব্যেব উপকবণ সমস্তই ভাবত হ'তে গৃহীত, সেও অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ৪ বা ৪৫০০ বর্ষে।)

ঋগ্বেদ (১।৩৩৩।২-৫) এ দেখা যায় যে আর্য্যেবা তাঁদেব অনুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন কববাব জন্য, 'বক্তবর্ণ' অনার্য্য পিশাচেব হাত হ'তে বক্ষা পাবাব জন্য প্রার্থনা কবছেন। ঐ 'বক্ত বর্ণ' অনার্য্যেবাই, আর্য্য ধর্ম্মাচাবে বিশ্বাসহীন ছিল ব'লেই, প্রথম বিবোধেব সৃষ্টি কবত; আর্য্যেবা শুধু বিপদ হ'তে মুক্ত হবাব জন্য প্রার্থনাই কবেছেন প্রথমে। ঈজিপসিয়ানবা ছিল বক্তবর্ণ, আক্কাদবাও ছিল বক্তবর্ণ। কাবোব কাবোব মতে আক্কাদদেব আদি বাসভূমি ছিল পাবস্যেব পর্ব্বতমালা, অন্যমতে আক্কাদদেব Chaldea ও Assyria ই আদি নিবাস। দাস মহাশয়েব মত পূর্ব্বে বলেছি। যাই হোক্, তুবাণী, মঙ্গোল, শামান প্রভৃতি জাতিবাও ছিল বক্তবর্ণ। ইউবাল অল্টাই প্রদেশেব ধর্ম্ম প্রধানতঃ ছিল শামন জাতীয় ("essentially Shamanistic"—Sayce)। ভাবতেব বাহিব হ'তে নানাজাতিব অভিযান বাববাব ভাবতে এসেছে, তাব ফল অধিকাংশ স্থলেই হযেছে লুণ্ঠন ও আর্য্য-ধর্ম্মাচাবেব উপব অত্যাচাব, কিন্তু ভাবত হ'তে যে সব অভিযান ভাবতেতব দেশে গিয়েছে, সে সব অভিযানে বক্তপাত ত হয়ই নি, হয়েছে শান্তিব বাণী প্রচাবিত, ভাবতের ভাব সঞ্চবিত।

মোক্ষমূলাব প্রমুখ বিদ্বদ্‌কুলের 'আর্য্যজাতি ও আর্য্যশাখা' বিষয়ক মত নৃতত্ত্ববিদ্ Topinard ও Furthermore বিধ্বস্ত কবেছেন। Topinard বলেন যে এশিয়া হ'তে মাত্র আর্য্যভাষাই ইউবোপে এসেছিল, বক্ত এখন নেই ("the blood has disappeared"); Furthermore স্পষ্টই বলেন যে ইউবোপনিবাসীবা আর্য্যবংশসম্ভূত নয় ("the Europeans··· were not Aryans nor were they descended from them")। Rogozin, Francis Lenormautবা দেখিয়েছেন যে ঋগ্বেদেব 'মান' শব্দটি প্রাচীন Chaldea 'বা Semitic Babylonএ, ও পবে গ্রীসে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থবিভাগে। তাঁদেব মতে, ভাবতীয়

দ্রবিড়দের সঙ্গে বাবিরুষের ব্যবসায়ঘটিত আদান প্রদানের উহাই নিশ্চিত প্রমাণ। ঐ রকম 'সিন্ধ' মানে ভারতজাত মস্‌লীন—বাবিরুষ ভাষায়। ধোলো মতে 'সিন্ধ' আর্য্য-মনীষার ফল হলেও, ব্যবসা ছিল নিশ্চয়ই দ্রবিড়দের হাতে, কারণ আর্য্যদের সমুদ্রগামী পোত ছিল না, অথচ ঋগ্বেদে সমুদ্রগামী অর্ণবপোতের উল্লেখ আছে। Furthermore প্রমাণ করেছেন যে দ্রবিড় জাতিদের সঙ্গে আর্য্যদের কোন কালে কোন বিরোধ ছিল না।

(" that their Dravidian contemporaries were enterprising tribes, that the relation between the two races were by no means hostile and warlike nature · ")

প্রাচীনযুগে একমাত্র ভারতই তুলা ও তুলার ব্যবহার জানতেন। তাই আর্য্যেরা বরাবর কাপড় পরেই আসছেন। ধুতি পাগড়ীর ব্যবহার ভারতে চিরকাল। ভারত হ'তে তুলার ব্যবহার শিখে গ্রীকরাও ধুতি পরতে শেখেন। ইউরোপের মধ্যযুগে, যে সময় সমস্ত ইউরোপে বিদ্যা, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি হ'তে আরম্ভ করে, সে সময়েও কেউ তুলার নাম পর্য্যন্ত শোনেন নি! ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশে পশম, রেশম ও পাট, শন প্রভৃতি গাছের সূতা দিয়ে গাত্রাবরণ তৈরী হত। উক্ত মধ্যযুগেও ঐ সব গাত্রাবরণ ছিল—পাট ও শনের (Flax) খুব চল্ ছিল। ঈজিপ্টে 'ফ্লাক্‌স্' (Flax=পাট, শন প্রভৃতি উদ্ভিদ্ জাতীয় গাছ হ'তে সূতা) হত। ("Flax appears to be indigenous in Egypt"—Vide "Cotton Manufacture in Great Britain"—E. Baines)। সাহেব বলছেন, ঈজিপ্টে জোসেফের সময় (খৃঃ পূঃ ১৭০০) সূতো কাটা ও সূতো বোনার বিদ্যা অজ্ঞাত ছিল না; প্লিনির মতে, আসীরিয়ান রাজ্ঞী সমীরমিসই বস্ত্র বয়নবিদ্যা আবিষ্কার করেন কথিত আছে, আর 'মিনার্ভা' (Minerva) শেখাতেন সূতো কাটা বিদ্যা। এই সম্মান ঈজিপ্‌সিয়ানরা দেন Isis (আইসিস) কে, মুসলমানরা দেন জেফেটের এক ছেলেকে ("to a son of Japhet"), চীনারা দেন তাঁহাদের মহারাণী Yeo (ইয়ো) কে, Peruvians (পেরুভিয়ানরা) দেন তাঁদের প্রথম রাণী ' (Maneo capac এর স্ত্রী Mamœlla) মেমিলাকে, সাহেব বলছেন যে ঐ সব কাহিনী হতেই বোঝা

যায যে বস্ত্র বয়ন ও সূতা কাটা বিদ্যা অতীত যুগ হতে আছে। খৃঃ পূঃ ৪৪৫ বর্ষে, Herodotusএব (হেবোডোটাসেব) সময়, ভাবতে তুলাব পোষাক ছিল সাধাবণ পোষাক, Herodotus আশ্চর্য্য হযে বলছেন যে, একমাত্র ভাবতেই এমন এক অদ্ভুত বৃক্ষ আছে যাব ফল হয় না, কিন্তু তাতে জন্মায় অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দব পশম যা ভেড়াব লোমেব চেযে উৎকৃষ্ট, ("produces wool of a fine and better quality than that of sheep"), আবও আশ্চর্য্যেব বিষয় যে ভাবতবাসীবা তা হ'তেই আবাব কাপড তৈবী কবে। ঐতিহাসিক আবিয়ান (Arian) আলেকৃজাণ্ডাবেব কথা উত্থাপন ক'বে বলছেন "গাছেব উপব একটা বস্তু জন্মায় যা হতে ভাবতবাসীবা 'ফ্লাকৃস' অপেক্ষা সূক্ষ্ম পোষাক তৈবী কবে, আব ভাবতবাসী ঐ গাছকে বলে 'টালা' ('tala'=তুলা)। আবিয়ানেব মৃত্যু হয় ২৫ খৃষ্টাব্দে। তিনি দেখে যান যে পাবস্য উপসাগবেব পাবস্য প্রদেশস্থ অন্তবীপ (Susiana) সুসিয়ানাতে তুলাব কাজ বিস্তৃতি লাভ করেছে। প্লিনিব সময়ে Tylos দ্বীপে (পাবস্য উপসাগবে) ও ঈজিপ্টেব উত্তবাংশে তুলাব চাষ বেশ চল্ হয়েছে। গ্রন্থকাবেব (উক্ত Edward Baines এব) মতে, ভাবত-জাত তুলা প্রাচ্য ভূখণ্ডে আমদানি হ'তে আবম্ভ হয় খৃষ্টাব্দ ৫৫২ হ'তে, যাব প্রমাণ নিঃসন্দেহ রূপে 'Justinean's Digest of Laws' হ'তে পাওয়া যায়।

ভাবতই জগতকে সর্ব্ব-বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে এসেছেন। আমবা ঘবে ব'সে এখন যতই অতীতেব বডাই কবি না কেন, ঘবেব কথা আমবা আজ ভুলেছি, ধোলোবাই প্রথম আমাদেব ঘবেব কথা আমাদেব জানিয়ে দেন। আজও কি আমবা ঘবেব দিকে দৃষ্টি দিচ্ছি জাতি হিসাবে? বৃথা বডাইএব আস্ফালন না ক'বে এখন দবকাব ঘবেব দিকে দৃষ্টি ফেবান, নিজেব চোখ দিয়ে।

বিজ্ঞানের কথা

(১)

আমরা দেখেছি যে অতি প্রাচীনকালেও আর্য্যের জড় বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান ছিল। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে যে রজোগুণের দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে ("আকৃষ্টেন রজসা"), সূর্য্য হিরণ্ময় রথে চ'ড়ে সব দেখতে দেখতে অগ্রসর হন। ঘোলো বিদ্যায় শিক্ষিত হ'য়ে আমরাও বলি যে সূর্য্যাদি ত সমস্তই জড়পিণ্ড। ঋগ্বেদের ঋষিরাও "আকৃষ্টেন রজসা" রূপ শক্তির কথা জানতেন, আর, সেই সঙ্গে সৌরমাস ও চান্দ্রমাসের কথাও জানতেন, জানতেন যে গ্রহ আদি যা কিছু দৃষ্ট হয় সবই জড়পিণ্ড, তবু তাঁরা সূর্য্য প্রভৃতিকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন—মাত্র বাহিরের জলন্ত অগ্নি পিণ্ডকে দেখতেন, না, তার অভ্যন্তরের অন্য কিছুকে দেখতেন—সেটা বোঝা দরকার। বহু পরবর্ত্তীকালে আর্য্য-জ্যোতির্ব্বিদ আর্য্যভট্ট (খৃঃ পূঃ ১০০ বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী) ঐ 'আকৃষ্ট শক্তির' কথা বলে গেছেন। তাঁর মতে, "শূন্যে গুরুভার জিনিষকে, ঐ 'আকৃষ্ট শক্তির' জন্যই, পৃথিবী নিজ অভিমুখে আকর্ষণ করে (পৃথ্বী) স্ব শক্তিতে শূন্যে অবস্থান করছে ও সমস্তই তার পৃষ্ঠে রয়েছে·· ।" (সিদ্ধান্ত শিরোমণি দ্রঃ)। মহামতি নিউটনের মাধ্যাকর্ষণবাদ (Law of Gravitation) আজ পর্য্যায়চ্যুত হ'য়ে আইনষ্টিনের মতবাদে এসে পৌঁছেচে। 'আকৃষ্ট-শক্তি' রজোগুণের একটি প্রকাশমাত্র, এখন তার নাম যাই দেওয়া হোক্। ঘোলো মতের ধাঁধায় প'ড়ে আমরাও পূর্ব্বে ঐ 'আকৃষ্ট শক্তিকে' মাত্র Gravitation মনে করে এসেছি, কিন্তু রজোগুণের দ্বারা ঐ আকৃষ্ট শক্তির অর্থ আরো ব্যাপক।

আর্য্য-ভট্ট ছিলেন তখনকার একজন প্রধান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত—শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ ও গণিতবিদ্। কার্য্যকারণ পরম্পরা বুঝতে না পেরে যে মন প্রাকৃতিক শক্তি দেখে বিহ্বল হয়, সে মন যে তাঁর ছিল না, ইহা নিশ্চয়। তিনি ও সূর্য্যকে "বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম তন্মূর্ত্তি পুরুষঃ পরঃ" বলতে কুণ্ঠিত হন নি। স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য, যে দেশে কখনও অত্যাচার হয় নি, মানুষকে পুড়িয়ে মারে নি, সে দেশের একজন পণ্ডিত যে একটা কুসংস্কারকে (যেমন বলা হয়) লোকাচার ভয়ে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, মনে হয়

কি ? তিনি ভাগবৎ সম্প্রদায়েব প্রতিধ্বনি ক'বে বলছেন যে, সূর্য্য 'অব্যক্ত', 'নির্গুণ', 'শান্ত' ও 'সর্ব্বাতীত পুরুষ', সূর্য্য 'সর্ব্বব্যাপি', সৃষ্টিব আদিতে তিনি প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে কাবণবাবিতে নিজ বীর্য্য প্রদান কবেন, নাম হয় তাঁব 'সঙ্কর্ষণ'। ঐ তমসাবৃত 'অপ'ই স্বর্ণ অণ্ডৰূপে পবিণত হয় ও তাব মধ্যে প্রথম ব্যক্ত পুরুষই সনাতন 'অনিরুদ্ধ'—ছন্দৰূপে বেদে যাঁব নাম 'হিবণ্যগর্ভ', আবির্ভূত হ'লেই ইনি হন 'আদিত্য', সৃষ্টিব প্রসূতি ব'লেই এঁব নাম 'সূর্য্য', 'অনিরুদ্ধ'ই পবম জ্যোতির্ম্ময় সবিতা। 'সূর্য্য'ই তমোনাশক, মহান ও প্রকাশ স্বৰূপ—ঋগ্বেদ তাঁব মণ্ডল, সামবেদ তাঁব কিবণ, যজুর্ব্বেদ তাঁব মূর্ত্তি ..। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত দ্রঃ)। জড় পিণ্ডেব আববণ ভেদ ক'বে ভাবতেব জ্যোতির্ব্বিদবাও স্বৰূপতত্ত্ব বোঝবাব চেষ্টা কবেছেন—সমস্ত অপবাবিদ্যা তখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। ভাবতেব চিন্তাধাবাব সঙ্গে অন্যান্য দেশেব চিন্তাধারাব ইহাই পার্থক্য। বেদেও দেখি, সূর্য্যেব বিভিন্ন অবস্থাব বিভিন্ন নাম—দুপুবেব সূর্য্য হচ্ছেন 'বিষ্ণু'—পালনী শক্তিব তীক্ষ্ণ প্রকাশ—ইত্যাদি। ভাবতেব চিন্তা-প্রবাহ ববাবব চ'লে এসেছে কোন্ পথ ধ'বে এটি না জানলে, আর্য্যেব সংস্কৃতি—জাতীয় কৃষ্টি—বোঝা অসম্ভব। দৃষ্টি ভাবতীয়েব চাই। সর্ব্বত্রচাবী এক বিবাট শৃঙ্খলা নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত হ'যে চলেছে এক অখণ্ড মহাশক্তিব নিয়ন্ত্রণে; খণ্ডেব, এই অখণ্ডেব আজ্ঞাবহতা ভাবত শিখিয়েছেন সর্ব্বক্ষেত্রে। কল্যাণশক্তিব আজ্ঞাধীনতা—ঠিক্ ঠিক্ সশ্রদ্ধ আজ্ঞাবহতাতেই হয় অগ্রগতি, জাগে একাত্মবোধ।

নক্ষত্রাদিব অবস্থান নিৰূপণ কববার জন্য বৈদিক যজ্ঞে জ্যোতিষশাস্ত্র জ্ঞানেব প্রয়োজন হত। যেমন, 'কৃত্তিকা'—অগ্নি বা ক্ষুবসদৃশ ছয়টি নক্ষত্রেব সমষ্টি—পূর্ব্বদিকেই থাকে, উত্তবে বা দক্ষিণে স'বে যায় না; 'বোহিণী' আব একটি নক্ষত্র—স্থিব থাকে। বোহিণীব বোহিনীত্ব এই যে ইহা প্রজা ও পশুগণেব সাধনস্বৰূপ।

ইন্দ্রেব বহস্যনাম, অর্জ্জুন। ফল্গুনী নক্ষত্রদ্বযকে 'অর্জ্জনী' বলে। যজমান ইন্দ্রস্বৰূপ; অতএব ইহাতে স্বকীয় নক্ষত্রে অগ্নিদ্বয় আধান কবতে হয়।

চিত্রা নক্ষত্রেব অদ্ভুত স্বভাব, (তাই চিত্রা=বিস্মিত)। "চিত্রায়াং ক্ষত্রিয়স্য" (কাত্যায়ন শ্রৌ ৪ শ. ৪.)।

"এই সমস্ত নক্ষত্র পূর্ব্বে ঐ সূর্য্যেব ন্যায় ভিন্ন তেজ ('ক্ষত্র') ছিল।

কিন্তু ইহা (সূর্য্য) উদিত হ'তে হ'তেই ইহাদের বীর্য্য ও তেজ ('ক্ষত্র') আদান (গ্রহণ, আ+√দা) করে, তাই ইহার নাম আদিত্য ; কেন না ইহা নক্ষত্র সমূহের বীর্য্য ও তেজ আদান করে। দেবগণ বলেছিলেন— 'সেই যার আগে ছিল 'ক্ষত্র' (তেজ)—(এখন) তারা আর তেজ নয় (ন-ক্ষত্র)' "।

[উক্ত নক্ষত্রাদির বিষয়—শতপথ ব্রাহ্মণ, ১ম প্র, ১ম ব্রা, ১—১—৬ , ১প্র, ২ব্রা, ১অ, ২ ব্রা —১১ , ঐ ঐ ঐ ১৭।১৮ , ১৮।১৯ ও ১৯ মূল ও পাদ টীকা দ্রঃ] । ঐরকম 'ত্বষ্টা' নাম দেখতে পাই। (শতপথ ব্রা, ১ম কাণ্ড ৭ম, প্র. ৩ ব্রা।১০ মূল ও পাদটীকা দ্রঃ।) বৈদিক সাহিত্যে 'ত্বষ্টা' বারবার রূপকর্ত্তা রূপে বর্ণিত—"ত্বষ্টা রূপাণাং রূপ কৃৎ রূপপতিঃ" (শতপথ ব্রা. ঐ ঐ ১১. ৩-১৭. দ্রঃ)। "ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু "(ঋগ্বেদ ১০-১৮৪-১) , "ত্বষ্টা রূপানি সহি প্রভুঃ" (ঋগ্বেদ ১,১৮৮,৯)]।

ত্বষ্টা, বীজের ভিতর থেকে রূপাবয়ব নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান ধোলো বিজ্ঞান Embryology, Biology ইত্যাদি নানা কথা জীববিজ্ঞানে বলছেন। সর্ব্বত্র এই বীজ বা বীজকোষগুলি একই উপাদানে সংঘটিত, কিন্তু ঐ গুলি নানা আকারে—নানা রূপাবয়বে পরিণত হয়। প্রতি জাতির (বীজের) সংস্কারানুযায়ী 'ত্বষ্টাই' রূপ নির্ম্মাতা।

নক্ষত্রগুলির নাম দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে যে পূর্ব্বে নক্ষত্রগুলি প্রত্যেকটি সৌরজগৎ ছিল, (যেমন কৃত্তিকা) বা সূর্য্য। এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি সে যুগেও অজ্ঞাত ছিল না। ধোলো বিজ্ঞান আজও জানেন না, কেন একই উপাদানে গঠিত বীজ নানা প্রকার রূপাবয়বে পরিণত হয়। বলা হয়, তখন আধুনিক বিজ্ঞানের কোন যন্ত্রাদি ছিল না। তা হ'লে কি ক'রে ঐ সব নিরূপণ হ'ত? স্বীকার করতে হয়, তখন ঐ সব তত্ত্ব ধ্যান সহায়ে দৃষ্ট হ'ত—একাগ্র চিত্তের সামনে সত্য দীপ্ত হ'য়ে প্রকাশিত হত। ধ্যানের কেন্দ্র বিন্দু হ'ত, রূপ বা রূপাবয়ব অথবা খুঁটি নাটির কোনটিই নয়—কেন্দ্রবিন্দু হ'ত সেই সর্ব্ব-নিয়ন্ত্রিনী শক্তি। তাই থাকত না জড়ের দৃষ্টি।

[কালচক্রের বিভাগ ক'রে দেখানই জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশেষত্ব। প্রাচীন ভাবতে তিন রকম উপায়ে কাল পরিমাপ বোঝান হত। গুরু অক্ষর, যেমন, অ, উ, ঋ, ইত্যাদি উচ্চারণে যে সময় লাগে তার নাম 'গুর্ব্বক্ষর'। হিসাব এই— ১০ গুর্ব্বক্ষর=১ অণু বা প্রাণ, ৬ অণু=১ বিনাড়ী, ৬০ বিনাড়ী=১ নাড়ী, ৬০ নাড়ী=১ দিন। ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম ভাগ—৬০ অনুপল=১ বিপল, ৬০ পল=

১দণ্ড , ৭½ দণ্ড=১ প্রহর ; ৮ প্রহর=১ দিন। ১ নাডী=৬০ বিপল বা পল, নাডী=দণ্ড। এইবকম কাল বিভাগের নাম 'মূর্ত্তকাল'। আব এক রকম অতি শূক্ষ্ম বিভাগ প্রচলিত ছিল যা এখন লোপ পেয়েছে, তাব নাম 'অমূর্ত্তকাল'। তাব হিসাব—১০০ ত্রুটি=১ তৎপব, ৬০ তৎপর=১ নিমেষ, ১৮ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ৩০ কাষ্ঠা=১ কলা ; ৩০ কলা=১ ঘটিকা, ২ ঘটিকা=১ ক্ষণ, ৩০ ক্ষণ= ১ দিন। 'ত্রুটি' বলতে বোঝায় 'পরমাণু', এই পরমাণুব ১টি স্পন্দনে যে সময় লাগে তার নামই 'ত্রুটি'। ঘটিকা মানে 'দণ্ড' বা 'নাডী'। এই রকম ভাবেও গণনা হ'ত, যাব উদ্ধাব চেষ্টা আব হয় নি। ইহা যেন বিশ্বগতির স্পন্দন-কাল ধরবার গণনা—ধ্যানগম্য, সৃষ্টিরহস্যের মূলে যাবার চেষ্টা।]।

ধোলো বিজ্ঞানেব উদ্দেশ্য বস্তুজ্ঞান লাভ কবা, আর্য্যবিজ্ঞানেব উদ্দেশ্য বস্তুব স্বরূপজ্ঞান লাভ করা। পদার্থেব মুল—মূল বস্তুব—অনুসন্ধান কবাই ধোলো বিজ্ঞানেব লক্ষ্য, আর্য্য অপবা বিজ্ঞান চান, বস্তুব পবিচয় লাভ ক'বে তাব প্রাণশক্তি অনুসন্ধান কবতে।

এখানে বলা বাহুল্য যে ধোলো বিজ্ঞানপ্রণালীব অনুসন্ধানবীতি অধিকতব বাস্তব, অধিকতব নিশ্চিৎ, অধিকতর বিদ্যার্থীব উৎসাহ উদ্দীপক, অধিকতব সাধাবণগম্য, অধিকতব সুখকব। তবে ইহাও ঠিক যে ধোলো বিজ্ঞান বস্তুজ্ঞানেব উর্দ্ধে আজও যেতে পারে নি, আব সেই জন্য এই বস্তুবিদ্যা আজ তাঁদেব ঘাডে চেপে গলা টিপে মাববাব উদ্যোগ কবছে—বস্তুবিজ্ঞান কখন কোন নিয়ন্ত্রিণী শক্তি স্বীকাব কবে নি। বস্তুবিজ্ঞান আজ খণ্ড খণ্ড দস্তরূপে পবস্পর পবস্পবেব প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে কবালমূর্ত্তিতে খাডা হয়েছে। 'ঈশাবাস্যং' ক'বে নেওয়া ছাডা বাঁচবার অন্য উপায় আছে কি? প্রবৃত্তি বা অবসব আছে কি এখন এসব বুঝতে চেষ্টা কববাব?

ধোলো বিজ্ঞান দেখাচ্ছেন যে, বিভিন্ন অণুব সংযোগে আব একটি নতুন জিনিষেব উদ্ভব হয়। বহু যুগ পূর্ব্বে বৈশেষিক দর্শন বলেছেন যে দ্ব্যণুকেব উৎপত্তি হয় অণু আদিব সংঘাতে। "তত্র স্বাবস্থিতাকৃষ্টশক্তি" (জৈন দর্শন)। এখানেও 'আকৃষ্ট শক্তি'ব কথা বলা হয়েছে। ধোলো বিজ্ঞান বলছেন যে Positive (পুং) ও Negative (স্ত্রী) Electricity পবস্পব পবস্পবকে স্বতই আকর্ষণ কবে।

বৈশেষিকদর্শনেব সৃষ্টিবাদ পবে বোঝবাব চেষ্টা কবা যাবে। কণাদেব

পরমাণুবাদ জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে এক সময়ে সমগ্র এশিয়ায় প্রচারিত হয় ও পরে গ্রীসে যায়। গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো ও এপিকিউরাস্ ঐ বাদ সাধারণে প্রচার করেন। ইহার পূর্ব্বে, লিউকিপ্পাস (খৃঃ পূঃ ৪৫০) ও তাঁর শিষ্য ডেমোক্রিটাস (খৃঃ পূঃ ৪২৫) কণাদের কাছে প্রথম ঋণী। ঐ বাদের প্রতিবাদ করেন এরিস্টটল্। এই দুই মতই চলে আসছিল। তারপর ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী হ'তে—বেকন হ'তে আরম্ভ ক'রে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত—পরমাণুবাদ আলোচিত হয়ে এসেছে। বহু পরীক্ষার পরও, বর্ত্তমান' কণাদকেই সমর্থন করেন।

কণাদের মতে, সূর্য্যরশ্মিকণাই, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষুদ্রতম অণু, সূর্য্যকণাই, সাবয়বী স্থূল কারণ পরম্পরার শেষ রূপ। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ক্রুকস্, বায়ু নিষ্কাষণ ক'রে সেখানে তড়িৎ প্রয়োগ করায়, এক নতুন আলোকরশ্মি দেখতে পান—নাম দেওয়া হল "Radiant matter", ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ক্রুকস্, রাদারফোর্ড ও আরো কয়েকজন বৈজ্ঞানিক Uranium, Thorium ও Radium প্রভৃতি ধাতুর মধ্যে স্বতস্ফূর্ত্ত কিরণমালা দেখতে পান। বৈজ্ঞানিক টমসন্ প্রমাণ করেন যে 'radiant matter', 'স্ত্রী' কণার সমষ্টি। রশ্মি পরমাণু—X ray—α, β, γ (এক্স্ রে—আল্ফা, বিটা, গামা), শ্রেণী অনুসারে। ঐ সব রশ্মি-অণুর নিত্যপরিবর্ত্তনশীলতায় ও ক্রিয়াশীলতায় নব নব পরমাণুর জন্ম হচ্ছে। আলফারশ্মি দ্বিমাত্রিক ('দ্ব্যণুক'?)—পুং তড়িৎযুক্ত হিলিয়াম পরমাণু। 'বিটা' রশ্মি, স্ত্রী তড়িৎকণা ও 'গামা' আকাশতরঙ্গের সঞ্চালনকারী। গুরু-ভার-যুক্ত ব'লেই পুং তড়িৎকণা স্থির বা নিষ্ক্রিয় থাকে ও স্ত্রীকণা সংযোগফলেই চঞ্চল বা সক্রিয় হয় ও বহুত্বের প্রসূতি হয়। আজ পর্য্যন্ত এই মত দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর হচ্ছে।

কণাদের 'আরম্ভবাদ'—খোলো বিজ্ঞানের পরিণতি। বিজ্ঞানাগারে বহু পরীক্ষা হল। তড়িৎশূন্য Atom (পরমাণু), সেখানে তড়িৎকণা আসে কোথা হতে? রশ্মিকণাসমূহের বেগ ও গতি দেখে, বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি পড়ল সৌরমণ্ডলে, অনেক রকম কল্পনা চল্লো। এটম্ চক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু আর্টের কৌশলে তা বিজ্ঞানাগারে প্রত্যক্ষ হল—কল্পনা বাস্তবে পরিণত হল।

ধোলো বৈজ্ঞানিক আজও ঋষি বর্ণিত 'আকাশতত্ত্বেব' হদিশ পান নি। তাঁবা আকাশ তবঙ্গেব স্পন্দন ('গামা' বশ্মি) কেই ব্যোম বলছেন, তাতেও সন্দেহ এসেছিল অর্থাৎ তাব মধ্যেও অবকাশ (ফাঁক) আছে সন্দেহ হয়েছিল। ইং ১৮৮৬ সালে Sir William Crooks দেখালেন যে সমগুণযুক্ত মূল পদার্থ একটি সূক্ষ্ম উপাদান হ'তে এসেছে (নাম, Protyle)। ক্রমে প্রমাণ হল যে তড়িৎশক্তি=সঞ্চলন বা বেগশক্তিব (বলেব বা Forceএব) পরমাণুসমষ্টি। ১৯০০ সালে গণিতবিৎ Plank ঠিক্ কবলেন যে জড বা বেগ অর্থাৎ গতিশক্তি এসেছে পবমাণু হ'তে—জড পবমাণুব উপাদানও তড়িৎ পবমাণু। অধুনা পণ্ডিতেবা বলছেন যে 'ঘনকেন্দ্র' ('Nucleus'), স্থূল জডপদার্থেব মধ্যে চটচটে আঠাব মত যা দেখা যায়—সেইটিই প্রাণশক্তিব আদিম নিদর্শন। ঐ ঘনকেন্দ্রে (কেন্দ্রকে) দুবকম বশ্মিকণাই বর্ত্তমান। ঐ দু'যেব সংযোগ আছে ব'লেই তা 'দেখা যায়' ও সেইখানেই তাব নিজত্ব (individuality, 'ব্যক্তিত্ব' বা বিশেষত্ব) অর্থাৎ জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তিব প্রথম স্থূল প্রকাশ দৃষ্ট হয়।

বৈশেষিক দর্শন ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনা কবেন নি; কিন্তু ঐ দর্শনেব 'আকাশ' ও ধোলো বিজ্ঞানেব 'আকাশ' এক নয়। তন্ত্রশাস্ত্র 'ব্যোমপঞ্চকে'ব অর্থাৎ পঞ্চপ্রকাব আকাশেব কথা বলেছেন, সাধনক্ষেত্রে—

"নবচক্রং কলাধারং ত্রিলক্ষং ব্যোমপঞ্চকম।
স্বদেহে যো ন জানন্তি স যোগী নামধাবকঃ ॥"

নব চক্র=সুষুম্নাস্থিত কুণ্ডলিনী চক্র। ত্রিলক্ষ=স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, ইতর লিঙ্গ। ব্যোম পঞ্চকম্="আকাশন্ত মহাকাশং পবাৎপবম্। তত্ত্বাকাশং সূর্য্যাকাশং আকাশং পঞ্চলক্ষণম্ ॥" আকাশের এই পঞ্চলক্ষণ। বহুস্থলে 'ব্যোম' ও 'আকাশ' একই অর্থে ব্যবহৃত হ'লেও, এখানে পঞ্চব্যোম=আকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ, তত্ত্বাকাশ ও সূর্য্যাকাশ, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম=পঞ্চাকাশ। তন্ত্র বলেন, গ্রন্থিত্রয় ভিদ্য হ'লে আকাশতত্ত্ব বোঝা যায়। গ্রন্থিত্রয়=ব্রহ্মগ্রন্থি (মনিপুরে), বিষ্ণুগ্রন্থি (অনাহতে), রুদ্রগ্রন্থি (আজ্ঞাচক্রে)। আকাশই নাম রূপের নির্ব্বাহক—"আকাশোহবৈনাম-রূপয়ো নির্বহিতা" (ছান্দোগ্য ৮।১৪।১)। ধোলো বিজ্ঞানেব force (বল), 'গামা' রশ্মি বা 'ঈথার'—সবই জড়]।

Solid (নিবেট), Liquid (তবল), gas (বায়বীয়)—সব বস্তু হতেই

Electron (বিদ্যুতিন) পাওয়া যায়। Electron কে 'স্ত্রী' বলা হয় (negative)। Hydrogen atom সব চেয়ে হাল্কা, কিন্তু Electron অপেক্ষা ২০০ গুণ ঘন। Hydrogenএ একটি atom আছে। Uranium এর atom সব চেয়ে ভারী। এই ভারের কারণ 'পুং'—ভারটাই পুং। Atom এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর, অর্থাৎ, তার সারাংশের নাম—ঘনকেন্দ্র (Nucleus), Atom এর মধ্যস্থলে অবস্থিত। ঐ ঘনকেন্দ্রের চারিধারে গ্রহাদির মত Electron সব ঘুরছে—ঘনকেন্দ্রকে রক্ষা করছে। Negative—স্ত্রী, Positive—পুং, ঘনকেন্দ্র হচ্ছে Positively charged—পুং পূর্ণ (তড়িতাবিষ্ট)। সমপ্রকার তড়িৎ বেগ—দেখা হ'লে—দূরে যায়; কিন্তু 'পুং' ও 'স্ত্রী'—এই দু'য়ে সাক্ষাৎ হ'লে, পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিদ্যুতিন জগতেও 'আকৃষ্ট শক্তির' পরিচয় পাওয়া যায়। Hydrogen ঘনকেন্দ্রকে Proton বলে; Proton ও 'পুং'। সমরাসায়নিক গুণযুক্ত atom এর ভার ও ঘনত্ব যে একই প্রকার হয় তা নয়। সমগুণযুক্ত atom গুলির নাম Isotips, এত দিন ধোলো বিজ্ঞানে যাকে মূলভূত বা Element বলা হত, তা বস্তুতঃ এই Isotips এর সংমিশ্রন। এ অবধি কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা Isotips করা যায় নি। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত atom এর প্রযোগে—সহজ, সরল সাধারণভাবে,—রাসায়নিক ভাবে নয়—কতকটা Isotips কে পৃথকীভূত করা যায়। যাকে Radio-active substance বলা হয়, তাতে তিনপ্রকার রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, α, β, γ, (আলফা, বিটা, গামা)। সর্ব্ববস্তু ভেদী Xrayর নাম 'গামা' রশ্মি, কিন্তু দৈর্ঘ্যে ছোট। বিটা রশ্মি স্বতই অতি দ্রুত গতিতে বিচ্ছুরিত হয়। আলফা রশ্মি Helium-atom এর ঘনকেন্দ্র। 'আলফা' রশ্মি হ'তেই ঘনকেন্দ্রের অস্তিত্ব বুঝি।

Energy মানে 'কার্য্য শক্তি'। Atom এর energy নির্ভর করে Electron in orbit —(বক্ররৈখিক গতিস্থ Electron)—এর বিশেষ অবস্থানে। Electron কে, atomic energy প্রয়োগে (atom এর কার্য্যশক্তি প্রযোগে), স্থানচ্যুত করার নামই atom কে 'break' করা (ভেঙ্গে দেওয়া)। Radio-active পরিবর্ত্তনে, Elements এর পরিবর্ত্তন আসে, সীসা ও পারা (Lead and Mercury) স্বর্ণে পরিণত হ'তে পারে, নিম্নস্তরের ধাতু উচ্চস্তরে পরিণত হ'তে পারে, বিপরীত ও

হ'তে পাবে। নিম্নস্তব হ'তে যেমন উচ্চস্তবে গতি হ'তে পারে, উচ্চতব স্তব হতেও নিম্নগতি হ'তে পাবে—এখানেও এই নিয়ম। Radio-active স্বতই ক্ষয় হয়; এপয্যন্ত তা বশে আসে নি, তাপ বা চাপে কোন ফল হয় নি। গুরুভাব বিশিষ্ট ব'লেই আলফা particles এব (ক্ষুদ্র জডাংশেব) কার্য্যকবী শক্তি বেশী, অর্থাৎ ধাক্কাব জোব বেশী। Mass ও Energy (গুরুভাব ও কার্য্যকবী শক্তি) সমপর্য্যাযে অবস্থিত। ঘনকেন্দ্রই পদার্থ বিজ্ঞানে, বসাযন শাস্ত্রে, যুগান্তব আনাতে চলেছে।

ধোলো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ক'বে স্থিব কবেছেন যে শক্তি দুভাবে থাকে—Potential (স্থিব) ও Kinetic (চঞ্চল), অর্থাৎ অন্তর্নিহিত শক্তি = স্থিব + চঞ্চল। ইলেকট্রণবাদেব প্রবর্ত্তক ববার্ট মিলিকান হ'তে আইনষ্টিন পর্য্যন্ত, বৈজ্ঞানিক জগতে বহু নতুন তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়েছে।

একই বস্তুব সকল পবমাণুই সমধর্ম্ম বা সমগুণ বিশিষ্ট। বিভিন্ন বস্তুব পবমাণুব গুণ বিভিন্ন। পবমাণুকে ভাঙ্গলে, থাকে মাত্র সমপবিমাণ Positive (পুং) ও Negative (স্ত্রী) তডিতাবেশ। এখানেও তন্ত্রেব অর্দ্ধনাবীশ্ববভাব।

Hans Berger সাহেব (১৯২৯) অব্দে মস্তিষ্কের মধ্যে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া পবীক্ষা ক'বে দেখেছেন যে অল্পবুদ্ধি ও প্রতিভাসম্পন্ন মানুষেব মধ্যে তডিৎ তবঙ্গেব পার্থক্য আছে। বৈজ্ঞানিকবা দেখেছেন যে ঘুমেব প্রথম অবস্থাব ঐ তবঙ্গেব বা কম্পনেব গতিব মধ্যে শৃঙ্খলাব অভাব, কিন্তু গাঢ় নিদ্রায বেশ শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়। মস্তিষ্ক তরঙ্গেব দুবকম গতি বা ছন্দ—একটিব নাম (Alpha rhythm) আলফা ছন্দ, অপবটিব, বিটা ছন্দ।

ধোলোব কাছে শক্তি (Energy) = Work (শক্তিব ক্রিয়া বা ক্রিযাব ফল), কাবণ, ক্রিয়া দেখেই শক্তি বোঝা যায়। এই ক্রিযাব মধ্যে শৃঙ্খলা আছে দেখা যায়। এই ক্রিযা মানে গতি বা কম্পন। এই গতিব পবিমাপ স্থিব কবা যায়। বস্তুব ভাব = 'আকৃষ্ট শক্তি' (পৃথ্বীব আকর্ষণ শক্তি)। কোন বস্তুকে উর্দ্ধে তুলতে হলে, দবকাব শক্তিব ব্যয়। বৈজ্ঞানিক হিসাব ক'বে দেখেছেন যে যদি ৪ পাউণ্ড বস্তুব উত্তোলনেব উচ্চতা ৫ ফুট হয় তা হলে Energy বা work = ৪ × ৫ = ২০ ফুট পাওযা যায়।

আলফা, বিটা ও গামা—এই তিন মূল বশ্মিব মধ্যে আলফা ও বিটা বশ্মিকে জডকণাব সামিল ধবা হয়। গামা বশ্মিই প্রকৃত বশ্মি। গামা

রশ্মি সর্ব্বক্ষেত্রেই পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আর দুটি একসঙ্গে নির্গত হয় না। Conservation of Energy—অর্থাৎ শক্তির অপচয় হয় না, মাত্র রূপ বদলে যায়। এই নিয়ম, সমষ্টি হিসাবে খাটে। কিন্তু দেখা যায়, বিটা রশ্মির বেলায় ঐ নিয়ম খাটে না। ইহার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। যাঁরা Conservation of Energyকে সর্ব্বক্ষেত্রে বজায় রাখতে চান তাঁদের সঙ্গে নব্য বৈজ্ঞানিকদের মতভেদ দেখা যায—তাঁরা সংশয় তুলেছেন।

পরমাণু ভেঙ্গে পাওয়া যায় Positive ও Negative—দুই প্রকার তড়িতাবেশ। Nucleus (ঘনকেন্দ্র বা কেন্দ্রক), Positive তড়িতাবিষ্ট। সাধারণতঃ ঐ কেন্দ্রক = Proton (প্রোটন) + Electron সমষ্টি। Proton = পজিট্রন (Positron) + নিউট্রন (Neutron); অতএব বস্তুমাত্রেরই শেষ পরিণতি, Positron, Neutron ও Electron। Electron ও Positron = Negative ও Positive তড়িতাবেশ।

Xrayর বিভিন্ন শ্রেণী আছে। যে Xray সাধারণতঃ হাসপাতালে ব্যবহার করা হয় তার শক্তি কম। Atom নিজে শূন্যগর্ভ। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ—এই তিন নিয়ে হিসাব হয় জড়ের। গতিটা কখন নিরপেক্ষ নয়। একটা মার্ব্বেলকে যে গতি দেওয়া হয় তার হিসাব ঠিক করি যে নিয়মে, সেই নিয়ম পরমাণু বা molecules এর মধ্যে সাধিত হয় না—সে পরিবর্ত্তন সাধিত হয় Space-time এ (দেশ-কালে), পার্থিব ক্ষেত্রের হিসাবে নয়। Gravitation (মাধ্যাকর্ষণ) সর্ব্বক্ষেত্রে খাটে না, Gravitation সর্ব্বক্ষেত্রে আকর্ষণ করে না। আলোক-তরঙ্গ অথবা অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন Particles (রশ্মিকণার) ওপর সূর্য্যের আকর্ষণশক্তি নেই, আছে তদ্বিপরীত বিকর্ষণশক্তি (Repulsion)। আমাদের পরিমাপ সমস্তই ফিতা বা দাঁড়িপাল্লার মত ওজনযন্ত্র নিয়ে, দেশ-কালে এ নিয়ম খাটে না। এক পার্থিব মুহূর্ত্ত মানে, আমার সময়-বোধ বা ঘড়ির হিসাব। এই হিসাবটি সব বিষয়ে খাটে না অর্থাৎ একই নিয়মে সব অবস্থার ও সব স্থানের পরিমাপ হতে পারে না। পৃথিবীর গতিই, রশ্মি কালকে বদলে দিতে পারে। একই নিয়মে, এক স্থানে, আমার একই মুহূর্ত্তে, একই ঘটনা পৃথিবী ও বহুদূরে অবস্থিত দেশে, না হতে পারে। যাকে এতাবৎ

ঈথাব বলা হ'ত তাব মধ্য দিয়ে ঘড়িব গতি, সময়েব পবিবর্ত্তন আনাতে পাবে। বলা হয় যে motion বা velocityতে (গতি অথবা 'গতিব মাত্রাতে) পবিবর্ত্তন আনায়। এটা কি সব সময়ে ঠিক? একটা আংটীকে চাকাব মত ঘোবাও। আংটীব পবিবর্ত্তন কোথায়? অথচ স্থিব আংটী ও ভ্রাম্যমাণ আংটী একই অবস্থাযুক্ত নয়।

ইতিপূর্ব্বে আমবা জাতি ও বর্ণেব কথা বলেছি, সমবর্গে ফেলে সমজাতীয়ত্ব ঠিক্ কববাব কথা বলেছি। ধোলো বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত মূল বস্তুবই অনুসন্ধান কবেছেন। মূল বস্তুতত্ত্বের দিকে আজও ঘেঁসেন নি। সকল বস্তুব মূল অনুসন্ধান কবতে গিয়ে পেলেন Electron বা বিদ্যুতিন্— বশ্মিকণা ছাডা অন্য কিছু নয়, একটা শক্তিতরঙ্গ, যাব আঘাতে বিদ্যুতিন বিচ্ছিন্ন হয, কিন্তু দেখলেন যে এই বিদ্যুতিনটিও দ্বিবকম—পুং ও স্ত্রী। বিদ্যুতিনেব সাবাংশই মূল, কিন্তু এই সাবাংশ, প্রতি বিদ্যুতিনে বিদ্যমান। Electronগুলির সমজাতীয়ত্ব নিরূপণ হয লক্ষণ দেখে, যাব মধ্যবিন্দু ঘনকেন্দ্র। এটীবও সমজাতীযত্ব ঠিক্ কবা হয় লক্ষণ দেখে। Isotips ঠিক্ কবা হয় বস্তু দেখে, আকাব, গঠন প্রভৃতি দেখে অর্থাৎ একই প্রকাব বাহ্য লক্ষণ দেখে, Electronএব, পুং স্ত্রী হয় ক্রিয়া ও ক্রিযাব লক্ষণ দেখে। আমবা দেখেছি, যাকে Gravitationএব Law বা প্রাকৃতিক বিধি বলা হয়, তা সব যায়গায় খাটে না। ধোলোব সাজানোব বীতিতে 'সর্ব্বকালেব সর্ব্বাবস্থাব সর্ব্ববাদীসম্মত প্রাকৃতিক নিয়ম' সব যায়গায পাওয়া যায় না। ধোলো লক্ষণ দেখে সাজান্, কিন্তু সমস্ত লক্ষণগুলিব মধ্যে সমজাতীয়ত্ব হিসাবে সাজাতে চান না; তাঁবা বস্তুব সংস্কাব-বৈশিষ্ট্য বা বস্তুব গুণগুলির সমজাতীয়ত্ব নিরূপণ ক'বে দেখাবাব ইচ্ছা কবেন না, কাবণ, তা চলে যায় বস্তুব বাইরে। আর্য্য সাজিয়েছেন গুণগুলিব সমজাতীয়ত্ব ঠিক্ ক'বে অর্থাৎ সবই তিনটি গুণেব মধ্যে একটিতে না একটিতে পডবে। এই সাজানোব বীতিই যথার্থ প্রাকৃতিক বিধি। আর এক কথা, ধোলো এতদিন অন্তবেব দিক্ দেখতে চান নি—মনেব দিক্ দেখেন নি, কাবণ, ববাবব তাঁদেব ধাবণা ছিল 'মন', অজড় বা বস্তু নয়, সুতবাং বস্তুবিজ্ঞান বহির্ভূত একটা কিছু। এখন দেখছেন যে যদি ক্রিয়া দেখে বিদ্যুতিনেব ও পুং স্ত্রী বিভাগ কল্পিত হয়, তা হ'লে দেহেব উপব চিন্তাব ক্রিয়া দেখে

তার মূল অনুসন্ধান করাও উচিৎ। গুণগুলিকে সাজাতে গেলে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ দেখতে হয়। এই সম্বন্ধজ্ঞানে যে পরিমাপ দেখতে পাওয়া যায়, সেই পরিমাপ দিয়েই বস্তুর মূল তত্ত্ব নিরূপিত হ'তে পারে, যেটি অন্তর ও বাহিরের সর্ব্ববস্তুতে খাটে। অন্তর্শক্তির বহির্বিভাগই 'গুণ'। অতএব, ঐ অন্তর্শক্তিই বস্তুর মূলতত্ত্ব। বস্তুবিজ্ঞান চায় পরিবর্ত্তনের মধ্যে এক একটা স্থায়ী জিনিষকে ধরতে। এটা শুধু বস্তুবিজ্ঞানের নীতি নয়, ইহা মনেরই স্বভাব—প্রাকৃতিক নিয়ম। মন চায় চঞ্চল বা অস্থায়ী অবস্থাকে ছেড়ে স্থায়ী বা অপরিবর্ত্তন সত্তাকে ধরতে। এই অপরিবর্ত্তনত্বই বা নিত্য বস্তুটিই বস্তুর মূল তত্ত্ব। ধোলো বিজ্ঞান প্রমাণ ক'রে দেখাচ্ছেন যে matter বা জড়াবয়ব-সার সর্ব্বত্র একই প্রকার, আমাদের মস্তিষ্ক বা brain matterও ঐ matterএর উপাদানে নির্ম্মিত। আর এই brain matterএরই বিশেষত্ব, 'চিন্তা'। এই বিশিষ্ট সংস্কারাক্রান্ত matterএর গঠন ও আকার অন্য প্রকার সব matterএর রূপ ও গঠন হ'তে অভিন্ন। অতএব বহিরাবরণই—রূপ ও আকারই—বস্তুর সবটা নয়। ক্রিয়া হয় দু'দিক্ দিয়েই—অন্তরের সংঘাতে ও বাহিরের সংঘাতে। এই দুই সংঘাতের কারণ, বস্তুর সংস্কার বা গুণ বা স্বভাব। ঐ দুয়েরই নিয়ন্ত্রণ হয় একটি মূল শক্তির দ্বারা—মূল বস্তুতত্ত্বের দ্বারা। এই মূল অন্তর্শক্তি বা যাকে, আর্য্য নাম দেন 'প্রাণশক্তি', সে দিকটি ধোলো বিজ্ঞান এখনও দেখতে পান নি। সংঘাতের বহুত্বে, তার জটিলতায় কখন জাতীয়ত্ব নিরূপণ হতে পারে না। ইহাতে যে আর্টের প্রয়োজনীয়তা তা হ'তে ধোলো আজও দূরে, যদিও বহুদূরে নয়। ঐ আর্টের হিসাবে দাঁড়ায় যে, অন্তর্শক্তির স্ফুরণ বা লক্ষণই Matter—Matter লক্ষণ (symptom) মাত্র। বর্ত্তমান ধোলো বিজ্ঞান সম্বন্ধ স্থাপন পর্য্যন্ত কিছু এসেছেন, কিন্তু সম্বন্ধটা হয় কিসে ও তাদের মূল ভিত্তি কোথায় সে সম্বন্ধে একেবারে নীরব—ঐ ভয়, পাছে 'বস্তু' উড়ে যায়। আমাদের অনুভূতি আদির উপকরণ, সম্বন্ধ স্থাপন। এই সম্বন্ধ স্থাপনের মূল অনুসন্ধান রত হওয়াতেই, আর্য্য সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানকে 'ঈশাবাস্যং' করেছেন। এই দিক্ দিয়ে ও 'ঈশাবাস্যং' করবার একটা বড় যুক্তি আছে, আর সেটি ধোলো animism নয়।

'তাপ' কোন অবয়বের moleculesএ (জড়াংশে) উত্তেজনা আনায় না,

পরন্তু উত্তেজনাই 'তাপ'। আবার জ্যামিতির মত অঙ্কশাস্ত্র, সম্বন্ধ স্থাপনের একটা-দিকই দেখায়, তাই ঐ একটি দিক্ সম্বন্ধে তার নিয়ম খাটে—space-timeএ (দেশকালে) নয়। ত্রিভুজের দুটো দিক্ একত্রে, যে অপর দিক্‌টির চেয়ে বড় হবে সর্ব্বক্ষেত্রে, তা space-time এ খাটে না। জ্যামিতির হিসাব চায় (১) একই অবস্থা, (২) একই standard (স্থাপিতমান), (৩) পরিমাপের rigidity (ধ্রুবানম্যতা, সমটান বা দৃঢ়তা)। সময়ের কখন standard হয়? একই সময় সর্ব্বদেশে নয়। Local time (স্থানীয় সময়), সেই স্থানের standard হ'তে পারে, সর্ব্বস্থানের হ'তে পারে না। কেবল spaceএ rigidity থাকতে পারে এক অবস্থায়; কিন্তু space-timeএ তা কি ক'রে সম্ভব হবে? ত্রিভুজের দুটো দিক্ অপরটির চেয়ে বড়—spaceএর এই নিয়মটির ভুল ধরা পড়ে space-timeএ, নক্ষত্রগুলির মধ্যে রেখা টেনে দেখতে গিয়ে ধোলো বৈজ্ঞানিকদেরই হাতে, বৈজ্ঞানিক আইনষ্টিন এই ভুলটি প্রমাণ করেন Dynamicsএর সাহায্যে—space-timeএ two sides of a triangle, তৃতীয়টির চেয়ে বড় না হ'য়ে হয়ত তৃতীয়টিই হয় ঐ দুই সমষ্টির চেয়ে বড়। কোন পরিমাপ কি বরাবর সিধে যায় বা সিধে থাকে? বস্তুর গতি যেমনভাবেই হোক্, যে দিকেই হোক্—যার যেখান হ'তে উদ্ভব, তার পুনরাগমন হবেই অর্থাৎ স্বস্থানে সে ফিরে আসে। রশ্মি যে স্থান হ'তে নির্গত হয়, সেই স্থানে আবার ফিরে আসে। সূর্য্যরশ্মির গতিও অণ্ডাকার। Space-timeএও, যাকে আমরা দৃশ্যমান Infinity (অসীম) বলি, সেও তাই—অখণ্ড-মণ্ডলাকারে রয়েছে। ইন্দ্রিয়শক্তির অসীমত্ব হয় না। "যার যেমন তার তেমন, যখন যেমন তখন তেমন।"

সর্ব্বদা নেতার অধীনে থেকে কার্য্য করা বা সর্ব্বক্ষেত্রে আজ্ঞাবহতা ও সঙ্ঘবদ্ধতা আজ ধোলোকে সর্ব্ববিষয়ে উন্নত করেছে, যে অদ্ভূত শক্তির খেলা তিনি আজ বিজ্ঞানজগতে দেখাচ্ছেন তা আমরা জানি, কিন্তু ধোলো ঐ শক্তি হাতে পেয়ে, বহুস্থানে অপচয় করেছেন, অপপ্রয়োগ করেছেন। আমাদের সাবধানে অগ্রসর হ'তে হবে। মানবতার স্ফুরণ—মানবকল্যাণ সাধনই যে ঐ বিজ্ঞানের লক্ষ্য এটি মনে রাখতে হবে, যুবকদের সেইভাবে শিক্ষা দিতে হবে।

বিজ্ঞানের কথা—জীবতত্ত্ব (Biology)

(২)

প্রাণ কোথা হ'তে বা কেমন ক'রে আসে, তাই নিয়ে খোলো বৈজ্ঞানিকেরা বহুকাল ধ'রে বহু গবেষণা করেছেন। বিভিন্ন মতও দেখা দিয়েছে, তাঁরা একটি সাধারণ জিনিষ দেখতে পেলেন। তাঁরা দেখলেন যে জলে, স্থলে, উদ্ভিদে—যেখানেই জীবন—সেই স্থলেই এক-কোষিক জীব বর্ত্তমান—বহু কোষিক জীবে, bacteria (জীবাণু) ও অন্যান্য জিনিষের সমাবেশ। পর্য্যবেক্ষণফলে আর একটি জিনিষ দেখে অবাক্ হলেন—উদ্ভিদে প্রাণশক্তি সবচেয়ে প্রবল। অজৈব পদার্থ হ'তে জৈব পদার্থ গঠন ক'রে নিতে উদ্ভিদ সমর্থ। তাঁরা জীবের দুটি লক্ষণের কথা বললেন—বর্দ্ধন ও প্রজনন। অজৈবের এ দুটি নেই। যাই হোক্, প্রথম প্রথম তাঁরা cellকে (জীবকোষকে) একটি জীব মনে করতেন। পরে বুঝলেন, কোষটি একটা আবরণ মাত্র, যার অভ্যন্তরে আছে জীব। এই অণুজীবের নাম দেওয়া হ'ল Protoplasm (প্রোটোপ্লাজম্)। বিভিন্ন অবস্থায় এই অণুজীবের বিভিন্ন আচরণ তাঁরা দেখতে পেলেন—উদ্ভিদে ঐ অণুটির গতি বৃত্তাকার, এমিবা (amœba) যায় হামাগুড়ি দিয়ে, ম্যালেরিয়ার অণুটি নৃত্যচঞ্চল ইত্যাদি। বিভিন্ন অবস্থায় ফেলে তাদের পরীক্ষা চলতে লাগল। কোষগুলির গঠন ও আকারে পার্থক্য দৃষ্ট হ'লেও সবই এক ধাঁচের (typeএর)। এমিবা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র জীব। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এমিবা ও লিউকোসাইট বা রক্তকণার শ্বেতকোষ (leucocyte)—এই দুয়েরই আকারগত সাদৃশ্য বর্ত্তমান, এইগুলি পরিণত ও এক টাইপের জীবকোষ, কিন্তু অজটিল নয়। আর এক রকম অপেক্ষাকৃত অজটিল অণুজীব—microbe (মাইক্রোব) বা আমাদের রক্তকোষের রক্তকণা—আছে, তারা সাধারণ ধাঁচের নয় ('not typical')। এইগুলির অবনত অবস্থা অর্থাৎ একটা ক্রমপরিণত অবস্থা হ'তে আবার ক্রম অবনত অবস্থায় এসেছে। ক্রমোন্নতি-হ'তে আরম্ভ হ'লে যে আর ক্রমাবনত অবস্থায় এসে অন্য শরীর হয় না, তা নয়।

শিশু-লাল-রক্তকোষের ঘনকেন্দ্র আছে। কোষের অধিকাংশ Protoplasm থাকে ঘনকেন্দ্রের বহির্ভাগে। ঐ ঘনকেন্দ্রটি Protoplasm নির্ম্মিত। Protoplasm জলেও বর্ত্তমান। পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে Protoplasm নানা উপাদানে গঠিত—কতকগুলি উপাদান, পৃথিবীতে, সূর্য্যে ও নক্ষত্রাদিতে পাওয়া যায়, অবশিষ্টগুলি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান। Protoplasm স্বভাব চঞ্চল। ইহার গঠন-কৌশল-বোধ ও গঠন দক্ষতা অদ্ভুত। পরমাণু (atom) বা পরমাণুদল ('group of atoms') নিয়ে এরা এমন গঠন-সামর্থ্য দেখায় যা আজও কোন রাসায়নিকের দ্বারা সম্ভব হয় নি। আর এক প্রকার জীবকোষ যার দ্বারা আমাদের কোন স্থান ফুলে ওঠে, সেই রকম একটি অজটিল bacteriaর (অন্য প্রকারের জীবাণুর) মধ্যে ঘনকেন্দ্র নেই। এই অণুজীবের আকার ১ ইঞ্চির সংহস্রাংশের ২৫/১ অংশ।। এই জীবকোষটিও পূর্ব্ব-অবস্থা হ'তে ক্রম অবনত হয়েছে। অতএব, ঊর্দ্ধগতি হ'তেই হবে তা নয়, ক্রমপরিণতি বা ক্রমবিকাশই যে একমাত্র নিয়ম তা নয়। কর্ম্মসংস্কারই নিজ উপযোগী শরীর বেছে নেয়, ইহাই সত্য। ক্রমারোহণ বা ক্রমাবতরণ হয় একই সিঁড়ি দিয়ে। অবস্থা বিশেষে একই নিয়মের দুটো দিক আছে দেখা যায়। শিশু-লাল-রক্তকোষ পরিণত হ'লে তার ঘনকেন্দ্র থাকে না, ঘনকেন্দ্রহীন ঐ কোষ তখন রক্তের মধ্যে ভাররাহীর (Portage) কার্য্যে নিযুক্ত থাকে! প্রোটো-প্লাজমের অধিকতর ক্রমবিকশিত অবস্থাই ঘনকেন্দ্র। Protoplasm এর মত নিত্য চঞ্চল জীব আর নেই। তার শ্বাস ও খাদ্য গ্রহণাদির ক্ষমতা আছে, কিন্তু স্থিরাবস্থা প্রাপ্ত হ'লেই জড়ত্ব প্রাপ্তি বা মৃত্যু হয়। কোষ, ঘনকেন্দ্রেরই কার্য্যকুশলতার ফল, সুতরাং ঘনকেন্দ্র, কোষ অপেক্ষা অধিকতর পরিণত। কোষস্থ প্রাণশক্তির আধারই ঘনকেন্দ্র। যদি ঐ কোষকে এমন ভাবে বিভক্ত করা যায় যে, তার এক অংশে ঘনকেন্দ্র থাকবে ও অপর অংশে তা থাকবে না, তা হলে ঘনকেন্দ্রযুক্ত কোষটি জীবিত থাকবে, কিন্তু ঘনকেন্দ্রহীন অংশটির মৃত্যু হবে। আবার, যদি ঐ কোষকে এমন ভাবে নাড়া যায় যাতে ঘনকেন্দ্রটি প'ড়ে যায় তা হলে ঐ ঘনকেন্দ্রটির ক্ষতি হয় না!

উদ্ভিদের ও জীবের আদিম অবস্থা এককৌষিক। প্রথম ঘনকেন্দ্র স্ববিভক্ত হয়, পরে ঐ একটি কোষ স্ববিভক্ত হ'য়ে এক একটি স্বতন্ত্র

দুটি কোষে পরিণত হয়। এই ভাবে চলে। উদাহরণ স্বরূপ দেখান যেতে পারে যে, এককোষিক এমিবার অবয়ব বৃদ্ধি পেলে, তার মধ্যে স্ববিভক্ত হবার একটা চাঞ্চল্য আসে বোঝা যায়; এটা প্রকাশ পায়, যখন তার দেহের মাঝখানটা চাপা হয়ে যায়—যেন মাঝখানটা দড়ি দিয়ে এঁটে বাঁধা হয়েছে। তারপরই স্ববিভক্ত হয়। স্ববিভক্ত হ'লেও দুটি কোষ পৃথক লম্বা ভাবে লগ্ন থাকে—ঠিক্ যেন একটির উপর অপরটি দণ্ডায়মান। তার পরই স্বতন্ত্র হ'য়ে যায়। স্বতন্ত্র হ'লে প্রত্যেকটি কি মৃত হয়? শব ত থাকেনা, সুতরাং মৃত বলা যায় না; কিন্তু একটির স্থানে দুটি 'এমিবা' দেখা দেয়। কোষগুলি ঐ প্রকারে বিভক্ত হ'তে হ'তে যায় ও শেষে একত্রিত হ'য়ে নানা প্রকার জীব সৃষ্টি করে।

তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনায়, 'চণকাকার', 'সমবন্ধ' 'বিপরীতরতি'—অহংএর উপর ইদং দণ্ডায়মান ও উভয়ের পৃথক হওয়া—ইত্যাদি বুঝলে বোঝা যায় যে দুটি প্রান্তসীমার বাহ্য অবস্থা একই প্রকার—যদিও ভাবে প্রভেদ আকাশ পাতাল। তন্ত্র বলেন, চণকাকারের ভাব সর্ব্বত্র বিদ্যমান। জীবতত্ত্ব আলোচনা ক'রে ধোলো বৈজ্ঞানিক মহল অত্যন্ত বিস্ময়াপ্লুত হ'য়ে বলেন যে, যখন সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে প্রাণকে পূর্ণতররূপে প্রকাশ করাই জীবনের লক্ষ্য, তখন প্রাণের পূর্ণতম বিকাশ হয় না কেন, সবাই শেষে প্রাণহীন হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয় কেন? ধোলো ইহার উত্তর দিতে পারেন না। তাঁরা প্রাণের পূর্ণতম বিকাশ ব'লতে বোঝেন শরীরের অমরত্ব। ভারত বলেন, নিত্য চঞ্চল, সদা পরিবর্ত্তনশীল বহিরাবরণ দেখলে, পরিবর্ত্তন বা পরিণতিই দেখা যাবে, আর, ঐ নিত্য অবস্থিত প্রাণই—অপরিবর্ত্তনশীল প্রাণই—বিকশিত হবার জন্য, নিজ বাধা বা অভাব দূর করবার জন্য নব নব আধার তৈরী করতে প্রেরণা দিচ্ছে। পূর্ণতম অবস্থা মানে অভাব-বোধ-শূন্য অবস্থা। এ অবস্থা কি পরিবর্ত্তনশীলের হয়?

জীবতত্ত্বের আর একটি দিক্ বোঝাবার চেষ্টা করা যাক্। জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে এককোষিক জীব মাত্রই 'অলিঙ্গ' ('a-sexual'), তাঁরা দেখেছেন যে, কতকগুলি দুটি এককোষিক এমন ভাবে সঙ্গত হয় যে স্বতই মনে হয়, তাহাদের মধ্যে একটি পুং জাতীয় অপরটি স্ত্রী জাতীয় অর্থাৎ পুংস্ত্রী চিহ্ন উদ্ভব হবার উপক্রম হয়েছে। পণ্ডিতদের

অনুমান যে এটা হয় স্ববিভক্ত হবাব পবেই। ম্যালেবিয়া জীবাণু এককৌষিক, কিন্তু তাদেব মধ্যে পুং স্ত্রী বর্ত্তমান। এই বকম কতস্থানে যে ঐ 'অলিঙ্গ'-নিয়মেব ব্যতিক্রম তা কে বলতে পাবে? ক্রমবিকাশ প্রকৃতিব নিয়ম। নিম্নতব জীবে ঐ লিঙ্গ-বোধেব প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। ধোলো বৈজ্ঞানিকেবা এই ব্যাপাব (লিঙ্গ-বোধেব প্রাবল্য) দেখে প্রশ্ন কবেন যে তা হলে, ঐ লিঙ্গ-বোধেবও ক্রমপবিণতি হ'যে লিঙ্গ-বোধ কি একেবাবে দূরীভূত হয়? এই মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়ে প্রশ্নটি কবা হয় আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ ও বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতদের দ্বাবা। তাঁবা উত্তব দিয়েছেন দুবকম ভাবে :—(১) মানুষই শ্রেষ্ঠ ক্রমপবিণত জীব, মানব সমাজে বা সভ্য সমাজে ভেদজ্ঞাপক লিঙ্গ-বোধ বাখবাব দবকাব নেই অর্থাৎ নবনাবীব সর্ব্বত্র সম অধিকাব হোক্—ভোটাধিকাব ও সর্ব্বক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমভাবেই হোক্ ইত্যাদি। (২) অপব পক্ষ বলেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাবী পুরুষেব বিরুদ্ধে সমবেত হ'লে সমাজ ভেঙ্গে যাবে, অতএব, প্রকৃতিব উদ্দেশ্য বুঝতে হবে, বুঝতে হবে যে প্রকৃতি ঐ প্রকাব ভেদ আনিয়েছেন জীবসংখ্যা বর্দ্ধনেব ('Propagation and multiplication'এব) জন্যই, মাত্র মানবকে বুদ্ধিসহাযে কামবৃত্তি পবিচালন কবতে হবে। প্রশ্নেব আসল কথাটিকে চাপা দেওয়া হয়েছে, ভোগ আহরণকে সমর্থন কবা হয়েছে। ভাবত বলেন, বিকাশ ত হচ্ছেই, কিন্তু এই ক্রমবিকাশের সঙ্গে জীবন চাই, তবে ত বিকাশেব পূর্ণতম রূপ দেখা দেবে? এমন জীবন চাই যা জটিলতা বর্জ্জন ক'বে অগ্রসব হবে অর্থাৎ জৈবসংস্কাবকে জয় কববে।

পুংস্ত্রীভেদ, জীবেব প্রায় আদিম অবস্থা হ'তেই বর্ত্তমান। কীট পতঙ্গ, যথা, মৌমাছি, বোলতা, পিঁপড়ে আদি জীবেব লিঙ্গ-বোধ প্রবল। কীট জগতেব সাধাবণ নিয়ম এই যে, ইহাদেব পুংজাতীয়েবা স্ত্রীজাতি অপেক্ষা ক্ষুদ্রতব; পুংজাতীযেবা অল্পায়ু, দুর্ব্বল ও কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন কামোন্মত্ত। মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবে লিঙ্গ-বোধেব প্রাবল্য অনেক কম। প্রকৃতিতে যখন পুং স্ত্রী ভেদ বর্ত্তমান, তখন বুঝতে হবে যে, অন্ততঃ মানব সমাজে ঐ দুযেব ক্ষেত্রও পৃথক্—ক্ষেত্র বিপর্য্যযে বা যথেচ্ছাচাব পবাযণতায় জাতি লোপ অবশ্যম্ভাবী। নাবীব অধিকাব নাবীত্বে, পুরুষেব অধিকাব পৌরুষে—উভয় ক্ষেত্রেই ত্যাগ ও বীবত্ব আছে। জন্মনেব নিম্নভূমিতে

এই ভেদবোধকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। পুং প্রকৃতি ও স্ত্রী প্রকৃতির ভেদ কোথায়? জীবতত্ত্ববিদেরা বলেন যে যদিও উভয়েরই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করতে হয়, আত্মরক্ষা করতে হয়, তথাপি পুং জাতীয়কে ধুপ্ ধাপ্ ছুটোছুটি ইত্যাদিতে, শক্তি সঞ্চয় অপেক্ষা, শক্তিক্ষয় বেশী করতে হয়, পুং জাতীয়ের লক্ষণ চঞ্চলতা, নতুন নতুন আহার অন্বেষণ, আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন, বিরোধ সৃষ্টি করা, মারামারি করা প্রভৃতি, স্ত্রী জাতীয়ের লক্ষণ, ধৈর্য্যশীলতা, ধীরতা, গঠন করা, অনাবশ্যককে ত্যাগ করা বা তাকে কাযে লাগাবার চেষ্টা করা, পালন, পোষণ ও সঞ্চয় করা। এই কারণে সর্ব্বক্ষেত্রে স্ত্রীজাতীয়দের মধ্যে সংযম বৃত্তির বিকাশ অপেক্ষাকৃত বেশী। স্ত্রী জাতীয়েরা সর্ব্বত্রই ভবিষ্যতের জন্য শক্তি সঞ্চিত রাখে। কি জৈব কোষে (Germ cellএ), কি উদ্ভিদ-ডিম্ব-কোষে (Ovary of a flowerএ), কি পাখীর ডিম্বকোষে, কি অন্যান্য অসংখ্য স্থানে—সর্ব্বত্রই ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য আহার সঞ্চিত থাকে। গর্ভের মধ্যে শিশু রক্ষার যে আশ্চর্য্য বন্দোবস্ত—শিশুকে অভেদ্য দুর্গের মধ্যে রক্ষা করবার যে কৌশল, তা দেখলেও, অদ্ভুত শক্তি সঞ্চয়ের—সঞ্চিত শক্তিকে কাযে লাগাবার কৌশল—প্রমাণ হয়। পুং জাতীয়ের মত শক্তিক্ষয়ে নিযুক্ত থাকলে, স্ত্রী জাতীয়ের সঞ্চয় ক্ষমতা ক'মে আসে ও পরে লোপ পেতে পারে। ভ্রূণের পোষণ, গর্ভস্থ শিশুর পোষণ, প্রসবান্তে স্তন্যদান ইত্যাদি সমস্তই সঞ্চিত শক্তির ফল। পুং স্ত্রী প্রকৃতির ঐপ্রকার ভেদ খোলা মনীষীরাও লক্ষ্য করেছেন। ইহাকে 'ভেদ' আখ্যা না দিয়ে 'প্রকৃতির বিভাগ' বলা উচিৎ।

অলিঙ্গ অবস্থা হ'তে জীবের লিঙ্গোদ্গম, তার বিভাগ ও কার্য্যপ্রণালী, পণ্ডিতেরা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করেছেন, তাদের গতিবিধি ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে, অলিঙ্গ অবস্থার পর, জীবের মধ্যে স্ত্রী জাতিই প্রথম উদ্ভূত। এটা নিশ্চয় যে 'চাক্ষুষ দৃষ্ট' জীবের মধ্যেই স্ত্রী জাতিই আদিম। অলিঙ্গ অবস্থার এককোষিক জৈবকোষ (Germ cell)—পরে দ্বিধা-বিভক্ত প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখে—পুং স্ত্রী ভেদে দুরকম বলা হয়, প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আছে। একটির স্বভাব অস্থির ও শক্তিক্ষয় করতেই যেন ব্যস্ত, অপরটি শান্ত, স্থির ও সঞ্চয়ে

বত। তাই, প্রথমটিব নাম দেওযা হয় 'পুং' ও দ্বিতীয়টিব 'স্ত্রী'। পুং জৈব কোষ হ'তে পুং লক্ষণাক্রান্ত পুং জৈব কোষই উৎপন্ন হয়, স্ত্রী জৈব কোষ হ'তে হয স্ত্রী জৈব কোষ। মনে রাখতে হবে যে মিথুন সর্ব্বদাই বর্ত্তমান—অতিস্থূলেও 'চণকাকাবেব ভাব'॥ পুং বা স্ত্রী উভয়েব মধ্যেই মিথুন বর্ত্তমান, কখন একেব প্রাবল্য দেখা দেয, কখন দেখা দেয না। মাতৃগর্ভ হ'তে পুং বংশ বা স্ত্রী বংশ উভযই জাত হয়, আবাব বংশধাবাবও পবিবর্ত্তন হয, একটি বংশে হয়ত কেবল পুং জীবই উৎপন্ন হয়, পবেব বংশে হয ত কেবল স্ত্রী জীবই জন্মায়।

প্রাণশক্তিব খেলায় প্রাকৃতিক নিয়ম বিভিন্ন হয়—সব অবস্থায় একরূপ নয়। ক্রম-পবিণতিতে জীব নিম্ন অবস্থাব বিধি অতিক্রম কবে; অন্য নিয়মেব অন্তর্গত হয। এমিবাব মত ব্যূহিত-জীব-কোষ-জাতি ('Race') অলিঙ্গ, কিন্তু সেগুলি হ'তে অন্য কোষ উৎপন্ন হয়। এই হিসাবে, ঐগুলিকেও স্ত্রী জাতিব পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পাবে। আবাব কতকগুলি পোকা মাকডেব মধ্যে পুং চিহ্ন ও স্ত্রী চিহ্ন পৃথক ভাবে স্পষ্টতঃ দেখা যায—তাদেব মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে পুং জাতি ও স্ত্রী জাতি বর্ত্তমান। স্ত্রী মৌমাছি, বিনা সহকাবিতায় পুং জাতীয় জীবেব জন্ম দেয়। ঐ সব ডিম্বকোষ হ'তে যে সব পুং মৌমাছি জন্মায, তাবা হয অত্যন্ত অলস ও বিষম কামপ্রবণ। এটা যেন "Virgin birth"—কুমাবীব প্রজনন শক্তিব খেলা! পুং ও স্ত্রী মৌমাছিব মিলনে যে সন্তান হয়, সেগুলি পুং বা স্ত্রী উভয জাতীয হয়—যেমন আহাব পায সেই বকম পবিণত বা অপবিণত হয়। স্পষ্ট বোঝা যায় যে লিঙ্গ প্রকাশেব পূর্ব্বে, কথিত স্ত্রী জাতীয়েব মধ্যেই ছিল প্রজনন শক্তি—স্ত্রী জাতীয়েব মধ্যেই আছে জীবনীশক্তি। পণ্ডিতেবা বলেন "Life is female"—স্ত্রী শক্তিই প্রাণ শক্তি।

[অনুকীটে ব্যূহিত জীবকে 'Race' বলা হয়—এক ভাবে থাকে, গতানুগতিকভাবে একই লক্ষ্যে কায কবে। ঐ ব্যূহিত-জীব নরাকাবে বিবর্ত্তিত হ'লে, তার সঙ্গে বুদ্ধিব যোগাযোগ হয়। ঐ বুদ্ধিব সহায়তাব মানুষ নিজের বিশেষত্ব রক্ষাব জন্য ও আত্মরক্ষার জন্য একত্রিত হ'য়ে 'Race' গঠন কবে। ঐ ব্যূহিত-জীব-জাতির সংস্কাব এখানে বিকশিত হয়েছে। কীট অনুকীট আদি এই 'Race' এব ঊর্দ্ধে যেতে পারে না। মানুষ তা অতিক্রম ক'রে জাতি গঠন করে। জাতি বা Nation মানে অনেক Race

নিয়ে একটি বিশেষ ভাবের সংঘবদ্ধ জীব। এখানে, বুদ্ধি, কৌশল, প্রতিভা ও আত্মশক্তির বিকাশে সমষ্টির কল্যাণসাধন প্রধান লক্ষ্য হয়। Race হয় অন্তর্জাতি। এই সব অন্তর্জাতি, জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে নিজ নিজ ভাবে গ্রহণ করে ও নানাভাবে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পুষ্টি সাধন করে]।

অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায় যে এমিবা দ্বিধা বিভক্ত হবার পূর্ব্বে ঘনকেন্দ্রে একটি ক্রিয়া আরম্ভ হয়, যার ফল বিভক্ত হওয়া। ঘনকেন্দ্র হ'তে পুষ্টি লাভ ক'রে যেটি ঐ ঘনকেন্দ্রের রক্ষক হয় তার নাম Cytoplasm, 'সাইটোপ্লাজম' ('general cell-plasm'), ভাগ ক'রে দেওয়া ছাড়া সাইটোপ্লাজমের কোন কার্য্য দৃষ্ট হয় না। মস্তিষ্কের মতই ঐ ঘনকেন্দ্রটি জীবকোষের শ্রেষ্ঠ অংশ। উদ্ভিদ বা জীবে কোষ-বিভাজন মানে ঘনকেন্দ্রেরই বিভাজনী ক্রিয়া। কৌষিক ঘনকেন্দ্রের (cell nuecleusএর) সর্ব্বাবস্থাতেই একটা নির্দ্দিষ্ট অবয়ব আছে, তা ঐ ঘনকেন্দ্র,—এমিবারই হোক্, বটগাছেরই হোক্ অথবা যে কোষ পরে মানবাকারে পরিণত হবে, সেই কোষেরই হোক। এমিবার মত যে কোন কোষের বিশিষ্ট অবয়ব সত্ত্বেও, অবয়ব সংস্থান জটীলতায় পূর্ণ এবং তা রঙ্ করলে, বর্ণ বেশ পরিষ্কার দৃষ্ট হয়। ঐ সংস্থানের নাম 'ক্রমোটিন' (Chromotin)। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এমিবার কোষ বিভঞ্জন কালে ঘনকেন্দ্রের জটিলাংশ, নিজে—স্ব ইচ্ছায়—টুকরো টুকরো হ'য়ে ভেঙ্গে যায়। যে কোন প্রকার কোষে ঐ একই রীতি বর্ত্তমান। ঐ ভেঙ্গে যাবার পরের সমস্ত ব্যাপারেই ঘনকেন্দ্রের মধ্যে একটা গতি দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যাপারের নাম 'কারযিওকেনিসিস' (Karyokinesis)। ঐ জটিল জালের ভগ্নমুখ-ঘনকেন্দ্র—যা টুকরো টুকরো হয়—অর্থাৎ, সেই খণ্ড বর্ণাবয়বী ক্রোমোসোনগুলি গঠিত হওয়ার সঙ্গেই নিজ নিজ কায করতে লেগে যায়, কোনটি লম্বা হ'য়ে ছিন্ন হ'যে যায়, কোনটি জালের কেন্দ্রদ্ব'য় যেন আকৃষ্ট হ'য়ে ছুটে যায়, পৃথকীকৃত অংশের মধ্যে আবার অনুপ্রবিষ্ট হয়, আবার জটিল জালের উদ্ভব হয়, তারপর কোষের মধ্যে দুটি ঘনকেন্দ্রের উৎপত্তি হয়। বিশিষ্ট বা পরিণত কোষস্থ ঘনকেন্দ্রের নিকটে—মধ্যে বা সাইটোপ্লাজমেও নয়—একটি ক্ষুদ্রাবয়বী জিনিষ দেখা যায়, ইহাই 'সেণ্ট্রোসোম' '(Centrosome)'। এই সেণ্ট্রোসোম ঘনকেন্দ্রের কোন অংশ না হলেও, কোষকে দ্বিধা বিভক্ত করে। এই

সেণ্ট্রোসোমের উত্তেজনাতেই কোষ-বিভঞ্জন ক্রিয়া ও কোষের কারিওকিনিসিসের বিভঞ্জন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, ক্রোমোসনের উপর সেণ্ট্রোসোমের চাপ পড়ে। যাই হোক্, নিউক্লিয়াস, সাইটোপ্লাজম্, ক্রোমোসন, কারিওকিনিসিস অথবা সেণ্ট্রোসোম—সবই cell বা কোষের অন্তর্গত। বোঝা গেল যে কোষের দ্বিধা বিভক্ত হওয়া ইত্যাদি ব্যাপার, সমস্তই যেন এক সেণ্ট্রোসোমের ইচ্ছাতেই হয়—সেণ্ট্রোসোমই সকলের মূলে। এই স্বতন্ত্র শক্তিই যেন কোষ মধ্যে থেকে স্ত্রী পুংরূপে বিভক্ত হয়। গুরুভার সেণ্ট্রোসোম, যার উত্তেজনা দেওয়া ছাড়া অন্য ক্রিয়া নেই, কারণ, জীবনের ক্রিয়া বা জীবন সমস্যার মূলে কারিওকিনিসিস, সেণ্ট্রোসম নয়, সেই সেণ্ট্রোসেম পুং ভিন্ন আর কি? এটা অবশ্য চর্ম্মচক্ষুর অগোচর অণুবীক্ষণ দৃষ্ট পুং। এই স্থূল ব্যাপারেও সেই 'আমি বহু হব' ইচ্ছা পুং এরই।

পুং ও স্ত্রী—এই দুই সম্মিলন মানে, দুটি ঘনকেন্দ্রের প্রথম সম্মিলন, যার নাম 'Gamets' (গ্যামেট্), আর, 'Gameto-genesis' বা 'গ্যামেট্ ধারা' মানে, ঐ গ্যামেট্‌দের পূর্ণ পরিণত অবস্থায় উপনীত হ'যে অপর গ্যামেট্ গুলির সঙ্গে মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থা। আমরা দেখেছি যে উদ্ভিদ বা যে কোন দ্রব্য স্ববিভক্ত হ'তে হ'তে যায়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঐ নিযম খাটে না। এ ক্ষেত্রে, শেষে একটি মাত্র বিভাগ দেখা যায—ক্রোমোসনগুলিও বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত হয না। কোষের এই শেষভাগে—শেষ গ্যামেটে—ঘনকেন্দ্রের ক্রোমোসনগুলি সমভাগে, পুং ও স্ত্রী জাতীয ক্রোমোসনরূপে বিভক্ত হয়। পৃথক পৃথক সংস্কার নিয়ে এইবার এক একটি জাতি গঠিত হয়। এখানে নিয়ম এই যে, স্বজাতীয় বা অনুরূপ জাতীয় ঘনকেন্দ্রের পুং স্ত্রী সম্মিলন হওয়া চাই, এইরূপ সম্মিলনের পর, তবে, জাতির লক্ষণস্বরূপ বিভিন্ন শরীর গঠিত হয়। সর্ব্বপ্রকার কোষের এই নিযম, কিন্তু এক্ষেত্রেও ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম বর্ত্তমান, যথা ক্যানসার (cancer) রোগে দেহ মধ্যে ঐ প্রকার সর্ব্ববিধি বহির্ভূত অস্বাভাবিক ভাবে বর্দ্ধিত কোষ দৃষ্ট হয়।

পুং গ্যামেট ও স্ত্রী গ্যামেটের মিলনে অর্থাৎ একটি ঘনকেন্দ্র অপরটিতে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার ফলে যে সন্তান হয তার নাম 'জিগোট' (Zygote)—এক ও এক যুক্ত হ'য়ে, একেই পরিণত হয়। একটি আকার দৃষ্ট হ'লেও বস্তুতঃ

'জিগোট' দুটি। অণুবীক্ষণে দেখা যায় যে, ঐ পূর্ণ মিলনের—দুটিতে এক হ'য়ে যাবার-প্রাক্কালে, জীবাণু যেন অত্যন্ত উৎফুল্ল হ'য়ে (ছোট্ট ল্যাজ উঁচু ক'রে) একটি অপরটিতে অনুপ্রবিষ্ট হ'তে ধাবমান হয়। এত নিম্নস্তরেও বাসনার কি বিকাশ। কিন্তু একাত্ম হবার জন্য কি উল্লাস। 'একের'দিকে যাওয়াই জীবের স্বভাব। আর একটি জিনিষ বোঝবার আছে। বিশেষজ্ঞেরা দেখিয়েছেন যে সন্তান উৎপত্তির কারণ, একমাত্র পিতামাতা নয়। সত্য বটে সে নবঘনকেন্দ্র উভয় হ'তে নির্ম্মিত হয়, তথাপি অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় যে উভয়ের প্রদত্ত শরীর গঠনোপযোগী উপাদানের অতিরিক্ত আর এক শক্তি সঙ্গে আসে। স্ত্রী গ্যামেটের থাকে পোষণ শক্তি, যেমন পাখীর ডিমে দেখা যায়—যে জন্য ডিমটির আকার আশ্চর্য্য রকম বড় হয়। মাতা আনেন পোষণ শক্তি, কিন্তু পোষণশক্তি বা সংগৃহীত খাদ্যসম্ভার কিছু গ্যামেট নয়। সেই রকম পুং গ্যামেট্ (যথা পুষ্পরেণু)—অথবা, শুক্রবীজ, ঘনকেন্দ্রীয় সকল ক্রোমোসম ব্যতিত—অতিরিক্ত কিছু সঙ্গে আনে; এই অবস্থার বহুস্থলে, স্ত্রী গ্যামেটে সেণ্ট্রোসোম নেই—যেন 'স্ত্রী'তে 'পুং' প্রভাব নেই, যেন 'স্ত্রী'ই স্বয়ং শক্তি ॥ সাধারণ বৈশিষ্ট্য (সংস্কার), বিশিষ্ট কতকগুলি জাতির শুক্রবীজে, ঘনকেন্দ্র ছাড়া একটি ক্ষুদ্র সেণ্টোসোম দৃষ্ট হয়। এই পুং গ্যামেটের সেণ্ট্রোসোমটিও, পুং স্ত্রী গ্যামেট সম্মিলনজাত নবকোষের সেণ্ট্রোসোম হয়। পিতা হ'তে প্রাপ্ত এই সেণ্ট্রোসোমই, আবার বিভঞ্জন ক্রিয়া আনায়, উত্তেজনা সৃষ্টি করে ইত্যাদি, ইহাও স্মরণ রাখা দরকার যে এই সেণ্ট্রোসোমটির প্রথম গতি সম্ভব হয়, স্ত্রী গ্যামেট দ্বারা আনীত খাদ্য শক্তির জন্য—স্ত্রী গ্যামেটই সেণ্ট্রোসোমকে সক্রিয় অবস্থায় আনার মূল। "যা হেথা আছে, তা সেথা আছে।"

বিজ্ঞানের রহস্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রাকৃতিক জ্ঞানাহবণেব প্রধান সহায় চক্ষুবিন্দ্রিয, কিন্তু ইন্দ্রিয়েবই শক্তি পবিমিত। প্রকৃতিব ঐশ্বর্য্যকে আয়ত্তে আনবাব ইচ্ছা জাগ্রত হ'ল খেলো মনে, আবিষ্কৃত হ'ল খোলো বিজ্ঞান। আজ ইন্দ্রিয়শক্তিব মাত্রা বিজ্ঞান বলে আশ্চর্য্য বকম বেড়ে চলেছে। মানবে যে অসীম শক্তি ঠাসা আছে, বিজ্ঞানেব দ্রুত উন্নতি তা প্রমাণ কবছে। ঐ শক্তিব সীমা কোথায়? খোলো বৈজ্ঞানিক বস্তুব মূল অনুসন্ধানে বত; এই পবীক্ষায়, বশ্মিকণাব আবিষ্কাব বিজ্ঞান জগতে বিপ্লব এনেছে।

সূর্য্য রশ্মিতে সব বকম রঙ্ আছে, কিন্তু সব চ'খে দেখা যায না। Sir William Hershell ১৮০০ খৃঃ (Ultra-red) বশ্মি আবিষ্কাব কবেন, ১৮০১ সালে T. W. Rilter আবিষ্কাব কবেন Ultra-Violet-red বশ্মি। এই Ultra-red বশ্মি সহাযে মসীবর্ণ অন্ধকাব ঘবে পড়া যায়! ঐ বশ্মিতে নীল ও বেগুণী বঙেব অভাব, তাই তাতে আকাশ দেখায় মসীবর্ণ ও গাছ পালা দেখায তুষাবাবৃত সাদা। পণ্ডিতেবা বলেন "কে জানে এমন জীব আছে কি না যাবা আমাদেব চক্ষুব অগোচব—যাদেব চক্ষু Ultra বশ্মি গ্রহণে সমর্থ? Ultra-violet বশ্মি গ্রহণে সমর্থ এমন জীবও ত থাকতে পাবে যাবা ঘোব অন্ধকাবেব মধ্যেও স্বচ্ছন্দে দেখতে পায!" এই Ultra-violet বশ্মি সহাযে ফটো নিলে, ফটোটি ছায়াহীন দেখায়! এই বশ্মি Phosphorous কে বিভিন্ন বস্তুতে পবিণত কবতে পাবে, বিস্ফোবণ আনাতে পাবে, এমন এক বস্তু সৃষ্টি কবতে পাবে যাব আলো আছে, কিন্তু তাপ নেই। এই অদৃশ্য বশ্মিব ক্রিয়াতেই সবুজ পাতাব মধ্যে Carbonic acid gas ও জলকে, চিনি ও শ্বেতসাবে (starchএ) পবিণত কবে, আব, ইহাই জীবনী শক্তিব আদি উপাদান ব'লে মনীষীবা স্বীকাব কবেন। এই অদ্ভুত বশ্মি সহায়ে আজ প্রাচীন অস্পষ্ট লেখাব উদ্ধাব সাধন হয়েছেও এবং বিজ্ঞানের সর্ব্বক্ষেত্রে ইহাব প্রয়োগে অতি বিস্ময়কব ফল পাওয়া যাচ্ছে। খোলোব কর্ম্মনিষ্ঠা, অধ্যবসায়, ও উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে

একতানতা দেখলে বিস্ময়াপ্লুত হ'তে হয়। সমগ্র ইউরোপের কুসংস্কার, পাদরীদের ধর্ম্মান্ধতা ও গোঁড়ামি চূর্ণ হয়েছে ধোলো বৈজ্ঞানিকদের অসম সাহসিকতায়। তাঁদের সাহিত্যে ও সমাজে নতুন শক্তি জাগ্রত করেছেন ঐ সব মনীষীরা, আর আমরা এখনও ঘোঁট্, দলাদলি ও ছ্যুৎমার্গ নিয়ে হট্টগোল করছি। যে সময়ে দেশে রামমোহন ঐ সব গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতাকে আঘাত দিলেন, যাতে জাতির নবচেতনা আসে, তখন দেশে ধন ছিল, প্রতিভা ছিল, সামর্থ্য ছিল ও সেই সময়ে যখন জাতি ধোলো বিদ্যা অর্জ্জন করতে আরম্ভ ক'রে দিলে সাগ্রহে ও সোৎসাহে, তখন ধোলো বিজ্ঞানাগার স্থাপনের দিকে কারোর নজর পড়েনি একমাত্র সংঘশক্তির অভাবে। এখন ত চারিদিকে দারিদ্র্যের হাহাকার।

সূর্য্যরশ্মি নিয়ে গবেষণা আরম্ভ হয় Newton যুগ হ'তে। সেই ধারা বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত চ'লে এসেছে। আলোক রশ্মির গতি কি ভাবে হয়? গতি বেঁকে গেলে defraction এ কি ফল হয়? আবিষ্কৃত হল—রশ্মির দৈর্ঘ্য হিসাবে, ছোট বড হিসাবে—রঙ্ বিভিন্ন দেখায়, রশ্মিগুলো যায় তরঙ্গাকারে, কোন তরঙ্গটি ছোট, কোনটি দীর্ঘ। সূর্য্যরশ্মি যখন পৃথিবীতে অতদূর হ'তে আসে, তখন মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে কি ক'রে আসে, যদি তরঙ্গকে চালিত করবার কিছু না থাকে? অতএব ধোলো মতে তখন হ'ল ঠিক্ যে space বা অবকাশটার মধ্যে ঈথার নামে একটা সর্ব্বব্যাপি ঘনত্বগুণ বিশিষ্ট কিছু নিশ্চয় বর্ত্তমান। ঈথার তরঙ্গ বলতে বোঝাল waves of radiation, বিচ্ছুরণেরই তরঙ্গ; Sir Oliver Lodge বললেন যে ঈথার মানে, "that which undulates"—স্পন্দন মাত্র। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই স্পন্দ'নর পুনঃ পুনঃ দ্রুতগতিতে (frequency তে) হয় রঙের উৎপত্তি। তার পর জল্পনা চলল যে, ঐ রকম frequency র কি কমবেশী অবস্থার রশ্মি নেই? আবিষ্কৃত হ'ল অদৃশ্যরশ্মি সব—লাল আলোক তরঙ্গ অপেক্ষা কম frequencyর তরঙ্গ এবং বেগুনি আলোক তরঙ্গ অপেক্ষা বেশী frequencyর তরঙ্গ, Infra-red রশ্মিতে আনায় সর্দ্দিগরমী (sun-stroke), ultra violet rayতে সারায় অনেক প্রকারের চর্ম্মরোগ। তার পর উঠ্‌লো Xrayর কথা। আবিষ্কৃত হ'ল তার দ্বিভাবে

গতি, একটির নাম soft-ray, কোমল বশ্মি, অপবটিব নাম hard-ray দুবভেদ্য বশ্মী। কোমল রশ্মি বেশী ভেদ কবতে পাবেনা ("less penetrating")। তাব পব 'গামা' বশ্মিব অদ্ভূত অনুপ্রবেশ-শক্তি দেখে বৈজ্ঞানিক মহলে বিস্ময়েব অবধি বইল না। তাব পব আব এক বকম বিশ্বানুস্যূত বশ্মিব সন্ধান তাঁবা পেলেন, নাম হল cosmic ray ; অন্যান্য বশ্মি থাকে দিনে, cosmic ray বর্ত্তমান সব সময়ে, প্রতি মুহূর্ত্তে এই বশ্মি আমাদেব দেহেব অনু পবমাণু গডছে ভাঙ্গছে। এই cosmic ray সূর্য্য হ'তে আসছেনা, কাবণ, বাত্রিতেও তা বর্ত্তমান। বৈজ্ঞানিকেবা ভাবছেন, তবে কি ঐ বশ্মি সৌবমণ্ডলেব বাইবেব নক্ষত্রাদি হ'তে আসছে ও সেই সব নক্ষত্রাদিব ক্রিয়া আমাদেব দেহেব উপব কার্য্য কবে? অথবা ইহা সেই জ্যোতিঃ বা বিশ্বগঠন-মূল মহাদীপ্তি যা ছায়াপথ সৃষ্টি কবে? ইহা কি electron এব বিপরীত ধর্ম্মী? যাই হোক্, তাঁবা বলছেন যে সব তবঙ্গাকাবে বয়েছে—তবঙ্গ তবঙ্গই সব। তা হ'লে, এক মনেব অন্যেব উপব প্রভাব (Telepathy) ও কি ঐ তবঙ্গেব ক্রিয়া? স্পন্দনই সৃষ্টি বহস্য—বিজ্ঞান বহস্য ইহাই দিন দিন দৃঢতব ভাবে প্রমাণ কবছে।

পৃথিবীব বয়স নিরূপণ কবতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন্ প্রথম ঠিক কবলেন যে সূর্য্য পৃথিবীকে আলো দিচ্ছে ১০ কোটি হতে ৫০ কোটি বৎসবেব বেশী নয় ("100 million years to 500 million years"), Professor Tait অধ্যাপক টেটেব মতে ২ কোটি বৎসবেব বেশী নয় ("not more than 20 million years")। তাব পব এলেন গণিতবিদ্। তাঁবা মেরুদ্বয়েব ও বিষুব বেখাব আয়তন দেখে, ১০ কোটি বৎসবই সাব্যস্ত কবলেন, ভুতত্ত্ববিদ্ ঠিক কবলেন ৮ কোটি, কিন্তু তাঁদেব মধ্যে বহু মতভেদ বয়ে গেল, জীবতত্ত্ববিদেবা ঠিক্ কবলেন, ১৪ কোটি হ'তেও আব অনেক লক্ষ বেশী। সূর্য্য হতে পৃথিবী এসেছে, সুতবাং ভুতত্ত্বেব দিক্ দিয়ে ও অন্যান্য প্রমাণ সহায়ে একদল পণ্ডিতেবা ঠিক্ কবলেন যে ধবাব জন্ম ১৩০ কোটি বৎসব পূর্ব্বে অন্ততঃ, আব, সম্ভবতঃ আমাদেব এই সূর্য্যেব জন্ম ৭০ হাজাব কোটি বর্ষ পূর্ব্বে। তাবপব radio-active-substanceএব আবিষ্কাবে ঐ সমস্ত গণনা ত্যাগ কবতে

হয়েছে। একমতে—ইহাই এখন প্রবল মত—সাব্যস্ত হল যে পৃথিবীর জন্ম হয়েছে অন্ততঃ প্রায় ২০০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে—সুবিধার জন্য ধরা হোক খৃঃ পূঃ ২০০ কোটি বর্ষে। ধরা হ'তে বিচ্ছিন্ন ভূভাগ—যার নাম চন্দ্র—ছিটকে বেরিয়ে আসে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে। এই বেরিয়ে আসার জন্যই ২৭ মাইল গভীর প্রশান্ত মহাসাগরের সৃষ্টি হয়। ধরা ছিল প্রথমে এক প্রকাণ্ড দ্রবময় পিণ্ড। সূর্য্যের মধ্যেই ছিল আমাদের এই ধরা, আর সূর্য্যের টানেই ইহা বেরিয়ে আসে। সূর্য্যকে বেষ্টন ক'রে পৃথিবী ঘুরছে, কিন্তু সূর্য্যও স্থির নেই, সমস্ত গ্রহগুলি নিয়ে সূর্য্য 'Lyra' নক্ষত্র পুঞ্জের দিকে প্রতি সেকেণ্ডে ১০ মাইল গতিতে অগ্রসর হচ্ছে ও প্রতি বৎসর ৩০ লক্ষ মাইল ঐ নক্ষত্র পুঞ্জের নিকটবর্ত্তী হচ্ছে।

জীবন রহস্যের মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, রাশিয়া অগ্রণী হয়ে প্রমাণ করলেন যে একটি Electron হ'তে বহু Electronএর উৎপত্তি হ'তে পারে, আর Radio সহায়ে মৃতকল্প ব্যক্তি ও প্রাণ পায়। এই সব নব নব আবিষ্কার মূল্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু এ পর্য্যন্ত জীবন-রহস্যের মূল খোঁজো পান নি—অমৃতের সন্ধান তাঁরা পান নি।

সমুদ্রেই প্রথম জীবন চিহ্ন পাওয়া যায়। জীবাস্থির চিহ্ন আজও বর্ত্তমান। সমুদ্রতল ও ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তর দেখে অনেক তথ্য বৈজ্ঞানিকেরা পেয়েছেন। ধরার বয়স হিসাবে বিভিন্ন যুগ ও তদন্তর্গত অনেক উপযুগে কালকে বিভাগ ক'রে দেখিয়েছেন। আদি অবস্থার নাম Archœn or Azoic, এজোয়িক ২। Primary or Palœozoic, প্যালিওজেয়িক। ইহার উপযুগ (ক) Cambrian, ক্যাম্ব্রিয়ান—মেরুদণ্ডহীন জীবের উৎপত্তি, (খ) Silurian, সাইলুরিয়ান—ঐ। গ। Devonian, ডেভোনিয়ান—ঐ। ঘ। Carboniferous, কার্বোনিফেরাস্—মৎস্য। (ঙ) Permian, পারমিয়ান—উভচর জীব (জলে ও স্থলে)। ৩। Secondary or Mesozoic, মেসোজোয়িক্। উপযুগ :—(ক) Triassic, ট্রায়াসিক্—সরিসৃপ আদি, (খ) Jurassic, জুরাসিক্, (গ) Cretaceous, ক্রিটেকিয়াস্। ৪। Tertiary or Cinozoic; সাইনোজোয়িক্, (ক) Eocene, ইয়োসিন্—স্তন্যপায়ী জীব; (খ) Oliogocene ওলিগোসিন্, (গ) Miocene, মাইওসিন; (ঘ) Pliocene, প্লিওসিন্—ভাভা যে বৃহদ্‌কায় নরাকার অস্থি পাওয়া যায় তদনুরূপ জীব। ৫।

৫। Quartenary or Neozic, নিয়োজিক্ ঃ—(ক) Pleistocene, প্লিইস্টোসিন—মানবেব আবির্ভাব, (খ) বর্ত্তমান যুগ।

[ঐতিহাসিক—বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েব গ্রন্থে ঐগুলির বাঙ্গালা নাম দ্রঃ]।

ক্যাম্ব্রিয়ান্ যুগেব পূর্ব্বে ছিল গলিত প্রস্তব। আদি যুগে কোন জীবাস্থি পাওয়া যায় নি, তবে কেমন ক'বে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে প্রথম চক্ষু বিশিষ্ট প্রাণীব ও পোকা মাকডেব উদ্ভব হ'ল, এই নিয়ে তাঁবা বহু গবেষণা চালিয়েছেন। সাইলুবিযান্ যুগে, মাছ, বিছা, স্পঞ্জ প্রভৃতিব উদয়। মেসোজোয়িক যুগে বৃহদ্‌কায় সবিসৃপ জাতীয় জীব ও প্রজাপতি আদিব আবির্ভাব। সাইনোজোয়িক যুগে, সমুদ্র উচ্ছলিত হয় ও বহু পর্ব্বত মালাব উত্থান হয়। এই সময়ে বৃহৎকায জন্তুব ধ্বংস সাধন হয়; mamoth, ম্যামথ (অতিকায় হস্তি), খড্‌গ্ দন্তী ব্যাঘ্র (sabre-toothed tigers), ছয় ফিট্ লম্বা কচ্ছপ সে সময়েও ধ্বংস হয় নি। এই সময় হ'তে স্তন্যপায়ী জীব দেখা দেয়। পববর্ত্তী যুগ হ'তে, প্রায় বর্ত্তমান আকাবেব জীব দেখা দেয। মাইওসিন্ যুগে বানব (apes) দেখা দেয় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে। তাব পবেব যুগই Ice-age, হিমযুগ। এই হিমযুগে ইউবোপেব ৮০ হাজাব বর্গ মাইল (Square miles) ভূমি অদৃশ্য হয়ে যায়, বহুস্থান ভূগর্ভে অন্তর্হিত হয় ও সমুদ্রেব তলদেশ উচ্চ হয়ে যায। মনীষীবা বলেন যে ঐ প্রকাব হিমযুগ তিনবাব বা সাতবাব হয়েছে, কিন্তু মানুষেব চিহ্ন সে সময়ে ও পাওয়া যায়; এই চিহ্ন গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই সম্ভব। প্যালিওজোয়িক ভূভাগেব অন্তর্গত ভূভাগেব নাম ছিল Gondwana Land, গণ্ডওয়ানা ভূভাগ, দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য এশিযাব অধিকাংশ, মাদাগাস্কাব ও ভাবত উপদ্বীপ নিয়ে ছিল ঐ ভূভাগ। পণ্ডিতদেব মতে, ঐ ভূভাগেব সঙ্গে, খুব সম্ভব, দক্ষিণ আমেবিকাব যোগ ছিল—'দক্ষিণ আট্‌লন্টিস্' নামে এক মহাপ্রদেশেব মধ্য দিয়ে, যে স্থান এখন আতলান্টিক মহাসাগব। ঐ যুগে চীন, মঙ্গোলিয়া ও পূর্ব্ব সাইবিরিয়াব নাম ছিল 'আঙ্গাবাল্যাণ্ড (Angara Land)। ইহাই লুপ্ত 'আতলান্তিস্' মহাপ্রদেশ (Atlantic Continent)। মেজোয়িক যুগেব মাঝামাঝি সময়ে সমুদ্র উচ্ছলিত হয় ও এশিয়া মাইনরেব উদ্ভব হয়, আব এই সময়েই হিমালয়েব

অভ্যুত্থান হয়ে সমগ্র এশিয়ার আকার পূর্ণ হয়। বর্ত্তমান ভূমধ্যসাগর সেই লুপ্ত মহাসাগরের চিহ্নস্বরূপ সমুদ্র-প্রণালী রূপে বিরাজ করছে! এই যুগের পর উত্তর আমেরিকা দেখা দেয়। নিয়োজিক্ যুগে ভূসংস্থান এখনকার মত ছিল না, তখন, পণ্ডিতদের মতে, মানবের প্রস্তর যুগ। ঐ যুগেই বেরিং প্রণালীর মধ্য দিয়ে এশিয়া ও আমেরিকার যোগ ছিল এবং সম্ভবতঃ আতলান্তিসের মধ্য দিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার সংযোগসূত্র ছিল।

মানুষের প্রথম আবির্ভাব কত পূর্ব্বে, এই নিয়ে আজও বৈজ্ঞানিকদের জল্পনা-কল্পনা ও বৈজ্ঞানিক রীতিতে অনুসন্ধান চলেছে। প্রথমে ধরা হত যে ৩ লক্ষ বৎসরের অনেক পূর্ব্বে মানবের আবির্ভাব হয়। তার পর Radium ও Radio-activity সহায়ে ঐ সব গণনাকে অনেক বাড়িয়ে ধরতে হয়েছে—আরো বহু পূর্ব্বের প্রমাণ হয়েছে।

[রেডিয়ামের যে গুণে উজ্জ্বলতা আদি আসে তার নাম Radio-activity, এই গুণটি রেডিয়ামের নিজস্ব অর্থাৎ ইহা তার মধ্যেই বর্ত্তমান, বাইরের কোন সংঘাত জনিত নয়]।

Keith কিথ্ প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে, প্রায় ৬০ লক্ষ ("6 million years") বৎসর পূর্ব্বে প্রথম মানব চিহ্ন পাওয়া যায়; অর্থাৎ সেই সময়ে মূল বংশ ('Common stock') বা 'নর-বানর' ('anthropoid-apes') হ'তে মানব আকারের পৃথক বিকাশ হয়। এই রকম পরিবর্ত্তন হ'তে কত সময় লাগে? ডারউইন প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে, ইহাতে যুগ যুগ ব্যাপী সময় লাগতে পারে, কিন্তু মেণ্ডেল প্রমুখ মনীষিগণের শিষ্যেরা প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছেন যে 'Law of Variation' (প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের নিয়ম—'জাত্যন্তর পরিণাম') অনুসারে মস্তিষ্কে অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন ("abrupt changes") আসে ও তাতে সময় একেবারে সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাঁরা বলেন, ও জোর করেই বলেন যে, মানবের উৎপত্তির মূল 'higher apes' বা উচ্চতর বানর জাতিতে নয়, পরন্তু মানব এসেছে একটি বানর ও মানুষের মৌলিক মূল বংশ হ'তে; এখানে বলা যায় যে ঐ হঠাৎ বৈচিত্র্যের উদয় ('Sudden Variation') ও ঐ আকস্মিক পরিবর্ত্তন হ'তে আরো বহু প্রকারের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এসব ক্ষেত্রে, natural selection, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন

আপন বিধিকে অনুসবণ কবেনা, ববং ঐ আকস্মিক ব্যাপাব-সমূহ সমাবেশেব সহায় হযে দাঁড়ায় !

বর্ত্তমান বিজ্ঞান, জাতীয কুসংস্কাবকে, (Race prejudiceকে) ধাক্কা দিয়েছে। আদিম মানবে (অসভ্য) ও সভ্য মানুষে পার্থক্য অবশ্য থাকে। এস্থলে, হিন্দু বলবেন, যাদেব প্রথম মানব জন্ম ও যাদেব অনেকবাব মানবজন্ম হয়েছে তাদেব—এই বিভিন্ন শ্রেণীব মানবে—পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ কবছেন যে একটি মূল 'গণ' (species) হ'তেই সব মানব এসেছে। মূল 'গণ' হ'তে বহু শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে ও তাবাই আবাব ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পবিণত হযেছে। জীবতত্ত্ববিদেবা বলতে আবম্ভ কবেছেন যে তাঁবা বহু পবীক্ষাব ফলে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন 'গণে'ব (Species এব) কল্পনাটা কৃত্রিম ও অবাস্তব। বহু শাখায বিভক্ত বর্ত্তমান মানবসন্তান, মূলগণ হ'তে উদ্ভূত হ'যে প্রত্যেকটি মিশ্রজাতিরূপে বিদ্যমান। এই বিভিন্নতাব মধ্যে এক একটিব মধ্যে যে বিশেষত্ব দেখা যায়, তাই দেখে মানুষকে শ্রেণী অনুসাবে বৈজ্ঞানিক বিভাগ কবেন। ধোলোব বিভাগ বক্তেব দিক্ দিয়ে, মাথাব খুলি, দেহেব গঠন প্রভৃতিব দিক্ দিয়ে; আর্য্যেব বিভাগ গুণেব দিক্ দিয়ে, মানসিক গঠন, মানস গ্রহণ ক্ষমতা, প্রবৃত্তি ইত্যাদিব দিক্ দিয়ে। এই দুটো দিক্ই জানা দবকাব। আজ আমবা দেখছি যে Anglo-Saxon এঙ্গলো-স্যাক্সণ জাতি ক্ষমতাশালী, প্রতাপশালী ও বড় জাতি, কিন্তু ঐ জাতিতে শুধু যে কয়েকটি আদিম জাতিব—কেল্ট, এঙ্গল্স্, স্যাক্সণস, ডেন্, নবমেন, বোমান্—বক্ত আছে তা নয, আবো বহু জাতিব বক্ত ঐ জাতিব ধমণীতে বর্ত্তমান।

[যেখানে এঙ্গলো স্যাক্সণ জাতি বাস করত, সেই দ্বীপসমূহের আদিম জাতিব সঙ্গে "Celts, Angles, Saxons, Danes, Normans, Romans with a dash of half a dozen of other peoples" এব রক্ত মিশ্রণ হয়—(Harmsworth]।

মাত্র বক্তমিশ্রণেব দিক্ দিযে সভ্যতাব স্বরূপ নির্ণয় হয় না। যে জাতি মহৎ গুণসম্পন্ন, যে জাতি মহৎ কাজ কবেছে বা কবে, সেই জাতিই বড —এ তত্ত্বটি ধোলো বৈজ্ঞানিক এখন বুঝেছেন। পূর্ব্বে, যে সময়ে ভাষাতত্ত্বেব দিক্ দিয়ে জাতিনিরূপণ কববাব একমাত্র উপায় ধবা হ'ত, তখন তাঁবা এমন ভাবে বোঝেন নি।

মানবের উৎপত্তি কোথায়—কোন্ ভূভাগে—প্রথম হয়, এ নিয়েও ধোলো মনীষীরা বিস্তর গবেষণা করেছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত যে মানবের আবির্ভাব প্রাচ্যেই হয়, ইউরোপে নয় ('all races are oriental—man was not born in Europe"—ঐ) আর, বহু প্রাচীন যুগ হ'তে, ঐ যে এস্‌কিমো, রেড্‌ইণ্ডিয়ান, বা য়াহুদি জাতি যা ইউরোপে বা আমেরিকায় দেখা যায়, তারাও এসেছে এশিয়াখণ্ড হ'তে, এস্‌কিমো ও রেড্‌ইণ্ডিয়ানরা—মঙ্গোলিয়ান জাতির প্রশাখা—এবং য়াহুদিরা, ধোলো মতে, ইন্দো-ইউরোপিয়ান (Indo-Europeans)।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে ধোলো মতে পৃথিবীর বয়স ১৩০ কোটি বা ২০০ কোটি বৎসর। এই সব গণনা তাঁরা যে ভাবেই করুন, সবগুলিই এক একটা আঁচ মাত্র, ইহা স্পষ্ট বোঝা যায়। আর্য্যের গণনায় যে ভাবে সংখ্যা ফেলা হয়েছে, তাতে মনে হয়, গণনা ঠিক্ ক'রে বার করা হয়েছে। আর্য্যমতে, পৃথিবীর জন্ম হয় ১৯৫ কোটি, ৫৮ লক্ষ, ৮৫ হাজার ৩৬ বর্ষ পূর্ব্বে, বর্ষটী অবশ্য প্রতিবৎসর বেড়ে যাচ্ছে। যে কোন পাঁজিতে এই হিসাবটা পাওয়া যাবে। এই হিসাব, যুগোৎপত্তির হিসাব ধ'রে গণনা। যাই হোক্, উক্ত দুপ্রকার গণনাতে বিশেষ পার্থক্য নেই। ওরকম আঁচের গণনায় ৪।৫ কোটিতে এসে যায় না (১৯৫ ও ২০০)। তবে, ধরায় জীবনের প্রারম্ভকাল সম্বন্ধে ধোলো যে মত প্রকাশ করেন, আর্য্যের তা নেই। ইউরোপের প্রত্ন প্রস্তর যুগ আরম্ভ হওয়ার প্রমাণ খৃঃ পূঃ ১৫ লক্ষ বৎসর আগেও পাওয়া যায়।

['Prehistoric Times' ও রাখালদাস বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাসে ধৃত বচন দ্রঃ।]

ধোলোর একমতে, ৬০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মানবের উৎপত্তি, ইহাও পূর্ব্ব গণনার মত আঁচ, চীনাদের ইতিহাসে ১০ লক্ষ বৎসরের কথা আছে। আর্য্যমতে, মানব সৃষ্টির কাল—৪৩ লক্ষ ২২ হাজার বৎসর পূর্ব্বে—বর্ষটা প্রতি বৎসর বাড়ছে।

[হিন্দুশাস্ত্র মতে যুগ বিভাগ :—

(১)	সত্যযুগ বা দেবমানব ঋষি যুগ,	স্থিতি পরিমাণ	১৭ লক্ষ, ২৮ হাজার বর্ষ।
(২)	ত্রেতা " বা মানব-দেব-ঋষি যুগ,	" "	১২ " ৯৬ .. ..।
(৩)	দ্বাপর " বা মানব-ঋষি যুগ,	" "	৮ " ৬৪ .. ।
(৪)	কলি " বা বর্ত্তমান যুগ,	" "	৪৩ " ২২... .।

[উল্লিখিত বিভাগের তিথি, নক্ষত্র ও বার পর্য্যন্ত দেওয়া আছে। স্থিতি পরিমাণ—যুগ প্রভাবমাত্র। প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনগুণই বর্ত্তমান, সুতরাং প্রত্যেক যুগেই গুণত্রয় সম্পন্ন মানব বর্ত্তমান। যে গুণেব প্রাবল্য যে যুগ তাহাই যুগ-বিভাগে দেখান হয়েছে। আর্য্যের সৃষ্টিক্রম, অবতরণ প্রণালী, ধোলো বিজ্ঞানের অববোহণ প্রণালী বা বস্তুব দিক্ দিয়ে। প্রথম বা দেব-মানব যুগ, সত্ত্বগুণ প্রধান যুগ—স্রষ্টা হ'তে জ্ঞানলাভ। এই যুগে পূর্ণ অধ্যাত্মগুণের প্রকাশ ও শান্ত সভ্যতাব বিকাশ। ভেদ বুদ্ধি ও বিবাদহীন-প্রধান এই যুগের সভ্যতায় বর্ণবিভাগ পর্য্যন্ত নেই। ব্যবহার সুবর্ণপাত্র, দীর্ঘ ও বিপুলায়তন মানবশরীর; "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"—প্রচার। ২য় বা ত্রেতাযুগ, সত্ত্বরজপ্রধান। এই যুগে পবশুরাম ও রামচন্দ্রের আবির্ভাব। "সত্যেনোত্তভিত জগৎ", সত্যের দ্বাবাই জগৎ ধৃত (সত্যই ধর্ম্ম ধারণ করে)—এই বেদবাণীকে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা কবা হয়, জীবনে পরিণত করা হয় রামচন্দ্রের দ্বারা, প্রচার হয়. সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই বিশ্বকে ধারণ করে, সত্যেই বিশ্বপ্রতিষ্ঠিত, সত্যময় জীবনই আদর্শ জীবন। মানবের আকার ক্রমশঃ ছোট হ'তে আবস্ত হয়েছে. এই যুগে, ব্যবহার রৌপ্যপাত্র। এই যুগে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ দেখা যায়। সমদর্শীত্বই রাজধর্ম্ম, ইহা দেখান বামচন্দ্র। ৩য় যুগ রজস্তম প্রধান। এই যুগের শেষাংশে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। এই যুগে জাতিবিভাগ বেশ জেঁকে ব'সলেও, জাতির মধ্যে বর্ত্তমান যুগের মত ভেদ বুদ্ধি প্রবল হয় নি। এই যুগের ঋষি বেদব্যাস, জেলেনীর গর্ভজাত ও কামজ সন্তান। রামচন্দ্রেব মত, এই যুগে শ্রীকৃষ্ণই ধর্ম্মসংস্থাপক। প্রচার হয় নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, অহৈতুকী ভক্তিযোগ ও জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশ:।" ব্যবহার তাম্রপত্র। এই কলিযুগ তমপ্রধান—ভোগবিলাস ও জডবাদ প্রবল। জডবাদের রজোগুণ বা আস্ফালন জডত্বের দিকে ধাবমান]।

ধোলো হিসাবে, মানুষের, প্রথম প্রস্তর যুগ, তাবপব তাম্রযুগ; ভাবতেব প্রথম স্বর্ণযুগ; তাবপব বৌপ্যযুগ, পবে ৩য় যুগই তাম্রযুগ। আর্য্য দেখাচ্ছেন যে, মানব শ্রেষ্ঠ সভ্যতা হ'তে ক্রমে অবতবণ ক'বে বর্ত্তমান যুগে দাঁডিয়েছে। এতটা নীচে নেমে এলেও, এ যুগেব সকল দেশেব মহাপুরুষ সাধন মার্গকে সহজ ক'বে দিয়েছেন। এ যুগেব কোন মহাপুরুষই গণ্ডী মানেন নি তত্ত্ববিষয়ে। এ যুগেব সর্ব্বত্র সমাজ-সমস্যা জটিল। ধোলো দেখাচ্ছেন, অসভ্য যুগ হ'তে মানব ক্রমশঃ সভ্য যুগে উঠেছে অর্থাৎ মহাবজোগুণেব বিকাশ হয়েছে ধোলোব; কিন্তু জডবাদ এখন টুঁটি চেপে বসেছে। জাতি

বিভাগ সর্ব্বত্র আজও। Herodotus, Diodorus ও Plutoর মতে ইজিপ্টের জাতিবিভাগ, (১) পুরোহিত, (২) যোদ্ধা, (৩) কৃষক, (৪) শিল্পি, (৫) পশুপালক, উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের বিবাহ হত না। এই নিয়ম, ভারতে, বর্ত্তমান যুগে, কঠোর ভাবে পালিত হয় নি মুসলমান যুগ পর্য্যন্ত। ইজিপ্টে জাতিবিভাগ প্রথমে ছিল ৭টি। অনেক স্থলে, গুণকর্ম্ম অনুসারে বিভক্ত হ'লেও, ঐ বিভাগে ভারতের মত ব্রহ্মচর্য্যের ভাব—ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ ও আবশ্যকতার বোধ বা ব্রহ্মবিদ্যাও ছিলনা এবং সামাজিক রীতিনীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। জাত্যন্তর পরিণাম ফলে, জড়বাদের তরঙ্গাঘাত সহ্য করতে না পেরে বর্ণসঙ্করের জন্য ঐ প্রাচীন জাতির ক্রমারোহণ প্রণালীতে জড়ত্বপ্রাপ্তি ও বিলুপ্তি।

আধুনিক এক মতে, বর্ত্তমান যুগের মাত্র ৫০৩৬ বর্ষ গত হয়েছে ও ঐ সময়ের সম সময়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। উপরি উক্ত ভারতীয় যুগ-বিভাগ ও স্থিতি পরিমাণের হিসাবের সঙ্গে ইহার মিল বা সামঞ্জস্য হয় না। আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয়। সত্যযুগে হিরণ্যকশিপুর সময় অসুর প্রভাব দেখা দেয়, সেটি দমন করা হলে আবার সত্যযুগ-প্রভাব ফিরে আসে, সেই রকম রামচন্দ্রের প্রভাবে ত্রেতাতেও সত্যযুগ প্রভাব দেখা দেয় ইত্যাদি। পুরাণাদিতে যাই থাকুক, বেদের সময় মানবের—পরমায়ু গড়পড়তা শত বৎসর ছিল—বেদে ১৫০ বৎসর পরমায়ুর কথাও পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান ও পুরাণ

সৃষ্টি দানা বেঁধে ওঠবার পূর্ব্বে, দুটি অবস্থার কথা পুরাণাদি শাস্ত্রে পাওয়া যায়। বেদ বলেন, ব্রহ্মজ্যোতির দুরকম রূপ—"দ্বে বাব খল্বেতে ব্রহ্মজ্যোতিষো রূপকে" (মৈত্রায়ণী, ৬।৩৬)। ঐ জ্যোতিকে, জ্যোতির জ্যোতি বলা হয়েছে—"তদ্ দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতি" (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১৬)। ঐ জ্যোতিই পরম জ্যোতি, কারণ, সেই জ্যোতিতেই সব জ্যোতিষ্মান (কঠ ২।২।১৫)।

শাস্ত্র বলেন, তপস্যায় সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু তপস্যায় মগ্ন, তাঁরা এক অদ্ভুত জ্যোতি দেখতে পেলেন। ব্রহ্মা হংসরূপ ধারণ ক'রে সেই

স্তম্ভাকৃতি জ্যোতিব উর্দ্ধে যেতে লাগলেন, বিষ্ণু ববাহরূপ নিয়ে ঐ জ্যোতিস্তম্ভেব অধোদিকে চললেন। উভয়েই ক্লান্ত হ'য়ে ফিবে এলেন, কেহই উহাব অন্ত বা মূল পেলেন না। পুবাণাদিতে (লিঙ্গপুবাণ, শিবপুবাণ—২য় অ. ইত্যাদি দ্রঃ) ঐ জ্যোতিস্তম্ভই অনাদি লিঙ্গ, ঐ লিঙ্গ হ'তেই বিশ্বেব প্রকাশ। (যজুর্ব্বেদেব যূপস্তম্ভও জ্যোতির্ম্ময়)। এইটি প্রথম অবস্থা।

[লিঙ্গ—যার দ্বারা কারণকে বুঝতে পারা যায় ও যা স্বকারণে লীন হয়।]

"দ্বৈতাৎ ভয়ং"। ব্রহ্মা, স্বষ্ট্যাভিমানী পুরুষ। সেই কাবণার্ণবে অন্য কিছু নেই। ব্রহ্মা দেখলেন, হঠাৎ সেখানে দুই দৈত্যেব আবির্ভাব হয়েছে। তাবা চায় স্বষ্টিব ক্ষমতা নিজেবা নিতে, ব্রহ্মাব স্বষ্টিকে বিপর্য্যস্ত কবতে। ব্রহ্মাব স্বষ্টিব অভিমান আছে, দ্বন্দ্ব আছে। তাঁতে ভয় ও মোহ দেখা দিল, 'যুদ্ধং দেহি' ববে ঐ দুই দৈত্য—মধু ও কৈটভ—তাঁব সামনে দাঁড়াল। পালনীশক্তি বিষ্ণু,—তাদেব বিনাশ কবলেন, ভয় ও মোহ দূবে গেল। তাদেব মেধে ভূপৃষ্ঠ জেগে উঠল। এইটি দ্বিতীয় অবস্থা। ব্রহ্মেব দ্বিবিধ রূপেব কথা বলা হয়েছে, কিন্তু "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেবিতাঞ্চ মত্বা, সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ" (শ্বেতাশ্বেতর ১।১২), ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেবিতা এই তিনরূপে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত।

বামায়ণাদিতে বর্ণিত চবিত্র বিশেষেব কাল নিরূপণেব চেষ্টা ধোলো কবেছেন, হিন্দুবা তাঁদেব প্রণালী সম্পূর্ণ অনুসবণ ক'বে অনেক নতুন নতুন তথ্য নিরূপণে অগ্রসব হয়েছেন, কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাঁবা ঐ প্রণালীকে অভ্রান্ত মনে কবেন না, যাঁবা বেদ বা বামায়ণাদিব অতি প্রাচীনত্বে আস্থাবান। তাঁদেব যুক্তিব ও একটা দিক্ আছে। এই দিক্‌টাব বিবৃতি দেবাব চেষ্টা কবব, বিচাবেব ভাব আপনাদেব উপব, মাত্র ভাববাব খোবাক্ দেওয়া যাচ্ছে তাঁদেব পক্ষ সমর্থন ক'বে কিছু ব'লে। তাঁদেব যুক্তি অদ্ভুত মনে হ'তে পাবে, বিষম মতভেদ থাকতে পাবে, কিন্তু ঐ দিকটা বিশেষ ভাববাব বিষয় তাতে সন্দেহ থাকে না।

এখন ভূতত্ত্বেব দিক্ দিয়ে নৃতত্ত্বেব আলোক সম্পাতে ইতিহাস আলোচনা চলেছে; এটা পূর্ব্বে এমন ছিল না। দিল্লীব উত্তবে যে সিবালিক পর্ব্বতমালা আছে, তাব ভূগর্ভেব একটি স্তবে এক বিপুলকায় বানব-জাতীয়

অস্থিপঞ্জর পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা ঐ স্তরকে অন্ততঃ ১ কোটি বৎসর পূর্ব্বেকার বলেন। ঐ অদ্ভুত প্রাণীর নাম দিয়েছেন Dryopethicus, ড্রাইওপেথিকাস্। পণ্ডিতদের মতে, ঐ প্রাণী-জাতি হ'তে অন্য সর্ব্বপ্রকার লাঙ্গুল বিশিষ্ট বানর এসেছে ও তারাই মানবের পূর্ব্বপুরুষ। তা হ'লে, ভারতই মানবের আদি জন্মভূমি স্বীকার করতে হয়, কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, তা নয়, কারণ তখন ভূমধ্যসাগর ছিল না, একটানা জমি বরাবর ছিল, সুতরাং সেই নানা শ্রেণীর বানরকুল, তখনকার এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, যবদ্বীপ ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে ও সব স্থানেই তারা ক্রমশঃ নর-বানর ও পরে নরাকারে পরিবর্ত্তিত হয়। ঐ সঙ্গে, অনেকে বলেন যে ভারতেই প্রথম উচ্চশ্রেণীর মানুষ অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান মানুষ দেখা দেয়। তাঁদের মতে, কোন নৈসর্গিক কারণে হিমালয়ের হঠাৎ অভ্যুত্থান হয়। এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে হিমালয়ের আবির্ভাব হয় উত্তর ও পশ্চিমাংশস্থিত ভূ-স্তরের চাপে—ফল প্রবল ভূকম্প। হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গের এক তৃতীয়াংশ হ'ত তখন সমুদ্র-তরঙ্গ তাড়িত। হিমালয়ের পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতের পর্ব্বতমালার উদ্ভব হ'লে সেটি হয়ে যায় ন্যুব্জপৃষ্ঠ। মেসোজোয়িক যুগে যে গলিত প্রস্তরাদির প্রবাহ ছুটে যায়, তাতে দাক্ষিণাত্য প্রদেশ প্রায় ৪০০০ হাজার হ'তে ৬০০০ হাজার ফিট্ উঁচু হয়ে যায়।

হিমালয়ের অভ্যুত্থান হয় অন্ততঃ খৃঃ পূঃ সাড়ে কুড়ি লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে (একমতে ৫ কোটি বৎসর পূর্ব্বে), ফলে ভারতের বানরকুল ভারতেই আটক পড়ে ও নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে তারা ক্রমশঃ মানবরূপে পরিণত হয় ও পরে বাক্‌স্ফুর্ত্তি হয়। নর-বানরকুল এখন লোপ পেয়েছে, যেমন Mamoth, ম্যামথ লোপ পেয়েছে। অন্যান্য স্থানেও, বহু পরে, বানর, বানর-নর, নর-বানর ও নরের আবির্ভাব হয়। সমস্ত নর-বানর একইকালে, একসঙ্গে নররূপে বিবর্ত্তিত হয় নি। যখন কতক নররূপে ক্রমপ্রকাশিত হয়, তখন কতকাংশ বা অনেকাংশই নর-বানরাদিরূপে বর্ত্তমান ছিল। এই ক্রমবিকাশের সময় যদি ১০ লক্ষ বৎসর ধরা হয়, তা হ'লে ভারতে আদি মানবকুলের আবির্ভাব হয়েছিল—সাড়ে কুড়ি লক্ষ হ'তে বাদ্ দিয়ে—সাড়ে দশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে। সাড়ে দশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের মানব অবশ্য ছিল অরণ্যচারী।

হিমালয় উঠে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সমস্ত স্থানে জীবনসংগ্রাম কঠোর ক'রে দেয়, সেই জন্যই সেখানে বানর-নর,' নর-বানর থেকে মানুষে পরিণত হ'তে অন্য স্থানের মত অত দেরী হয় নি, আর, সেই একই কারণে সে সব স্থানের অসভ্য ও বনচারী মানুষের সমাজবদ্ধ মানবরূপে পরিণত হ'তে বেশী সময় লাগে নি। এটা যেন মনে থাকে যে বানরের দলবদ্ধ হয়ে ও ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে থাকা স্বভাব। সমাজ-বদ্ধ হবার সময় যদি চারি লক্ষ বৎসর ধরা যায়, হাতে থাকে সাড়ে ছয় লক্ষ। আরো ৫০ হাজার বাদ্ দিয়ে ধরা যাক্, অর্থাৎ ৬ লক্ষ বৎসর। সমাজ-বদ্ধ অবস্থা হ'তে সভ্যতা ও সভ্যতার উৎকর্ষতায় ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব হ'তে সময় লেগে ছিল এক লক্ষ বৎসর—ইহা অন্যায় বা অসঙ্গত কল্পনা বলা যায় না। তা হলে বৈদিক যুগের আরম্ভ কাল, অন্ততঃ ৫ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের কথা। এসব খোলো মতের ভূতত্ত্বের দিক্ দিয়েই প্রমাণ হয়। এ রকম সিদ্ধান্তকে কেউ উদ্ভট বলতে পারেন, রামায়ণ বর্ণিত নর-বানরের কাহিনীকেও উদ্ভট কল্পনা বলতে পারেন, কিন্তু একবার খোলো বিচার প্রণালীর সংস্কার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজেরা ভাবলে বলতে পারা যায় যে, নর-বানরের কল্পনার জন্যও বাল্মীকিকে বাহাদুরি দিতে হবে, আর, কেন তিনিও ওরকম কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন, তা ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হবে।

একটু পরিষ্কার ক'রে বোঝবার চেষ্টা করা যাক্। যে রকম জীবন-সংগ্রামে ক্রমবিকাশের শক্তি দ্রুত হয়, যে রকম জীবন-সংগ্রামে চিন্তাশক্তির প্রয়োগ বিশেষ দরকার হয়ে পড়ে, গতানুগতিক পশুজীবনের মত আত্মরক্ষার ধারা অপেক্ষা যে রকম জীবন-সংগ্রামে মনোবৃত্তির অনুশীলন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়, ভূ-সংস্থানের ওলট্ পালটে ও আবহাওয়ার ঘোর পরিবর্ত্তনে যে রকম জীবন-সংগ্রাম প্রয়োজন ও উপযোগী, সেইরকম জীবন-সংগ্রাম তখন দেখা দিয়েছিল ঐসব বানর-নর, নর-বানর ও মানুষের মধ্যে। অন্যত্র মাত্র আত্মরক্ষা ক'রে গেলেই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হ'ত, তাতে উন্নত চিন্তাশক্তির দরকার ছিল না, সুতরাং সেটা বিকশিত হবারও সুযোগ পায় নি। মানবাকারে বিবর্ত্তিত হ'তে, ভারতে যদি সাড়ে দশ লক্ষ বৎসর বা ১০ লক্ষ বৎসর লেগে থাকে, অন্যত্র অন্ততঃ ১৫ লক্ষ বৎসর

লেগেছিল বলা হ'লে অত্যুক্তি হবে না। ঐ হিসাবে বলা যায় যে অন্যত্র সমাজ-বদ্ধ মানিবের অভ্যুদয় ১ লক্ষ বৎসরের পূর্ব্বে হয় নি, এখন পর্য্যন্ত সব জায়গায় সমাজ-বোধই হয় নি। অনেক অনেক বাদ্ সাদ্ দিয়ে ভারতের হিসাব ধরা হয়েছে। অসভ্য অবস্থা হ'তে সভ্য অবস্থায় আসতে ইউরোপের মাত্র কয়েক শতাব্দী লেগেছিল। নর-বানর অর্থাৎ নর ও বানরের মাঝে হারাণো সূত্র পাওয়া যায় কিনা বৈজ্ঞানিকেরা অনুসন্ধান করেছেন। সিবালীক পর্ব্বতের জীব ও জাভার জীবকে তাঁরা ঐ সূত্র মনে ক'রেছিলেন প্রথম। পাওয়া যাক্ আর নাই যাক্, অত্যুন্নত সভ্যতার বিকাশে ভারতে সে সূত্র বিলুপ্ত হয়েছে—নর-বানরের মধ্যে লাঙ্গুলটি অব্যবহার্য্য হ'য়ে খসে গেছে। রামচন্দ্রই সমস্ত নর-বানর-জাতিকে আপন ক'রে নিয়েছিলেন ভালবাসায়, অন্যত্র, পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করেছে, অথবা, প্রথম সমাজ-বদ্ধ মানব সে সব দেশে তাদের ঠেঙ্গিয়ে মেরেছে, যেমন সভ্যতার গর্ব্বে স্ফীত জাতি, আদিম জাতিদের নিপাত করেছে বা নিপাতের কারণ হয়েছে। ঠেঙ্গানির সংস্কারটি বেশ আছে এখনও, কিন্তু ভারতে, আর্য্যেরা কারোকে মেরে লোপ্ করতে অগ্রসর হন নি।

হিন্দুশাস্ত্রে অন্ততঃ দ্বাদশবার প্রলয়ের কথা আছে। পুরাণে সমুদ্রমন্থনের কথা আছে; সেই সময়ে চন্দ্রের উৎপত্তি হয় বলা হয়। ধোলো মতে, সে ত ৫ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের কথা। পুরাণ মতে তখনও দেবাসুর বর্ত্তমান—হিমালয়ের অভ্যুত্থান বহু পরের কথা। ঐ যে সমুদ্র-মন্থন ও চন্দ্রের উৎপত্তির কথা, সেটা কি পুরাতন স্মৃতি? স্মৃতির ধারাই বা বজায় ছিল কেমন ক'রে, যখন বলা হয় যে ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ প্রণালী বা উপকরণ কখন ছিল না? মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ বামনাদি অবতারের স্মৃতি থাকে কোথা হ'তে? পরবর্ত্তী সময়ে কি এই সব তত্ত্ব জানতে পারা যায় ও সেই বিজ্ঞান অন্য আকার ধারণ করে? আজ বৈজ্ঞানিক বলছেন যে, উত্তপ্ত পিণ্ড ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হ'য়ে আস্‌লে, জলময় ধরায় প্রথম মৎস্যের আবির্ভাব, তারপর কর্দ্দমময় ধরায় কূর্ম্মের আগমন, পরে কঠিন ধরার জঙ্গলে বরাহের গতিবিধি, পরে মানবের আবির্ভাব কালে, সে সময়কার আব্‌হাওয়ার জন্য খর্ব্বকায় মানবের আবির্ভাব। এই আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্য পুরাণাদিতে আসে কোথা হ'তে? পুরাণাদি বর্ণিত মৎস্য কূর্ম্মাদির কথা যদি তখন

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত না হ'য়ে থাকে (যা লোপ পেয়েছে), তা হ'লে স্বীকার করতেই হবে যে শাস্ত্রকারেরা ঐ বাস্তব ব্যাপারকে অন্য ভাবে উপলব্ধি ক'রেছিলেন, আর সেই জন্যই—অন্য দৃষ্টি কোণ হ'তে দেখে—মৎস্য কূর্ম্মাদিগকে 'অবতার' বলা হয়েছে, শাস্ত্রাদি গ্রন্থে সাধনার দিক্ দিয়ে যে রূপক অর্থ আছে, সেই দিক্ দিয়েই তাঁরা বুঝেছেন। এক্ষেত্রে যেটি রূপক, সেটিও বাস্তব—কল্পনার বা নিছক কবিত্বের রূপক নয়। এরকম ভাব প্রস্ফুটিত হ'তে, জাতির মধ্যে, কতকাল লেগেছিল? ঐ সব রূপক বর্ণনার সঙ্গে স্তব-স্তুতির মধ্যে যে সব দার্শনিক তত্ত্ব কথার ইঙ্গিত আছে ও স্থানে স্থানে স্পষ্ট প্রসঙ্গ আছে, তাতে ত মনে হয় না যে প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা গুলি বা গাঁজার আড্ডায় ব'সে ঐ সব কল্পনা করেছেন। মৎস্য বরাহাদির কল্পনা, ইন্দ্রের চতুর্দ্দন্তী ঐরাবত হাতীর কল্পনা—ম্যামথ্ যুগের পূর্ব্বে যে হাতী চতুর্দ্দন্তী ছিল ব'লে জানা গেছে, সেই হাতীর কল্পনা—রামায়ণে নর-বানরের কথা প্রভৃতি সবই কি খেয়াল ও গল্প? ধোলো বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যের সঙ্গে এত কল্পনার মিল হয় কেমন করে?

পূর্ব্ব কথায় ফিরে আসা যাক্। ধোলো মতের দিক্ দিয়েই, অতি সাবধানে, অনেক্ বাদ্‌সাদ্ দিয়ে আলোচনা হয়েছে। সাড়ে দশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের মানুষ অরণ্যবাসী ছিল, মানে, ঐ বনজীবনেও তারা দলবদ্ধ ছিল ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মানুষ অপেক্ষা উন্নত মানুষ ছিল, কিন্তু তখন হয়ত তাদের মধ্যে সমাজ-শক্তি দেখা দেয় নি। পণ্ডিতেরা বলেন, অলিগসিন যুগে বানরেরা ছড়িয়ে যায়। হিমালয়ের উত্থান হয় মাইওসিন যুগে। মাইওসিন্ স্তরের গঠন হ'তে লাগে ৬০ লক্ষ বৎসর। হনুমান, জাম্বুবানাদি বিভিন্ন প্রকার বানর জাতি—সিম্পাঞ্জি, গরিলা প্রভৃতি বানরকুল—চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ হয় দেড় কোটি বৎসর পূর্ব্বে। এই দেড় কোটি হ'তে ৬০ লক্ষ বাদ্ দিলে হয় ৯০ লক্ষ, অর্থাৎ নব্বই লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে শেষ হয় মাইওসিন যুগ। মাইওসিন যুগের পর প্লিইওসিন যুগ। সে স্তরের গঠন হ'তে লাগে, সাড়ে বিশলাখ্ বৎসর, তা হ'লে পাওয়া গেল ঐ যুগের শেষকাল সাড়ে উনসত্তর লক্ষ বৎসর। তারপর প্লীয়স্‌টিন্ স্তরের গঠনকাল বিশলক্ষ বৎসর; পাওয়া গেল সাড়ে উনপঞ্চাশ লাখ বৎসর। পণ্ডিতেরা যুগ ও উপযুগ বিভাগের পর্য্যায় রকম রকম করেছেন, তাতে, কোন ক্ষতি নেই,

কেন না, তাঁবা গণনা বিষয়ে প্রায়ই একমত। কোন কোন পণ্ডিতদেব মতে, মাইওসিন ও প্লিইসোন যুগে মানুষ ছিল, তবে প্লীয়সটিন্ ও পববর্ত্তী যুগে যে মানব ছিল সে বিষয়ে তাঁবা সন্দেহ কবেন না। প্লীয়সটিন (বা প্লীয়সটিসিন) ও পববর্ত্তী যুগেব জন্য অর্থাৎ 'Sub-recent' ও 'Recent' যুগ—যাব বাঙ্গালা নাম দিয়েছেন ঐতিহাসিক বাখালদাস বাবু 'উপাধুনিক' ও 'আধুনিক যুগ'—ঐ দুই যুগকাল যদি হয় ২৯ লাখ্ বৎসব, তা হলেও, পাওযা যায় সাড়ে ২০ লাখ্ বৎসব; এই সাড়ে বিশ হ'তে আবো দশ লক্ষ বৎসব বাদ্ দিলে থাকে সাড়ে দশলক্ষ বৎসব। ভাবতে উন্নত মানব দল গঠিত হবাব সময় যা ধবা হয়েছে, তাব মধ্যে উদ্ভট্ কোথায? ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেবা বলেন, যে খৃঃ পূঃ ১৫ লাখ্ বৎসব কালে ইউবোপে ছিল 'প্রস্তব' বা বর্ব্বব যুগ। ভাবতে তখন বর্ব্বব যুগেব অবসান হয়েছে। হিমালযেব উত্থান কাল, সাড়ে বিশলাখ বা যাই ধবা হোক্, ঐ সিদ্ধান্তেব ব্যতিক্রম হয় না। বাখাল দাস বাবু, তাঁব 'বাঙ্গালাব ইতিহাসে', জে, কগিন্ ব্রাউন সাহেবেব উক্তি তুলেছেন। ব্রাউন সাহেব বলছেন, বাঙ্গালা দেশে যে প্রস্তবাযুধ পাওযা গেছে, তাব কাল ১৫ লক্ষ বৎসব হ'তেও পাবে।

[Prehistoric times ও উক্তগ্রন্থে সাহেব ধৃত উক্তি দ্রঃ]।

ধোলো মনীষীবা তাম্রযুগ, লৌহযুগ ইত্যাদিব কথা ব'লে ক্রমপবিণতি দেখাবাব চেষ্টা কবেছেন। বহুউন্নতি হলেও, ভাবতে নীচেকাব স্তব ফেলে দেয় না। গরুব গাড়ীব চাকাব দৃষ্টান্তেই তা বোঝা যায়, গোটা কাঠ কুঁদে যে চাকা হ'ত তা আজও বযেছে। অন্যত্র উন্নতিব সঙ্গে নীচেকাব স্তব ত্যাগ কবে। যেখানে পাথব প'ড়ে পাহাড় ধ্ব'সে নিত্যই আগুন ঠিকবে ওঠে, যেখানে জঙ্গলে আগুন আপনি জ্'লে ওঠে বিশেষ বিশেষ কাঠেব ঘর্ষণে, যে দেশেব তিন দিকে সমুদ্র ও যেখানে মানুষ বাড়বানল দেখতে পায, যেখানে (উষ্ণ প্রস্রবণে) জলেও আগুন মানুষ দেখতে পায়, সেখানে আগুণেব ব্যবহাব শিখতে দেবী হয না। ভাবতীয়েব দৈব উৎপত্তি মাইওসিন যুগেব বহু বহু পূর্ব্বে।

আর্য্যমতে, সত্যযুগ আবম্ভ হয় প্রায় ৪৯ লক্ষ বৎসব পূর্ব্বে—কলিব মোটে ৫০৩৬ বর্ষ গত হয়েছে স্বীকাব কবলেও। আমবা পূর্ব্বে দেখেছি যে Radium ও Radio-activity অর্থাৎ বেডিয়াম ও তাব গতি—

ক্ষিপ্রকারিতা বা কার্য্যকারিতা—পূর্ব্ব গণনাকে বহু বহু বৎসর ঠেলে দিয়েছে এবং Keith প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে ৬০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেও প্রথম মানব-চিহ্ন পাওয়া যায়। সেই মানব চিহ্ন মানে, তাঁদের মতে, 'Common Stock' বা "anthropoid apes'—পূর্ব্বে বলা হয়েছে। ৪৯ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের মানব অতি উন্নত জীব। মেণ্ডেল সাহেবের Law of variation'এর কথা ছেড়ে দিলেও, আর্য্যমত ও খোলা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল—এই দু'যে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। অন্যান্য স্থানে মানব চিহ্ন বিভিন্ন কালে পাওয়া যাচ্ছে, তাতে বিস্ময়ের কারণ নেই। সম্প্রতি California Universityর Theodore D. Mc. brown সাহেব, ভূমধ্যসাগরের তটভূমিতে যে 'ape-like men' নর-বানরের কঙ্কাল সব পেয়েছেন, যেগুলি প্রায় ৮০ হাজার বৎসর পূর্ব্বের—সে সব কঙ্কালই তার প্রমাণ। সেইরকম, সিবালিক পর্ব্বতস্থিত নর-বানর কঙ্কাল হ'তে জাভার নর-বানর কঙ্কাল তার অন্য আরো প্রাচীন যুগের প্রমাণ।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, বারবার আবর্ত্তন করে। সে দিক্ দিয়ে বিচার করবার এখানে দরকার নেই। ভূতত্ত্ব শেষ সীমায় আসেনি, খনন কার্য্য ভারতে বা চীনদেশে অতি সামান্যই হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রদেশে কি রকম প্রথা, কি রকম আইন চলত, সেইগুলি মাত্র মন্বাদি স্মৃতি শাস্ত্রে দেওয়া আছে, একরকম বিধি সব যায়গায় ছিল না। এই একটি জিনিষ বোঝবার আছে অর্থাৎ আদর্শ প্রচার হ'ত সামাজিক রীতি নীতিকে আঘাত দেবার জন্য নয়। মানুষ যাতে আদর্শ পেয়ে তদনুরূপ জীবন গঠন করতে পারে, সমাজ নিজের অদল-বদল নিজে করতে পারে তাই করা হত। পুরাণাদিতে আষাড়ে গল্প আছে বা ঢুকেছে ব'লেই যে সেগুলিকে একেবারে ফেলে দিতে হবে তা নয়। তার উদ্ধার সাধনের জন্য ভারতের পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রচেষ্টা চাই। খোলো সংস্কার ছেঁটে ফেলতে হবে অথবা তাকেও "ঈশবাস্যং" ক'রে নিতে হবে।

অনুলোম বিলোম, আরোহণ অবতরণ—যে দিক্ দিয়ে প্রকৃতির রহস্য বুঝতে চেষ্টা করা যায়, দেখা যায় সব স্থানেই প্রকৃতির আপূরণ চলেছে। ক্রমোন্নতিই ঠিক্, ক্রমাবনতি ভুল—এ কথা বলতে পারা যায় না, প্রমাণ করতে পারা যায় না যে ক্রমবিকাশই ঠিক,

ক্রমসংকোচ ভুল। মাটি পাথর হয়ে যায়, বলতে পারা যায় না যে পাথর মাটি হ'তে পারে না, বরফ জল হয়, জল বাষ্পাকার ধারণ করে, বলা যায় না যে বাষ্প জল হ'তে পারে না—এমন কি এক ধাপ ডিঙিয়ে একেবারে বরফ হ'য়ে যেতে পারে না, Electron, Atom, Molecule বিপরীতক্রমে Molecule, Atom, Electron হ'তে যে পারে না তা বলা যায় না, জৈব বীজ বিশ্বে বর্ত্তমান, তাই কালে হয় জীবের আবির্ভাব, বলতে পারা যায় না যে জীবকুল ধ্বংস হ'য়ে আবার জৈব বীজরূপে থাকতে পারে না। সৃষ্টি, ধ্বংস, প্রলয়, সৃষ্টি, ক্রমাবরোহণ, ক্রমারোহণ, ক্রমবিকাশ, ক্রমসংকোচ—প্রকৃতির আপূরণ, প্রকৃতি আপন নিয়মেই চলে, সমভাবে সর্ব্বক্ষেত্রে।

শক্তির অবতরণে মানবকুল এসেছে ভারতে—দৈবোৎপত্তি, অন্যত্র হয়ত অণুকীট হ'তে ক্রমবিকাশ প্রণালীতে মানুষ হয়েছে—হয় নি যে, হ'তেই পারে না যে এটা বলতে সাহস কার? প্রকৃতির আপূরণ—একই স্তন্যপায়ী জীব এদেশে একরকম, অন্য দেশে অন্য রকম—পার্থক্য এত যে আকারগত সাদৃশ্যও নেই, অথচ এক শ্রেণীর, এদেশে মানুষের প্রকৃতি ও দেশের মত নয় এক শ্রেণীর অন্তর্গত সত্ত্বেও, ইহা কি স্বতন্ত্র সংস্কারজাত, ভিন্ন প্রকৃতিজাত হ'তেই পারে না, এটা কে বলতে পারে জোর করে? লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে গাছপালার, জীবজন্তুর যে আকার ছিল এখন তার চেয়ে অনেক ছোট—একভাবে পৃথিবী থাকে না। ধোলোমতে পেলিও-জোয়িক যুগে নানাপ্রকার শামুকাদি ও চিংড়ীমাছ জাতীয় জীবের উদয় হয়, হয়ত, তার আগে আর্কায়িক যুগের শেষভাগে নানাপ্রকার উদ্ভিদ ও ঐ রকম জীবসমূহ কিছু দেখা দেয়, হেলিওসিন যুগে দেখা দেয় চতুষ্পদ জীবেরা ও বানরাকার জীবেরা—একই অবস্থার মধ্যে, একই শ্রেণীর অন্তর্গত নানাপ্রকারের জীব হয় কেমন ক'রে? নানাপ্রকার পাখীর আবির্ভাব হয় কোথা হ'তে? গোড়া হ'তেই নানাত্ব, ভিন্ন দেশে ভিন্ন রকম হয় কেমন ক'রে? অতএব, বলতে পারা যায় না—ভারতে এক রকম সংস্কারের মানুষ দেখা দেয়, আর, অন্যত্র অন্য সংস্কারজাত নরের আবির্ভাব হয়—এটা অসম্ভব, এটা উদ্ভট কল্পনা, এটা হ'তেই পারে না। মাইওসিন যুগে উৎপত্তি হয় সিম্পাজি, গরিলাশ্রেণীর বানর ও পরবর্ত্তী প্লিইওসিন যুগে দেখা দেয়

একরকম জীব যাদের আকার অনেকটা মানুষের মত; এখন একদল পণ্ডিতেরা বলছেন, নর ও বানর, উভয়েই এসেছে ধেড়ে ইঁদুর হ'তে। ধেড়ে ইঁদুর হ'তে ক্রমান্বয়ে Electron পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। Laws of variation ও তাতে sudden change যদি স্বীকার করা যায়, দৈবোৎপত্তিও যেমন সত্য, ক্রমবিকাশও তেমনি সত্য—সবই প্রকৃতির আপূরণ। যে শিল্প-সহায়ে অধ্যাত্মশিল্পী সর্ব্বত্র চৈতন্য সত্তার স্ফুরণ দেখেন, "একং সদ্‌বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" উপলব্ধি করেন, সেই একই শিল্পাবলম্বনে ব্রহ্মচৈতন্য মানুষ হ'য়ে আসেন। পুরাণ কথায়, ব্রহ্মাই সেই আদি মানব। ব্রহ্মার হ'ল মানসপুত্র—বংশবৃদ্ধির সাধারণ পরবর্ত্তী নিয়ম তখন দরকার হয় নি। পরবর্ত্তী মানবকুলের ক্রমি অবতরণেই অন্যান্য জীবের উৎপত্তি। যে শক্তির স্ফুরণে ক্রম-আরোহণ সম্ভব হয়, সেই শক্তির সংকোচেই ক্রম-অবতরণ হয়। ক্রমারোহণ ও ক্রমাবরোহণ—দুইই বাস্তব।

যাঁরা শাস্ত্রের অতি প্রাচীনত্বে বিশ্বাসী তাঁদের দিক্ হ'তে যা বলবার তা সংক্ষেপে বলা হল। ভারতে জন্ম মানবকুলের; দেবভাবপ্রধান জাতিই আর্য্য। কবে আর্য্যের আবির্ভাব হ'য়েছিল—সময় জেনে ফল কি? সকল দেশের সাহিত্য, ইতিহাসাদি অনুসন্ধান ক'রলে দেখা যাবে যে ভারতেই উদয় প্রথম সভ্যতা; যখন অন্যান্য স্থান মনুষ্য-আবাসশূন্য, তখন ভারত অধ্যাত্মচর্চ্চায় রত, সত্যসংকল্প ও দেবভাবপূর্ণ। এইটে জানলেই ত যথেষ্ট। পাঁচলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ঋষি-সংঘ ছিল—তার পূর্ব্বে হেথায় হোথায় ঋষি ছিলেন, এক লাখ্ দেড় লাখ্ বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র ছিলেন—এ সব নিয়ে কি হবে? জাতীয় চরিত্র নিহিত রয়েছে মহান্ আদর্শে, নেই তা সন্ তারিখে।

বুদ্ধদেবের পূর্ব্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল নেপালের ভিতরে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম দুদিক দিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করে। তিব্বতরাজ, নেপাল রাজবংশীয়ের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। সে সময়ে তিব্বতরাজ ঐ দেশের প্রাচীন 'বুন'বাদে বিশ্বাসী ছিলেন ('Bonfaith of Thibet')। 'বুনবাদে' পুনর্জ্জন্মবাদের ন্যায় একটি মত ছিল। ঐ দুই কন্যার প্রভাবে ওদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হয়। তারপর, নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ্মসম্ভব—বর্ত্তমান আফগানিস্তান (Swat) নিবাসী উদয়ন,—তিব্বতরাজ থি-স্রং দেতসানের (Thi-Srong-Detsanএর) সাহায্যে ঐ দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম

দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয় (খৃষ্টাব্দ ৭৪০—৭৮৬)। ঐ বিবাহব্যাপার সংঘটিত হয়, ইহার ১০০ বৎসর পূর্ব্বে। 'বুন'বাদী তিব্বতরাজ, চীন রাজবংশীয়ের একটি কন্যাকেও বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলেও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। তিব্বতের 'লামা' মতটি, বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত। যে তন্ত্রবাদ ভারত হ'তে বহুপূর্ব্বে গিয়ে ঐ সব দেশের আচারাদির আকার ধারণ করে ও ঐ সব দেশের প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসে অনুরঞ্জিত হয় তাকে বলা হয় 'বৌদ্ধতন্ত্র'বাদ। ঐ 'লামা' ধর্ম্মের রহস্য বিদ্যায় সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত আছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হল।

[Vide "The Tibetan Book of the Dead"—by W Y Evans Wentz, M. A, D Litt, B Sc Jesus College Oxford , Author of "The Fairy-Faith in Celtic countries" ? ঐ গ্রন্থের, বারবার অতঃপর উল্লেখ না ক'রে, আমরা মাত্র "The Book of the Dead" অথবা 'ইভান্স সাহেব' বলব।]

পৃথ্বীর কথা—সৃষ্টির কথা। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে একমাত্র 'তেজই' বিবর্ত্তিত হল। কর্ম্মজনিত পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী ঐ তেজোময় দীপ্তি ('fire-mist') ঘূর্ণ্যমান হ'য়ে জ্বালাময় অণ্ডাকারে পরিণত হ'ল। এই অবিকৃত আদিভূত শক্তির গর্ভে অপরাপর ভূত ভ্রূণ অবস্থায় ছিল। ঐ তেজোমধ্যে অগ্নিদেহী জীবের প্রথম প্রকাশ হয়। বৌদ্ধতন্ত্রে ইহারাই Salamanders, সালামাণ্ডার্স নামে অভিহিত। দ্বিতীয় অবস্থায়, তেজ হ'তে বায়ু পৃথক হ'য়ে ঐ অণ্ডকে আবৃত করলে। .সেই সময়ে ঐ জীব, অগ্নি ও বায়ুর সমবায়ে গঠিত হল। তৃতীয় অবস্থায়, বায়ুদ্বারা স্নাত ও চালিত হ'য়ে অগ্নি শান্তভাব ধারণ করায়, ধূম্রাকারে ('vapour gas'এ) তৃতীয় ভূত 'অপে'র উদ্ভব হ'ল। চতুর্থ অবস্থায়—পৃথ্বীর প্রায় বর্ত্তমান অবস্থায়—বায়ু এবং জল (অপ), অগ্নিকে সাম্যাবস্থায় রাখে। এই অগ্নি হ'তেই পঞ্চম ভূত 'ক্ষিতি'র প্রকাশ হল।

উক্ত মতও দৈবোৎপত্তি সমর্থন করেন। ইভান্স সাহেবের বিশ্বাস যে, ঐ তেজোত্থ দীপ্তিকেই ('fire-mist') হিন্দুরা 'দুগ্ধ-সমুদ্র' বলেন। সমুদ্র-মন্থন ব্যাপারটি ঐ দুগ্ধ-সমুদ্রেরই মন্থন, যা হ'তে মাখনের মত এই কঠিন ধরার জন্ম।

["Esoterically, the same teachings are said to be conveyed by the old Hindu myth of the churning of the Sea-of Milk, which

was the Fire-mist, whence came, like butter, the solid earth Upon the earth, so formed, the Gods are credited with having fed; or in other words, they hankering after existence in gross physical bodies, became incarnated on this Planet and so became the Divine Progenitors of the human race"—The Book of the Dead.]

বৌদ্ধতন্ত্র মতে, পঞ্চম ভূত 'আকাশ' (সাহেবেব অনুবাদ Ether) হচ্ছে "the green light-path of the Wisdom of perfect Actions," 'অঘ শূন্য সবুজ জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান-পথ'। 'বৈবোচন'ই আকাশাভিমানী দেবতা, যিনি সমস্ত দৃষ্টবস্তুব মধ্যে অবস্থিত থেকে আকাব দেন। পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ হ'তে পঞ্চভূত উদ্ভূত হয়, (১) জড়সমষ্টি=বৈবোচন (আকাশ), (২) মনন বা ইচ্ছাসমষ্টি=অমোঘ সিদ্ধি (বায়ু), (৩) তেজসমষ্টি বা সংবেদন= অমিতাভ (অগ্নি); (৪) চিতি বা চেতনসমষ্টি=বজ্রসত্ত্ব, যাঁব বহিবঙ্গ ভাবেব নাম 'অক্ষোভ' (জল); (৫) স্পর্শসমষ্টি=বত্নসম্ভব (ক্ষিতি)। 'আদিবুদ্ধ' সম্প্রদায়মতে আদিবুদ্ধই পঞ্চভূতেব কাবণ। ঐ পঞ্চভূত হ'তে ষষ্ঠ ভূতেব উৎপত্তি=মন। উপাসনায বা অনুষ্ঠানে, পঞ্চবুদ্ধকে আদিবুদ্ধেব সঙ্গে অভিন্ন ধবা হয়। (ইভান্স সাহেব)।

পুবাণাদি শাস্ত্রে এই বকম সমুদ্র-মন্থনেব মত রূপক বর্ণনাব আতিশয্য দেখতে পাওয়া যায। রূপক ব'লে উড়িয়ে না দিয়ে, ঐ সবেব মধ্যে সত্য অনুসন্ধান কবা উচিত। সমুদ্র-মন্থনে অনেক কিছুর মধ্যে 'শ্রী' দেবীব আবির্ভাব-কথা আছে। শ্রীদেবী বিষ্ণুব কণ্ঠ-সংলগ্ন হন। (বিষ্ণুপুরাণ দ্রঃ)।

[শ্রীদেবী=দেবী 'কমলা', দশমহাবিদ্যাব অন্তর্গত—লক্ষ্মী নন।]

এই শ্রীদেবীব নাম বেদেও পাওয়া যায়। ইহাব উপাসনা একসময়ে ভাবতে সর্ব্বসম্প্রদায়েব মধ্যে বিস্তৃতি লাভ কবে, এমন কি পববর্ত্তী বৌদ্ধ ও জৈনেরা এই দেবীকে গ্রহণ কবেন। ইহাব পূজা নাগ, যক্ষ আদি জাতিবাও গ্রহণ কবেন। সুখেব বিষয় কয়েকজন ভাবতেব মনীষী সমুদ্রমন্থন ব্যাপাবটিকে একটি প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক ব্যাপাব ব'লে মনে কবেন ও তাঁবা ইহাব গবেষণায় বত আছেন। আশা কবা যায় ঐ গবেষণাব ফলে, সাধনাবও একটা দিক্ বোঝা যাবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

ঋষিহৃদয়ে মন্ত্রের আবির্ভাব হয়। এইরূপ, বহু মন্ত্র, বহু ঋষি। সব মন্ত্র একই সময়ে সকলের মনে স্ফূর্ত্তি পায় নি। পূর্ব্বে বলেছি, মন্ত্রের আবির্ভাব কাল ও সংকলনকাল কখন এক হয় না। কোন বিশেষ ভাব সমগ্র জাতির মধ্যে ছড়াবার দরকার না হ'লে, ঐগুলিকে একত্রে সাজাবার বড় দরকার হয় না। এরকম ছড়াতে কত সময় দরকার, বিশেষ মনস্তত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব ?

অনেকে বেদমন্ত্র 'রচনার' কাল নিরূপণ করবার চেষ্টা করেছেন। মহামতি তিলকের নাম সর্ব্বজনবিদিত, তিনিও ঐ চেষ্টা করেছেন জ্যোতিবিজ্ঞান-সহায়ে। সূর্য্যের বার্ষিক গতি লক্ষ্য ক'রে আকাশমার্গকে ১২ ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক বিভাগের নাম 'রাশি', ১২টি রাশি মিলে হয় 'রাশিচক্র'। এই রাশিচক্রকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করা হয়, যার নাম 'নক্ষত্র'। অতএব নক্ষত্র ২৭টি। গণনা হয় সূর্য্য ও চন্দ্র ধ'রে। সময় সময় অনেক কারণে গতির কম বেশী হয়, সুতরাং দ্রুতগতি বা মন্দগতি বুঝে গণনা করতে হয়। গ্রহাদির গতি একরকম নয়। এই গতিবিধি বোঝাবার জন্যই রাশিচক্র। যেটি যেখান দিয়ে ঘোরে, সেই স্থানটিই তার কক্ষ। সূর্য্যকে নিজ কক্ষ পথে ঘুরিতে যত সময় লাগে সেইটিই সূর্য্যের রাশি চক্রের ঘূর্ণন কাল অর্থাৎ সৌরমণ্ডলকে ৩৬০ অংশে ভাগ ক'রে, ৩০ দিয়ে ভাগ দিলেই হয় ১২টি রাশি। এই হিসাবে চন্দ্র ২৭ দিন, ২৯ দণ্ড, ১৭ পল, ৪০ বিপল, রাশিচক্রে ঘোরে। এই রকমে অন্য সব গ্রহ ও সৌরজগৎ-বিবর্ত্তন-কালই সেই সবের রাশিচক্র বিবর্ত্তন কাল ধরা হয়। রাশিচক্র যেমন ১২টি রাশিতে বিভক্ত তেমনি ২৭ ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ সেই ২৭ ভাগ, ২৭টি নক্ষত্র ধরা হয়। রাশি ও নক্ষত্রের নাম প্রত্যেক পাঁজিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন নক্ষত্রের বিভিন্ন আকার আছে, যেমন ধনিষ্ঠা ৫টি নক্ষত্র ঢাক্কাকার ইত্যাদি। পৃথিবীর কক্ষ সমতল ও আকাশ মণ্ডলের সংযোগ রেখার নাম 'ক্রান্তিবৃত্ত' অর্থাৎ সূর্য্যের আবর্ত্তন যে পথে নক্ষত্র মণ্ডলের মধ্য দিয়ে হয়। যে স্থান হ'তে মেরুদ্বয় সমান দূরে অর্থাৎ যেটা বৃত্তাকারে পৃথিবীকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে, তার নাম 'নিরক্ষ দেশ'। পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত সমতলকে যদি

পৃথিবীব বাইবে আকাশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভেবে নেওয়া যায়, তা হ'লে ঐ সমতল আকাশ গোলকে যে গোলাকাব বেখা ছেদন কবে তার নাম "বিষুবদ্বৃত্ত'। 'ক্রান্তিপাত' বা 'বিষুব'=বিষবদ্বৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্ত যে দুই বিন্দুতে পবস্পব পরস্পবকে ছেদন করেছে। তখন দিন ও রাত্রি সমান হয়। বিষুবদ্বৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্ত পবস্পবেব সঙ্গে বক্রভাবে আছে। পৃথিবীব নিবক্ষদেশ অপেক্ষাকৃত স্ফীত।

ক্রান্তিপাত বিন্দুব গতি দেখে, পণ্ডিতেবা বিভিন্ন মতে এসেছেন। ক্রান্তিপাত বিন্দু (অয়ন চলন, Procession of Equinox) ক্রমেই পূর্ব্বদিকে স'বে যাচ্ছে। বিষুবন (Vernal Equinox) বৎসবে ৫০ বিকলা স'বে যায়; ৩৬০ অংশ ঘুরে পূর্ব্বস্থানে ফিরে আসতে সময় লাগে ২৫৮৬৮ বৎসব। তিলক, তাঁর Orion গ্রন্থে, বাসন্তিক ক্রান্তিপাত (যে নক্ষত্রে বিষুবন থাকে) ধ'বে গণনা কবেছেন। তিনি কয়েকটি ঋঙ্‌মন্ত্র দেখে অনুমান কবেন যে ঐ মন্ত্রগুলি পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত সময়ে 'বচিত' হয়। সে সময়টি এখন হ'তে ৭৬২৩।২৪ বৎসব পূর্ব্বে।

[তিলক তাঁ'র Arctic Home গ্রন্থে বলেছেন..."The Vernal Equinox was in Orion (মৃগশিবা, কালপুরুষ) when some of the Ṛgvedic traditions were formed", বিষুবন ছিল মৃগশিবায়, সেই সময়ে কতকগুলি ঋঙমন্ত্র প্রচলিত হয়। ধ্রুবনক্ষত্র ও (Polar Star) সেই স্থানে এখন নেই, স'রে গেছে, "Thus the polar star 7000 years ago was different from what it is now, but the terristerial pole has always remained the same" (ঐ গ্রন্থ)]।

ঐ রূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নক্ষত্রেব স্থিতি দেখে তিনি খৃঃ পূঃ ৪৫০০ ও খৃঃ পূঃ ৬০০০ বৎসবেব কথা বলেছেন। গণনা হয়, বিষুবন কোন্ নক্ষত্রে থাকে এই নিয়ে। এক একটি নক্ষত্র ঘুবে আসে কত দিন পবে? মেষ হ'তে বৃষে আসতে লাগে ২০০০ বৎসব, এই বকম সব।

প্রাচীনপন্থীদেব মতে এবকম গণনায় কতকগুলি দোষ বর্ত্তমান। পৃথিবীতে অনেকবাব শীত বা গ্রীষ্মযুগ দেখা দিয়েছে, পূর্ব্বে বলা হয়েছে। এখন চলেছে গ্রীষ্মযুগ। ধোলো প্রণালীতে যে সব গণনা হয়, তাতে শেষবাবেব হিমযুগ হ'তে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ধ'বে গণনা হয়। কেন ঐ হিমযুগেব পূর্ব্বেব বা আবো পূর্ব্বেব হিমযুগ হ'তে ধবা হয় না গণনাব সময়ে?

কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ আছে কি? ধোলো মনীষীরাই বলছেন যে প্রায় লক্ষ স্তরে ধরার গঠন হয়েছে, প্রতিস্তর গ'ড়ে উঠতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লেগেছে। প্লিইস্‌টোসিন বা হিমযুগে স্থানে স্থানে তুষারাবৃত ধরা, তিলকের মতে ঐ তুরন্ত হিমযুগে আর্য্যেরা উত্তর মেরু হ'তে পালিয়ে আসেন। ইহাতে প্রমাণ হয় না যে আর্য্যেরা প্রথম উত্তর মেরুর কাছেই বাস করতেন, বরং ইহাই সম্ভব যে আর্য্যদের একটি শাখা ভারত হ'তে উত্তর মেরুতে যান, হয়ত বৈদিক সভ্যতা 'প্রচার' করতে, যেমন পরবর্ত্তী ধারাবাহিক আর্য্যের ইতিহাস প্রমাণ করে, তাঁরা ধর্ম্মভাব ও আর্য্য-শিক্ষা বিস্তার করবার জন্য ভারতের বাইরে গিয়েছেন, লুটপাট বা দেশজয় করতে কখন যান নি। যদি আরো পূর্ব্বেকার হিমযুগ ধ'রে গণনা করতেন, তা হলে গণনার কাল আরো দশ বিশ পঁচিশগুণ বেড়ে যেত।

বরাহ-মিহিরের মত জ্যোতির্বিদও তাঁর সূর্য্য সিদ্ধান্তে ক্রান্তিপাত গণনায় ভুল করেন। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের গণনায় শুদ্ধি করেন আর্য্যভট্ট। কৃত্তিকা নক্ষত্রে অগ্ন্যাধান করতে হত। পণ্ডিত দীক্ষিত (তিলকের গ্রন্থে S. B. Dikshit) মহাশয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সম্বন্ধে (যাতে কৃত্তিকার কথা আছে) যা বলছেন তাতে ঐ কথা বলা যায়। অগ্ন্যাধান ব্যাপার কি পূর্ব্বে ছিল না? অগ্ন্যাধান বা সম্বৎসর আগুণ জেলে রেখে তাতেই যজ্ঞীয় সমস্ত কাজ করবার প্রথাটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের কত পূর্ব্ব হ'তে ছিল? অগ্ন্যাধানের ভাবটি কি জাতির মধ্যে হঠাৎ উদয় হয়েছিল? জ্যোতির্বিজ্ঞান আজও একেবারে নির্ভুল গণনার দ্বারা কাল নিরূপণের স্পর্দ্ধা করতে পারেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ লেক্সেল একটি ধুমকেতুকে দীর্ঘবৃত্ত পথে পরিভ্রমণশীল দেখতে পান। তাঁর আশঙ্কা হয়, পাছে ধুমকেতুর আকর্ষণে পৃথিবী বিচলিত হয়, কিন্তু তা হয় নি—ধুমকেতুর বপুটি ওজনে হাল্কা থাকায়। জ্যোতির্বিদেরা বলেন যে যদি সেটি আকারানুরূপ আরো একটু ভারি হত, তা হলে, তারপর হ'তে, পৃথিবীর বৎসর গণনায় আরো তিনঘণ্টা বেড়ে যেত। ঐ ধরণের কোন ঘটনা কখন হয়েছিল কি না, কেহ গ'ণে দেখেছেন কি? পৃথিবীর উত্তরাংশে স্থলভাগ বেশী, সুতরাং ভারি ও পৃথিবী একটু হেলে রয়েছে, আর সেইজন্যই ধরা হেলে দুলে লাঠিমের মত ঘুরছে, তার ফলে, পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত, বিষুবদ্বৃত্ত, বিষুবদ্বিন্দু

সব পৌছিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রদের অবস্থিতিতেও গোলযোগ দেখা দিচ্ছে।

বৈদিক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে ছন্দের একাদশ অক্ষরই সূর্য্যের আপন গতি। জ্যোতির্বিজ্ঞান দেখাচ্ছেন যে আমাদের ২৫ দিনে হয় সূর্য্যের একদিন, এই হিসাবে সূর্য্য, আমাদের ১১ বৎসরে নিজের অক্ষে ঘুরে আসেন; নক্ষত্র ধ'রে যজ্ঞকাল বাছাই করা হত কি অকারণে, একটা উদ্ভট্ সংস্কারে? শাস্ত্রে দ্বাদশ আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। আজ জ্যোতির্বিজ্ঞান বলছেন যে আমাদের এই সৌরমণ্ডল অর্থাৎ গ্রহ-উপগ্রহাদি সমন্বিত সৌরজগতটি ঘুরছে আর একটি বৃহত্তর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, আর, সেই সূর্য্যটি কৃত্তিকানক্ষত্র পুঞ্জের মধ্যে একটি নক্ষত্র!

[বিষ্ণুপুরাণ দ্বাদশ মাসে সূর্য্যের দ্বাদশ অবস্থা কল্পনা ক'রে সূর্য্যেরই দ্বাদশ নাম দিয়েছেন। বেদে প্রাতঃ মধ্যাহ্নাদির যে নাম এখানেও সেই নাম। বলা বাহুল্য, এটা সূর্য্যের দ্বাদশ অবস্থা, দ্বাদশটি পৃথক পৃথক আদিত্য নয়। প্রত্যেক অবস্থাকে পৃথক পৃথক বর্ণনা ক'রে প্রত্যেকটিকে সূর্য্য বলেছেন। (নক্ষত্র = ন + 'ক্ষত্র')]।

কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে যে ভাবে বিশ্ব চলত, এখন সে ভাবে চলে কি? ঐ যে ছায়া পথ, ঐ যে সমুদ্রে ভাসমান মৎস্যাকৃতি নীহারিকাগুলী, তারা তখন পৃথিবীর যত কাছে ছিল এখন তা আছে কি? তারকামণ্ডলীর মধ্যে কত ব্যবধান হয়েছে? নীহারিকা শ্রেণী ত প্রতি সেকেণ্ডেই আমাদের দৃষ্টিপথ হ'তে ৫।৭ হাজার মাইল স'রে যাচ্ছে? কৃত্তিকানক্ষত্রের গতির বেগ কত পরিমাণ? এই ত সে দিন খোলো জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতেরা হঠাৎ বুধের গতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে দেখে তার কারণ নির্ণয় করতে পারছেন না। সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি-বেগের একটা পরস্পরের উপর প্রভাব আছে, পৃথিবীর উপরও আছে।

জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে—Plato's year—প্লেটোর বৎসর। নক্ষত্রগুলি (Stars) ও নক্ষত্র মণ্ডলী (Constellations) নিজ নিজ পথে ঘুরলেও, আবার; বিষুব সম্বন্ধে, ২৫ হাজার বৎসর পরে পূর্ব্বস্থানে ফিরে আসে; ইহাই Plato's year; 'প্লেটোর' কাল'। বৃহৎ সংহিতায় সপ্তর্ষিমণ্ডলের স্থান ও কোন্ তারকাটি কোথায় আছে, তা নির্দ্দেশ করা হয়েছে; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত সপ্তর্ষিমণ্ডলের সঙ্গে প্রভেদ

দেখা যায়, অর্থাৎ পূর্ব্বস্থান হ'তে স'রে গিয়ে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। তিলক মহোদয়ের একটা উদাহরণ উদ্ধৃত করেছি পূর্ব্বে। পণ্ডিতদের মতে, সপ্তর্ষিমণ্ডল বেষ্টিত ধ্রুব নক্ষত্র-কেন্দ্র এক সময়ে নেপ্চুনের কাছে ছিল, এখন তা নেই। সপ্তর্ষিমণ্ডলকে বলা হয় Ursa Major। দৈব উপসর্গ ও ব্যবধানাদি গণনা মুখে ঠিক ক'রে বলতে পারলেও 'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রণেতা ৺ দুর্গাদাস লাহিড়ী ঠিকই বলেছেন যে, ভারতীয় নক্ষত্রের অবস্থিতি ভারতীয় মতেই লিখিত, অথচ ভারতীয় নক্ষত্রাদির পরিমাণ ও ব্যবধানাদির সঙ্গে ধোলো মতের যেটুকু পার্থক্য আছে তার কোন কারণ নির্দ্দেশ না ক'রেই ধোলো হিসাবেই গণনা করা হয়।

তিলক প্রমুখ পণ্ডিতদের গণনা ও যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সময় ৫০৩৬ বর্ষে ফেলেন তাঁদের উভয়ের গণনার সময় কাছাকাছি। উভয়ের মতে বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ সবই রচিত বা সংকলিত হয় সেই সময়ে (খৃঃ পূঃ ৩০০০ হাজার বর্ষে)। মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান। অধ্যাপক হরিপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে, (১) মহাভারতের প্রাচীন অংশ বা প্রাচীন কথার সংকলন কাল (6th century B. C.)র, খৃঃ পূঃ ষষ্ঠশতকে প্রচলিত কাহিনী হ'তে, (২) যদি মহাভারত খৃঃ পূঃ ষষ্ঠশতক হ'তে ৪র্থ শতকের মধ্যেই সংকলিত হ'য়ে থাকে, তার অস্তিত্ব বুদ্ধদেবের জন্মভূমিতে কেউ জানত না, (৩) মহাভারত বর্ত্তমান আকারে সংকলিত হ'তে আরম্ভ হয় খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতক (4th Century B.C) হ'তে ও তা পূর্ণ হয় ৪র্থ শতকে (4th. Century A D.)। রামায়ণ সম্বন্ধে তাঁদের মত, (১) সপ্তকাণ্ড রামায়ণের প্রথম ও সপ্তমকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত—বহু বহু কাল পরে রচিত, (২) রামায়ণ বর্ত্তমান আকারে দাঁড়ায় ৩য় শতকের শেষ অংশে (2nd Century A. D.), (৩) মহাভারত বর্ত্তমান আকারে পরিণত হবার পূর্ব্বে সমগ্র রামায়ণ প্রচারিত হয়েছিল, (৪) বেদে রামচরিতের উল্লেখ না থাকলেও, সে যুগেও রামচরিতের গীতি ঝঙ্কারের আভাস পাওয়া যায়, (৫) ত্রিপিটকে রামায়ণের নাম নেই, কিন্তু যেরূপ গাথায় রামচরিত বর্ণিত সেই রূপ গাথা পাওয়া যায়, (৬) বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্পষ্ট কোন নিদর্শন রামায়ণে না থাকলেও, সম্ভবতঃ বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে রামচরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে, (৭) রামায়ণে গ্রীক্ প্রভাব নেই, (৮) প্রাচীন গাথার উপর ভিত্তি

ক'রে, বাল্মীকি তাঁর মূল রামায়ণ রচনা করেন খৃঃ পূঃ তিনশত শতকে (3rd Century B. C.) ।

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের কাহিনী হ'তে যদি মহাভারত রচনা হয়ে থাকে, শ্রীকৃষ্ণও সম্ভবতঃ ঐ সময়ের লোক হয়ে যান, ঐ সব পণ্ডিতদের মতে। কোথায় খৃঃ পূঃ ৩০০০ হাজার (৫০৩৬ বর্ষ পূর্ব্বে) আর কোথায় খৃঃ পূঃ ষষ্ঠশতক ! তাঁদের মতে বাল্মীকি বর্ত্তমান ছিলেন খৃঃ পূঃ তিন শত শতকে। প্রাচীন শাখা তার কত কাল পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল ? বোধ হয় খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের পূর্ব্বে। তাঁদের মতে মূল ও পরবর্ত্তী অংশ যখনই রচিত হোক্ না কেন, বাল্মীকি ছিলেন রামচন্দ্রের সমসাময়িক ও তাঁর পিতৃবন্ধু, ইহা জানা যায় ঐ রামায়ণ হ'তেই। যে রামচরিতের প্রভাব বেদেও বর্ত্তমান, সেই রামচন্দ্রকেও তাঁরা বোধ হয় অস্বীকার করেন। বেদের কালও সম্ভবতঃ ঐ সময়ে তাঁদের মতে। কিন্তু এদিকে আবার অধ্যাপক দাস মহাশয় বেদের সময় ফেলেছেন খৃঃ পূঃ ৫০—২৫ হাজার বর্ষে ! পুনঃ, পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ নন্দ বংশের নন্দ হ'তে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় ১০০০ বৎসর ব্যবধান ধরেন, অনেকে আবার বুদ্ধদেব হ'তে ঐ ব্যবধান স্বীকার করেন, অর্থাৎ একমতে প্রায় খৃঃ পূঃ ১৫০০ বৎসরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়, অন্যমতে তার ২৩৭।৩৮ বৎসর পূর্ব্বে।

[বুদ্ধদেবের জন্মকাল ধরা হয় খৃঃ পূঃ ৬০০ হ'তে ৫৬৩ বৎসরের মধ্যে। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক ছিল নন্দ বংশ, অতএব খৃঃ পূঃ ৩২৬ বা ৩২৪ বৎসরে নন্দ মগধে রাজত্ব করেন। বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবৎ হ'তে শ্লোক তুলে একদল পণ্ডিতেরা স্থির করেন যে নন্দাভিষেক হ'তে পরীক্ষিতের সময় ১০১৫ বৎসরের ব্যবধান ; ঐ ভাগবতোক্ত শ্লোকের অন্য অর্থ ক'রে আর একদল, ২৬০০ বৎসরের ব্যবধান দেখান। অর্থাৎ একমতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খৃঃ পূঃ ১৪০০, অপর মতে খৃঃ পূঃ ৩০৪০ বর্ষে সংঘটিত হয়।]

শ্রীকৃষ্ণের কাল গণনা হয়, নন্দবংশের মহাপদ্ম নন্দ হ'তে, যদি 'নন্দ পিতার নন্দ-গোপরাজ' হ'তে কাল নিরূপণের চেষ্টা হয়, তা'র মধ্যে ভুলটি কোথায় ? এই সব ত পণ্ডিতে পণ্ডিতে গণনা বিভ্রাট ! এ অবস্থায় প্রাচীন মত ধ'রে থাকাটা অন্যায় বা অসমীচীন কি ? প্রাচীন কথা, প্রাচীন আচার প্রভৃতি যে সময়ে পরে সংকলিত হয়, সেই সময়ের প্রভাব ও সঙ্কলয়িতার মধ্যে থাকবে না, তা হয় কি ?

অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, এম, এ মহাশয় বেদের কাল বিভাগ সম্বন্ধে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ) আলোচনা করেছেন। [ভারতবর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৪ দ্রঃ]। তিনি লিখেছেন, "অঙ্গিরাদিগের বিষয় ঋগ্বেদে যেরূপ বর্ণিত দেখি, তাহাতে ইন্দ্রের কুক্কুরি সরমা, দক্ষিণদিকস্থ পণিদিগের দ্বারা হৃত সূর্য্যকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছিল। সেই নিমিত্তই সরমা ও তাহার পুত্র যজ্ঞের ভাগ প্রাপ্ত হয়।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৪।৪৫।৭ ও ৪।৪৫।৮।]

আমাদের মনে হয় সরমাই Serius (α Canis Major) নামক নক্ষত্র ও তাহার পুত্র শ্বা (β Canis Major) নক্ষত্র। সরমা ও শ্বা পুনর্বসু নক্ষত্রের অন্তর্গত। যখন সূর্য্য সরমা নক্ষত্রে আসিতেন, তখন সূর্য্যের বিষুবন (Winter Solistice) হইত। এই ঘটনা অঙ্গিরা ঋষিদের কালে ঘটে। ঋগ্বেদে, ঋভু, বিভু ও বাজ নামক তিন ভ্রাতার গল্প আছে। তাঁহারা অগোহ্যের (অর্থাৎ অগ্নির) গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। দ্বাদশ দিন তথায় বেশ সুখে অবস্থান করেন। সেই দ্বাদশ দিনের শেষে সুনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া অগোহ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কে সংবৎসরের মধ্যে অন্ধকার দিনকে জানাইয়া দেন? তাহাতে বস্ত অগোহ্য (অগ্নি) উত্তর দিয়াছিলেন যে শ্বাকে এই জ্ঞানদাতা বলিয়া জানিবে।

[ঋগ্বেদ, ১।১৬১।১৩, ৪।৩৩।৭, ১০।৮৪।৩, ১।৬২।৩, ৪, ৫।]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে জানিতেছি যে, শিশির ঋতুর শেষভাগে দ্বাদশাহের সত্র যজ্ঞ হইত। পাপী পুরুষ যাজ্য নহে।...এই যজ্ঞের পর ইন্দ্র, দেবতাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হন। শিশির মাসদ্বয়ের মধ্যে দ্বাদশাহের যজ্ঞ করিতে হইবে। [ঐ ব্রাঃ ১৯।৩।২৫, ২৬।]। অতএব ঋভুদিগের কালে বসন্ত 'ঋতু' আরম্ভ হইত।...Winter Solistice বা বিষুবনের সময় ইহার ঠিক একমাস পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। পুনর্বসু নক্ষত্রের অন্তর্গত শ্বা নক্ষত্রের আরম্ভ হইলে মৃগশিরা নক্ষত্রপুঞ্জে বিষুবন হইত। কারণ মৃগশিরা হইতে আর্দ্রা এক নক্ষত্র, আর্দ্রা হইতে পুনর্বসু এক নক্ষত্র এবং তাহা হইতে শ্বা এক নক্ষত্রের অংশ; বর্ত্তমান কালে মৃগশিরার পর নক্ষত্র আর্দ্রার প্রথম অংশে অতিরাত্র (Summer

Solstice) হইতেছে। অতএব বৈদিক কাল হইতে অয়ন-চলন বশতঃ এই বিপর্য্যয় সাধিত হইযাছে। দেখা যাইতেছে যে, অয়ন প্রায় ১৩ নক্ষত্র ঘুবিয়া আসিয়াছে। এই পবিবর্ত্তন সাধিত হইতে ১৩×৯৫০ বৎসব অর্থাৎ ১২৩৫০ বৎসব লাগিয়াছে। ঋভূদিগেব কাল তাহা হইলে বর্ত্তমান সময হইতে ১২৩৫০ বৎসব পূর্ব্বে ছিল। নবগ্ব ও দশগ্ব অঙ্গিবাদিগেব কালে বিষুবান্ পুনর্বসু নক্ষত্রেব অন্তর্গত সবমা নক্ষত্রে ছিল। অতএব ঋভুদিগেব কাল হইতে প্রায ২০০০ বৎসব পূর্ব্বে নবগ্ব ও দশগ্ব বর্ত্তমান ছিলেন। ঐতবেয় ব্রাহ্মণকালে সম্ভবতঃ বোহিণী নক্ষত্র ছাডাইয়া বিষুবান্ কৃত্তিকাব দিকে গমন কবিয়াছে, কিন্তু কৃত্তিকায় পৌছায় নাই। অথর্ববেদেব যুগে বিষুবান্ কৃত্তিকায় পৌছিযাছে এবং এইকালে সমস্ত নক্ষত্রদিগেব নামকবণ হইয়াছে। কৃত্তিকায় বিষুবান্ হইলে বিশাখায় বৎসব শেষ ও আবম্ভ হয় অর্থাৎ বৎসবেব দুই শাখাব মিলনস্থান বিশাখা নক্ষত্রে। তাহা হইলে যে কালে নক্ষত্রদিগেব নামকবণ হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান কাল হইতে ১১×৯৫০=১০৪৫০ বৎসব পূর্ব্বে ছিল।" লেখকেব গণনাকাল এখন কয়েক বৎসর বেড়েছে মাত্র।

[লেখক উক্ত প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে ঋগ্বেদেব "নবগ্ব ও দশগ্ব অঙ্গিরাগণ ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবদ্বয়ের সাহায্যে পণিদিগেব পর্ব্বত হইতে সূর্য্য, গো, অর্ক এবং উষাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।"]

ঐতবেয় ব্রাহ্মণ, ঋগ্বেদেব ব্রাহ্মণ। সূর্য্য পাছে অদৃশ্য হন এই আশঙ্কাব কথা উক্ত ব্রাহ্মণেও পাওয়া যায়। তা হলে, অধ্যাপক মহাশয়েব কাল নিরূপণ হতে জানা যায়,—(১) নবগ্ব ও দশগ্ব অঙ্গিবাব নাম ঋগ্বেদে কিছু বেশী বাব হাজাব বৎসব পূর্ব্বে পাওযা যায়; (২) কিছু কম সাড়ে বাব হাজাব বৎসব পূর্ব্বে ঋভু বর্ত্তমান ছিলেন; (৩) প্রায় সাডে দশ হাজাব বৎসব পূর্ব্বে ঐতবেয় ব্রাহ্মণে অনেক নক্ষত্রেব নাম পাওয়া যায়। অধ্যাপক মহাশয়েব মতে, ঐতবেয় ব্রাহ্মণেব বহু পবে শতপথ ব্রাহ্মণ বচিত হয়, কাবণ (ক) ঐতবেয় ব্রাহ্মণে 'ইষ', 'উর্জ্জ' শব্দদ্বয়ে বসন্ত কাল বোঝাত, কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণে ঐ শব্দদ্বয়ে শবত ঋতুব মাসদ্বয় বোঝাত; (খ) ঐতবেয় ব্রাহ্মণে অথর্ববেদেব নাম নেই, যদিও ঋগ্বেদে ও এই ব্রাহ্মণে, অথর্ব ঋষির নাম আছে; (গ) ঐতবেয় ব্রাহ্মণে সকল নক্ষত্রেব নাম নেই,

শতপথে ২৭টি নক্ষত্রের নাম পাওয়া যায় এবং অথর্ববেদে ২৮টি নক্ষত্রের নাম আছে, (ঘ) ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মৃগনক্ষত্রকে শতপথে মৃগশীর্ষ বলা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ১৩টি মাসের উল্লেখ আছে।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে একমতে ৫০৩৬ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র সমরের যুগে শতপথ ব্রাহ্মণাদি সঙ্কলিত হয়। সে সময়ে বেদব্যাস ছিলেন। তিনিই প্রথম বেদ বিভাগ করেন, বেদগুলি পৃথক পৃথক নামে পরিচিত হ'তে থাকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যখন ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ, তখন ঐ ব্রাহ্মণের সংকলন ঐ সময়ে বা কাছাকাছি সময়ে হয় নিশ্চয়, নতুবা মাত্র শতপথ ব্রাহ্মণ সংকলন ব্যাপারের অর্থ কি? যাঁরা সংকলন কালকে রচনা কাল বলে মনে করেন তাঁদের মতে অতএব, শ্রীকৃষ্ণের সময় দাঁড়ায় প্রায় ১২ হাজার হ'তে অন্ততঃ ১০ হাজার পূর্ব্বে। অথর্ব্বন ঋষির নাম ঋগ্বেদে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যখন পাওয়া যায় ও যখন ঐ ঋষির নামের সঙ্গে অথর্ব্ববেদ জড়িত, তখন ঋগ্বেদ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও অথর্ব্ববেদ প্রভৃতির সময়ে ঐ ঋষি বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং সমসাময়িক অর্থাৎ একই কালে ঐ গুলি ও শতপথ সংকলিত হয়, উক্ত মতানুসারে।

অথর্ব্ববেদে ২৮টি নক্ষত্রের নাম আছে, সুতরাং অথর্ব্ববেদ পরবর্ত্তী, এই যুক্তি সমীচীন বলা যায় না। যজ্ঞাদির জন্য কাল নিরূপণ আবশ্যক হত। এই গণনা পদ্ধতি দুরকম ছিল, ইহা ভারতীয় পণ্ডিতেরা বহুবার দেখিয়েছেন, একটি হত চন্দ্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ ক'রে—চান্দ্র তিথিদ্বারা, (২) দ্বিতীয়টি হত, রাশির সাহায্যে। গণনায় ক্রান্তিবৃত্ত (ecliptic) ও রাশিচক্রের (Zodiac) বিভাগ দরকার হয়ে পড়ে। চন্দ্রের দৈনিক গতি নির্দ্দেশ করতে হলে ক্রান্তিবৃত্তকে ২৮ ভাগে বিভক্ত করতে হয়, কারণ, রাশিচক্রের সঙ্গে চন্দ্রকক্ষার অবনতি (inclination of the moon's orbit to the ecliptic) অতি সামান্য, নগণ্য।

[প্রাচীন যুগের জ্যোতিষ শাস্ত্র—সুকুমাররঞ্জন দাস গুপ্ত, বি, এ,—ভারতবর্ষ ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা—১৩২৫ দ্রঃ।]

তারকাপুঞ্জকে স্থির করবার প্রথম চেষ্টা ঐ কালে হয় বরং বলা যেতে পারে, কারণ একটি তারকাপুঞ্জ হ'তে অপরটিতে চন্দ্রের আবর্ত্তন কাল সূক্ষ্মভাবে গণনা করলে হয় ২৭ দিনের সামান্য বেশী। সূক্ষ্মতর

গণনাব কাল পববর্ত্তী ধবলে অথর্ব্ববেদই প্রাচীন, এই মতে (ঐ প্রবন্ধ দ্রঃ)। আগে অতি সূক্ষ্ম গণনাব কথা বলেছি। সেইটিই ছিল সর্ব্ব পূর্ব্বে, ইহাই সঙ্গত মনে হয়, ইহা, পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন সমস্ত বেদে বক্ষিত বৈদিক গণনা প্রণালী আবিষ্কৃত বা ঋষিদৃষ্ট হয়, অতি প্রাচীন ও সাধক ভিন্ন অন্যেব গম্য নয বলেই সে বীতি ছেড়ে দিযে সহজতব বীতিব চল হয় ও সর্ব্বপূর্ব্বটি স্মৃতিপথ হ'তে মুছে যায়। সূক্ষ্মতম বা সূক্ষ্মতব বীতি যদি পবে আবিষ্কৃত হত, সেইটিই থেকে যেত, বিলুপ্ত হত না। ভাবতেব ইতিহাসে, আধ্যাত্মতত্ত্বেব মত, আধ্যাত্ম জীবন সহায সমস্ত সূক্ষ্মতম ব্যাপাব প্রথমে এসেছে। আব একটি কথা। যে সব যজ্ঞে খুব সূক্ষ্ম গণনাব দবকার হত না সেই সব যজ্ঞাদিব কাল নিরূপণ কবতে অপরাপব নাম দবকাব হত না।

উক্ত অধ্যাপক মহাশয়, তাঁব প্রবন্ধে ধোলো মত উদ্ধৃত ক'বে, আবো কযেকটি সিদ্ধান্তে এসেছেন। ঐতবেয় ব্রাহ্মণ বলেন, যে সকল গো কামনা ক'বে ও দীক্ষিত হয়ে ("যস্মৈ কামায় অদীক্ষমহি") যজ্ঞ কবে তাবা দশম মাসে খুব ও শৃঙ্গ প্রাপ্ত হয [১৮।৩।১৭], যাবা অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক সংবৎসব যজ্ঞ কবেছিল, তাবা খুব ও শৃঙ্গ লাভ কবে নি, কিন্তু বলবান ও সকলেব প্রিয হযেছিল। [১৮।৩।১৭]। ঐ বকম আদিত্যগণ দ্বাদশ মাস ব্যাপী যজ্ঞ ক'বে অগ্রেই স্বর্গে যান এবং অঙ্গিবাগণ ৬০ বৎসবে যান। ধোলো মতে এই ৬০ বৎসবেব হিসাবটি চীন বা খলদে হ'তে এসেছে, কাবণ ঐ সব দেশেও যাটেব গণনা দেখা যায।

["The cycle of 60 years was brought into India by some of the imigrant tribes and was afterwards known as the cycle of Vrihaspati *ie* of Jupiter It is a continuation of two cycles a cycle of 5 years from the Jyotish (Astronomy), of the Vedas and the sidereal period of the planet Jupiter, which was at first reckoned to be 12 years, but was afterwards found by the Hindus to be 11·860962 years. According to Laplace the mean sidereal period is 11 862 Julian years......It has already been mentioned that Chinese History and the Annals of the Chines Emperors were

written by reference to cycles of 60 years Such a period of time, moreover, was in common in Chaldea, under···SoSa." (Hindu Astronomy W. Bernard)]

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে হিন্দুগণনা খোলো গণনা অপেক্ষা সূক্ষ্ম। সে যাই হোক্। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কাল সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলেছি। মহাভারত এক ব্যক্তির রচনা নয়, পণ্ডিতদের মতে, মহাভারতে বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব বর্ত্তমান, কিন্তু মূল ঘটনা, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বা কুরুক্ষেত্র সমরের সময় নিরূপণ পণ্ডিতেরা করেছেন পূর্ব্বে বলেছি। সে সময়ে কুরুপাণ্ডবদের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত ছিল জানতে পারা যায়। পূর্ব্বসাগর বা প্রশান্ত মহাসাগর হ'তে, কাশ্যপহ্রদ (Caspian Sea) পর্য্যন্ত ভূভাগ হ'তে, রাজারা এসে এক পক্ষে না এক পক্ষে যোগদান করেছেন। আমরা এখন যাকে চীন সাম্রাজ্য বলি তার উপর কুরুপাণ্ডবদের প্রভাব ছিল। ভারতের বাহিরের স্বাধীন নৃপতিরা যে দিল্লি বা ইন্দ্রপ্রস্থানের 'আহ্বানে' যুদ্ধে সমবেত হন, ইহা কি সামান্য প্রভাব? কত কালে এই প্রভাব হওয়া সম্ভব? অতএব ৬০ বৎসরের হিসাবের জন্য ভারত চীনের কাছে ঋণী এটা সম্ভব হয় কোন্ যুক্তিতে? দেখা যায় ভারতের প্রভাবেই চীন প্রভাবান্বিত।

[ভূতপূর্ব্ব রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ভাটপাড়া পণ্ডিতসভার সহকারী সভাধ্যক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ইত্যাদি বহু উপাধিধারী পণ্ডিত হরিপ্রসাদ শাস্ত্রী ভট্টাচার্য্য, এম, এ, বি, এল, এবং অধ্যাপক রামরূপ বিদ্যাবাগীশ এম্, আর্, এস্ মহাশয়দ্বয়—যাঁদের মহাভারত ও রামায়ণ সম্বন্ধে মত উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাঁরা—দেখিয়েছেন যে, মদ্রদেশ = উত্তর পারস্য হ'তে কাশ্যপহ্রদ পর্য্যন্ত ভূভাগ। কেকয় = মদ্রদেশের পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য—কাশ্যপহ্রদ হ'তে আর্ম্মেনিয়া পর্য্যন্ত ভূভাগ, ভগদত্ত ছিলেন চীন ও কিরাতদের (Mongolianদের) রাজা, যাঁর সাম্রাজ্য ছিল প্রশান্ত মহাসাগর হ'তে সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত ভূভাগ ও দক্ষিণে প্রাগ্‌জ্যোতিষ কামরূপ বিস্তৃত। এই সব স্থানের নৃপতিরা কুরু-পাণ্ডবদের আহ্বানে ইন্দ্রপ্রস্থে সমবেত হয়েছিলেন]।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১৮।৮।২২) হ'তে জানা যায় যে, যে নক্ষত্রটির শিরের মধ্যে সেলাই করার মত দেখায়, সেই নক্ষত্রটির শিরই বিষুবন্ অর্থাৎ পুরুষাকৃতি ঐ নক্ষত্রের দক্ষিণ ও বাম বাহুর মধ্যস্থিত শিরই বিষুবন্। "যে দিন আদিত্য এই স্থানে আগমন করেন, সেই দিনকেও বিষুবন্ বা

একবিংশতি বলা হয়, (বিষুবতি বলাও হয়)"। এই একবিংশের সাহায্যে আদিত্য স্বর্গলোকে যান। (১৮।৪।১৮)। তিলকাদি সকলেই স্বীকার করেছেন যে এই নক্ষত্রপুঞ্জটি Orion বা কালপুরুষ। (তারাপদবাবুর উক্ত প্রবন্ধ দ্রঃ)। এখানে একটি কথা বলা দরকার। ঋগ্বেদ (১।১৬৪।৪৩)এ "শকময়ং ধূমম্" অর্থে সায়ন করেছেন শকৃৎময় বা শুষ্ক গোময় সম্ভূত ধূম; 'উক্ষ'=বৃষভ বা অভীষ্ট ফলবর্ধক; 'পৃশ্নি' (পৃশ্নিমাতর)=মরুৎগণ। পণ্ডিতগণের আপত্তি যে সায়নাচার্য্য, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সম্মত বিষুবান্ শব্দের বিশেষ অর্থের উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নি। মনে হয় সায়নের "নাতিদূরে শুষ্ক গোময় সম্ভূত ধূম দেখছি" এই অর্থটিতে কোন গোলযোগ নেই; Serius ও Orion নক্ষত্রদ্বয়ে প্রকাণ্ড ছায়াপথ বা নেবুলি দেখা যায়, দূরত্বের জন্য অথবা সেইগুলি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নেবুলিগুলি ধূম্রাকার দেখায়। (এই Milky Wayর নাম Magellinic clouds)। সায়ন, Orion সম্বন্ধেই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'শকময়ং' অর্থে ধূমবিশিষ্ট করেছেন। এই নেবুলিকে নিকৃষ্ট অগ্নি ('অবর') বলা হয়েছে; নিকৃষ্ট এইজন্য যে নেবুগুলির আলোক reflected আলোক, স্বয়ং প্রকাশ নয়, অথবা ঐ নীহারিকার দীপ্তি তখন বিস্তৃত জমাট বেঁধে সূর্য্যের মত স্বয়ং প্রকাশ হয় নি।

[Pole star বা ধ্রুবতারার বিপরীতদিকে, দক্ষিণ আকাশে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ দেখা যায় তার নামই কালপুরুষ। এটা সাদা চ'খেই দেখা যায়। কালপুরুষের শিরোভাগে তিনটি ছোট নক্ষত্র, কাঁধে দুটি বড় নক্ষত্র, পাদদেশে একটি নীলাভ উজ্জ্বল নক্ষত্র, নীচে বা পাশে দুটো নক্ষত্রপুঞ্জ। শেষোক্ত দুটো নক্ষত্রকে কালপুরুষের দুটো কুকুর বলা হয় (Canis Major ও Canis Minor)। ঐ Canis Majorএর খুব উজ্জ্বল তারার নাম লুব্ধক (Sirius)। কালপুরুষের উত্তরে যে দুটি নক্ষত্র, তাদের একটির নাম বৃষ, অপরটির নাম রোহিণী। রোহিণী রক্তাভ (ঐ. ব্রা. ১৩।৯।৩৩) ও তাকে বৃষের চক্ষু বলা হয়। রোহিণী প্রজাপতির কন্যা নামে বর্ণিত। শাস্ত্রাদিতে অনেক সময় অনেক কথা রূপকে বর্ণিত। পায়ের ক্ষুর, শৃঙ্গ আদি লাভেচ্ছায় গো সকলের সত্র অনুষ্ঠান প্রভৃতির কথা স্পষ্টতঃ রূপক। অত্যন্ত অভাববোধে যে তীব্র আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, তার জন্য বহুকাল গভীর চিন্তার ফলে দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির আবির্ভাব, ইহা জীবতত্ত্ববিদের পরীক্ষালব্ধ সত্য। শতপথেও অনুরূপ গল্প আছে। তখনকার শিক্ষাপ্রণালী আমরা ভুলে গেছি, তাই বুঝতে কষ্ট হয়। তা ছাড়া, ঋষি, দেবতা বা মহাজনদের নামে, নক্ষত্র, পর্ব্বত নদী ইত্যাদির নামকরণ

হত, এমন কি বৎসবেব ভিন্ন ভিন্ন মাস ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রচলিত হ'তে দেখা যায় কোন মহাপুরুষেব স্মৃতি হিসাবে, যেমন বৈশাখ মাস, বুদ্ধদেবেব স্মৃতিহিসাবে বর্ত্তমানে বৎসরের প্রথম মাস। এই সব কাবণে ঐতিহাসিক উপাখ্যানগুলি রূপক ভাবে ব্যাখ্যা ক'রে, ও একমাত্র ঐ ব্যাখ্যাব ওপবে জোর দিয়ে, আসল ঘটনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায়। ঐরূপে, দুর্গা প্রতিমা, বামায়ণাদি, বাধাকৃষ্ণ লীলা প্রভৃতি—এমন কি ইটালিয়ান ঐতিহাসিক গোবেসিযো দেখিয়েছেন যে নেপোলিয়ানেব জীবনীকে—সমস্তগুলিকে জ্যোতিবতত্ত্বান্তর্গত করা যায়। সাধনবাজ্যে, এ বিষয়ে সাবধানতার দরকাব। আর্য্য জ্যোতিষ মতেও বহু সূর্য্য আছে বলা হয়। সিবিয়াসে বাট কোটি পৃথিবী স্থান পেতে পারে=মৃগব্যাধ বা লুব্ধক, ভেগা=অভিজিৎ বা শতদল, পেলারিস=ধ্রুব। ধ্রুবলোক=ধ্রুবনক্ষত্রকেন্দ্র, তাকে বেষ্টন করে আছে ক্রতু, পুলস্ত, পুলহ, অত্রি, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, মবীচি—৭ ঋষির নামে পরিচিত। ইহা একসময়ে নেপচুনেব কাছে ছিল। সপ্তর্ষিমণ্ডলের উত্তর পূর্ব্বে অরুন্ধতি, বশিষ্ঠকে আশ্রয় ক'রে আছে, পশ্চিমে বশিষ্ঠ, অঙ্গিবা, অত্রি (তাব কাছে), পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু যথাক্রমে পূর্ব্বে। সপ্তর্ষিমণ্ডল Ursa Major নয়, তবে সপ্তর্ষিমণ্ডল দুই সময়ে দুভাবে অবস্থিত ছিল। এই পবিবর্ত্তনের একটিই Ursa Major।]

শাস্ত্ৰাদিতে ৰহস্য বিজ্ঞান

[বেদাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বায় জ্যোতিঃ শাস্ত্রীব দশাবতাব চবিত—ভাবতে সাধনা, বৈশাখ—১৩৪২ দ্রঃ। সংক্ষেপে উদ্ধৃত]। তিনি বলেন, "সত্যযুগেব প্রথম অবতাব মৎস্য। 'মৎস্য' শব্দ মধ্যেই মৎস্যাবতাবের রহস্য পূর্ণ উক্তি নিহিত। আনন্দ ও মত্ততা ব্যঞ্জক মদ ধাতু হইতে মৎস্য শব্দ সিদ্ধ। ভগবান বিষ্ণুব অন্যতম নাম আনন্দময়। সেই আনন্দময়েব মনে সৃষ্টি বাসনা জাগিলে তাঁহাব মনে মত্ততা জন্মে, সেই মত্ততাই তাঁহাব আবির্ভাবেব কাবণ। 'কামাচ্চনানুমানাপেক্ষা'—বেদান্ত দর্শন, ১।৭৮), এই কামই মত্ততা, ইহাই মৎস্যরূপ ধাবণেব কাবণ। প্রজাপতি বলিতেছেন, 'কামস্তদগ্রে…মনীষা' (ঋ. ১০।১২৯।৪)।

[কামঃ=সিসৃক্ষা, রেতঃ আসীৎ=ক্ষরণগতি ও শব্দার্থক রী ধাতু হইতে রেতঃ শব্দ নিষ্পন্ন, সতঃ ব্রহ্ম অথেতি=ব্রহ্মের অনংশীকৃত তন্মাত্র সকলকে ব্রহ্মেব বন্ধুস্বরূপ

প্রাপ্ত হইলেন (বা সৃষ্টির উপাদানস্বরূপ একার্ণবে জীবের উৎপাদনের পূর্ব্বভাব সদৃশ)।]

মদন শব্দ ও মদ ধাতু হইতে উৎপন্ন। মদনের অন্যতম নাম মীনকেতন, মীনধ্বজ (=মহার্ণবরূপী সমুদ্র), সুতরাং মীনকেতন, মদন ও 'মৎস্যাবতার' পৃথক বস্তু নহে। গতি ও মতি অর্থসূচক মী ধাতু হইতে মীন শব্দ সিদ্ধ। ব্রহ্মের প্রথম গতি (Vibration or motion) স্বতঃই উৎপন্ন। ব্রহ্মার নামান্তর মনঃ, মহান, মতি ইত্যাদি, কেতন=ইচ্ছা ও মতি। অতএব মীনকেতন=পুরুষাখ্য ব্রহ্মা। ব্রহ্মার প্রথম সাকার ভাব মৎস্যরূপে পর্য্যবসিত। ইনিই বেদের বৈশ্বানর অগ্নি এবং পুরাণের প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু।

ভগবান যে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা খাল, বিল বা সমুদ্রের মৎস্য নহে। তাহা একার্ণবী অনন্ত মহাসাগরের মহামৎস্য, স্বর্গের মন্দাকিনীর মহামৎস্য। ছায়াপথই পুরাণে দেবকুল্যা, ঋষিকুল্যা, স্বর্ণদী, মন্দাকিনী, ত্রিপথগা প্রভৃতি নামে পরিচিত। ছায়াপথটি মালাকারে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিবেষ্টন করিয়া বিদ্যমান। এই জন্য তাহার নাম 'কৃতমালা নদী' বা মালিনী। এই নদীতে তর্পণকালে মনুর অঞ্জলিমধ্যে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য পতিত হইয়াছিল (অগ্নিপুরাণ)। এই ক্ষুদ্র মৎস্যই অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে জ্যোতির উদ্ভব। মৎস্য পুরাণেও এসম্বন্ধে রূপক আখ্যায়িকা আছে। মহাভারত বনপর্ব্বে এই নদীর নাম চীরিনী নদী, অন্যত্র ইহার নাম চিত্রা নদী। ব্রহ্মাণ্ডের সপ্তবেষ্টনের ইহাই অম্বুবেষ্টন নামক প্রথম বেষ্টন।...সেই একার্ণবরূপী মহাকাশ হইতে জ্যোতির বা অগ্নির উদ্ভব। সমুদ্রজাতহেতু, মৎস্যসহ উপমিত। বেদের বহুমন্ত্রে অগ্নিকে 'বারবন্তং' ও 'সমুদ্রবাসসং' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে (মহাঃ ৩।৪৩।১২)।

নিশাকালে গগনের ঊর্দ্ধতম প্রদেশে পরম ব্যোমে যে সোমধারা নামক ছায়াপথ (Galaxy) দৃষ্ট হয়, যাহাতে আঁইসের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিকণা পরিলক্ষিত হয়, তাহাই আনন্দস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর প্রথম সাকার অভিব্যক্তি মৎস্যরূপে। মহাবিষ্ণুর শরীর হইতে মহৎ জল।...এই মৎস্য চরিতের মধ্যে বিবিধ পৌরাণিক উপাখ্যানের মূল নিহিত। মৎস্যগন্ধার সম্বন্ধ এই মৎস্যের সহ আছে, মহাভারত আদিপর্ব্বের উপরিচর রাজার

উপাখ্যান ইহার সহিত অনুস্যূত বলিয়া মনে হয়।...মৎস্যাবতারের কার্য্য—হয়গ্রীব নামক দৈত্যের বধসাধন।

['মৎস্য ভূত্বা হয়গ্রীবং দৈত্যং হত্বাজিকণ্টকম্'। মৎস্যাদি জলজন্তুরূপে প্রথম প্রকাশ, কিন্তু উহা আদি সত্যযুগ নহে।]

· সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত এক অন্ধকার এবং তন্মধ্যে জ্যোতিঃ ছিল, পরে অন্ধকার ও জ্যোতিঃ পৃথক হইয়া গেল। অন্ধকার হইল দিতি—দ্বিখণ্ডিত। দিতির প্রথম পুত্র হয়গ্রীব। হয় ধাতুর অর্থ বেগ ও গতি এবং গৃ ধাতুর অর্থ গিলন বা গিলে ফেলা বা ভক্ষণ।

সৃষ্ট্যর্থে যে বেগ (Motion, Vibration) বা কম্পন—প্রসূতির প্রসব বেগের ন্যায়—একবার হইয়া থামিয়া যায় প্রথম। উপস্থিত বেগটা হয়গ্রীব নামক দৈত্য গিলিয়া ফেলিল। চিকিৎসকের দ্বারা প্রসূতির দ্বিতীয় বেগ আনার মত, মৎস্যদেবও হয়গ্রীবকে নাশ করতঃ ব্রহ্মব্যবহারবাধা তিরোহিত করিলেন। 'মৎস্যপুরাণ' মৎস্যরূপী বিষ্ণুর স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ।"

[অগ্নি, 'ধারবস্তং' ও 'সমুদ্রবাসসং'—উঃ আঃ ১৩৩২ সাল ও ১৩৬০ সাল দ্রঃ। ঋগ্বেদে-দিতি ও অদিতি। "অথ চন্দ্রার্থে অদিতিম্ দিতিং চ" ।৫।৬২।৮ঋ। অদিতি = জ্যোতিঃ, দিতি = অন্ধকার। দিতি ও অদিতির অন্য অর্থও আছে, সেই অর্থে প্রয়োগও আছে। অনাদি অন্ধকার, মহানিশারই বিভিন্ন অবস্থা]।

ধোলো জ্যোতির দেশে, আর্য্য জ্যোতির শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা হয়। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক বৈকুণ্ঠনাথ রায় এম্ এ. মহাশয়ের প্রবন্ধ হ'তে কিছু কিছু নিয়ে উদ্ধৃত হল [ভারতবর্ষ ৫ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—ষষ্ঠ সংখ্যা—১৩২৫ দ্রঃ] "ইদানীং আমরা যে সব পাশ্চাত্য জ্যোতিগ্রন্থ পাঠ করি, তাহাতে Planet বলিতে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, য়ুরেনস্, নেপ্‌চুন বুঝি, কিন্তু অতি পূর্ব্বকালের পাশ্চাত্য জ্যোতির শাস্ত্রে Planet শব্দে এই কয়টী জ্যোতিষ্ক বুঝাইত না। য়ুরেনস্ ও নেপচুন্ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং তাহাদের নাম পাওয়া যাইবে না। পৃথিবীর পরিবর্ত্তে সূর্য্য ও চন্দ্রের নাম দেখিতে পাই।...বর্ত্তমান সময় Planet শব্দে কতকগুলি জ্যোতিষ্ক বুঝায়—যাহারা সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করে, সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হয় এবং যাহাদের আবর্ত্তন ক্রিয়া আছে। এইজন্য রবি ও চন্দ্র Planet সংজ্ঞা বহির্ভূত এবং পৃথিবী

অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন সময়ে Planet বলিতে কতকগুলি গতিশীল জ্যোতিষ্ক বুঝাইত। ভূপৃষ্ঠস্থ ব্যক্তি পৃথিবীর গতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, অথচ সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি প্রত্যক্ষ করে; সেইজন্য পৃথিবীকে Planet না বুঝাইয়া রবি ও চন্দ্রকে বুঝাইত। এই ত গেল পাশ্চাত্য জগতের কথা। আমাদের দেশের…কোন প্রাচীন গ্রন্থে পৃথিবীকে গ্রহ বলা হয় নাই; এইজন্য আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানাভিমানী মহাশয়গণ এতদ্দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের উপর কটাক্ষপাত করিতে ত্রুটি করেন না। বর্ত্তমান সময়ে গ্রহ শব্দ আধুনিক Planet শব্দের পরিভাষামাত্র। পূর্ব্বকালে গ্রহ শব্দ বিজাতীয় ভাষার কোন শব্দের পরিভাষা মাত্র ছিল না; সুতরাং আধুনিক অর্থে কোন প্রাচীনগ্রন্থে ব্যবহৃত হইতে দেখি না।…গ্রহ শব্দ গ্রহ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; এই ধাতুর অর্থ, গ্রহণ করা, গ্রাস করা (খাওয়া)। এই শব্দটি কর্ম্মবাচ্যে এবং কর্ত্তৃবাচ্যে বিহিত প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে, প্রথমতঃ ইহা কর্ম্মবাচ্যে ব্যবহৃত হইত। যে সব জ্যোতিষ্ক গ্রস্ত হইত বা যাহাদের গ্রাস (গ্রহণ) দৃষ্টিগোচর হইত, তাহাদের সংজ্ঞা 'গ্রহ'। সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ সকলে প্রত্যক্ষ করিতেন। কোন কোন সময়ে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই কয়টি জ্যোতিষ্কের গ্রহণ দৃষ্টিগোচর হইত। তাই এই সাতটী গ্রহ নামে অভিহিত। এইজন্য অতি প্রাচীনকালে গ্রহ বলিতে মাত্র এই সাতটী জ্যোতিষ্ক বুঝাইত। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত পাঁচটী ক্ষুদ্র—তারকার মত দৃষ্ট হয়, তজ্জন্য এই পাঁচটীকে 'তারাগ্রহ' বলে। কালক্রমে কর্ত্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন গ্রহ শব্দ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের হেতু নির্দ্দেশ উপলক্ষে 'রাহু' নামক একটী তমোময় আচ্ছাদক বা গ্রাহকের সৃষ্টি হইল, এবং গ্রহসংজ্ঞাভুক্ত হইয়া রাহু অষ্টম গ্রহরূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কতক সময় অতীত হইলে অপর পাঁচটী গ্রহের গ্রহণ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে কেতু নামক নবম গ্রহের উৎপত্তি হইল, তদবধি গ্রহ সংখ্যাদ্বারা (৯) বুঝাইতে লাগিল। [নবগ্রহ স্তোত্র দ্রঃ)।…আজকাল কেহ-কেহ চন্দ্রবর্ত্মের পাতের একটীকে (Ascending nodeকে) রাহু ও অপরটীকে (Descending nodeকে) কেতু বলেন। কেহ-কেহ বা রাহু অর্থে পৃথিবী বুঝিতে চাহেন। …নবগ্রহের শ্লোক দুইটী ("অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং…") হইতে মনে হয়

রাহু শব্দে দুইটী চন্দ্রপাতই বুঝাইত। গ্রহ শব্দের তদানীন্তন অর্থ এইরূপভাবে গ্রহণ করিলে কোন প্রাচীন গ্রন্থে পৃথিবী গ্রহ শব্দে ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে না, কারণ ভূপৃষ্ঠস্থ ব্যক্তি পৃথিবীকে গ্রস্ত দেখিতে পায় না। ·যদি পৃথিবী গ্রহ নামে অভিহিত না হইয়াও কার্য্যতঃ আধুনিক গ্রহের ধর্ম্মানুসরণ করিতে দৃষ্ট হয়, তবে পৃথিবীকে আমরা আধুনিক গ্রহ শব্দে প্রয়োগ করিতে পারিব সন্দেহ নাই। গ্রহের একটী ধর্ম্ম—আবর্ত্তন গতি, আর্য্যভট্টের গ্রন্থে ও কোন কোন পুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। আর একটী ধর্ম্ম—সূর্য্যের পরিতঃ ভ্রমণ, তাহার উল্লেখ কোন সিদ্ধান্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কোন কোন বিখ্যাতনামা পণ্ডিত বেদের কয়েকটী ঋকের অর্থ এইরূপভাবে করেন যদ্দ্বারা পৃথিবীর সূর্য্য-পরিতঃ ভ্রমণ স্বীকৃত হইতে পারে।···পৃথিবীর আবর্ত্তন গতি স্বীকার করিলে, আংশিকভাবে ইহার চলত্ব সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নাই।" অন্যত্র প্রবন্ধকার বলেন, "যদিও গ্রহসমূহ রাশিচক্রে অবস্থিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, তথাপি গ্রহগুলি নক্ষত্রগণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ। এইজন্য নক্ষত্র ও গ্রহ দুইটী শব্দেরই উল্লেখ আছে।···মহাভারত ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে এবং পূর্ব্বতন জ্যোতিগ্রন্থে গ্রহ শব্দে কোন কোন স্থলে সূর্য্য বুঝায়, কিন্তু কুত্রাপি পৃথিবী বুঝায় নাই।"

[বৈদিক অনুষ্ঠানে আদিত্যাদির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হত। ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে (যজ্ঞে) গ্রহ শব্দটির অর্থ অন্যরূপ। "সোমরসের যে অংশ পাত্রে অথবা স্থালীতে আহুতির জন্য গৃহীত হইয়া আহবণীয় অগ্নিতে দেবোদ্দেশ্যে অর্পিত হয় তাহার নাম গ্রহ। যে পাত্রে সোমরস রক্ষিত হয় তাহার নামও গ্রহ। (ঐ. ব্রা. রামেন্দ্রসুন্দর)।]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একটি গল্প আছে, তাতে উক্ত হয়েছে যে, দেবতারা ভয় পেতেন পাছে সূর্য্য নীচে প'ড়ে যান। অনেকে মনে করেন, অজ্ঞ আর্য্যেরা সত্যই ভীত হতেন, কারণ, দক্ষিণায়নের আরম্ভ হ'তে শেষ পর্য্যন্ত সূর্য্যের একই দিকে গতি হওয়ায় দিন ছোট ও রাত্রি বড় হ'তে থাকে। অন্য অনেকে মনে করেন, আর্য্যেরা বহুকাল উত্তর মেরুতে বাস করায় তাঁরা দীর্ঘ রাত্রির আগমনকে ভয় করতেন ও সেই ভয়ের সংস্কার, ভারতবর্ষে এসে, ও বহুকাল বাস করেও, দূর হয় নি। আমরা বুঝতে চেষ্টা করব, সূর্য্যের নীচে প'ড়ে যাওয়াটা ও ভয়টা বা কি।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১৮শ অধ্যায় হ'তে জানা যায় যে সম্বৎসর মধ্যে— সোমযাগের মধ্যে গবাময়ন সত্র 'প্রকৃতি', আদিত্যানামায়নে ও অঙ্গিরাসাময়ন তার 'বিকৃতি' বিচার—অনুষ্ঠেয়। গো-গণের অয়ন অনুষ্ঠানে গো-ই আদিত্য স্বরূপ। এই সত্রেই গো গণের শফ ও শৃঙ্গ জন্মায় বলা হয়েছে। সম্বৎসরব্যাপী সত্রের মধ্যবর্ত্তী প্রধান দিনের নাম বিষুব দিবস। সেই দিন একবিংশ-স্তোম গীত হয়, তাই তার নাম একবিংশাহ। এই একবিংশাহ দ্বারা দেবতারা আদিত্যকে স্বর্গলোক অভিমুখে তুলে ধরেছিলেন। বিষুব দিনের পূর্ব্বে তিন দিন স্বরসাম (যে অনুষ্ঠানে স্বরযুক্ত সামের ন্যায় আনন্দদায়ক হয়), এক দিন অভিজিৎ ও ৬ দিন পৃষ্ঠ্য ষড়হ; ঐরূপে বিষুব দিনের পরে তিন দিন, একদিন বিশ্বজিৎ ও ৬ দিন পৃষ্ঠ্য ষডহ = ১০ দিন। পূর্ব্বে ১০ ও পরে ১০ দিনের মধ্যে বিষুবাহ একবিংশ স্থানীয়। শ্রুতিমতে, আদিত্য একবিংশ স্থানীয় (অতএব আদিত্য ও বিষুব পরস্পর পরস্পরের অনুরূপ) আদিত্য স্বস্থান ভ্রষ্ট হয়ে নীচে প'ড়ে যাবেন অথবা উপরে উঠে যাবেন এই ভয়ে দেবতারা আদিত্যের নীচে তিন স্বর্গ ও উপরে তিন স্বর্গ স্থাপন ক'রে তাঁকে স্বস্থানে ধ'রে রেখেছিলেন। তদনুরূপ বিষুবাখ্য অনুষ্ঠানকেও পূর্ব্বে তিন স্বরসাম ও পরে তিন স্বরসাম দ্বারা ধ'রে রাখা হয়। কিন্তু সেই স্বরসামগুলিকেও অরক্ষিত অবস্থায় না রেখে দুই দিক্ হ'তে ঢাকা দিয়ে রাখ্‌তে হয়। তাই বলা হয়, একদিকে স্তোম, অন্যদিকে পৃষ্ঠ্য দ্বারা স্বর সমূহ রক্ষিত হয়। পাছে আদিত্য স্বর্গলোক হ'তে প'ড়ে যান এই জন্য দেবতারা তাঁকে পাঁচটি রশ্মি দ্বারা বেঁধে রেখেছিলেন। বিষুব দিনের বিহিত দিবাভাগে গেয় পাঁচটি সাম (দিবা কীর্ত্ত্যসাম) সেই রশ্মিস্বরূপ। তার মধ্যে মহাদিবা কীর্ত্ত্যসাম হ'তে পৃষ্ঠস্তোত্র, বিকর্ণ হ'তে ব্রহ্মসাম, ভাস হ'তে অগ্নিষ্টোম আর বৃহৎ ও রথন্তর এই দুটি পবমান স্তোত্র নিষ্পন্ন করা হয়। এইরূপে পাঁচটি রশ্মি দ্বারা তাঁকে ধরে রাখা হয় ও তাঁর পতন সম্ভাবনা থাকে না।

ঐ ৫ম খ, ১ম প, ২য় অধ্যায়ে অদিতির দুই দিকে গ্রন্থি দেবার ব্যবস্থা আছে। অদিতির উদ্দেশ্যে প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় চরু দিতে হয়। ঐ চরুদ্বয় দেওয়া হয়,—যজ্ঞকে ধরবার জন্য, যজ্ঞকে অশিথিল করবার জন্য ও যজ্ঞে গ্রন্থি বন্ধনের জন্য, অর্থাৎ যজ্ঞের আদিতে উদ্দিষ্ট প্রায়ণীয়

চরু ও যজ্ঞের অন্তে অদিতির উদ্দিষ্ট উদয়নীয় চরু—এই চরুদ্বয় দ্বারা যজ্ঞের উভয় অন্তকে এঁটে ধরবার জন্য চরু দেওয়া হয়। ঐ ব্রাহ্মণে ঠিক্ ঐ রকম বর্ণনা আছে; আর এক অংশে উপদেশ করা হয়েছে, "দীক্ষা সত্য, দীক্ষা ঋত, অতএব দীক্ষিত সত্যই বলবে। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হ'লে দেবত্ব আসে। প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় উভয় কর্ম্মে প্রাণই প্রায়ণীয়, উদানই উদয়নীয়, সমানই হোতা।" এখানে ছন্দে পুং স্ত্রী কল্পিত হয়েছে।

[ঐ. ব্রা. ১৮শ অ, ৩য় খ সম্বৎসর মধ্যে গবাময়ন বিষুব দিন, ৪র্থ খ গবাময়ন ৫ম দ্রঃ। (গবাময়ন—সূর্য্যরশ্মি সম্বন্ধীয়। ঐ ৫ম দ্রঃ।]

উক্ত বর্ণনা সবই রূপকভাবে যজ্ঞ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তখন এই ভাবের বর্ণনায় লোকের মন বিচলিত হত না, কারণ অনুষ্ঠান সব হাতে-নাতে করা হত। ঐ সব অনুষ্ঠানমুখে সাধক নিজেই সব বুঝতে পারতেন। ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে অনুষ্ঠানকালে, যজ্ঞ, যজ্ঞাভিমানী দেবতা, যজমান ও বেদি প্রভৃতিকে অভেদ ভাবনা করতে শিক্ষা দেওয়া হত। এখানে আদিত্যই যজ্ঞ স্বরূপ, আদিত্যই যজ্ঞাভিমানী দেবতা। আদিত্য নীচে প'ড়ে যাবেন মানে ইহা নয় যে আর্য্যগণ মনে করতেন সূর্য্য মাটীতে প'ড়ে যাবেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যুগে ও ঋষিদের জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে জ্ঞান ছিল, তাতে এ রকম কল্পনাও অসম্ভব। যেমন প'ড়ে যাবার কথা বলা হয়েছে সেই রকম বলা হয়েছে যে পাছে আদিত্য ঊর্দ্ধে উঠে যান এই ভয়ে দেবতারা তাঁকে ঊর্দ্ধস্থিত পরম স্বর্গলোক দ্বারা ধ'রে রেখেছিলেন। পূর্ব্বে যে স্তোমের কথা বলা হয়েছে, সেই ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমই পরম স্বর্গলোক।

[স্তোম :—সামগায়ী ঋত্বিকেরা স্তোত্র গাইতেন। ঋক্ মন্ত্রে সুর বসালেই সেটি হয় সাম। একই ঋকে সুর বসিয়ে বার বার গাইলে প্রত্যেকটি এক একটি সাম হয়। এই কতকগুলি সামমন্ত্রের সমষ্টি, এক এক স্তোত্র, বার বার আবৃত্তি হেতু যতগুলি সামমন্ত্র দাঁড়ায় তদনুসারে স্তোমের নামকরণ হয়।]

ঐ ব্রাহ্মণে (১৩শ অ; ৯ম ও ১০ম খ) আছে, 'প্রজাপতি', কন্যার উদ্দেশ্যে ধ্যান করলেন। দৌঃ দেবতাই সেই কন্যা, প্রজাপতি ঋষ্য (মৃগবিশেষ) রূপ ধ'রে কন্যায় রত হলেন।

[শ্রীমদ্ভাগবত গীতে এই কন্যা বা দৌঃদেবতা—নীহারিকা।]

অশান্ত প্রজাপতিকে শান্ত করবার জন্য ঘোরতম 'শরীরধারী' একজন আবির্ভূত হলেন, তাঁর নাম ভূতভাবন। তিনি পশুমান। তিনি প্রজাপতিকে বাণবিদ্ধ ক'রে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করলেন। ঐ আকাশস্থ মৃগরূপী প্রজাপতিকে লোকে মৃগ বলে।

[রোহিনী ও আর্দ্রার মধ্যে স্থিত মৃগশীর্ষনক্ষত্র—সায়ন।]

তিনিই আকাশে ঐ মৃগব্যাধ (লুব্ধক নক্ষত্র)। যিনি রক্ত বর্ণা মৃগী, তিনি আকাশে রোহিণী, আর যাহা ত্রিকাণ্ডযুক্ত বাণ তাহাও আকাশে ত্রিকাণ্ড বাণ হয়ে আছে। (মৃগশীরার নিকটে বাণাকৃতি তারাত্রয়)।

[বাণের তিনভাগ = অনীক, শল্য, তেজন। অসুরদের পুরীভেদের গল্পে বলা হয়েছে যে উপসদিষ্টি যজ্ঞে, উপসৎ (ইষু) বাণস্বরূপ হয়েছিল। অগ্নি—সেই বাণের সম্মুখ ভাগ, সোম—শল্য, বিষ্ণু—শল্যাগ্র, বরুণ-পত্র দেবগণ—আজ্যস্বরূপ হয়ে বাণ মোচন করেছিলেন।]

প্রজাপতির রেতঃ ধাবিত হ'য়ে সরোবরে পরিণত হল (মানুষ)। ঐ রেত অগ্নি দ্বারা বেষ্টিত হল। মরুতেরা তা কম্পিত করলেন। রেতের উদ্দীপ্ত প্রথম অংশ আদিত্য হলেন, দ্বিতীয় অংশ ভৃগু হলেন। বরুণ ভৃগুকে গ্রহণ করায় তিনি বারুণি ভৃগু হলেন। রেতের তৃতীয় অংশ অন্যান্য আদিত্যগণ হলেন। অবশিষ্ট সব দগ্ধ হ'য়ে অঙ্গার হল। তা হ'তে অঙ্গিরাগণ হলেন। পুনরায় যে অংশ অশান্ত হল, তা হ'তে বৃহস্পতি হল।' ইত্যাদি।

[অন্যত্র—ঐ. ব্রা. ষষ্ঠ ম, ১৪শ অ. ৩ প—অগ্নিষ্টোম। এই বর্ণনাটিতে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ প্রার্থনা করি।]

অন্যত্র, "যে আদিত্য তাপ দেন, তিনিই অগ্নিষ্টোম। ঐ আদিত্য দিনের সহিত বর্ত্তমান; অগ্নিষ্টোমও একদিনে সমাপ্ত হয়।...এই আদিত্য কখনই অস্তমিত হন না, উদিতও হন না। যখন তাঁকে অস্তমিত মনে করা যায়, তখন তিনি সেই দেশে দিবসের অন্ত ক'রে আপনাকে বিপর্য্যস্ত করেন অর্থাৎ সেই পূর্ব্বদেশে রাত্রি করেন ও পরদেশে দিবস করেন। আবার যখন তাঁকে প্রাতঃকালে উদিত মনে করা যায়, তখন তিনি রাত্রিরই সেখানে অন্ত ক'রে আপনাকে বিপর্য্যস্ত করেন অর্থাৎ পূর্ব্বদেশে দিবস করেন ও পরদেশে রাত্রি করেন। এই আদিত্য কখনই

অস্তমিত হয় না। যে ইহা জানে সেও কখন অস্তমিত হয় না, পরন্তু আদিত্যের সাযুজ্য, সারূপ্য ও সালোক্য লাভ করে।"

[উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন শব্দ ঋগ্বেদে নেই, আছে ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে। দেবযান=দিব্যপথ, প্রাণের পথ, পিতৃযান=অন্ধকারের পথ, মৃত্যুর পথ। (ঐ. ব্রা ৩২শ অ. ১১ খ)। প্রায়শ্চিত্ত বিধিতে উক্ত হয়েছে যে আদিত্য হিরণ্যশুক্র (দীপ্তিযুক্ত) ও জ্যোতিস্বরূপ। প্রাতে অগ্নি উদ্ধারে রজত দিতে হয়, কারণ রজত রাত্রি স্বরূপ। ছায়া মিলিয়ে যাবার পূর্ব্বে, সূর্য্য থাকতে থাকতে, গার্হপত্য হ'তে অগ্নি উদ্ধার করা হত, কারণ অন্ধকার ও ছায়া মৃত্যুস্বরূপ। আদিত্যই সূর্য্যস্বরূপ]।

প্রাচীন বাবিলোনিয়ানরা ও চ্যালডিয়ানরা ও অপরাপর প্রাচীন জাতিরা এই হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাছে ঋণী, কিন্তু তাঁরা জড়বিজ্ঞানভাগই গ্রহণ করেছিলেন, হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যে রহস্যবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হত তা গ্রহণে সমর্থ হন নি। যাই হোক্, চীনই প্রথমে ভারত হ'তে এই বিদ্যা লাভ করে, পণ্ডিত ওয়েবার সাহেবের মতেও তাই। ক্রান্তিবৃত্তের বিভাগ, চান্দ্র দৈনিক গতি হিসাবে গণনা, রাশিচক্রের বিভাগ, সবই প্রথমে আর্য্যেরা আবিষ্কার করেন। বাবিলোনের বিভাগ প্রণালী ছিল সূর্য্যের গতি হিসাবে। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি, যজ্ঞ, যজমান ও বেদি প্রভৃতি সবই ছিল এক সূত্রে গ্রথিত! ইহাই রহস্যবিজ্ঞান। যজ্ঞের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। এই হ'তে ফলিত জ্যোতিষের (astrologyর) উদ্ভব হয়।

[খোলো বিজ্ঞান প্রমাণ করেন যে পৃথিবী আপন অক্ষে ঘুরে আসে ২৩ ঘণ্টা. ৫৬ মিনিট (সূর্য্য) সময়ে, নাক্ষত্রিক গতি ঠিক্ রাখবার জন্য করা হয় তাকে ২৪ ঘণ্টা, ইহার নাম Sidereal time, তিথি গণনা, চান্দ্র বিভাগ, ২৭টি নক্ষত্রের হিসাবই ছিল আর্য্যের নাক্ষত্রিক আবর্ত্তনকাল (mean Sidereal revolution)]।

সর্ব্ব বস্তুকে, সর্ব্ব কর্ম্মকে 'ঈশাবাস্যং' (deify) করেছেন আর্য্য। শ্রুতিতে আদিত্যকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়েছে। তাই দেখতে পাই,—যজ্ঞানুষ্ঠানে যিনি আদিত্যকে কখন উদিত বা অস্তমিত মনে করেন না, তিনি আদিত্যের স্বরূপ জানতে পারেন—বলা হয়েছে। খোলো অধ্যাপক ডয়সন বলেন যে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড বিপরীত ধর্ম্মী—('antagonistic') ছিল। বিপরীত ধর্ম্মী এই হিসাবে যে ক্ষেত্রানুসারে সাধনার রীতির

প্রভেদ ছিল—শত্রুতা ছিল না। সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী সাধক ও সাধনরত মহাকর্ম্মী সাধকের মধ্যে যে 'ভাবনার' পার্থক্য থাকবে সর্ব্বকালে, ইহা নিশ্চয়। ভাবতে অনুষ্ঠান মানে ঐ জ্ঞানকাণ্ডকে রূপ দেওয়া, যাতে জীবন—আদর্শ বাস্তব জীবনে পরিণত হয়। আদর্শ সামনে রেখে উঠতে হয় সর্ব্বপ্রকার সাধককে। রহস্যবিজ্ঞানের আর একরূপ দেখিয়েছেন ঐ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ অন্যস্থলে—স্বর্গ আরোহণ ও স্বর্গ হ'তে অবরোহণের অর্থ প্রকাশ করেছেন। স্বর্গ আরোহণের জন্য 'দুরোহণ মন্ত্র' পাঠ করতে হয়।

[হংসবতী ঋকই দুরোহণ মন্ত্র। আদিত্য ঐ ঋকের স্বরূপ। গায়ত্রীর পরই বেদে হংসবতী ঋকের মর্য্যাদা। (হংসবতী ঋক্—ঋগ্বেদ ৪ম।৪।৪০ সূক্তের ৫ম ঋক্ ও যজুর্ব্বেদে ১০।২৪, ১২।২৪)। হংসবতী ঋক, কঠ ২ব. ২।৩এ আছে। সেখানে অতিথি=সোম, দুরোণসৎ=কলসেস্থিত।) মন্ত্রটি "হংসঃ শুচিসদ্বসু...দুরোণসৎ।..ঋতং বৃহৎ॥" বৃহৎ শব্দটি ঋগ্বেদের সকল শাখায় নেই। সায়ন উক্ত ঋকের মর্ম্মার্থ দিয়েছেন মাত্র। হংস=আদিত্য, বসু=সর্ব্বসঞ্চারী, শুচি=শুদ্ধ, সৎ=অস্তি বা নিত্য বিদ্যমান, দুরোণ=গৃহ, নৃসৎ=মানবে (নরে) চৈতন্য রূপে প্রতিভাত, বরসৎ=বরণীয় আদিত্য মণ্ডল। তন্ত্রে, হংস=শিবশক্তি]।

অর্থাৎ 'আদিত্য নিত্য শুদ্ধ, সর্ব্বসঞ্চারী, সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান, সর্ব্বহৃদয়েও বিদ্যমান, মানবের মধ্যে চৈতন্যরূপে দৃষ্ট হন; তিনি গৃহাগ্নি—জীবাত্মা ও ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রতিভাত, সত্যচিন্তায় বা যজ্ঞে তাঁর অবস্থান, তিনিই অপমধ্যস্থ তেজ ('অব্জা'), প্রস্তর বা রশ্মির মধ্যে তিনি অগ্নি ('গোজা'), তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি মেরু পর্ব্বত হ'তে উদিত ('অদ্রিজা'), তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ('বৃহৎ') '। দুরোহণ, এই জন্য যে আদিত্য তাপ দেন, দুরোহ=তাঁর স্থানে আরোহণ দুঃসাধ্য অথবা, যদি কেহ সেখানে যান, তিনি দুরোহণ স্থানে আরোহণ করেন। 'স্বর্গকামী তার্ক্ষ্যসূক্তে, (ঋ. ১০ম। ১৭৮ সূঃ) দুরোহণ মন্ত্র পাঠ করবেন। গায়ত্রী যখন সোম আহরণ করেন, তখন তার্ক্ষ্য (গরুড) অগ্রণী হ'য়ে পথ দেখিয়েছিলেন।' তার্ক্ষ্যসূক্তও সেইরূপ পথ প্রদর্শক। যিনি পবমান (বায়ু) তিনিই তার্ক্ষ্য, ইনিই স্বর্গলোক আরোহণ করান। ··দুরোহণ পাঠ করা দরকার, কারণ স্বর্গলোকই দুরোহণ ও বাক্যই 'আহাব' (হোতা কর্তৃক বিশেষ মন্ত্র দ্বারা অধ্বর্য্যুকে আহ্বান মন্ত্র) '।

এই ভূরোহণ মন্ত্র পাঠের দুই ক্রম—আরোহ ও অবরোহ, আরোহ ক্রমে, ভূলোক হ'তে স্বর্গারোহণ ও অবরোহ ক্রমে স্বর্গ হ'তে ভূমিতে অবতরণ হয়। অন্যত্র (২২শ অঃ, ২য় খ ৫ম প) উক্ত হয়েছে যে প্রজাপতি 'সিমা' মহানাম্নী ঋক্‌সমূহকে ঋগ্বেদ সংহিতার সীমা ছাড়িয়ে ব্রাহ্মণের আরণ্যক মধ্যে স্থাপন করেছিলেন। সকাম সাধককেও লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হতে হত। পথের বিভিন্নতা antagonistic হয় না। সকল পথই গন্তব্য স্থানে মিলিত হয়েছে।

["আদিতি দেবমাতা অদীনা, অদিতি দাক্ষায়নী, অদিতি অগ্নি, অদিতি দৌ আকাশ।" অন্যত্র, "ঐশী শক্তিই অদিতি, ইনিই জগজ্জননী, অতএব সমস্ত দৃশ্য পদার্থই আদিত্য—অর্থাৎ অদিতি হ'তে জাত, তন্মধ্যে সূর্য্যই প্রধান, এ হেতু আদিত্য শব্দটি সূর্য্যতেই যোগারূঢ়, আর, কশ্যপ অর্থে ঈশ্বর, 'যঃ সর্ব্বং পশ্যতি' (তৈত্তিরীয় আরণ্যক), এই জন্য কশ্যপ প্রজাপতির পত্নী অদিতি। দেবতারা অদিতির কাছে উপদিষ্ট হ'য়ে এই ভূমিতেই যজ্ঞ বিস্তার করেছিলেন। এই ভূমিই অতএব অদিতি। অদিতি সম্বন্ধে নিরুক্ত:(৪।৪২, ১১।৩।২—ত্রিবেদী)"। এ স্থলে সমগ্র ধরাকে অদিতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ঐ ব্রাহ্মণের অন্যত্র বলা হয়েছে যে দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ ও ভূলোক অভিন্ন ভাবে চিন্তনীয়। ভূলোকের যজ্ঞভূমিই চন্দ্রে স্থাপিত (কলঙ্ক)]।

বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত এই রহস্যবিজ্ঞান—অনুষ্ঠানমূলক যজ্ঞবিদ্যাও—অদিতি বা নারীশক্তির দ্বারাই ভারতে প্রথম প্রচারিত হয়, যেমন উমা হৈমবতীর দ্বারা দেবলোকে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার হয়। ভৌগলিক ভূসংস্থান বিশেষের ওপর ধোলো Patriotism স্থাপিত, ভারতে, সমগ্র ধরাকে 'অদিতি' বলা হয়েছে—ভূমিই অদিতি। আর, চন্দ্রের কলঙ্কের কারণ একটি পৌরাণিক আখ্যান নয়, ইহার কারণ এই যজ্ঞবিদ্যা। এই রহস্যবিজ্ঞান শাস্ত্রাদিতে বিশেষভাবে রক্ষিত, পুরাণে ছড়িয়ে আছে, চণ্ডীতে—এমন কি অনেক স্তবস্তুতিতেও—এই রহস্যবিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

সূর্য্যের জগৎ প্রকাশক শক্তির নাম ভর্গ। ভর্গই আদিত্যাত্মক। তিনবার প্রণব উচ্চারণে—ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ব্যাহৃতির উপদেশই গায়ত্রী। সাবিত্রী, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আদি ও অন্তে প্রণব দিতে হয় (বন্ধন)। সাবিত্রীর দ্বারা জ্ঞেয় ঐ ব্যাহৃতিত্রয়ে ত্রিলোক বোঝায়। সবিতা=

সর্ব্বভূতের ও সর্ব্বভাবের প্রসূতি—সমস্ত পবিত্র করেন বলেই সবিতা। ভর্গ দেব, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী আদিত্য দেবতাস্বরূপ পুরুষ। ত্রিলোকের সবই সূর্য্যের পরিণাম। তপোজ্ঞান সমুদ্ভব অদিতির গর্ভে জন্ম নিয়ে ভর্গ, দ্বাদশ অংশে বিভক্ত হন। এই তেজোমণ্ডলের উল্ব (ভ্রূণ বেষ্টিত সূক্ষ্ম চর্ম্মবিশেষ) হ'তে উত্থিত হয় 'মেরু' প্রভৃতি। (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য দ্রঃ)। এখানে আরো বলা যায় যে, নভোমণ্ডলের যে তেজ বা জ্যোতি হ'তে কত শত সূর্য্যের উদ্ভব হয়, সেই 'বিস্তার-সূর্য্যই' বিশ্বরূপে পরিণত অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের সবই সূর্য্যের পরিণাম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন যে, অদিতির অন্য নাম 'পথ্যা'। 'পথ্যা' যজ্ঞের জন্য অদিতি পূর্ব্বে উদিত হন ও পশ্চিমে অস্ত যান—আদিত্য পথ্যারই অনুসরণ করেন। সাবিত্রী, সবিতার কন্যা। প্রজাপতি স্নেহবশতঃ তাঁকে আপন দুহিতা মনে করতেন। যজ্ঞকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে—সম্বৎসর সত্র সমুদ্রস্বরূপ। 'মেরু'কে পর্ব্বত বলা হয়েছে। মেরু পর্ব্বতই সপ্ত আদিত্যের স্থান (তৈত্তরীয় আরণ্যক, ১।৭।১); অষ্টম আদিত্য কশ্যপ কখন মহামেরু ত্যাগ করেন না। সমুদ্র মন্থনকালে এই মেরুপর্ব্বত আশ্রয় করেই মন্থনকার্য্য হয়েছিল। এই মেরুকে বেষ্টন ক'রে কতকগুলি 'অপ' বা সমুদ্রের স্তর আছে। অনুরূপ বর্ণনা বৌদ্ধ মহাযান সৃষ্টিতত্ত্বেও দেখা যায়।

["Esoterically explained, Mt Meru (Tib, Ri-rab), the Central mountain of Hindu and Buddhist cosmography, round which our cosmos is disposed in seven concentric circles of oceans separated by seven intervening concentric circles of golden mountains, is the universal hub, the support of all the worlds. We may possibly regard it, like the Central Sun of Western astronomy, as the gravitational centre of the known universe"—Evans]।

বর্ত্তমান ধোলোর উন্নত জ্যোতির্বিজ্ঞানে (Astrophysicsএ) সৌরবায়ুর (atmosphere) বর্ণনার সঙ্গে এই বর্ণনা তুলনীয়। সূর্য্যের তলদেশ (surface) হ'তে বিচ্ছুরিত কিরণভাসিত স্থানের নাম Photosphere; তার উর্দ্ধে সৌরবায়ু, Solar atmosphere; Solar atmosphere হ'তে ক্রমশঃ নীচে এসে যেটি ঐ Photosphereএ মিশে গেছে—তাকে বলা হয়

Reversing layer (বিপরীত স্তর), কারণ, এখানে পার্থিব উপাদানের 'ধূম' (Vapours) বর্ত্তমান। এই reversing layerএর ঊর্দ্ধে বহুদূর বিস্তৃত পাতলা Chromosphere, Photosphereএর ঊর্দ্ধে বহু সহস্র মাইল ব্যাপী। Chromosphereএর ঊর্দ্ধে আরো বহু বহু দূর বিস্তৃত Corona। এই Coronaর আবরণ এত পাতলা যে একমাত্র সূর্য্যগ্রহণের সময় ইহার মণ্ডল দৃষ্ট হয়। এই বর্ণনা অবশ্য স্থূলের দিক দিয়ে।

সৌরজগতের কেন্দ্রই সূর্য্য। সূর্য্যই সৌরজগতের মধ্যবিন্দু (Central Sun)। 'আকৃষ্ট-শক্তি'তেই সৌরজগত ধৃত। পুং তড়িৎ (Positive Electricity) কে বেষ্টন ক'রে আছে স্ত্রী তড়িৎ; পুং তড়িতের জন্য ঘুরছে স্ত্রী তড়িৎ—পুং তড়িতই এখানে মধ্যবিন্দু, Central Sun; Newtonএর মাধ্যাকর্ষণ বলে যে, প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুকে আকর্ষণ করে, কিন্তু দেখা যায় প্রত্যেকটি Electron, অন্যান্য Electronকে দূরে রাখে—বিকর্ষণীর খেলা—'আকৃষ্ট শক্তির' আর এক দিক্। পরমাণু (atom) যুক্ত হ'য়ে আছে অণুতে (Moleculesএ), অণু আছে স্থূল অবয়বে (solid bodyতে), Electron ও তার ঘনকেন্দ্র বা অণুকেন্দ্র (nucleus) আছে পরমাণুতে, এই যুক্ত হ'য়ে থাকার কারণ Gravitation নয়; এই রকম ক'রে সব যায়গায় সকলকে গ্রথিত ক'রে, বন্ধন ক'রে রাখার, যে শক্তি, তার উৎপত্তিস্থান Electric-magnetic-forces, বৈদ্যুতিক চৌম্বক শক্তি। এই তত্ত্বটি বোঝালেন বৈজ্ঞানিক আইনষ্টিন। Gravitation বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সম্বন্ধে বলা হত যে, সেই শক্তির একই সময়ে একসঙ্গে ক্রিয়া হয় (spontaneous), কিন্তু সূর্য্যরশ্মির পৃথিবীতে আসতে সময় লাগে। Atom বা পরমাণুর মধ্যে পুং তড়িৎ ও স্ত্রী তড়িতের বেগই গতির বা রশ্মিতরঙ্গের কারণ—গতিশক্তি তাতে স্বতঃই বর্ত্তমান! আর্য্য এ যায়গায় বলবেন 'আকৃষ্ট শক্তিই' এখানে মধ্যবিন্দু—Central Sun; দূরে—বহু বহু দূরে—আকাশের একদিকে তারকার ঝাঁক আছে, সেগুলির গতি সবাইএর একই দিকে, তাদের আবর্ত্তন বা ঘূর্ণন ব্যাপারও একই রকম; ঐ ঝাঁক (open clusters) অসীম দূরপ্রসারী ছায়ামণ্ডলীর অন্তর্গত (sub-systems of galactic system)। ছায়াপথ গুলি অনিয়ন্ত্রিত (irregular) অথবা নিয়ন্ত্রিত (regular)—যে ভাবেই

দৃষ্ট হোক্, নিকটস্থ, তারকামণ্ডলীর কিরণে দুগ্ধসমুদ্রবৎ (milky way) দেখাক্ অথবা (gas) ধূমাবৃত থাকায় ধূমবৎ দেখাক্, ঐ জ্যোতিঃ সাগর হ'তেই কোটি কোটি সূর্য্যের জন্ম—ঐ প্রদীপ্ত জ্যোতির্ম্মণ্ডলই এখানে মধ্যবিন্দু—Central Sun—সেই জ্যোতির দীপ্তি যে কারণেই হোক্। আজ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছেন যে ছোট বড় দুরকম শ্রেণীর তরঙ্গের মধ্যে—আলোক ও অন্ধকার, এই দুয়ের মধ্যে—অন্ধকার মানে, 'যে ছোট আলোকতরঙ্গ আমাদের চক্ষু গ্রহণ করতে পারে না'। তা হ'লে আসলে জ্যোতিই বর্ত্তমান। ঐ জ্যোতির প্রবাহ যার মধ্য দিয়ে হয় তার নামই মেরু—বিশ্ব-কুণ্ডলিনীর পথ—আমাদের মেরুদণ্ড বা ব্রহ্মদণ্ড বা সুষুম্না—ব্রহ্মপথ। যে দিব্যজ্যোতির অনুসন্ধানে ভারতের ঋষিরা জীবন দিয়েছেন সেই জ্যোতিই মধ্যবিন্দু সমগ্র বিশ্বের—সব কিছুর। ভর্গশক্তি ও জীবের কুণ্ডলিনী একই সূত্রে গ্রথিত। শক্তির জ্যোতির্ম্ময়ত্ব আরো সূক্ষ্ম।

পূর্ব্বে বলেছি, যজ্ঞ হ'তেই ফলিত জ্যোতিষের (Astrologyর) উদ্ভব। এই ফলিত জ্যোতিষে পৃথিবী মধ্যবিন্দু—Central Sun, জীবকুল তার অন্তর্গত। জীবকুলের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ভোগ, বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত—এই পৃথিবীতেই নিয়ন্ত্রিত, তাই এই ধরাকে বিন্দু ক'রে দূর দূর গ্রহ নক্ষত্রাদির সম্বন্ধ বা প্রভাব নিরূপণ চেষ্টা ফলিত জ্যোতিষের—কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের দিক্ দিয়ে। কপার্নিকাশ ও গেলিলিওর পূর্ব্বে যেভাবে পৃথিবীকে মধ্যবিন্দু ধরা হত, ভারতের ফলিত জ্যোতিষের দৃষ্টিকোণ সেদিক্ দিয়ে নয়। ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে, ফলিত জ্যোতিষ এক অদৃশ্য শক্তির সন্ধান পেয়ে তাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ক'রে দেখিয়েছেন। অধ্যাত্মপ্রাণ ঐ গুলিকে, এক একটিকে, অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে দর্শন করেছেন।

গুপ্তবিদ্যার কথা

দেখা যায় যে দুটি প্রধান ভাব মানুষকে চালিয়ে এসেছে, একটি অদ্বৈতভাব, অপরটি পূরোমাত্রায় দ্বৈতভাব। একটি বহুকে অস্বীকার না ক'রেও, একমাত্র সত্তাকে স্বীকার করেছে, অপরটি, ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য ইত্যাদি দুটি ভাব অর্থাৎ দ্বন্দ্বের প্রত্যেকটির পৃথক অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা মেনে এসেছে। ভারত বরাবর প্রথম ভাবটি গ্রহণ করেছেন, অন্যত্র সকল

স্থানে অপরটি গৃহীত হয়েছে, তাই ভারতের ঠিক্ ভাব কেহই ঠিক ধরতে পারেন নি অধিকাংশ স্থলে, ধরতে গিয়ে তাই ভুল করেছেন, ভুল বুঝেছেন। যেখানে মন মুখ এক, সেখানে কি সাধনক্ষেত্রে, কি ব্যবহারিক জীবনে—অদ্বয় জ্ঞানকে যিনি যেভাবেই গ্রহণ করুন, যেমন অর্থই দেওয়া হোক্ তার, অদ্বয়তত্ত্ব ভারতের মজ্জাগত।

গুপ্তবিদ্যা বা রহস্য বিদ্যা মানে গুরুমুখী বিদ্যা ভারতে, পূর্ব্বে বলেছি। ভারতে গুপ্তবিদ্যা মানে, সাধারণ বুদ্ধির আচ্ছন্নকারী ও অগম্য কোন গোপন বিদ্যা (mystery) নয়। এই গুপ্তবিদ্যা ছিল সাধনগম্য অবশ্য, কিন্তু সাধনাভিলাষী প্রত্যেকের কাছে ঐ বিদ্যার গোপনীয়তা ছিল না। এখনও সন্ন্যাসজীবনে যে রকম ভাবনার দ্বারা জীবন গঠন করতে হয়, সে সমস্তই গৃহস্থের কাছে গোপন রাখা হয়। এই গোপন রাখার মানে লুকোচুরি নয়। সন্ন্যাসজীবন সন্ন্যাসরূপ সংস্কার গ্রহণ ভিন্ন হয় না অর্থাৎ সর্ব্বসংকল্প ত্যাগে প্রস্তুত যিনি, তিনিই ঐ সংস্কার গ্রহণের অধিকারী। গৃহস্থজীবনে সর্ব্বসংকল্প ত্যাগের দৃঢ়তা, নানা সংকল্প বিকল্পের মধ্যে বাস ক'রে অর্জ্জন করতে উদ্যোগী হলে গৃহস্থজীবনের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। নিষ্কাম সাধকের কথা বলা হচ্ছে না। বুঝতে হবে ব্যবহারিক জীবনে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর বিধি সর্ব্বক্ষেত্রে এক নয়। ইহা মানসিক গ্রহণ সামর্থ্যের কথা। ইষ্টমন্ত্রও প্রত্যেকের, অপরের কাছে গোপন রাখতে হয়, নতুবা ভাবের বিপর্য্যয়ে সাধকের মনকে বৃথা বিচলিত করা হতে পারে। এই রকম, ঐ কারণে ইষ্ট-সাধন প্রণালীও গোপন রাখা হয়। এই সমস্ত স্থলেই, ইহাও সত্য যে প্রত্যেকটির মূল তত্ত্ব কারোর কাছে গোপন রাখা হয় না। অদ্বয়বাদী ভারত কখন এ কথা বলেন না যে একমাত্র অমুক ভাবটি আশ্রয় না করলে মুক্তি নেই বা ধর্ম্মলাভ হয় না; কিন্তু এইটি বলেছেন দ্বৈতভাবাশ্রয়ী বিদেশী সকলে, অতএব সেখানকার গুপ্তবিদ্যার অর্থও হয়েছে অন্যরকম। সেখানে সাধারণ ধর্ম্মপ্রচার হয়েছে খোলাখুলিভাবে, কিন্তু মহাপুরুষের সাধনসম্ভূত অদ্বয়বাণীকে ঐ সব স্থানের ভাবানুযায়ী অর্থ দিতে গিয়ে বিকৃত ভাব ধারণ করায়, নানা ভাবের অর্থ দিয়ে animismএর মূল সংস্কারের সঙ্গে মিশে তাকে গোপন ক'রে 'রাখতে বাধ্য হয়েছে ঐ সব স্থান। এই গোপন রাখবার—লুকোচুরি ভাবের—অবশ্যম্ভাবী ফল, বীভৎসতা।

গুপ্তবিদ্যা ভারত হ'তেই অন্য দেশে যায়—ভারতই এ বিষয়ের গুরু ; কিন্তু মনে হয়, ঐ সব দেশ হ'তে যে সমস্ত ভাব ভারতে আসে, সে সব ক্ষেত্রে, যেখানে ঐ ভাবসংঘাত সম্প্রদায়বিশেষ বা লোকবিশেষ সহ্য করতে অর্থাৎ আত্মস্থ করতে পারেন নি, সেখানে এনেছে অধঃপতন। তা সত্বেও এ ক্ষেত্রে ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ।

Tibetan Book of the Dead এর গ্রন্থকার বলেন এবং তিব্বতীয় লামারা ও স্বীকার করেন যে, অতি প্রাচীন যুগ হ'তে রহস্য বিদ্যার রহস্যলিপি বা সংকেত (Symbolic Code) ছিল ও তার চল্ বরাবর চলে আসছে ভারতে ও তিব্বতে, চীনদেশে ও মঙ্গোলিয়ায় এখনও বর্ত্তমান। রহস্যবিদ্যা অনুসন্ধান রত ধোলো পণ্ডিতদের মতে, একটি গুপ্তভাষা হ'তে প্রাচীন ঈজিপ্ট ও মেক্সিকোর সাঙ্কেতিক লিখন প্রণালীর আংশিক উৎপত্তি হয়েছে। তাঁরা দেখিয়াছেন যে Pythagoras ও Orpheseusএর রহস্য শিক্ষা (Orphic lore) বিষয়ক জ্ঞান ও তার রীতি Plato প্রমুখ পণ্ডিতেরা সময়ে সময়ে প্রয়োগ করেছেন, যে, Celt ও Druid রাও ঐ রকম রীতি অনুসরণ করত, যে, বুদ্ধদেবের ও যিশুর গল্প গাথার (Sermons and parablesএর) মধ্যেও ঐ ভাব বর্ত্তমান। ধোলো প্রমাণ করেছেন যে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ অথবা Æsop's Fable আদি প্রাচ্য গল্প গাথা হ'তেই জাতকের সৃষ্টি ; খৃষ্টান জগতের গল্প গাথার সৃষ্টিও ঐ রূপে হয়। খৃষ্টানদের দ্বারা বুদ্ধদেবকে St. Josephut রূপে খাড়া করাতে প্রমাণ হয়, প্রাচ্যভাব ধোলোদের মধ্যে গিয়ে কোন্ আকার ধারণ করে।

["The apparent Romanist canonisation of the Buddha, under the medieval character of St Josephut is an additional instance of how things Eastern seem to have become things Western"—Evans]।

প্রাচ্যভাব ধোলো দেশে গিয়ে—বিশেষ যে সব স্থান ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসে নি, সেই সব স্থানে ভারতের ভাব গিয়ে—কি আকারে পরিণত হয়, তার বহু প্রমাণ ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন ও দেখাচ্ছেন। পুরাণের যমরাজের বর্ণনার সঙ্গে, মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 'বার্দো থোডেল' (বা 'শব-কথা'—Book of the Dead) ও ঈজিপ্টের

'শব-কথার' (Book of the Dead এর) সাদৃশ্য আছে বহু বিষয়ে। 'বোর্দো থোডলের' শেষ বিচারক, বানর মুখো (Monkey headed) 'শিঞ্জি' (Shinji), ঈজিপ্টের শেষ বিচারক বা ধর্ম্মরাজও বানর মুখো '(ape headed)' অথবা আইসিস্ (Isis) মুখো। এই সাদৃশ্য সত্বেও, সাক্ষাৎ ভাবে ভারত হ'তে গৃহীত বৌদ্ধ চিত্রে, ধর্ম্মরাজের হাতে আছে কর্ম্মরূপ দর্পণ, ঈজিপ্টে তা নেই। ইভান্স সাহেব স্পষ্ট বলেছেন যে ঐ রকম পশুমুখো ভাব বৌদ্ধদের মধ্যে আমদানি হয় ঐ দেশের প্রাচীন 'বুন' ধর্ম্মের প্রভাবে, তবু সেটা অপেক্ষাকৃত কম পশুস্মৃতি উদ্দীপক (less totemistic)। ভারতে, যমরাজের কথা ও নচিকেতার কাহিনী ভাবরাজ্যের ঊর্দ্ধে যাবার চেষ্টা করেছে, পরলোকের—রহস্যদ্বার খুলে দিয়েছে।

পরলোকতত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যা ও রহস্য বিদ্যা বা গুপ্তবিদ্যা, কিন্তু এই গুপ্তবিদ্যার অধিকারী একমাত্র নির্ভীক পুরুষ—মহবীর্য্যবান মহাবীর পুরুষ। এ গুপ্তবিদ্যার 'গুপ্ত' মানে লুকোচুরি নয়। ঈজিপ্ট আদি স্থানে না হয় রহস্যবিদ্যার প্রসার ছিল, কিন্তু সে সব স্থানে জীবনাদর্শ কোথায়? যা ক্বচিৎ ২।১ জনের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, তাঁদের প্রভাব ঐ সমাজে স্থায়ী ফল প্রসব করেনি কেন, জাতি তা গ্রহণ করেনি কেন, সমাজে কার্য্যকরী হয় নি কেন? এইখানে আসে animismএর কথা, যা পূর্ব্বে বলেছি অর্থাৎ গল্পের প্রথম অবস্থায় কোন প্রণালী না থাকলেও, মাত্র খেয়াল থাকলেও, পরে তাতে ভাব ও অর্থ সংযুক্ত হ'যে সেটিকে সজীব করে। ভাবকে ফুটিয়ে তুলে উপলব্ধি করার বা প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা না ক'রে, কেবল ভাব ও অর্থ নিয়ে থাকলে, বাহ্যেন্দ্রিয়েরই সজীবতা আসে, যার ফল ঐ সব দেশের জাতীয় জীবনে প্রত্যক্ষ। অন্তর্মুখীনতাই ভারতের নিজস্ব ভাব। ভারতে, বৈরাগ্যমুখী ভাবই প্রস্ফুটিত করে ঐ সবে। ভারত নিম্নসত্যকে যথাযথ স্থানে রেখে, উচ্চাদর্শের দ্বারা সকলের কল্যাণ চেষ্টা করেন—ভাব আবদ্ধ রাখেন না।

আমরা দেখেছি যে, খৃঃ পূঃ ৫৫০০ বর্ষে এক নতুন জাতি এসে ঈজিপ্টে সাঙ্কেতিক ভাষার প্রবর্ত্তন করে। ফারওয়াদের কথা ও পূর্ব্বে বলা হয়েছে। পারসীক ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়েছিল বেদ বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে—দ্বৈতসত্ত্বা অঙ্গীকার ক'রে৮৫ ইরাণীদের গ্রন্থেই স্বীকৃত যে তাঁরা আসেন 'আর্য্য-ব্রজ'

হ'তে। সর্ব্বস্থানেই ঐ পারসীক ধর্ম্মের দ্বৈতবাদ। ভারত হ'তে গল্প গাথা ও ধর্ম্ম মতবাদ যায় সর্ব্বত্র, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে, কিন্তু ঐ সব ভাব আবার ভারতে ফিরে আসে বিকৃত হ'য়ে। তাই দেখি, সকল স্থানে সর্ব্বপ্রথম একটা শুদ্ধ ভাব ছিল বলা হয়েছে। এই রকম দেখা যায়, ঈজিপ্টের প্রাচীনতম গল্পের মধ্যে ও ছিল প্রথম ভাল ভাব। এই গল্পটি আজ ব'লেই প্রবন্ধের উপসংহার করবো। গল্পটি কি আকারে ওখানে গৃহীত হয়, তা দেখতে পাবেন আপনারা।

প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগ হ'তে যে সব ধর্ম্ম বিশ্বাস ঈজিপ্টে রোম সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল, সেগুলির মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন আর সব চেয়ে জনসাধারণের প্রিয় ধর্ম্মাচরণ ছিল অসিরিস্ আইসিস্ ও হোরাসের (Osiris, Isis ও Horus,) পূজা। আইস্-তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে পণ্ডিতেরা তার মধ্যে রহস্য বিদ্যার সন্ধান পেয়েছেন। Isis রহস্য প্রথম জনসাধারণকে জানান খোলো দেশে, বিদুষী ম্যাডাম ব্লাভাডস্কি—থিওজোফিকাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। যাই হোক্, অসিরিস, আইসিস ও হোরাস ছিলেন পূর্ব্বে এক এক জন গ্রাম্য দেবতা। পরবর্ত্তী কালে সমস্ত ঈজিপ্টে তাঁরা পূজিত হন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে আইসিস্ সর্ব্বসাধারণের প্রিয় দেবতা থেকে যান। পণ্ডিতেরা বলেন যে ঈজিপ্টের ইতিহাসে হাজার হাজার বৎসর যাবৎ অসীরিয় মতবাদ, অসীরিয় গল্প আদির বহু পরিবর্ত্তন হয়েছে ও পূর্ব্বে গল্পের যে সমস্ত পবিত্র ভাব ছিল তার অধিকাংশ নষ্ট হয়ে যায় পরবর্ত্তী যুগে। এখন যে ভাবে গল্পটি রক্ষিত আছে, সেইটি আপনাদের জানাব। Sab সেব, ভূদেবতা ; নূৎ বা নাৎ দেবতা ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত হলেন। এই দুই দেবতার মিলনে যে ছেলে হল, নাম তার অসিরিস , আরো কয়েকটি সন্তান হল—আইসিস্, নেপ্‌থিস (Nepthys), সেট্ বা সুতেখ ('Set' or 'Sutekh')। ঈজিপ্টে বহুদিন যাবৎ সহোদরা সহোদরের বিবাহ প্রচলিত ছিল। অসিরিস বিবাহ করলেন আইসিস্‌কে, সেট করলেন নেপ্‌থিসকে। ফারওয়ারা যে কেবল বোনকেই বিবাহ করত তা নয়, তারা নিজের কন্যাকেও বিবাহ করত! কোনরকম বিবাহই অসিদ্ধ ছিল না তাদের কাছে। যে সমাজ-জীবনে বিবাহের আদর্শ কেবল ভোগমুখী, যে সামাজিক জীবনে পবিত্রতা নেই, সেখানে উচ্চভাব যে বিকৃত হবে তাতে আশ্চর্য্য কি ?

[বাইবেলের একটি উদাহরণ ঃ—"নূহবংশীয় লটের দুহিতাদ্বয় অপর পাত্রের অভাব দেখিয়া পিতাকেই মধুপানে মত্ত করিয়া গর্ভধারণ করিলেন।" (Genesis xix, ৩০—২৪)—ভারতে শক্তি পূজা—স্বামী সারদানন্দ।]

বর্ব্বর মানবে ঐরকম বিসদৃশ সম্মিলন আশ্চর্য্য নয়; শিক্ষার বিস্তার ও সভ্যতার প্রসারে ঐরূপ অপপ্রথা সমাজ হ'তে বিদূরিত হয়, কিন্তু ঈজিপ্ট ও ঈজিপ্টের ভাবানুসারী জাতিদের মধ্যে সমাজ জীবনের বীভৎসতা বহুকাল পর্য্যন্ত চলে এসেছিল। ও সব দেশে, সভ্যতার অর্থই ছিল অন্যরূপ।

যাই হোক্, অসিরিস হলেন রাজা, ঈজিপ্টের ভাগ্য বিধাতা। তিনি দেখলেন, দেশ দরিদ্র, জনসাধারণ অশিক্ষিত ও অসভ্য, দেশে কোন আইন প্রচলিত নেই। তিনি দেশে ঝগড়া দলাদলি মিটিয়ে শৃঙ্খলা আনলেন, সদাচারের প্রবর্ত্তন করলেন, আইন তৈরী করলেন। অসিরিসের যশে দেশ পূর্ণ হল, কিন্তু তাঁর প্রতিপত্তি দেখে সেটের হল ঈর্ষা। মন্ত্রশক্তি বলে কতকগুলি অশরীরী ভূতপ্রেত সেটের বশীভূত ছিল। অসিরিসের দেহের মাপে একটি সুন্দর মণিরত্ন খচিত সিন্দুক তৈরী হল। অসিরিস একদিন বৃহৎ ভোজ দিলেন। অসিরিসকে ফুসলে ঐ সিন্দুকে বসান হল, যেই সিন্দুকে প্রবেশ করা, তৎক্ষণাৎ সেট্ তার মুখ বন্ধ ক'রে ভূত প্রেতের সাহায্যে সিন্দুকটি উধাও ক'রে একেবারে নাইল নদীতে ফেলে দিলেন। আইসিস্ শোকে উন্মত্ত হ'য়ে নৌকা নিয়ে নাইল নদীময় খুঁজে স্বামীর দেহ উদ্ধার করলেন। সেট্ সেই দেহকে সকলের অজ্ঞাতে গ্রহণ ক'রে ১৪ খণ্ডে বিভক্ত করলেন ও ঈজিপ্টময় ছড়িয়ে দিলেন। শোকবিহ্বলা আইসিস্ আবার অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন। মৃত দেহের ১৩টি অংশ উদ্ধার হল, শেষ অংশ—অসিরিসের কামলিঙ্গ—মাছে খেয়ে ফেলেছিল, তাই সেটি পাওয়া গেল না। যেখানে যেখানে অসিরিসের দেহাংশ প'ড়েছিল, সেই সেই স্থানে আইসিস্ বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণ করালেন। দেশময় অসিরিসের পূজা প্রচারিত হল, রীতিমত পূজা চলতে লাগল। অসিরিসের মাথা (অন্যমতে, হৃদয়) পড়েছিল Abydos, এবাইডস নগরে। সেই নগর পরে হয়ে যায় শ্রেষ্ঠ তীর্থ। হোরাস্ (Horus = আইসিস—অসিরিসের ছেলে) সেট্‌কে খুন করলে, ও 'তার অদ্ভুত যাদুবলে অসিরিস্ মৃত অবস্থা হ'তে পুনরুত্থান ক'রে পাতালের রাজা হলেন। এই হল

সংক্ষেপে অসিরিসের কথা। এ সম্বন্ধে শেষ দু'চারিটি কথা, প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যা বলেন, এইবার তা বলব। ঈজিপ্টের নগরে, প্রতি গ্রামে, ছিলেন এক একটি গ্রাম্য দেবতা। কালে, অসিরিসের সমস্ত গুণাবলীই ঐ ঐ গ্রাম্য দেবতায় আরোপিত হয়। এবাইডস্ নগরের গ্রাম্য দেবতা Sokar, সোকর হলেন Osiris-Sokar, অসিরিস সোকর; মেমফাইট দেবতা, Memphite Deity, অসিরিসের সঙ্গে মিশে হলেন অসিরিস্-এপিস, Osiris-Apis, তিনি আবার হয়ে উঠলেন গ্রীকদের সিরাপিস. Serapis। বহু পরে সূর্য্য দেবতা 'Ra' 'রার' সঙ্গে অসিরিস মিশে গেলেন।

[ফিনিসিয়ানদের প্রধান দেবতা Baal or vala, ব্যাল্ বা বলা = সূর্য্য। ঋগ্বেদের ঋভুর সঙ্গে Raর সাদৃশ্য ঐতিহাসিকেরা দেখেন, ঋভুর আর এক অর্থ সূর্য্যরশ্মি, বলের সন্ততি (তুলনীয় Vala) (ঋগ্বেদ ৪।১৮ ও ৪।৩৩-৩৭ দ্রঃ)]।

ঐ মেশামেশি ব্যাপারে হোরাস্ও বাদ্ গেলেন না, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন Horus-ra, হোরাস-রা অর্থাৎ মধ্যাহ্ন তপন; হেলিওপোলিসের পৌরহিত্যকালে তিনি নিজ নাম খুইয়ে হলেন Tum, তাম্ বা অস্তগামী সূর্য্য। আইসিস্ মিশলেন Thebes থিবস্ এর পশ্চিমাংশস্থিত দুই স্থানের প্রধান দেবতা হেথরের (Hathorএর) সঙ্গে, যে হেথর দেবতাকে বহুপরে গ্রীকরা Aphrodite এফ্রোডাইট্ দেবতার সঙ্গে এক করে ফেলে। আইসিসের পূজা এবাইডস্ ও বুসিরিসের আশে পাশে বিস্তৃত হয়েছিল। বহু পরে আইসিসের পূজা জনসাধারণের এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল যে যখন ঈজিপ্টবাসীদের জাতীয়ত্ব-বোধ লোপ পায় ও তাদের দেবতারাও গল্পের স্মৃতিরূপে পরিণত হয়, তখন পর্য্যন্ত রোমের মধ্যেই আইসিস্বাদীরা তিনটি বড় বড় মন্দির করেন। আইসিস্, অসিরিস, হোরাস্—এই ত্রিমূর্ত্তির ত্রিমূর্ত্তিবাদ ঈজিপ্টে থেকে যায়। এ ছাড়া (Amen) এমেন, মুং ও খরসু নামে ত্রিমূর্ত্তিও ছিল। পরে যখন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার হয়, খৃষ্টানরা ঐ ত্রিমূর্ত্তিবাদকে গ্রহণ করে; গোঁড়া খৃষ্টানদের মতে, ঈজিপ্টের ত্রিমূর্ত্তিবাদ খৃষ্টধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তিবাদে মিশে যাওয়ায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারটা খুব সহজ হয়। মৃত অসিরিসের পুনরুত্থান ও পরলোকে অশরীরীদের ওপর আধিপত্য প্রভৃতি কথার সঙ্গে ক্রীটরাজ মাইনসের (Cretan king Minosএর)

সাদৃশ্য বর্ত্তমান, আর, বাইবেলের সঙ্গে যে সাদৃশ্য আছে, তা বলা বাহুল্য। তাই ঈজিপ্টে আইসিসের (Virgin Mary) মেরিরূপে বা কুমারীরূপে পূজিত হওয়াটা কঠিন হয় নি।

["কারণ প্রিয় ভুজগ ভূষিত 'উক্ষ' দেব (Bachus) ও তচ্ছক্তি 'ঐশি' (Isis)" এর পূজা ইউরোপে প্রচলিত হয় ও বীভৎস রূপ ধারণ করে" (ভারতে শক্তি পূজা দ্রঃ) পূর্ব্বে বলা হয়েছে। কি ভয়াবহ কুৎসিৎ ব্যভিচারের তরঙ্গ নানা দিকে আঘাত ক'রে নরনারীকে—সমস্ত জাতিকে—পশুরূপে পরিণত করেছিল ও নারীজাতির উপর কি অভূতপূর্ব্ব অত্যাচার হয়েছিল তা বর্ণনা করবার প্রবৃত্তি নেই। যাঁরা সংক্ষেপে প্রমাণ চান তাঁরা The Origin of the Cross by Swami Satyananda গ্রন্থটি পড়বেন]।

সেট্ পাপ দেবতারূপে গণ্য হন। পূর্ব্বে ফারওয়াদের নামের সঙ্গে যেমন অনেকের হোরাস নামটি যুক্ত হত, তেমনি আবার অনেকের নামের সঙ্গে সেট্ নামও যুক্ত থাকত। অসিরিসকে হত্যা করবার পর নেপ্‌থিস ও আইসিস্ একযোগে মৃতদেহের অনুসন্ধান করেন ও নেপ্‌থিস সেটকে ত্যাগ করেন।

[ঈজিপ্টের Luxar সহরে অসিরিসের প্রস্তর মূর্ত্তির মধ্যে দুটি Papyrus পত্রে আইসিস্ গাথা আবিষ্কার করেন পণ্ডিত M Passalaqua.]।

ঈজিপ্সিয়ানরা সঙ্গীতপ্রিয় ছিল। প্লেটো বলেছেন যে গ্রীক্ সঙ্গীতের চেয়ে ঈজিপ্সিয়ান সঙ্গিতের সুর-শক্তি অনেক বেশী; গানে, বাক্য ও বাক্যার্থই ছিল প্রধান, সুর বা সুরশক্তির প্রয়োগ ছিল গৌণ। ভারতে গান মানে, বাক্য ও বাক্যার্থের সূক্ষ্মশক্তির প্রয়োগ বা ঐ সূক্ষ্মশক্তির বিকাশ দেখান। এখানেও আদর্শের পার্থক্য।

প্রতিনিধির মধ্য দিয়ে দেবতার উপাসনা হত, যথা, হোরাসের প্রতিনিধি বাজ-পাখী—মন্দির এডফিউ নগরে, সেবেকের ছিল, কুমীর বা মকর—মন্দির ক্রকোডিলোপলিসে, হেথরের, ষাঁড়, এপিসের গরু এই রকম সব।

আইসিস্-আসিরিস কথা ও সতীর দেহত্যাগের বর্ণনায় কতক সাদৃশ্য আছে। সতীর দেহত্যাগ হল; উন্মত্তভাবে শিব সতীদেহ স্কন্ধে নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন, দেহ বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হ'য়ে ভারতের সর্ব্বত্র পড়ল—সেই সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ হল। এখানে দেহত্যাগ করলেন সতী, ওখানে

কবলেন অসিবিস। এখানে নাবী, ওখানে পুরুষ, এখানে উন্মাদভাবে ঘুবলেন শিব, ওখানে আইসিস। এখানে সতীদেহ টুকবো টুকবো হ'যে ভাবতময় ছড়িযে পড়ল, ওখানে অসিবিসেব দেহ টুকবো টুকবো হ'য়ে ঈজিপ্টময় ছড়ালো—তীর্থে পবিণত হল, প্রত্যেক স্থানটি। অবশ্য আদর্শেব পার্থক্য—আকাশ পাতাল। সতীব দেহত্যাগেব পবেব ঘটনা—মদনভস্ম; আইসিস, অসিবিসেব কামলিঙ্গ খুজে পেলেন না। তীর্থেব সংখ্যাও এক নয়। অসিবিসেব মাথায় আছে শিবেব মত জটা ও সাপ, আর, হেথব-অসিবিসেব আছে ষাঁড। এ দুই স্থানেব বিবাহাদর্শে পার্থক্য পবিষ্কাব। আইসিসের প্রভাব ঈজিপ্ট হ'তে ধোলো দেশে ছড়ায়, আইসিস্ বহুকাল পর্য্যন্ত ওসব দেশে দেবীরূপে পূজা পেয়ে এসেছেন; সতী-চবিত্র ভাবতময় পবিব্যাপ্ত হযে জাতিব মধ্যে ঐ আদর্শানুরূপ বহু চবিত্র ববাবব সৃষ্টি কবেছে। সতী ভাবতীয় নাবীকুলেব আজও আদর্শ—পবিত্রতাব প্রতীক, বিশ্বজননী। ওখানে পূজা চলত প্রতিনিধিব দ্বাবা, এখানে প্রতীকোপাসনা।

[আমবা দেখেছি, Isis Osiris বাদের ত্রিতত্ব খৃষ্টানের কাছে আদৃত হয়, ঈজিপ্টের ঐ বাদে পুনর্জন্মবাদ ও ছিল। Gnostic খৃষ্টানদের মধ্যে রহস্য বিদ্যা ও সঙ্কেত লিপির প্রসার খুব ছিল; তাদের এই গুপ্ত বিদ্যার নাম ছিল Esoteric Christianity, যখন খৃষ্টাব্দ ৫৫৩ বর্ষে (A. D 553), খৃষ্টান সঙ্গীতি (Second Council of Constantinople) আহুত হয়, তখন সেই সঙ্গীতিতে Gnostic দের অভিশপ্ত জীবের মত ত্যাগ করতে আদেশ করা হয়, কাবণ Gnostic বা প্রাচ্যের উন্মত্ত প্রলাপে বিশ্বাসী। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে খৃষ্টান মঠ ও সন্ন্যাসীর সৃষ্টি হয়। য়াহুদিরা সন্ন্যাস ধর্ম্ম ঘৃণা করত। ঐ মঠে কিছু যোগ বিদ্যারও প্রচলন ছিল। সন্ন্যাস জীবন ও যোগবিদ্যা বরাবব আছে ভারতে, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে, আর আছে চীনদেশের 'তাও' বাদে। এই সব সূত্র হ'তেই নব্য খৃষ্টানরা ভাব পান। তিব্বতে যোগবিদ্যা নিয়ে যান ভারতের অতিশা, খৃষ্টীয় ১১ শতকেব শেষ ভাগে; তাঁর-দুই তিব্বতী শিষ্যের দ্বারা তিনি ঐ বিদ্যাব সঙ্গে 'মহামুদ্রা' শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। পরে ভারতের অসঙ্গ ঐ বিদ্যার আরো প্রসার করেন তিব্বতে। প্রোটাস্টান্ট ধর্ম্ম মতের অভ্যুদয়ে, উক্ত সমস্ত সম্প্রদায় খৃষ্টান ধর্ম্ম হ তে বহিষ্কৃত হয়।

কথিত আছে আইসিস, চরকা ও তাঁত প্রচলন করেন। পরবর্ত্তী যুগে, আইসিসের মাথায় দুটি শিঙ্ দেখা যায়। গাভী ছিল তাঁর কাছে পবিত্র। মিল্টন তাঁর Paradise

Lost কাব্যে, আইসিস্, অসিরিস ও ওরাসকে (Isis, Osiris, Orus) স্বর্গ ভ্রষ্ট দেবতা বলেছেন। চন্দ্রের বা গ্রহের উদয় ও উষাকালকে আইসিস্ বলা হত। চন্দ্রের ক্ষয়, গ্রহের অস্তগমন, সূর্য্যাস্ত, সন্ধ্যা—এই সমস্তকে অসিরিস বলা হত। আইসিস পুত্র হোরাস = সূর্য্যোদয় কাল, রা = মধ্যাহ্নকাল। এক সময়ে Isis ছিলেন Paris এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গ্রীক্ Para Isidos (বা আইসিস্ মন্দির) কথা হ'তেই Paris নামটা এসেছে। St Germain des Pros গির্জ্জায় বহুকাল যাবৎ আইসিসের মূর্ত্তি রক্ষিত ছিল, Cardinal Briçonuet তাকে Virgin Mary রূপে পূজিত হ'তে দেখে ভেঙ্গে দেন।]

আইসিস্-অসিরিসের গল্পটি ভিন্ন নামে Mexico ও Central America তে পাওয়া গেছে। Le Plongeon সাহেব দেখিয়েছেন যে প্রাচীন Mayan Civilisation যুগের ধ্বংসাবশিষ্ট নগরগুলির মধ্যে দুটি মন্দিরে পাথরে খোদাই করা যে গল্প পাওয়া যায়, সেই গল্পটি হুবহু ঈজিপ্টের গল্পের সঙ্গে—খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত—আগাগোড়া মিলে যায় অনেকাংশে। কাল নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে গল্পটি অন্ততঃ খৃঃ পূঃ দশ হাজার বর্ষ পূর্ব্বের। তখন ছিল ঈজিপ্টে বাদরিয়ান বংশ (Badarian Dynasty)। পণ্ডিতেরা বলেন, আইসিস্-অসিরিস্ গল্পে একটা পবিত্রভাব প্রথমে ছিল। মেক্সিকো আদি স্থানে, ঈজিপ্টে ও ভারতে একই ভাবের গল্প আসে কোথা হ'তে? সতী-চরিত্র আদর্শ সমাজ-চিত্রের কাহিনী। যদি বলা হয় ভারত হ'তেই সতীর আখ্যান মেক্সিকোতে সঞ্চারিত হয়, কিন্তু ঐ সব স্থানের অপরিণত সমাজ আখ্যানটিকে ঠিক্‌ভাবে গ্রহণ করতে না পারায় বিকৃত করেছে, তা হলে স্বীকার করতে হয় ভারতীয় আখ্যানটি খৃঃ পূঃ ১০ হাজারের বহু পূর্ব্বের ঘটনা। পক্ষান্তরে, যদি বলা হয় যে মেক্সিকো আদি স্থানের গল্পই আর্য্যের মধ্যে সঞ্চরিত হয়েছিল, তা হলে, এমন কোন প্রমাণই নেই যাতে মনে হ'তে পারে যে ঐ দেশ হ'তে আগত গল্পটির উপর একটি বড় আদর্শ—ধ্যানচিত্ত বা একাত্মবোধের আদর্শ—ভারতে কল্পিত হয়ে সতীচরিত্র গঠিত হয়েছে, বিদেশাগত কাহিনীর পূর্ব্ব গল্পাদর্শের চিহ্নমাত্রও ভারতে নেই। ওসব স্থানে, গল্পটি গুপ্তবিদ্যায় পরিণত হয় ও পরে লোপ পায়; আর, সতীচরিত্র হিন্দু সমাজ-বিজ্ঞানের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ হয়ে আজও বর্ত্তমান।

বৈশেষিক দর্শন প্রসঙ্গ

আপনারা বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। তন্ত্র সাধককে, আসনে ব'সে শ্রীগুরুর মানসপূজাকালে, তাঁকে পঞ্চভূত সমর্পণ করতে হয়। এই সমর্পণ ব্যাপারটি কি বুঝাতে হলে বৈশেষিক দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝবার চেষ্টা করলে সুবিধাই হবে বোঝবার।

যাতে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ বিশেষ গুণ আছে তার নাম 'ভূত'। ভূত পাঁচটি—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। ক্ষিতির লক্ষণ (গুণ)—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। এই পাঁচটি গুণ যাতে বর্ত্তমান তার নাম ক্ষিতি। সেইরকম, অপ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস—এই চারি গুণযুক্ত। 'অপ' এ গন্ধ নেই। তেজ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ—এই ত্রিগুণযুক্ত—গন্ধ ও রস নেই। মরুৎ—শব্দ, স্পর্শ—এই দুইগুণযুক্ত—গন্ধ, রস ও রূপ নেই। ব্যোম—শব্দগুণযুক্ত মাত্র—স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ নেই। অপ, রস প্রধান; মরুৎ বা বায়ু, স্পর্শ প্রধান, ব্যোম বা আকাশ, শব্দগুণযুক্ত। ক্ষিতি, গন্ধ প্রধান—অর্থাৎ গন্ধ গুণ অন্যে নেই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ মানে, দৃশ্যমান সমস্তই বোঝায়। ক্ষিতি গন্ধপ্রধান বলেই, গন্ধশক্তিই আকার প্রদানের প্রধান কারণ। ক্ষিতিকে পৃথ্বীও বলা হয়। ক্ষিতি মানে মাটী নয়—ওটি স্থূল। ঐ রকম অপ, বাঙ্গালা ভাষার জল নয়—জলটি স্থূল। তেজ, আগুন নয়—সেটি স্থূল প্রকাশ। মরুৎ বা বায়ু—বাতাস নয়—বাতাস স্থূল। ঐগুলির সূক্ষ্মাবস্থার নাম তন্মাত্রা (তৎ-মাত্রা)—তার সংজ্ঞা বা পরিচয়। সাংখ্য মতে, যে উপাদানে মন গঠিত হয়েছে তারির স্থূল অবস্থাই তন্মাত্রা, আর তন্মাত্রার স্থূলই ভূতাদি পরিদৃশ্যমান অবয়ব।

বৈশেষিক দর্শন বলেন, পরমাণু নিরবয়ব—শক্তিবিশেষ। ঐ অবস্থায়, পঞ্চভূত, বহিরিন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মশক্তি গ্রাহ্য—পঞ্চমহাভূত। পূর্ব্বে বলেছি, উক্ত দর্শনে আত্মা, পরমাত্মা, জীবজগৎ ও ঐ সবের সম্বন্ধ আলোচিত হয় নি। বেদকে প্রামাণ্য মেনে নিয়ে বলছেন "যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্ম"—যার দ্বারা অভ্যুদয় লাভ হয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিলাভ হয়, তার নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্ম শব্দের এই অর্থ সর্ব্ববাদিসম্মত। নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি মানে, যার দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয় বা মোক্ষ আসে। ঐ দর্শন মতে, 'দ্রব্য' নয়প্রকার—পঞ্চভূত, দিক্, কাল, মন, আত্মা। সাংখ্য মতে, জ্ঞান

সহায়ে উপলব্ধিগম্য "আত্মা" বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় না। দ্রব্যের দ্বিবিধ শ্রেণী—নিত্য ও অনিত্য। ক্ষিতি, অপ, তেজ—অনিত্য, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা—নিত্য। পরমাণু নিত্য—অনিত্য নয়। 'পদার্থ' ৬টি—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়। বিচারের সুবিধার জন্য ভাব বা অভাবকে অতিরিক্ত 'পদার্থ' বলে স্বীকার করলে হয় ৭টি। যাতে গুণের অত্যন্তাভাব না থাকে বা দ্রব্যত্ব জাতি থাকে তার নাম 'দ্রব্য' পদার্থ। 'সামান্য' মানে জাতি—ব্যাপকভাব—গুণবৃত্তি নয়। সেই সামান্য জাতিই দ্রব্যত্ব। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই তিনটিই—সৎ অর্থাৎ বর্ত্তমান। সৎ হলেও, পরিবর্ত্তনশীল ও বিনাশী—অনিত্য ও দ্রব্যাশ্রিত। যা দ্রব্যগুণ ও কর্ম্মে সমভাবে বর্ত্তমান তার নাম 'সত্তা'—"সদিতি যতো দ্রব্যগুণকর্ম্মসু সা সত্তা।" সত্তা—সামান্য, ইহা অপেক্ষা ব্যাপক জাতি আর কিছু নেই, ইহা কখন 'বিশেষ' হয় না। "সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম।"—সামান্য ও বিশেষ—বুদ্ধিসাপেক্ষ। বুদ্ধি যেখানে গিয়ে নিরস্ত হয় আর এগুতে চায় না তার নাম 'বিশেষ'। এইরকম সর্ব্বক্ষেত্রে বুঝতে হবে। সত্তা-সামান্য বা জাতি ব্যাপক হলেও গুণবৃত্তি বিধায় দ্রব্যত্ব নয়। যাতে গন্ধের অত্যন্তাভাব নেই, যাতে ক্ষিতিত্বজাতি বর্ত্তমান, তাহাই পৃথ্বী বা পৃথিবী। পৃথিবী দুইপ্রকার—নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুই নিত্য পৃথিবী বা ক্ষিতি। যার উৎপত্তি বা বিনাশ হয় না, যা স্বতঃসিদ্ধ তাকেই পরমাণু বলা যায়। তা ছাড়া অপর সমস্ত ক্ষিতিই অনিত্য। অনিত্য ক্ষিতি তিন প্রকার—শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়। শরীর ভোগায়তন, ইন্দ্রিয় ভোগকরণ। গন্ধানুভূতি হয় বলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, পার্থিব। ইন্দ্রিয় মাত্রই এক একটি গুণের অভিব্যঞ্জক। Chlorine gas বা তা অপেক্ষা সূক্ষ্ম গন্ধ বিশিষ্ট gas ও পার্থিব। স্নেহ গুণ বিশিষ্ট দ্রব্যই অপ। যে গুণ থাকায় গুণ্ডিকা পিণ্ডাকার প্রাপ্ত হয়, সেই বিশেষ গুণের নাম স্নেহ। অপ দুরকম—নিত্য ও অনিত্য। অপ পরমাণু নিত্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত অপ অনিত্য। অপ তিন প্রকার—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। বরুণলোকস্থ জীবের শরীর জলীয়। পার্থিব পরমাণুর মত, অপ পরমাণুও ইন্দ্রিয়ের তথা শরীরের আরম্ভক। রসনা জলীয় ইন্দ্রিয়। সেই রকম, রূপযুক্ত রসহীন দ্রব্যই তেজ। যে দ্রব্যে তেজস্ত্ব জাতি বর্ত্তমান তাহা তেজ।

তেজ ও দুইপ্রকার—নিত্য ও অনিত্য। পরমাণু-তেজ নিত্য; অবশিষ্ট সমস্ত তেজ অনিত্য। অনিত্য তেজ তিন প্রকাব—শবীব, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। ঐ তিনই অনিত্য। বায়ুলোকস্থ জীব-শবীব বায়বীয়। শবীব ও ইন্দ্রিয় ছাড়া সমস্ত 'বিষয়'। ঐ ভুত চতুষ্টয়েব পবস্পব কম বেশী সম্বন্ধ আছে। উহাবা জন্য-দ্রব্যেব আবম্ভক বা সমবাযী কাবণ। শব্দেব আশ্রয় দ্রব্যই আকাশ। সাধাবণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় যে শব্দোৎপত্তিব জন্য বায়ুব অপেক্ষা থাকলেও, বায়ু শব্দেব আশ্রয় নয়। বায়ুব বিশেষ গুণ স্পর্শ। যে পদার্থ যেখান হ'তে উৎপত্তি হয, সেই খানেই লীন হয।

[এই দর্শনে সমস্তই জাগতিক দৃষ্টি হ'তে বলা হয়েছে, সুতরাং নিত্য, অনিত্য প্রভৃতি কথাগুলি জগতের দিক্ হ'তেই নিত্য, অনিত্য—চিরস্থায়ী, ক্ষণিক ইত্যাদি। ধর্ম্ম বলতে কি বোঝায় তা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। মনুমতে ধর্ম্মেব ১০ লক্ষণ—সবগুলিই অভ্যুদয় সহায়ক। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ—এই ১০ লক্ষণ। ধী=নিঃসন্দেহ হওয়া, জ্ঞানলাভ কবা, বিদ্যা=সদসদ্ বিচার, আত্মজ্ঞান স্ফুবণ চেষ্টা, শৌচ=অন্তবেব পবিত্রতা ও বাহ্যশুচিতা, দম=মনকে নির্ব্বিকার কববার চেষ্টা, ধৃতি=মনকে এমনভাবে দৃঢ় ও স্থির রাখা যাতে কোন অবস্থাতেই ধৈর্য্য নষ্ট না হয়, প্রলোভনে বিচলিত না হয়, অস্তেয়=চৌর্য্যবৃত্তি হ'তে মনকে দূরে রাখা—মনের ফাঁকি হ'তে দূরে থাকা ইত্যাদি। বৌদ্ধ দশশীল ও বাইবেলের Ten Commandments, এই দশ লক্ষণেরই প্রতিধ্বনি। এই দশ ছাড়া, অহিংসাকেও ধর্ম্মের আর একটি লক্ষণ বলা হয়। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে পঞ্চভূতের কথা আছে, কোথাও 'অপ' মানে 'জল' বলা হয় নি। 'জলম্' শব্দ, 'অপ' এই অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায় কিন্তু সেখানে 'জলম্' অর্থে বাঙ্গালা ভাষার জল নয়। স্বামীজি কঠোব ভাষায় বলেছেন, "A silly man reads three letters of Sanskrit and translates a whole book. They translate the elements as air, fire, and so on; if they would go to the commentator they would find they do not mean air or anything of the sort —(Sankhya and Vedanta) অর্থাৎ 'তিন অক্ষব সংস্কৃত শিখে আহাম্মকেব মত পঞ্চভূতের অনুবাদ করে, বাতাস, আগুন ইত্যাদি, একবার টীকাও দেখে না'। ভূত=তত্ত্ব বা মূল উপাদান (element), যা বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় স্থিতির ব্যক্তাবস্থায়। প্রাচীন গ্রীকদের element ছিল Earth, Air, Fire Water, ভূমি বাতাস জল। সেই ধারণা অনুসারেই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বোঝবার চেষ্টা হয়।]

এই দর্শন প্রত্যক্ষ বস্তুর যে রকম বিভাগ করেছেন, তা আমরা দেখেছি। ঐ সব পরমাণু আর বিভক্ত করা যায় না। কিন্তু পরমাণুগুলির একটা স্বাতন্ত্র্য আছে যার জন্য এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর সঙ্গে পৃথক। এইটিই 'বিশেষ'। এই ষট্ পদার্থের সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান হ'লে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লব্ধব্য বিষয় যে মোক্ষ তা উদয় হয়। ইহাই 'ধর্ম্ম বিশেষ'।

আকাশ, কাল, দিক্—একেরই উপাধিভেদ। জ্যেষ্ঠত্ব, কনিষ্ঠত্ব ইত্যাদি ব্যবহার নির্ব্বাহক দ্রব্যই 'কাল'। দূরত্ব ও নৈকট্য, ব্যবহারের ও সুবিধার জন্য, ব্যবহারিক পূর্ব্ব পশ্চিম আদিই দিক্; ঘটাকাশ, পটাকাশ, শুধু উপাধি ভেদ। কালের ও ঐ রকম বহু ভেদ। ব্যাকরণ শাস্ত্র মতেও, শক্তির ক্রিয়াই কাল। মন, আত্মা—সূক্ষ্ম। বিষয় সন্নিকর্ষ থাকলেও, একটা বিশেষ বস্তুর সংযোগ না হলে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান হয় না। সেই বিশেষটির নাম মন। জ্ঞানের আশ্রয় দ্রব্যই আত্মা। এককালে একাধিক ইন্দ্রিয় একসঙ্গে যুক্ত হ'তে পারে না বা একাধিক ক্রিয়া ও একাধিক জ্ঞান একসঙ্গে, একই কালে হ'তে পারে না ব'লেই, মন পরম সূক্ষ্ম বা অণু পরিমাণ, অর্থাৎ মন মহৎ পরিমাণ বা বিভু নয়। মনের দ্রুত বা আশুসঞ্চারী ভাব বিচার ও বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে, যৌগপদ্য জ্ঞান বলে ভ্রম আসবে না।

পরমাণু ছাড়া সমস্তই সাবয়ব, সুতরাং উৎপত্তি ও বিনাশশীল। দুটি পরমাণু সংযোগে হয় দ্ব্যণুক, তিনটি সংযোগে ত্রসরেণু ইত্যাদি ক্রমে মহাবয়বী পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়। চার রকম পরমাণু ও আকাশাদি পঞ্চ দ্রব্য নিত্য, তা ছাড়া দ্ব্যণুক অবধি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ—এই চারটি মহাভূত অনিত্য।

আইনষ্টিন দেখাচ্ছেন যে (Mass), 'রাশি' ও Energy পরস্পর সমতুল্য (Equivalent to one another), 'রাশিকে' ধ্বংস করলে সেই পরিমাণ Energy পাওয়া যায়। এখন Atom আর পরমাণু নয়—Elctron কে বোলো পরমাণু বলা চলে। পূর্ব্বে বলেছি যে Atomকে সম্পূর্ণ ভেদ করতে পারে Electron-Atom শূন্যগর্ভ ব'লে। সব চেয়ে আশ্চর্য্য বস্তু হচ্ছে আলফা রশ্মি, যার মধ্যে আছে হিলিয়াম Atomএর কণিকাগুলি (particles), অর্থাৎ 'রাশি' চারটির ঘনকেন্দ্র ও দুটি পুংতড়িতাবেশ (positive

charge two) (তুলঃ—'বিটা', 'গামা', radio-active atom গুলির—ত্বরিৎগামী Electronএর—ঘনকেন্দ্র, (অণুকেন্দ্র) যাহা স্বতই ছুটে বাহির হয়)। এ পর্য্যন্ত দুটি রাশির Atom (Atoms of mass two) ও ঐ তিনটি 'রাশি' পরীক্ষাগারে ধৃত হয় নি। যাই হোক্, এই Electron সূর্য্যনক্ষত্রাদিতে ও সর্ব্বত্র রয়েছে। আমাদের সূর্য্যের চারিদিকে গ্রহাদি ঘুরছে; সেই রকম Electron গুলিও, পুং তড়িৎ বা অণুকেন্দ্রের মধ্যবিন্দু Protonএর (Positive chargeএর) চারিদিকে ঘুরছে! ইহা একটি ক্ষুদ্র জগৎ। নিউটনের জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) ছিল প্রথমটিকে নিয়ে, নব বিজ্ঞান উঠছে দ্বিতীয়টিকে নিয়ে, ইহারও জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) দরকার। অত্যধিক উত্তাপে (যেমন সূর্য্যের মধ্যে) Electron গুলি ছিন্ন হয়ে যায়, থাকে মাত্র পুংতড়িতাবেশ (positive charge); Electron গুলি ঐ দেহেই মিশে থাকে, তাপ অপেক্ষাকৃত শীতল হলেই আবার প্রকাশ পায়। এই প্রবাহের আদি নেই—থাকতে পারে না—ইহাই আজ জড-বিজ্ঞান বলছে। শক্তি রয়েছে, চিরন্তন সে শক্তি, মাত্র প্রকাশ জন্য সে আর একটার অপেক্ষা রাখে। ইহাই বিশ্ব, আজ আইনষ্টিন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করছেন।

শক্তি অনাদি, সুতরাং সৃষ্টি ও কর্ম্ম অনাদি। পূর্ব্বকৃত সঞ্চিত কর্ম্মাদির নাম 'অদৃষ্ট' (যা দৃষ্ট হয় না)। প্রলয়ে ভোগজন্য অদৃষ্ট কার্য্য স্তম্ভিত থাকে মাত্র; কারণ কোন কর্ম্মই ভোগ প্রদান না ক'রে নিবৃত্ত হয় না। জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি এই ভোগের জন্যই। যে সব কারণে ভোগ হয়, তাকে 'ভোগ-হেতু-অদৃষ্ট' বলে। সেই রকম 'প্রলয়-হেতু-অদৃষ্ট' ও আছে। 'ভোগ-হেতু-অদৃষ্ট' রুদ্ধ বা স্তম্ভিত হয় 'প্রলয়-হেতু-অদৃষ্টে'র উদ্ভবে, সুতরাং তখন ভোগ-হেতু অদৃষ্টের ক্রিয়া হয় না। প্রলয়-হেতু-অদৃষ্টের কার্য্য আরম্ভ হ'লে, শরীর ও ইন্দ্রিয়যুক্ত সমস্ত জীব পরমাণুতে পরিণত হ'তে থাকে অর্থাৎ জীবাত্মাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের 'আরম্ভক পরমাণু'তে কর্ম্মের উৎপত্তি হয় ও সমস্ত সংযোগাদি ব্যাপার সেই সময়ে নিবৃত্ত হয় ও ঐ ঐ ভূত সকল বিনষ্ট হয়; তখন থাকে মাত্র চতুর্বিধ পরমাণু পৃথক পৃথক ভাবে আর থাকে সংস্কারাবদ্ধ জীবাত্মা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও আকাশাদি নিত্য পদার্থ। দেশ ও কাল—সর্ব্ব অদৃষ্টের আধার।

যাকে জড বলা হয, সেই জড থাকে দেশ অধিকাব ক'বে। আমাদেব চিন্তা আদি—যা জড বলে মনে হয না—থাকে কালে। আধেয় সসীম হ'তে পাবে, কিন্তু ঐ আধাব—সমস্তই অসীম। ধোলো বিজ্ঞান দেখাচ্ছেন যে দুটি বিপবীত শক্ত্যাবিষ্ট (Positive ও Negative—পুং ও স্ত্রী) সমবল শক্তিব মিলনে যে বিন্দুব সৃষ্টি হয়, তাহাতেই Atomএব উৎপত্তি হয়, 'সমবল' মানে, Positive charge যে পবিমাণে থাকে, Electron ও ততগুলি হয়। Electron অথবা Positive ও Negative charge ও, শক্তিব একটি রূপ মাত্র, অতএব, দেশই জডরূপে পবিণাম প্রাপ্ত হয়। কালেব প্রতি অংশই অসীম। সুবিধাব জন্য আমবা বিভাগ কবি, কিন্তু কালেব প্রতি অংশই সমকালে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত—অসীম। অখণ্ড, অচল, বিকাবহীন এই কাল নিত্য বিবাজিত। কণাদ বলেন, পঞ্চভূতেব অতিবিক্ত দেশ ও কাল—এই দুটিও জড পদার্থ। আকাশ, কোন দ্রব্যেব আবম্ভক নয়, ইহা সর্ব্বগত ও নিষ্ক্রিয়। দেশেব একটা বিভাগেব নামই দিক্। একই দ্রব্যেব অবস্থা ভেদে আমাদেব পবম্পবা-জ্ঞানেব একাংশই 'দেশ' ও অপবাংশ 'কাল।' ঐ মূল দ্রব্যই 'আকাশ'। শব্দ—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, মন বা আত্মাব গুণ নয, অতএব শব্দ, সেই মূল দ্রব্য আকাশেবই গুণ।

আবাব, 'প্রলয-হেতু-অদৃষ্টে'ব কার্য্য আবম্ভ হ'লে, ভোগ প্রয়োজক অদৃষ্টেব কার্য্য ফলোন্মুখ হয়। ঐ অদৃষ্টযুক্ত আত্মাব সংযোগে প্রথমতঃ পবন পবমাণুতে কর্ম্মেব উৎপত্তি হয। পবন পবমাণুব পবস্পব সংযোগে মহাবায়ু উৎপন্ন হয়, অন্য কোন বাধ্ না থাকায সেটা তখন আকাশে অনববত স্পন্দিত হ'তে থাকে। তাব পব ঐরূপে আপ্য পবমাণুতে কর্ম্মেব উদ্ভব হযে—পূর্ব্ব প্রক্রিযানুযায়ী—দ্ব্যণুকাদি ক্রমে 'সলিল' বাশি উৎপন্ন হ'যে বাযুবেগে স্পন্দিত হয় ও মহাবায়ুতেই অবস্থিত হয। পবে, ঐ প্রকাব পার্থিব পবমাণু সংযোগে নিবিডাবযব ক্ষিতি উৎপন্ন হ'যে ঐ সলিল বাশিতে বিবাজ কবে।

[আপ্য পবমাণু হ'তে সলিল উৎপন্ন বলা হয়েছে, সলিল বাযুবেগে স্পন্দিত হ'য়ে বাযুতেই থাকে। ঐ বাযু বা মহাবায়ু যে আমাদের পার্থিব স্থূল বায়ু নয় ইহা স্পষ্ট। সলিলও 'জল' নয়—দেখা যাচ্ছে, 'অপ'এর অপেক্ষাকৃত স্থূল পবিণতিব নামই সলিল।

বৈদিক বৃহৎ সংহিতার 'তারাপুঞ্জগণনিকাশাগণকা' অর্থে নীহারিকাই বোঝায়, অতএব সলিল অর্থে 'নীহারিকা পরিব্যাপ্ত অতি বিস্তার অন্তরীক্ষ' (এই অর্থ 'পৃথিবীর ইতিহাসে' করা হয়েছে)। বস্তুতঃ নীহারিকার জমাট্ ভাবই পৃথ্বী। বলা হয়েছে প্রলয় সময়ে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ—সবই লয় হয় আকাশে, অতএব, সৃষ্টিমুখে প্রথম আকাশ, তারপর ক্রমে ক্রমে বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি। বৈশেষিকের সৃষ্টিতত্ত্ব বৌদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত তুলনীয়। ইভান্স সাহেব তাঁর গ্রন্থে (Tibetan Book of the Deadএ) বলেন, যদি ভারত হ'তে গৃহীত বৌদ্ধ মহাযানের সৃষ্টিতত্ত্বকে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত অসংখ্য বিশ্ব সৃষ্টি ব'লে বুঝতে চেষ্টা করা যায়, তা হলে খোলো বিজ্ঞানের সৃষ্টিবাদের সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যাবে।]

খোলো ঈথারবাদ খণ্ডিত হয়েছে এখন। বৈশেষিকে মহাবায়ুকে সদা কম্পমান বলা হয়েছে; [সংস্কৃত 'বা'=নড়া (to move)]। বলা হয়েছে আকাশের কোন ক্রিয়া নেই। আকাশকে দ্রব্যও বলা হয়েছে, অথচ দ্রব্যের সাধারণ লক্ষণ ক্রিয়া! আবার, দিক্ ও কাল জড় পদার্থরূপে স্বীকৃত, উপাধিভেদে অবশ্য তার ক্রিয়া আছে। তা ছাড়া, কার্য্য বস্তু দ্রব্যেই সমবেত হয় ব'লে দ্রব্যই উপাদান বা কারণ। এখানে বুঝতে হবে যে আকাশকে 'মূলদ্রব্য' বলা হয়েছে, 'মূল' দ্রব্যে ক্রিয়ার শান্ত অবস্থা মাত্র—ক্রিয়ার বীর্য্য নিহিত বা সুপ্ত মাত্র, সুতরাং তখন ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। এই হিসাবে আকাশ একটি 'অসাধারণ দ্রব্য'। দ্রব্য, উপাদান হলেও, সেখানে কার্য্যবস্তু সমবেত, অতএব তার লক্ষণ ক্রিয়া হবেই। 'অহং শব্দমান' হয় না, সুতরাং শব্দ আকাশের গুণ। এখানে শব্দ, সাধারণ অর্থে গৃহীত। বৈশেষিকে প্রথম সৃষ্টির (স্থূলের) বিচার—আরম্ভবাদ। সাধারণ বুদ্ধির দিক্ দিয়ে এই দর্শনশাস্ত্র রচিত।

জ্ঞানের আশ্রয় দ্রব্যের নাম আত্মা, বুদ্ধির নাম জ্ঞান। আত্মা দুই—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। আত্মার লিঙ্গ=প্রাণ, অপান, নিমেষ, উন্মেষ, জীবন, মনের গতি, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিকার বা ক্রিয়া, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন।

["প্রাণাপান নিমেষোন্মেষ জীবনমনোগতীন্দ্রিয়ান্তরবিকারাঃ, সুখদুঃখ ইচ্ছাদ্বেষ প্রযত্নাশ্চাত্মনো লিঙ্গানি"।]

আত্মার পৃথকত্ব, সংযোগ বিভাগ, ভাবনাখ্য সংস্কার—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—আছে। জীবাত্মা প্রতি শরীরে বিভিন্ন; অহং প্রত্যয় ইহার জ্ঞাপক লিঙ্গ।

অহং বোধ প্রথম উদিত হয়, তারপর, তখন মনসংযোগ সম্ভব হয়। অহং প্রত্যয়—কেবল জীবাত্মারই আছে। পরমাত্মা মহৎ বা বিভু। 'তস্মাদাগমিকঃ' ইহা বেদবেদ্য বা বেদসিদ্ধ বাণী। পরে মোক্ষ সম্বন্ধে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে—মন আত্মস্থ হলে সুখ-দুঃখের উৎপত্তি হয় না। প্রলয় কেন হয়? এই 'কেন'র উত্তর দুভাবে বলা যায়; (১) অনবরত গতির বিশ্রাম বা ক্ষণিক বিরতি দরকার, যাতে আবার নতুন তেজে কার্য্য হয়, অনবরত ভোগে অবসাদ ও শেষে বিরক্তি আসে, তখন ভোগ-গতি নিরুদ্ধ হয়; সুখ-দুঃখ-ভোগ ক্লান্ত জীবেরও বিশ্রাম দরকার হয় সেই জন্য। এই জন্যই প্রলয় দরকার, ইহা সমষ্টি ও ব্যষ্টি—দুদিক্ দিয়েই সত্য, (২) যে সংকল্পে বা সিসৃক্ষায় সৃষ্টি হয় ও তাতে শৃঙ্খলা আসে, সেই একই সংকল্পে আবার শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যায়, প্রলয় হয়—নতুন সৃষ্টি ও শৃঙ্খলা আসবার জন্য। ইহাও সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে সত্য। জীবের নানাবিধ পৃথক পৃথক সংকল্প সেই মূল সংকল্প হ'তে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে কার্য্য করায় ও ঐ সিসৃক্ষার সঙ্গে একাত্ম হ'তে না পারায় তাকে ভেঙ্গে গড়তে হয় নতুন গতি দেবার জন্য, যাতে জীব ঐ মূল সংকল্পের দিকে আপনারাই যেতে পারে।

বৈশেষিক মতে, মন অন্তঃকার্য্য সম্পাদক যন্ত্রবিশেষ—একটি দ্রব্য—যা মোক্ষের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী, সুতরাং মন জড়। ন্যায়মতে ও তাই। সাংখ্যমতে, 'পুরুষ' সান্নিধ্যে প্রকৃতির প্রথম পরিণাম (বিশ্ববীজ)=সাত্ত্বিক প্রকাশ মহত্তত্ত্ব=সমষ্টি মন। ব্যষ্টি মহত্তত্ত্ব=অন্তঃকরণ বা মন। অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের পরিণাম প্রাপ্তিতে সত্ত্ব অহংকার হ'তে মন, রজঃ অহংকার হ'তে দশেন্দ্রিয়, ও তমঃ অহংকার হ'তে ইন্দ্রিয়াদির ভোগ জাত হয়। সাংখ্য মতে মন জড়, কিন্তু সত্ত্ব প্রধান চৈতন্যের সান্নিধ্যে চৈতন্যাত্মক। শ্রীশঙ্কর মতে, জীবাত্মাদিরূপ কল্পনা, মায়াশক্তির অধ্যাস বলে, মনরূপ অবিদ্যাই আনায়। সাংখ্য মতে, মন 'পুরুষের' হাতে যন্ত্র বিশেষ। মনের স্থূলতর অবস্থাই তন্মাত্রা। তন্মাত্রার স্থূল পরিণতিই 'ভূত।' বিশ্বের উপাদান কারণ এই ভূতাভিমানি পুরুষই 'বিরাট', আর অস্মিতাময় শরীরী 'সর্ব্বোঽস্মীতি' ইত্যাদি অভিমানী—ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী—বিগ্রহই 'হিরণ্যগর্ভ'। অস্মিতারূপ সংস্কারই প্রথম অভিব্যক্তি। অস্মিতা মাত্রের 'অদৃষ্ট' বা পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য-সংস্কার হ'তেই ব্রহ্মাণ্ড জাত হয়।

[বৈশেষিক দর্শনকারের আসল নাম 'উলুক', তাই এই দর্শনের নাম 'ঔলুক্য দর্শন'। উলুক ছিলেন ঋষি, একজন কঠোর তপস্বী, শস্যক্ষেত্রে প'ড়ে যাওয়া কণা সংগ্রহ ক'রে জীবন ধারণ করতেন, তাই তিনি 'কণভক্ষ্য ঋষি' বা 'কণাদ' নামে পরিচিত। বৈশেষিক দর্শন কোন দর্শনের সঙ্গে বিবোধ করেন নি। এই দর্শনে, 'বিশেষ'টিব ওপর জোব দেওয়া হয়েছে, তাই নাম বৈশেষিক দর্শন। কণাদ ছিলেন শৈব। এই দর্শনেব সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাষ্য লঙ্কেশ্বর রাবণ রচিত। কণাদের মত নিয়ে অনেকে অনেক কষ্ট কল্পনা করেছেন। তাঁবা বোধ হয়, কণাদেব দৃষ্টিকোণ দিয়ে তাঁর মতগুলি আলোচনা করেন নি।]

সাধনকাণ্ড

যা বলবাব জন্য আবাব অনুরুদ্ধ হয়েছি, এইবাব সেই সাধনকাণ্ড বোঝবাব চেষ্টা কবা যাবে। শ্রুতি বলেন—

["শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"। (কৈবল্যোপনিষদ্, ২।)]

'গুরুবেদবাক্যে বিশ্বাস অর্থাৎ শ্রদ্ধা ভক্তি ধ্যানযোগেব দ্বাবা ব্রহ্মবিদ্যা জানা যায়, একমাত্র ত্যাগ-দ্বাবাই অমৃতত্ব লাভ হয়'। এই ভাবেব কথা উপনিষদেব সর্ব্বত্র। তন্ত্র সাধনায়, প্রথমেই মানসে গুরু চিন্তা কবতে হয়। সমস্তই তাঁকে সমর্পণ কবতে হয়—নিত্য ও অনিত্য, সমস্তই, যথা, 'পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং শ্রীগুরুবে সমর্পয়ামি নমঃ," ঐ প্রকাব "আকাশাত্মকং পুষ্পং" "বায়্বাত্মকং ধূপং" "অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং," "তেজাত্মকং দীপং", "সর্ব্বাত্মকং তাম্বূলং"—সমস্তই কবাঙ্গুলি সমাবেশে, 'মুদ্রায়', সমর্পণ কবতে হয়। বৈশেষিক দর্শন প্রসঙ্গে নিত্য ও অনিত্য পৃথ্ব্যাদিব কথা বলা হয়েছে। ইহাই আত্মসমর্পণ—যাতে শ্রদ্ধা-ভক্তি জাগবিত হয়, চিন্তায ধ্যান পরিস্ফুট হয় ও ত্যাগ-বুদ্ধি উদ্দীপিত হয়। বেদ সম্মত সাধনে ও তন্ত্র সাধনায় তত্ততঃ কোন প্রভেদ নেই।

"ব্রহ্ম স্থিব, কম্পনহীন, অথচ মনেব চেয়ে বেগবত্তব; তাই ইন্দ্রিয়েব দ্বাবা তাঁকে জানা যায় না। তিনি সকলকে অতিক্রম কবেন। মাতরিশ্বা 'অপ'কে ধাবণ কবেন।" (ঈশ।৪)

['মাতবিশ্বা' = বায়ুরূপে সূত্র সংজ্ঞক সমগ্র বিশ্বের বিধাতা। 'অপ' = জীবকুলের কর্ম্ম, আদিত্য, অগ্নি আদি দেবগণের জলন, দহন, প্রকাশ ও বর্ষণাদি শক্তি। 'দধাতি' = ধারণ করেন, বিভাগ করেন।]

"যিনি 'অপের' সহিত ব্রহ্ম হ'তে জাত হয়ে ছিলেন, যিনি সর্ব্বহৃদয়ে রয়েছেন, যিনি সব উপলব্ধি করছেন, তাঁকে জানলেই আত্মাকে জানা যায়" (কঠ ২।১)। ঐতরেয় উপনিষদে দেখা যায় "স ইমান্ লোকান্ অসৃজৎ আম্ভো মরীচির্ম্মরূপঃ"।

["অপ এব সসর্জ্জাদৌতাসু বীজমবাকিরৎ" (মনু)। অপ্ সৃষ্টি ক'রে তাতে বীজ আধান করলেন। (সসর্জ = তদ্রূপে পরিণত)]।

'অপ' কারণার্ণব। অপ ও হিরণ্যগর্ভ এক সূত্রে গাঁথা। হিরণ্যগর্ভ পুরুষের আর এক নাম ব্রহ্মা। প্রকাশের পূর্ব্বে ব্রহ্মা ছিলেন 'অপ'এর গর্ভে। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন (১।১।৯) "সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল অপ ছিল, 'বাক্' হ'তেই অপ উদ্ভূত হয়, ও বিশ্ব সমাচ্ছন্ন হয় বলেই নাম হয় অপ, 'অপ'এর আর একটি নাম 'ভা' বা দীপ্তী। স্থূল ভাবে, এই অপকে নীহারিকা বা ছায়াপথ বলা যায়, 'ভা' অর্থে দীপ্তিমান বা দুগ্ধ সাগরবৎ ছায়াপথ (Milky Way) বোঝায়—ধূম্রবৎ ছায়াপথ (dark nebulæ নয়)। গুরুকে স্থূল সূক্ষ্ম সবই সমর্পণ করতে হয়। 'ভা' মানে প্রকাশ ও হয়। প্রকাশ শক্তির গর্ভেই হিরণ্যগর্ভের স্থিতি। অস্মিতাই 'ভা' বা 'অপ'। 'বাক্' হ'তেই প্রকাশ। অস্মিতার পরিব্যাপ্তিই 'সলিল'।

["সলিল একো দ্রষ্টাঽদ্বৈতোভবত্যেব ব্রহ্মলোক · ।"—বৃহদারণ্যক, ৪।৩২। এই প্রকার বচন বহুস্থলে পাওয়া যায়। তন্ত্রশাস্ত্রে, 'অপ', 'সলিল', 'জল' অনেক সময়ে একই অর্থে ব্যবহৃত।]

তন্ত্রে ঐ অপই—'অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং' রূপে শ্রীগুরুতে অর্পিত। 'অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান'—সব শ্রীগুরুচরণে নিবেদিত, কারণ,

["যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূংস্বাং"] অর্থাৎ, তিনি প্রসন্ন হলে আত্মা প্রসন্ন হন।]

সাধকের 'সন্ধ্যা' করবার রীতি আছে। দুটি পরস্পরের সংযোগ অর্থাৎই সন্ধি। তন্ত্ররাজ তন্ত্র বলেন, "শিবশক্তি সমাযোগো যস্মিন কালে প্রজায়তে। সা সন্ধ্যা···সমাধিস্থে প্রজায়তে।" অর্থাৎ 'যে সময়ে শিব-শক্তির

বা পুরুষ প্রকৃতির যোগ উৎপন্ন হয় তাহাই সাধকের সন্ধ্যা—সমাধিতে তাহা সিদ্ধ হয়'। শ্রুতি ও বলেন "যে সময়ে জীবাত্মা প্রজ্ঞা সহায়ে পরমাত্মার সঙ্গে অভেদ ভাবনা করে, তার নামই সন্ধ্যা, এই রকম সন্ধ্যায় জলের দরকার হয় না। এই সন্ধ্যা প্রভাবে একত্ব বোধ স্ফূরিত হয় ইত্যাদি।" [ব্রহ্মোপনিষৎ-৩৪। "সন্ধিনী সর্ব্বভূতানাং সা সন্ধ্যা"—এখানে সন্ধিনী= একত্ব বোধিকা শক্তি]। অধ্যাত্মবোধই সন্ধ্যা। ইহাই ধ্যান সন্ধ্যা। তন্ত্র ও শ্রুতি এখানে একমত। বেদমতে, এই সন্ধ্যা দণ্ডিদের, তন্ত্রমতে, এই সন্ধ্যা, বিশেষ অধিকার প্রাপ্তের। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। শক্তি সংযোগেই সৃষ্টি। "সঃ অকাময়ৎ," "সঃ ঐক্ষৎ"—এই দুই বেদ বচনে, 'কাম' বা সংকল্প ও সংকল্পের প্রযোগ জন্য ঈক্ষণ বোঝায়। সংকল্প ও ঈক্ষণ—স্বপ্নজগৎ। "রসো বৈ সঃ"—তিনি রসস্বরূপ, তাই সংকল্প ও ঈক্ষণ। সর্ব্বহৃদয়ে রসরূপে স্থিত হয়ে তিনি প্রেমস্বরূপ, তাই, সাধনে হয় রতি মানবের, তাই তিনি সর্ব্ব 'আকৃষ্ট শক্তি'। সর্ব্ববৃত্তি নিরোধের নাম যোগ, আবার সর্ব্ববৃত্তি একই মহাশক্তির সঙ্গে বিলীন হ'যে সর্ব্ববৃত্তির একত্বে স্থিতি লাভ করাও 'যোগ'। এই শেষ প্রণালী, কুণ্ডলিনী উত্থাপনে প্রয়োগ হয়—তন্ত্রে।

জগৎ ক্রিয়ার, প্রধানতঃ তিনটি সন্ধিস্থল—প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা। স্থূলভাব গ্রহণে, অর্থাৎ আদর্শ-লক্ষ্য না থাকলে, সাধন হয় না—মানুষ যন্ত্রবৎ জড় হয়ে যায়। কারণ, সাধন, অধ্যাত্ম শিল্প। সূর্য্য হ'তে পৃথিবী প্রাণ পায়, সূর্য্য একটা জলন্ত পিণ্ড—ইহা স্থূল। সূর্য্য একটি শক্তির প্রকাশ মাত্র, যে শক্তিটি প্রকাশ হয় তাহাই গ্রহণীয়। ঐ প্রকাশশক্তির বাহ্য পরিণতিই, সকাল দুপুর ও সন্ধ্যা—তিন প্রধান অবস্থা, যেমন শৈশব, যৌবনকাল ও বার্দ্ধক্য মানুষের তিন প্রধান অবস্থা। সন্ধ্যা ঐ প্রকাশ শক্তিরই আরাধনা।

সাধন ভিন্ন উপলব্ধি হয় না—কথায় চিড়ে ভেজে না। পূজা বা অনুষ্ঠান ও সাধনাদি সব হাতেনাতে করতে হয়—আদর্শ ঠিক্ রেখে। পূজায় ব'সে যে বড় বড় চিন্তা আরম্ভ করতে হবে তা নয—তা হলে পূজাই হবে না। পূজায় বসে নানাচিন্তা আসা, যা করতে যাচ্ছি তাতে, একাগ্র চিত্ত হবার অন্তরায়। তাই নিয়ম এই যে, পূজায় বসবার পূর্ব্বে মনে মহৎ মহৎ চিন্তা এনে মনকে ঠিক্ করে নিতে হয়; পূজাকাল ছাড়া অন্য

সব সময়ে বড় বড় চিন্তা করতে হয়, মনে মনে আলোচনা করতে, জীবনকে (চিন্তানুরূপ) গঠন করবার চেষ্টা করতে হয়, তাহলে, সাধনে সুবিধা হয়। তন্ত্র বলেন, কি করতে যাচ্ছ ও আর কেন করছ এটা যেন স্মরণ থাকে—তা হ'লে উদ্দেশ্য ভুল হবে না। কতকগুলি মন্ত্রের আবৃত্তি নয়—চাই সাধনার ভাব।

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বীজ রয়েছে জ্ঞানকাণ্ডে বা উপনিষদে। সাধারণের জন্য বা বহুজন হিতায়, ঋষিরা ঐ সব অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করেন। যাঁরা এই সব কর্ম্মকাণ্ড নিয়ে থাকতেন, তাঁরাই পরে 'ব্রাহ্মণ' এই আখ্যা পান ও ঐ সব অনুষ্ঠান সংগৃহীত হয়ে নাম হয় 'ব্রাহ্মণ গ্রন্থ'। একমাত্র কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় ব্রাহ্মণ হ'তেই আসে পৌরোহিত্য।

ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী কে—এই প্রশ্ন ওঠে। অধিকারীর বহু লক্ষণের মধ্যে, একটি লক্ষণে বলা হয়, "যাঁরা বেদজ্ঞ ও ক্রিয়াবান, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে 'একর্ষি' অগ্নিতে হোম করেন, তাঁরা ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী (মুণ্ডক ৩।২।১০)। ইহাই ছিল পরিচয়ের লক্ষণ। দুরকম বিদ্যা জ্ঞাতব্য—শব্দব্রহ্ম বিদ্যা ও পরমব্রহ্ম বিদ্যা, কিন্তু শব্দব্রহ্ম বিদ্যা যদি পরমব্রহ্ম বিদ্যার অনুকূল হয়, তবেই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হওয়া যায় (ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ, ১৭)। এই বিদ্যা লাভ করতে হলে মনকে 'বিষয়াসঙ্গ' হ'তে বিচ্যুত ক'রে 'উন্মনী'ভাব অবলম্বন অর্থাৎ নিঃসঙ্কল্প করতে হয় (ঐ, ৪।)। মন, অচিন্ত্য বিষয়ের চিন্তায় অসমর্থ, আর, বিষয়াদি চিন্তা মন করতে পারলেও, সেগুলি মিথ্যা—অতত্ত্ব, উপায়—আত্মতত্ত্বের চিন্তা অথবা অতত্ত্ববিষয়কে ভোলবার চেষ্টা, এই দুয়ের কোনটা না ক'রে—মনকে নিরপেক্ষ করা; তখন মন নিরালম্বভাবে স্থিত হলেই ব্রহ্মভাব ফুটে ওঠে (ঐ, ৬)। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানও, উচ্চতম আদর্শ সামনে রেখে, ঠিক্ ঠিক্ করলে, মনমুখ এক ক'রে করলে, মন ব্রহ্মভাব গ্রহণ করবার অধিকারী হয়।

["রয়িরেবচন্দ্রমা ··" প্রশ্নোপনিষৎ ৫। চন্দ্রমা রয়ি পদবাচ্য। মূর্ত্ত রয়ি = অন্ন, অমূর্ত্ত রয়ি = অন্নের সূক্ষ্মাংশ = প্রাণ বা অমৃত।]

"আদিত্যই প্রাণ, চন্দ্রই 'রয়ি', স্থূল, সূক্ষ্ম সবই 'রয়ি।' সেই সংবৎসররূপী প্রজাপতির দুটি অয়ন—উত্তর ও দক্ষিণ। যাঁরা ইষ্টপূর্ত্তের জন্য (সকামভাবে) যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, সেই সব প্রজাকামী ঋষিরা দক্ষিণায়ন প্রাপ্ত

হন। ইহাই রয়ি; ইহারই নাম পিতৃযান, কর্ম্মফল অবসানে ইহাদের ফিরে আসতে হয়। যাঁরা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা সহায়ে আত্মাকে জেনে উত্তরায়নে গমন করেন, তাঁরা আদিত্য প্রাপ্ত হন। ইহা প্রাণসকলের আয়তন (আশ্রয়), ইহাই অমৃত, ইহাই সর্ব্বভয়বর্জ্জিত ('অভয়ং'), ইহাই পরাগতি, এ স্থান হ'তে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না।" নিষ্কাম সাধক দক্ষিণায়ণকে ভয় করতেন, সকাম সাধক উত্তরায়ণ চাইতেন না। নিষ্কাম সাধকের কাছে পিতৃযানই ধূমযান। "সংবৎসরের মত, মাস ও প্রজাপতি স্বরূপ। কৃষ্ণপক্ষ রয়ি (চন্দ্র), শুক্লপক্ষ প্রাণ (সূর্য্য)। যিনি প্রাণকে (আদিত্যকে) সর্ব্বাত্মা ব'লে জেনেছেন, তাঁরা শুক্লপক্ষে যজ্ঞ করেন, তাঁদের কাছে কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ উভয় পক্ষই সমান। যাঁরা ইহা জানেন না তাঁরা কৃষ্ণপক্ষে যজ্ঞ করেন।" আর একস্থানে 'প্রাণের' মহিমা কীর্ত্তন করা হচ্ছে "হে প্রাণ, তুমিই ব্রাত্য, তুমিই 'একর্ষি' নাম অগ্নি হ'য়ে ঘি খাও" ইত্যাদি [প্রশ্নোপনিষৎ—৯।১০।১১।১২ ও টীকাকারের টীকা দ্রঃ]। "নিদ্রাকালে প্রাণরূপী অগ্নিত্রয় সর্ব্বদা জাগরিত থাকেন। তার মধ্যে অপান বায়ু=গার্হপত্য অগ্নি, ব্যানবায়ু=দক্ষিণাগ্নি। যজ্ঞে, আহবণীয় অগ্নিকে ও গার্হপত্য অগ্নিকে পৃথক করা হয়, নিদ্রাকালে সেইরকম প্রাণবায়ু ও অপান বায়ু পৃথক হয়ে মুখ ও নাসিকাদ্বারা সঞ্চরণ করে, এইরূপে গার্হপত্য স্থানীয় অপানবায়ু হ'তে পৃথকীকৃত হয় ব'লে প্রাণবায়ু আহবণীয় স্থানীয (ঐ)। উদাহরণ বাড়াবার প্রয়োজন নেই। জ্ঞানকাণ্ড কখন কর্ম্মকাণ্ডকে ছেঁটে দেয়নি—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড (antagonistic) বিপরীত ধর্ম্মী হয়ে লড়াই করতে যায় নি। লক্ষ্য ঠিক্ থাকলে সাধকের মন কি ভাবে গ'ড়ে ওঠে ও অনুষ্ঠানের প্রতি অঙ্গকে সাধক কোন্ দৃষ্টিতে দেখতে শেখেন তার জন্য উক্ত উদাহরণই যথেষ্ট। সকল যুগেই, সকাম ও নিষ্কাম, এই দুরকম সাধক ছিলেন ও আছেন, পরেও থাকবে। উচ্চাধিকার প্রাপ্ত বা নিষ্কাম সাধকের কাছে, জ্ঞানকাণ্ড বরাবরই শ্রেষ্ঠ দিগ্‌দর্শন হয়ে থাকবে। তন্ত্রে যেমন নানাবিধ সকাম সাধকের জন্য মারণ, অভিচার, বশীকরণ, উচ্চাটনাদির মন্ত্র ও সে সমুদয়ের প্রয়োগ দেখা যায়, ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থেও অনুরূপ দেখা যায়।

৫[শতপথ ও ঐতবেয় ব্রাহ্মণ দ্রঃ। গার্হপত্য অগ্নি সর্ব্বদা জ্বালান থাকে, আহবনীয় অগ্নি প্রত্যহ হোমেব পব নিবিয়ে দেওয়া হয়, পবদিন আবার গার্হপত্য হ'তে আগুণ নিয়ে আহবনীয় জ্বালান হয়]।

ধর্ম্মেতিহাস-আলোচনায দেখা যায় যে, লক্ষ্য ঠিক্ থাকলে, সর্ব্বত্রই ঐ সকাম সাধনা হ'তে কত শত সাধকেব উচ্চাবস্থা এসেছে। মনকে ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ ও ধাবণোপযোগী আধাবে পবিণত কবাই অনুষ্ঠানাদিব উদ্দেশ্য ভাবতে। "প্রজাপতি ও দেবতাবা যজমান হ'যে যে হোম ক'বেছিলেন তাতে দেবগণেব চিত্তি (জ্ঞানরূপা মনোবৃত্তি) স্রুক (জুহু) স্বরূপ, চিত্ত— আজ, বাগিন্দ্রিয—বেদি, ধ্যানলব্ধ সমস্ত বস্তু—বর্হি, জ্ঞান-অগ্নি বিজ্ঞান—আগ্নীধ্র নামক ঋত্বিক, বৃহস্পতি—হোতা, মন—উপবক্ত (মৈত্রাবরুণ) হয়েছিলেন [ঐতবেয ব্রাহ্মণ—২৪শ অ। ষষ্ঠ খ। (প্রজাপতিব তনু।)]। এই বকম বাহ্য উপচাববিহীন 'শ্রদ্ধা-হোম' বা ভাবনা-হোমেব কথাও দৃষ্ট হয়। উপনিষদেও দেখি, সত্যে প্রতিষ্ঠিত হযে বেদ ও ব্রাহ্মণেব সু-আবৃত্তিকে স্বাধ্যায বলা হত—সত্যপ্রতিষ্ঠ সাধকেবই হয় স্বাধ্যায় [তৈত্তি.—১।১১।১ দ্রঃ]। বাণপ্রস্থাশ্রমী সাধকেব নাম ছিল আবণ্যক। আবণ্যক যিনি, তিনি যজ্ঞাঙ্গসমূহেব ভাবনা নিজ দেহেব মধ্যেই কবতেন। ইহা স্মবণ বাখতে বলি, কাবণ, তন্ত্রে 'যন্ত্র-ভাবনা'ও ঐ প্রকাব। যে সব গ্রন্থে ঐ বকম প্রতীকোপাসনা বা রূপক ভাবনাব প্রসঙ্গ আছে তাব নামও আবণ্যক। বিনীত শিষ্যেব, গুরুব কাছে ব্রহ্মবিদ্যালাভেব নাম উপনিষৎ। (উপসদ = যজ্ঞাঙ্গবিশেষ)। শ্রুতি বলেন, যাঁব বিদ্যা—শ্রদ্ধা ও উপনিষদেব সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয তাঁব শক্তি বাড়ে [ছান্দোগ্য—১।১।১০]। মৃত্যুব পব পুনর্জন্ম, দেবযান, পিতৃযান আদিকে বহস্যবিদ্যা বলা হত, তাব উপদেশ ও উপনিষদে পাই [ছান্দোগ্য—৫।৩। প্রবাহন-জৈবিলী সংবাদ]। এই সব বহস্যবিদ্যা বা গুহ্য বিদ্যা মানে উচ্চতম চিন্তাব সঙ্গে আদর্শানুরূপ সহজ ও সবল জীবন যাপন।

[ঐতবেয় ব্রাহ্মণে 'প্রজাপতির তনু'ব পব প্রজাপতিব 'তনু মন্ত্র' আছে। তাতে কয়েকটি মূর্ত্তিব উল্লেখ আছে। প্রজাপতির দ্বাদশ মূর্ত্তি। তাঁব 'অন্নদা' ও 'অন্নপতি', এই দুই মূর্ত্তিদ্বয়েব মধ্যে অন্নদা মূর্ত্তি = অগ্নি, অন্নপতি মূর্ত্তি = আদিত্য, ভদ্রা মূর্ত্তি = সোম, কল্যাণী মূর্ত্তি = পশুগণ, অনিলয়া মূর্ত্তি = স্বর্গ, অমাবৃয্যা মূর্ত্তি = অগ্নি,

অপ্রতিধৃষ্যা মূর্ত্তি—আদিত্য, অপূর্ব্বা (সর্ব্বাগ্রেস্থিত) মূর্ত্তি—মন, অপভ্রাতৃব্যা (অপবাজেয়া) মূর্ত্তি—সংবৎসর]।

এ বকম রূপকল্পনা নিশ্চয়ই Animism নয়। গাছ, পাথবেব পূজাকে Animismএব স্মৃতি বলা হয়; যাঁবা বলেন, তাঁবা ভুলে যান যে, ভাবতে গাছ পাথবেব সঙ্গে মহাপুরুষেব স্মৃতি ও পবিত্রভাব জড়িত। যে Freudএব মত অধুনা বহু পণ্ডিতদেব দ্বাবা খণ্ডিত হয়েছে, সেইমত এখনও অনেকে কপচান্, মানবেব আদিম বন্য দিকটাই তাঁদেব নজবে পড়ে সর্ব্বক্ষেত্রে। বন্য দিক্ই তাঁবা দেখান। শ্রীবুদ্ধ যে গাছেব তলায় তপস্যা কবেছিলেন, সেই বুদ্ধ-গয়াব গাছ পূজিত হয়। বুদ্ধদেবেব তপস্যা ও তাঁর নামেব সঙ্গে জড়িত বলেই ঐ গাছ পূজিত হয়। প্রযাগেব অক্ষয় বট সীতাবাম নামেব সঙ্গে জড়িত। এইবকম বহু উদাহবণ দেওয়া যায়। এসব স্থানে আগে পবিত্র ভাব ও তাব প্রাধান্য, তাব পব পূজাব প্রচলন—আগে বন্য ভাব ও পবে মার্জিতাকাবেব অর্থ নয়। সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায়, মহাবায়ু তির্য্যগ্-গতিসম্পন্ন, ঋষি দৃষ্টিতে ঐ মহাবায়ু সংযোগে কুণ্ডলিনীব উত্থান তির্য্যগ্গতিবিশিষ্ট—সর্পাকৃতিতে ও সর্পগতিতে উত্থান—ইহা সাধকেব প্রত্যক্ষ ব্যাপার, তাই বিশ্বকুণ্ডলিনী 'অনন্ত' নামে পুবাণে পূজিত। ব্রহ্মজ্যোতিব সাক্ষাৎকাব আগে, তাবপব ধ্যানেব রূপায়তন। ভাবতেব animism নয়, ভাবতেব 'ঈশাবাস্যম্'। তাই বলা হয়েছে যে শব্দব্রহ্মবিদ্যাও, পবমব্রহ্মবিদ্যাব অনুকূল হওয়া চাই। অনুষ্ঠানবত সাধককেও সাবধান কবা হয়েছে।

বৈদিক যুগে শিল্পজ্ঞান

ধোলো মতে, বৈদিক ভাবতে আর্য্যেব শিল্পজ্ঞান পবিস্ফুট হয় নি। ঋগ্বেদে 'সুন্দব' শব্দটি নাকি পাওয়া যায় না। বেদ বিভাগ ত বহু পবে হয়—ব্যাসদেবেব দ্বাবা—তখন ঐবকম আপত্তি নিবর্থক—ঐ শব্দেব অন্যত্র বহুল প্রয়োগ আছে। তা ছাড়া, ভাবত কখন বাহ্য সৌন্দর্য্যে আপনাকে হাবিয়ে ফেলেন নি। বাহ্য সৌন্দর্য্য ভাবত ববাববই দেখে আসছেন, তাব বর্ণনাও যথেষ্ট। ঋগ্বেদে উষাব বর্ণনাটি কি? কিন্তু, [illegible] সৌন্দর্য্যেব মূল অনুসন্ধানেই জীবন কাটিয়েছেন। ঋগ্বেদে সৃষ্টি বর্ণনায়,

'অন্ধকাব ঘোব অন্ধকাব দ্বাবা আবৃত' যখন বলা হয়, তখন, সৃষ্টিব মূল সম্বন্ধে প্রশ্নই উঠেছে, উত্তবে বলা হয়েছে যে, যে যেটি ছিল, সেটি 'আনীদবাতং' —প্রাণবন্ত (আনীত) নিষ্কম্প (অবাতং)—ও সেখান হ'তেই সৃষ্টি এসেছে। এ বর্ণনায কি শিল্প নেই? 'বসো বৈ সঃ', যে জাতি বলতে পেবেছেন, ঐ নামে যাঁকে অভিহিত কবতে পেবেছেন, সেই জাতি, শিল্পেব মূল স্থানই যে আবিষ্কাব কবেছেন। ঈশোপনিষৎ একটি সর্ব্বপ্রাচীন উপনিষদ। সেখানে প্রার্থনা, "হে পুষণ। হে একাকী গমনশীল সূর্য্য, তোমাব তেজ সম্বৰণ কব যাতে আমি তোমাব কল্যাণতম রূপ দর্শন কবতে পাবি।" আর্য্য এই কল্যাণতম রূপেরই অনুসন্ধান ববাবব কবেছেন। সেই কল্যাণতম রূপটি কি তাও পবে বলা হযেছে, "যিনি সেই আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ, তিনিই আমি।" এই যে কল্যাণতম রূপেব সঙ্গে একাত্ম বোধ কবা, ইহাতে কি শিল্প-বোধেব অভাব? "তাঁব স্থান সর্ব্বভূত-হৃদয়াভ্যন্তবে, সে রূপেব প্রকাশ কোথায়"? "অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তবাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥" (কঠ)। এইবকম বর্ণনা যে কালেব, সেইকালে শিল্পজ্ঞান পবিস্ফুট হয নি? সেই রূপময পুরুষকে বলা হয়েছে, "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং কবির্মনীষি পবিভূঃ" (ঈশ), এ বর্ণনায কি বস-বোধ নেই, শিল্পজ্ঞানেব অতি গভীবতা নেই, ভাষাব মধ্যেও কবিত্ব বা শিল্প নেই?

কঠোপনিষদে, যম, নাচিকেতাকে অগ্নিবিদ্যা বলছেন, অগ্নিস্থাপনেব জন্য যতগুলি 'ইষ্টক' দবকাব তাও বলেছেন। এখানে 'ইষ্টক' অর্থাৎ পাকা বেদিব কথা বলা হয়েছে—কাঠ বাঁশ নয়। বেদপন্থীসমাজ যজ্ঞ কবতেন। তাঁব গৃহটিও ছিল দেবতার; তাই বেদ-পন্থীব, যজ্ঞেব জন্য বেদি নির্ম্মাণে, এমন কি গৃহ নির্ম্মাণেও ছিল নিজস্ব পদ্ধতি। ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবানুযায়ী, বহুস্তবে ইট্ দিয়ে বেদি তৈরী কবা হত। প্রত্যেক বেদিব একটা নির্দ্দিষ্ট মাপ ছিল, লম্বা চওডা সমান সমান হত। ১০ স্তবেব বেদি উচ্চতায় হত ৮১ হাত। ১৫ স্তবেব বেদিব কথাও আছে। এক একটি ভাব অনুসাবে এই সব বেদি নির্ম্মাণে কি শিল্পজ্ঞানেব অভাব বুঝায়? বেদি নির্ম্মাণেব ধাবা আজও অনেক আকাবে বর্ত্তমান। কি রকম ঘবে ভিক্ষুক থাকবেন, তপস্যা কববেন, নানা বিষয়ে অনুশীলন কববেন, এ সব

বিষয়ে বুদ্ধদেবেরও উপদেশ পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের ৫ রকম গৃহ নির্ম্মাণ পদ্ধতির কথা আছে—গুহা, বিহার, অর্দ্ধযোগ, হর্ম্ম্য, প্রাসাদ। অর্দ্ধযোগের নাম ছিল 'বাঙ্গলা' যা হতে Bunglow শব্দটি ইংরাজিতে এসেছে। অর্দ্ধযোগে বাঙ্গালীর বিশেষত্ব আজও প্রায় সেই ভাবে বর্ত্তমান; যাকে 'Turkish Bath' বলা হয় সেটি বৌদ্ধ কৃতিত্বের পরিচয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় বহু ক্রোশ ব্যাপী শ্বেত পাথরের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা হয়, দূর হ'তে সে গুলি রাজহংস শ্রেণীর মত দেখাত। পুরাণেও অনেক রকম গৃহ নির্ম্মাণ পদ্ধতির কথা আছে। অনেক আকারের অট্টালিকা ছিল। পুরাণে, ৫০ হাত উচ্চ ১৬ তল অট্টালিকার কথাও আছে। বিমান ছন্দ নামে অট্টালিকা ছিল পঞ্চতল যুক্ত।

[পণ্ডিত প্রসন্নকুমার আচার্য্য M, P. H. D. D L. &c. মহাশয়ের লেখা দ্রঃ। ইনি এই সব বিষয়ে গবেষণায় রত]।

এই সব নানা পদ্ধতি যে বৈদিক যুগেরই ধারা, ঐ যুগের আদর্শ ক'রেই যে নানা পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল পরে, তার সন্দেহ নেই। 'কামিক আগম' নামে বাস্তু শাস্ত্র এখনও অপ্রাপ্য নয়। কি বৈদিক যজ্ঞে, কি তন্ত্রানুষ্ঠানে, সর্ব্বপ্রকার বাহ্য শুদ্ধির সঙ্গে 'বাস্তু' শুদ্ধিও দরকার। বাস্তু শাস্ত্রের মূলগ্রন্থ 'মানসারের' কাছে রোমীয় শিল্প বিশেষ ঋণী। যজ্ঞের অর্থ ও ছন্দের সঙ্গে যজ্ঞীয় বেদির ভাব বা অর্থ ছিল একই সূত্রে গাঁথা। ব্রাহ্মণগ্রন্থে দেবযজনের জন্য গৃহের নাম ছিল 'প্রাগ্বংশ-শাল'। এই 'বংশ' শব্দ দেখেই তার মানে 'বাঁশ' করা হয় কেন? যাঁরা বাঁশ অর্থ করেন তাঁদের মতে ওটা ছিল বাঁশের ঘর; কিন্তু এই গৃহকে বলা হত "দীক্ষিতের যোনি"। বংশপরম্পরায় ঐ গৃহে দীক্ষা কার্য্য হত। বেদি হত পাকা, আর 'দীক্ষিতের যোনির'র বেলায় বুঝি বাঁশ? ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ, ব্রাহ্মণগ্রন্থ, শুল্বসূত্রাদি মিলিয়ে প'ড়ে, এসব বিষয়ে পণ্ডিত মণ্ডলীর আরো অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়। তান্ত্রিক হোমের বেদি ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে ছন্দ আছে, অর্থ আছে—প্রত্যেকটি সাধকের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িত! এই সমস্ত কি একটা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচয় নয়? বরং পরবর্ত্তী যুগের শিল্পের বাহ্য আড়ম্বরে বৈদিক যুগের ভাব গম্ভীরতা ঢাকা পড়েছে ও ক'মে এসেছে। পঞ্চগুঁড়ির প্রথা কতকালের কে জানে?

বৈদিক যুগে, অলঙ্কৃতা দাসীব কথাও পাওয়া যায়। তখন, তুলাব কাপড়, পশমী কাপড ও বেশমী কাপড ব্যবহাব হত। মেয়ে পুরুষ, সকলেবই অন্তর্বাস ছিল—নাম 'নীবি'; 'চণ্ডাতক', তাব ওপবের কাপড—'বাসস', সর্ব্বোপবি, যেটা সময়ে সময়ে ব্যবহাব হত—'অধিবাস,' 'অৎক' 'দ্রাপি' ইত্যাদি। যজ্ঞকালে যে বেশমেব কাপড ব্যবহাব হত—'তাপ´', পাড ও ঝালব—'তুঁষ', 'দশা' ইত্যাদি। মেয়েদেব ও 'উষ্ণীষ' (পাগড়ী) ছিল। কেশবর্দ্ধক একবকম চুলেব মশলা—'নিতম্নি', 'চতুষ্কপর্দ্দ' অর্থাৎ চাব্ খোঁপাব কুমাবী ও দেখা যেত; সুন্দব সুশ্রী খোঁপা—'সুকপর্দ্দা'। পুরুষদেব বড চুল বাখা সকলেবই ঘৃণাব বস্তু ছিল। দেবতাদেব মধ্যে 'পুষণ' ও 'রুদ্র' ছিলেন 'কপর্দ্দযুক্ত'—জটাসমন্বিত তেজোদ্দীপ্ত তপস্বীব খোঁপা। চুলেব ফিতা ও জাল—'অবপশ', পবচুলা—'স্বোপশা', 'পশ'। শিবোভূষণ—'কম্বু' 'কুবীব' ইত্যাদি। মাথাব ময়ুবাকৃতি অলঙ্কাব—'কুবীবিন'; গলাব গহনা—'নিষ্ককণ্ঠ, 'নিষ্কগ্রীব' (সোণাব), ব্রাত্যেব ঐ—রূপাব নিষ্ক। চকৃচকে পালিশ কবা বুকেব অলঙ্কাব—'রুক্ম', মাকডি—'প্রবর্ত্ত'; ইয়াবিঙ—'কর্ণশোভনা'। বিবাহেব সময মেয়ে পবত 'ন্যোচনী'—এই গহনাব ভাব ছিল, যেন শক্তি যাচ্ছেন জডকে চেতন-কবতে। এই বকম নানা মণি (হীবাব) মুক্তাব অলঙ্কাব—ছিল। এই সব কি শিল্পজ্ঞান পবিস্ফুট হওয়াব পবিচয নয়? ফুলেব মালা পুরুষেবা ব্যবহাব করত—ফুলেব ব্যবহাব অনার্য্য হ'তে আসে নি। শূকব চামডাব জুতা ('উপানহ্')ও ছিল। বৈদিক যুগেব এই ধাবা আজ ও চলে আসছে। ঋগ্বেদ, ব্রাহ্মণগ্রন্থে ও অন্যত্র এ সমস্ত নাম পাওয়া যায। আধ্যাত্মিক প্লাবন আগে এসে ঐ যুগে জনশক্তিব জাগবণ এনেছিল ও সেই জাগবণেব ফল সেই যুগেব শিক্ষায, শিল্পে ও সর্ব্বক্ষেত্রে দেখা দিযেছিল, ভাবতে, আধ্যাত্মিক প্লাবনই জাগবণ এনেছে ববাবব—এইটি স্মবণ বাখতে হবে।

পাথবেব ওপব খোদাই কবা কারুকার্য্যেব নিদর্শন নাকি ভাবতে নেই। এখনও ভূগর্ভ খুঁড়ে সে সব অনুসন্ধান হয় নি, যে টুকু হযেছে তা নগণ্য। পাথবেব বড বড খোদাই কবা মূর্ত্তি এখনও না পাওয়া গেলেও, (যদি স্বীকাব কবাও হয়), স্মবণ বাখতে হবে যে, তখন 'মণি': অর্থাৎ হীবক ও অন্যান্য মূল্যবান পাথব কেটে অলঙ্কাবও তৈবী হত; ঐ বকম ছোট পাথর

কাটা, বড় বড় পাথরের খোদাই কাযের চেয়ে অনেক বেশী সূক্ষ্ম-শিল্পের পরিচয়। নদীমাতৃক স্থানে পাথরের খোদাই মূর্ত্তি পাওয়া দুষ্কর। পাহাড় অঞ্চলে এ সব অনুসন্ধান করা দরকার। বিদ্বদ্‌জনেরা সে চেষ্টা ক'রে দেখলে হয়ত অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে পারেন। বৈদিক যুগে ধাতু নির্ম্মিত আরসির (দর্পণ = 'প্রারোপ') ব্যবহার ছিল; 'বালা' ইত্যাদির মত গহনা সূক্ষ্ম শিল্পের পরিচয়।

বৈদিক সাধনা কাণ্ড

"ব্রাহ্মণ মাত্রই—সকলেই শক্তি বা শক্তির উপাসক; তাঁরা বেদমাতা গায়ত্রীর উপাসক, তাঁরা শৈবও নন্, বৈষ্ণবও নন্" [শ্রীহরি ভক্তি বিলাসে, ৩য় বিলাস, মনুস্মৃতি ধৃতবচন :—'ব্রাহ্মণাঃ শক্তিকাঃ সর্ব্বেঃ····· গায়ত্রীং বেদমাতরম্' ।] সেই রকম অদিতির কথাও বলা যায়।

["শক্তিপূজা, বিশেষতঃ মাতৃভাবে শক্তিপূজা ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি।··· বাস্তবিক জগৎকারণকে 'মা' বলিয়া, জগদম্বা বলিয়া ডাকা একমাত্র ভারতেই দেখিতে পাওয়া যায়।···পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মায়া বলিয়া ভারতের দর্শনকার যে দুই পদার্থ জগতের মূলে নির্দ্দেশ করিয়াছেন উহা একই বস্তুর, একই কালে বিদ্যমান, দুই বিভিন্ন ভাব বা প্রকাশ বিশেষ। তবে দেশ কালাবচ্ছিন্ন বা নামরূপাবলম্বনে সবাহ্যান্তর্জগৎ উপলব্ধিকারী মানব মন একই কালে, একেবারে জগদম্বার দুই ভাব দেখিতে অক্ষম।···সে জন্য দেশকালাবচ্ছিন্ন সগুণভাবের উপলব্ধির সময় সে জগদম্বার নির্গুণ ভাব উপলব্ধি করিতে পারে না, এবং সমাধি সহায়ে উচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করিয়া যখন সে জগন্মাতার নির্গুণস্বরূপের প্রত্যক্ষ করে তখন আর তাহার নয়নে তাঁহার সগুণভাবের ও সগুণ ভাব প্রসূত জগতের উপলব্ধি হয় না। তবে সমাধি ভূমি হইতে নামিয়া সে নিঃসংশয় বুঝিতে পারে তিনি নির্গুণা ও সগুণা উভয়ই"—ভারতে শক্তিপূজা (নিবেদন)—স্বামী সারদানন্দ।

প্রতীকাবলম্বনে শক্তিপূজা যে ঐ সমাধিলাভের সহায়ক একথাও ভারতের ঋষি ও আচার্য্যেরা আবহমানকাল হইতে নিজেরা উপলব্ধি করিয়া জনসাধারণে প্রচার করিয়া আসিতেছেন।·· শাস্ত্রকারেরা বলেন—অন্তর ও বাহ্য জগতের অন্তর্গত যে সকল বিশেষ শক্তিশালী পদার্থ মানবমনে স্বভাবতঃ অনন্তের ভাব উদ্দীপিত

করিয়া তাহাকে জগৎকারণের অনুসন্ধানে ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করণে নিযুক্ত করে' তাহাকেই প্রতীক বলে। আর ধাতু, প্রস্তর বা মৃত্তিকাদি কোন প্রকার পদার্থ গঠিত কৃত্রিম মূর্ত্তি বিশেষে, জগৎ কারণের সৃষ্টি স্থিত্যাদি গুণরাশির আরোপ বা আবেশ কল্পনা করিয়া পূজা ধ্যানাদি সহায়ে জগন্মাতার সাক্ষাৎ স্বরূপের উপলব্ধি করাকে প্রতিমা পূজা বলে। 'অব্রহ্মণি ব্রহ্ম দৃষ্টানুসন্ধানং'— অর্থাৎ যাহা সসীম স্বভাবহেতু পূর্ণব্রহ্ম নহে, ঐ প্রকার কোন পদার্থ বা প্রাণীকে ব্রহ্ম ধরিয়া লইয়া পূর্ণব্রহ্মের স্বরূপানুভূতির চেষ্টা করার নামই প্রতীক ও প্রতিমা পূজা" (ঐ, ঐ)]।

শাস্ত্রের ঐ রকম মর্ম্ম সত্ত্বেও, শাস্ত্রেরই দোহাই দিয়ে, একদল আপত্তি উত্থাপন করেন যে, (১) বেদে, প্রতীক, প্রতিমা বা মূর্ত্তির উপাসনা নেই, (২) উপনিষদেও নেই ; (৩) তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনা না ক'রেই তাঁরা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা—" এই শ্লোকটি তুলে অর্থ করেন, 'উপাসকেরাই ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করেন', অতএব তাঁদের মতে ঐ রকম উপাসনা তন্ত্র সম্মতও নয় অর্থাৎ দ্বিবিধ শ্রুতি—বেদ ও তন্ত্র— স্বীকার করলেও ঐ রকম উপাসনা সমর্থনযোগ্য নয়। ইতিপূর্ব্বে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের আভাষ দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি, ব্রাহ্মণগ্রন্থে অনেকগুলি মূর্ত্তির নাম আছে। উপনিষদে, সগুণব্রহ্ম ও নির্গুণব্রহ্ম—এই দুই ভাবেরই প্রসঙ্গ আছে। উপনিষদ, অনুষ্ঠানের গ্রন্থ নয়, তাতে আনুষ্ঠানিক পূজা-পদ্ধতি বা প্রতিমার কথা কি জন্য থাকবে ? উপনিষদের সঙ্গেও যে যজ্ঞের সম্বন্ধ ছিল তাও আমরা দেখেছি।

["সাধকানাং হিতার্থায়"—এই 'হিতার্থায়' স্থানে 'ভেদার্থং' পাঠান্তরও আছে। এ সম্বন্ধে, ৺ পণ্ডিত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্ত বলেন, 'উপাসকানাং ভেদার্থং ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা' এই বচনে 'কল্পনা' এই কৃদন্ত প্রয়োগের যোগে কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়ই ষষ্ঠি বিভক্তি হইতে পারে। ইহাতে 'ব্রহ্মণঃ' এই পদে কর্ত্তাতে, কি কর্ম্মে ষষ্ঠি, ইহা নিয়াই যত গণ্ডগোল। এক পক্ষ কর্ত্তাতে ষষ্ঠি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন,—স্বয়ং ব্রহ্মই বিভিন্ন মতাবলম্বী উপাসকগণের উপাসনা সৌকর্য্যার্থ নিজের রূপ কল্পনা করিয়াছেন। অপর পক্ষ বলেন,—এই স্থলে কর্ম্মে ষষ্ঠি, উপাসকগণই নিজেদের উপাসনার জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে উপাসকের কল্পিত রূপ ব্রহ্ম নহে, যেহেতু ব্রহ্মের কোন রূপ নাই। এই তর্ক নিরর্থক ; ব্রহ্মের রূপ উপাসকের কল্পিত বলিয়া স্বীকার করিলেও, যিনি অনন্তরূপের আধার, রূপময় জগৎ যাঁহার কুক্ষিগত, তাঁহার বাহিরে ত

উপাসক কোন রূপ কল্পনা করিতে পারিবে না, অতএব উপাসক যে রূপই কল্পনা করুন না কেন, তাহাই ব্রহ্মের রূপ হইবে।" কৌলমার্গরহস্য]।

যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সবই ছিল প্রতীক। যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হবার পূর্ব্বে দীক্ষিত হ'তে হত। দীক্ষাসংস্কার গ্রহণ ভিন্ন উপদেশ দেওয়ার রীতি সাধারণতঃ ছিল না। ত্রিবর্ণের উপনয়ন সংস্কারগ্রহণ অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। তবে বিশেষ স্থলে, ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়—আচার্য্য সব সময়ে বিধি নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকা দরকার মনে করতেন না। তিনি বিদ্যা ও শ্রদ্ধাই দেখতেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখি যে, উদ্দালকের সঙ্গে পাঁচজন 'বৈশ্বানর শ্রোত্রীয় মহাগৃহস্থ', গৃহস্থ ব্রাহ্মণ অশ্বপতি কৈকেয়ের কাছে বিনীতভাবে বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব জানতে চান; রাজা, মাত্র একদিন বিলম্ব ক'রে, অর্থাৎ পরের দিন, তাঁদের—উপনয়ন সংস্কার না করেই—আত্মতত্ত্ব উপদেশ করলেন। অনেক গৃহস্থও ছিলেন ব্রহ্মবিৎ—উপনিষদে ও অন্যত্র ইহার প্রমাণ যথেষ্ট। ক্ষত্রিয় গুরু ব্রাহ্মণকেও দীক্ষিত করতেন। উচ্চ বিদ্যা লাভের আগ্রহ কোন আভিজাত্য-বোধরূপ বাধা মানত না, সে সময়ে সে বোধই পরিস্ফুট হয় নি। তখন গুরুগৃহবাসান্তে ঘরে ফিরে এলে (স্বাধ্যায় ও সমাবর্ত্তনের পর) উপনয়ন বা দীক্ষা সংস্কার হত। ঐ সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত ছাত্র শূদ্রবৎই থাকতেন। উপনয়নের সঙ্গে গায়ত্রী শিক্ষালাভ হত, তখন ছাত্রের বিবাহের অধিকার জন্মাত। এখন গুরুগৃহ নেই, সে আশ্রম বা আশ্রমভাবও নেই—স্বাধ্যায় ত দূরের কথা। এখন বিবাহে যোগ্যতা লাভ করবার জন্যই যেন উপনয়ন সংস্কার হয় ও গায়ত্রীর কটা মন্ত্র শেখান হয়। 'ব্রহ্মযজ্ঞ' এখন করা হয়েছে ইচ্ছা সাপেক্ষ ও তাও শেষ করা হয়, ঋক, যজুঃ ও সামবেদের প্রথম শ্লোক কয়টি আবৃত্তি করেই—ইহাই এখন ব্রহ্মযজ্ঞ! তখন গৃহস্থ হ'তে হলে যে শিক্ষা বা সাধন প্রণালীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হত, এখন সেই উদ্দেশ্যটি পর্য্যন্ত ভুল হয়েছে।

যজ্ঞে উপবাসের নিয়ম ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণের অনুবাদক এ সম্বন্ধে বলেন যে উপবাস মানে অনশন নয়। উপবাস (উপ + √বস)= সংযত হয়ে নিয়ম গ্রহণ করে যাগ বা সাধনার স্থানে বাস।

["...অনশনকে যে বুঝাইতেছে না তাহা সর্ব্বত্রই প্রতীয়মান হয়, কেননা সেই

দিন ব্রতোপযোগী দ্রব্যের আহার করার ব্যবস্থা পাওয়া যায় (১১, ১. ৯ ১০)। অথবা সেদিন তাদৃশ নিয়মপূর্ব্বক অবস্থান করিলে দেবগণ উহাদের নিকট আগমন করেন (১. ১. ১ ৭), ইহা হইতেও উপবাস হইতে পারে (তুলঃ উপবসথ)। আপস্তম্ব শ্রৌত্রসূত্র (১. ১৪. ১৬) ভাষ্যকার রুদ্রদত্তের উক্তি (শ্বো যাগার্থোঽগ্নি সমীপে নিয়মবিশিষ্টো বাসঃ উপবাসঃ), কাত্যায়ন শ্রৌত্রসূত্র (২ ১ ১) সম্বন্ধে কর্ক ভাষ্যকারের অর্থ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭ ২ ১০) সায়নের অর্থ, গোভিল গৃহ্য ভাষ্যে (১. ৫ ২) ।" বিধুশেখর বাবু বলছেন, "বঙ্গ বিধবার নিরম্বু একাদশীর সূত্রপাত কি শব্দকল্পদ্রুমে ৪র্থ চরণের পাঠ হতে?" ৺ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন যে উপবাস শব্দের তিন অর্থ : (১) সমীপোবাস অর্থাৎ যাগের পূর্ব্বে গার্হপত্যাদির সমীপে বাস। (২) দেবগণ যজ্ঞের সমীপে বাস করেন। (৩) ব্রত গ্রহণার্থ গ্রাম্য-ভোজন ত্যাগ করিয়া অরণ্যভোজনের নিয়ম]।

উপবাস পালনের উক্ত বিধির সঙ্গে উচ্চ সংস্কার প্রাপ্ত সাধকের উপবাস পালনবিধির কতক সাদৃশ্য আছে। "ক্ষত্রিয় রাজা দেবতা বিষয়ে ইন্দ্রের, ছন্দে ত্রিষ্টুভের, স্তোমে পঞ্চদশ স্তোমের, রাজত্বে সোমের সম্বন্ধযুক্ত, ও, বন্ধ সম্পর্কে তিনি রাজন্য" [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫ম খণ্ড—আহবণীয়ো স্থাপন]। ঐ স্থানে বলা হয়েছে যে তিনি দীক্ষিত হলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। অনুষ্ঠানাদিতে জল ব্যবহার হত—যেমন সন্ধ্যা পূজায় হয়। ঐ জল 'অপ'এরই প্রতীক বলে গণ্য হত। জল বাহ্য উপকরণ মাত্র।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (পৌর্ণমাস যজ্ঞে) উক্ত অনুবাদক মহাশয় বলেছেন, "জল প্রণয়ন-স্থলে মূলে সর্ব্বত্রই 'অপ' শব্দের প্রয়োগ আছে। 'যে হেতু জল বজ্রই, সেই জন্য ইহা যে স্থান দিয়া যায় সেই স্থানকে নিম্ন করিয়া দেয়, এবং যে স্থানে ইহা উপস্থিত হয় তাহাকে 'নিদগ্ধ' (নিঃসার) করে।" পাদটীকায় অনুবাদক বলছেন, "জলের সহিত 'দহ' ধাতুর প্রয়োগ আরও বিচিত্র।" এখানে বক্তব্য এই যে, মূলের 'অপ' অর্থে বাঙ্গালা 'জল' না করলে 'দহ' ধাতুর প্রয়োগ বিচিত্র বোধ হবে না। 'অপ' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যজ্ঞে 'অপ' স্ত্রীরূপে ও 'অগ্নি' পুরুষরূপে কল্পিত। অনুবাদক মহাশয় দেখিয়েছেন যে প্রবহমান বায়ু = পবন (পুঙ-অর্থ) = পবিত্রীকরণ, শুদ্ধিকরণ। "পবিত্র শব্দ বৈদিক সাহিত্যে ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ইহা গত্যর্থে প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু বেদে ইহার গত্যর্থে প্রয়োগ দেখা যায়"]।

ঋগ্বেদী, সামবেদী বা যজুর্বেদী—যিনি যে বেদীই হোন, সন্ধ্যাগায়ত্রী সকলকে করতে হয়। উপনয়ন সংস্কারে পৈতা হয়। এই পৈতার নাম

যজ্ঞসূত্র বা যজ্ঞোপবীত। যজ্ঞোপবীত ত্রিদণ্ডী বা তিন ফেব সূতাব গ্রন্থি, সমাবর্ত্তনেব পব ২টি বা ৩টি ধাবণ কবতে হ'ত। ঐ সূতা কোন্ বেদীব কতটা লম্বা হবে, তাবও বিধি আছে। সামবেদীব গ্রন্থি বিধানে ও অপব বেদীব গ্রন্থি বিধানে পার্থক্য আছে। প্রতি সূতায় তিনজন দেবতাব অধিষ্ঠান, অতএব ৩×৩=৯ দেবতা—ওঁ, অগ্নি বা তেজ, অনন্ত, সোম, পিতৃগণ, প্রজাপতি, বসু, যজ্ঞ, শিব। এই জন্য ব্রাহ্মণকে নব গুণান্বিত হ'তে হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণেব লক্ষণ, (১) ব্রহ্মবিৎ বা বেদজ্ঞ, (২) তেজ বা নির্ভীক (আদর্শে অটল), (৩) ধৈর্য্য বা সর্ব্বসহনশীলতা, (৪) অমৃতময় হৃদয় (সকলেব আনন্দ দায়ক), (৫) স্নেহশীলতা, (৬) সর্ব্বপালক বা নিঃস্বার্থ ত্যাগ বুদ্ধি, (৭) স্বধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠা, (৮) সত্য প্রতিষ্ঠ, (৯) বিষয়ে অনাসক্তি, শান্তভাব বা বৈবাগ্য। ইহাই উপনয়ন সংস্কাবেব অর্থ। ঐ নয়টি গুণ ব্রাহ্মণকে অর্জ্জন কবতে হয়। মন্ত্র প'ড়ে পৈতা কেমন ক'বে ভাঁজ কবতে হয় তাবও বিধি আছে।

পূর্ব্বে মেয়েদেবও পৈতা হত—'উপবীতি,' 'উপবীতিন' শব্দদ্বয় ও আছে। বৈদিক সকল অনুষ্ঠানই সস্ত্রীক কবতে হত, স্ত্রীব ছিল সমান অধিকাব। পবে, নাবীদেব এই সব অধিকাবেব সঙ্গে উপবীত ধাবণেব অধিকাবও কেড়ে লওয়া হয়। কিন্তু, যখন উপনয়নহীন ব্যক্তি দ্বিজ ব'লে গণ্য হতে পাবেনা, এই বিধি আছে, তখন বলা হ'ল যে দ্বিজ কন্যাব বিবাহ হলেই উপনয়নেব ফল পাওয়া যায়, অতএব ওটা নাবীদেব দবকাব নেই। হিন্দু দেব-দেবীদেব পৈতা আছে। তন্ত্রে, বিবাহিত গৃহস্থকে সস্ত্রীক অনুষ্ঠান কবতে হয়, নাবীব অধিকাবও সমান।

সন্ধ্যা বা গায়ত্রী জপেব পূর্ব্বে গায়ত্রী-শাপোদ্ধাব কবতে হয়, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র গায়ত্রীকে অভিসম্পাত কবেছিলেন। বশিষ্ঠ-শাপ-বিমোচনে, মন্ত্রেব মধ্যে, 'অর্কজ্যোতিবহং' 'ব্রহ্মজ্যোতিবহং' 'শিবজ্যোতিবহং', বিষ্ণুজ্যোতিবহং' বলতে হয়। এই বোধ উদ্দীপিত হলে গায়ত্রী আবাব পূর্ব্ব-তেজ ফিবে পান ও সাধকেব কল্যাণ কবেন। বিশ্বামিত্রেব শাপ-বিমোচনেব মন্ত্রটি একটি সুন্দব স্তুতি। এই শেষ মন্ত্রে গায়ত্রীব তিন নাম পাওয়া যায়—সন্ধ্যা, সবস্বতী, ব্রহ্মযোনি।

বৈদিক সন্ধ্যায় প্রথম হ'তেই 'বস' শব্দটিব প্রয়োগ দেখা যায়। সর্ব্বভাব-সমষ্টিই 'বস'। 'বস' সর্ব্বসঞ্চাবী। বসসঞ্চবণে শৃঙ্খলা আসে। এই শৃঙ্খলাব

প্রসার, বিস্তৃতি বা বিকাশে হয় সৃষ্টি-স্থিতি, বিপরীত গতিতে—সংকোচে, হয় প্রলয়—হয় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন বিবর্ত্তন। ঐ তিন অবস্থা ও তার গতি প্রগতির মধ্যে যে 'রস'—সুর তাল ও ছন্দ—আছে, তাহাই 'ঋত'। সকলের মধ্যে নিত্য অস্তিই 'সত্য'। গায়ত্রী ঐ ঋতসত্যমকে অনুভব করবার রসসঙ্গীত।

ঋগ্বেদী, সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী—এই তিন রকম সন্ধ্যা। ঋগ্বেদী-সন্ধ্যায় মন্ত্র বাহুল্য ও সামবেদী সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান বাহুল্য। সন্ধ্যা অনুষ্ঠানের মন্ত্রগুলির ভাব ও অর্থ প্রায় একই প্রকার। সম্যক্ ধ্যানই সন্ধ্যা। একাগ্রচিত্ত হওয়ার জন্যই এই অনুষ্ঠান। সামবেদীয় সন্ধ্যাই ধরা যাক্। দশটি অনুষ্ঠান করতে হয়ঃ—(১) মার্জ্জন, (২) প্রাণায়াম, (৩) আচমন, (৪) পুনর্মার্জন, (৫) অঘমর্ষণ, (৬) সূর্য্যোপস্থান, (৭) গায়ত্রী জপ, (৮) আত্মরক্ষা, (৯) রুদ্রোপস্থান, (১০) সূর্য্যার্ঘ্য। মার্জ্জন হচ্ছে বাহ্যাভ্যন্তর শোধন ও শুচিতা, প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য সমস্ত দেহকে বিশুদ্ধ করা, যাতে অল্পায়াসে মন স্থির হয়। আচমন হচ্ছে অন্তঃস্থাপন। অঘমর্ষণ মানে পাপ ক্ষালন। ধর্ম্ম (অভ্যুদয়) বা পুণ্যের দ্বারা পাপ বিধৌত হলে মোক্ষ আসে। আত্মরক্ষা হয় সোঽহং চিন্তায়, একাত্মতা জ্ঞানে। উর্দ্ধরেতা হ'য়ে বিশ্বরূপী ঋত সত্যের সংহাররূপী রুদ্রকে হৃদয়ে স্থাপন ও তাঁর স্তুতিই রুদ্রোপস্থান।

মার্জ্জনের মন্ত্র "ওঁ শন্নো আপে…স্ব" (১-৬)। 'অপো' শব্দটির অর্থ 'জল' করা হয়, ধন্বন্যা আপঃ='মরুদেশস্থ জল' অর্থ করা হয়। অপ='রস' অর্থ করলে ১ম শ্লোকটির অর্থ হয়, 'মরুময় দেশস্থ রসই হোক্, রসপূর্ণ স্থানোদ্ভব রসই হোক্, সমুদ্ররস প্লাবিত স্থানই হোক, কূপস্থ রসই হোক—সেই রস আমাদের কল্যাণ প্রাপিকা হোক" ('শমনঃ')। 'জল' সাধারণ অর্থ, কিন্তু মরুময় দেশ, শুষ্ক দেশ। মরুতে জল থাকে না, থাকে মাত্র মরূদ্যানে (oasisএ)। সূর্য্যাপেক্ষা মরুময়-দেশ আর হয় না। রস সর্ব্বসঞ্চারী বিধায়, এই রস ঐ প্রচণ্ড জ্বালাময় সূর্য্যেও বর্ত্তমান। অতি সংকীর্ণ স্থান কূপে ও ঐ রস বর্ত্তমান। "শমনঃ সন্তু" কথাটি লক্ষ্য করতে বলি। 'অপ' বা 'রসই' কল্যাণ-প্রাপিকা শক্তি। মরূদ্যানে, জল ও গাছ পালা থাকে। মূলে গাছ পালার কথা নেই, কিন্তু ঐ স্থান পথিকের শ্রান্তি ও অবসাদ নিবারক, ভয়ঙ্কর তাপের মধ্যে আশ্রয় স্থল—শুষ্ক প্রদেশের উহাই রস। এ ভাবেও অর্থ করা যায়। সমুদ্রিয়, আপঃ' (মূলের)='সলিল', 'আত্মস্বরূপ সমুদ্র'।

[পূর্ব্বে স্বামীজীর কথা উদ্ধৃত হয়েছে। 'অপ', 'সলিল' শব্দদ্বয়ের অর্থ আমরা দেখেছি। "অপার পারাবার বিস্তার সম্বিৎ সলিল চালনৈঃ। চিদেকার্ণব একোঽয়ং স্বয়মাত্মা বিজৃম্ভতে"—(যোগবাশিষ্ট সার), অর্থাৎ 'অতি বিস্তার সম্বিৎরূপী সলিল চালনে আত্মস্বরূপ অর্ণব বিজৃম্ভিত হয়।' সম্বিৎ = নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য = প্রকাশ। তন্ত্রে শক্তিকে সংবিন্ময়ী বলা হয়। 'ঈক্ষণ', 'বহুস্যাং প্রজায়েয়' ইত্যাদিই প্রথম স্ফুরণ, শক্তির প্রথম বিকাশ = (তন্ত্রের) বিমর্শ। ("সেবা-ঈক্ষণ-কাম-তপোবিচিকীর্ষাদি শব্দৈরুচ্যতে)"। ঈক্ষণ-কাম-তপঃ বিচিকীর্ষাদিরূপই প্রথম স্পন্দন, যাতে শক্তির বিকাশ হয়। (তন্ত্রের শক্তিতত্ত্ব)। ("সোঽকাময়ত, বহুস্যাং প্রজায়েয়" (তৈত্তীরীয়))। ঈক্ষণ, বহু হবার কাম, সংযোগ, বিয়োগ, বিস্তার হওয়া বা ঘনীভূত হওয়া, প্রদীপ্ত হওয়া, তাপ বিকীরণ করা, তাপ সংহার করা, আকর্ষণ বিকর্ষণ = সৃষ্টি স্থিতি সংহার সবই (তন্ত্রের ভাষায়) ঐ বিমর্শশক্তির ক্রিয়া। মূলে 'এনস' শব্দ আছে, 'পাপ' নেই। এনস = অধর্ম্ম। 'রস' অর্থ করলে, ৩য় শ্লোকটির অর্থ সঙ্গত ও আরো পরিষ্কার হয়, "হে রস ... আমাদিগকে অন্ন ভোগে সামর্থ্য প্রদান কর এবং মহৎ ও রমণীয় ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে অধিকারী কর।" [আজ = যজ্ঞার্থে মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত ঘি। অভুক্ত সংস্কার ও যে সংস্কার প্রকাশ পেয়েছে—এই অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ সংস্কারদ্বয়ই পাপ (রূপ গোস্বামীর অর্থ—'অপ্রারব্ধং ভবেৎ পাপং, প্রারব্ধং—')। আশ্চর্য্যের বিষয়, পণ্ডিতেরাও, এখন পর্য্যন্ত, স্বামীজির মন্তব্য সত্ত্বেও, 'O Thou Waters' অনুবাদ করেন]।

চতুর্থ শ্লোকে 'শিবতমোরস = শ্রেষ্ঠতম কল্যাণরূপ। এখানে 'রস' শব্দটির স্পষ্ট প্রয়োগ। এই কল্যাণরূপকে মাতৃতন্ত্রের রস বলা হয়েছে। "ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিদ্ধাৎ..." শ্লোকে, সুন্দর প্রার্থনায় সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

["ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ। ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী। ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষ-মথো স্বঃ।৮। (ঋগ্বেদ ১০ম।১৯০ সূ)। পূর্ব্ব শ্লোকের 'অরংগমাম' = 'পর্য্যাপ্তরূপে উপলব্ধি করি' বা 'অনুপ্রবিষ্ট' অর্থ করা যেতে পারে। ঋত সত্য = চণকাকার ব্রহ্ম; অভীদ্ধাৎ = 'অভি' অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে 'ইদ্ধাৎ' = নিরুদ্ধ বৃত্তি, পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ বৃত্তি বা প্রলয়, যা অদৃষ্টবশতঃ হয়। অর্ণব = অর্ণযুক্ত বা সলিলরাশি। ভোগকারণ জগৎ উৎপত্তির হেতু সলিলরাশির উদ্ভব হল। অর্ণব হ'তে ধাতা বা বিধাতা, 'মিষতঃ', প্রকাশমান হলেন। (পূর্ব্বে 'অপ', 'হিরণ্যগর্ভ' ও 'সলিল' এই শব্দত্রয়ের অর্থ বলা হয়েছে)। তিনি 'বিশ্বস্যবশী' = মায়াধীশ, সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয়ে সামর্থ্যবান। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—সবই একটি

মহাসঙ্গীতের ধারা, একটি মহা স্বরতরঙ্গ। সেই স্বরই ঋত—এক, ক্ষয়হীন, একাক্ষর ব্রহ্ম। সত্য মানে স্বরূপ ভাব। অতএব চণকাকারই ঋত সত্য। তপসঃ=তপস্যা হ'তে অর্থও হয়—তপস্যা করেই 'পুরুষ' নিজের মধ্যে দ্বাদশাহ যজ্ঞ দেখেছিলেন। (দ্বাদশাহ=দ্বাদশদিনে সম্পাদ্য যজ্ঞ—দ্বিবিধ—ভরত দ্বাদশাহ ও ব্যূঢ় দ্বাদশাহ। বেদে ঋত=বৎসরব্যাপী যজ্ঞও বোঝায়।) 'সংবৎসরো অজায়ত]।

অর্থাৎ বলা হয়েছে যে, ঋতসত্য সর্ব্বতোভাবে নিরুদ্ধ ছিল—চণকাকার রূপে ছিল—রাত্রি অর্থাৎ গূঢ় অন্ধকার ছিল ইত্যাদি, যে, এই বিধাতা, পরিকল্পিত পূর্ব্বসৃষ্টির ন্যায় সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দিব্যলোকাদি সৃষ্টি করলেন।

[এই সূর্য্য ও (পরের) ভূর্ভুবঃ স্বঃ আদির ধাতাই ব্রহ্মা। বেদে, বিষ্ণু=সর্ব্ব-তেজোময় সর্ব্বব্যাপী দীপ্তি। পুরাণে, কারণবারিতে বিষ্ণু শয়ান, তাঁর নাভিতে ব্রহ্মা। (তন্ত্রে, নাভিস্থান=মণিপুরচক্র। ধোলো চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ইহাই জঠর মস্তিষ্ক—'abdominal brain'। এই স্থান হ'তেই ভাববাহী বা অনুকম্পালু নাড়ীগুলির (sympathetic nerves দের) প্রসার ও এই স্থান হ'তেই রক্ত সঞ্চালন হয়। 'নাই' বা নাভি কামারের দোকানে সব আঘাত সহ্য করে ও গঠনকার্য্যে সহায়তা করে]।

"শন্নো আপো" ইত্যাদি মন্ত্রটি অথর্ব্ববেদের। এই মন্ত্র সর্ব্ববেদীরাই বলেন। (কাত্যায়ন ঋষির উপদেশ যে, যদি স্বশাখার ভাব-বিরুদ্ধ না হয়, তা হলে যা স্বশাখায় নেই, তা অন্য শাখা হতে গ্রহণীয়)। তারপর, ওঁকারের ঋষি, ছন্দ ও দেবতাস্মরণ। সত্যদর্শী বা মন্ত্রদ্রষ্টাই ঋষি। যিনি যে মন্ত্র প্রকাশ করেন, তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি। ঋষিস্মরণ মানে, সাধককেও ঋষিজীবন অনুসরণ করতে হবে। সাতটি ব্যাহৃতি :—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য—এই সপ্তলোক।

[নরলোক, দেব বা প্রেতলোক=ভূঃ—পুণ্যাত্মা সূক্ষ্মদেহী নরের স্থান, উচ্চতর দেবলোক বা মাহেন্দ্রলোক=ভুবঃ স্বঃ—ভোগভূমি, মহর্লোক=যে সব দেবতারা ধ্যানাহারী ও 'ভূত' সমূহকে আয়ত্তাধীনে রাখতে সমর্থ তাঁদের এইস্থান, জনঃ তপঃ ও সত্যলোক=ব্রহ্মলোক। (জনলোকের দেবগণ সর্ব্বভূতবশী, তপোলোকের—ঊর্দ্ধরেতা ও তন্মাত্রবশী)]।

ঐ সাতটি, স্বর্গলোক বা দিব্যলোক। তারপর, নিজের চারিদিকে জলবেষ্টন ক'রে—প্রোক্ষণে—সেইটি 'অগ্নি প্রাচীর'—এই চিন্তা ক'রে নাভিতে ব্রহ্মার ধ্যান করতে হয়। ব্রহ্মা রজোগুণী, তাই রক্তবর্ণ। তন্ত্রে, অজপা

জপসময়ে অথবা সাধাবণ 'মানস-হোম' প্রভৃতি সময়ে নাভিতে ধ্যানেব ব্যবস্থা আছে, ও ঐ স্থান হ'তে কুণ্ডলিনী উত্থাপন কবতে হয়—সাধাবণ নিয়ম যদিও মূলাধার হ'তে। বৈদিক সন্ধ্যায় যা আছে, সেই ভাব ও তদনুরূপ অনুষ্ঠান তন্ত্রমধ্যে ছড়িয়ে আছে। আচমনেব বিধি আছে, বৈদিক সন্ধ্যায় দুবাব আচমন কবতে হয়, কিন্তু তান্ত্রিক বা পৌবাণিক কর্ম্মে তিনবাব আচমন কবতে হয়। চণকাকাবেব ভাব ব'লেই আচমন দুবাব; ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়ারূপা ত্রিশক্তিব ভাব বলেই তিনবাব আচমন; পুবাণ, এ স্থলে তন্ত্রানুগামী।

সমর্থ হলে 'গায়ত্রী-হৃদয়' পড়তে হয়। স্থানে স্থানেব অনুবাদ দেওয়া হল, "তমোগুণাতীত পবম জ্যোতির সঙ্গে প্রণব ও ব্যাহৃতি নিত্যযুক্ত। বিষ্ণুই সেই জ্যোতির্ম্ময় স্বয়ম্ভু বা স্বতঃসিদ্ধ পুরুষ। তিনি অপ সৃষ্টি কবলেন। আঙ্গুল দিয়ে মন্থন কবলেন, মন্থনে ফেনা হল, ফেনা বুদ্বুদাকার হল, বুদ্বুদ হ'তে অণ্ড হল, অণ্ড হ'তে বাযু হল, বাযু হ'তে অগ্নি হল, অগ্নি হ'তে ওঁকাব হল, ওঁকাব হ'তে ব্যাহৃতি হল, ব্যাহৃতি হ'তে গায়ত্রী হল, গায়ত্রী হ'তে সাবিত্রী হল, সাবিত্রী হ'তে সবস্বতী হল, সবস্বতী হ'তে বেদ হল, বেদ হ'তে ব্রহ্মা হল, ব্রহ্মা হ'তে লোকসকল হল—সেই হ'তে লোকসকল বর্ত্তমান। চতুর্ব্বেদ, উপনিষদাদি ইতিহাস সমেত সমস্তই বর্ত্তমান—সমস্তই গায়ত্রী হ'তে প্রবর্ত্তন হয়েছে বা প্রকাশ পেয়েছে। "(তৎসবিতুর্ব্ববেণ্যং" ইত্যাদি)—'তৎ' ইহাই তেজ। যাহা তেজ তাহাই অগ্নি। এই সবিতাই আদিত্য, ববেণ্যই অন্ন, অন্নই প্রজাপতি। ভর্গই অপ, যাহা অপ, সেই সর্ব্বদেবতা। 'দেবস্যসবিতুর্দেবো' (দেব = পুরুষ = বিষ্ণু)। 'ধীমহি', ইহাই ঐশ্বর্য্য, (তিনি সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যরূপী), এই ঐশ্বর্য্যই প্রাণ। ইহাই অধ্যাত্ম। যাহা অধ্যাত্ম, সেইই 'পবমপদ'। তাহাই মহেশ্বব। 'ধিয়', ইহাই 'মহী'। মহীই পৃথিবী। 'যোনঃ প্রচোদয়াৎ', যিনি আমাদিগকে (কামরূপে) চালিত কবেন। 'কাম ইমান্ লোকান্ প্রচাবয়তে'—কাম এই লোক সকলকে প্রচালিত কবেন। 'যো নৃশংসো যোঽনৃশংসোঽস্যাঃ স পবো ধর্ম্ম ইত্যেষা বৈ গায়ত্রী'—যিনি নৃশংস ও অনৃশংস—যাঁব ইহাই শ্রেষ্ঠ বা অসাধাবণ ধর্ম্ম—তিনিই গায়ত্রী। "

'কাম' সম্বন্ধে বলা হযেছে যে, নৃশংস কার্য্যেব প্রবর্ত্তক কাম, আবার

'অনৃশংস কার্য্যেরও প্রবর্ত্তক কাম ; এই প্রেরণা দান করাই গায়ত্রীর বিশেষ ধর্ম্ম। 'ঐশ্বর্য্য', 'অধ্যাত্ম', 'পরম-পদ', 'অগ্নি', 'সূর্য্য' ইত্যাদির অর্থ স্পষ্ট। 'অন্ন' কে তুচ্ছ করা হয় নি, ইহাও লক্ষ্য করতে বলি। গায়ত্রী ছন্দের ২৪টী অক্ষর, তাই 'বরেণ্যং' উচ্চারণে 'বরেণীয়ং' উচ্চারণ করতে হয়। 'আকাশ' ও 'শব্দ', মীমাংসকের অর্থে গৃহীত। গায়ত্রীর ছয়টি স্বর বা 'ছন্দস্পন্দ'—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, বিভিন্ন সময়ে গায়ত্রীর বিভিন্ন নাম ও রূপের বর্ণনা—ইনি বিরাট। সাধনে, চিন্তাকে যত মহান্ ও ব্যাপক করা যায় ততই সুবিধা, ইহাই অধ্যাত্ম শিল্প-কৌশল।

'আপোজ্যোতি' মন্ত্রই 'গায়ত্রী-শির' অর্থাৎ এই মন্ত্রেই রহস্য ব্যক্ত হয়েছে। ভর্গই সকলের বুদ্ধিকে প্রেরণা দেন, তিনি রস-স্বরূপ, জগতের কারণস্বরূপ, সর্ব্ব হৃদয়ে চেতনাত্মস্বরূপ। বলা হয়েছে যে সর্ব্বজীবের মধ্যে সূর্য্য আছেন, তার মধ্যে সোমমণ্ডল বর্ত্তমান ইত্যাদি। চণকাকারই সর্ব্বগত সর্ব্বসূর্য্যমণ্ডল—রসস্বরূপ বা সোমস্বরূপ। সোম মানে চন্দ্র। এই সোমই বেদের অমৃত ও তন্ত্রে সোমই অমৃতস্বরূপ। রসমধ্যে তেজ, সেই তেজমধ্যেই সত্য, তেজমধ্যেই—'অভয়ং অমৃতং', এই অভয়ই তেজ, তার মধ্যেই সত্য। সত্য বোধেই 'চেতনাত্মস্বরূপের' উপলব্ধি হয়। গায়ত্রী বর্ণনায় কি মহান্ বিশ্বরূপের ভাব ফুটে উঠেছে! সমস্ত জগৎ, সমগ্র বিশ্বের অন্তর বাহির যেন জমাট্ বেঁধে একটি রূপ ধরেছে।

প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় আচমন ক'রে কয়েকটি মন্ত্র বলতে হয়; পাপক্ষালন করতে হয়, যে সব পাপ "মনসাবাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না'। শেষে, প্রতি সন্ধ্যায় বলতে হয় "ইদমহং মামৃতযোনৌ সূর্য্য-জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা।" ইহা হোম, ইহা প্রার্থনা। এই হোমে সর্ব্বপাপ বিধৌত হয়, কেবল স্বকৃত নয়, কিন্তু, বলা হয়েছে, যেন ঐ রস হোমকারীকে—সূর্য্য, যজ্ঞ ও যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি দেবগণের, অসম্পন্ন যজ্ঞ-কৃত পাপ অথবা ক্রোধ ও তজ্জনিত পাপ হ'তে—রক্ষা করেন। দ্বিতীয় সন্ধ্যার হোমে উক্ত হয়েছে যে যেন 'রস' পৃথিবীকে পবিত্র করেন, পৃথিবী এবং জ্ঞানের আশ্রয়ভূত ব্রহ্মণস্পতি, ব্রহ্মদৃষ্টিতে পূত হ'য়ে হোমকারীকে পবিত্র করেন, এইরকম যেন সর্ব্বপ্রকার পাপ নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়। ৩য় সন্ধ্যাতেও ঐ প্রকার।

পুনর্মার্জ্জনের পর অঘমর্ষণ—'ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ...স্বঃ" পর্য্যন্ত বলতে হয়। ঐ তিনটি মন্ত্রোচ্চারণের পর নিঃশ্বাস দ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ কল্মষ জলে মিশে গেল ভেবে সেটি ফেলে দিতে হয়—কেহ কেহ এই রকম করেন, কেহ কেহ বা, গায়ত্রী প'ড়ে ত্রিসন্ধ্যায় তিনবার সূর্য্যকে অঞ্জলি দেন। 'অঘ' মানে 'পাপ', 'মর্ষণ' মানে 'দূরীকরণ'। এটি হল অঘমর্ষণ কথার অর্থ, কিন্তু অঘমর্ষণ, একজন ঋষির নাম। "অঘমর্ষণ ঋষিনুরষ্টুপ ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধা ভৃথে বিনিয়োগঃ।" ঋগ্বেদীয় প্রয়োগে অঘমর্ষণ ঋষির পরিচয়ও দেওয়া আছে—'মাধুচ্ছন্দ সাঘমর্ষণ ঋষি' ইত্যাদি। অঘমর্ষণ, মধুচ্ছন্দার পুত্র। এই মন্ত্রের দ্রষ্টা অঘমর্ষণ, ছন্দ অনুষ্টুভ, দেবতা 'ভাববৃত্ত'। ব্রহ্মাই ভাববৃত্ত দেবতা অর্থাৎ তিনি 'ভাবকে' প্রবৃত্ত করেন বা সৃষ্টি প্রবর্ত্তন করেন। বৈদিক সন্ধ্যায়, অঘমর্ষণ='মন্ত্রস্নান'। পৌরাণিক অনুষ্ঠানে অঘমর্ষণ ব্যাপারে, একজন কৃষ্ণবর্ণ, রক্তচক্ষু, বামকুক্ষিস্থিত পাপ পুরুষ কল্পিত হয়েছে, তাকে একটি প্রক্রিয়ার দ্বারা 'প্রস্তরে' আছড়ে বধ করতে হয়, শুষ্ক ক'রে পুড়িয়ে দিতে হয়। স্থূল হলেও, এটি যে মানসিক ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই। তন্ত্রেও ঐ রকম প্রক্রিয়ার ব্যাপারটি আছে। সম্ভবতঃ পুরাণ হ'তেই ঐ ভাব তন্ত্রে এসেছে, কারণ, তন্ত্রের উচ্চাঙ্গ সাধনায় 'মন্ত্রস্নানের' ব্যবস্থা পৃথক আছে। তন্ত্র, কোন ভাবকে ফেলে দেন না, বরং তাতে নিজের বৈশিষ্ট্য দেন। তন্ত্রের 'মন্ত্রস্নানে'ও সকল পাপ দূর হয় ও ইহা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার—বাহ্য কিছুরই দরকার হয় না, ইহা চিন্তার বা ধ্যানের ব্যাপার। বৈদিক যজ্ঞে 'প্রস্তর' হচ্ছে 'দর্ভগুচ্ছ'। ঐ 'প্রস্তরের' উপর যজ্ঞীয় দ্রব্য রাখতে হয়, যজমানের দেহকে ঐ 'প্রস্তরের' (দর্ভগুচ্ছের) প্রতিরূপ মনে করা হয়, 'প্রস্তর' বা দর্ভগুচ্ছকে পুড়িয়ে দিলে যজমানের সমস্ত বহির্মুখী বৃত্তি ভস্মসাৎ হল ও দেহ নিষ্পাপ হয়ে উচ্চলোকে যাবার অধিকারী হল। সেই 'প্রস্তরই' পুরাণে পাপপুরুষকে আছড়ে মারবার প্রস্তর বা শিলা হয়েছে, মনে হয়। সে যাই হোক্ এটা ঠিক্ যে সাধক পাপ পুরুষের ধ্বংস সাধন প্রত্যক্ষ করেন—সাধক জীবনীতে এটা পাওয়া যায়, কিন্তু শিলায় আছড়ে মারার উল্লেখ সেখানে নেই।

[ঋগ্বেদী অঘমর্ষণের পূর্ব্ব মন্ত্রটিতে 'রসের' উল্লেখ স্পষ্ট, "আজ আমি আপে

অণুপ্রবিষ্ট হয়েছি ('অন্বচারিষং), রসের দ্বারা অবগাহন করেছি ; হে অগ্নি তোমার তেজে আমাকে সংযোজন কর।']

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ…প্রচোদয়াৎ।" এই গায়ত্রী তিনবার প'ড়ে সূর্য্যাভিমুখে তিন অঞ্জলি জল ও মধ্যাহ্নে এক অঞ্জলি জল দিতে হয়। তারপর 'উদুত্যমিতস্থ চোপজায়ত'। এই তিন মন্ত্র সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগ হয়। সূর্য্যকে, সর্ব্বদেবসমষ্টিস্বরূপ ('দেবানাং আনিকং') ও স্থাবর জঙ্গম স্বরূপ বা আত্মা ('জগতুস্থশ্চ'), বলা হয়েছে।

[কেতবঃ = রশ্মিসমূহ। চিত্রং—আশ্চর্য্যং বা আশ্চর্য্যরূপে হৃদয়ে প্রকাশমান। এই মন্ত্রটি সামবেদের অন্তর্গত বংশব্রাহ্মণ গ্রন্থের প্রথম মন্ত্র।]

তারপর জপ শেষে, গুরুপরম্পরাকে প্রণাম ক'রে গায়ত্রী আবাহন, "ওঁ আযাহি বরদে দেবী ত্রক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী। গায়ত্রী ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্ম যোনি নমোহস্তুতে॥"

"[ত্রক্ষরে = ত্রয়ময়ী অক্ষর = ওঁ। বৈদিক নামানুকরণে যে সব ছন্দ (metre) আছে, সেগুলি নামমাত্র বৈদিক। 'ছন্দসং' মানে বর্ত্তমানের metre নয়, 'ছন্দস্' রক্ষিত হয়েছে অথর্ব্ববেদে ও জেন্দাবস্তায়]।

গায়ত্রীর ঋষি-বিশ্বামিত্র, ছন্দের নামও গায়ত্রী, দেবতা—সবিতা; ইহা জপে ও উপনয়নে বিনিযোগ হয়। তার পর প্রাতঃকালের ধ্যান—ব্রহ্মরূপা কুমারী, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপা তার্ক্ষস্থা, সায়াহ্নে শিবরূপা বৃদ্ধা—সর্ব্বসময়েই তিনি—সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থা। তারপর বিভিন্ন মুদ্রায় জপ করতে হয়, প্রাতে চিৎ হাতে, মধ্যাহ্নে হৃদয়াভিমুখী হাত করে, সায়াহ্নে উপুড় হাতে। সৃজনী শক্তির প্রথম প্রকাশ, বিস্তার—চিৎ হাতে; স্থিতিশক্তি, হৃদয়, প্রলয়-শক্তি-উপুড়—একেবারে উল্টে যাওয়া। এক অঞ্জলি জল দিয়ে বিসর্জ্জন হয়। বলা হয়, 'হে দেবি, যখন তুমি স্বেচ্ছাময়ী, তখন তুমি স্বেচ্ছায় যাও'। আত্মরক্ষার মন্ত্রে, 'অরাতীয়তো' = শত্রুর ন্যায় আচরণকারী = রিপু, অর্থাৎ অমঙ্গল বা বিঘ্ন, নিঃদহতি' = নিত্যদহন করে, 'বেদঃ' = যাতে বেদজ্ঞান স্ফুরণ হয়। [এখানে, অগ্নিকে শত্রুর ঐশ্বর্য্য (বেদঃ = 'ঐশ্বর্য্য'—কেহ কেহ করেন)। পুড়িয়ে দিয়ে রক্ষা করার কথা বলা হয় নি ; ইহা একটি প্রার্থনা, বেদ = ঐশ্বর্য্য = 'বেদজ্ঞান' এই অর্থ সুসঙ্গত), প্রার্থনা করা হয়েছে-যে যেন অগ্নি (আমাদের) সাধন বিঘ্নকে (শত্রুকে) নিত্যদহন করেন, (আমাদের)

বেদজ্ঞান স্ফুরণের জন্য, যেন (আমাদের) দুরতিক্রম্য ('দুর্গানি') যা কিছু আছে তার পারে নিয়ে যান ('অতি-পর্ষৎ'), আত্মরক্ষা হয়, সোঽহং চিন্তায়।

[তন্ত্র শাস্ত্রে, সাধারণ মানস-পূজায়, "পাতাল-ভূতল-ব্যোমচারিণো বিঘ্নকারিণঃ··· বলিং দত্ত্বা নির্দ্বন্দ্বো জপমারভেৎ" আছে। নির্দ্বন্দ্ব হয়ে জপ করতে বলা হয়েছে। বাধাবিঘ্ন ঠেলে মনকে দ্বন্দ্বভাব শূন্য করবার চেষ্টা না করলে সোঽহং চিন্তার আশা বিড়ম্বনা। প্রয়োগ অনুসারে সহজ ও ভাবানুগামী অর্থই ভাল। তন্ত্র বেদকে অনুগমন করেছেন, ভাবে; সেই জন্য তুলনামূলক আলোচনায় সুবিধা হয়। মনে রাখতে হবে, গায়ত্রীকে বেদমাতা বলা হয়]।

'আত্মরক্ষার' পর 'রুদ্রোপস্থান'।

[মন্ত্র, "ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং। ঊর্দ্ধ লিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ ॥"

ঐ কৃষ্ণ পিঙ্গল পুরুষ ঊর্দ্ধরেতা (ঊর্দ্ধলিঙ্গং)। এখানে ইঙ্গিত যে, সমস্ত জাগতিক ভাব হ'তে মনকে ঊর্দ্ধে তুলে ব্রহ্মে বিনিযোগ করতে না পারলে, মনকে লয়মুখী করতে না পারলে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে—অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্য ইন্দ্রিয়কে—ব্রহ্মভাবে পূর্ণ ক'রে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যধারী না হলে ঐ 'কৃষ্ণপিঙ্গলের' (ভক্তানুকম্পায়, উমা-মহেশ্বর রূপধারী পুরুষের) স্বরূপ জ্ঞান আসে না। খণ্ডভাবে অখণ্ডভাবোপলব্ধি হয় না।

[উমা-মহেশ্বর—তন্ত্রের অর্দ্ধনারীশ্বরের একটি ভাব। বেদে রুদ্র দেবতার নানা নাম,—ভীম, কপর্দ্দী, পশুপতি, শঙ্কর, স্বিষ্টকৃত, উগ্র—প্রভৃতি। 'ভীম', 'উগ্র' মূর্ত্তি ভীষণাকার বিধায় ভয় উদ্রেক করে; ঐ রূপ, রুদ্রমূর্ত্তী প্রলয়ের, তাঁর বাণে প্রলয় হয়। যজ্ঞের ভাব স্থিতি মূলক, তাই প্রলয়রূপীর নামে যজ্ঞ হত না, কিন্তু যখন সাধকের আহ্বানে ভক্তানুগ্রহ বশতঃ তাঁর আবির্ভাব হত, তখন যজ্ঞভাগ তাঁকে অর্পিত হত, কারণ, ভীষণ মূর্ত্তী ভয়ের কারণ হয় না ভক্তের কাছে—সিংহশিশুর কাছে, সিংহ বা সিংহী প্রিয়ই হয় বরং। "রুদ্ররূপে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী।" ধোলো মনীষীরা এটি বুঝতে না পেরে বিকৃত সমালোচনা করেছেন।]

সূর্য্য সর্ব্বতেজোময়ের প্রকাশ। সূর্য্যই বিষ্ণু, সূর্য্যই পার্থিব অগ্নি, যিনি সাধক-নিবেদিত অন্ন 'সর্ব্বতেজোময়' ও 'সর্ব্বদেবতাময়ের' কাছে বহন করেন; ইনিই বষট্কার। ঐ সূর্য্যের মধ্যে 'মন্দেহ' নামে কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষস বর্ত্তমান! সন্দেহই ঐ রাক্ষস। 'স' স্থানে 'ম' করা হয়েছে।

সাধনকাণ্ডের ইতিহাস শুকনো আলোচনায় হয় না; জাতীয় ভাবধারার সুর ধ'রে বুঝলে ঐ ইতিহাস একটা নাটকীয় ব্যাপার হয়ে যায় না, বরং, সাধনমুখে কল্পনা অপেক্ষা সত্যই প্রকাশ পায়। সাধনকাণ্ড কবিত্ব নয়; ইহা মহাবাস্তব ব্যাপার—জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ত্যাগপূত জীবন চাই। পূর্ব্বে দেখেছি, গায়ত্রীর বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, তিনি নৃশংস ও অনৃশংস—দুইই তিনি; তিনি কামরূপী, তন্ত্রে নৃমুণ্ডমালিনী, অসি-কপালধারিণী এবং বরাভয়করী—একই মূর্ত্তিতে প্রকাশ। একটাই আছে, দুটো নেই—আলাদা সয়তান গড়া হয়নি। প্রলয় মানেই সৃষ্টি, সৃষ্টি মানেই প্রলয়, মৃত্যু মানেই জন্ম, জন্ম মানেই মৃত্যু—মাঝখানটা প্রবাহের গতি। যিনি বনমালী পদ্মধারী, তিনিই আবার শঙ্খচক্রগদাধারী—তাঁর শঙ্খে প্রলয়বিষাণ বেজে ওঠে। এই ভাবধারা শাস্ত্রে বরাবর চলে এসেছে। কামনা বা স্বার্থ এলেই রুদ্রমুখে ডবায়। নিষ্কাম বৈদিক ঋষির প্রার্থনাও ঐ 'একের'ই উদ্দেশ্যে অর্পিত, প্রার্থনা পূরণের জন্য অন্য দেবতা নেই। কামনার উদয়ে আসে বহু ভাব, তখন ঐ সব দেবতারাই সকাম দেবতারূপে ভক্তের কাছে আবির্ভূত হন। এটাও আমাদের জানা দরকার যে স্বার্থপরের 'সকাম' আর ভক্তের 'আর্ত্তি' এক বস্তু নয়।

বৈদিক সাধনকাণ্ড—২।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গায়ত্রীর 'ব্রহ্মদেবতা' ও 'বিষ্ণুদেবতার' কথা বলা হয়েছে; সমস্তটাই যেন একটি সুরলহরীর খেলা—বিশ্বসঙ্গীতের নানা পরদা। ঐ গীতের প্রথম প্রকাশ গায়ত্রী—আরম্ভ; দ্বিতীয় প্রকাশ, বিদ্যাশক্তি, যাতে মনকে উচ্চভাবে প্রতিষ্ঠিত করে, তৃতীয় প্রকাশ—সমস্তটা মূর্ত্ত, নতুন রাগের সৃষ্টি—সাবিত্রী। বিভিন্ন লোকে অবস্থিতা হয়ে সূর্য্যপথগামিনী হলে গায়ত্রীর যে যে রূপ হয় তারই বর্ণনা। ইনি কামরূপী—নানা ভাব, নানা বর্ণনা। গায়ত্রী নাম কেন? "গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাদ্ গায়ত্রী ত্বমতঃ স্মৃতঃ।" অর্থাৎ 'যে তোমার গুণ গায়, তাকে তুমি রক্ষা কর, তাই তুমি গায়ত্রী নামে প্রসিদ্ধ।' এই গায়ত্রীই বর্ণ ও স্বররূপে তন্ত্রের মাতৃকাসরস্বতী।

সেই গায়ত্রী কি রকম? ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যায়, "ওজোঽসি, সহোঽসি, বলমসি, ভ্রাজোঽসি, দেবানাং ধাম নামসি, বিশ্বমসি, বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুরভিভূরোঁ।"

["ওজই তুমি, রিপু অভিভবন শক্তিই তুমি, বলই তুমি, দীপ্তিই তুমি, দেবতাদের আশ্রয়স্থানই (ধামই) তুমি, বিশ্বই তুমি, বিশ্বায়ুই তুমি, সর্ব্বরূপই তুমি, সর্ব্বকল্মষ অপহারকই তুমি, ওঁকারই তুমি।" যজুর্ব্বেদীয় প্রয়োগেও ঐ রকম দেখা যায়।]

উপনয়নে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে 'গায়ত্রী-সাবিত্রী' দেওয়া হয়; কখন কখন, ক্ষত্রিয়কে 'ত্রিষ্টুপ-গায়ত্রী' ও বৈশ্যকে 'জগতী-গায়ত্রী' দেবার রীতিও দেখা যায়। বেদের ব্রাহ্মণভাগ হ'তে গোভিলাদি গৃহ্যসূত্রকারেরা সন্ধ্যা-পদ্ধতি প্রকাশ করেন। গায়ত্রীতে কেবল দ্বিজেরই অধিকার—এটি প্রচার করা হয় পরে। গায়ত্রীতে সকলেরই অধিকার, ইহা যজুর্ব্বেদে স্পষ্ট স্বীকৃত।

["যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়।" (যজু ২৬।২)। অর্থ—'যথা (যেরূপ) জনেভ্যঃ (সমস্ত মানুষের জন্য) ইমাম (এই) কল্যাণীম (সাংসারিক অভ্যুদয় আদি ও পারমার্থিক মোক্ষসুখাদি প্রদায়িনী) বাচং (ঋগ্বেদাদি চারিবেদের বাণী) আ, বদানি (উপদেশ করিতেছি) ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়) চ অর্য্যায় (ও বৈশ্য) শূদ্রায় (শূদ্রদিগকে) চ স্বায় (ও ভৃত্য এবং স্ত্রীদিগকে) চ অরণায় (ও অতিশূদ্রদিগের) নিকট প্রচার কর।' উক্ত বচন, তার অর্থ—(মহর্ষি) দয়ানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। কলিকাতার 'বৈদিক ধর্ম্ম মহামণ্ডল'-তার বঙ্গানুবাদ ক'রে কলিকাতায় বিতরণ করেন। তাতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, "এই ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবার মানব মাত্রেরই অধিকার আছে]।"

দয়ানন্দ সরস্বতী প্রদত্ত অর্থ সম্বন্ধে যার যত মতভেদই থাকুক না কেন, এক্ষেত্রে যজুর্ব্বেদোক্ত বচন অস্বীকার করবার জো নেই। শতপথ ব্রাহ্মণেও দেখা যায় যে যজ্ঞে—ব্রাহ্মণ বলবেন 'এহি', রাজন্যবন্ধু। (নিন্দিত ক্ষত্রিয় নয) বলবেন—'আদ্রব'; শূদ্র—বলবেন-'আধাব'। অতএব, শূদ্রের ও যজ্ঞের অধিকার স্বীকৃত। তবে পরবর্ত্তী (আ. শ্রৌ.) বৃত্তিকার মতে ইহা 'নিষাদস্পতি' যাগের কথা। তা হলেও, শূদ্রের যজ্ঞে যে অধিকার নেই, তা বলা হয় না। এখন ত ধোলো পণ্ডিতেরাও, শুধু গায়ত্রী কেন, সমগ্র-বেদাদি শাস্ত্র তন্ন তন্ন ক'রে আলোচনা করছেন, এমন কি অনেক

সমষ্টে তাঁদের ব্যাখ্যা ভিন্ন অনেক অর্থ পরিষ্কারই হয় না। যাই হোক, এই রকম ক'রেই স্ত্রীশূদ্রের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে—দ্বিজ পত্নীর বিবাহ সংস্কারকেও 'পারিভাষিক' বলা হয়েছে অধিকার ভ্রষ্ট করবার জন্যই। ঋগ্বেদাদির ও অনুষ্ঠানাদির একটা সাধারণ অর্থ আছে ও উচ্চ আধ্যাত্মিক অর্থাৎ সাধনসহায় অর্থও ছিল, যা লুপ্ত বা অপ্রচলিত —সায়ন ও বলেছেন। সাধারণ অর্থ ছিল সকলের জন্য, অধিকার ও ছিল তাতে সকলের, উচ্চ অর্থ বা উচ্চাঙ্গ সাধনতত্ত্ব ছিল 'রহস্য' বা গুরুমুখী—মানস অধিকারীর জন্য। ব্রাহ্মণগ্রন্থে,—ঋক যজুঃ ও সাম দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করা হয় ব'লে, তারা 'সাধন' ও যজ্ঞ 'সাধ্য'—এই সাধ্যসাধনকে অভেদ বলা হয়েছে অর্থাৎ ঐ ত্রয়ীবিদ্যাকেই অভেদ বলা হয়েছে। [শতপথ ব্রাহ্মণ, ১ অ ৪ ব্রা ১ প্র. ৪ ব্রা। ১২ দ্রঃ]। ত্রয়ীবিদ্যা মানে তিনটি গ্রন্থ নয়। ত্রয়ীবিদ্যা=জ্ঞানকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড (জ্ঞান, উপাসনা, কর্ম্ম)। একেবারে প্রথম হ'তেই অভেদ ভাবনায় সাধকের সামর্থ্য না হ'তে পারে, কিন্তু অনুষ্ঠান সহাযে সেটি অভ্যাস সকলেই করতে পারতেন। তন্ত্রেও, 'দেবতাগুরুমন্ত্রাত্মৈক্যং' বা ঐক্য ভাবনা করতে হয় অনুষ্ঠান সহাযে (তন্ত্ররাজ তন্ত্র)।

উপনয়নের আদর্শ উচ্চ—সূত্র ধারণে, বহুগুণ অর্জ্জন করবার জন্য তৎপর হ'তে হয়। ঐ সব বহু প্রথার মূলে ছিল উচ্চভাব, কিন্তু পৌরোহিত্যের অত্যাচার সকলকেই সহ্য করতে হয়েছে ও আদর্শ ক্ষুন্ন হয়েছে। সমাজ, পৌরোহিত্যের সঙ্গে বরাবর রফা করে এসেছেন; সেই-জন্য, কোন অবস্থাতে, আদর্শকে কখন ছোট ক'রে দেখতে নেই। পৈতা ধারণের ন্যায় একটা রীতি প্রাচীন ঈজিপ্টে, রোমে, গ্রীসে, আসিরিয়ানদের মধ্যে, বাবিলোনিয়ানদের মধ্যে, ক্রীটান ও ইট্রাসকানসদের (Cretans ও Etruscans দের) মধ্যেও ছিল, কিন্তু কোথাও ভারতের 'একলক্ষ্য' আদর্শ ছিল না। পার্শীদের মধ্যে ঐ প্রথা আজও বর্ত্তমান, য়াহুদিকে অভিষেকের সময় সূত্র ধারণ করতে হয় (Baptismal ceremony)। সর্ব্বস্থানেই পৌরোহিত্যের অত্যাচার ফল! বোধ হয়, এবিষয়ে পার্শী ও য়াহুদিরাই, হিন্দু অপেক্ষা অনেক বেশী ঐ অত্যাচার ভোগ করেছেন। বৌদ্ধপ্লাবন শান্ত ভাব ধারণ করবার পর, যখন

হিন্দুরাজগণ সহায়ে পৌরোহিত্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, সেই সময়ে, পণ্ডিতদের মতে, 'বৃদ্ধমনুসংহিতার' পরপর বহু পরিবর্ত্তন ও সংস্করণ হয়। [তখন "ক্ষাত্রবীর্য্যও নাই, ব্রহ্মচর্য্য-ও লুপ্ত"—স্বামীজির বর্ত্তমান ভারত দ্রঃ]। পৌরোহিত্য শক্তির অবনতি সময়ে যাতে সাধক সৎপুরোহিত নির্ব্বাচন করতে পারেন তার ব্যবস্থাও ব্রাহ্মণগ্রন্থে পাওয়া যায়।

[(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১৫শ অ ২য় খ ৩য় প দ্রঃ) :—যজ্ঞে বর্জ্জনীয় ঋত্বিক (পুরোহিত) :—জগ্ধ (ভক্ষিতাবশিষ্ট), গীর্ণ (উদরগত), ও বান্ত (উদর নির্গত) —এই ত্রিবিধ দোষ যজ্ঞে ঘটতে পারে। 'যজমান হয়ত আমাকে কিছু ধন দেবে, অথবা আমাকে পুরোহিত পদে বরণ করবে'—এই রকম কামনা যার আছে তার দ্বারা ঋত্বিকের (পুরোহিতের) কর্ম্ম করালে যে দোষ ঘটে তাহাই 'জগ্ধ'। জগ্ধ (উচ্ছিষ্ট) দ্রব্যের মত তাহা যজ্ঞে নিকৃষ্ট দোষ, তা যজমানকে রক্ষা করতে পারে না। 'এই ব্রাহ্মণ আমার ক্ষতি না করুক অথবা আমার যজ্ঞে বিঘ্ন না করুক', এইরূপ ভয়ে ভয়ে কাহারও দ্বারা ঋত্বিকের কর্ম্ম করালে যে দোষ ঘটে তাহাই গীর্ণ। গীর্ণ (উদরগত) দ্রব্যের মত উহা যজ্ঞে নিকৃষ্ট দোষ, তা যজমানকে রক্ষা করতে পারে না। (পাতিত্য হেতু) নিন্দিত লোক দ্বারা ঋত্বিকের কর্ম্ম করালে যে দোষ তাহাই 'বান্ত'। মনুষ্যেরা যেমন বান্ত (উদ্গীর্ণ) দ্রব্যকে ঘৃণা করে, দেবগণ সেইরূপ সেই দোষকে ঘৃণা করেন। তাই বান্ত দ্রব্যের মত উহা নিকৃষ্ট দোষ, উহা যজমানকে রক্ষা করতে পারে না। যজমান এই ত্রিবিধ ব্যক্তির অপেক্ষা রাখবেনা। যদি যজমান, না জেনে ওরকম ঋত্বিকের দ্বারা কর্ম্ম করান, যজমানকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে]।

উক্ত অনুবাদ হ'তে আমরা দেখতে পাই একটি শক্তিশালী সমাজের নিয়ন্ত্রণ। ঐ যে সমাজের প্রায়শ্চিত্তবিধি সেটি অবশ্য কঠোর নয়, কারণ ভুলটি যজমানের না জানার জন্যই। পরবর্ত্তী কালে কিন্তু ঐরূপ স্থলে প্রায়শ্চিত্তের নাম গন্ধও নেই, সেখানে যে সব স্থলে প্রায়শ্চিত্তের কথা আছে, সেগুলি 'মাকড মারলে ধোকড্ হয়' গোছের বিধি।

ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে বর্ণিত অনুষ্ঠানাদি প্রচলন হবারও পূর্ব্বকাল হ'তে যে সব যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ ঐসব গ্রন্থেই পাওয়া যায়। 'এই রকম পূর্ব্বে যা ছিল, আমরা তারই অনুসরণ করছি,' 'পূর্ব্বে এটা এইভাবে করা হ'ত, এখন তা করা হয় না', 'আগে এটার জন্য সাধক

কৃচ্ছ্র করতেন, এখন সে ভাবটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এটি অন্যায়'—ইত্যাদি বহু বাক্য ব্রাহ্মণগ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়।

পৌরোহিত্য শক্তির ইতিহাস স্বামীজির 'বর্ত্তমান ভারতে' সুন্দরভাবে দেওয়া আছে।

["বৈদিক পুরোহিত মন্ত্রবলে বলীয়ান, দেবগণ তাঁহার মন্ত্রবলে আহূত হইয়া পানভোজন করেন ও যজমানকে অভীপ্সিত ফল প্রদান করেন। ইহলৌকিক মঙ্গলের কামনায় প্রজাবর্গ, রাজন্যবর্গও তাঁহার দ্বারস্থ।...দৈববলের উপর মানববল কি করিতে পারে? মানববলের কেন্দ্রীভূত রাজাও পুরোহিতবর্গের অনুগ্রহপ্রার্থী।...কখন বিভীষিকাসংকুল আদেশ, কখন সহৃদয় মন্ত্রণা, কখনও কৌশলময় নীতিজাল-বিস্তার, রাজশক্তিকে অনেক সময়েই পুরোহিতকুলের নিদেশবর্ত্তী করিয়াছে। সকলের উপর ভয়—পিতৃপুরুষদিগের নাম, নিজের যশোলিপি পুরোহিতের লেখনীর অধীন। মহাতেজস্বী, জীবদ্দশায় অতি কীর্ত্তিমান্, প্রজাবর্গের পিতৃমাতৃস্থানীয় হওন না কেন, মহাসমুদ্রে শিশির-বিন্দুপাতের ন্যায় কালসমুদ্রে তাঁহার যশঃসূর্য্য চিরদিন অস্তমিত, কেবল মহাসত্রানুষ্ঠায়ী, অশ্বমেধযাজী বর্ষায় বারিদের ন্যায় পুরোহিতগণের উপর অজস্র-ধন-বর্ষণকারী রাজগণের নামই পুরোহিতপ্রসাদে জাজ্বল্যমান। দেবগণের প্রিয়, প্রিয়দর্শী ধর্ম্মাশোক ব্রাহ্মণ্যজগতে নাম-মাত্র শেষ; পরীক্ষিত জন্মেজয় আবালবৃদ্ধবনিতার চির পরিচিত। বৌদ্ধপ্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের শক্তিক্ষয় ও রাজন্যবর্গের শক্তির বিকাশ।...বৌদ্ধযুগের একচ্ছত্র পৃথিবীপতি সম্রাড়্গণের ন্যায় ভারতের গৌরব-বৃদ্ধিকারী রাজগণ আর কখন ভারত-সিংহাসনে আরূঢ় হন নাই, এ যুগের শেষে আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম ও রাজপুতাদি জাতির অভ্যুত্থান। ইহাদের হস্তে ভারতের রাজদণ্ড পুনর্ব্বার অখণ্ড প্রতাপ হইতে বিচ্যুত হইয়া শতখণ্ড হইয়া যায়। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যশক্তির পুনরভ্যুত্থান রাজশক্তির সহিত সহকারীভাবে উদ্যুক্ত হইয়াছিল।...পরস্পরের স্বার্থের সহায়, বিপক্ষ পক্ষের সমূল উৎপাটন, বৌদ্ধবংশের সমূলে নিধন ইত্যাদি কার্য্যে ক্ষয়িত বীর্য্য এ নূতন শক্তি-সংগম, নানাভাবে বিভক্ত হইয়া, প্রায় গতপ্রাণ হইয়া পড়িল, শোণিত-শোষণ, বৈরনির্য্যাতন, ধনহরণাদি ব্যাপারে নিয়ত নিযুক্ত হইয়া পূর্ব্বরাজন্যবর্গের রাজসূয়াদি যজ্ঞের হাস্যোদ্দীপক অভিনয়ের অঙ্কপাত মাত্র করিয়া, ভাটচারণাদি—চাটুকার শৃঙ্খলিত-পদ ও মন্ত্রতন্ত্রের মহাবাগ্-জাল-জড়িত হইয়া, পশ্চিম দেশাগত মুসলমান ব্যাধনিচয়ের সুলভ-মৃগয়ায় পরিণত হইল।..মুসলমান রাজত্বে অপরদিকে পৌরোহিত্য শক্তির প্রাদুর্ভাব অসম্ভব।...এই প্রকারে বহু ঘাতপ্রতিঘাতের পর রাজশক্তির শেষ জয় ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী রাজন্যবর্গের

নামে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারত-আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল। কিন্তু এই যুগের শেষভাগে একটি অভিনব শক্তি ভারত-সংসারে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।. .আমরা ইংলণ্ডের ভারতাধিকারের কথা বলিতেছি।"—বর্ত্তমান ভারত।]

ইহাই সংক্ষেপে পৌরোহিত্যশক্তির ইতিহাস। ইহার গুণ ও দোষ দুইই আছে। গুণ ও দোষ, ভাল ও মন্দ—এই দুইদিক্ চিরকালই আছে। স্বামীজি উক্ত গ্রন্থে তা ভাল করেই বুঝিয়েছেন।

["পৌরোহিত্যশক্তির ভিত্তি বুদ্ধিবলের উপর, বাহুবলের উপর নহে, এজন্য পুরোহিতদিগের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাচর্চ্চার আবির্ভাব। অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের বার্ত্তা ও সহায়তার জন্য সর্ব্বমানব প্রাণ সদাই ব্যাকুল। সাধারণের সেথায় প্রবেশ অসম্ভব, জড়ব্যূহ ভেদ করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমী, অতীন্দ্রিয়স্পর্শী, সত্ত্বগুণ প্রধান পুরুষেরাই সে রাজ্যে গতিবিধি রাখেন, সংবাদ আনেন এবং অন্যকে পথপ্রদর্শন করেন। ইঁহারাই পুরোহিত, মানবসমাজের প্রথম গুরু, নেতা ও পরিচালক। সমাজ তাঁহাকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যথেষ্ট সময় দেয়, কাজেই পুরোহিত চিন্তাশীল হয়েন এবং তজ্জন্যই পুরোহিত প্রাধান্যে প্রথম বিদ্যার উন্মেষ। দুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয় সিংহের এবং ভয়কম্পিত প্রজা-অজাযূথের মধ্যে পুরোহিত দণ্ডায়মান। সিংহের সর্ব্বনাশেচ্ছা পুরোহিতহস্তধৃত অধ্যাত্মরূপ কশার তাড়নে নিয়মিত। ধনজনমদোন্মত্ত ভূপালবৃন্দের যথেচ্ছাচাররূপ অগ্নিশিখা সকলকেই ভস্ম করিতে সক্ষম, কেবল ধন-জনহীন দরিদ্র তপোবল সহায় পুরোহিত বাণীরূপ জলে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত। পুরোহিত প্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের প্রথম অধিকার বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস জড়পিণ্ডবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত তাহার প্রথম বিকাশ। পুরোহিত জড়চৈতন্যের প্রথম বিভাজক, ইহপরলোকের সংযোগ সহায়, দেবমনুষ্যের বার্ত্তাবহ, রাজাপ্রজার মধ্যবর্ত্তী সেতু। বহু কল্যাণের প্রথমাঙ্কুর তাঁহারই তপোবলে, তাঁহারই বিদ্যানিষ্ঠায়, তাঁহারই ত্যাগমন্ত্রে, তাঁহারই প্রাণসিঞ্চনে সমুদ্ভূত; এজন্যই সর্ব্বদেশে প্রথম পূজা তিনিই পাইয়াছিলেন, এজন্যই তাঁহাদের স্মৃতিও আমাদের পক্ষে পবিত্র।"

স্বামীজি তার পরেই সমাজকে সাবধান করছেন।

["দোষও আছে, প্রাণস্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবীজ উপ্ত। অন্ধকার আলোর সঙ্গে সঙ্গে চলে। প্রবল দোষও আছে, যা কালে সংযত না হইলে সমাজের বিনাশ সাধন করে। স্থূলের মধ্য দিয়া শক্তির বিকাশ সার্ব্বজনীন প্রত্যক্ষ, অস্ত্রশস্ত্রের ছেদ-ভেদ, অগ্ন্যাদির দাহিকা শক্তি, স্থূল প্রকৃতির প্রবল সংঘর্ষ সকলেই

দৈর্ঘ্য, সকলেই বুঝে। ইহাতে কাহারও সন্দেহ হয় না, মনেও দ্বিধা থাকে না। কিন্তু যেখানে শক্তির আধার ও বিকাশকেন্দ্র কেবল মানসিক, যেখানে বল কেবল শব্দ বিশেষে, উচ্চারণ বিশেষে, জপ বিশেষে বা অন্যান্য মানসিক প্রয়োগ বিশেষে, সেথায় আলোয় আঁধার মিশিয়া আছে, বিশ্বাসে সেথায় জোয়ার ভাটা স্বাভাবিক, প্রত্যক্ষেও সেথায় কখন কখন সন্দেহ হয়।·· সে মনের সম্মুখে সরল রেখা প্রায় পড়ে না, পড়িলেও মন তাহাকে বক্র করিয়া লয়।·· ইহার পরিণাম অসরলতা —হৃদয়ের অতি সঙ্কীর্ণ, অতি অনুদার ভাব, আর সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক, নিদারুণ ঈর্ষা-প্রসূত অপরা সহিষ্ণুতা।

উন্নতির সময় পুরোহিতের যে তপস্যা, যে সংযম, যে ত্যাগ সত্যের অনুসন্ধানে সম্যক্ প্রযুক্ত ছিল, অবনতির পূর্ব্বকালে তাহাই আবার কেবলমাত্র ভোগ্য সংগ্রহে বা আধিপত্য বিস্তারে সম্পূর্ণ ব্যয়িত। যে শক্তির আধারত্বে তাঁহার মান তাঁহার পূজা সেই শক্তিই এখন স্বর্গধাম হইতে নরকে সমানীত। উদ্দেশ্যহারা, শ্রেষ্ঠ-হারা,, পৌরহিত্য-শক্তি ঊর্ণাকীটবৎ আপনার কোষে আপনিই বদ্ধ, যে শৃঙ্খল অপরের পদের জন্য পুরুষানুক্রমে অতি যত্নের সহিত বিনির্ম্মিত, তাহা নিজের গতিশক্তিকে শত বেষ্টনে প্রতিহত করিয়াছে, যে সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ বহিঃশুদ্ধির আচারজাল সমাজকে বজ্রবন্ধনে রাখিবার জন্য চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারই তন্তুরাশিদ্বারা আপাদ-মস্তক-বিজড়িত পৌরোহিত্য শক্তি হতাশ হইয়া নিদ্রিত। আর উপায় নাই, এ জাল ছিঁড়িলে আর পুরোহিতের পৌরোহিত্য থাকে না।...যাঁহারা সম্প্রদায় বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের উপর ব্রাহ্মণ-জাতির অধিকার-বিচ্যুতি-চেষ্টারূপ দোষারোপ করেন, তাঁহাদেরও জানা উচিত যে, ব্রাহ্মণ জাতি প্রাকৃতিক অবশ্যম্ভাবী নিয়মের অধীন হইয়া আপনার সমাধি-মন্দির আপনিই নির্ম্মাণ করিতেছেন। ইহাই কল্যাণপ্রদ, প্রত্যেক অভিজাত জাতির স্বহস্তে চিতা নির্ম্মাণ করাই কর্ত্তব্য"]। (বর্ত্তমান ভারত—স্বামীজি)]।

পুরোহিত প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর হলেও, জানা উচিৎ যে প্রায় সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানের সঙ্গে আজও পুরোহিত সংশ্লিষ্ট।

যজ্ঞ সম্বন্ধে আরো কিছু

যে সুরে সাম গীত হ'ত তা এখন লুপ্ত, মাত্র উচ্চারণক্রম কতক জানা যায়। বৈদিক ছন্দ ও এখনকার ছন্দ যদিও ভিন্ন, তবু বৈদিক যজ্ঞের সঙ্গে ছন্দের, ছন্দের সঙ্গে যজ্ঞ ও যজমানের, যজমানের সঙ্গে যজ্ঞ, ছন্দ ও মন্ত্রের ঐক্য জ্ঞান ক'রে সাধনায় অগ্রসর হ'তে হ'ত, এমন কি যজ্ঞবেদির

সঙ্গে ও যজমানের, যজ্ঞের বা ছন্দের, ঐক্য বোধ করতে শিক্ষা দেওয়া হত—সমস্তই যেন স্বরকেন্দ্রোত্থিত ধ্বনির ঝঙ্কার। ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে যে সব আখ্যায়িকা আছে, সেগুলি এ-ঐভাবে বর্ণিত।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সোম হরণের গল্প আছে। সোমকে 'সোম-রাজা' বলা হত। ছন্দেরা, 'রাজাসোম'কে আনবার জন্য যাত্রা করেন। তখন ছন্দগুলি চারি চারি অক্ষরযুক্ত ছিল। তার মধ্যে চতুরাক্ষর 'জগতী' প্রথমে উর্দ্ধে উঠে অর্দ্ধপথে শ্রান্ত হ'য়ে পড়লেন, তখন তিনি তিন অক্ষর ত্যাগ ক'রে একাক্ষর হ'য়ে দীক্ষা ও তপস্যাকে আহরণ ক'রে নেমে এলেন। তাই যারা পশু আছে তারাই দীক্ষা ও তপস্যা লাভ করেছে, কেন না পশুগণ জগতী সম্বন্ধীয় এবং জগতী তাহাদিগকে এনেছিলেন। ঐরকম, ত্রিষ্টুভ ত্র্যক্ষরা হ'য়ে দক্ষিণা আহরণ ক'রে নেমে এলেন। শেষে গেলেন গায়ত্রী। গায়ত্রী সোমরক্ষকদের ভয় দেখিয়ে দুটি পা, নখ ও মুখ দিয়ে সোমকে, আর—জগতী ও ত্রিষ্টুপ যে কটি অক্ষর ত্যাগ ক'রে এসেছিলেন—তাদেরও দৃঢ়ভাবে ধরলেন। সোমরক্ষক—সপ্তম গন্ধর্ব্ব, কৃশানু—বাণ মেরে গায়ত্রীর বাঁ-পায়ের নখ ছিঁড়ে দিলেন। সেই নখ সাজারু হল, যেখানে যে মেদের স্রবণ হল, তাহাই যজ্ঞীয় পশুর বশা হল, ঐ বাণের লৌহাগ্রভাগ দংশনসমর্থ সাপ হল, ('নির্দংশী'), তার বেগ হ'তে স্বজ (দ্বিশিরা সাপ) হল, সেই বানের পত্র মন্থাবল (বৃক্ষ শাখায় লম্বমান জীব) হল, স্নায়ু হতে গণ্ডু পদ (সর্পাকৃতি জীব), তেজন (বাণের কাষ্ঠ ভাগ) হ'তে অন্ধসর্প হল। এই রকমে, গায়ত্রীর ৮ অক্ষর, ত্রিষ্টুভের ৩ অক্ষর ও জগতীর এক অক্ষর হল। মাধ্যন্দিনসবনে গায়ত্রীর সঙ্গে ত্রিষ্টুভের যোগ হল, গায়ত্রীর অনুগ্রহে জগতী ও দ্বাদশাক্ষরা হলেন। এইরূপে গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা, ত্রিষ্টুপ্ একাদশ অক্ষরা ও জগতী দ্বাদশাক্ষরা হলেন।

উক্ত গল্পে আমরা ছন্দের উৎপত্তি, ও ছন্দগুলি পূর্ব্বে কি আকারে ছিল এবং তাদের ক্রমপরিণতি দেখতে পাই। ছন্দ হ'তেই নানা জীবের উৎপত্তির কথাও পাই। যে শর বা বাণ ব্যবহৃত হয়েছিল তার ফলক ছিল লোহার ও বাণের পাশ ছিল 'পত্র' বা পালকের। সোম আনবার জন্যই গায়ত্রীর এই উদ্যম ও গায়ত্রীর অনুগ্রহই ছন্দগুলির ক্রম পরিণতির কারণ।

সোম অমৃত ক্ষরণ করেন, অমরত্ব প্রদান করেন। তাই দেবতারা সোম আনবার জন্য কাতর হয়ে উঠলেন। সোম ছিলেন গন্ধর্ব্বদের কাছে। গন্ধর্ব্বরা সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতেই তাদের মুগ্ধ করা যায়। তাই স্বয়ং গায়ত্রী সোম এনে দেবার ভার নিলেন; তিনি সুপর্ণ (= সুন্দর পক্ষ যুক্ত) পাখীরূপ ধ'রে সোম আনতে চললেন। তার্ক্ষ্য পাখী (পুরাণের গরুড) অগ্রণী হ'য়ে পথ প্রদর্শক হলেন। দেবতারা ছন্দগুলিকে সোম আনতে পাঠান। ছন্দেরাই সুপর্ণের রূপধারণ ক'রে ঊর্দ্ধে—অতি ঊর্দ্ধে—উঠতে আরম্ভ করলেন, তাতে প্রথম প্রকাশ হলেন জগতী, পরে হলেন ত্রিষ্টুপ্। ছন্দগুলি পরিশ্রান্ত হলেন, শেষে আবির্ভূতা হলেন গায়ত্রী—গায়ত্রীর মেয়ে। এই সর্ব্ব-কনিষ্ঠ মেয়েটির নামও গায়ত্রী। গায়ত্রী কুমারী, তিনি 'নগ্নারূপে' (শিশুরূপে) গন্ধর্ব্বদের মোহিত করলেন, সোম এনে উপস্থিত করলেন। (অন্যত্র, ছন্দগুলিকে সুপর্ণার সন্তান বলা হয়েছে)।

[নগ্না = 'বালিকা'—সায়ন। হংসবতী ঋক্ (তুরোহণ) মন্ত্রে আমরা তার্ক্ষ্য মন্ত্রের উল্লেখ দেখেছি। শক্তিকে নানারূপে প্রয়োগ করলে নানারূপ ফল অবশ্যম্ভাবী]।

ব্রাহ্মণগ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে একই গল্প ও ভাব বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত। সাধনক্ষেত্রে একই ভাব, বিভিন্ন সাধকের কাছে, বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, সকল সোমযজ্ঞের প্রকৃতি-স্বরূপ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের বিবরণ নিয়ে আরম্ভ। এস্থলে যজ্ঞ অর্থে জ্যোতিষ্টোমাভিমানী দেবতা। সোমযাগে প্রবৃত্ত যজমানের সংস্কারের নাম 'দীক্ষা' বা 'দীক্ষণ'। সকল দেবতার শরীর অগ্নিতে আছে ও বিষ্ণু সর্ব্বলোক ব্যাপ্ত, সুতরাং অগ্নি ও বিষ্ণু সর্ব্বদেবময়। অগ্নি দেবতাগণের মুখ, বিষ্ণু দেবতাগণের অন্তিম (উত্তম)—সোমযাগের আদিতে ও অন্তে অবস্থিত। বিভিন্ন ছন্দের কথা আছে, কামনা অনুসারে বিভিন্ন প্রয়োগের কথাও আছে। এগুলি ছন্দোৎপত্তির কথা নয়। গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা। অগ্নি ও গায়ত্রী, উভয়েই, প্রজাপতির মুখ হ'তে উৎপন্ন, তাই উভয়ের সাম্য হেতু, গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ। যজ্ঞে, দীক্ষিত যজমান বৃত্রকে হত্যা করে। [এখানে 'বৃত্র' মানে 'পাপরূপ শত্রু' বলা হয়েছে।]। ভিন্ন ভিন্ন ফল কামনায় ছন্দ ও ছন্দের লক্ষণ দেওয়া আছে, গায়ত্রীই তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস ('বেদাধ্যয়ন সম্পত্তি), গায়ত্রী প্রয়োগে তেজস্বী ও ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত হয়, উষ্ণিক ছন্দই আয়ু—উষ্ণিকে আয়ু

বৃদ্ধি হয়; অনুষ্টুপ ছন্দ (দুটি) ৩২ অক্ষরে (=৬৪)—অনুষ্টুপে প্রতিষ্ঠালাভ হয়, শ্রীকামী ও যশস্কামীর পক্ষে ২টি বৃহতী ছন্দ; ত্রিষ্টুপ ছন্দ বীৰ্য্য ও ওজঃ স্বরূপ; অহীন সত্রাদি (যজ্ঞবিশেষ) যজ্ঞকাম যজমানের জন্য, পংক্তি ছন্দ; গবাদি পশুলাভের জন্য জগতী ছন্দ; "অন্নং বৈ বিরাট"—অন্নই বিরাট, অন্নের জন্যই বিরাট ছন্দের বিরাটত্ব; এই ছন্দ পঞ্চবীর্য্য বিশিষ্ট—বিরাট ছন্দে, উষ্ণিক, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ ও বিরাট, এই ৫ রকম ছন্দের বীৰ্য্য ও সামর্থ্য আছে। এইরকম বর্ণনা দৃষ্ট হয়। লক্ষ্য করবার বিষয় যে বিরাট বা অন্নের অর্থাৎ অন্নলাভের জন্য উদ্যমের প্রচুর প্রশংসা আছে বহু স্থানে। বলা হয়েছে, অনুষ্টুভের ৩২ অক্ষর সত্ত্বেও—২।১ অক্ষর কম বেশীতে ছন্দ নষ্ট হয় না—বিরাটের মধ্যে অনুষ্টুভ বৰ্ত্তমান এবং যে বিরাট ছন্দের সামর্থ্য জানে, সে সেইসকল ছন্দাভিমানী দেবতার সাযুজ্য, সারূপ্য ও সালোক্য লাভ ক'রে নীরোগ ও 'অন্নপতি' হয়—বিরাটে অন্যান্য ছন্দের ফল পাওয়া যায়।

দেবাসুরের গল্পটি 'বিঘ্নাপসরণ'। দেবাসুরের যুদ্ধ হয়। অসুরেরা ভূলোক জয় ক'রে তাকে লৌহ প্রাকারে বেষ্টিত করে; অন্তরীক্ষ জয় ক'রে তাকে রৌপ্য প্রাকারে বেষ্টিত করে, ঐ রকম, দ্যুলোককে স্বর্ণ প্রাকারে বেষ্টিত করে। দেবতারা এই বিঘ্ন অপসারণের জন্য 'উপসৎ' করেন। অসুরেরা অপসারিত হয়ে, ষড় ঋতু, মাস, ও শেষে, দিন ও রাত্রি আশ্রয় করে। উপসৎ দ্বারা তারা সেই সব স্থান হ'তেও অপসারিত হয়। ইহাই 'বিঘ্নাপসারণ'। অসুরেরা কেন প্রবল হয়? দেবতারা বুঝলেন তাঁদের ভয় হয়েছিল—তাঁরা মনে বুঝেছিলেন যে ভেদবুদ্ধির জন্য, ঐক্য ও প্রেমের অভাব বশতঃই, অসুরেরা প্রবল হয়েছিল; তাই যাতে কেহ লোভ আদির বশবৰ্ত্তী না হয়, তার উপায় নির্দ্ধারণ করবার জন্য তাঁরা মিলিত হয়েছিলেন।

লোভ অর্থাৎ কামকাঞ্চনের লোভ সংবরণ না করলে ঐক্যবুদ্ধি আসে না, আর, একতায় (মিলনে) প্রেমপ্রবণ হৃদয় চাই—এই উপদেশ চিরদিনই সত্য থাকবে।

অসুরেরাও যজ্ঞ করত, কিন্তু তাদের অগ্নি স্থাপনের ক্রম ছিল দেবগণের বিপরীত ও তারা পশুবল প্রয়োগের দ্বারা তাদের ক্রম অনুসরণ করতে তাঁদের বাধ্য করত, অতএব এই রকম বিরোধের সৃষ্টি, গোঁড়ামির ফল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্যত্র, অসুর জয়ের জন্য অগ্নিকর্তৃক ছন্দসকল তিন শ্রেণীতে পরিণত হয়। আর এক স্থানে আছে যে 'পশুপতি রুদ্র'— কৃষ্ণবর্ণবেশী পুরুষ—যজ্ঞভূমির উত্তর দিক্ হ'তে উঠে, একটি বালকের সত্যনিষ্ঠায় প্রীত হয়ে বালককে 'বর' প্রদান করলেন। রুদ্রমূর্ত্তী যে সব সময়েই ক্রোধপরায়ণ থাকেন তা নয়—রুদ্র দেবতা খোলো wrathful deity (যেমন অনুবাদ করা হয় সেরূপ) নন্।

ঐ ব্রাহ্মণের [৩৪শ অ ১৪খ. (ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞলাভ)] আর একটি গল্প :—প্রজাপতি যজ্ঞের সৃষ্টি করলেন। তারপর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অনুরূপ ক'রে 'হুতাদ' ও 'আহুতাদ' সৃষ্টি করলেন। ব্রাহ্মণগণই হুতশেষ ভোজী— হুতাদপ্রজা, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র—এঁরাই 'আহুতাদ'। যজ্ঞ তাঁদের নিকট হ'তে পালালেন; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যজ্ঞের অনুগমন করলেন। যজ্ঞের আয়ুধ, স্ফ্য (কপাল), অগ্নিহোত্রহবনী, কৃষ্ণাজিন, শম্যা, উদখূল্, মুষল, দৃষদ্, উপল। ব্রাহ্মণের ঐ আয়ুধ দেখে, যজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাছে এলেন এবং অশ্বযুক্ত রথ, কবচ ও বাণযুক্ত ধনু—ক্ষত্রিয়ের এই আয়ুধ—দেখে, যজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের নিকট হ'তে ভয়ে পালালেন। তখন ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণকে বললেন, 'আমাকে যজ্ঞে আহ্বান করুন'। তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে তাঁর আয়ুধ ত্যাগ ক'রে যজ্ঞের আয়ুধ নিয়ে আসতে বললেন। ক্ষত্রিয় যজ্ঞ পেলেন।

[পরে (৩য় খণ্ডে) উক্ত হয়েছে যে ব্রাহ্মণ, রাজন্য ও বৈশ্য দীক্ষিত হবার সময় ক্ষত্রিয়ের (রাজার) কাছে দেব-যান স্থান প্রার্থনা করবেন (যাচ্ঞা আবশ্যক), আর, ক্ষত্রিয় চাইবেন আদিত্যের কাছে।] ।

ঐ গল্পটি নিয়ে খোলোরা অনেক কিছু লিখেছেন। যজ্ঞে দীক্ষিত হ'তে হত। ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপযোগী সাজ সরঞ্জাম এনেছিলেন। আদালতে উকিল যদি ডাক্তারের যন্ত্রপাতি, বই ও ঔষধ নিয়ে হাজির হন, তিনি আদালতে স্থান পান না—ডাক্তারী ব্যবসার স্থান আদালত নয়। যজ্ঞে দীক্ষিতাভিলাষীর, যজ্ঞের ব্রত ও লিঙ্গ ধারণ করা চাই। যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। যাগকাল পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ বিচার থাকে না, কিন্তু যাগান্তে প্রত্যেক সাধক স্ব স্ব বর্ণ আশ্রয় করবেন—ইহা দেখি বৃহদারণ্যকে। উচ্চাঙ্গ সাধনায়, তন্ত্রেরও ঠিক্ ঐ ব্যবস্থা। ঐ রকম ব্যবস্থার কারণও বোঝা যায়। যাগকালে বা সাধনার সময়ে, সকল সাধকই একক্ষেত্রে অবস্থিত। "এতদাত্মমিদং

সর্ব্ব…শ্বেতকেতু', 'তত্ত্বমসি শ্বেত কেতু'—যখনই এই বোধ জাগ্রত হয়, সাধক হ'য়ে যান তখনই ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণগ্রন্থে 'পুরুষ-মেধ' যজ্ঞেব কথা আছে। ঐ যজ্ঞেব ৪০টি গোত্র, দীক্ষা ২৩ বকম, উপসদ ১২ বকম ও সুত্য ৫ বকম। মানবেব আদি জনক প্রজাপতি। প্রজাপতি হ'তে জাত হ'লেন আদি মানব-পুরুষ-শক্তি। উক্ত দীক্ষাব ঐ ৪০টি গোত্র—৪০ শব্দমাত্রিকরূপে পবিণত হলেন—বিবাট ছন্দ হলেন। ঐ পুরুষ-শক্তিই বিবাট। সেই পুরুষই এই যজ্ঞেব পশু। পুরুষ-মেধ যজ্ঞে, ক্ষিতি ও দিকাদি, সমস্তই বশীভূত হয়। দীক্ষাব সময অগ্নি ও সোমেব জন্য ১১টি পশু দরকাব। সেজন্য চাই ১১টি যূপ। ১১টি যূপই ১১টি শব্দমাত্রিক—ত্রিষ্টুভ্ ছন্দ। ত্রিষ্টুভ্ই বজ্র, ত্রিষ্টুভই সঞ্জীবনী শক্তি, ত্রিষ্টুভই সমস্ত পাপ ধ্বংস কবে। তাবপব, ১১টি পশু, ১১টি শব্দ-মাত্রিক প্রজাপতিব কথা বলা হয়েছে। দীক্ষাই প্রতিষ্ঠা, প্রথম দিন—বসন্ত ঋতু। এইরূপে বিভিন্ন ঋতুব উৎপত্তি-কথা ব'লে, শতপথ ব্রাহ্মণ ব'লছেন যে সে 'স' ই পুবে বা আবাসে শযন কবেন, নিদ্রা যান তাই তাঁব নাম 'পুরুষ'। বিশ্বেব যা কিছু সমস্তই তাঁব আহাব—এই আহাবই 'মেধ'। পুংশক্তিময় অক্ষবগুলি, এই সমস্ত পূতশবীবী পুরুষ—যজ্ঞে তারাই বলি প্রদত্ত হয়, ঐ পুরুষ সমুদয় মধ্যকালে বলি প্রদত্ত হয়। ব্যোমই মধ্যকাল—সর্ব্বজীব-গৃহ; ঐ পশুগুলিই আহাব। মধ্যকালই উদব—সর্ব্বপ্রকাব আহাবেব আধাব। দশ দশ ক্রমে বলি দেওয়া হয়। দশমাত্রিকেব প্রত্যেক পদটি বিবাট ছন্দ। পূর্ণ আহাব প্রাপ্তিব জন্য বিরাটই পূর্ণ আহাব। মধ্যযূপে ৪৮টি পশুবলি প্রদত্ত হয়। পশুবলি জগতীব অন্তর্ভুক্ত। জগতী ৩৮ শব্দমাত্রিক। সর্ব্বোত্তম ববণীয় বা শ্রেষ্ঠ ৮টি বলি প্রদত্ত হয়। গায়ত্রীই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই কল্যাণরূপী, ব্রহ্মই সুতবাং শ্রেষ্ঠ। যজ্ঞই ব্রহ্ম, যাহা বলি প্রদত্ত হয়, তাহাও ব্রহ্ম, অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাও ব্রহ্ম। বাজন্যই ক্ষত্রিয়। বাজন্যই 'ক্ষত্রিয় পুরুষ'; তাঁব সন্নিধানে বলি প্রদত্ত হয়। ক্ষাত্রই ক্ষাত্রেব মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ কবেন, যেমন ব্রহ্মেব মধ্য দিয়েই ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। তাপস (তপঃ) দেবতাব উদ্দেশ্যেই শূদ্র বলি প্রদত্ত হয়। তাপসই শূদ্র। তাপসেব মধ্য দিয়েই তাপসসমূহ বর্দ্ধিত হয; (ঐ ব্রা ও শত. ব্রা দ্রঃ)।

যজ্ঞ মানে ত্যাগ। ত্যাগ বুদ্ধি বিকাশেব জন্যই যজ্ঞ। অসুবেরা, এইরূপ

যজ্ঞের বিরোধী। তারা ভোগ চায়। জীব জগৎ, প্রাণী জগৎ, জড় জগৎ অর্থাৎ দেব, মানব, পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদি—সকলের জীবন সকলেই সার্থক করছে যজ্ঞদ্বারা। এই যজ্ঞের জন্যই দেবাসুর সংগ্রাম। দেবতারা যজ্ঞকে খুঁজে পাচ্ছেন না—যজ্ঞ স্বয়ং উদয় হচ্ছেন। যজ্ঞ হচ্ছে সর্ব্বক্ষণ। কালরূপী প্রজাপতি যজ্ঞ করছেন। সেই যজ্ঞের ঋত্বিক মাস ও ঋতু। প্রজাপতির বহু হবার ইচ্ছা হল, তপস্যা করলেন। তপস্যায় তিনি নিজের মধ্যে দ্বাদশাহ যজ্ঞ দর্শন করলেন—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মতই দর্শন করলেন। তপস্যার শক্তিতেই তিনি বহু হলেন। সেই শক্তি তাঁরই। সেই বিরাট পুরুষ সর্ব্বব্যাপী। ঋষিদের, সাধ্যদের (পূর্ব্বকল্পের) দেবতাদের যজ্ঞ করবার ইচ্ছা হল। তাঁরা ঐ পুরুষকেই পশুরূপে আটক্ করলেন। তাঁকেই খণ্ড খণ্ড ক'রে আহুতি দেওয়া হ'ল। এই মহাযজ্ঞে, তাঁর নাভি হ'তে অন্তরীক্ষ প্রকাশ হ'ল, মাথা হ'তে দ্যুলোক, পা হ'তে ক্ষিতি, কর্ণ হ'তে দিক্ সকল, তাঁর মন হ'তে চন্দ্র, চক্ষু হ'তে সূর্য্য, মুখ হ'তে ইন্দ্রাগ্নি, প্রাণ হ'তে বায়ু, অঙ্গ হ'তে মানুষ ও পশু আদি সমস্তই আবির্ভূত হ'ল—সমগ্র বিশ্বই ঐ যজ্ঞীয় পশুর শরীর। তিনি অকাম। বিশ্বকল্যাণেই তাঁর আত্মাহুতি, বিশ্বকল্যাণেই তিনি আপনাকে বিলিয়ে দিলেন। সমস্ত প্রাণীর অন্নরূপে, ভোগ্যরূপে, বিশ্বই ঐ যজ্ঞে বিনিযুক্ত হয়েছে।

[৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'যজ্ঞ কথা' ও মৎপ্রণীত ভারতধারা (২য় খণ্ডের), বিবিধ প্রসঙ্গ দ্রঃ।]।

তন্ত্রে পূজা তিনরকম, স্থূল, সূক্ষ্ম, পরা। বৈদিক অনুষ্ঠানাদিতেও তাই। ব্যাপক ভাবই সূক্ষ্ম যজ্ঞ। তাদাত্মভাবই পরা পূজা।

পুরুষ-যজ্ঞ হ'তে আমরা বুঝতে পারি যে (১) সংকল্প (ঈক্ষণ, কাম) আগে, তারপর যজ্ঞ, তারপর, তপস্যার তেজে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ। (২) ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশের কারণ বিভূতি নয়—ত্যাগ ও তপস্যাই মূল। (৩) ঐ ত্যাগ, করুণা বা অনুকম্পাজনিত—তীব্রতম ভালবাসা—সর্ব্বত্র প্রেম-দৃষ্টি। (৪) ঐ আত্মাহুতি—তপস্যা ও তেজ—ঐ মহা-বৈরাগ্যই, বিশ্বের মুখ বা ব্রাহ্মণ্যশক্তি, অতএব, কামনা শূন্য ত্যাগ-তপস্যা বিনা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় না। পরবর্ত্তী সময়ে, গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণ বিভাগের অর্থ এইখানে পাওয়া যায়। 'আগে ব্রাহ্মণ, পরে যজ্ঞ'—এই অর্থ নয়। যজ্ঞ না করলে

ব্রাহ্মণ হয় না। পুরুষ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেছেন কাবা ? (৫) কর্ম্মমাত্রই পূজা যদি যজ্ঞেব ভাবে নেওয়া যায়। ছোট কোনটিই নয়, যখন সমগ্র বিশ্বই, তাব প্রতি অঙ্গই বিবাট। আব একটি জিনিষ বোঝা যায়—ভাবতেব বিবাহাদর্শ, উক্ত হয়েছে যে ঐ বিরাট পুরুষ পবে স্থিতি শক্তিব প্রতিষ্ঠাব জন্য, স্ত্রীশক্তিব সহকাবীতাব প্রয়োজন অনুভব কবেন।

যজ্ঞানুষ্ঠানে, ঋক্‌গুলি পবিবর্ত্তন কবলে কি নাম হয় ও সেগুলি কি ভাবে উচ্চাবিত বা গীত হত তাব আভাসও পাওয়া যায়, যথা 'আগূঃ' শব্দ। 'আগূঃ (স্ববিশেষে 'যজামহে' এই তিঙ্‌ন্ত বেফান্ত) পূর্ব্বক বষটকাবান্ত অর্দ্ধ ঋকে অবসান ; একটি ঋক্‌কে 'যাজ্যা' বলে। যে ঋকেব প্রথমার্দ্ধ এক বিবাম, চতুর্ম্মাত্র প্রণবান্ত দ্বিতীয়ার্দ্ধে দ্বিতীয় বিবাম, দেবতাব আনুকুল্য-কাবী সেই ঋককে 'পুবোহনুবাক্যা' বা 'অনুবাক্যা' বলে। ত্রিবৃৎ সোমাদি ঃ —অগ্নি-ষ্টোমেব ষোড়শস্তোত্রে ঋকগুলিকে ২১টি সামে পরিণত ক'বে উদ্গাতারা গান কবেন, মোট মন্ত্র সংখ্যা ১৯০ (১৮৯+১=৯×২১+১=১০ ×৯+১০+১০×৯......)। ত্রিবৃৎ সাম=৯, ২১ ত্রিবৃৎ সাম+১টি মন্ত্র=১৯০। ১৯০ মন্ত্র=১০ ত্রিবৃৎ আব ৯০টিতে আব ১০ ত্রিবৃৎ। বাকী ১০টি মন্ত্রে আর একটি ত্রিবৃৎ হ'য়ে, ১টি অবশিষ্ট থাকে। শেষোক্ত ২১ ত্রিবৃৎ আদিত্যস্বরূপ, অতিবিক্ত মন্ত্রটি যজমান স্বরূপ। আদিত্য ২১ সংখ্যা পূবক। ঐ আদিত্যস্বরূপ ত্রিবৃৎ=বিষ্ণুর স্বরূপ। গবাময়ন সত্র ২১দিনে হয় (পূর্ব্বে ১০ দিন পবে ১০ দিন ও মাঝে ১ দিন), ঐ মাঝেব দিন 'বিষুব'। এই মধ্যবর্ত্তী বিষুব দিনেব সঙ্গে একবিংশ ত্রিবৃৎ সোমেব সাদৃশ্য আছে (তাই বলা হয় স্তোম সকলেব মধ্যে বিষ্ণুব স্বরূপ)।

যে সকল ঋক্ মন্ত্রে সাম উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে একেব চবণ অন্যেব চবণেব সঙ্গে যোগ ক'বে গান কবলে তাকে 'বিহৃত' কবা হয়। ঐরূপ না কবলে 'অবিহৃত' ভাবে গান কবা হয়। এক ছন্দেব এক চবণেব সঙ্গে অন্য ছন্দেব এক চবণ মিশিয়ে অর্থাৎ একেব পর অন্যকে বসিয়ে যে গীত, তাব নাম 'বিহবন' বা 'বিহৃতি সম্পাদন'। কোন স্বরবর্ণেব বিশেষ উচ্চাবণের নাম 'ন্যুঙথ্'। যথা, 'আপো বেবতী ক্ষয়থ' ইত্যাদিব প্রথম চরণে 'আপো' পদেব শেষ ওকাব উদাত্ত স্ববে তিন মাত্র যুক্ত ক'বে ৩বাব উচ্চাবণ কবতে হয়। প্রত্যেকবাব উদাত্ত উদাত্ত উচ্চাবণেব পব কয়েক-

বার অনুদাত্ত স্বরে অর্দ্ধমাত্রায় উচ্চারণ করতে হয়। প্রথম উদাত্তের পর ৫ অনুদাত্ত, দ্বিতীয় উদাত্তের পর ৫ অনুদাত্ত এবং তৃতীয় উদাত্তের পর ৩ অনুদাত্ত বিহিত। ত্রিমাত্রা যুক্ত ওকার এবং অর্দ্ধমাত্রা যুক্ত হ্রস্ব ওকার চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করলে এইরূপ হয়:— ও ওও ওও ওওও ও ও ওওও ও ও ও ও ওঁ। সামগানের পূর্ব্বে 'হুং' কার উচ্চারণ বিহিত=হিঙ্কার। (কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম। এইরূপ অনেক স্থলে পাওয়া যায়)।

[অধ্যাপক ৺ রামেন্দ্রসুন্দর ও মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর অনূদিত ব্রাহ্মণগ্রন্থ দ্বয়ের পাদটীকা দ্রঃ]।

হরপ্পা ও মোহেন জো দাড়ো আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন দ্রবিড় সভ্যতার সঙ্গে ভূমধ্য সাগরের আশেপাশের সভ্যতার সাদৃশ্য আছে, পণ্ডিতেরা বলছেন। ভারতময় দ্রাবিড়রা পরিব্যাপ্ত ছিলেন। দ্রাবিড়দের ও একটা নিজস্ব সভ্যতা ও ভাব ছিল, পণ্ডিতেরা স্বীকার করছেন, ফলে দাক্ষিণাত্যে (ঐ স্থানেই বিশেষ ক'রে) তামিল ভাষার উপর সংস্কৃতের অদ্ভুত প্রভাব এসে পড়েও বহুস্থানে সংস্কৃতানুযায়ী ধ্বনি ও ভাষা প্রকাশের বিশেষ রীতি (idiom) গৃহীত হয়, অপর পক্ষে, তামিলের বহু উচ্চারণ ও স্বর-ভঙ্গী সংস্কৃতে প্রবেশ লাভ করে। আর্য্যায়িত হবার পরও এই দ্রবিড় জাতি আজও সাম উচ্চারণে তাঁদের ভঙ্গী রেখে এসেছেন। সমস্ত দাক্ষিণাত্যে তাদের বিশেষ প্রভাব এখনও এবং দক্ষিণ ভারতই এক সময়ে সমগ্র ভারতের ধর্ম্মাচারকে সংঘবদ্ধ করতে বিশেষ ভাবে অগ্রণী হন। মনে হয় এই সব কারণে ও হিন্দুজাতির অধঃপতন যুগে—বৌদ্ধযুগ ও পরবর্ত্তী কালে—বৈদিক অনুষ্ঠানে ক্রমাগত আঘাত পড়ায়, সামগানের সুর, ও উচ্চারণের বিশেষত্ব আদি-লোপ পেয়েছে।

মোহেন-জো-দাড়ার সবটা খনন হয় নি, সব কথা জানা যায় নি। কিন্তু ইহার মধ্যেই বলা হচ্ছে যে বৈদিক সভ্যতার মূল আর একটি প্রাচীনতর সভ্যতা! বৈদিক সভ্যতার মূল 'আর্য্য 'দেব'-সভ্যতাই হোক্ বা মোহন-জো-দাড়ার সভ্যতাই হোক্ বা আর যাই হোক্, এখনই নিঃসংশয়ে কোন কথা বলা ঠিক নয়।

সামগানই প্রথম গান। সঙ্গীতবিদ্যার স্ফুরণ একদিনে হয় নি। কত

কাল লেগেছিল? কে প্রথম এই বিষ্যাব শিক্ষক? এখানেও উত্তব—দৈবোৎপত্তি। সাম গানেব মাত্রা, গ্রাম, পদ্ধতি আছে; ঐ গানে 'তান' আছে। সঙ্গীতশাস্ত্রে, সব রকম সুমধুব তান, সব বকম পদ্ধতিব মূল-স্থানের নাম 'বাগ'। সাম গানের তানে আর্য্য উন্মত্ত হ'তেন—এতই সুমধুব তাঁব লাগত, সুব-সৌন্দর্য্যে বিভোর হযে তাঁবা দেবস্তুতি কবতেন—'সুন্দবের' বোধ, মাধুর্য্যেব বসবোধ, তাঁদেব ছিল না? শতপথ ব্রাহ্মণ শতমুখে স্বাধ্যায়েব প্রশংসা করেছেন, সাধককে বেদেব যে কোন অংশ, অন্ততঃ অল্পও, নিত্য আবৃত্তি করতে বলেছেন, যাতে সুবতানেব অভ্যাস থাকে। যা তখন অসমর্থেব পক্ষে ব্যবস্থা ছিল তাই এখন নিত্যকবণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঋষি-হৃদয়ে উৎপত্তি হয় 'বাগ'। সাম গান হ্রস্ব, দীর্ঘ, গুরু, লঘু, দাত্ত, উদাত্ত, অনুদাত্ত আদি ভাবে গীত হত। বেশ বোঝা যায়, সে গানে বিবাম (ফাঁক) ছিল, কিন্তু যোগসূত্র বিহীন নয—সংযোগসূত্রও ছিল। সঙ্গীতশাস্ত্রে ইহাই 'গমক'। 'বাগ' ও 'গমক'—পববর্ত্তী কালেব নামকবণই হোক্ বা যাই হোক্, ঐ দুই বর্ত্তমান ছিল। এই 'বাগ' ও 'গমক' আজও ভাবতেব নিজস্ব।

সঙ্গীত বিদ্যা—১।

ভাবতেব সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যাত্মশাস্ত্রেব অন্তর্গত—বিশেষ সাধনাঙ্গ শাস্ত্র। বৈদিক যুগেব সুব বা আবৃত্তিক্রম এখন নেই। বিবাট পুরুষেব দেহ হ'তে উৎপন্ন হয় প্রথম—সাবিত্র অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য; তাবপব (২) প্রাজাপত্য বা গায়ত্রী-অধ্যয়নশীলেব ত্রিবাত্র ব্রত ও উপনযন বিধি, (৩) ব্রাহ্ম—ব্রতধাবীব সম্বৎসব মধ্যে বেদ গ্রহণ, (৪) ছন্দসকল—পূর্ব্বে দেখেছি। স্বাধ্যায় বা বেদ আবৃত্তিব লক্ষ্য যেমন ছিল সংযম ও প্রজ্ঞা-বর্দ্ধন, তেমনি আবৃত্তি কবতে হত যে হিসাবে তা আমবা ইতিপূর্ব্বে দেখেছি। সে আবৃত্তিক্রমেও খেলা কবত সুমধুব স্বরলহবী। বিবাটেব শবীব হ'তে আবো বহু জিনিষেব মধ্যে উৎপন্ন হয় 'বৃহৎ' বা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য—ছন্দোৎপত্তিব পূর্ব্বে। তখন সঙ্গীতবিষ্যা শিখতে হলে ব্রহ্মচর্য্য অবশ্যপালনীয় ছিল—শুদ্ধ পবিত্র জীবন যাপন কবতে হত। এইরূপ জীবনযাপন চেষ্টায সমগ্র জীবনটাই হয়ে যেত ছন্দময়। অর্থাৎ যে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ছন্দ হত,

সেই ভাবানুসারী জীবনকে গ'ড়ে তোলা হত। এটি এখন বোঝা কঠিন। যে ভাব আমরা হারিয়েছি। ছন্দের অক্ষরমাত্রার সংখ্যা অনুসারে উপনয়নের বয়স নির্দ্দিষ্ট হত। উপনয়ন হত দ্বিজের—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, এই ত্রিবর্ণের, অগ্নি, ইন্দ্র, বিশ্বদেব—এই ত্রিছন্দ। ব্রাহ্মণের উপনয়ন হত ৮ হ'তে ১৬ বৎসরের মধ্যে, ক্ষত্রিয়ের ১১।১২ বৎসরের মধ্যে, বৈশ্যের ১২ হ'তে ২৪ বৎসরের মধ্যে। এই বয়স নিরূপিত হত গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ, জগতী, পঙ্‌ক্তি, বৃহতী আদি ছন্দানুসারে। এই ধারা আজও কতক বর্ত্তমান, যদিও সেইভাব ও উদ্দেশ্যহারা। এখন 'জাতি' বা 'বর্ণ' বংশগত, জাতি বা বর্ণের কথা পাঁজিতেই রয়ে গেছে, দরকার হয় কেবল বিবাহের সময়।

[লক্ষ্ণৌ হ'তে প্রকাশিত 'সঙ্গীত' নামে ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় অনেক বৎসর পূর্ব্বে রাগিণীভেদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়. তারিখ ও সংখ্যা টুকে রাখতে ভুলেছি, ক্ষমা করবেন। ঐ প্রবন্ধের শেষে হিন্দিতে গুরু-শিষ্যের কথোপকথন আছে। ঐ প্রবন্ধ অবলম্বন ক'রে—যা কতক কতক টুকে রেখেছি—তা হ'তে আজ আপনাদের কিছু সংক্ষেপে বলব বিষয়টি কঠিন বিশেষ যার সঙ্গীতশাস্ত্রের বোধ প্রায় নেই]।

সঙ্গীতশাস্ত্রে 'শ্রুতি' ও 'স্বর' দুটি কথা আছে। শক্তির প্রকাশ দেখে শক্তির অর্থবোধ হয়। সৃজনকারিণী শক্তি যেটি, সর্ব্বশক্তিমত্তা যেটি, তা সর্ব্বব্যাপী। ঐ শক্তি আমাদের মধ্যেই কুণ্ডলী পাকিয়ে আছেন মূলাধারে। সেটি যেন একটি সাপ—তন্ত্র নাম দিয়েছেন 'সাপিনী'। সাপ ও কুণ্ডলে যে ভেদ, 'স্বর' ও 'শ্রুতি'তে সেই ভেদ বলা যেতে পারে, একই বস্তু দুরকমে শোনায়। রাগ রাগিণীর আলাপকালে যে সব ধ্বনির সত্যই ভঙ্গী দেওয়া হয়, সেই সব ধ্বনিই সেই রাগের 'স্বরে' পরিণত হয়, যেগুলি সে রকম হয় না, সেগুলি 'শ্রুতি' থেকে যায়। তাদের যেমন বস্তু আছে তাতে সমবিভক্ত 'শ্রুতি'র পর্য্যায় থাকে। যে কোন রাগে গীত স্বরগুলি যদি অন্য রাগে আলাপ করা হয় ও ভিন্ন প্রকারের শ্রুতির যাচাই করা হয়—বাছাইটি 'শ্রুতি' হ'তেই হওয়া চাই—যদি সত্যই হয়, তখন ঐ স্বরগুলিই 'শ্রুতি' হয়ে যায়। হিন্দুস্থানী গীতে ২২ রকম শ্রুতির চল্‌ আছে। বাঙ্গলার নিজস্ব যে সব গান, তাদের শ্রুতি নিলে সংখ্যা বেড়ে যায়। অতএব শ্রুতির সংখ্যা যে নির্দ্দিষ্ট তা নয়।

শক্তিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে বোঝা যায়, কিন্তু সমষ্টিভাবে বুঝতে পারা যায় যখন 'বোধ' জন্মায়—মনীষার মধ্যে 'বোধ'টি আসা চাই। খণ্ড হলেও, প্রত্যেকটির একটি একটি বিশেষ ভাব আছে, বিশেষ রূপ আছে, বিশেষ ক্ষমতা আছে। বিশেষত্বের প্রতিষ্ঠাই 'ন্যাস'। প্রত্যেক রাগের এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেকটির পরিচয় এক একটি অসাধারণ লক্ষণের দ্বারা প্রকাশ পায়, 'ষড়জ' ছাড়া প্রত্যেকটিতে 'ন্যাস' ও 'অংশ' থাকে। 'ন্যাস' ও 'অংশে'—এই দুয়ের যথার্থ প্রয়োগে—গানে 'ব্যঞ্জনা' আসে। দক্ষিণ ভারতে, রাগ বিভাগ প্রণালী একটু অন্য রকম। পূর্ব্বে যে বিভাগ প্রণালী ছিল, তাই যে সর্ব্বস্থানে ঠিক আছে তা নয়, সংখ্যাও যে বাঁধাবাঁধি আছে তাও নয়। ঠিক্ পরে পরে উচ্চারিত স্বরগুলির প্রবাহকে বলে 'স্বরসমূহ'। 'স্বর' আবার 'শুদ্ধ' ও 'বিকৃত'। স্বরের জাতি আছে,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। 'মেল' ধ'রেই রাগের বিকাশ দেখান হয়, কিন্তু তাতে আছে 'আরোহ' ও 'অবরোহ', 'আরোহ' হচ্ছে 'চড়াই' (ascending), 'অবরোহ,' 'উৎরাই' (descending), ওঠা নামা—'আরোহ', 'অবরোহ'—এই দুয়ে হয় স্বরের খেলা। 'মেলে' 'আরোহ' ও 'অবরোহ' প্রয়োগ হলেই, সেটি 'রাগে' পরিণত হয়। পূর্ব্বে 'মূর্চ্ছনা' বলতে যা বোঝাত, পরে তা বদলে যায়। সপ্তস্বরযুক্ত 'গ্রাম' থাকলেই, পূর্ব্বে তাকে মূর্চ্ছনা নাম দেওয়া হ'ত। পরে হল শুদ্ধ স্বরযুক্ত সমস্ত স্বর, যার নাম 'সম্পূর্ণ'। এই ষড়স্বর যুক্তের নাম 'ষাড়ব', পঞ্চ স্বরে হয় 'উড়ব'। 'সম্পূর্ণ', 'ষাড়ব' ও 'উড়ব'—এই তিনটি 'মেলের' তিনরূপ। রূপ প্রকাশে আরোহ ও অবরোহ দরকার, আবার রাগোৎপত্তিতে মূর্চ্ছনা চাই-ই চাই। অতএব 'রাগ' ও 'মেল'—এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী যেটি তাহাই 'মূর্চ্ছনা'। রাগের চার অংশ—'উদগ্রাহ,' 'স্থায়ী' 'সঞ্চারী' ও সমাপ্তিদ্যোতক 'বিশ্রান্তি' বা 'রাগমুক্তি'। ঐ গুলিরই নাম 'তান'। মূর্চ্ছনায় আবদ্ধ আলাপই 'উদগ্রাহ', তৃতীয়াংশ 'সঞ্চারী', শেষাংশ 'বিশ্রান্তি'। রাগ—আলাপের প্রথম অঙ্গই যথার্থ মূর্চ্ছনা। মূর্চ্ছনায় আবদ্ধ আলাপই 'রাগের' নামকরণ করে। পরে, 'মেল' ও 'মূর্চ্ছনার' পার্থক্য লুপ্ত হল। পূর্ব্বে, 'উদগ্রাহ' হ'তেই যে আরম্ভ করতে হবে—এরকম কোন নিয়ম ছিল না, রাগের 'আরোহ' ও 'অবরোহ'কেই মূর্চ্ছনা বলা হত, ও ষড়জের

ছায়, 'মেল' থেকেই তা আরম্ভ হয়। ঐ সময় ২৪টি শ্রুতির নাম পাওয়া যায়।

আলাপে কাল পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকে। স্বরের দৈর্ঘ্য নিরূপিত হয়, বাগ্‌যন্ত্রের একটি বিশেষ স্থানের উচ্চারণে। বিশুদ্ধ স্বর উচ্চারণ হয় না—উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নানাধ্বনির উদ্ভব হয়, ও এই কারণেই কারোর গলা মিষ্টি ও কারোর কর্কশ হয়। এটির নাম স্বরের 'রঙ' (Tone colour)। গায়ক ইচ্ছামাত্র যে কোন অক্ষরকে তিনি মাত্রা হ'তে চারি মাত্রা পরিমাণ করতে পারেন। ছন্দশাস্ত্রে, বিরাম স্থানই 'যতি' বা 'বিচ্ছেদ'। ভারতীয় ছন্দের ভিত্তি—'মাত্রা', যোরোপের—'স্বরাঘাত' অর্থাৎ তাঁদের রঙ্ 'শক্তি ক্ষেপের' উপর নির্ভর করে, আমাদের করে, মাত্রার বা অক্ষরের উপর। আশ্চর্য্যের বিষয় যে একমাত্র Aristotle এর শিষ্য Aristoxenes কাল পরিমাণানুযায়ী ছন্দ গঠন স্বীকার করেছেন।

শক্তির ক্রিয়াকেই আমরা, আমাদের সুবিধামত বিভাগ করি, একটির নাম দেই 'কাল', অপরটিকে বলি 'দিক্'। গানে, ঐ কাল নিরূপিত হয় 'তানের' দ্বারা, 'তালের' দ্বারা। 'আকাশ' বা অবকাশটাই 'দিক্'। প্রত্যেক গানের নিজস্ব রূপ, সেই 'গানের 'আত্মা'—যেমন আমাদের জীবাত্মা। 'সুরকেন্দ্রই' পরমাত্মা—সেই দিকে সব লয় হয়।

(ব্যাকরণ শাস্ত্রেও 'ব্যঞ্জন' মানে—যা বিশিষ্ট রূপে প্রকাশ পায়, অঞ্জন মানে 'প্রকাশ'। প্রকাশশক্তিরই একটা রূপ বা ভাবব্যঞ্জনা। আবার লয় ও ব্যঞ্জনার আর এক লিঙ্। ঐ স্থলে 'ব্যঞ্জনা' শব্দের 'বি' মানে 'না'—নিষেধ, বি+অঞ্জন অর্থাৎ যার প্রকাশ থাকে না—উৎপত্তি স্থানে ফিরে যায়। স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ মাত্র এক একটা ধ্বনির রূপ বা বর্ণ। বর্ণ, অর্থ প্রকাশক হলে তাকে বলে 'নাম'। শক্তি-মূল ক্রিয়ার, যথা, 'হওয়া' 'করা' 'দেখা' প্রভৃতির নাম দেওয়া হয়, 'ধাতু'। 'নাম' যদি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়, তার নাম ব্যাকরণ শাস্ত্রে 'প্রকৃতি')।

অতএব, আলাপের গতি-বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করতে হলে ঐ সমস্ত বোধ থাকা চাই, যাতে অর্থটি ফুটে উঠে রাগ প্রাণবন্ত হয়। নিষ্ক্রিয় অবস্থা মানে, শক্তি তখন অব্যক্ত। অব্যক্তের প্রথম প্রকাশ—'নাদ'। 'নাদের' অবরোহ ক্রিয়াতে যে যে ভাবে সৃষ্টির বিবর্তন হয়, তাকেই বলে 'রাগ'। এই 'রাগ'ই তন্ত্রের 'মুদ্রা'—যার প্রভেদ প্রয়োগে।

ব্রহ্মার ধ্যানে বেদ আবির্ভূত হন অর্থাৎ যেটি তাঁর মুখ হ'তে ধ্বনিরূপে বা মন্ত্ররূপে ব্যক্ত বা প্রকাশিত। 'ধাতু,' 'প্রকৃতি' ও 'অর্থযুক্ত' বর্ণই ঋঙ্মন্ত্র। সঙ্গীত বিদ্যা, অপর সব বিদ্যারই ন্যায়, বেদ হ'তে এসেছে। শব্দবিদ্যার—ধ্বনিতত্ত্বের—মূলই সঙ্গীত বিদ্যা। ব্যাকরণে 'বর্ণন্যাস' মানে বানান (Spelling)। গানে, বর্ণের 'ন্যাস'—গাইয়ের মুখ দিয়ে প্রকাশ হয়। 'নাদ' বুঝতে পারা যায় কুণ্ডলিনী জাগ্রত হ'লে। সুতরাং 'নাদ' প্রকাশের জন্য তার আধার তৈরী করতে হবে—বিদ্যা অর্জ্জন ক'রে ছন্দময় জীবন গঠন করতে হবে।

বৈদিক আবৃত্তি ক্রম আমরা ভুলেছি এখন। যে সব নাম পাওয়া যায়, সে সবের দ্বারাও তাদের মাত্রা, গ্রাম ইত্যাদির বিশেষত্ব বোঝা যায়। সামগান, তাদের মাত্রা ও গ্রাম, ছিল যজ্ঞরহস্যের লিঙ্গ অর্থাৎ সৃষ্টি তত্ত্বের বিভিন্ন বিজ্ঞান রহস্য। যে বিশ্বনিয়মে শব্দ আত্মপ্রকাশ করে, সেই বিজ্ঞানের সঙ্গেই, বৈদিক 'মাত্রা', 'গ্রাম' ও তাদের অবরোহ প্রণালীর বিশিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। কালচক্রের প্রতিবিম্বই শব্দের অবরোহ, এই অবরোহ প্রণালীই সৃষ্টি রহস্য। ঐ প্রতিবিম্বই সুরকেন্দ্র (Tone-centre)—ওখান হ'তেই বিশ্ববিক্ষিপ্ত হয়, অবরোহের জন্যই 'এক' বহু দেখায়। ইহা আমরা ভুলেছি—'পোঁ' ভুলেছি। পুরুষ যজ্ঞের কথা পূর্ব্বে বলেছি। 'অক্ষর রাশি' ব্যক্ত হয় জ্ঞান, কর্ম্ম, উপাসনার মধ্য দিয়ে; যজ্ঞের উপকরণ—দেশ, কাল ও আত্মা; স্বর অনবরত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে,—যজ্ঞের আরম্ভ বা সমাপ্তি নেই। এই 'বোধ'—ঋতজ্ঞান—উদিত হয় দেবী কুণ্ডলিনীর নিত্যঝরী কৃপায়। শব্দশক্তির ঐ জ্ঞান ফুটে উঠেছে বৈদিক ছন্দে ও গানে, যাতে দেশ-কাল-জীব-ভাবরূপী আবরণ চলে যায়, অন্তরের 'পুরুষ' স্বপ্রকাশ হ'ন।

সৃজনী শক্তির কল্যাণ ভাবই অষ্টাক্ষরী গায়ত্রী ছন্দে প্রকাশ, একাদশ অক্ষর—সূর্য্যের আপন গতি, যার পরিধি ঘুরে আসতে লাগে ১১ বৎসর; ত্রিষ্টুভের একাদশ অক্ষর। শৃঙ্খলাই ঋতের রূপ—শৃঙ্খলার মধ্য দিয়েই সত্য প্রকাশ হন। অতএব, গানে, তালভঙ্গ, ছন্দপাত, ধ্বনির ভুল, বিকৃত স্বর উচ্চারণ হ'লে, গানই নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং ছন্দ ও আবৃত্তিক্রমের ভুলে—যে আবৃত্তি সাধন শক্তি সহায়ে হ'ত, তার বিপর্য্যয়ে—মন্ত্রের সামর্থ্য

থাকে না ; যথার্থ রূপ প্রকাশ না হ'য়ে যদি বিপরীত রূপ প্রকাশ পায়, ফলও হয় বিপরীত। অবশ্য ইহা সকাম সাধকের পক্ষে—ধ্বনিতত্ত্বের দিক্ দিয়ে সত্য, ভাবের অর্থাৎ বিশুদ্ধ-চিত্ত মন-মুখী নিষ্কাম সাধকের পক্ষে ঐ নিয়ম খাটে না। লয় মুখে শৃঙ্খলাও লয় হয় 'ঋতসত্যমে'।

বৈদিক যুগে যেটি ছিল গন্ধর্ব্ব গ্রাম, সেটি হয়েছে এখন গান্ধার গ্রাম। সামগানের আরম্ভরূপ ও অবরোহ প্রণালীর 'নি' বিকৃত হয়ে হয়েছে এখন 'নিষাদ'। 'নিষাদের' কত উচ্চরূপ, কত উচ্চভাব ছিল, তা এখন বোঝান যায় না। স্বরূপ বুঝতে গেলে তার, চাই অধ্যাত্ম সাধন। বৈদিক যজ্ঞাদির ও বেদির, শুল্বসূত্র ও জ্যামিতির, এবং বৈদিক গীতের, পরিমাণ-জ্ঞান এক তানে বাঁধা—বিশ্বপ্রকৃতির অগণন খেলার লিঙ্গ—সংকেত। বৈদিক মন্ত্র-বিজ্ঞান-ধারা বজায় রেখেছেন তন্ত্র, কিন্তু বিজ্ঞানটাই আছে—নেই সেই আবৃত্তির ঢং, যা পূরণ করা হয়েছে সাধনার দ্বারা। বৈদিক ছন্দ, ছন্দের আবৃত্তিক্রম, মন্ত্রের প্রতি অক্ষর সংখ্যা—সবই ছিল যজ্ঞের বিশেষ অঙ্গ ও প্রত্যেকটিই ছিল বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যজ্ঞাপক। তান্ত্রিক সাধনার 'যন্ত্র' আদি ও ঐ ভাব প্রকাশ করে। 'অবরোহ' ও 'আরোহ'—একই বস্তুর দুই দিক্। 'আরোহ'এর দিক্ দেখলে—অণু, পরমাণু, অণুকীট, কীট হ'তে পশুজীবন, পশুজীবন হ'তে মানুষ—মানুষেই দেবত্ব ও ব্রহ্মত্ব প্রকাশ। 'অবরোহের' দিক্ দেখলে—ব্রহ্মশক্তিই বহুরূপে পরিণত হয়েছেন, ব্রহ্মশক্তি হ'তেই সৃষ্টি। পাশার ঘুঁটির মত ঘুরে ফিরে সেই একই সংখ্যা আসছে। সৃষ্টিক্রম ব্যাখ্যা দুদিক্ দিয়েই হয়—স্বরূপের দিকে গতি ও বহুভাবের ছন্দ। একেরই দুই দিক্—এই বোধ, হয় ছন্দময় জীবনে।

খোলো সঙ্গীত বিদ্যার সঙ্গে ভারতের পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট। খোলো পণ্ডিতেরা দুটি নাম দেন—Arithmetic Series এবং Harmonic Series, সুশৃঙ্খল অবরোহ গতিই Arithmetic progression, যার লক্ষণ প্রকাশ পায় ক্রমস্পন্দিত তার-যন্ত্রের স্পন্দনে। প্রত্যেক সুরই চলে ঐ যন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট বিভাগের সঙ্গে—নিয়মিত ভাবে ধ্বনি 'খাদের' পর খাদে অবরোহণ করে। Harmonic Seriesএর 'আরোহ' গতিতে ধ্বনি ক্রমবর্দ্ধনশীল হয় ও ঘন ঘন তারস্পন্দনে তার লক্ষণ স্ফুটিত হয়, খোলো বর্ত্তমানে তার যন্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন করেছেন—কি জোর্ আওয়াজ,

সুস্পষ্ট ও মধুব, তাঁদেব তাব যন্ত্রেব। বর্ত্তমানে আমাদেব তাব যন্ত্রেব আওয়াজ ক্ষীণতব, মিষ্ট কিন্তু সরু আওয়াজ। বৈদিক গানে, গায়ক গলা ছেড়ে বা উদাত্তে অথবা খাদে বা অনুদাত্তে গাইতেন। বেদে শত তাবযুক্ত যন্ত্রেব কথা পাওয়া যায়—কত জোর্ আওয়াজ ছিল তাব। সুবেব গতি সম্বন্ধে, ধোলোব আছে সুবেব অবকাশ—Numerical intervals বা Empty spaces, আর্য্যের আছে, স্বাভাবিক গতিব বিকাশ এবং ধ্বনি-প্রবাহেব ধীবে ধীবে সুরকেন্দ্রে লয়। ধোলোব, বহুত্বেব মধ্যে সমঞ্জস বিধান, আর্য্যের গতি একত্বে। ভাবতে, গানেব সহকাবী নাচ ও বাজনা—এই দুটি গানেব সঙ্গে শিখতে হয়। এই বাদ্য ও নৃত্য বিজ্ঞান শিখতেও দবকাব ব্রহ্মচর্য্যেব।

ধোলো Harmonyবও একটি দিক্ আছে। স্বামীজি ধোলো Harmonyব সেই দিকৃটিব প্রশংসা কবতেন। আমাদেব সঙ্গীতবিদ্‌দেব উচিৎ, সেই দিকৃটি প্রকাশ কবা ও কাযে লাগান। প্রত্যেক সুবই এক একটি ভাব প্রকাশ কবে। আমাদের Harmony মানে, 'সুব-সম্বাদ' বা 'বাদী' 'সম্বাদীব' মিলন—সুব 'বাদী' হলে, সাধাবণতঃ, তাব পঞ্চম সুব হবে 'সম্বাদী' ('গা' বাদী হলে 'নি' সম্বাদী হয়), এই প্রকাব।

ভাবতেব ভাব-ধাবাব সঙ্গে না মিলিয়ে দেখলে ধোলো হিসাবে আমাদেব ছন্দবিভাগ বীতি বোঝা কঠিন। উদাহবণস্বরূপ, ধবা যাক্ 'অনুষ্টুপ্' ছন্দ। এই ছন্দে ১৬টি শব্দমাত্রা আছে। তাকে দুভাগ বা দুটি অর্দ্ধ অংশে বিভক্ত কবলে, শেষ অংশটি হয় ⏑ — ⏑ ⏓ এই বকম। এই রূপটি ধোলো Iambic বিভাগেব একটি রূপেব ন্যায। ঐ রূপটি যে হ'তেই হবে তাব বাঁধাধবা প্রয়োগ বেদে বা গৃহ্যসূত্রে নেই। অনুসন্ধান ফলে ধোলো ঠিক্ কবলেন যে 'অনুষ্টুপ্' ছন্দই সর্ব্বপ্রাচীন ছন্দ, তাঁবা 'ত্রিষ্টুভ্' ও 'জগতী' ছন্দে অনুসন্ধান কববাব তেমন উপকবণ পান নি। বেদেব শেষ অংশে, পববর্ত্তী মহাকাব্যে, বৌদ্ধগ্রন্থ আদিতে ঐ অনুষ্টুপ্ ছন্দেব প্রথমাংশেই ঐ বকম পদবিভাগ দেখা যায়—শেষাংশে নয়। অপর পক্ষে, গাযত্রীব সুপর্ণারূপ ধারণে বলা হয়েছে যে, প্রথমে ওঠেন 'জগতী' ছন্দ, পবে প্রকাশ হন 'ত্রিষ্টুভ্'। ভাবমুখে যেটিব প্রথম প্রকাশ হয়, তাকে পুঁথিগত কবতে হলে, যখন যেটিব প্রয়োজন তখন সেইটিই প্রয়োগ

করা হয় মাত্র। এই দিক্ দিয়ে বৈদিক স্মৃতির বা ব্রাহ্মণগ্রন্থাদির প্রামাণ্য বেশী বলেই মনে হয়। আর একটি কথা। সুপর্ণার উর্দ্ধগমনে চাই, অস্থি ও স্নায়ুর বল (রূপকের বাহ্য ভাব), 'জগতী' ও 'ত্রিষ্টুভ'; এই ভাব প্রকাশক। বিরাটের প্রাণ হ'তে আসেন 'বৃহতী' ও মজ্জা হ'তে 'পঙ্‌ক্তি' ছন্দ, একটি সুপর্ণার গতি, অপরটি, বিরাটের বহু-প্রকাশ-রীতি। উভয় স্থলেই অনুষ্টভের কথা নেই। ভাবের দিক্ দিয়ে আর্য্যের গীতবিদ্যা বোঝাবার চেষ্টা না করলে অনেক স্থলেই গোলমাল হয়। এখন ভারতীয় সঙ্গীতে অনেক নতুন জিনিষ প্রবেশ করিয়ে ইহার উন্নতি সাধনের চেষ্টা চলেছে। এটি যে খুব ভাল লক্ষণ ইহা বলা বাহুল্য, কিন্তু আমরা যেন ভাবহারা না হই, সকালের সুরের সঙ্গে সন্ধ্যার সুর মিশিয়ে একটি সুমধুর সুর সৃষ্টি হ'তে পারে, কিন্তু তাতে ভাবের বিপর্য্যয় হবে। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে প্রাতঃসন্ধ্যা, সৃষ্টি-দ্যোতক, সন্ধ্যার সন্ধ্যা, প্রলয় দ্যোতক, সকাল ও সন্ধ্যার সুরেও এই মূলগত প্রভেদ আছে। বলবার উদ্দেশ্য এই যে, মূল-ভাব বা মৌলিকত্ব বজায় রেখে যত নতুন সৃষ্টি হয় ততই ভাল।

সঙ্গীত-বিদ্যা—২

মায়াটা বাস্তব। বাস্তব যে চৈতন্যেরই আর এক মূর্ত্তি, তা আমরা ভুলেছি। এই ভুলেই আসে পৃথক বোধ। এই ভুলটাই মিথ্যা, অথচ মিথ্যাকেই আঁকড়ে থাকি আমরা, মনে করি এই মিথ্যাটিতেই রয়েছে মজা; সত্যকে—চিৎ বা চৈতন্যকে—ধ'রে থাকলে, ভুল সব যে একে একে খ'সে যায় ও তারা লম্বা দৌড় মারতে থাকে, এ মজাটা মন দেখতে চায় না। সরল গতি ছেড়ে, মন যায় বক্র গতিতে, অথচ মন জানে কোনটি সরল গতি। এমনই সংস্কারের প্রভাব। ভারতের বিশেষত্ব যেথায়, সেইটিই আমরা করি তুচ্ছ—ফল আত্মঘাতীর মত। এই বিশেষত্বের উপর ভিত্তি ক'রে হোক্ না কেন নতুন নতুন সুর তালের উৎপত্তি, হোক্ না নতুন নতুন আবিষ্কার—বেরুবে তাতে নতুন নতুন সাধনার পথ, আসবে বহু সাধকের প্রাণে শান্তি। যতক্ষণ সত্য মিথ্যা বোধ আছে, ততক্ষণ

সত্য সত্যই, মিথ্যা মিথ্যাই। ঐ সনাতন সত্য আব এই চিবন্তন মিথ্যা, চলেছে পাশাপাশি।

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, পুনঃ সৃজনাদি ব্যাপাবই বিবাট সঙ্গীত—বিশ্বসঙ্গীত। অব্যক্ত স্থবকেন্দ্রেব প্রকাশ ওঁকাবে। ওঁকাবই ঐ স্থব-কেন্দ্রেব বাহ্য অবয়ব। মহাব্যামে বেজে ওঠে ওঁকাব, স্পন্দিত হ'তে থাকে তাব ধ্বনি—হয় তাতে অগণন বিশ্বেব সৃষ্টি, আবাব বাজে ওঁকাব—আসে প্রলয়! আমরা যাকে 'মায়া' বলি, তাব পবিমাণ আছে, পবদাব পব পবদা খুলে যায় সব জিনিষেব, ক্রমপবিণতি পাই দেখতে, 'মাত্রা' দেখতে পাই সব জিনিষেব—মায়াব 'মাত্রা'ও আছে। মায়াব আববণ, মাযাব প্রয়োগেই—মায়াব সহায়েই—খুলে যায়, কাঁটা দিয়ে কাঁটা উঠে যায়। মায়া-বিলাসেব উদ্দেশ্য—আববণমুক্তি, বন্ধনমুক্তি, পূর্ণ আত্মবিকাশ, ইহাই মায়াব লক্ষ্য। স্বস্থানেই সব ফিবে যায—মাযা, ব্রহ্মেই যুক্ত। দবকাব প্রত্যক্ষ জ্ঞানেব, প্রত্যক্ষ পবিচয়েব—অনুভূতিব। সঙ্গীতে হয় হৃদযেব বিকাশ, হয সাধকেব সত্য সাক্ষাৎকাব। গানেব চেতনায় জডেও আসে প্রাণ। প্রাণ আছে, জডে সুপ্ত, তাই মনে হয় আসে প্রাণ বাহিব হ'তে। স্থব-কেন্দ্রেব অববোহ গতিতে আবম্ভ হয মাযাব খেলা, 'আবোহে' উহাই ধাবিত হয় একের দিকে—ওঁ তত্ত্বে বিশ্ব বিলীন হয়। যা 'মায়া' এখন, তাই 'একং' শেষে। তাল, মাত্রা, স্বব—এসব বাঁধাধবা রূপ—আকাবটা মায়া—মুক্ত ভাব হ'তে স্বতন্ত্র প্রাণহীন যন্ত্র। মুক্তিব ভাব আছে 'আলাপে', ভাবেব গাম্ভীর্য্যে, ভাবেব গাঢত্বে—উধাও উধাও যাব গতি। স্থরকেন্দ্রেব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলে, আলাপ ও ভাব, এনে দেয প্রাণ যন্ত্রে—মায়াব উদ্দেশ্য সার্থক হয়। সংকুচিত ব্রহ্মই মায়া। বীজেব বৃক্ষে পবিণতি বা ভ্রূণেব জীবে পবিণতিব মত, 'বাগেব' আলাপ। কুঁড়ি ফুটে ওঠে, ফুলে হয় পবিণত—বাগেব আলাপে। ভাবতেব সঙ্গীত কলা, বাগ-বাগিণীব রূপ দেখিয়েছেন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়েছেন, বাগিণীকে বাগেব সহধর্ম্মিণী কবেছেন, বাগ-বাগিণীব সন্তান-সন্ততীও আছে। সূর্য্যোদয় হ'তে সূর্য্যাস্ত, সূর্য্যাস্ত হ'তে সূর্য্যোদয়—এই সমস্ত ভাগ ক'বে দেখান হয স্থবেব খেলা—মায়াব নানা বঙ্গ। মায়াব অর্থই ব্রহ্ম, বিশ্বেব অর্থই চৈতন্য। পৃথক্ ভাব আসে ভয় হ'তে, দুর্ব্বলতা হ'তে। গানকে—স্থবকে—স্ববলিপি দিয়ে রূপ দেওযাটাই অর্থ

হ'তে নির্গত হয়? সব বর্ণের মধ্যে আ, ঈ, উ কি প্রধান নয়? নিজের গলায় হাত দিয়ে দেখ, বুঝবে ঐ তিনটির উচ্চারণ পৃথক পৃথক স্থান হ'তে হচ্ছে। ঐ ঐ স্থানই গ্রাম। বলা হয়, সপ্তদ্বীপ হ'তে ৭টি স্বরের উৎপত্তি, গলায়, গলার নীচে, গলার আশেপাশে ৭টি অস্থি আছে, হাত দিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায়। সেই অস্থি-স্থান হ'তেই ৭টি স্বরের উৎপত্তি হয়েছে ও তার নামই সপ্তদ্বীপ।

নারদের মতে, স্বর ৭টি, গ্রাম ৩টি, মূর্চ্ছনা ২১টি, তান ৪৯টি=স্বরমণ্ডল। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যমা, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ=সপ্তস্বর। ষড়জ, মধ্যমা, গান্ধার—এই তিন গ্রাম। ষড়জ—ভূলোকজাত, মধ্যমা—ভুবর্লোক হ'তে এসেছে, স্বর্গ ও অন্যত্র হ'তে—গান্ধার। স্বর-রাগের বিশেষ হ'তে গ্রাম ও রাগাদি হয়। মধ্যম গ্রামে ২০, ষড়জ গ্রামে ১৪, তানের ১৫—গান্ধারগ্রাম আশ্রিত। এই প্রকারে, নারদ সামবেদের স্বর চরিতাদি বর্ণনা করেছেন; ষড়জ—পদ্মপত্রপ্রভ, গান্ধার—কণকাভ, পঞ্চম—কৃষ্ণবর্ণ, ধৈবত—পীতবর্ণ। সামগান সম্বন্ধে বলা হলেও, সপ্ত-ধ্বনি কি প্রকার ছিল বোঝা যায় না।]

উক্ত প্রশ্নোত্তরে স্থূল ভাবের কথাই বলা হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে আ, ঈ, উ কে প্রধান তিন স্বর বলা হয়েছে, 'মূলস্বর' বলা হয় নি। ব্যাকরণশাস্ত্রে মূলস্বর ৪টি—অ, ই, উ, ঋ। অ, ই, উ—গানে দীর্ঘ করেই আলাপ করা হয়, তাই ঐ তিনটিকে প্রধান স্বর বলা হয়েছে। যে কোন ধ্বনি খুব খাদে উচ্চারণ করলে, গলা চিরে যেন আর একটি স্বর বাহির হয়, সেইটিই ঋ, তাই ঋ, মূলস্বরের একটি। (ঋ='র' কোমল, যেমন ণ='ন' কোমল)। এটা ধ্বনি বিকাশের দিক দিয়ে বোঝবার চেষ্টা। গীতবিস্তার দিক দিয়ে ষড়জাদিকে 'স্বর' বলা হয়। গ্রাম স্থলবাচক। তিনটি গ্রামের তিন স্থান—ভূ, ভুবঃ, স্বঃ। তন্ত্রশাস্ত্র দেখিয়েছেন যে ঐ তিন লোকই আমাদের মধ্যে আছে—কুণ্ডলিনী উত্থানে বিভিন্ন চক্রে; 'ব্যোমচক্রে' অর্থাৎ 'বিশুদ্ধে' বা 'ভারতী স্থানে' সব স্বরই আছে। দিগ্‌ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত সমুদ্রযাত্রীর আশ্রয়স্থলই দ্বীপ, ঐ রকম ৭টি স্থান আশ্রয় করেই ৭টি স্বরের উদ্ভব হয়েছে।

কারিকোপেত মাণ্ডুক্যোপনিষদে, "জাগরিত স্থানো বহিঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি মুখঃ স্থূলভূগ বৈশ্বানরঃ প্রথম পাদঃ।" ইহা ওঁকারের

প্রথম পদ। ঐ সপ্ত অঙ্গই সপ্তদ্বীপ, ২১টি মুখই ২১টি মূর্চ্ছনা। প্রশ্নোপনিষদ বলেন যে সাধনকালে 'ওঁ'কারের ৩টি মাত্রা প্রযোগ করতে হয়, ঐ তিন মাত্রার প্রযোগে যে অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় তাহাই ওঁকারের ৪র্থ মাত্রা—"তুরীয়"। এই ৪র্থ মাত্রা—অবস্থা মাত্র, প্রযোগ হয় না। 'অ'কার জাগ্রত স্থান—ঋগ্বেদ; 'উ'কার অন্তরীক্ষ স্থান—স্বপ্নস্থান, যর্জুর্ব্বেদ, 'ম'কার "স্বর্গ"—সুষুপ্তি স্থান, সামবেদ। সাধক, ওঁকাররূপী পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্মের উপাসনা ক'রে তুরীয় স্থান লাভ করেন।

তুরকম গাইয়ে আছেন। একজন ধ্বনির ভঙ্গী, তাল, মান, লয় ঠিক্ রেখে চলে যান ও সেইভাবে তন্ময় হন। শব্দশক্তি তাঁদের মধ্যে এমন তীক্ষ্ণ যে সামান্য স্বরভঙ্গীর এদিক্ ওদিক্ কাণে বাজে, স্বর তাল আদির দিক্ দিযে গানের রূপ রসাদির শক্তি অনুভব করেন। গাইয়ের, মাত্র এরকম বাহ্যভাবে সমস্ত স্পষ্ট হয় না, শ্রোতার অন্তর বিকশিত হয় না। সাধক গাইয়ের গানে, কিন্তু, ভাব থাকে, গীত অর্থযুক্ত হয়। তিনি গানের স্বর, তাল অর্থাদির সঙ্গে একাত্মবোধ করেন, গানের ভাবে বিভোর হযে যান। উদ্বেল ভাবমুখে তাল মানের ঠিক্ না থাকলে তাঁর একাত্মবোধে আঘাত পায়, তিনি যথার্থ ই যাতনা অনুভব করেন। তিনি 'অনাহত' শব্দস্থানে না পৌঁছে তৃপ্ত হন না, চান তিনি বিষ্ণুর পরম পদ স্পর্শ করতে।

["অনাহত শব্দস্য যো ধ্বনিঃ। ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ। তন্মনঃ বিলয় যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরম্ পদম্।"]

'বাধশূন্য যে শব্দ (অনাহত), সেই শব্দোত্থ (আহত) ধ্বনি, সেই ধ্বনির অন্তর্গত যে জ্যোতি, ঐ জ্যোতির অন্তর্গত যে মন, সেই মন যেখানে বিলয হয তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ।' শ্রোতাও যদি সাধক হন, তিনি গানের দু-এক কলি শুনেই বিভোর হয়ে পড়েন—সমস্তটা শোনবার অবসর থাকে না। সাধক গাইয়ে তন্মাত্রাগুলিকেও সচেতন করে দেন। গান, শব্দ ব্রহ্মের অন্তর্গত, সুতরাং তার ক্ষমতাও অদ্ভুত। একটা ফুলের কুঁড়িও ফুটে ওঠে আলাপে, ইহা বাহ্য ভাব—ঐশ্বর্য্য বিকাশ—'ঈশান্', ভৌমবদন। সাধকের গানে রসস্ফুর্ত্তি হলে মন ব্যাপ্ত হয়ে যায় রসে—'তৎপুরুষ' (তৎ=ব্যাপক)—অপময বদন। আনন্দের স্ফুরণ, তেজোময়—'অঘোর', (ঘোরহীন), আনন্দময় তৈজসবদন, বিপরীত ভাবের

খেলা, রক্ষা ও নাশ ভাব—বামদেব ; তার পরই লয় বা ব্যোম—'সদ্যোজাত', আকাশবদন—অবরোহের মুখে সৃষ্টিমুখী প্রথম প্রকাশ। পঞ্চবদন শিবের স্থান বিশুদ্ধে। এই চক্রে, সাধক প্রত্যক্ষ করেন—রক্তবর্ণ ষোড়শ স্বরবর্ণ ও সপ্তস্বর। সপ্তস্বর বা 'সপ্তদল' ও স্বরের মূল স্থানই বিশুদ্ধে বা কণ্ঠে—আকাশাভিমানী দেবতার স্থান। এই স্থানে যেমন বিষ আছে, তেমনি, অমৃত আছে, আর আছে সকলের মূলমন্ত্র। স্বরকেন্দ্রের স্বর স্বর আদি. পৃথক ভাবে এই স্থানে বিদ্যমান। এই চক্রে 'আকাশ' বীজ, স্পর্শশক্তি আদি, বায়ুর সৃষ্টি এই চক্রে, নিস্তরঙ্গ অবস্থায় বায়ুর স্থিতি অনাহতে। ধ্বনি ও বর্ণের মূল এই আকাশ, ঐ বায়ুতে আহত হয়ে হয় স্বরাদির উদ্ভব।

ধোলো Anatomy বা শারীরতত্ত্ব বলে যে আমাদের গলনালীর ঊর্দ্ধাংশে 'ল্যরিংক্ষ' আছে ও তার মাঝখানে একটি ত্রিকোণাকার অল্প উঁচু উপাস্থি আছে, নাম 'পেমাম্ হুডেমাই'। ঐ উপাস্থির গহ্বর হ'তেই ধ্বনির উৎপত্তি হয়, আর, 'পেমাম্ হুডেমাই', 'ভোকাল কর্ড' নামক সরু দুটো পেশিকে কাঁপায়। Anatomy আর একটি কথা বলেন। বুকের মধ্যে দুটি ফুস্‌ফুস আছে, তলায় আছে 'ডায়ফ্রোম' চারপাশে পঞ্জরাস্থি, সবগুলিতে লগ্ন হয়ে আছে মাংস পেশী। বক্ষোগহ্বর প্রসারণ ও সঙ্কোচে ঐ সমস্তই প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হয়, তার ফলেই শ্বাস প্রশ্বাসের বা বায়ুর ক্রিয়া হয়। এই বায়ু রয়েছে বাহ্যাকাশে। অনাহত, নিস্তরঙ্গ অবস্থার স্থান—ভাবরূপে ধ্বনি বা শব্দ রয়েছে। তন্ত্র—'ঈশ্বর', শুদ্ধবিদ্যা' ও 'সদাশিব'—এই তত্ত্বত্রয়কে বায়ুতত্ত্বাত্মক বলেছেন, (শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব আকাশ-তত্ত্বাত্মক)। বায়ুতত্ত্বাত্মকের বায়ু, আর ধোলো বিজ্ঞানের বায়ু এক নয়। ধোলো বিজ্ঞান বলছেন, মস্তিষ্কের নীচে অবস্থিত 'মেডেলা অবলংগেটা'র হুকুমেই, ঐ সব বুকের তোড় জোড়, এক সঙ্গে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হয়। যতক্ষণ হুকুম না আসে, বায়ুর তাড়না হয় না। যখনই আহত হয়, তখন বায়ুটা উপরে উঠে বাইরে প্রকাশ পায়, আর, প্রকাশ হয় অবকাশে বা আকাশে। মণিপুরের উপরেই 'হৃৎপদ্ম',, তার উপরের অংশটির নাম 'অনাহত', অথচ হৃৎপদ্ম' হ'তে পৃথক অবস্থিত। বায়ুর আঘাত যে হৃৎপদ্মেই হয় না তার প্রমাণ কি? ধোলো বিজ্ঞান অত সূক্ষ্মে যান না। বায়ুর কায় বহুদূর প্রসারী। ঐ বিজ্ঞান মতে, মস্তিষ্কই হুকুম দেয়। মস্তিষ্কে

বা Brainএ প্রাণ আসে কোথা হ'তে ? মানুষ মৃত হলে, Brain কি করে ? Brain টাই কি সব ? বিজ্ঞান বলেন, না তা নয়। Brainএর কাজ তিনটি —জানা বা অহংগোচর হওয়া, রূপ রসাদির জ্ঞান হওয়া, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করা। আমাদের যতরকম জ্ঞান বা রূপ রসাদির ও তজ্জনিত সমস্ত দ্বন্দ্বের বোধটা হয় ব্রেনেই। মেরুমজ্জার পেছন দিকে যে স্নায়ুগুলি রজ্জুর মত আছে, সেইগুলির দ্বারাই এই বোধ-জ্ঞান ব্রেনে বাহিত হয়। এই ব্রেন ও মেরুমজ্জা বা spinal chord ছাড়া আর একটি স্নায়ুমণ্ডল আছে, তার নাম Sympathetic Nervous System বা অনুকম্পায়ী স্নায়ুমণ্ডল। ব্রেন বা মেরুমজ্জার কোন কর্তৃত্বই ঐ মণ্ডলের উপর নেই। শিরা, ধমনীর মধ্যে কতটা রক্ত সঞ্চালন হওয়া উচিৎ, কোথায় কম রক্ত দরকার ইত্যাদি, এই মণ্ডলই ঠিক্ ক'রে দেয়, হৃৎপিণ্ডের কার্য্য দ্রুত চলে এই মণ্ডলের হুকুমে, হজম করা, অনাবশ্যক জিনিষকে বার করা এই মণ্ডলের কায; ঘাম হওয়া, রোমাঞ্চাদি হওয়া, ইহারই অধীন।

ভারত বলেন, আনন্দই সৃষ্টির মূলে, আনন্দই ঠেলা দিচ্ছে। এই আনন্দের স্ফূর্ত্তি বোধ হয় সহস্রারে, সেই ঠেলাই নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যই শরীরে সর্ব্বত্র রয়েছেন—ব্রেন বা যা কিছু সব, সেই আনন্দের জন্যই আত্মবিকাশপর, যে আধারে যতটা বিকাশ সম্ভব ততটাই হচ্ছে, অন্য আধার তৈরী হচ্ছে, কর্ম্মের জাল বুনে যাচ্ছে। আনন্দই 'অহং' রূপে মস্তিষ্কে হুকুম দিচ্ছেন। এই চেতনার প্রকাশ + আনন্দ = জগৎ (অহং + ইদং)। এই অহং ইদং রূপ মোহই মেরুদণ্ডাস্থির দুই পার্শ্বে স্থিত, স্নায়ুমণ্ডলের অনুধ্বনিতা বা অনুরণন বহন করে। বায়ুর স্থিতি সর্ব্বত্র। "ভিদ্যমানাৎ পরদ্বিন্দোরব্যক্তা ..." 'ভিদ্যমান পরম ব্যোমের ররোত্থ কুণ্ডলিরূপা শক্তি জীব দেহে গন্ধ পদ্মরূপে আবির্ভূতা হন', তিনি, "স্বাত্মেচ্ছাঘাতেন প্রাণবায়ু—', 'ইচ্ছা দ্বারা তাড়িত প্রাণ বায়ুস্বরূপা মূলাধারে উৎপন্ন হ'য়ে ক্রমশঃ উর্দ্ধে যান।' ইহা আরোহ প্রণালী। মূলাধার হ'তেই কুণ্ডলিনী ওঠেন, তাই 'উৎপন্ন' বলা হয়েছে এখানে, তাঁর উৎপত্তি স্থান সহস্রার। শ্বাস প্রশ্বাস দেহ যন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখে, কিন্তু প্রাণ বায়ু না থাকলে বাইরের কোন বায়ুই কিছুই করতে পারে না। যা সমষ্টিতে তা ব্যষ্টিতে। সৃষ্টি তত্ত্বে বলা হয়েছে যে পবন পরমাণুর সংযোগে মহাবায়ুর সৃষ্টি হয় ও কোন

বাধ্ না থাকায় তা আকাশে স্পন্দিত হ'তে থাকে। স্পন্দন আছে, তবঙ্গ নেই—কাঁপে আবাব কাঁপে না—ইহাই অনাহত। স্পন্দনই অনাহতেব ধ্বনি—অব্যক্তাত্মাব 'বব'। জ্যোতিই তাব পিযূষ—সহস্রাব হ'তে মূলাধাব পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। মনেব ব্যাপ্তিই হৃদ্যাকাশ। গানে ঐ অহং রূপ আনন্দই বাগরূপে ব্যক্ত, চেতনানন্দেব প্রকাশই বাগিনী—ছযবাগ, ৩৬ বাগিনী। যে সাধক 'যো-শো' ক'বে একবাব স্থব-কেন্দ্র স্পর্শ কবতে পাবেন, তাঁর জীবন সার্থক হয়ে যায়, সে সাধক কণ্ঠে বা ভাষায স্থব প্রকাশ কবতে পারুন বা নাই পারুন, সঙ্গীতবিদ্যাব পবিভাষা জানুন বা নাই জানুন, সৎলোকেব স্পর্শ তিনি বুঝতে পাবেন, দূব হ'তে, হয়ত গন্ধ অনুভব ক'বে, সেই লোকেব মনোবৃত্তি জানতে পাবেন, স্পর্শ মাত্রেই যে কোন লোকেব মনেব ভাব বুঝতে পাবেন, চক্ষেব দৃষ্টিব মধ্য দিযে তাব প্রকৃতি বুঝতে পাবেন। সকল জিনিষেবই গন্ধ আছে, জলেব গন্ধ উটেব নাকে লাগে, দূব হ'তে বুঝতে পাবে কোথায় জল আছে। মানুষে ঐ বোধেব মত অনেক বোধই সুপ্ত মাত্র। তন্মাত্রাব সাক্ষাৎকাবে, সাধকেব সে সব বোধ জাগ্রত হয়। শ্রীশঙ্কবাচার্য্যেব দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রে, "চিত্রং বটতরুমূলে · ", 'বটগাছেব তলায়, বয়োবৃদ্ধ শিষ্যদেব, যুবা গুরু ব'সে আছেন, গুরু মৌন ভাবে থেকেই শিষ্যদেব সংশয় দূব কবছেন।' ইহা তন্মাত্রা বোধেব ক্রিয়াফল, 'পশ্যন্তিবাকেব' উদাহবণ; এবকম তীক্ষ্ণানুভূতিব পবিচয পাওয়া যায কেবল স্থব-কেন্দ্র-স্পর্শীব কাছে।

ব্রহ্মচাবীব হয় প্রথম প্রাকৃত সম্বন্ধ বাহিত্য, প্রাকৃত ভাব পর্য্যন্ত বর্জ্জন হয় ঊর্দ্ধবেতাদেব। অখণ্ডব্রহ্মচর্য্য ব্রতধাবীবাই সঙ্গীতবিদ্যাব বিশেষ অধিকাবী মহাজন সন্দেহ নেই। শ্রদ্ধাবানই বস্তু লাভ কবেন—শ্রদ্ধাই মূল। শ্রদ্ধাহীন পাটুওযাব বা অতি কৃপণ সংযতেন্দ্রিয় হ'তে পাবে, প্রাকৃত সম্বন্ধ বর্জ্জন কবতে পাবে, কিন্তু সেটি ব্রহ্মচর্য্য নয। "সেই বিভূই অদ্বিতীয় গুরু, তিনিই অদ্বিতীয় শিষ্য, তিনিই সকলেব দ্বেষ্টা, তিনিই সর্ব্বময়, নিজে তিনিই নিজেব গুরু, শিষ্যভাবে তিনিই গুরুব শবণাগত হন, তিনিই ব্রহ্মরূপ ঋত্বিক সহায়ে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ যজ্ঞ কাষ্ঠ প্রক্ষেপ কবেন, তিনিই ব্রহ্মরূপ জল প্রোক্ষণ কবেন।" (অনুগীতা) এই যে ব্রহ্মরূপ ভাবনা, ইহাবই নাম 'সূক্ষ্ম ব্রহ্মচর্য্য।' গানে ও গানেব প্রত্যেক অঙ্গেব সঙ্গে সাধকেব

একাত্মবোধ জাগ্রত হয়, তন্ময়তা আসে। ব্রহ্মচর্য্য, কুণ্ডলিনীবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা ও সঙ্গীত বিদ্যা একই সূতাব মালা।

নাদ হ'তেই সঙ্গীত বিদ্যা। স্থূল প্রকাশ, নাদেব দু বকম, (১) ঘাত প্রতিঘাত জনিত বা ধন্যাত্মক, যন্ত্র সঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীত বর্ণাত্মক। পূর্ব্বে সঙ্গীত শাস্ত্রেব ৬।৭ অধ্যায় ছিল—স্ববাধ্যায, বাগাধ্যায়, নৃত্যাধ্যায়, ভাবাধ্যায়, কোকাধ্যায়, হস্তাধ্যায। ঐগুলি এখন লুপ্ত। নৃত্য ভিন্ন সঙ্গীত হত না। নাচ দুবকমেব—তাণ্ডব ও লাস্য। তাণ্ডব নৃত্য পুরুষেব, দুবকম—পেবলী, বাহুরূপ, 'লাস্য'—মেয়েদেব, দুবকম = 'ছুবিত' ও 'যৌবত'। ছুবিত নাচে দুজন চাই, দেখান হত চ'খে চ'খে (চক্ষুতে চক্ষুতে—দৃষ্টিব দ্বাবা) চুম্বন; 'যৌবত' একলাব নাচ—মনোমুগ্ধকব। অনেক বকম নাচ ছিল, 'বিষম নাচ'—দডিব নাচ বা শস্ত্র নিযে নাচ, 'বিকট নাচ'—নাচতে নাচতে বেশ ভূষাব পবিবর্ত্তন। সেই বকম 'লঘু' নাচও ছিল। হবপার্ব্বতীব 'তাণ্ড' ও 'লাস্য'—এ দুয়েব আদ্যক্ষবে হয়েছে 'তাল', যেমন একতালা প্রভৃতি [(পৃথিবীব ইতিহাস দ্রঃ)]।

সঙ্গীত বিদ্যা—৩

তন্ত্রে, গুরুব অধিবাসস্থলেব নাম 'মণিদ্বীপ'। দেবীব দুই পাদবিক্ষেপেব কথা পূর্ব্বে বলেছি। দ্বিতীয় পদই গুরুশক্তি। গুরুশক্তি দৃষ্ট হন প্রতিষেধ শক্তিরূপে। বাধা দেবাব যথার্থ প্রযোগই গুরুশক্তি। গুরুশক্তি সংসাব হলাহল তবঙ্গেব মধ্যে একমাত্র দ্বীপ। 'চিৎ'ই মণিস্বরূপ। ঐ চিণ্মণি ৩টি প্রধান আববণে আবৃত। ত্রিপুবাবহস্যতন্ত্র বলেন, ১ম আববণ, 'অপবাধ বাসনা', ২য 'কর্ম্মবাসনা', ৩য় 'কামবাসনা'। বৈষ্ণবেবা, বিশেষ গৌডীয় বৈষ্ণবেবা, 'অপবাধ' বলতে যা বোঝেন, তন্ত্রশাস্ত্র 'অপবাধ' বলতে বোঝেন অন্যবকম। তন্ত্রশাস্ত্র স্পষ্টই বলেন যে, শ্রদ্ধাহীনতা বা 'অশ্রদ্ধা'ই প্রধান 'অপবাধ', আব যা কিছু সবই তাব ফ্যাকড়া। শ্রদ্ধা জাগবিত হলে 'অপবাধ বাসনা' নির্ম্মূল হয়। কর্ম্মবাসনা আসে কর্ম্মসংস্কাব হ'তে। কর্ম্মসংস্কাব আমাদেব যেন বলপূর্ব্বকই, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্ম্ম কবায়, অথচ কর্ম্ম কবি আমি, সংস্কাবও খাডা কবি আমি—আমাবই জালে আমিই বদ্ধ

হই। কর্ম্মফলের জন্য দায়ী আমিই। সংস্কার প্রতিরোধ করবার সামর্থ্য আছে গুরুশক্তির—গুরুশক্তিই ত্রাতা। এই গুরুশক্তি হ'তেই আমরা পড়েছি দূরে। সেজন্য চাই সাধনা। এই সাধনার মধ্যে সঙ্গীত বিদ্যা একটি প্রধান সাধনা। ইহা সর্ব্বযুগের ব্রহ্মযজ্ঞ, স্বাধ্যায়। শ্রদ্ধা ভিন্ন সাধনা বৃথা। ব্যাধি ইত্যাদি সবই যে পূর্ব্বজন্মের ফল তা নয়। কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে এই ভুল ধারণা দূর হওয়া দরকার। অনেক কর্ম্মের ফল, চেষ্টায় নিবারণ হয়। ঐ প্রতিষেধমূলক বৃত্তির উদ্ভব গুরুশক্তি হ'তে, সেটি দেহের মধ্যেও বর্ত্তমান। ইহা জেনে সশ্রদ্ধ হৃদয়ে গুরুশক্তির আশ্রয় নিতে হয়। কর্ম্মের মধ্যে আছে বহু অজ্ঞাত বা অদৃষ্ট কর্ম্ম। অনাদি সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার জয় করা প্রায় অসম্ভব। তাই শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায়—দৈব ও পুরুষকার—দুই দরকার বলা হয়েছে। উপাসনা বা সাধনা হচ্ছে 'দৈব'। অতএব সশ্রদ্ধ উপাসনায় 'কর্ম্মবাসনা' ক্ষয় হয়। কাঁচা আমি মণ্ডিত পুরুষকারে সেবার ভাব আনতে হয়, সেবা—গুরুশক্তির সেবা।

গানের মত সহজ সরস উপাসনা আর কি আছে? এ সাধনার আরম্ভে 'রস', মধ্যে 'রস' শেষেও 'রস'। গৌড়ীয় বৈষ্ণব, কীর্ত্তনে, এই রসের দিক্ ফুটিয়ে তুলেছেন—সঙ্গীতজগতে বাঙ্গালীর বিশিষ্ট দান। ৩য় বাসনা, 'কামবাসনা'। সশ্রদ্ধ উপাসনায় সদসৎ বিচার আসে, দোষগুণ বোঝা যায়, স্বরূপাভাস পাওয়া মাত্রই 'কামবাসনার' অন্ত হয়, চিণ্ময়ির সাক্ষাৎকার হয়, নিশ্চিন্ত চিত্তে সাধক মণিদ্বীপে আশ্রয় পান। তন্ত্র দেখতে চান তিনটি জিনিষ—আত্মবিচার, জপ, ধ্যান। সাধকের প্রতি তন্ত্রের উপদেশ 'আত্মবিচার ক'রে জপে বসবে, জপ একঘেয়ে বোধ হলে অর্থাৎ শ্রান্ত হ'লে ধ্যানে বসবে, জপধ্যানে শ্রান্ত হলে আবার আত্মবিচার ক'রবে-; এই রকম মন নিয়ে জগতে যথা ইচ্ছা বিচরণ করবে'। সঙ্গীত শাস্ত্রও বলেন যে আগে বুঝতে হয়, তারপর 'কসরৎ' করতে হয় (যেমন গলা সাধা), তারপর ভাবতে হয়, এসবে ক্লান্ত হলে বিষয়টি নিজের মধ্যে আলোচনা করতে হয় ইত্যাদি।

সপ্তদ্বীপই ৭টি স্বরের আশ্রয়স্থল। ধ্বনি বাহির হয় বাগযন্ত্রের (vocal cord) হ'তে, তারও ঐ রকম বিভাগ আছে। ব্যাকরণেও উচ্চারণস্থান ৭টি—কণ্ঠ জিহ্বামূলাদি; ঐগুলি উচ্চারণস্থান—উৎপত্তিস্থান নয়। বায়ুপ্রবাহে

আহত হয়েই ধ্বনির প্রকাশ ওরূপ হয়। উৎপত্তি স্থান, অস্থি বা কোন কিছু হয় না; উৎপত্তি স্থান সর্ব্ববস্তুর—শক্তি। ঘন বা স্থূল শক্তিকে অবলম্বন করেই প্রকাশ পায় সূক্ষ্ম শক্তি।

[ব্যাকরণ, শব্দশাস্ত্রের আর এক দিক্। বৈদিক যজ্ঞে 'মহাদেব' ও 'বৃষের' কথা আছে। স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে 'বাক্যের' চারি শৃঙ্গ, তিন চরণ, দুই মস্তক ও সপ্ত হস্ত। 'বৃষস্বরূপ' ত্রিভাগে বদ্ধ, 'মহান্ দেব' রব করছেন ও মানবের মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছেন। বৃষের চারি শৃঙ্গ = নাম + আখ্যাত + উপসর্গ + নিপাত = পদসমষ্টি বা শব্দরূপ, চরণত্রয় = অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, মস্তকদ্বয় = নিত্য ও ব্যঙ্গ—অর্থাৎ প্রকাশ্য এবং কার্য্য বা ব্যঞ্জক বা প্রকাশক = কার্য্যশব্দ। বুক, মাথা ও কণ্ঠস্থান অবলম্বন ক'রেই শব্দের প্রকাশ হয়, অতএব, ঐ ত্রিস্থানই—বন্ধন স্থান। সপ্ত হস্ত—৭ প্রকার বিভক্তিই ৭টি হাত। এই যে শব্দ অর্থাৎ মহান্ দেব (ব্রহ্ম) মর্ত্তে "আয়িষ্ঠা" হ'য়ে রয়েছেন। মহান্ দেবের সঙ্গে যাতে আমাদের সাম্য উপলব্ধি হয় তার জন্যই ব্যাকরণ-শাস্ত্র। 'তিতউ' (কুল'চালনী) দ্বারা শক্তুকে তুষ বিহীন করার মত ধীর ব্যক্তিরা মনের দ্বারা, বাক্যকে পবিত্র ক'রে গ্রহণ করেন। (মহাভাষ্য দ্র,)। এই পবিত্রতা-বোধকে উদ্দীপিত করা, গাঢ় করা, একাত্মবোধ আনিয়ে দেওয়া সঙ্গীত বিদ্যার কায]।

চৈতন্যকে 'পুরুষ' বলা হয়। ব্যাকরণে পুরুষ মানে, 'ক্রিয়া সম্পাদনের প্রয়োজনীয় পদ সমূহের আশ্রয়' (অর্থাৎ কারকের আশ্রয়)। এই খানে খোলো সংস্কারের সঙ্গে পার্থক্য। ইংরাজিতে পুরুষ = Person, খোলোর 1*st.* person, আমাদের প্রথম পুরুষ নয়; আমাদের প্রথম পুরুষ খোলো 3*rd.* person; আমি, উত্তম পুরুষ—অহং প্রকাশক।

সহস্রারের সঙ্গে গুরুশক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আর্য্য সঙ্গীতের উদ্দেশ্য কুণ্ডলিনীর জাগরণ। তন্ত্র বলেন, গুরুশক্তির কৃপাদৃষ্টির আকর্ষণে কুণ্ডলিনী সহস্রারাভিমুখে ধাবিতা হন।

সর্ব্বভূতচৈতন্যের আর এক নাম 'শব্দব্রহ্ম'। সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে চৈতন্যরূপে ইহার অবিষ্ঠান। প্রাণী অর্থাৎ প্রাণযুক্ত দেহে, ঐ সর্ব্বভূত চৈতন্যের বিকাশ হয়েছে, মানব দেহে 'হুঁষ' এসেছে—বিশেষ প্রকাশ। কুণ্ডলিনীই শব্দব্রহ্মরূপিনী। কুণ্ডলিনীর গতিতে 'শব্দ' স্ফুটিত হয়—অপ্রকট অবস্থা। 'নাদ'—শব্দের অতি সূক্ষ্ম প্রকাশ। ঐ সূক্ষ্মের নানাভাবে স্থূল পরিণতিতে ধ্বনির উৎপত্তি। ধ্বনিকে ভাবের ভঙ্গী দিয়ে অন্তর্নিহিত ভাবকে প্রকাশ করার

নাম 'স্বব'। প্রত্যেক ধ্বনিব এক একটি বর্ণ; প্রত্যেক বর্ণকে স্ববে প্রকাশ কবা যায়।

সমগ্র বিশ্ব, তাব সকল ভাব, সমস্ত ক্রিযা, একটি মহাগীতিব ধাবা। গান চাবি বকমে গীত হয়—'বাদী' 'সম্বাদী', 'অনুবাদী', 'বিবাদী', গানেব শুদ্ধি হয—গান বিশুদ্ধ বাখা হয় পঞ্চভাবে—'রাগী', 'বাগী', 'পাবখী' 'নাবী' 'ন্যাও', অতএব হচ্ছে ৪×৫=২০, [তুল :—ভাব উত্তোলনে শক্তি ব্যয়ের হিসাব (বিজ্ঞান বহস্য দ্রঃ।)] ৫০ বর্ণেব—সুধাময়ী অক্ষবেব—গীত উঠছে, সমস্ত গ্রাম—ষড়জ, মধ্যম, গান্ধাব—ভেদ ক'বে ৫০×২০ বা সহস্রাবে। এই সুবকেন্দ্রই সহস্রাব। অসংখ্য অসংখ্য স্বব উঠছে বলা যায়, কিন্তু সহস্রাবেব 'সহস্র' শব্দটি নিবর্থক নয। সহস্রাবে—সুবকেন্দ্রে পৌঁছুলে, সাধক গুরুপাদাম্ভোজে মিলিত হন, সাধকেব সাধনা পূর্ণ হয়।

গান্ধাব, গন্ধর্ব্বলোকেব। 'তান' মানে, যা স্ববপ্রবাহ ঠিক্ বাখে—বংশীবাদনেব প্রধান স্বব ও সুবেব প্রবর্ত্তক। বাঁশীব সুবেই, সুব, স্বব, ঠিক্ নিরূপিত হত। ভবত বলেন, "গাতা যং যং স্ববং গচ্ছেৎ তং তং বংশেন তানযেৎ।" তানেব আব একটি নাম 'অংশ'। ("স্ববান্তব প্রবর্ত্তকঃ বাগ-স্থিতি-প্রবৃত্তাদি হেতু···প্রধানভূত স্বব বিশেষঃ")। ভাবতীয় গানে, প্রথমে সব এক সুবে বেঁধে নিতে হয়—লয়-লক্ষ্য বলেই। জীবাত্মা ও পবমাত্মা স্বরূপতঃ এক, তাই জীবাত্মা পবমাত্মায় বিলীন হয়—সমজাতি হ'লেই মিশ থায়, তেলে জলে মিশ থায় না। ধোলোব গানে বিভিন্ন স্বব সমকালে প্রকাশিত হলেই হয়, 'কর্ড' বা 'হাবমণি', 'শুদ্ধস্বব' মানে তা নয়। ষড়জ হ'তে ৬টি সুব উৎপন্ন হয়, বীণা বা তানপুবাব তাবে স্ববেব সুস্পষ্ট বিকাশ হয। ষড়জেব অণুবণনাত্মক ধ্বনিকে 'স্বয়ম্ভূ' বা প্রতিধ্বনি বলে। এই স্বয়ম্ভুই শুদ্ধ স্বব বিকাশেব কাবণ। শুদ্ধ স্ববেব বিকৃতিই ধোলোব 'কর্ড'। হাবমোনিয়মে শুদ্ধ স্বব নেই। বৈদিক যুগেব শততাব যন্ত্রে অন্ততঃ ১০০টি শুদ্ধস্বব উঠত। ধোলোব উচ্চাবণে, স্বব বা ব্যঞ্জনেব কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নেই—কণ্ঠতালু প্রভৃতিব অক্ষব গুলিব উচ্চাবণ যা তা কবা হয়, বাক্য সৃষ্টিও তাই—যেন একটা এলোমেলো কাণ্ড, সুতবাং গানে ও ঐ বকম বোধ হয়। সংস্কৃত বা সংস্কৃত মূলক ভাষায় প্রতি অক্ষবেব উচ্চাবণ নির্দ্দিষ্ট—যা তা ক'বে অক্ষব বদলান আর্য্যবীতি নয়। বর্ত্তমানে,

ভাষায় একই ধ্বনি ও একই অর্থবোধক শব্দ লিখি দুরকম, ইহা চল্ হয়েছে কোন কোন স্থানে, কিন্তু ইহা আর্য্যরীতি নয়। সঙ্গীতে এ রকম করা বিপজ্জনক।

রাগ—শ্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘনট, আবার ঐ কটি ছাড়া—মালব, হিন্দোল, কর্ণাট—এই তিনও 'রাগ' নামে পরিচিত। তবে পূর্ব্বোক্ত কটিকেই বিশুদ্ধ রাগ বলা হয়। ওঁকার হ'তে সমস্ত স্বর উদ্ভুত, কারণ, সমস্ত উচ্চারণক্রমের মূল তাতে নিহিত, কুণ্ডলিনীর সজাগ ভাব আরম্ভ নাভিস্থান হ'তে। গাইয়েরা যে বলেন, নাভি হ'তে আওয়াজ তুলতে হয়, এটি নিরর্থক নয়। 'ভাব'ই গানের প্রাণ; 'বিজ্ঞান'—শৃঙ্খলাদ্যোতক্ (ঋত)।

গানে, বাঙ্গালার নিজস্ব জিনিষ আছে, বিশেষ কীর্ত্তনে। পূর্ব্বে, কীর্ত্তন আরম্ভের আগে 'আলাপের' রীতি ছিল। সেটি এখন লুপ্ত হ'তে বসেছে। চৈতন্যদেবের পূর্ব্বেও কীর্ত্তনগান ছিল। কীর্ত্তনগানে স্বর ও কথা, দুইই চাই। ভাবকে মধুর ও প্রাণস্পর্শী করবার জন্য, অর্থকে মূর্ত্ত-ভাবরূপে প্রকাশ করবার জন্যই কথার সংযোগ করতে হয়। বঙ্গদেশ ছাড়া, সব যায়গায় কথাটা অপ্রধান। কীর্ত্তন, সাধনারও একটি বিশেষ অঙ্গ, বিশেষ বৈষ্ণবের। স্বর ও শব্দযোগে ভাব ফুটে ওঠে, প্রাণটা—সমস্ত হৃদয়টা, পরদায় পরদায় যে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তার বিশেষত্ব বাঙ্গালী জানেন। সাধকের অজ্ঞাতসারে, ঐ পরদায় পরদায় ঝঙ্কৃত স্বর, কুণ্ডলিনীকে উদ্‌বুদ্ধ করে, তন্ত্রের সাধক কুণ্ডলিনীর উত্থান স্পষ্ট বুঝতে পারেন, এই মাত্র প্রভেদ। কীর্ত্তনের এই বিশেষত্ব অননুকরণীয় হয়ে আছে, তাই ইহা বোঝাও কঠিন ও তাই বাঙ্গালার বাহিরে কীর্ত্তনের তেমন প্রচার নেই। বিশেষ স্থলে, ভাবের ক্ষেত্রে, স্বরের সঙ্গে যে বর্ণাত্মক ভাষার দরকার তা দেখিয়েছেন বাঙ্গালী। কীর্ত্তনের মধ্যে যে কমনীয়তা কোমলতা ও মাধুর্য্য—এই তিনের একত্র সমাবেশ আছে, তা সংসারক্ষেত্রের সকল কর্ম্মে প্রযুক্ত হ'লে মানবতার একটা দিক্ ফুটে ওঠে, তাতে সন্দেহ থাকে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার এই দিকটা সকল সাধককে বিস্ময়ানন্দে আপ্লুত করেছে। কীর্ত্তনের রস-সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে চিত্তের যে স্বচ্ছন্দতা আনায়, তার কাছে সমস্ত বাসনা, সকল কামনা,

নিখিল ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ হয়ে যায়—সাধক আপন ভাবে মাতওয়াবা হ'যে নিজ প্রেমাস্পদেব পদে লুণ্ঠিত হন, সাধকেব উদ্দাম ভাবেব গতিতে সমস্ত বৃত্তি ভেসে যায়—ভাবেব পূর্ণ মুক্তি এনে দেয়। বাঙ্গালী সাধকেব এই সাধনাব অভিনব পন্থায় প্রাণ দেন সেই পাগল গোবাচাঁদ—ভাবকে বাস্তব রূপ দিযে জীবন্ত কবেন তিনি। আজ আমবা টকি গ্রামোফোনে কীর্ত্তন শুনি, তাতে কি জীবন গডে ওঠবাব সহায়তা কববে ?

চবিত্রবল সর্ব্বপ্রকাব সাধনাব মহৎ অঙ্গ। চবিত্রবলই জীবন আনায়। গীতে যদি বস-পিপাসাই বর্দ্ধিত হয়, তাতে কীর্ত্তন বিলাসেব বস্তু হয়ে যেতে পাবে, তাতে দুর্ব্বলতা আনায, ঐ পিপাসাব অপব্যবহাবে ভণ্ডামি আনায়। বাঙ্গালীর কীর্ত্তনগানে—পদকর্ত্তাদেব গানে—যে ভাব ফুটে ওঠে, সেই ভাবকে জাতিগত কবা সহজ নয়। যেখানে সমস্ত বিচাবশক্তি ভাবতবঙ্গে হাবুডুবু খায, যেখানে দৈন্য, কোমলতা, সুন্দবেব বোধ ও বসপিপাসাই সাধনাব প্রাণ, সেখানে সাবধানতাব দবকাব, জীবন দবকাব ; সেটি ব্যক্তিগতই হয়, একই প্রকাব মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি-সমষ্টিতেই সম্ভব হয, জাতিগত হয় না, তাকে জাতিগত কববাব চেষ্টা নিবাপদ নয়, কোমল ভাবকে সর্ব্বাবস্থায প্রাধান্য দেওয়া নিবাপদ নয়। ঐ সাধনাব চলমান বিগ্রহ ছিলেন শ্রীচৈতন্য, তাঁব জীবনপ্রভাবে যে ভাব সঞ্চবিত হয়েছিল, তাতে ছিল কঠোব সাধনাব আদর্শ, ত্যাগবৈবাগ্যরূপ জীবনাদর্শ। সেগুলি ছেডে দিয়ে, মাত্র ভাবেব উদ্দাম গতি, জাতীয চবিত্রেব উপব সুফল বিস্তাব কবতে পাবে না। কীর্ত্তনেব প্রাবম্ভে গৌবচন্দ্রিকা গীত হয়—গোবাব জীবন স্মবণ কবিয়ে দেবাব জন্য, সেটিও এখন উঠে যাচ্ছে অনেক স্থলে। কীর্ত্তন সাধকেব জন্য, বিলাসীব জন্য নয়, পেশাব জন্য নয়। কীর্ত্তনেব উদ্দেশ্য, চিন্ময় ভাবকে জাগ্রত কবা, প্যানপেনে ভাবকে প্রশ্রয় দেওযা নয়।

বাঙ্গালীব জিহ্বাব নমনীয়তা, উচ্চাবণে শব্দ-বৈচিত্র্যেব বিশিষ্টতা—হিন্দি, মাবাঠি বা গুজবাতিব মত 'দীর্ঘস্ববেব দবাজ আওয়াজেব' অভাব সত্ত্বেও, বিবামকালে ধ্বনিব ঝঙ্কাব তোলা—বাঙ্গালা ছন্দেব পর্ব্ব, বাঙ্গালা ছন্দের প্রতিসমতা (Symmetry) অক্ষব-সমষ্টিরূপে বিবেচিত না হয়ে—শব্দ-সমষ্টিরূপে স্বীকাব কবা প্রভৃতিতে বাঙ্গালাব নিজস্ব গানেব অভিনবরূপ

আছে, যে রূপের মাধুরিতে অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকাশ করে। ঘড়ির কাল পরিমাপ হিসাবে, গানের কাল পরিমাপ হয় না. উচ্চারণের তারতম্যে, উচ্চারণের ভঙ্গী অর্থাৎ উচ্চারণে বৈশিষ্ট্যদান প্রয়াসে অক্ষরের মাত্রা বোধ আসে। এই প্রয়াস ও মাত্রাবোধ হ'তেই গানের কাল পরিমাপ হয়।

বাঙ্গালীর উচ্চারণে, স্বরবর্ণের লঘুগুরু বা হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান নেই। সেই জন্য, বাঙ্গালা গানের সময়, অর্দ্ধ উচ্চারণ করতে হয় বহুস্থলে। বাঙ্গালা গানে ছোট 'গমক্‌ই' খাপ খায় ভাল। সংস্কৃতের সব স্বরবর্ণ আমরা গ্রহণ করি না, সকল ব্যঞ্জনবর্ণের ঠিক্ উচ্চারণ আমরা করি না, সংস্কৃত হ'তে গুণবাচক বিশেষ্য বেছে নিয়ে ঐ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার দৈন্য পূরণ করি না—এই সব দোষ হয় বড় বড় গানের সময় বাঙ্গালা ভাষায়। এ দৈন্য কি ভাবে পূরণ করা যায় তা দেখিয়েছেন স্বামীজি তাঁর "খণ্ডন ভববন্ধন" গানে। সকল কবিতা গানে প্রকাশ হ'তে পারে না। ভাবকে সুরে রূপায়িত করতে হলে শব্দযোজনার জ্ঞান অন্য রকম হওয়া দরকার।

[বাঙ্গালা ছন্দের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ১৩৩৮ সালের সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় আলোচনা করেছেন, সেই আলোচনা বা রাখাল দাস বাবু ও সুনীতি বাবুর লেখা দ্রঃ]।

প্রাণী মাত্রেরই কতকগুলি সাধারণ বৃত্তি আছে, যেমন সুখদুঃখ ইত্যাদি। এই সব সাধারণ বোধের কারণ, এক একটি উত্তেজিকা শক্তি। উত্তেজিকা শক্তির ক্রিয়া, জড়ে ও ক্রিয়া করে। মানুষের মধ্যে ঐ শক্তির সুপরিস্ফুট অভিব্যক্তি হয়—হাসি কান্নায়, সুখ দুঃখ ইত্যাদি নানা ভাবে। ষড়জাদি সুর সপ্তক মনের ঐ সব ভাবই প্রকাশ করে। সুরগুলি আছে সমস্তই, সুতরাং স্বরসপ্তক সর্ব্বগত ও ব্যাপক। সুর আছে সমস্ত বস্তুর মধ্যে। আকাশের গুণ শব্দ। শব্দ দু ভাবে আত্মপ্রকাশ করে,—স্বরূপে, মন্ত্ররূপে। স্বর-বিদ্যার নাম সঙ্গীত শাস্ত্র ও মন্ত্র-বিদ্যার নাম তন্ত্রশাস্ত্র। ঐ দুই বিদ্যার আলোচনা বৈদিক যুগে ও বিশেষ রূপ ধারণ করে, তা আমরা দেখেছি। (বৈদিক যুগের 'বাক্'—'বাগ্ বৈ গায়ত্রী')। এই বাক্ই শব্দ শক্তি, সুতরাং ব্যাপক ও সর্ব্বগত—আকাশবৎ। ব্রহ্মা—চতুর্গুণ বিশিষ্ট শব্দ,

অতএব, শব্দ তত্ত্বের দিক্ দিয়ে ব্রহ্মা=সমষ্টি মন এবং সরস্বতীই তাঁর শক্তি।

[অপ=সর। অপ গর্ভেই ব্রহ্মা। অপ বা 'সর' সহ বলেই নাম সরস্বতী। মন্ত্রমাহাত্ম্যে যে নদী শুদ্ধা পবিত্রা হয় তারও নাম সরস্বতী দেওয়া হয়। বাঁশির সুরে যমুনা উজান বয়েছিল ও সেই অবধি পবিত্রা বলে গণ্য, বেদধ্বনিতে—সামগানে সেই রকম সরস্বতী প্রবাহিনী। ইহাই আর্য্যভাব।]

মহাপ্রভুর জীবনে যে রসপুষ্টির পরিপূর্ণ রূপ দেখি তার উৎপত্তিস্থল, মহাশক্তি-কেন্দ্র 'নারী হৃদয়ে'। 'নারী-হৃদয়', স্বতঃই বিকশিত, শক্তিময়ী নারী, সাধিকা হলে, অতি সহজে সুর-কেন্দ্রকে স্পর্শ করতে পারেন—হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বিকাশ, সুরগরিমার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয় নারী হৃদয়ে। বৃন্দাবনের ষোল হাজার গোপী, প্রত্যেকে এক একটি 'রাগ মূর্ত্তি'। ষোল হাজার 'রাগ' সৃষ্টি ক'রে তাঁরা তাঁদের প্রেমাস্পদের কাছে প্রাণ ঢালা আকুলি, আলাপে নিবেদন করতেন, তাঁরা নতুন 'রাগ' সৃষ্টি ক'রে যান—যা এখন লুপ্ত। শুদ্ধ স্বর—যার আত্মক্ষর ধরেই সপ্তস্বর, যার বিভিন্ন সমাবেশ পদ্ধতির জন্য নানা রাগের উৎপত্তি—মূলস্থান তার কোথায়? ছয় রাগ ও ৩৬ রাগিনীর নানা ভাবের মিলনে দেখা দেয় অসংখ্য উপরাগ উপরাগিনী। বৃন্দাবনলীলা একটি মহাসঙ্গীত, যার সুর হচ্ছে অনাদিকাল ঝঙ্কৃত বিশ্বে; সেথায় আছেন দুই—পুং ও প্রকৃতি। বিশ্বমূলে আছেন একটি 'পুরুষ', একটি 'স্ত্রী', আর, সেই 'হংস' হ'তেই উঠছে বিশ্বসুর। নারীতে প্রস্ফুটিত সুর-কেন্দ্রের বিভব, তাই সঙ্গীতে অধিকতর মুগ্ধ হয়ে যান নারী—স্বরূপাভাস পেয়ে। মনে রাখতে বলি যে গায়ত্রী—'ছন্দসাং মাতা'।

[নারীকে 'চপলা' 'তরলা' প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করবার যে চেষ্টা তার অন্য কারণ। নারদ পঞ্চরাত্রে 'কামের' স্থান নির্দ্দেশ করবার যে আখ্যানটি আছে, সেখানেও দেখি যে সতীকুলের অভিসম্পাত ভয়ে ব্রহ্মাকেও ভীত হ'তে হয়েছে।]

চৈতন্যদেবের ৫০০—৬০০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গলায় কীর্ত্তন ছিল। বৌদ্ধ প্লাবনের বিষময় ফলকে রোধ করবার জন্য সহজিয়া সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক সিদ্ধাচার্য্য কীর্ত্তনের আশ্রয় নেন প্রচারের জন্য। তাঁর সম্প্রদায় মধ্যে অনেক বৌদ্ধও ছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রের উপর বাঙ্গালার প্রভাব বরাবর

ছিল। হিন্দি সঙ্গীত শাস্ত্রে 'গৌড় বিলবল', গৌড সাবেঙ্গ', 'গৌড মালহার্', 'গৌডশিব', 'গৌডবংত' প্রভৃতি কথাগুলিব মধ্যে 'গৌড' শব্দেব অর্থ কি? একটি বাগিনীব নাম 'বাঙ্গালী' কেন?

'খেয়ালে' ও বাঙ্গালাব প্রভাব যথেষ্ট। 'খেযাল' ও ভাবতেব নিজস্ব সম্পত্তি। একজন ভাবতীয় মুসলমানই খেযালেব প্রবর্ত্তক। আকববেব সময় তানসেনই ছিলেন আকবব সভাব শ্রেষ্ঠ গায়ক। তানসেন প্রথম ছিলেন হিন্দু, পবে হন মুসলমান। তাঁব সঙ্গীতগুরু ছিলেন চৈতন্যদেবেব পার্ষদ হবিদাস গোস্বামী। বাঙ্গালী বৈষ্ণব প্রভাবে তানসেন ববাবব মুগ্ধ ছিলেন, এমন কি, কথিত আছে, তিনি মহামতি আকববকে সঙ্গে নিয়ে যান ছদ্মবেশে তাঁব নিজগুরুব অদ্ভুত গান শোনাতে। যাই হোক্, তানসেনেব 'ঢং'এ বাঙ্গালাব প্রভাব যথেষ্ট থাকলেও, বাঙ্গালী বৈষ্ণব গোস্বামীদেব উপব যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলে ও, ধর্ম্মান্তব গ্রহণ কবায়, তিনি হিন্দু সাধনাব ভাব বা বিশিষ্টতা গ্রহণ কবেন নি—হিন্দু সঙ্গীত-সাধনাব অধ্যাত্ম বহস্য—মানবতা প্রস্ফুটনেব চেষ্টা, বৈষ্ণব বাঙ্গালীব নিজস্ব আদর্শ, কিছুই গ্রহণ কবেন নি, তিনি সঙ্গীতে বাদশাহকে তুষ্ট কবতে ও তাঁব সভাব গৌবব সদা অক্ষুন্ন বাখতে চেষ্টা পেয়েছিলেন তাঁব 'মজলীসি' গানেব দ্বাবা। আকবব ও ঔবংজেবেব পবে, তানসেনেব এক দৌহিত্র বংশেব সন্তান, নাম 'সদাবঙ্গ', 'খেযাল' সৃষ্টি কবেন। সদাবঙ্গ ছিলেন বিখ্যাত 'ধ্রুপদ' গাযক। ধ্রুপদ গানে, উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব আজও ওস্তাদেবা ফুটিযে তোলবাব চেষ্টা কবেন। ধ্রুপদেব গুরুত্ব, গাম্ভীর্য্য, সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। 'খেয়ালে' সে ভাব মোটেই ছিল না। তাঁব খেয়ালে, অতি সাধাবণ নায়ক নায়িকাব ভাবে বাধাকৃষ্ণ লীলা ফুটে উঠেছে। ভাব গ্রহণে অসামর্থ্যেব লক্ষণ এই বকমই হয। বলা বাহুল্য ধ্রুপদী সদাবঙ্গ, লোক তুষ্টিব জন্য, তাঁব খেয়ালেব উপকবণ পেয়েছিলেন বাঙ্গালাব সঙ্কীর্ত্তন হ'তেই।

সঙ্কীর্ত্তনে আছে ভাবেব গাঢত্ব, ভাবেব মাদকতা, ধ্রুপদে আছে মহা-গাম্ভীর্য্য স্থিব সাগবেব ন্যায, আছে শান্ত গুরুগম্ভীব ভাব, আছে মনকে অন্তর্লীন কববাব ক্ষমতা। স্বামীজি চাইতেন এমন সুব দেখতে, যাতে সঙ্কীর্ত্তনেব ভাব-গাঢত্ব ও ধ্রুপদেব গাম্ভীর্য্য থাকে। এখন জগৎ চায এমন ভাব, যা মহাসমুদ্রেব মত অতলস্পর্শী ও আকাশেব মত অনন্ত প্রসাবী।

নব ভাবেব গান কি ঐ বকম স্থবে তৈবী হ'তে পাবে না? বাঙ্গালায ঢাক ঢোল ও আছে, কৈ ঢাকের বাজনাব সঙ্গেও মেঘমন্দ্রে ধ্বনিত হয় এমন বীব বসেব গানও ত বাঙ্গালায নেই।

[পুত্র বিয়োগে অত্যন্ত কাতব হযে কোন ভদ্রলোক শ্রীবামকৃষ্ণ দর্শনে দক্ষিণেশ্বরে যান। পবমহংসদের শোকাতুব পিতার কথা শুনলেন, পিতাব বুক ভবা বেদনা-কাতব মুখ দেখে অস্থির হলেন। যখন, সেখানে উপস্থিত অনেকে মনে কবছেন যে কামকাঞ্চনত্যাগী—সর্ব্বত্যাগী—'পবমহংসেব' কাছে দুঃখ নিবেদন—বিশেষ, মোহজনিত দুঃখ নিবেদন—বৃথা, তখন সকলেই অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে পরমহংসদেবও ঐ পিতার মতই কাতর হয়েছেন। সমবোধে আসে সমবেদনা। পিতাব বোধেব সঙ্গে সমবোধ হওয়ায়, পিতা যে শুধু মুগ্ধ হলেন তা নয়, গভীর শোক ও সেই সময়ের জন্য শান্তভাব ধারণ ক বল। ক্ষণিক কাতবতাব পব, পরমহংসদেবের ভাব বদলে গেল, তিনি হুংকার তুলে বিভোর হয়ে গান ধরলেন, যাতে পিতাব মনে বল, উৎসাহ ও আশাব সঞ্চাব হয়। সঙ্গীতে শোক দূবীভূত হ'য়ে সে স্থানে উঠল আনন্দেব তরঙ্গ। মনকে কাদাব ডেলাব মত যদৃচ্ছা পবিবর্ত্তন করতে পারেন স্থর-কেন্দ্র স্পর্শী সাধক।]

সঙ্গীতচর্চ্চা ভাবতে ববাবব হয়ে আসছে। অনুশীলনেব ফলে বহু পবিবর্ত্তনও এসেছে। সঙ্গীতেব অদ্ভুত মোহিনী শক্তি। এই শক্তিকে উপেক্ষা কবা যায না, অপপ্রযোগ কবা উচিৎ নয়—ইহা সকলেই স্বীকাব কববেন। সাধকেব জন্য যেমন সঙ্গীতেব উচ্চ আদর্শ থাকা দবকাব, তেমনই সঙ্গীতবিদ্যাকে জনপ্রিয় কবাও দবকাব। চবিত্র গঠনই এই সব জনপ্রিয গানেব লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। বিলাসীব হাতে এই মোহিনী শক্তিব অবমাননাই হয়। ভাবতে এখন গঠনেব যুগ, বলসঞ্চয়েব যুগ, ইহা যেন আমবা না ভুলি।

বেদ ও পুরাণাদি

জগতের মনকে আলোড়ন করেছে বরাবর কোন্ শক্তি? তাতে স্থায়ী ভাব দিয়েছে কোন্ শক্তি? অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মশক্তির প্রেরণায় জগতের মধ্যে, সর্ব্বজনের মধ্যে যে শক্তির সঞ্চার হয়—সর্ব্বক্ষেত্রে প্রাণ এনে দেয়—তা আসে অবতারাদি পুরুষ হ'তে—জগতের মহাপুরুষ হ'তে। আসে কি ঐ রকম প্রচণ্ড প্রেরণা—যার শক্তি, যার ফল যুগ যুগান্তর ধরে চলে—শুধু সৎ ও নীতি পরায়ণ ব্যক্তি হ'তে, এমন কি প্রতিভাবান পুরুষ হ'তে? মানুষেরই আছে অধ্যাত্ম জ্ঞান। মানুষ দেহ হ'তেই মানুষ জন্মায়। স্তরকেন্দ্রের অবরোহ ক্রম বুঝলে বুঝতে পারা যায় যে আদি মানবগুরুই অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেষ্টা, তাঁর মধ্যে হয় প্রথম সঙ্গীত রসের স্ফূর্ত্তি।

বৈদিক যুগে, তৎকালীন ও তৎপূর্ব্বকাল হ'তে প্রচলিত অনেক 'পুরাণ' কথা পাওয়া যায়। ঐগুলিকে বেদের বহিরঙ্গ পুরাণ বলা যেতে পারে। শতপথ ব্রাহ্মণ, ঐ রকম পুরাণকে 'বিদ্যা' বলেছেন, তার্ক্ষ্য বংশীয় রাজা বৈপশ্যতের মতে, ঐ গুলি বেদের অন্তর্গত। শিক্ষাপ্রদ গল্পগুলি এই রকমে ধারাবাহিক রক্ষিত হয়ে এসেছে। সাধনপ্রণালী ও নানাপ্রকার সাধন, অনুষ্ঠান ও আচারাদি এবং তাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করবার জন্যই নানা শাখা বা সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়। আবার এক এক বংশের নিজস্ব সাধনার ধারা—কুলাচারাদি—রক্ষা করবার চেষ্টাতেই হয় 'বংশব্রাহ্মণ' গ্রন্থাদির উৎপত্তি।

কালক্রমে বেদের ভাব সাধারণের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। এই জন্য পুরাণ রচনার কল্পনা প্রথম করেন মহর্ষি বাদরায়ণ। সৃষ্টি প্রকরণাদি, মহৎ জীবন ও নানারকম গল্প গাথা নিয়ে হয় পুরাণ। এই সব গল্পের মধ্যে উপনদ্ধিনয় জীবন-কথা, দেবাসুরের সংগ্রামাদির বর্ণনার নাম 'ইতিহাস'। অথর্ব্ববেদে 'ইতিহাস-পুরাণের' উল্লেখ আছে। নানাপ্রকার সাধনাপক্ষে, ও জ্ঞান ভক্তির পথ নির্ণয়ের জন্য, পুরাণের আদর। বেদ-ভাব সমন্বিত গল্পাদি বিভক্ত হয়ে পুরাণ রচিত হয়। (১) আখ্যান—প্রত্যক্ষ ঘটনা, (২) উপাখ্যান—শোনা কথা, (৩) গাথা—দেবতার স্তুতি বা গীতি, (৪) কল্প—শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্বন্ধে স্মৃত্যাদির মত, (৫) নারা-শংসী—অপরের রচনা—ধার্ম্মিক রাজার প্রশংসা, (৬) ইতিহাস—রাজচরিত্র, দেবচরিত্র বর্ণনা

বা দেবাসুর সংঘর্ষ বর্ণনা, (৭) পুরাণ—সৃষ্টি প্রকরণাদি—এই সমস্ত নিয়ে সত্যবতী সুত ব্যাস ছয়খানি পুরাণ রচনা করেন, নাম—'ষট্ সংহিতা'। ব্যাসের শিষ্য প্রশিষ্যেরা ঐ ষট্ সংহিতার আদর্শে ১৮ খানি পুরাণ রচনা করেন; ইহাই অষ্টাদশ পুরাণ। "বৈয়াসিক্যাং সংহিতায়াং' কথাটি সব মহাপুরাণের শেষে পাওয়া যায়, অথচ অনুবাদের সময় এখন কোন কোনটিতে 'ব্যাস কৃত' বলা হয়। ঐ অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে প্রথম রচিত হয় ১৭ খানি পুরাণ, পরে হয় ভাগবৎ (শ্রীমদ্ভাগবৎ)। ভাগবতের, প্রথম বা আদি অংশের নাম 'দেবী ভাগবৎ', শেষ অংশের নাম শ্রীমদ্ভাগবৎ।

বৌদ্ধপ্লাবনের রামায়ণাদি হ'তে আরম্ভ করে কালিদাসের কাব্য পর্য্যন্ত ও অন্যত্র বহু আবর্জ্জনা ঢুকেছে। এ সব উদ্ধারের চেষ্টা হচ্ছে, সুখের কথা, কিন্তু ওরকম ক্ষীণ চেষ্টায় কায কি অগ্রসর হবে? এসব কাযে, যাঁদের ভারতের ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় আছে—তাঁদের অগ্রণী হওয়া দরকার; ভাব শুদ্ধির দিক দিয়ে প্রাচীন কথা অবহেলা করা ঠিক্ নয়। দেখা যায়, একটা প্রসঙ্গ হয় ত চলেছে, তার মধ্যে হুম্ ক'রে অপর প্রসঙ্গের কথা, বিপরীত ভাবের কথা, গোঁড়ামি ভাবের কথা, সম্পূর্ণ মূল ভাব হ'তে বিচ্ছিন্ন কথা এসে প'ড়ে সমস্ত যেন গুলিয়ে দেয়। এ সমস্ত বিচারের ভার আমাদের দেশীয় পণ্ডিতেরা নিজ হাতে নিন্, পথ নির্দ্দেশ করুন; তারিখ না হয় পরে হবে। প্রাচীন কোনও তারিখ আজও অবিসম্বাদী সত্য বলে নির্ণীত হয় নি। সাধকের কাছে তারিখ-গুলি নিরর্থক, এটিও মনে রাখতে হবে, কারণ সাধক চান জীবন-আদর্শ তারিখ নয়।

পুরাণ, সগুণ উপাসনা প্রচার করেছেন, ভক্তি মার্গের নানাদিক্ দেখিয়েছেন, সহজ ভাবে মনস্তত্ত্বের একটা দিক্ প্রকাশ করেছেন, ফলে পুরাণ জনসমাজের উপর অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন।

পণ্ডিত কুলের মতে, বেদের 'নিবিদ' ঋঙ্‌মন্ত্রাদি হ'তে ও প্রাচীন। এই 'নিবিদ' কি? ধ্যান ও তপস্যার দ্বারা ঋষি সত্য দর্শন করেন। এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যা ঋষি হৃদয়ে স্ফুটিত হয়। নিবিদগুলি এক্ একটি স্ফোট্—সংক্ষিপ্ত পদযুক্ত মন্ত্র। সকলেই জানেন, ব্রহ্মসূত্রের মত সূত্রগুলি কত সংক্ষিপ্ত

অথচ গভীর অর্থযুক্ত। নিবিদগুলি তার চেয়েও সংক্ষিপ্ত। 'তজ্জলান', 'তদ্বন', 'বামনী', 'ভামনী', 'সংযদবাম'—এই রকম কথা গুলি নিবিদ। উপনিষদে এই সব নিবিদের প্রয়োগ দেখা যায়। এগুলির অর্থ ও গভীর। এরকম গভীর অর্থযুক্ত শব্দগুলি যখন ঋঙ্‌মন্ত্রের পূর্ব্বে ও ছিল তখন ঋগ্বেদীয় সভ্যতা আবির্ভাব হবার কত পূর্ব্ব হ'তে জাতির মধ্যে ঋগ্বেদীয় সভ্যতার মূল আদর্শ বর্ত্তমান ছিল? তজ্জলান=তাঁহা হ'তে জগৎ জাত, ও তাঁতে স্থিত, তাঁতেই লীন (হয়)। ব্রহ্মসূত্রে এই ভাব স্পষ্ট, পূর্ব্বে আমরা দেখেছি (তটস্থ লক্ষণ)। তদ্বন=জীবের প্রত্যাগাত্মা, বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ বুদ্ধি সংক্রান্ত সমস্ত প্রত্যয় বা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান যার বিবর্ত্তীভূত 'সেই' বা জীবের মধ্যে আছে। বামনী=সর্ব্বপ্রকার প্রীতি ভালবাসা ও প্রেমের প্রভু। ভামনি=ভাতিমান, কঠোপনিষদে "রূপংরূপং" বা 'তমেব ভান্তি অনুভাতি সর্ব্বং" ইত্যাদি ঐ ভাব প্রকাশ করে। সংযদ-বাম=প্রেমশরণ, প্রেমের প্রভু, এই সব নিবিদবাক্য হ'তেই পাই 'রসো বৈ সঃ" প্রভৃতি বচন। উপাসনাকাণ্ডে এই নিবিদের বিভিন্ন প্রয়োগ দেখা যায়। ব্রাহ্মণগ্রন্থে, শাস্ত্রান্তর্গত সূক্তের মধ্যে কতিপয় নিবিদ প্রক্ষেপ করতে হয়। এই সব শক্তিযুক্ত স্ফোট্ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ক্রিয়ায় বিনিযুক্ত হত। তন্ত্রের মত, ব্রাহ্মণগ্রন্থে ও, 'অভিচার', মারণাদি ব্যাপার আছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে 'নিবিদকে' ক্ষত্রিয় ও 'সূক্তকে' বৈশ্য বলা হয়েছে, আর, 'আহাবই ব্রাহ্মণ'।

[আভিচারিক কর্ম্মে নিবিদের মধ্যে সূক্ত বসালে নিবিদ খণ্ডিত হয়, ক্ষত্রিয়ত্বের হানি হয়, ঐ রকম, সূক্তের মধ্যে নিবিদ বসালে উহা খণ্ডিত হয়, বৈশ্যত্বের হানি হয়। হোতা, যজমানের অনিষ্ট সাধন করবার ইচ্ছা করলে ঐ রকম করেন। যজমানকে ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্ব হ'তে বিযুক্ত করতে হলে সূক্তের মধ্যে নিবিদ পাঠ করতে হয়। স্বর্গকামীর জন্য অন্য রকম পাঠ।]

নিবিদের আদর সকল শ্রেণীর সাধক করতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১০ অ দ্রঃ) উক্ত হয়েছে যে, প্রজাপতি একা, তাঁর বহু হবার ইচ্ছা হল, বাক্য সংযম করলেন, সম্বৎসর পরে তিনি দ্বাদশ বার বাক্য উচ্চারণ করলেন। 'ঐ দ্বাদশ স্ফোটই দ্বাদশপদযুক্ত নিবিদ'। সৃষ্টির প্রাক্-কালে 'নিবিদ', আবির্ভুত হল। ভারতে, আগে তত্ত্বজ্ঞান স্ফুরণ, ব্রহ্মবিদ্যার

প্রচার, তার পর 'ঋঙ্ মন্ত্রাদি ও ব্রাহ্মণগ্রন্থানুরূপ কর্ম্মকাণ্ড বা সাধন-প্রণালী বা প্রয়োগ ব্যবস্থা। এখানে ও সেই দৈবোৎপত্তি।

কি প্রকারে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার মানব মনে জাগ্রত করা হয় তারও ইতিবৃত্ত আছে উপনিষদে। তপস্যার তাপে তপ্ত হয়ে, স্বয়ম্ভূ দেন এই বিদ্যা ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মার নিকট হ'তে পান, তাঁর মানস পুত্র (জ্যেষ্ঠ) অথর্ব্ব; অথর্ব্বার নিকট হ'তে পান অঙ্গির, অঙ্গির হ'তে ভরদ্বাজ সত্যবাহু, সত্যবাহু হ'তে অঙ্গিরা (মুণ্ডক্)। ছান্দোগ্যে আছে, ঐ বিদ্যা প্রথম পান ব্রহ্মা তার পর প্রজাপতি, তারপর মনু, মনু হ'তেই ঐ বিদ্যা সঞ্চরিত হয় মানবকুলে। এই বিদ্যাপ্রাপ্তির বিষয় বর্ণনা কালে মুণ্ডক বলছেন, 'পুরাকালে এই বিদ্যা পান অঙ্গির'। সুতরাং ইহাই প্রমাণিত হয় যে সর্ব্ব প্রকার অনুষ্ঠানাদি সহায়ে সাধন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হবার বহু বহু পূর্ব্ব হ'তে, অতি প্রাচীন কাল হ'তে, গুরুপরম্পরাক্রমে এই বিদ্যা চলে আসছিল। গুরু-পরম্পরা ক্রমও ছিল। মনে হয়, এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার হবার পরে 'হিরণ্যগর্ভ' ও 'বিরাটের' উপাসনা প্রচারিত হয়—সাধারণের জন্য। ব্রহ্মবিদ্যাই ছিল তখন 'বিদ্যা' আর যা 'বিদ্যা' নয় তাই 'অবিদ্যা'। ঈশোপনিষদের "ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং"—ধীরগণের কাছে আমরা ইহা শুনেছি—এই উক্তি উহারই সমর্থক। কিন্তু সেখানেও উপনিষদে ঐ দুই বিদ্যার মধ্যে ভেদবুদ্ধি আনতে নিষেধ করেছেন ("বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয় সহ…")। ব্রহ্মবিদ্যার আর একটি নাম রাজবিদ্যা। রাজারাই এই বিদ্যার প্রচার করেন।

[অধ্যাত্ম বিদ্যা "তেনেয়ং পূর্ব্বং রাজসু বর্ণিতা। তদনুপ্রসৃতা লোকাঃ···।" (যোগবাশিষ্ঠ)]।

গুরু-পরম্পরা ক্রমে নানা দিকে নানাভাবে ঐ দুই বিদ্যার প্রচার বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হ'তে লাগল, কল্যাণের নানা পথ উদ্ভাবিত হল—সম্প্রদায় সম্প্রদায়ে বিভক্ত হ'য়ে ঐ বিদ্যাদ্বয় রক্ষিত হ'য়ে মানব কল্যাণে নিয়োজিত হ'তে লাগল। সম্প্রদায় ছিল, ছিল না সাম্প্রদায়িকতা। সম্প্রদায় ভাল, সংহতিশক্তি ভাল, সংহতিশক্তির প্রেরণায় কল্যাণের পথ প্রশস্ত হয়—সম্প্রদায় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রথমে লক্ষ্য ছিল যেখানে সকলকে উৎসাহিত করা ও সহায়তা করা, সেখানে পরে দেখা দেয় ভেদ বুদ্ধি, স্বার্থ বুদ্ধি,

পৌরোহিত্যের প্রতাপ অক্ষুন্ন রাখবার প্রবৃত্তি। সম্প্রদায়—ভাব রক্ষা করে, ধারা বজায় রাখে। পৌরোহিত্যের প্রথম অবস্থায় গুণ থাকে। গুণদোষের কথা স্বামীজি যা বলেছেন, তা ইতিপূর্ব্বে বলেছি (বর্ত্তমান ভারত দ্রঃ)।

এক অখণ্ড ভাবই হিন্দু সম্প্রদায়ের ভিত্তি। কিন্তু এখন ? এখন দৃষ্টি কেবল খণ্ডের দিকে, অখণ্ড হয়েছে দৃষ্টিপথ বহির্ভূত—ফল, সতত আত্মকলহরত জাতি। সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা প্রসূত জাতির মধ্যে দলাদলি—স্ব স্ব মত প্রাধান্যের জন্য সতত বিবাদ—এই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যেন জাতির সংস্কার, যার ক্রিয়া জাতীয় জীবনে সকল ক্ষেত্রে স্ফুট্ মারছে। তবে উপায় ? উপায়—আবার অখণ্ডের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে, অখণ্ড হিন্দু ভারতে, সম্প্রদায়ের মধ্যে অখণ্ড দৃষ্টি আনাতে হবে, ইহাই প্রথম। আর সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে "চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কায হয় না"। ঐ প্রকার ভেদ বুদ্ধির জন্য দায়ী সম্প্রদায় নয়—দায়ী জাতীয় আদর্শ চ্যুতি, দায়ী রকতকটা পৌরোহিত্য, দায়ী মনুষ্যত্বের অভাব, দায়ী স্ত্রী শূদ্রকে দাবিয়ে রাখা। সার্ব্বজনীন সার্ব্বলৌকিক ও সার্ব্বভৌমিক ভাব আশ্রয় করতে হবে, তবে বিশ্বকে আপন বোধ হবে—শুধু অখণ্ড ভারত নয়, অখণ্ড, বিশ্ব ইহাই এই নতুন যুগের বাণী। অখণ্ড, সার্ব্বলৌকিক, সার্ব্বভৌমিক ভাবের উপরই সব জাতি, সব ধর্ম্ম দাঁড়িয়ে আছে। ধর্ম্ম জগতে রফায় সামঞ্জস্য আসে না। রফায় বন্দোবস্ত হয় বিষয় বুদ্ধিতে। আগে ঘর সামলাতে হবে, এখন আরো ২০।২৫ বৎসর ভারতই হবে ভারতীয়ের একমাত্র উপাস্য দেবতা। গানে কখন 'ঋষভ্' ছাড়তে হয়, 'গান্ধার' ধরতে হয়, কিন্তু সানাইএর পোঁ ঠিক্ থাকে। চাই অখণ্ড দৃষ্টি, চাই সমদৃষ্টি, তবেই হবে সমন্বয়, সব ভাব সমভাবে অন্বিত—অখণ্ডের মধ্যে তখন থাকবে অসংখ্য খণ্ড, অসংখ্য সুর নির্ব্বিবাদে পরস্পর পরস্পরের সহায়তা ক'রে, নতুবা সকলের মুখে আপন আপন বিশ্বাসের বাণী—Universal Religion—বিশ্বজনীন ধর্ম্ম—বুলি বৃথা।

দার্জিলিঙে স্বামীজি ভ্রমণে বেরিয়েছেন। অনতিদূরে একজন কুলি পড়ে গেল, পাথরে পা লেগে। স্বামীজি কোমরে হাত দিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর এল "কোমরে বেজায় লেগেছে, ঐ লোকটি পড়ে গেল কিনা, তাই কোমরে হাত দিয়েছি।" সত্যই জানা গেল, লোকটির কোমরেই চোট্ লেগেছে। এই যে সমদৃষ্টিবোধ,

সমবেদনাবোধ, ইহা জীবনসাপেক্ষ। সমদৃষ্টি, সাধনসাপেক্ষ, কিন্তু সমবেদনা বোধ, জাতীয়ত্ব বোধেও উদয় হয়। "যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবতে একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেবার বিরাম থাকবেনা"— এই ভাবের উক্তি, যা স্বামীজি ৺সখারাম গণেশ দেউস্করকে বলেছিলেন, তাহাই চাই প্রথম, সমবেদনা বোধকে কার্য্যে দেখান চাই সর্ব্বক্ষেত্রে।

তন্ত্র

তন্ত্রের একটি নাম সাধনশাস্ত্র অর্থাৎ তন্ত্রের মর্ম্ম বুঝতে হলে সাধন চাই। সাধনের জন্য তন্ত্রে অনুষ্ঠান বা পূজার ব্যবস্থা আছে। "আমাদের চিন্তার মত আমরা হই", "সমানই সমানকে জানতে পারে"— এই দুই ভাব বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনার মূলকথা।

বিভিন্ন রুচি আছে, একই সৃষ্টির অন্তর্গত বিভিন্ন সংস্কৃতি আছে। সেগুলিকে তাল্‌গোল্ পাকিয়ে মিশিয়ে অধিকারের সাম্য আসে না—'সম অধিকার' মানে তা নয়, বরং ঐ রকম ক'রে মিল করবার চেষ্টায় অনেক সময় ফল বিপরীত হয় অথবা জীবন অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায় সর্ব্বক্ষেত্রে। সেই জন্য দরকার, ঐ সব পার্থক্যের মধ্যে সাধারণ ঐক্য ভাবকে পুষ্ট করা, আর, ঐ ঐক্যাশ্রয়ে সমস্ত ভাব বৈচিত্র্যের গতিকে নানা উপায়ে একমুখী করা, যাতে সবই এক সুরে বাঁধা হয়। কারোর ভাবে আঘাত না দিয়ে সকলের জন্য উন্নতির পথ খোলসা রাখা চাই, যোগ্যতাই অধিকার লাভের মাপ কাটি হওয়া চাই। অযোগ্যকে যোগ্য ক'রে নেবার সাহস ও হৃদয় চাই। যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হয় শিক্ষা ও 'সংস্কার' সহায়ে। অধিকারের উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ।

[ব্যাকরণে 'জ্ঞান' ক্লিবলিঙ্গ। বোধে বোধ 'প্রতিবোধবিদিতং'— জ্ঞান, অলিঙ্গ। জ্ঞানার্জ্জনে লিঙ্গ বিচার থাকতে পারে না। "সত্যেনোত্তভিতা ভূমি" (ঋগ্বেদ)— সত্যের দ্বারাই ভূমি উন্নত হয়েছে ও হয়। প্রজ্ঞাবেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি—এই সত্য অবলম্বনে সাধনে অগ্রসর হতে হয়।]

"তস্মাদ্বেদাত্মকং শাস্ত্রং বিদ্ধি কৌলাত্মকং প্রিয়ে" (কুলার্ণব, ৮৫।২য় উ)। তন্ত্র বেদাত্মক। তন্ত্রের নিজস্ব আচার। উচ্চাঙ্গ সাধনায়, তন্ত্রের আচার

কৌলাত্মক। বৈদিক যুগে ঐ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি নিয়ে যাতে সকলের অগ্রগতি হয়, অর্থাৎ যাতে ঐ বুদ্ধির স্ফুরণ হয়, তার জন্য হয় বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা, কিন্তু স্বার্থ আসায় বর্ণাশ্রমের 'অধিকার' মানে দাঁড়ায় স্বার্থের অধিকার, রক্তের অধিকার, আভিজাত্যের একচেটিয়া অধিকার অর্থাৎ ভোগাধিকার। তার ফল—স্ত্রী-শূদ্রের উন্নতি-পথ রোধ।

সকাম সাধক চিরকাল আছে ও থাকবে। সকাম সাধকের মধ্যেও বহু সাধকের উচ্চ লক্ষ্য থাকে আবার অনেকের থাকে না। যাদের জীবনের উচ্চ লক্ষ্য নেই, অথচ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সাধনে অগ্রসর—এই রকম নানা প্রকৃতি, নানা সংস্কৃতি, ও নানা মনোবৃত্তিকে মোড় ফিরিয়ে দেবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার প্রবর্ত্তন—এ সমস্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থাদির মধ্যে বা অন্যত্র স্পষ্ট নির্দ্দেশ নেই। যা আছে, তার মধ্যে বিধির 'ফাঁক্'ও যথেষ্ট—সব তালগোল পাকিয়ে একস্থানেই রয়েছে—নির্ব্বাচন করবার জন্য আভিজাত্য ছাড়া অন্য কোন বিশেষ মাপকাঠি নেই। তন্ত্রে, সাধকের শ্রেণীবিভাগ আছে। তার মাপকাঠি, 'বর্ণ' নয়, মাপকাঠি মনোবৃত্তি। 'সংস্কার' অর্থাৎ শিক্ষা ও সাধনা ভিন্ন, একশ্রেণীর সাধক উচ্চশ্রেণীর সাধনা গ্রহণ করতে পারেন না, 'সর্ব্বাধিকার' প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত, সেখানেও গুরুর নির্দ্দেশে সাধককে অগ্রসর হ'তে হয়। অতি হীন সাধক যাদের আমরা সাধারণতঃ বলি, তার জন্যও ব্যবস্থা আছে, যদিও সেগুলিকে তন্ত্রে উৎসাহ দেওয়া হয় নি। তন্ত্র কারোকে ছেঁটে ফেলেন নি। ইহাতে তন্ত্রের কারুণিকত্বই প্রমাণ হয়। তন্ত্র বেদাত্মক বলেই সর্ব্বপ্রকার সাধকের মধ্যে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিকে প্রবুদ্ধ করবার চেষ্টা হয়েছে ঐ শাস্ত্রে। স্বার্থ-সিদ্ধিপর ও হীনমতি সাধকের জন্য ব্যবস্থা কঠোর। সাধারণতঃ, তন্ত্রে যেমন সাধকের শ্রেণীবিভাগ আছে, সাধনারও ক্রমবিভাগ আছে। তন্ত্র ও বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, তবে সকলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই। বৈদিক সাধনায় নারী ও পুরুষের অধিকার সমান, তন্ত্রেও তাই, অধিকন্তু তন্ত্রমতে স্ত্রীগুরু নিষিদ্ধ নয়—বরং প্রশস্ত। স্ত্রীগুরুর ধ্যানও আছে। স্ত্রীজাতির অধিকার লোপ পায় পৌরাণিক যুগে, তার ছোঁয়াচ জাতির সর্ব্বাঙ্গে লাগে। স্ত্রীগুরু গ্রহণে আপত্তি, শক্তিসাধক কখন করতে পারেন না, কখন করেন নি এপর্য্যন্ত। পুরাণে তন্ত্রের প্রভাব যথেষ্ট, আর সে

প্রভাব প্রকাশ্যভাবে আজও বর্ত্তমান। তন্ত্রবিরোধী পুরাণে, তন্ত্র সাধনা না করেই, রহস্য না জেনেই, দ্বেষ উদ্গীরণ করা হয়েছে, সাম্প্রদায়িকতার গোঁড়ামি থাকাতেই ঐগুলির উদ্দেশ্য সহজেই ধরা পড়ে। তথাপি তাঁরাও তন্ত্রপ্রভাব মুক্ত নন। জাতীয় অবনতির যুগে, বৌদ্ধপ্লাবনে, বিদেশী কর্ত্তৃক ভারতজয়ে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ ইত্যাদি নানা কারণে জাতির মধ্যে যে জড়তা আসে, সেই-সময়ে ভারতীয় বৌদ্ধ তন্ত্র মিশে, ভারতের তন্ত্রশাস্ত্রও বিকৃত হয় অর্থাৎ বৌদ্ধবাদের অনেক বিসদৃশ ভাব তন্ত্রে স্থান- পায়। ইহা সকল পণ্ডিতেরাই স্বীকার করেছেন।

ভগবানকে 'জগদম্বা' নামে সম্বোধন করা, 'মা' নামে ডাকা, ভারতের নিজস্ব, তন্ত্রের নিজস্ব। তন্ত্রের প্রভাব ভারত হ'তে অন্যত্র বহু বিস্তৃতি লাভ করে; সে সকল স্থানের আদিম ভাবের সঙ্গে মিশে ঐ সব স্থানেই ভারতীয় তন্ত্র বিকৃত হয়। বৌদ্ধ অভিযানে, সেইগুলির নাম হয় 'বৌদ্ধতন্ত্র'। বৌদ্ধপ্লাবনে সেই বৌদ্ধতন্ত্রগুলির আগমন হয় ভারতে। মধ্যএশিয়া বা তিব্বত হ'তে তন্ত্র আসে নি—লয়যোগ বা কুণ্ডলিনী যোগও সে সব স্থান হ'তে আসে নি।

["Just as the Tibetans took over *Tantricism* from India, so, as the well-known Tibetan Biography of *Jetsün Milarepa* (Tibet's most famous *yogī* and saint), for example, makes clear, they appear also to have derived various systems of *yoga*, including *Laya* or *Kuṇḍalinī Yoga*. While it is undoubtedly true that many *Mantras* likewise derived from India have grown hopelessly corrupt in the Tibetan language itself, the practice of *Laya* or *Kuṇḍalinī Yoga* by Tibetans seems to have been kept fairly pure"...(W Y E W.) অর্থাৎ, 'ভারত' হ'তে তিব্বতীরা তন্ত্র ও যোগবিদ্যা বা কুণ্ডলিনী যোগ নিলেও, গৃহীত মন্ত্রগুলিকে অত্যন্ত বিকৃত করা হয়েছে, তবে কুণ্ডলিনী যোগটা অনেকটা ঠিক্ আছে।' (এইটি সাহেব দিয়েছেন footnote এ, Tibetan Book of the Dead এর উড্রফ লিখিত Foreward এ)। Foreward এ Woodroffe লিখছেন যে তিব্বতী গ্রন্থে গৃহীত সংস্কৃত মন্ত্রগুলি 'badly corrupt' (অত্যন্ত দুষ্ট), তাতে সন্দেহ হয় তিব্বতী সাধকদের মন্ত্রের শব্দশক্তি বিষয়ে জ্ঞান আছে কিনা।]

উডবফ সাহেব স্পষ্ট বলেছেন, উক্ত Forewardএ, যে, বৌদ্ধতন্ত্রেব মন্ত্র সাধনাব প্রণালীব সঙ্গে হিন্দুতন্ত্রেব প্রভেদ আছে। এই পার্থক্য দেখে পণ্ডিতেবা যদি অনুসন্ধানে বত হন, সাধকদেব যে সুবিধা হয় তাতে সন্দেহ নেই ; তা হলে, হিন্দুতন্ত্রেব মধ্যে যে সব অন্যভাব ঢুকেছে তা ধববাব সুবিধা হয়।

বৌদ্ধবাদ মানে শ্রীবুদ্ধেব বাণী নয়। বুদ্ধদেবেব জীবন ও বাণী ভাবতেতব দেশে প্রচাবিত হবাব পব, সেই সব দেশ হ'তে বৌদ্ধনামধাবী ব্যক্তিগণ যে সব মতবাদ প্রচাব কবেন ও যাব বিরুদ্ধে শ্রীশঙ্কব দাঁড়ান, সেই সব মতবাদই বৌদ্ধবাদ। ঐ সব মতবাদ ভাবতীয় চিন্তাধাবায় বিপর্য্যয় সাধন কবতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

হিন্দুব ষড়দর্শন বেদবিবোধী নয়। তন্ত্র বলছেন—

["ষড় দর্শনানি মোঙ্গানি পাদৌ কুক্ষিঃ কবৌ শিরঃ। তেষু ভেদন্ত যঃ কুর্য্যান্মমাঙ্গং ছেদয়ত্ত সঃ।" (কুলার্ণব ২য় উ। ৮৪)]

'ষড়দর্শন আমাব অঙ্গ, যে তাব ভেদ কবে, সে আমাব অঙ্গ ছেদ কবে'। তাই তন্ত্রেব সঙ্গে কোন দর্শনেব বিবোধ নেই। তন্ত্র সহজেই স্বীকাব কবেন যে প্রত্যেক দর্শনেব এক একটি অধিকাব আছে, আব প্রত্যেক দর্শনকাব তাঁব অধিকাবেব সীমাব মধ্যেই থেকেছেন। ইতিপূর্ব্বে আমবা দেখেছি যে বৈদিক সাধনাব সঙ্গে তন্ত্রেব আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। ক্রমশঃ আবো বোঝবাব চেষ্টা কবা যাবে।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চাবটি—সাধনায় বিনিযোগ হয়। ঐ ৪টিব নাম চতুর্ব্বর্গ। ধর্ম্মার্থকামেব বিনিযোগে উদয় হয় মোক্ষ। মোক্ষ হচ্ছে পবম পুরুষার্থ অর্থাৎ অপব তিনটিব ফল। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গেব কথা কৌটিল্যেব অর্থশাস্ত্রেও আছে। অর্থ ও কাম ধর্ম্মার্থে প্রযুক্ত হওয়া চাই। ধর্ম্ম মানে, যা 'স্ব'কে ধাবণ ক'বে বাখে। সাধন সহায়ে অর্থাৎ উদ্যম ও মহাবীর্য্য প্রকাশেই অভ্যুদয লাভ সম্ভব। অলস জীবনকে বৈবাগ্য মনে কবা বাতুলতা মাত্র। বৈবাগ্যেব নামে জড়তাব প্রশ্রয় দেওয়া ধর্ম্ম নয়। বিনিয়োগ, মানে, বিশিষ্টরূপে প্রয়োগ। ত্রিবর্গকে 'কামনা' নাম দিয়ে অবহেলা কবেই এসেছে জাতিব মধ্যে উদ্যমহীনতা। নিষ্কাম ও নির্ভবশীল ব্যক্তি ক জন ?

'মোক্ষ'কেও কামনা বলা হয়। মোক্ষ, স্বতঃসিদ্ধ বস্তু; স্বতঃসিদ্ধ যা, তাব কামনা হয় কখন? যেটি আছে নিয়ত, সেটি প্রকাশ হবাব চেষ্টা পায়। সাধনা মানে, ঐ চেষ্টাব সহায়তা মাত্র—একটি বিশেষ কৌশল। কর্ম্মবাদ মানে কর্ম্ম হ'তে বিরত থাকা নয়, 'ভাগ্যে আছে' ব'লে নিশ্চেষ্ট থাকা নয়। ক্রমবিকাশ মানে কি? একটা অবস্থাব বন্ধন হ'তে মুক্তি লাভেব ইচ্ছা ও চেষ্টা। বন্ধনমুক্ত হবাব ইচ্ছা, উন্নত হবাব ইচ্ছা মানুষেব স্বাভাবিক। ইহা আপনি প্রকাশ পায়। স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে উন্নতি কববাব ইচ্ছাই কামনা, কাবণ, তাতে বন্ধনেব পব নূতন বন্ধন এনে দেয়। বন্ধন কেহ চায় না। উন্নতিব ইচ্ছা, 'স্ব'-এবই স্বভাব-স্ফূর্ত্ত ভাব, তাব স্ফুবণকে গণ্ডীব মধ্যে বেঁধে ফেল্‌লেই হয় কামনা, আব তাকে কোন গণ্ডীব মধ্যে আটকাবার চেষ্টা না কবলে সেটি স্বয়ং নিজেকে পূর্ণ প্রকাশ কবে। এই পূর্ণ প্রকাশাবস্থাই মোক্ষ। বন্ধন মুক্ত হবাব প্রচেষ্টাই অভ্যুদয় অর্থাৎ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মকে ঠিক্ ঠিক্ বিনিয়োগ করতে হলে চাই, সুতবাং, অর্থ ও কামেব যথাযথ প্রয়োগ। সমষ্টিভাবে, ইহা প্রত্যক্ষ। প্রয়োগ ঠিক হলে দূরে যায় বন্ধন। এই বকম প্রয়োগ-সামর্থ্যেব বা উদ্যমের নাম জীবন-সংগ্রাম—দুঃখ, বেদনা ও তাব আনুষঙ্গিক সুখেচ্ছা। ব্যক্তিগত হিসাবে, ব্যক্তিব অভিব্যক্তিব শেষে এমন অবস্থা আসে, যেখানে সে সমস্ত সংগ্রামকে তুচ্ছ ক'বে খাড়া হয় ও তখন আসে মোক্ষ অর্থাৎ তখন সে দেখতে পায় যে 'স্বতঃস্ফূর্ত্ত' ছিল এতদিন আববণে ঢাকা মাত্র। মোক্ষকে কামনা বলাই ভুল। আদর্শ লাভ করবাব পথে, বাধা বিঘ্ন দূব কবাব চেষ্টাই সাধনা। আদর্শ লাভ কবাব চেষ্টাব নামই উন্নত হবাব, উন্নতি কববাব ইচ্ছা। ইহাকে কামনা বলা যায় না। স্বরূপ যেটি, তাব কামনা হয় না। কার্য্যকারণ পবম্পবা আমবা দেখি না, বর্ত্তমান অবস্থাচ্যুতিকে ভয় কবি ও মোক্ষকে একটি স্বতন্ত্র বস্তু বলে মনে কবি। তাই মোক্ষকে কামনা বলি। এই অর্থেই বৈষ্ণবেবা মোক্ষ চান না। তাঁবা চান 'প্রেম' বা প্রেমরূপী প্রেমঘন মূর্ত্তি অর্থাৎ তাঁবাও চান তাঁদেব 'অন্তবেব ধন'—হৃদয়গুহায় নিহিত 'আকৃষ্ট শক্তি' বা সুব-কেন্দ্র (Tone centre)। অর্থ ও কামকে জীবনেব লক্ষ্য কবলে আসে মোহ বা আববণ। তাঁবাও জীবনেব লক্ষ্যকে অর্থ কাম কবেন না। এই মোহকে

তুচ্ছ ক'রে বীরের মত অগ্রসর হ'তে হয়; ইহা সকল সাধকই স্বীকার করেন। তন্ত্রশাস্ত্র বারবার বলেছেন, যাঁরা মোক্ষ ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, ব্রহ্ম চিন্তা করেন, তাঁদের পক্ষে বিধিনিষেধ নেই; চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্তই শাস্ত্রপথ অবলম্বন করতে হয় ও উপদেষ্টার দরকার হয়। তারপর? তারপর, "সে বড় বিষম ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই।"

'কোশ' মানে আবরণ—কোশই আবরক। পঞ্চকোশের কথা সব শাস্ত্রেই আছে। পঞ্চকোশ—(১) অন্নময় কোশ=শরীর—যা অন্নের উপর নির্ভর করে, (২) প্রাণময় কোশ=পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়+পঞ্চপ্রাণ, (৩) আনন্দময় কোশ =ভোগাতিরিক্ত ইষ্টে লীন বুদ্ধি, (৪) মনোময় কোশ=পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়+মন, (৫) বিজ্ঞানময় কোশ=পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়+বুদ্ধি। (১) শরীর দৃঢ় ও সুস্থ রাখা চাই, নতুবা সাধনে বিঘ্ন আসে; এজন্য তান্ত্রিক সাধক আসন ও যোগের (কেহ কেহ হঠযোগের) প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন আবশ্যক মতে—গুরু উপদেশে; (২) সাধনের দ্বারা প্রাণক্রিয়া স্থির ও শান্ত হওয়া দরকার, এজন্য আসনে বসবার পূর্ব্বে সাধক স্তবাদি ক'রে মনকে প্রস্তুত করেন; (৩) বুদ্ধিকে স্ব-ইষ্ট চিন্তায় মগ্ন রাখতে হয়—ভোগাদির আয়োজন সমস্তই ইষ্ট প্রীত্যর্থে—নিজের জন্য নয়, ইহা প্রথমেই ধারণা করতে হয় ও এই বিষয়ে চাই সজাগ বুদ্ধি; (৪) সংকল্প ও বিকল্প ত্যাগ জনিত শুদ্ধ বুদ্ধির উদয় ও চিত্তপ্রসন্নতা অর্থাৎ চাই গুরু ইষ্টে দৃঢ় বিশ্বাস—শ্রদ্ধা, (৫) স্থির লক্ষ্য—ঔদার্য্য ও আপনবোধে সর্ব্ববস্তু গ্রহণক্ষমতা ও সর্ব্বত্র সহনশীলতা।

আচরণ ও জীবন যাপনে কোশ ক্রমশঃ মুক্ত হয়। তন্ত্র, কলে ফেলে, সাধককে তৈরী করে নেন্। তান্ত্রিক সাধকের জীবন তপস্যার জীবন, কি অনুষ্ঠানে, কি চিন্তায়।

তান্ত্রিক পূজা

বিভিন্ন তন্ত্র বা আগমে সাধারণ ভাব একই, সর্ব্বত্র প্রায় এক রকমই আচার—পার্থক্য, খুঁটিনাটিতে, নীতি একই। তন্ত্র বলেন, 'তর্কপ্রতিষ্ঠানাৎ' সত্যলাভ হয় না। সত্য রয়েছে, আবিষ্কার করতে হবে না, শুধু নিজের জীবনে সাধন বা অনুষ্ঠান সহায়ে, সত্যদর্শন করতে হবে। সাধনে সিদ্ধ

হলে অর্থাৎ সিদ্ধ পুরুষের যে ভাব সেই ভাব গোড়ায় অবলম্বন করে অগ্রসর হলে অবস্থা আপনিই উদয় হয়।

পূজায় কোশাকুশিতে জল নিয়ে বসতে হয়। কোশাকুশি অঞ্জলির আকারে নির্ম্মিত ; বিনীত নিবেদনই অঞ্জলি। ঐ কোশাকুশিরূপ অঞ্জলিতে হৃদয়ের প্রীতিপ্রেম অভিব্যক্ত। বারিরূপে হৃদয়ের রসই কোশাকুশিতে। তান্ত্রিক সাধক, কোশাস্থ জলকে আনন্দের প্রতীক জ্ঞান করেন— 'বিজ্ঞানান্দং ব্রহ্ম'। বাহ্য পূজায় কোশাকুশি, ফুল, জল, চন্দন, প্রভৃতি দরকার।

বাহ্য পূজার পূর্ব্বে বিছানায় ব'সেই 'প্রাতঃকৃত্য' অর্থাৎ গুরুর মানস পূজা আদি করা যায়। ঐ মানস পূজা তন্ত্রেরই। কুণ্ডলিনীর ধ্যান অনেক রকম। কার কোনটি উপযোগী, নিজ গুরুর কাছে জেনে নিতে হয়, কারণ ইহাতে যোগাঙ্গ ব্যাপার আছে। সাধারণ ভাবের কথা—যা সকলেই করতে পারেন—তারও উপদেশ আছে, যথা সহস্রারেস্থিত শ্রীগুরুর কৃপাদৃষ্টি বা আকৃষ্টশক্তির বলে মূলাধার হ'তে কুণ্ডলিনীর উত্থান হচ্ছে চিন্তা করা ইত্যাদি। ইষ্ট জপ ও ধ্যানান্তে শয্যা ছেড়ে ভূমিতে পা রাখবার আগে 'ক্ষমস্ব' বলে মাতৃজ্ঞানে প্রণাম করতে হয়, 'তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রাং অনুবর্ত্তয়িষ্যে', এই ভাব ধারণ করতে হয়। আচমনে, আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা ; "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" মন্ত্রে যতদূর দৃষ্টি যায় সবই ব্রহ্ম—এই চিন্তা করতে হয়। তার পর আসন শুদ্ধি আদি, ন্যাস, অঘমর্ষণ। সন্ধ্যাকর্ম্মে সূর্য্যার্ঘ্য দিতে হয় ত্রিসন্ধ্যায়। সব সময়েই সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থ নিত্যচৈতন্য শক্তিকে অর্ঘ্য দিতে হয়। ইষ্ট গায়ত্রী ও ধ্যানের পর, জপ ও জপফল ইষ্টে নিবেদন করতে হয়। সকাম সাধক জপফল নিজের কাছেই রাখেন। ইহাই সন্ধ্যা। দেবতা বিশেষে ধ্যানের পার্থক্য হয়, যথা, প্রাতে মূলাধারে "হুতভুঙ্ মণ্ডলোপরি", মধ্যাহ্নে 'হৃৎপদ্ম কর্ণিকায়', সায়াহ্নে সহস্রারে চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে প্রভৃতি।

'মন্ত্র', 'ছন্দ', 'দেবতা', 'তন্ত্র', 'গায়ত্রী' বলতে কি বোঝায় জানা দরকার। মন্ত্র'—মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ প্রকীর্ত্তিতঃ' (মনন = বিষয় চিন্তা)। বিষয়

চিন্তা হ'তে ত্রাণকারী যা, তাই মন্ত্র। মন্ত্র একটি শক্তি—ব্রহ্মই স্ফোটরূপে ব্যক্ত। পূর্ব্বে এসম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। ছন্দ ও দেবতা—

["সর্ব্বেষাং মন্ত্রতত্ত্বানাং ছাদনাচ্ছন্দ উচ্যতে অক্ষরত্বৎ পদত্বাচ্চ মুখে ছন্দঃ সমীরিতং॥ সর্ব্বেষাং জন্তূণাং ভাষণাৎ প্রেরণস্তথা। হৃদয়াম্ভোজমধ্যস্থা দেবতা তাং ন্যসেৎ॥"]

অর্থাৎ ছন্দ সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রতত্ত্ব সমূহের আচ্ছাদন, পদ ও অক্ষর বিশিষ্ট ভাবে উচ্চারিত হলে যে ভাব প্রকাশ পায় তা হ'তেই আসে ছন্দ। সাধনে দৃঢ়তা, ইষ্ট নিষ্ঠায় অক্ষর ও পদ উচ্চারণে যে বৈশিষ্ট্য ভাব বা গাঢ়তা আনে সেটি আনন্দেরই দ্যুতি; দ্যুতিই মন্ত্রের আচ্ছাদন বা সর্ব্বাঙ্গে পরিলিপ্ত। ছন্দ, বিশেষ ভাব প্রকাশক। দেবতা তিনিই যিনি সর্ব্বজীব হৃদয়ের প্রেরণাকে কর্ম্মে নিয়োজিত করেন বা প্রেরণা দেন। দেবতা মন্ত্রময়ী—'মন্ত্রতনু' তাঁর। ঋষিই মন্ত্রদ্রষ্টা, তাই ঋষিন্যাস মাথায় করতে হয়। হৃদয়ে দেবতা, গুহ্যে বীজ, পাদদ্বয়ে শক্তি ও সর্ব্বাঙ্গে কীলক ন্যাস করতে হয়।

তন্ত্র = তন্ + ত্র। 'তন' মানে (জ্ঞানের) বিস্তার, ব্যাপ্তি। এই 'ব্যাপ্তি' ভাবকে রক্ষা করতে হয়, যাতে মনের বিস্তার ও ব্যাপ্তি ভাব রক্ষিত হয় তারই নাম তন্ত্র। কোন্‌টি যে তন্ত্র নয় তা বলা কঠিন। সাংখ্যকে ষষ্টিতন্ত্র বলা হয়। সাধনের উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ বা আদর্শ লাভ। হৃদয়ের প্রসার বা মনের ব্যাপ্তিভাব না থাকলে সাধনা হয় না। আদর্শ লাভ করতে হলে যে প্রণালীর মধ্য দিয়ে যেতে হয় তার নাম তন্ত্র। ঐ প্রণালীর বিধি বা অবয়ব অর্থাৎ তনুই তন্ত্র—ঋত, একটি শৃঙ্খলা। ইংরাজিতে ইহাকে Constitution বলা যেতে পারে। তন্ত্রের আর এক নাম 'মন্ত্রশাস্ত্র'। মন্ত্রই দেবতার তনু। এই তনু, সাধন দ্বারা রক্ষা করতে হয়, তাই তন্ত্রশাস্ত্র আবার সাধনশাস্ত্র।

যে তেজ বা শক্তি সর্ব্বলোক প্রসূতি তিনি সাবিত্রী; বেদ প্রসব করেন ব'লেও ইনি সাবিত্রী। ঐ তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই গায়ত্রী। দীপ্তিশালী, ক্রীড়াশীল অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াকাশে দ্যোতমান যিনি তাঁর নাম 'দেব-সবিতা'। 'দেব-সবিতা' সকলের রুচি দ্বারাই উপাসিত হন। সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী যে শক্তি জীবের মধ্যে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষে প্রেরণা দেন ও তাতেই

বুদ্ধিকে নিযুক্ত রাখেন, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থ সেই আদিত্য দেবতারূপ পুরুষই 'ভর্গ'। ইনিই সূর্য্যের প্রাণ। ভৃজ ধাতু হ'তে নিষ্পন্ন ভর্গ=পাক, সংহার, প্রকাশ, দীপ্তি। ভর্গই কালাগ্নিরূপে সপ্তরশ্মি দ্বারা জগৎ সংহার করেন—'পাকে' হ'তে থাকে পরিণাম প্রাপ্তি। ভ=যিনি সমস্ত বিভাগ করেন, র=রঞ্জন করেন, সকলকে রূপবান করেন, বর্ণদান করেন, গ= গমনাগমনশীল—ক্রীড়ারত। স্থূলরূপে ইনি সূর্য্যমণ্ডলস্থ হয়েও সর্ব্বভূতে আছেন। বাহ্যাকাশে ইনি জলন্ত দীপ্তি বা সূর্য্য, হৃদয়াভ্যন্তরে ইনিই নির্ধূম জ্যোতিরূপে অবস্থান করেন। ভর্গদেব ত্রিতাপনাশক, তাই ধ্যানগম্য—বরণীয়। ইনিই আদিত্যাত্মক—ভূ ভুবঃ স্বঃ। জগৎ ব্যাপার সম্বন্ধে ইনি নিত্য। তপস্যা ও জ্ঞান হ'তে উদ্ভূত ঐ দীপ্ত হিরণ্যমণ্ডল, তপস্যা ও জ্ঞানের আকর। ইনি এক হ'য়ে ও অদিতির গর্ভস্থ। ঐ বিশাল তেজোমণ্ডলের উদর হ'তে সুমেরু পর্ব্বত, ধমনী হ'তে নদী, শোণিত হ'তে সপ্ত সমুদ্র, জরায়ু হ'তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উৎপত্তি। ভূলোক ও স্বর্গলোক ইঁহার কপালদ্বয়, কপালদ্বয়ের মধ্যস্থ শূন্য স্থানই আকাশ। কপালদ্বয়ের একটি, স্থূল দেহীর আবাসস্থল—কর্ম্মস্থান; অপরটি—স্বর্গ—ভোগস্থান। ব্যাহৃতিত্রয়ে ভর্গ মাহাত্মই বলা হয়েছে। ঐ শূন্য স্থানে বা মধ্যস্থলে এক শিশু আবির্ভূত হন, তিনিই মার্ত্তণ্ড ও দেব-সবিতা। (ভুবঃ=অন্তরীক্ষ লোক)। গায়ত্রী উচ্চারণে ত্রিমাত্র ব্যবহার আছে—হ্রস্ব বা একমাত্র, দীর্ঘ বা দ্বিমাত্র, প্লুত বা ত্রিমাত্র। [যোগী যাজ্ঞবল্ক্য ও ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্র দ্রঃ।]

সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনায় যেমন আমরা বিজ্ঞানটি বোঝবার চেষ্টা করেছি, সেই রকম এখানে আমরা তত্ত্বটি বোঝাবার চেষ্টা করব। পূজা ক্রমের বা পদ্ধতির ইঙ্গিত মাত্র দিব। আচমনান্তে একটি ত্রিকোণ-বৃত্ত চতুরস্রমণ্ডল লিখতে হয় মাটিতে, জল দিয়ে। ত্রিকোণটি বৃত্ত দিয়ে ঘেরা, তার চারিদিকে সরল রেখায় চতুষ্কোণ আঁকা। দেবী-পক্ষে অধোত্রিকোণ, নতুবা উর্দ্ধত্রিকোণ। এই মণ্ডলই 'আধার শক্তি'। গন্ধ পুষ্প দিয়ে ঐ আধার পূজা করতে হয়, কোশার জলে তীর্থ আবাহন করতে হয়। কয়েকটি 'মুদ্রা' দেখিয়ে, আসনশুদ্ধি, দিগ্বন্ধন, বাস্তুশুদ্ধি করতে হয়। পূজা দ্রব্যে জলপ্রোক্ষণ ক'রে শোধন করতে হয়। 'রং' এই বহ্নি

বীজ উচ্চারণ ক'রে নিজের চারিদিকে জলধারা দিয়ে বহ্নি বা তেজ-প্রাকারের মধ্যে বসে আছি চিন্তা করতে হয় অর্থাৎ উর্দ্ধস্থ বা ব্যোমমার্গস্থ রক্তবর্ণ তেজোময় বীজ—'রং'—হ'তে মহাশূন্যে 'হুঁ' বীজোদ্ভাসিত বাল-সূর্য্য-মণ্ডল উদ্ভূত হলেন চিন্তা করতে হয় এবং এই সর্ব্ববিঘ্ন দূরকারী বজ্রময় জ্যোতির্ভবনে আপনাকে নির্ম্মলচিত্ত ও দেবতাময় ভাবতে হয়।

[তীক্ষ্ণাকল্পে,—"রক্তং রেফজ-বালার্কমণ্ডলোর্দ্ধগ কূর্চ্চম্। বিভাব্য বজ্রমেতেন প্রাকারং দশদিগ্ তম। চিন্তয়েৎ বিমলাত্মানং দেবতাময়ম॥"]। কূর্চ্চবীজ = হুং।]

তার পর, "আং হুং ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে আত্মরক্ষা করতে হয়। (আং= ব্রহ্মের ব্যাপ্তি ভাব, হুং = কূর্চ্চ বীজ, ফট্ = অস্ত্রবীজ—ব্রহ্মভাবরূপ তেজোময় অস্ত্রদ্বারা আত্মরক্ষা করতে হয়)। প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকন্যাসের পর গুরুর বাহ্য পূজা। তার পর গন্ধ পুষ্প দিযে, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্ পাল, গণেশাদি পঞ্চ দেবতা, দশমহাবিদ্যা, দশাবতার, পঞ্চাশদ্বর্ণ, প্রতিপদাদি তিথি, অমাবস্যা পূর্ণিমা ও উপস্থিত ঘরে যদি কোন দেব প্রতীক থাকেন—প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক পূজা করতে হয়। তার পর ইষ্ট পূজা। পীঠন্যাস করার পর মূল মন্ত্রের বীজ উচ্চারণে দেবতার ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস, পীঠ দেবতা ও পীঠ শক্তির পূজান্তে কূর্ম্ম মুদ্রায় হাতে ফুল রেখে ধ্যান করতে হয়, ধ্যানান্তে মূলাধার হ'তে কুণ্ডলিনীকে ব্রহ্মপথে অর্থাৎ সুষুম্নাপথে সহস্রারে পরমাত্মায় যুক্ত ক'রে তাঁকে হৃদয়াষ্টদল পীঠে এনে মূলমন্ত্র দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা ক'রে—'যং'-এই বায়ুবীজ উচ্চারণে বাঁ নাকের নিঃশ্বাসে, ইষ্ট ঐ ফুলে অধিষ্ঠিত হলেন ভেবে ফুলটি যন্ত্রোপরি রেখে পূজা করতে হয়। ইহাই 'আবাহন'। পূজান্তে যন্ত্র হ'তে ফুল নিয়ে ঐ রকমে ফুলস্পর্শ করলেই হয় 'বিসর্জ্জন', অর্থাৎ ইষ্ট যে স্থান হ'তে এসেছিলেন, আবার সেই স্থানে স্থিত হলেন। অন্তরটা বাইরে এসেছিল, প্রকাশ হয়েছিল মাত্র। হাতে নাতে না করলে এসব শুষ্ক মনে হয়, ঠিক বোঝাও যায় না। পূজার সংক্ষেপ বিধিও আছে। অসমর্থ পক্ষে ও আপৎকালের জন্যও বিধি আছে। সব দেবতার পূজা একই ক্রমে হয় না—সামান্য এদিক ওদিক আছে। বিষ্ণুপূজায় ন্যাস ও মুদ্রার প্রভেদ আছে।

মানসপূজায় বাহ্য পূজার দরকার নেই, কারণ, মানসপূজারই বহিরঙ্গ বাহ্য পূজা। গুরুর মানসপূজা যে রকম, সেই রকম ক'রে সর্ব্বদেবতার মানসপূজা করা যায়। মানসপূজাও বিভিন্ন প্রকারের। পূজার প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক বস্তু, কি ভাবে গ্রহণ করতে হয় তা জানা চাই। ইহারই নাম 'বাসনা'। তন্ত্র বলেন, বাসনা-জ্ঞান পূজার প্রধান কথা। পূজায় যার যা ভাব, সেই ভাব আশ্রয় ক'রে গুরুপদিষ্ট মার্গে অগ্রসর হ'তে হয়। তন্ত্র আরো বলেন, যে পূজার যে মন্ত্র যে আচার তাহাই শ্রেষ্ঠ—এটা ভুল, ওটা ঠিক, ইহা নয়, 'বাসনা' জানা থাকলে সাধক নিজের ভ্রান্তি নিজেই বুঝতে পারেন। তন্ত্রে প্রত্যেকটির 'বাসনা' অর্থাৎ প্রত্যেকটি চিন্তার মূল সূত্র ধরিয়ে দেওয়া আছে, যাতে চিন্তার অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি থাকে, যেমন অদ্বৈত সাধককে 'নেতি, নেতি' চিন্তার মূল সূত্র 'নেদং যদিদং উপাসতে' প্রভৃতি ধরিয়ে দেওয়া আছে। মানস পূজা হ'তে বাহ্য পূজার 'বাসনা' জানা যায়।

[যথা :—"হৃৎপদ্মাসনং দদ্যাৎ সহস্রারাচ্যুতামৃতৈঃ। পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘং নিবেদয়েৎ॥ তেনামৃতেনাচমনীয়ং স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতম্। আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং গন্ধন্তু গন্ধতত্ত্বকম্॥ চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং, ধূপং প্রাণান প্রকল্পয়েৎ। তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থে, নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিঃ। অনাহত ধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরং। সহস্রারং ভবেৎ ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকম্। নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনস্তথা। সুমেখলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধ তথা। অমায়াদৈভার্ভাবপুষ্পৈরর্চ্চয়েৎ ভাব গোচরাং। অমাৎসর্য্যং অলোভঞ্চ দশপুষ্পং বিধুর্বুধাঃ॥ অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পং ইন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। দয়া পুষ্পং ক্ষমা পুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমং। ইতি পঞ্চদশ ভাব পুষ্পৈঃ সংপূজয়েৎ শিবাং। কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দত্ত্বা প্রপূজয়েৎ॥ স্বর্গে মর্ত্তে চ পাতালে গগনে চ জলান্তরে। যদযৎ প্রমেয়ং তৎ সর্ব্বং নৈবেদ্যার্থং নিবেদয়েৎ॥ পাতাল ভূতল-ব্যোম-চারিণো বিঘ্ন কারিণঃ। তাং স্তানপি বলিং দত্ত্বা নির্দ্বন্দ্বো জপমারভেৎ॥" (কৌলাবলী তন্ত্র দ্রঃ)। পাঠান্তর ও দৃষ্ট হয়, কিন্তু অর্থ সব একই।]

দেবতাময় হ'য়ে দেবপূজা করতে হয়। সেই জন্য পূজায় পঞ্চশুদ্ধি দরকার। আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি ও দেবশুদ্ধি—এই পঞ্চশুদ্ধি চাই। আত্মশুদ্ধি হয় বাহ্যস্নানে, মন্ত্রস্নানে, ভূতশুদ্ধিতে,

প্রাণায়ামে ও ষড়ঙ্গ ন্যাসাদিতে। স্থানশুদ্ধি হয় মার্জ্জনে, পূজাস্থান ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে, ধূপ-দীপ জ্বেলে ও পুষ্পাদিতে ভূষিত ক'রে। মন্ত্রস্নান হয়, গুরুমুখে শুনে সাধকের উপযোগী মন্ত্রস্নান-মন্ত্রের অর্থ চিন্তা দ্বারা। মন্ত্রশুদ্ধি হয় অনুলোম বিলোমে মাতৃকাবর্ণ গ্রথিত ক'রে ইষ্ট মন্ত্র জপে ও মন্ত্রার্থ চিন্তায়। দেবশুদ্ধি হয়, ইষ্টমন্ত্র ভাবনায় হৃৎস্থিত আনন্দ ও আত্ম-জ্যোতিতে দীপ্তাত্মা হয়ে। পূজার ঠিক্ পূর্ব্বে, দেবতার অঙ্গে তিনবার প্রোক্ষণ করতে হয়—আত্মজ্যোতিই পূর্ণজ্যোতিতে প্রক্ষেপ (স্বাহা)। দেবশুদ্ধি পূর্ণ হয় তখন। দেবতাময় হওয়া মানে তদ্ভাবে ভাবিত হওয়া।

[ম্যাডাম ক্যালভে যখন কলিকাতায় আসেন, তখন বেলির বাড়ীর শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ বসু জন্ ডিকেনসনের জে কে দত্ত মহাশয় ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত ⁄পূর্ণচন্দ্র ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাডামের কাছে যাওয়া হয়। স্বামীজির কথায় ম্যাডাম যা বলেন তা স্পষ্ট সকলের স্মরণ আছে। তিনি বলেন "স্বামীজি ক্রপদ ভালবাসতেন। এই রকম সুর (উঁ আঁ করে কণ্ঠে ভেঁজে দেখালেন)। আমি সে সব শুনেছি। মাদ্রাসে ভারতীয় গান শুনেছি। বাঙ্গলার বিশেষত্ব শুনতে এসেছি। স্বামীজির কত কথা বলব? আমাদের (পাশ্চাত্যের) সুর বা গান না জানলেও অতি অদ্ভুত ক্ষমতা দেখেছি তাঁর। সেই একটি গান আমাদের গাওয়া হ'তে লাগল, তিনি বিভোর হয়ে শুনে তার মূল তত্ত্ব তৎক্ষণাৎ বুঝে নিলেন ও কণ্ঠে প্রকাশ করলেন।" স্বামীজির প্রতিভার কথা ছেড়ে দিলেও, ইহা তদ্ভাবে ভাবিত হওয়ার অর্থ প্রকাশক। সাধনার অভ্যাস এই জন্যই চাই। ম্যাডামের কথা:—সকলেই রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচিত লোক শুনে বেলুড় মঠ দর্শন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই কথা হবার পর শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদবন্ধু সেন ম্যাডামের সঙ্গে পরে দেখা করেন ও বেলুড়ে নিয়ে যান। শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ দত্ত, হাবু বাবু (বংশী বাদক থিয়েটারের 'হাবু দত্ত') কে সঙ্গে নিয়ে সকালের সঙ্গে প্রথম দিনের পর দিনে ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে বাঙ্গালার কীর্ত্তন শোনান হয়নি, বাউলও শোনান হয়নি। ম্যাডাম ফরাসী ভাষায় কথা বলতেন। তাঁর একজন সহচর ইংরাজিতে অনুবাদ ক'রে সকলকে বুঝিয়ে দিতেন।]

তন্ত্র রহস্য ।

তন্ত্র বা আগম সাধাবণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—শৈবাগম, শাক্তা-গম ও বৈষ্ণবাগম। শিব ও শক্তি অভিন্ন, সুতবাং শৈব সাধকেব সঙ্গে শাক্ত সাধকেব অমিল নেই, ভাবভেদে মাত্র নাম প্রভেদ। বৈষ্ণবাগমকে পঞ্চবাত্র বলে। ঐ সমস্ত আগমেব বহু উপবিভাগ আছে। বাঙ্গলাব শাক্ত সম্প্রদায ও কাশ্মিব বা উত্তব পশ্চিমেব তন্ত্র সাধকেবা অদ্বৈতবাদী। তাঁবা জীবাত্মা ও পবমাত্মাব অভেদত্ব স্বীকাব কবেন অর্থাৎ জীব ভাব বর্জ্জিত হ'লে আত্মা পবমাত্মায় লীন হন। তাঁদেব মতে, আত্মা, মানবদেহে চৈতন্য শক্তি, কিন্তু আত্মা দেহ ও মনরূপ শক্তিব আববণে আববিত, মূলশক্তি —ব্রহ্মচৈতন্য বা আত্মাব স্বরূপ। অতএব, সাধন দবকাব এই আববণ সবাবাব জন্য। সাধন দ্বাবা এই অন্তর্নিহিত শক্তি জাগাতে হবে। ভাবতময়, শক্তি উপাসকেবা বাঙ্গলাব মত অনুসবণ কবেন। কাশ্মিব শৈব সিদ্ধান্ত ও পঞ্চবাত্র বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শাবদা-তিলক (তন্ত্র) বিশিষ্টাদ্বৈতমত পোষণ কবেন। বাঙ্গলায়, এই তন্ত্রেব ও খুব আদব আছে। বেদে সব মতই দেখতে পাওয়া যায়। বেদেব বিভিন্ন ব্যাখ্যা-কাব আছেন, যেমন শ্রীশঙ্কব অদ্বৈতমত ব্যাখ্যা কবেছেন, শ্রীবামানুজ কবেছেন বিশিষ্টাদ্বৈতমত, শ্রীমাধ্ব কবেছেন দ্বৈতমত, সেই বকম তন্ত্রেব ও নিজস্ব ব্যাখ্যা আছে, তাব বৈশিষ্ট্য ও আছে। সাধনায় সিদ্ধিলাভ তাবিখে হয় না, অষুধেব গুণাগুণ তাবিখে জানা যায় না। এ ছাডা কতকগুলি বৌদ্ধতন্ত্র আছে, মহাচীন হ'তে আগত মহাচীনাচাবও আছে। আবাব মাতঙ্গতন্ত্র বা মৃগেন্দ্রতন্ত্রেব মত সাধাবণ তন্ত্র ও আছে। বিভিন্ন সাধনাব বিভিন্ন ভাব, বিভিন্ন নাম, কিন্তু সকলকেই কতকগুলি সাধাবণ সাধনাচাবেব মধ্য দিয়ে যেতে হয়—মন্ত্র, বীজ, যন্ত্র, মুদ্রা, ন্যাস, ভূতশুদ্ধি, কুণ্ডলীযোগ প্রভৃতি। পঞ্চবাত্র, 'লক্ষ্মী', 'শক্তি', 'ব্যূহ', 'সংকোচ' বলুন, আব অপবে 'ললিতা', 'ষোডশী', অথবা অন্য কেহ 'তত্ত্ব', 'মহাকালী 'কঞ্চুক' বলুন, তাতে কি এসে যায় ? ক্রিয়া, চর্য্যা, আহ্নিক, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ইত্যাদি সকলেবই। শক্তি আগমেব একটি আচাবেব নাম 'সময়াচাব', উচ্চাঙ্গ সাধনাব সময় 'সময়াচাব' কতদুব পর্য্যন্ত অবলম্বনীয় তা বলা আছে।

দক্ষিণাচারে ও বামাচারে পার্থক্য স্পষ্ট। দক্ষিণ—মোক্ষের অনুকূল; বাম—ভোগমূলক বা প্রতিকূল। দক্ষিণাকালীর দক্ষিণপাদ স্থাপন ও বামা কালীর পদস্থাপনের রীতির পার্থক্য ও এইজন্য। বামাচার যে সব অবস্থায় মোক্ষের প্রতিকূল, তা নয়। ব্যাপক লক্ষণে বামাচারের অন্তর্গত অনেক আচারই পড়ে। বামাচার সম্বন্ধে সাধারণের ঠিক্ ধারণা নেই। যাকে বামাচার বলা হয়, তার মধ্যে ভারতীয় সাধনাচার ও বৌদ্ধ বামাচারে মূল ভাবগত প্রভেদ বর্ত্তমান। বৌদ্ধ বামাচার, ভারতীয়, বিশেষ বাঙ্গলার, তন্ত্রের মধ্যে এমন জগা খিচুড়ি হয়ে আছে এখন যে পণ্ডিত ও সাধক-কুলের দুটিকে সম্পূর্ণ পৃথক ক'রে দেখান উচিৎ। এই জগাখিচুড়ি বা বামাচারকেই অনেকে ভ্রমবশতঃ নাম দেন তন্ত্র। বায়ুসংহিতা বলেন যে শৈবাগমের কতকগুলি বেদসম্মত হ'লেও, কতকগুলি আবার স্বতন্ত্র ভাব আশ্রয় করেন। মহামতি উডরফ সাহেব ঠিকই বলেছেন যে শাস্ত্র বা তন্ত্র নিজের সম্বন্ধে কি বলেন ও অপরে সেই শাস্ত্র সম্বন্ধে যা বলেন, এই দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা বোঝা উচিত, সকল তন্ত্রই শ্রুতির অনুগামী, যদিও ব্যাখ্যা নিজস্ব।

'যা হেথা আছে, তা সেথা আছে'। তন্ত্র বলেন 'যা এখানে নেই, তা অন্যত্র ও নেই।' শৈবশাস্ত্র বলেন, "বাইরে প্রকাশ দেখা যাচ্ছে, কারণ তা ভিতরে আছে।" আমাদের জ্ঞান সসীম। কিন্তু জ্ঞান, প্রকাশক, কারণ, সর্ব্বপ্রকাশক—জ্যোতিঃস্বরূপ চিৎ অন্তরে আছেন। আমাদের সুখ দুঃখ আছে, কারণ সুখদুঃখের মিলনস্থান—সুখদুঃখ হীন 'আনন্দ' আছে। আমাদের সমস্ত ভূয়োদর্শন, আমাদের সর্ব্বপ্রকার বোধ বীজ-রূপে আছে। দ্বৈতময় জগতে, 'অহং', 'ইদং' রূপ দুটো বোধই রয়েছে, অতএব ঐ দুটোর ভেদকস্থানে ঐ দুটি মিলিতাবস্থায় রয়েছে। বীজের মধ্যে বৃক্ষ না থাকলে বৃক্ষ হয় না, যা 'কার্য্যে' থাকে তা কারণেও বর্ত্তমান। এই অহং ইদং এর মিলন স্থানই 'পরশিব' বা 'পরাসম্বিৎ'; কিন্তু, সেখানে 'ইদং' আমাদের লৌকিক বোধের 'ইদং' নয়। আমাদের 'ইদং' মায়াশক্তির দ্বারা আবরিত। মায়াশক্তি, শক্তির একটি রূপ, অতএব 'জড়' নয়, আমাদের ইদং মানে, যেন শক্তি নিজেকে ঘোমটা দিয়ে ঢেকেছেন। অতএব, পরাসম্বিদে বীজরূপে বর্ত্তমান (১) প্রকাশ

(চিদাকাব), (২) বিমর্শ শক্তি। এই বিমর্শ শক্তিতে 'ইদং' বীজ বয়েছে —এই 'ইদং' বীজই' জগৎ রূপে পবে বিবর্ত্তিত হয়। জগৎ সত্য, ইহা ও শক্তিব রূপ। 'অমর্শ' বা পবা অবস্থায় বিমর্শ শক্তি দুই ভাবে বর্ণিত=(১) চিদ্রূপিণী, (২) বিশ্বাত্মিকা। শিবশক্তিব নির্গুণাবস্থায় চিৎ ও চিদ্রূপিণীব পূর্ণ মিলন—সমবন্ধাবস্থা। সেখানে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী এক। পঞ্চবাত্রেব বৈষ্ণবতন্ত্র বলেন যে সেটি (ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীব একত্ব) মহাশক্তি লক্ষ্মী ও বাসুদেবেব অভেদাবস্থা—অপ্রকাশাবস্থা—অন্ধকাব, শূন্যতা (বেদেব অসৎ)। শারদাতিলকে, টীকাকাব বাঘব ভট্ট বলেন যে ঐ অবস্থা, শক্তিব 'অনাদিরূপা চৈতন্যাধ্যাসেন' মহা-প্রলয়ে সূক্ষ্ম স্থিতি। পঞ্চবাত্র বলেন যে "অতিসঙ্গ ক্লেশাৎ", নাবায়ণ ও তাঁব শক্তি 'একত্বইব' হলেন— —আত্মাবাম। প্রকৃতিব পবিণাম, আমাদেব দৃষ্টিতে জগতে যেমন বোধ হয়, বিশুদ্ধ শিবশক্তি তত্ত্বে সে বকম হয় না। দুধেব পরিণাম দই— দুটি ভিন্ন বস্তু আমাদেব দৃষ্টিতে, শিবশক্তিতত্ত্বে—'আভাস'—সূর্য্য ও সূর্য্য হ'তে বিচ্ছুবিত কিবণ—"যেই সূর্য্য, সেই কিবণ"—একই সর্ব্বাবস্থায়। এই অবিকৃতি ভাবই 'বীর্য্য'—এক প্রদীপ হ'তে অন্য প্রদীপ। এই আভাস ও বিবর্ত্ত কিন্তু 'সদৃশপবিণাম'। 'সদৃশপবিণাম' সাংখ্যেব কথা হলেও, তত্ত্ববর্ণনায ঐ কথাটি মাত্র গৃহীত হয়েছে। ৩৬তত্ত্ব, শাক্ত ও শৈব আগমে একই ভাবে গৃহীত, একমাত্র পঞ্চবাত্র 'আভাস' সম্বন্ধে নাবায়ণেব চাবটি রূপ ধবেছেন—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। ইহাই 'চতুর্ব্যূহ'।

পবাসম্বিৎ—নির্গুণ ব্রহ্ম ; শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব—সগুণ ব্রহ্ম। এই দুই তত্ত্ব হ'তে প্রথম প্রকাশ হন 'সদাশিব' বা 'সদাখ্যতত্ত্ব'। সদাশিবে মাত্র 'অহমস্মি' বোধ স্ফুবিত। তাবপব অহং ইদং পৃথক হয়। শক্তিতত্ত্ব, নিষেধাত্মক— 'নিষেধব্যাপাবরূপা শক্তি' ; পূর্ণজ্ঞানেব নিষেধ অর্থাৎ সংকুচিত হ'য়ে সীমাবদ্ধ —বিশ্বরূপে প্রতিভাত হ'তে যাচ্ছেন। শিবশক্তিতত্ত্বেব শিব=প্রকাশ, শক্তি-তত্ত্ব=বিমর্শ, যাঁব গর্ভে বিশ্ববীজ। জীবেব 'ইদং'—বাইবেব বস্তু অর্থাৎ অহং হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক। সদাখ্য তত্ত্ব হ'তে, 'ঈশ্ববতত্ত্ব' ও 'শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব' পর্য্যন্ত ইদং—'অহং' এবই অঙ্গ, পৃথক নয়। ইহাব পবেই হয় পৃথক— 'ইদং,, 'অহং' এব সামনে 'ধ্যামলপ্রায়ং' ; 'কঞ্চুক', এই ক্রিয়াশক্তিব রূপ। কঞ্চুক হ'তে জ্ঞান সসীম হয়, (১) কাল—পবিচ্ছেদকাবী শক্তি, (২) নিয়তি

—স্বাতন্ত্র্য বোধ আনায়, (৩) রাগ—প্রথম জাগ্রৎ করে ঔৎসুক্য, আগ্রহ হয় ও আসে আসক্তি। পরা অহংই 'পরাহন্তা'—সৃষ্ট্যোন্মুখী অহং। স্বরূপ অবস্থায় শক্তি চিদ্রূপিণী। তিনিই ঘনীভূতাকারে জড়রূপে প্রতিভাত আবার তিনিই সকলের প্রাণশক্তি। মায়া, কাল, নিয়তি, রাগ, বিদ্যা, কলা—এই ছয় কঞ্চুক। মায়া ও অন্যান্য কঞ্চুকের ক্রিয়ায় শক্তির সংকুচিতাবস্থার নাম 'প্রকৃতিতত্ত্ব'। 'পুরুষতত্ত্ব' সংযোগে ইনিই 'হংস'। হংস—পুং ও স্ত্রী উভয়ই (হং=শিব, স=শক্তি)। এই হংসদ্বয়ের ঘনাবস্থা=বিশ্ব। কঞ্চুকাবৃত আত্মা=পুরুষ। মায়া ভেদবুদ্ধি আনায়। চিৎ বা আত্মার মধ্যে খণ্ডবুদ্ধির মূলে আছেন মায়াশক্তি। স্বচ্ছন্দতন্ত্র বলেন, মায়াশক্তির প্রভাবে, প্রতি পুরুষের আছে জগৎ, প্রত্যেকের নিজের। নিত্যতার মধ্যে 'পরিচ্ছেদ' আসে—জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ চলে। এই নিয়ত পরিচ্ছেদ—পরিচ্ছেদ প্রবাহ বা পরিচ্ছেদের শৃঙ্খলা 'কালতত্ত্ব' রূপে প্রতিভাত হয়। 'কাল', সেই শক্তি যা উত্তেজনা দিয়ে বস্তুর পরিপক্কতা আনায় বা পূর্ণাঙ্গ করে। এই 'কাল', মানে আমাদের 'সময়' নয়। ইহা 'অখণ্ডকাল' যা হ'তে জাত হয় 'ক্রিয়াকাল'। স্থূল-তত্ত্বের উদয়ে দেখা দেয় কালের স্থূল ভাব—'সকল কাল'। 'সকল কাল' অংশে অংশে দৃষ্ট হয—সময। সংজ্ঞারূপা শক্তি সংকুচিত হয়ে ঐহিক চিন্তারূপে আনে 'স্বতন্ত্রতা'। পুরুষ', সময়ের নিয়মাধীনে চলতে বাধ্য হন—স্বতন্ত্রতার সংকোচে। এখানেও বলপূর্ব্বক বিপরীত রতি! পূর্ব্বে যিনি ছিলেন 'পূর্ণ', যাঁর অভাব বোধ ছিল না, যিনি নিত্য পরিপূর্ণ তৃপ্তি স্বরূপ ছিলেন, সংকুচিত হয়ে ভোগ সমূহের দ্বারা বঞ্চিত হ'য়ে—তদ্‌ভাবে বঞ্চিত হয়ে পড়লেন। ইহাই 'রাগতত্ত্ব'। দ্বৈতবোধ উদয় হলেই, আসে পৃথকত্ব বোধ, আসে 'অন্যের' উপর আসক্তি। আমাদের দিক্ হ'তে 'ইচ্ছা' বা বাসনা মানে, পূর্ণতার অভাব। 'পরাইচ্ছা' মানে সৃষ্টি অভিমুখী চেতন গতি বা তৎপরতা—বস্তু নিচয়ের উপর কুতূহল জন্মাবার পূর্ব্বাবস্থা। 'রাগ'ই ইচ্ছায় পরিণত হয। এই ইচ্ছা মানে পূর্ণত্বের সংকোচ। সর্ব্বকর্তৃত্ব সংকুচিত হয়ে কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব আসার নাম 'কলা'। কলার মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে দুইরূপে—কর্তৃত্ব ও তার বিশেষণ ভাগ='কিঞ্চিৎ'। এই দ্বিত্ব বোধ আগমনের সঙ্গে উদয হয় যেটি তার

নাম, প্রকৃতি তত্ত্বে 'সামান্য মাত্রা'—সেখানে সুখ দুঃখ মোহাদি গুণের পৃথকত্ব বোধ নেই।

'কর্তৃত্ব' মানে, সৃষ্টি তৎপরতা, কল্পনা, রূপদান প্রভৃতি। 'ইদং' কে রূপান্তরিত করবার ক্ষমতাই কর্তৃত্ব। 'জ্ঞাতৃত্ব'—উদাসীন, অকার্য্যকর। সাংখ্য মতে পুরুষ ভোক্তা—কর্ত্তা নন্। কিন্তু শৈব শাক্ত মতে, কর্তৃত্ব ভিন্ন ভোক্তৃত্ব হয় না। বীজরূপে সাম্যভাবে বর্ত্তমান 'পরাসম্বিদে', জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, কর্তৃত্ব—কোনটি পৃথক ভাবে নেই। 'শিবশক্তি তত্ত্বে' মাত্র জ্ঞাতৃত্ব আছে—আর দুটি—শক্তির বলে দমিত। 'সদাখ্যতত্ত্বে' জ্ঞাতৃত্ব আছে, আর দুটি-প্রবর্ত্তক মাত্র। 'ঈশ্বরতত্ত্বে' ঐ তিনই বিকশিত—উন্মীলিত—কিন্তু ভেদ-বোধ-শূন্যাবস্থায় স্থিত। ঈশ্বর-চেতনা, ইদমাভিমুখী হলেও, অহং এর সমান সমাদর থাকে। এই 'ইদং' ই 'সদ্বিদ্যাতত্ত্ব'। সদ্বিদ্যাতত্ত্ব হ'তেই মায়া ও কঞ্চুকাদির আবির্ভাব হয়—যা পুরুষ প্রকৃতিরূপে বিবর্ত্তিত হয়।

অভেদ তত্ত্ব বুঝতে গেলে নানা দিক্ দিযে বুঝতে হয়—মন অভেদভাব ধরতে পারে না সহজে। তাই ক্রম দেখাতে হয়। শিব ও শক্তি অভিন্ন। জাগতিক দৃষ্টিতে দুটি প্রধান ভাব আমরা বুঝতে পারি—নিষ্ক্রিয়ত্ব ও সক্রিয়ত্ব। দুই দেখি, সুতরাং দু ভাবে বোঝবার চেষ্টা করতে হয়। মায়া শক্তিরূপা সলিলে প্রতিবিম্ব পড়ে, সুতরাং ঐ প্রতিবিম্ব স্ব-রূপের বিপরীত।

শিবশক্তিতত্ত্বের মধ্যে 'শক্তিতত্ত্বকে', 'ইচ্ছাশিব' ও বলা হয়। "শিব-শক্তি সমাযোগাৎ জাযতে সৃষ্টি কল্পনা"—এই পরস্পরের সংযোগ ও সম্বন্ধই 'নাদ'; সম্বন্ধটি যখন শিব-শক্তি ভিন্ন নয় তখন 'নাদ' মানে 'শিব-শক্তির বীর্য্য অবস্থা হ'তে কল্পনার দিকে গতি'। এই গতির ফল—বিশ্বের প্রকাশ। শিব—নিষ্ক্রিয়, শক্তি—সক্রিয়া। নাদ = ক্রিয়াশক্তি। শিব শক্তির মৈথুনই 'নাদ', আর মহাকাল মহাকালীর বিপরীত মৈথুনই 'বিন্দু'। যেখানে 'দুই' বোধ পৃথক নেই—যেটি 'এক'—সেখানে সুতরাং ক্রিয়া নেই। শব্দ প্রকাশের পূর্ব্বে দুই চাই। দুই হ'তে তিন হয়—যা মায়িক জগতের ত্রিমূর্ত্তিরূপে প্রতিবিম্বিত হয়—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র।

ধোলো পণ্ডিতেরা ও আমাদের ধোলো ভাবে ভাবিত ধোলোধারীরা 'মৈথুন' 'বিপরীত রতি' প্রভৃতি শব্দ নির্ব্বাচনে ঘোর আপত্তি করেন। তাঁরা বলেন, "কেন ও রকম চিত্র ধরা হয়, হলই বা সূক্ষ্মভাব?"

[একটা গল্প মনে পড়ে। একজন মাথা পাগলার, নারী জাতির উপর অত্যন্ত ঘৃণা ছিল, আর সর্ব্বোপরি তাঁর ঘৃণা বিরক্তি ছিল পতিতাদের প্রতি। একদিন তিনি বাসে (Bussএ) চড়েছেন। এই সময়ে তাঁকে শোনান হয় যে বাসের নাম 'মেনকা'। এখন 'মেনকা' থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেত্রীর নাম; আবার, মেনকা, স্বর্গবেশ্যার ও নাম। পাগল :—আমি কি বেশ্যার উপর চড়েছি?" ধোলো যুক্তি ঐরকম]।

মনে রাখতে হবে যে শিব ও শক্তি, পুং স্ত্রী রূপে বর্ণিত হলেও, কি অধিকার আছে, চিকিৎসা শাস্ত্রের, সমাজতত্ত্বের, জীবতত্ত্ব আদির অর্থ অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার? তন্ত্রশাস্ত্র স্পষ্ট বলেছেন বারবার যে শিব-শক্তি পুরুষ ও নয় জড় ও নয়। বিদেশী মনীষী উডরফ যা বুঝেছেন তা আমাদের ধুরন্ধেরাও বুঝতে পারেন না। ঐ গুলি তন্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। ঐ রকম শব্দ নির্ব্বাচন সমস্ত আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই রয়েছে, কি বৈষ্ণব সাহিত্যে, কি অন্যত্র। তা ছাড়া, ঐ রকম শব্দ ভিন্ন, ভাবপ্রকাশের অন্য শব্দ কোথায়? অন্য শব্দ গঠন করতে যাঁরা পারেন তাঁরা করুন না? সমুদ্র-মন্থনের কথা পূর্ব্বে বলেছি, ঐ অবস্থাও একটা মহা মন্থনের অবস্থা, "শক্তি সমুদ্র সমুত্থতরঙ্গং দর্শিত প্রেম বিজৃম্ভিত রঙ্গং।" 'মিলন' শব্দটিতে সম্পূর্ণভাব প্রকাশ করে না, মিলনে 'সমুত্থ তরঙ্গের' ভাব নেই। উক্ত আছে, প্রাণ শক্তি—আঘাতের পর আঘাত দিয়ে 'আকাশে' চেতনা আনেন—এ ভাবটি প্রকাশ পায় কিসে? উডরফ্ সাহেব বলেন, 'মিথসমবায়' কথাটি প্রয়োগ করলেই হয় "logical" বা যুক্তি সঙ্গত। 'মিথসমবায়' শব্দটি ঐ ভাব-দ্যোতক নয়, 'মিথসমবায়'—ঐ অবস্থারই শান্তভাব। 'মথিত হওয়া', 'তোলপাড় হওয়া'—'মৈথুন' বা 'বিপরীত মৈথুন' (মন্থন-শব্দ হ'তে) শব্দ আদিতেই—প্রকাশ পায়। যেখানে নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়—মাত্র এই দুটি ভাবের কথা, সেখানে ঐ রকম চিত্র মনে আসেই বা কেন? সেই জন্য, সাধনক্ষেত্রে, মনকে ছন্দময় করতে বলা হয়; সাধনের ভাবে মন পূর্ণ না হলে, নিত্যদৃষ্ট জাগতিক দেহ-তত্ত্বের ভাব উঁকি মারবে না ত কি? যে অর্থে যে ক্ষেত্রে যেটির প্রয়োগ নেই, সেই অর্থ গ্রহণকে তন্ত্রশাস্ত্র, 'কূটার্থ' বলেন। কূটার্থ গ্রহণ, তন্ত্রে নিষেধ—গ্রহণে অধোগতি হয় [মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—১১উ—১৬৯]।

ঐ সব বর্ণনা একটি বিচার নয়—সাধক এগুলি সাধন দ্বারা প্রত্যক্ষ করবেন, উপলব্ধি করবেন। সাধারণতঃ ঐ সব উচ্চাঙ্গের সাধনায়, সাধক প্রধানতঃ 'ভাবনা' দ্বারা পূজা করবেন (ভাবনা = পূজা বা মানসপূজা) ও কেহ কেহ চিন্তার সহায়তার জন্য প্রতীক অবলম্বন করবেন। ঐ সব প্রতীক, ব্যক্তিগত, সুতরাং গোপনীয়। সংসারক্ষেত্রে, সাধারণ ব্যাপারেও, অনেক জিনিষ ক্ষেত্র বিশেষে গোপন করতে হয়। ছোট ছেলেদের হাতে যাতে নভেল নাটক না পড়ে তার জন্য সাবধান হ'তে হয়. স্বামী স্ত্রীর কথোপকথন যুবক সন্তানের নিকট অনেক গোপন রাখতে হয়, বৈষয়িক পরামর্শও যাতে প্রকাশ না হয় সেজন্য সতর্ক থাকতে হয় ইত্যাদি। তবে ইহাও ঠিক যে ঐ সব অঙ্কিত চিত্রের প্রচার বা সাধারণের কাছে প্রকাশ নিশ্চয়ই আপত্তিকর ও দূষনীয়।

তন্ত্ররহস্য—২। (মন্ত্রবিদ্যা)

'নাদ' হতে 'বিন্দু'। 'বিন্দু' মানে ফোঁটা নয়। প্রলয়ে, বিশ্ব বিন্দুতে পরিণত হয়—আমরা বলি। এই বিন্দু জ্যামিতির বিন্দুর মত ; সমস্ত বিশ্ব গুটিয়ে একটি সূক্ষ্ম অবস্থায় পরিণত হয়, এটাকে ও বিন্দু বলা যায়। 'নাদ' (সমরস্কের 'উল্লাস') হ'তে যে বিন্দুর উদ্ভব হয়, সেখানে দেশের (spaceএর) কোন সংস্কার নেই। চেতনা বা শক্তির একটা দিক্—একটি দৃষ্টিই (ঈক্ষণই) বিন্দু। শক্তিগর্ভে, 'ক্রিয়াশক্তির' বীজের নাম 'নাদ' ও 'বিন্দু'—শক্তির একটা অবস্থা। সৃষ্টির জন্যই শক্তির ঐ দুই 'উপযোগাবস্থা' হয়। শক্তির ঘনাবস্থাই বিন্দু। শক্তিতত্ত্ব ও নাদের মধ্য দিয়ে শক্তির ক্রম-সূক্ষ্ম গতিতে পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তির ঘনত্ব হয়। এই অপেক্ষাকৃত ঘনাবস্থায় প্রকাশের পূর্ণ তৎপরতা থাকে। ইহাই 'মহাবিন্দু' বা 'পরাবিন্দু'। যে সব অন্যান্য বিন্দুর উদ্ভব হয়, তাদের সঙ্গে পার্থক্য দেখাবার জন্যই ঐ রকম নাম দেওয়া হয়। তোড়লতন্ত্র বলেন, দিব্যজ্যোতি বা পরা জ্যোতি আকার হীন ; কিন্তু বিন্দু—শূন্য ও গুণ, দুই বোঝায়। গুণ, ব্রহ্মশক্তির সৃজনী শক্তি। এই বিন্দুই ঈশ্বর ; পুরাণে কেহ কেহ বলেন 'মহাবিষ্ণু', কেহ কেহ বা 'ব্রহ্মপুরুষ' বলেন। শক্তি নানারূপ ধারণ করেন, তবুও সর্ব্বাবস্থায়—তাঁর স্বরূপের বিচ্যুতি হয় না।

শক্তিতত্ত্ব অবিকৃত থাকলেও আমরা 'নাদ' ও 'বিন্দু' রূপে তাঁকে বোঝবার চেষ্টা করি, নানাভাবে বর্ণনা করি—আমাদেরই সুবিধার জন্য। প্রপঞ্চসারতন্ত্র বলেন, 'পরবিন্দু' দ্বিধা বিভক্ত হলে, 'দক্ষিণেস্থিত' বিন্দু = পুং বা হং, বামেস্থিতটি 'বিসর্গ' = প্রকৃতি (স্ত্রী) অর্থাৎ 'সঃ' = 'হংস'। 'বিন্দু' কাল দ্বারা ভিন্ন হলে, 'বিন্দু', 'নাদ' ও 'বীজ' রূপে প্রতিভাত হয়। বিসর্গ মানে বিন্দুদ্বয় (ঃ)। বিন্দুদ্বয়ে শিববিন্দু যুক্ত হলে, বিন্দু হয় তিনটি। হং = শিব, সঃ = শক্তি; এই শিব-শক্তির সম্বন্ধই 'নাদ' (শারদাতিলক)। 'পরবিন্দু'—অবিভক্ত ও অভিন্ন শিব-শক্তির দিক্। বীজের স্ফোটনই 'পরবিন্দু'—তিনরূপে অভিব্যক্ত :—(১) শিব বা বিন্দু, (২) শক্তি বা বীজ, (৩) শিব-শক্তি-ভাব। সৃষ্টি ক্রিয়ায়, শক্তির বিভিন্ন দিক্ দেখান হয়েছে, যথা, নাদ = শিব-শক্তি সংযোগ। উহার সম্বন্ধ, 'ক্রিয়াশক্তি স্বরূপ'। ইহারই সার = 'কুণ্ডলী' বা 'কুণ্ডলীময়'। অতএব তন্ত্র বলেন, নাদ বিন্দুর মধ্যে নাদ = মৈথুন = শিবযোগ + শক্তিযোগ। যদিও গুণগুলিকে স্থূল শক্তি-প্রকৃতির কার্য্যকর প্রতিনিধি ব'লে মনে হয়, সূক্ষ্মাবস্থায় তারা সূক্ষ্মতর শক্তির অন্তর্গত।

[Arthur Avalon (উড্রফ সাহেব) মন্ত্রতত্ত্ব আলোচনা অনেক স্থানেই করেছেন। এক স্থানে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর এক নামহীন গ্রন্থের কথা বলেছেন। (Work published in the 18th century by one of the 'French Protestants of the Desert' called Le Mysterie de la croik, গ্রন্থের ৯পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলছেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে 'Punctum' অর্থাৎ 'বিন্দু' ছিল (point), এ বিন্দু এটমও নয় জ্যামিতির বিন্দুও নয়। এই একের (Monasএর) মধ্যে বহু (Myrias) বিদ্যমান—সেখানে ছিল আলো ও অন্ধকার, সৃষ্টি ও প্রলয়, পূর্ণ ও শূন্য ('every thing and nothing') সৎ ও অসৎ ('Being and non Being') অর্থাৎ সৎ বা অসৎ কিছুই ছিল না বা ঐ দুইয়ের কোনটিই নয়); গ্রন্থকার বলছেন যে উহাই 'ষটকোণযন্ত্রের' মধ্যবিন্দু ("all is engendered from the central indivisible point of the double Triangle")—ঐ মধ্য বিন্দু হ'তেই জগৎ প্রসূত হয়েছে (L Tout est engendre du point central indivisible du double Triangle)। অধ্যাত্মক্ষেত্রে এই বিন্দু ষট্‌কোনযন্ত্রের মধ্যবিন্দু বা বৃত্তাকার মণ্ডলোর্দ্ধে স্থিত। 'বিন্দু' সম্বন্ধে St Clement of Alexandria (2' century A. D.) বলেন যে কোন অবয়বকে যদি তার গুণ ও আয়তন হ'তে বিচ্ছিন্ন করা যায়, এককের থাকে মাত্র অবস্থিতি

(position), যদি ঐ অবস্থিতির ভাবকেও বিচ্যুত করা হয় থাকে মাত্র 'একক' —ভাব। শেলি তাঁর 'Prometheus' গ্রন্থে বলেন "অনন্তে ডুব দাও, দেখবে "সময়' সেখানে 'বিন্দু' হয়ে যাবে"।]

'মহাবিন্দু' বা 'পরবিন্দু' অর্থাৎ 'ঈশ্বরতত্ব', সৃষ্টিকালে—বিন্দু (কার্য্য), নাদ, বীজ—এই ত্রিরূপে বিভক্ত হন। এই ত্রিবিন্দুযুক্ত ত্রিকোণই 'কামকলা'। এই কাম স্থূল 'কাম' নয। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন,—বিন্দুরূপের স্ফূর্ত্তিই-'কাম'। কামকলাবিলাস তন্ত্র বলেন, "বিন্দন্থুবৃত্তৌ উচ্ছনং"—উচ্ছনং = স্ফূর্ত্তি। এই স্ফুরণশক্তি যেন দর্পণ, তাতে ব্রহ্ম বা 'সূর্য্য' প্রতিবিম্বিত হন; যদি দর্পণে সূর্য্যকিরণ পড়ে আর সেটি কোন প্রাচীরের গাত্রে দেখান হয়, সূর্য্য-কিরণরাশি ঐ প্রাচীরে বিন্দুরূপে দৃষ্ট হয। বিশ্বসংস্কার সমষ্টি বা বিশ্বমনই ঐ প্রাচীর, ঐ বিন্দুই 'মহাবিন্দু'। মহাবিন্দুর সংকুচিত আকার বা ব্যষ্টি সংস্কারকেও বিন্দু বলা যেতে পারে। ঐ স্ফুর্ত্তির বা 'কামের' অনুবর্ত্তন ক্রিয়াই 'রমণ' বা 'মৈথুন'। [ঋগ্বেদ (১০ম) কাম = মনের বীজ]। সাধনক্ষেত্রে সাধারণ বাঙ্গলা অর্থ বা কল্পিত অর্থ কররার স্পর্দ্ধা হয় কোন হিসাবে? কামের স্থূলভাব, "বিশ্বাকারা বিশ্বমনোবিক্ষোভ নিয়তাত্মকা" (তন্ত্ররাজতন্ত্র)। ইনি 'ভূতাত্মকা'। 'ভূতবুদ্ধি' যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই এই 'কামের' অধিকার। উক্ত তন্ত্র বলেন যে, কামের পঞ্চরূপ, (১) 'মন্মথ' (মনকে মথিত করে), (২) কন্দর্প (দাহক), (৩) মকরকেতন (মকর বা কুমীরের চিহ্ন বিশিষ্ট পতাকাধারী)। (কুমীর শিকারকে ধ'রে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে ও ঐরূপে খণ্ডে খণ্ডে তার সমস্ত শরীর খায়), (৪) মনোভব (মন-জাত কাম—সম্পূর্ণ মানসিক—মনের বলে তাকে দূর করা যায়), (৫) কামরাজ (সর্ব্বপ্রকার বাসনার রাজা)। এই 'বিশ্ববিগ্রহ' ভূতাত্মক। উপাসনায়, ভূতবুদ্ধিকে দেবতাবুদ্ধিতে পরিণত করতে হয়। (তন্ত্ররাজতন্ত্র—৭ম পটল দ্রঃ)।

'অখণ্ড পরচিচ্ছক্তি', সমস্ত তত্ত্বভাবে বিবর্ত্তি হ'তে ইচ্ছা করলে, প্রথম হন বিন্দুরূপী। ইহা ক্রিয়া প্রধান লক্ষণ। ত্রিরূপে, বিন্দু = শিবাত্মক, বীজ = শক্ত্যাত্মক, নাদ = সমবায়, সমবন্ধ। ক্ষোভক ও ক্ষোভ্যের সম্বন্ধ হেতু আসে সৃষ্টি।

তন্ত্র বলেন—সমস্তই সত্য, সমস্তই চিৎ। এই আত্মাই—বিশ্বাত্মা—চিৎ। 'চিৎ'এর অন্তর্গত বলেই, যা কিছু দৃষ্ট হয়, সবই মন্ত্র। চিৎ,

নাদরূপে বা গতিরূপে প্রকাশিত হয়—উভয়ের উৎপত্তিস্থল নাদ-শক্তি—'চিৎ' এরই এক প্রকাশ। সত্তা দ্বিবিধ—অরূপ ও রূপযুক্ত। 'অহং', 'ইদং'—এই দুয়ের, 'অহং=প্রকাশ, 'ইদং'=বিমর্শ—একেরই দুটো দিক্। শিব-শক্তি সর্ব্বাবস্থায় বিরাজ করছেন। শিব=চিৎ, শক্তি=চিদ্রূপিণী, শিব=পর, শক্তি=পরা। এই বোধই 'আনন্দ', 'স্বরূপ-বিশ্রান্তি'। এই অবস্থায়, শিবের বিশ্ববোধ 'পরাশক্তিরূপে'; ইহাই 'পরানাদ', 'পরাবাক্', ইহাই 'আত্মরতি'। কামককলাবিলাসতন্ত্র বলেন, শিব, বিমর্শদর্পণে প্রতিফলিত হলে, নিজেকে বিশ্বাত্মা ব'লে বোধ করেন, বিরাট বোধ করেন। ইহাই 'পরাহন্তা'—বহুত্বের বীজ='পরা অহং'। কামকলার বিন্দুত্রয়ের ঊর্দ্ধবিন্দু—দেবীর বদন, অন্য দুটি—জগন্মাতার স্তন। এই ত্রিবিন্দু—অর্ক-ইন্দু-বহ্নিরূপা। এই অর্ক, আকাশের সূর্য্য নয়, ইন্দু, আকাশের চাঁদ নয়, বহ্নি, আগুণ হয়। বিশ্ব দৃষ্টিতে ইহাই পরবিন্দুর প্রকাশ ও বিমর্শ দৃষ্টি, ইহা দেবীর অনুস্বার ('ম্', অনুনাসিক্) ও বিসর্গ (বিন্দুদ্বয়)—শ্বাস। (০=ম্, ঃ=বিসর্গ)। আত্মরতিতে 'ইদং' পরাশক্তিরূপে স্থিত থাকেন।

সৃষ্টি কল্পনাতেই 'মন্ত্রের' অভিব্যক্তি হয়। সেখানে 'জ্ঞানশক্তি' প্রথম, বিশ্বের সূত্ররূপে—চিন্তারূপে—প্রকাশিত হন। এই চিন্তার 'মন্তব্য', ক্রিয়াশক্তি বা নাদের মধ্য দিয়ে 'বাচ্য' রূপে স্ফুটিত হয়; তারপর বিন্দুর দ্বারা আসে পৃথক ভাব। এই পৃথক ভাব 'ম'কার রূপে জাত হয়। শক্তিরূপা 'উ'কার 'প্রমেয়' উৎপাদন করেন। পৃথকভাবে ইহা দৃষ্ট হয়। তারপর তত্ত্বগুলির বাহ্যরূপের পূর্ণতা হয় 'অ'কার রূপ প্রকাশে। শৈব দর্শনে এই 'আভাস' বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সংক্ষেপে এখানে এইমাত্র বলা যায় যে, সৃষ্টিতে, জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া—এই ত্রিশক্তির আবির্ভাব। মন্ত্রের বিভাগ এই তিনটিতে দেখান হয়—শক্তি, নাদ, বিন্দু। মায়াসংযুক্ত জ্ঞান ও ক্রিয়া হ'তে সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই তিন দেখা দেয়। পশুর মধ্যে চেতনার অভিব্যক্তি হয়—ইহাই পুরুষ-প্রকৃতির একটা ধাপ; শক্তির সৃষ্টি-চেতনা—সৃজনী চেতনা—সর্ব্বব্যাপি বিশ্বচেতনা রূপে আবির্ভূত হন (সদাখ্যতত্ত্ব)। এই ব্যাপ্ত চেতনাই (অপেক্ষাকৃত ঘনত্ব বা তার শিহরণই) 'নাদ'। এখানে 'অহং' ভাব প্রবল, কিন্তু ইদংভাববর্জ্জিত। ঐ চেতনার ইদমাত্ম বোধই

'বিন্দু'। তাবপব অহং ইদংএর 'সমানাধিকবণে' মায়াশক্তিব প্রভাবে ভেদ আসে—যাতে সমষ্টিবোধ ছিল—বহুত্বে তাতে এল ব্যষ্টিবোধ !

ওঁ কাবের বশ্মি—অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু, শান্ত। প্রপঞ্চসাবতন্ত্র বলেন—জাগ্রতই বীজ, স্বপ্নই বিন্দু সুষুপ্তিই নাদ, তুবীয়ই শক্তি, এসমস্তেব পাব 'লয়ই' শান্ত। সৃষ্টিমুখে পবম শিবেব প্রথমোল্লাস মাত্রাই 'শব্দব্রহ্ম'। সর্ব্বভূতচৈতন্যই শব্দব্রহ্ম—নাদবিন্দুময় ব্রহ্মাত্মক, অব্যক্ত শব্দ, অখণ্ড ও ব্যাপক। শব্দব্রহ্মই বিন্দুব মধ্যে ক্রিয়াশক্তিব প্রাধান্যে শব্দার্থেব কাবণ। ইহাই পবাশব্দ সৃষ্টি। কুণ্ডলিনী শক্তি চেতন শক্তিময়ী—জীবেব মধ্যে ধৃত। সর্ব্বজীবে, গদ্যপদ্যরূপে বর্ণরূপে, কুণ্ডলিনীতেই শক্তি অভিব্যক্ত হয় ও প্রকাশ হয়। 'কামকলা' সমস্ত মন্ত্রেব মূল। মন্ত্রসাধনেব উদ্দেশ্য—উপলব্ধি—সমাধিলাভ।

ঈশ্বব ও জীবেব বোধ এক বকম নয়। ঈশ্ববে—ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ; জীবে—জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া। তাই ঈশ্ববদৃষ্টিতে—বহুত্ব না থাকায়—জ্ঞান, ক্লীবলিঙ্গ। জীবে, জ্ঞান মানে বুদ্ধি, বিচাব শক্তি বা তাব ফল। এই জ্ঞান বাহিবেব জিনিষ। সাধনক্ষেত্রে এই জ্ঞান, অনুবাগ বা ভক্তিব সহায়তা না পেলে সাধনের ইচ্ছা বা সাধনে মতি হয় না। জীবেব এই জ্ঞান—পুরুষ ; ভক্তি, অন্তবে প্রবেশ কবে বলেই ভক্তি স্ত্রী।

সৃষ্টিতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়, অববোহক্রমে—উপব হ'তে নীচে ; সাধনা, আবোহক্রম—নীচে হ'তে উপবে। যে সিঁড়ি দিয়ে শক্তির বহুত্ব এসেছে, সেই সিঁড়ি ধ'বেই সাধককে একত্বে যেতে হয়। আবোহক্রমে, নীচেব ধাপ ক্রমশঃ উপবেব ধাপে বিলীন হয়। প্রত্যেক ধাপই সত্য। এই দৃষ্টিতে, একত্বে পৌছুলে—মায়া অনাদি হয়েও শান্ত। তন্ত্র, সাধন-শাস্ত্র, অতএব, এই শাস্ত্র সাধনলব্ধ উপলব্ধিব দিক্ দিয়ে সমস্ত আলোচনা কবেছেন, সাধনাতীত অবস্থা সাধনশাস্ত্রে ইঙ্গিত কবা হয়েছে মাত্র। পঞ্চদশী বলেন, শিবেব শক্তিই সর্ব্ববস্তুব নিয়ামক ও তিনি আনন্দ স্বরূপ ঈশ্ববে নিত্যযুক্ত (৩।৩৮)। ঈশ্বব-শক্তিই 'মায়া'। ঈশ্বব ও মায়া সংযোগে যত প্রকাব শক্তি উদ্ভূত হয়—সকলেব সমষ্টিরূপা ঐ 'মায়া,'ও, সে সমস্তেব পাবে ও তিনি। জগৎ ব্যাপাবেব সঙ্গে সম্বন্ধ ঈশ্বব ও মায়াব, অতএব শান্ত অবস্থায় মায়াও শান্ত বা স্থিব। তন্ত্রশাস্ত্রে মায়া একটি শক্তি। শ্রীশঙ্কবের

অদ্বৈত বিচারের মায়া—সাধনাতীত অবস্থার দৃষ্টিতে যে মায়া—এবং সাধনশাস্ত্রের মায়া—এই দুয়ের প্রভেদ স্মরণ রাখতে বলি।

যোগ্যতাই অধিকার লাভের মাপ কাটি। সকলেরই তন্ত্রে অধিকার আছে, ব্রহ্মমন্ত্র হ'তে সকল মন্ত্রে সকলের—মানুষ মাত্রেরই—অধিকার আছে, ইহা তন্ত্র শাস্ত্রে বহুবার স্বীকৃত। মনে রাখতে হবে, সাধন একটা ছেলে খেলা নয়। সকলের সব অধিকার আছে মানে, যোগ্যতা অর্জ্জন করবার অধিকার সকলেরই আছে। ইহার অর্থ ইহা নয় যে, গ্রন্থাদি হ'তে মন্ত্র বেছে নিয়ে সকলে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হ'তে পারেন অথবা মন্ত্রগুলি নিয়ে যদৃচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। সাধনার জিনিষ, গুরু বা আচার্য্যের কাছে শিক্ষা ভিন্ন যোগ্যতা আসে না—গুরূপদিষ্ট মার্গে যেতে হয়। স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর বা পরা—এই তিন সাধনের ক্রম। একজন চাই মন্ত্রতত্ত্ববিদ্ বা উপদেষ্টা, আর একজন চাই শিষ্য। নতুবা মন্ত্রগুলি কতকগুলি অবোধ্য ধ্বনিমাত্র থেকে যাবে। মন্ত্র মানেই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ। মন্ত্র সাধনগম্য করা চাই, উপলব্ধি করা চাই।

তন্ত্র রহস্য—৩।

(মন্ত্রবিদ্যা ও তার রূপ)

অধ্যাত্ম শিল্প বলে সাধক তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করেন—তত্ত্ব, বর্ণময়ী ও রূপময়ী হ'য়ে সাধকের কাছে প্রকাশিত হন। সর্ব্বদেশের ধর্ম্মেতিহাস ইহার সত্যতা প্রমাণ করে। ইহা 'কল্পনা' নয়। যাঁরা কল্পনা বলেন, তাঁরা মনে রাখবেন যে, এই কল্পনাই জগতকে আলোড়ন করে, জীবনকে উন্নত ও মহা পবিত্র করে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রস্তরময়ী কালী মূর্ত্তির সঙ্গে কথা কইতেন, পরামর্শ করতেন। ওরকম কল্পনায় নাস্তিকের মনেও শ্রদ্ধা জাগরিত হয় কেমন ক'রে? নিরক্ষর ওরকম কাল্পনিকের কাছে, বিদ্বান ও বড় বড় মাথাওয়ালার মাথা অবনত হয় কেন? তথাকথিত ঐ কল্পনাকে পরীক্ষা না ক'রেই উড়িয়ে দেওয়া হয় কেন?

সাধনার ফলে তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়। সাধকের এই দর্শন—এই মহাশক্তির লীলা—শাস্ত্রে বহু ভাবে বর্ণিত। সর্ব্বসম্প্রদায়ই, বিশেষ বাঙ্গালী, সপ্তশতী

চণ্ডীর আদর করেন। চণ্ডীতে, ত্রিগুণাতীতাবস্থায় স্থিত অব্যক্ত তুরীয় শক্তির নাম চণ্ডিকা। তাঁর প্রথম অভিব্যক্তি হয় 'মহালক্ষ্মী'রূপে। এই দেবী ওতঃপ্রোত ভাবে তেজরূপে জগৎ ব্যাপ্ত হলেন। সত্ত্ব, রজঃ, তম—এই তিনগুণ। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা বলেন, কাম ও ক্রোধ, 'রজোগুণ সমুদ্ভবা'। ইহা জাগতিক দিকের সাধারণ রজোগুণ। দৈবী রজোগুণ যা মহামানবে দেখা দেয়, তার স্বরূপ সত্ত্বগুণ—কল্যাণতমরূপ। জাগতিক দিকের তমোগুণ মানে যাতে জড়তা আনায়—বহুত্বের দিক, সৃষ্টির দিক ; তত্ত্ব দৃষ্টিতে, প্রলয়ের দিকই তমোগুণ—যেখানে বহুত্বের নাশ। গুণত্রয়ময়ী ঐ দেবীর তমোগুণের সারাংশ হ'তে আবির্ভূতা হলেন মোক্ষদায়িণী নবীনা দেবী 'মহাকালী'—একটি বহ্নি হ'তে উদ্গত হল আর একটি বহ্নি। এই মহাকালী নানা নামে অভিহিত—'মহামারী' 'ক্ষুধা', 'তৃষ্ণা', 'নিদ্রা', 'কালরাত্রী, প্রভৃতি (চণ্ডীতে বর্ণিত)। জাগতিক সত্ত্ব গুণ বহুমুখীভাবের অন্তরায়। মহামানবের শুদ্ধ সত্ত্বগুণ হ'তে জাত হন তাঁর বহু মানস সন্তান। দেবীর নিজ সত্ত্বগুণ হ'তে আবির্ভূতা হলেন 'মহাসরস্বতী'—যিনি 'মহাবিদ্যা', 'ভারতী', ব্রাহ্মী', 'বাক্' প্রভৃতি বহু নামে পরিচিতা। 'মহাসরস্বতী' হ'তে আত্মপ্রকাশিত হলেন এক শুভ্রবর্ণা দিব্যকান্তি নারী। বহু নাম তাঁর—'ত্রয়ী', বিদ্যা', 'ভাষা', 'অক্ষর', 'স্বরা' প্রভৃতি।

স্থূল, সূক্ষ্ম, পরা—এই তিন ভাবের সাধন। স্থূলপূজার নাম—সমস্তবিদ্যা, সূক্ষ্মপূজা—নামরূপবিগা, পর (পরা) পূজা—অর্পণ বিদ্যা [তন্ত্ররাজতন্ত্র-৪র্থ পটল-৯৭ দ্রঃ]। দেবীর স্থূলরূপ, 'সমস্ত' অর্থাৎ ধ্যান বর্নিত রূপকে তুরীয় ভাবে সাধককে গ্রহণ করতে হয়। তুরীয়ই সমস্ত। দেবীর প্রকট, স্থূলরূপে দৃষ্ট হলে ও, সেই রূপ হ'তেই সাধকের সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। গুরূপদিষ্ট মার্গে অগ্রসর হলে, ঐ স্থূলরূপই সাধকের হিতের জন্য 'মন্ত্রতনু' রূপে (সূক্ষ্মরূপে) সাধকের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হন। পরে 'পর' বা 'ব্রহ্মার্পনং'।

বেদে ওঁ মানে—হাঁ, আছে বা অস্তি। ওঁ ব্যাকরণে=অ+উ+ম= সৃষ্টিস্থিতি লয়াত্মিকা স্বাভাবিক ধ্বনি ; যেটি কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধাদি সকল স্থানই স্পর্শ করে তাহাই 'অ' , যে ধ্বনি ঐ সমস্ত স্পর্শ ক'রে বৃত্তাকারে ওষ্ঠস্থান ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় সেটি 'উ' , যে ধ্বনি উচ্চারণ ক'রে ওষ্ঠ বন্ধ করতে হয়—সেটি 'ম্'। ঐ ধ্বনির অন্তর্গত, অতএব, সমস্ত ধ্বনি। ধ্বনির শক্তি বর্ণময়ী

ভাষায়। এই 'ওঁ'—প্রকাশরূপে 'সমস্তবিদ্যা'—বিভিন্নরূপে বর্ণময়ী, মন্ত্রময় শরীরী, ইনিই 'মাতৃকাসরস্বতী'। ধ্বনির রূপময় লিঙ্গই ভাষা। ধ্বনি ভাষার সংকেত মাত্র। ব্যাকরণ ঐ সংকেতের প্রয়োগ ও ব্যবহার শিক্ষা দেন। 'অ' কারের মাহাত্ম্য সর্ব্ব শাস্ত্রে বর্ণিত। (গীতায়, "অক্ষরাণামকা-রোঽস্মি—১০ম অ। ৩৩,। 'অ' উচ্চারণ নানা ভাষায় নানারূপ হয় অর্থাৎ 'অ'কে প্রকাশ করা হয় নানারূপে। খোলো সব ভাষায়, বলা যায় না যে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনের সাহায্য বিনা উচ্চারিত হয় না। তাঁদের ভাষার উচ্চারণ, প্রয়োগ অনুসারে হয়, মূল ধ্বনি-প্রতীক অনুসারে হয় না। 'অ', ভাষার বর্ণরূপী অক্ষর এক জিনিষ, ধ্বনির সংকেতাক্ষর আর এক জিনির। ধ্বনি হিসাবে 'অ' সর্ব্বভাষারই মূল, তার বিকৃতিই অন্য সব। সঙ্গীত বিদ্যার মূলস্বর ইতিপূর্ব্বে আমরা জেনেছি। ভারতের ব্যাকরণও মূল ধ্বনির মর্য্যাদা হানি করেন না। মনে রাখতে হবে 'ভাষা, 'অক্ষরা', 'স্বরা' বলা হয়েছে কাকে—উহা স্থূল না সূক্ষ্ম—'সমস্ত' হলেও, কি তিনি ?

ঋক্ সংহিতায় বিষ্ণুর ত্রিপাদ দ্বারা জগৎ আক্রমণের কথা আছে। বিষ্ণুর চতুর্থপদই 'পরম পদ'—ব্যোমস্থিত, ইন্দ্রিয়াতীত (তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং)। গায়ত্রীর ও ত্রিপাদ—গায়ত্রী ছন্দের তিন চরণ; ভূর্ভুবঃ স্বঃ=পৃথ্বীলোক, অন্তরীক্ষলোক, দ্যুলোক, ঋক্ যজুঃ সাম=২য় পদ, 'পরোরজা, বা তুরীয়= ৪র্থ পদ। বাক্ দেবী, প্রাণ, অপান, ব্যানরূপে দেহে সঞ্চরণ করেন, দশবায়ু রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ঐ পঞ্চপ্রাণ সহায়ে কুণ্ডলিনীর গতি হয়। অপ্রকট অবস্থাই শব্দ। প্রকট অবস্থার ঠিক্ পূর্ব্বে, সূক্ষ্মরূপে দ্বিত্ব হবার যে ভাব তার নাম 'পর' বা 'পরা' শব্দ—মূলাধারে কুণ্ডলিনীর গতিহীন নিষ্পন্দ শব্দ বা শব্দের 'কারণ দেহ'।

তন্ত্রে, পুং ভাবে 'পর' ও স্ত্রী ভাবে 'পরা' বলা হয়। অনেক সময়ে 'পরা' ও 'পর'—এ দুয়ে ভেদ করা হয় না। [এক স্থানে উড্রফ সাহেব বলেছেন যে শিবশক্তি ত চাপাটি নয় যে তাকে ভাগ করবে]। অব্যক্ত চৈতন্যই 'পর-শব্দ'; ব্যক্ত জগতের মন ও জড়ের মধ্যেই ত্রিপাদভূমি। প্রলয়ের স্থির ভাব—শক্তিগর্ভস্থবীজ। ঐ শব্দের সামান্যস্পন্দভাব হলে তার নাম 'পশ্যন্তি'—মূলাধার হ'তে মণিপুর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। ঐ স্থানে সংকল্প বিকল্পাত্মক ভাব জেগে ওঠে ও মনের সঙ্গে সংযোগ হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে—'স' ঐক্ষৎ, 'স

অকাময়ত'—প্রথম গতিশীলতার ভাব। 'স ঐক্ষৎ', কাকে দেখলেন, কি দেখলেন—ঈক্ষণ—দেখবার কি আছে? জাগতিক ব্যাপারের মর্ত জানালার মধ্য দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখা নয়। 'স', এখানে চৈতন্য—স্বরূপস্থিতি। 'স' এর দুটি ভাব,—'নিষ্কল শিব' বা নিষ্ক্রিয়, 'সকল শিব' বা শক্তি—সক্রিয় সমষ্টি সংস্কার। ঈক্ষণ মানে—পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টিসংস্কার মাত্রের চেতনা—জাগরণ। 'মধ্যমা' শব্দ, বুদ্ধি অর্থাৎ স্থিরাত্মিকা ভাবের সঙ্গে সংযুক্ত—'পশ্যন্তি' হ'তে হৃদয় পর্য্যন্ত। সমষ্টির দিক্ দিয়ে ইনিই 'মহৎ'। 'মধ্যমা', সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহের অন্তর্গত। মানসশক্তির যেটি জ্ঞান, তাকে 'নাম' আখ্যা দেওয়া হয়। ঐ গতির বিষয়—দিক্কালাদি=অর্থ। বিশিষ্টরূপ বোধভাবই সূক্ষ্মশব্দ ও তাতে তাদাত্ম্যভাবই অর্থ। ইহা যখন ইন্দ্রিয়াদির মধ্য দিয়ে, কণ্ঠ, তালু আদি স্থানের আঘাতে বিক্ষিপ্ত হয় তখন তার নাম 'বৈখরী'—সমষ্টি ভাবে বিরাট শব্দ—বিশ্বপ্রকাশ। বৈখরীই ধ্বনি, ভাষা রূপে বহুরূপিণী। ভাষার বিষয়ই ইহার অর্থ। বোধভাবের গতি মানে 'মধ্যমা'শব্দ ও 'মধ্যমা'অর্থ—ঐ গতির বিষয় বা সংস্কার। ইহা সূক্ষ্ম। স্পন্দহীন পরশব্দ বা পরাবাক্ই 'কারণ'। উক্ত কারণ ও সূক্ষ্ম হ'তেই হয়—শব্দব্রহ্মের প্রকাশভাব—বৈখরী। ইহাই 'মন্ত্র'। এই ভাব উপলব্ধি হলে মন্ত্র মনকে ত্রাণ করেন। ঐ জ্ঞান উদ্দীপ্ত হ'য়ে দৃঢ় হওয়ার নাম 'মন্ত্রচৈতন্য'। বেদই পরশব্দ। অপ্রকট প্রকটিত হয়—অব্যক্ত স্ফূটিকৃত হয়—শক্তিতে। তন্ত্র বলেন, আমাদের মধ্যেই সকল মন্ত্রগুলি বিজ্ঞানরূপে বা চিৎরূপে বিদ্যমান। মন্ত্রের অর্থই দেবতা—শব্দ ও অর্থ। শ্রদ্ধাযুক্ত মনে বা স্বচ্ছ মনে উহার প্রকাশ হয়। স্থূল ভাবে মন্ত্রগুলির প্রকাশ হয় ধ্বনিতে। উচ্চারণ কৌশলে গীতে মোহন শক্তি আসে; মন্ত্রশক্তি অধিকতর সূক্ষ্ম; শ্রদ্ধাযুক্ত জপে মনপ্রাণ ইষ্টের দিকে ধাবিত হয়। কুণ্ডলিনী 'মন্ত্রময়ী', সূক্ষ্মরূপে জ্যোতির্ম্ময়ী। প্রথম উৎপন্ন নাদ—যা বিন্দুরূপে পরিণত হয়—তত্ত্বের পৃথক করণে, স্ফুটিত হয় অব্যক্ত 'রব', জপে। ইহাকেই কেহ কেহ Logos বলেন (Cosmic Word বাইবেলের)। ইহা হ'তে হয় বর্ণমালার উৎপত্তি। বর্ণমালা হ'তেই মন্ত্র গঠিত হয় বা রূপ ধরে। এই প্রকারে বিশ্বচেতনা ,পরাবাক্ রূপে পরিণত হয়। পরাবাক্ই স্থূল ও সূক্ষ্ম শব্দের প্রসূতি—মাতৃকা ও বর্ণ। পরাবাক্ ভাব মাত্র, ভাষা হীন।

ঈশ্বরের প্রত্যভিজ্ঞায় হয় স্বেচ্ছাক্রিয়া (ইচ্ছা), কার্য্যজ্ঞান-শক্তি (জ্ঞান) থাকায়, তিনি ক্রিয়ার বিষয় জানেন; তাঁতে স্থূল ভাবের ক্রিয়াশক্তির উদয় হ'লে জগৎ প্রকাশ হয় (ক্রিয়া)। শব্দসৃষ্টির ক্রম ও অর্থ এবং সৃষ্টির ক্রমে প্রভেদ বর্ত্তমান। বিভিন্ন তন্ত্রে নামের পার্থক্য থাকলেও ভাবের পার্থক্য নেই। শারদাতিলক বলেন, প্রণবের 'অ' = অর্ক = বিষ্ণু; বিন্দু হ'তে 'রৌদ্রী', নাদ হ'তে 'জ্যেষ্ঠা', বীজ হ'তে 'বামা' জাত হন।

এই সকল হ'তে আবির্ভূত হয়েছেন—'রুদ্র', 'ব্রহ্মা', 'বিষ্ণু'। ইঁহারা—জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া বহ্নি, ইন্দু, অর্কস্বরূপ। যোগিনীহৃদয়তন্ত্র বলেন, ইচ্ছাশক্তি যখন জগৎ প্রকাশোন্মুখ হন, তাঁর গতি বক্র ভাব ধারণ করে—অঙ্কুশাকার হয়। প্রকাশোন্মুখ জগৎ থাকে 'বীজ'রূপে; এই ভাবের নাম 'বামা', অর্থাৎ এই শক্তি জগৎ বমন করেন = পশ্যন্তি শব্দ (ঈক্ষণ)। 'জ্যেষ্ঠা', ঋজুরেখাকার—মাতৃকা ভাবের উপপন্ন = মধ্যমাবাক্। 'রৌদ্রী', ত্রিকোণাত্মিকা শৃঙ্গাটক (Pyramydical) = বৈখরী শব্দ। ত্রিবিন্দু = শিব, শক্তি, শিবশক্তি; প্রকাশ, বিমর্শ, প্রকাশ-বিমর্শ, শ্বেত, রক্ত, মিশ্র, বিন্দু, নাদ, বীজ, পর, সূক্ষ্ম, স্থূল, দেবীত্রয়, দেবত্রয়, তিন শক্তি (ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া)। এই মিলিত বিন্দু = ত্রিশক্তি। কুণ্ডলিনীর গতি হয় সুষুম্নার মধ্য দিয়ে, উত্থিতা হন মূলাধার হ'তে, ক্রমশঃ স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সব শেষে, সহস্রারে পৌছান। মূলাধারের নিম্নেও 'লম্বিকা'—সহস্রদলযুক্ত। এই সর্ব্ব নিম্ন স্থান হ'তে সহস্রারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—যা কিছু ভাব, বর্ণ, দেবতাদি আছে—সমস্তই পরাবস্থায় সহস্রারে বর্ত্তমান। এই স্থানে তিনি 'কামকলা' রূপে বিরাজ করছেন। ইহা দেখান হয় অধোত্রিকোণরূপে—'অকথাদি' আকারে, বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, এই ত্রিবিন্দুই ত্রিরেখা। 'অ' হ'তে সমস্ত ষোড়শ স্বরবর্ণ = বামারেখা, 'ক' হ'তে ষোড়শ ব্যঞ্জন = জ্যেষ্ঠা রেখা, 'থ' হ'তে ষোড়শ বর্ণ = রৌদ্রী রেখা, অবশিষ্ট তিন বর্ণ—'হ', 'ল', 'ক্ষ', এই ত্রিভুজের তিন কোণে অবস্থিত। ঐ ত্রিবিন্দু,—'ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মকম্'। কালিউর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র বলেন, ঐ ত্রিভুজের বর্ণগুলি 'বিন্দু' হ'তে উদ্ভূত। 'অ' হ'তে 'ঃ' পর্য্যন্ত রেখা = ব্রহ্মা, 'ক' হ'তে 'ট' = বিষ্ণু; 'থ' হ'তে 'স' = রুদ্র। ত্রিবিন্দু হ'তে তিন রেখার উদ্ভব। এই রকম তিন তিন ভাগে বিভক্ত করায় গুণগুলিও দেখান হয়। তন্ত্রজীবন বলেন, ঐ 'যোনিমণ্ডল'কে

বেষ্টন ক'রে আছেন গুণত্রয়—সত্ত্ব, রজঃ ও তম। এই 'কামকলাই' শব্দব্রহ্মের তিনরূপ, তার মধ্যে বিভিন্ন শক্তির স্থান ('অবলালয়ম্') [যোনি = 'কারণং']।

ঐ 'কামকলার' বিশিষ্ট স্পন্দন বা 'পশ্যন্তি' ভাব হ'তেই উৎপন্ন হয় 'অ—ক্ষর'—ক্ষরহীন, নিত্য। ঐ অক্ষরই জীবদেহে তালু কণ্ঠাদির মধ্য দিয়ে প্রকাশ হলেই হয় ধ্বনি বা ভাষা, যা বর্ণরূপে দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ 'অবর্ণই' বর্ণরূপে আমাদের সামনে খাড়া হয়। অতএব বর্ণ স্বরূপতঃ অবর্ণ, বর্ণ—লক্ষণার্থ মাত্র। সৃষ্টির প্রলয়াবস্থা পর্য্যন্ত ইহা থাকে, তাই 'অ—ক্ষর'। সেইজন্যই ইহা 'অনাহত' ও অসীম শক্তিসম্পন্ন। অক্ষরই ধ্বনিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন—সর্ব্বপ্রকার ধ্বনির প্রসূতি, সুতরাং 'মাতৃকা'। তত্ত্বের দিক্ দিয়ে, শক্তির নানা প্রকাশ, ও শব্দের দিক্ দিয়ে শক্তির প্রকাশ—স্থূল পর্য্যন্ত—এই দুয়ের পার্থক্য লক্ষ্য করতে বলি।

মূল ধ্বনি ৫০টি বলা হয়—স্বর ও ব্যঞ্জন। ৫০টি বর্ণনিরূপণ, ধ্বনি অনুয়ায়ী, চিত্র অনুযায়ী নয়। যে ভাষার যত অক্ষরই থাকুক, ধ্বনিই সেগুলি প্রকাশ করে। ধ্বনির মধ্যে অসংখ্য বিভাগ বা 'পরদা' দেখান যেতে পারে ও সেগুলিকে লিপিতে বা চিত্রে প্রকাশ করাও যেতে পারে। তন্ত্রানুযায়ী সংখ্যা নিয়ে বুঝিয়েছেন তন্ত্রশাস্ত্র, এটি বুঝতে হবে। অসংখ্য লিপি ধরলেও, মূল তত্ত্ব বদ্‌লায় না। বিকৃত করার নামই 'ম্লেচ্ছরীতি'। এই রীতি, শাস্ত্রে আলোচিত হয়নি। স্বর ও ব্যঞ্জনের প্রতি অক্ষর বা বর্ণই দেবতা, সুতরাং বিদ্যাশক্তি। তাই মাতৃকাসরস্বতী পঞ্চাশদ্ বর্ণময়ী। পণ্ডিতেরা বলেন, তন্ত্রের সাধক একাধারে দার্শনিক, কবি ও শিল্পী (artist)। একথা ভারতের সকল সাধক সম্বন্ধেই বলা চলে। গীতা যেমন বেদান্তের ভাষ্য, তন্ত্রশাস্ত্রকে ও সেই রকম বৈদিক সাধনার নিজস্ব ভাষ্য বলা যেতে পারে।

দেবী পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী। সহস্রারে তিনি পরারূপা। সহস্রার অমৃতময় (চিন্ময়)। সেখানে আছে সোমমণ্ডল বা অমৃতমণ্ডল। 'অক্ষর' সুধাময়ী। তাই 'অক্ষর' মহাকল্যাণদায়িনী, শিবসঙ্গিনী। 'কামকলা' হ'তে, সাধকের আহ্বানে, অক্ষর সব, সাধককে পরিপ্লুত করেন, ঐ পঞ্চাশটি বর্ণ ফুলের মত

সাধকের সর্ব্বদেহের প্রতি অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েন, প্রতি অঙ্গকে সুধাময় করেন, দেবদেহ নির্ম্মাণ করেন।

[গায়ত্রীর আবাহন তন্ত্রে,—"আগচ্ছ বরদে নিত্যপরাগধূলিধূসরে। মকরন্দ রসামোদ পরব্রহ্ম সুধাস্পদে। চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থ শিবপর্য্যঙ্ক শায়িনী। পঞ্চাশৎ যুবতী সঙ্গে মহাবিন্দুস্বরূপিণী॥ আগচ্ছ ত্বরিতং মাতস্ত্বং বিন্দু চন্দ্রমণ্ডলাৎ। আগত্য হৃদয়স্থানং বিদ্যাসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে।" গায়ত্রীতন্ত্র। সন্ধ্যাকর্ম্মে করণীয়।]

যেমন সেতুর উপর দিয়ে দৃঢ়পাদ বিক্ষেপে তালে তালে একসঙ্গে অনবরত বহু সৈনিকের গতায়াতে সেতুটী ভেঙ্গে পড়ে, সেই রকম বারবার গায়ত্রী সাধনে সাধকের সর্ব্ববন্ধন দূরে যায়।

শ্রুতিতে বহুস্থানে একটি সুন্দর উপমা আছে,

["দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বদ্বত্তি অনশ্নন্ন অভিচাকশীতি।"]

'জীবদেহরূপ বৃক্ষে দুটো পাখী সখার ন্যায় সংযুক্ত ভাবে আছে, একটি সংসারের নানা ফল আস্বাদন করছে, অপরটি কিছুই ভোগ করে না, মাত্র প্রকাশই করে।' এই প্রকাশশক্তিই চৈতন্য, দ্রষ্টা বা সাক্ষি। ঐ প্রকাশশক্তি অন্য কিছুর জন্য অপেক্ষা রাখেন না ('অনশ্নন্ন')। ঐ উপমাটি সাধনার প্রবর্ত্তক মাত্র, তাই দুটি পৃথক পাখীর কথা বলা হয়েছে। সাধনক্ষেত্রে ঐ উপমাটির প্রয়োগ একমাত্র তন্ত্রেই দৃষ্ট হয়। কুণ্ডলিনীর চিন্তায় মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানের পর, "ততো জীব প্রসন্নাত্মা পক্ষিণী সহ সুন্দরী" ইত্যাদি ভাবে চিন্তা ক'রে, হৃৎপদ্ম হ'তে ক্রমশঃ ভ্রূস্থানে বা 'আজ্ঞা'য় "পক্ষিণা সহ দেবেশি...ইষ্টবিদ্যাং মহেশানি সাক্ষাদ্ব্রহ্মস্বরূপিণীং" ভাবতে হয়; শেষে (শিব বলছেন), "ধ্যানেন যদ্রূপং সমুপস্থিতং। তদেব মন্ত্রার্থং বিদ্ধি পার্ব্বতি।" অর্থাৎ মন্ত্রার্থবোধ—সাধন ও ধ্যানগম্য। এইরূপে মন্ত্রার্থবোধ হলেই সঙ্গে সঙ্গে 'মন্ত্র চৈতন্য' হয়।

সুর-কেন্দ্র হ'তে নানা সঙ্গীত ধ্বনি, নানা ভাব উঠছে। উদ্ভিন্ন ঐ নানা গানের তানই ঐশ্বর্য্য বিকাশ, তাদের মোহন রূপই এক একটি পদ্ম রূপ—বৃত্তিময় বা স্বরময় হ'য়ে চক্রে চক্রে, নানা বর্ণে—চিত্তহারী বর্ণে ফুটে উঠেছে। কুণ্ডলিনী, "কূজন্তি কুলকুণ্ডলিনী চ মধুরং মত্তালি মালা স্ফুটং বাচঃ কোমল কাব্য বন্ধ রচনা ভেদাতি ভেদ ক্রমৈঃ..." উত্থিত হ'তে

থাকেন প্রতি চক্র ভেদ ক'বে, স্বযুম্না চক্র ভেদেব পূর্ব্বে দেবীব ধ্যান, "কোটীচন্দ্রপ্রতীকাশং পবব্রহ্মস্বরূপিণীম্।...গচ্ছতীং শ্বাসনং ভীমাং নানারূপ ধবাত্মিকা", দেবীব মোহন গীতে বিশ্ব বিমুগ্ধ—বীণা পুস্তক ধাবিণী (তুলঃ—শ্রীকৃষ্ণেব বিংশতী অক্ষবেব মন্ত্রধ্যান)—অথচ ইনি সিংহবাহিণী, ভীমা, নানারূপধাবিণী—বিশ্বের প্রাণ। তন্ত্রে, মাতৃকাসবস্বতীব অপরূপ রূপ—বর্ণময়ী তনু, হাতে অমৃত ভাণ্ড, ভালে অর্দ্ধচন্দ্র, মাতৃক্ষীবে স্তনভাবনম্রা। পূজায় দেবীর সৃষ্টি, স্থিতি, সংহাব ন্যাস কবতে হয়। সৃষ্টি ও সংহাব—এই দুই বিবাটেব গীত। দেবীব বাহ্যভাবেব বা বাহ্যমাতৃকাব ধ্যান আছে—নেই অন্তর্মাতৃকাব ধ্যানবর্ণনা। দেবী তখন মাত্র ধ্যানগম্যা, পবারূপা, অন্তর্বিলাসিনী—অন্তব হ'তে পবাগ কণায় সৃজন কবেন। পৌবাণিক পূজায় কেবল বাহ্যমাতৃকাব প্রয়োগ দেখা যায়। সৃষ্টি মানে, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, স্থিতি, সাম্যাবস্থা। এই আকর্ষণ বিকর্ষণই মহাগীতি, সাম্যই যতি। আকর্ষণ বিকর্ষণই কাম, উভয়েব সংঘর্ষই বমণ বা মৈথুন। সৃষ্টি লীলায় ইহাব স্থূলভাব। মূলাধাবে—কামবীজ; প্রলয়েব 'কাম' সূক্ষ্ম—সহস্রাবে কামবীজ পবরূপে—'শিবকাম'। সৃষ্টি ক্রিয়াশীল, বজোগুণেব বিকাশ—লিঙ্গ ইহাব—'বক্তবর্ণ'। বিভিন্ন প্রকাব গীতেব একীসাধনেব নাম ও 'বক্ত'। সঙ্গীত শাস্ত্র বলেন, "বক্তং নাম বেণুবীণাদি স্ববানামেকীব বক্তমীত্যুচ্যতে।"

মন্ত্রবিদ্যার প্রসার

(বীজ)

শাবদাতিলক বলেন, 'পববিন্দু ভিন্ন হ'লে অব্যক্ত বব হয়'। ইনিই ত্রিবিন্দুরূপা কামকলা। শব্দ ও অর্থ, সুতবাং মন্ত্রেব কাবণ—শব্দব্রহ্ম। ইনি নাদবিন্দুময় ব্রহ্ম—ব্রহ্মাত্মক শব্দ, অব্যক্ত, অখণ্ড ও ব্যাপিকা—সৃষ্ট্যোন্মুখ পবম শিবেব প্রথম উল্লাস। নাদ+বিন্দু=নাদাত্মা=নাদবিন্দুময়। নাদ ও বিন্দু, চন্দ্রবিন্দুব মত লেখা হয় (সোম বা অমৃত+বিন্দু)। প্রত্যেক বীজমন্ত্র নাদবিন্দু সংযুক্ত। 'হ্'=আকাশ; 'ব'=অগ্নি, , 'ঈ'=অর্দ্ধনাবীশ্বব—

মায়া। পঞ্চভূতকে দুভাবে দেখা হয—(১) অমূর্ত্ত—সূক্ষ্ম, (২) মূর্ত্ত—স্থূল। আকাশ ও বায়ু অমূর্ত্ত। 'অগ্নির' আবির্ভাব যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ বর্ণ ও রূপের প্রকাশ হয় না। তাই অগ্নি মূর্ত্ত ভূতের প্রধান, সুতরাং 'র' ই রূপের প্রথম অভিব্যক্তি—আকাশ সহ অগ্নিতে রূপ আসে। চিদাকাশের সঙ্গে রূপ যুক্ত হলে হয 'বীজমন্ত্র'। 'কং ব্রহ্ম'; তন্ত্রে কামবীজের প্রধান বর্ণ 'ক', আর 'কং'—মূলাধারস্থিত দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর আর এক রূপ—কংগর্ভস্থ জ্যোতিস্তত্ত্ব বা 'কামিনী'। 'কং'—কামিনীর বীজ। 'ক'—ত্রিকোণাকার, একটি অঙ্কুশ ও আছে [প্রাচীন সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অক্ষরে]। সহস্রারের কামকলাই আর এক ভাবে মূলাধারের ত্রৈপুরত্রিকোণ।

[সকাম সাধক এই 'কামিনীর' গর্ভে জপফল সমর্পণ করেন—জপ-শক্তি নিজে পাবার জন্য। উচ্চাঙ্গের সাধনায়, সাধক সমস্তই ব্রহ্মে অর্পণ করেন।]

'ল' = পৃথ্ব্যাত্মক বীজ—স্থিতি ভাব। তন্ত্ররাজতন্ত্র বলেন, 'কুলসুন্দরী, বেদময়ী ও ত্রয়ীময়ী হন—স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত হয়'; (স্বর = ব্রহ্ম, ব্যঞ্জন = শক্তি)। ইনি প্রপঞ্চের কারণ 'বাচ্যবাকরূপ' শব্দময ও অর্থময়।

[ঋগ্বেদ 'অ'কারাদি। ঋগ্বেদের প্রথম ঋক্, "অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং ·"। অগ্নি যজ্ঞফল স্বরূপ, অগ্নি দীপ্যমান। যজুর্ব্বেদ 'ই'কারাদি (যজুর্ব্বেদের প্রথম মন্ত্র, "ইষে ত্বেত্যস্য।" অগ্নিকে দীপ্তি প্রদানের জন্য শাখা (ডাল চাই)—এই শাখার (ডালের) আহ্বান।]। অতএব, ঋগ্বেদ + যজুর্ব্বেদ = অ + ই = এ, সামবেদ ও 'অ'-কারাদি। সামবেদের প্রথম মন্ত্র "অগ্ন আয়াহ্রীতস্য···।" অগ্নিকে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।]

সামগানে মন্ত্রস্ফূরণ হয। অতএব, সামবেদ + ঋগ্বেদ + যজুর্ব্বেদ—সন্ধির নিযমানুসারে = 'ঐ'কার = তেজ, তেজের উজ্জীবন, তেজের প্রতিষ্ঠা, নাদবিন্দু যোগে হয় 'ঐঁ' = প্রথম কূট—সর্ব্বব্যাপি। তন্ত্ররাজতন্ত্রে, এইরূপে ক্লীঁ = বাচ্যবাচক প্রপঞ্চ (১৫শ পটল দ্রঃ) = ২য় কূট্। 'ক' হ'তে 'হ' পর্য্যন্ত ব্যঞ্জন বর্ণ অর্থে শক্তির বর্ণরূপে প্রকাশ = জ্ঞেয = পঞ্চভূতাত্মক। স্বরবর্ণ ই 'বেদ' বা 'জ্ঞান'। ঐ রূপে 'হেসৌ' = জ্ঞাতৃরূপ = শেষকূট্ (ঐ দ্রঃ)। সাধক এই গুলি বুঝলে বীজশক্তিতে শ্রদ্ধাবান হন ও সাধনায় 'শক্তি' প্রত্যক্ষ করেন। সাধক শিক্ষা করেন যে সমস্তই ব্রহ্মের রূপ। যেমন 'অহং' = 'অ'—প্রথম স্বর + 'হ'—শেষব্যঞ্জন + বিন্দু = শিব-শক্তি স্বরূপ। ইহাও উক্ত হয যে, যাঁর যা ইষ্ট, তিনি তাই স্বরূপতঃ = তাঁর সংস্কারযুক্ত ব্রহ্ম, তাঁর শ্রেষ্ঠ কল্যাণতম রূপ।

"পদে চ গমনং পত্যৌ বিসর্গনাশকামিনী"—বলা হয়েছে কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে। 'বিসর্গ' মানে "উদ্বেগঃ কামোদ্বেগঃ" অর্থাৎ কুণ্ডলিনী কামোদ্বেগাদি ধ্বংসকারিনী। বিসর্গ = 'দ্বৈত'ও বোঝায; কুণ্ডলিনী সাধককে পবমাত্মায় (সহস্রাবে) নিয়ে যান, অতএব, কুণ্ডলিনী দ্বৈতবোধনাশিনী। মূলাধাবে কুণ্ডলিনী "প্রসুপ্তভুজগাকাবা", সেখানে আবাব কামবীজ বর্ত্তমান, সেই জন্য ভুল হয়, বুঝি কুণ্ডলিনী প্রাকৃত-কামশক্তি। উত্থান সময়ে কুণ্ডলিনী সমস্তকে নিজ অঙ্গে বিলীন ক'বেই ওঠেন—সমস্তই গ্রাস কবেন, ফলে, প্রাকৃত-কাম, শিব-কামে পবিণত হয়। "প্রকাশমানা প্রথম প্রয়াণে, প্রতিপ্রয়াণেপ্যমৃতায়মানা' অর্থাৎ যাত্রাব সময় সাধকেব নিকট সব প্রকাশ হ'তে থাকে, ফেববার সময় সাধক অমৃত স্বরূপ হয়ে আসেন। কুণ্ডলিনী সহায়েই সাধক 'সত্যলোকে' (সহস্রাবে বা 'অমৃতলোকে') যান ও সেখান হ'তে ফেববাব সময় আনন্দময় হয়ে আসেন। [অমৃতলোক = আনন্দস্থান]।

মূর্চ্ছা ও সমাধি দেখতে এক বকম হলেও, ঐ দুই অবস্থাব প্রভেদ স্পষ্ট। আঘাত লাগলে বা যে কোন কাবণে মূর্চ্ছাপন্ন ব্যক্তি, সুস্থ হলে, সে নয় নিবেট্ বোকা হয়ে যায় বা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সমাধিবান পুরুষের বাহ্যজ্ঞান ফিবে এলে, তিনি নতুন জ্ঞান, নতুন দৃষ্টি, নতুন প্রেরণা নিযে ফিবে আসেন। সমাধিলব্ধ জ্ঞান ভিন্ন সত্য প্রকাশ পায না।

'পবাসম্বিৎ' বা 'পবম শিব' কোন তত্ত্বেব অন্তর্গত নন—ইনি তত্ত্বাতীত। শিবতত্ত্ব হ'তে নিঃসৃত হয় 'আভাস' (দ্যুতিপ্রকাশ)। শিবতত্ত্বেব পবাভাবকে ধবলে, পুরুষ প্রকৃতি—এই দুই নিয়ে—আমবা পাই সাতটি সংখ্যা। সপ্তসংখ্যাব কথা ব্রাহ্মণগ্রন্থে খুব পাই (যথা, ৭×৩=২১; ৭×২=১৪ ইত্যাদি), তন্ত্রে পাই, পুরাণে পাই, বৌদ্ধগ্রন্থেও যথেষ্ট পাই। কুব্জিকাতন্ত্র বলেন, কুণ্ডলিনীব সাড়ে তিন পাক (ঐভাবে গুটিয়ে আছেন)। ঐ পাক্ খুললে ও তাব ব্যাস দিয়ে ভাগ কবলে পাই সপ্ত সংখ্যা।

[পূর্ণানন্দ স্বামীর 'ষটচক্র নিরূপণ' গ্রন্থে (শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি) কালিচবণের টীকায় এই ৭টির বিশেষ বিবরণ দ্রঃ]।

ঐ সপ্তশক্তি = (১) উন্মনী (২) সমনী (৩) ঐ দুই শক্তি 'আজ্ঞিরূপা' ব্যাপিকা শক্তিতে পবিণত হয়, (৪) লাঙ্গলাকৃতি 'মহানাদ' (৫) পক্ষমরূপ—শিবশক্তি সমবায়রূপ 'অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নাদ', (৬) 'অর্দ্ধমাত্রাকাবা বোধিনী

শক্তি', (৭) সপ্তমরূপ—ভ্রূস্থান বা আজ্ঞাচক্রের দ্বিতীয় বিন্দু। উন্মনী ও সমনীকে, উন্মনা ও সমনা নামে ও অভিহিত করা হয়, এবং মহানাদ = নাদান্ত।

উন্মনী = "যত্র গত্বা তু মনসো মনত্ব নৈব বিদ্যতে"—মনের মনত্ব থাকে না, নিবাত দীপশিখার মত স্থির, "অকুলাখ্য পরশিবাত্মক পদং বিশ্বস্য বিশ্রাম স্থানত্বাৎ"—বিশ্বের বিশ্রাম স্থান। ইহা সত্বাদি ত্রিগুণ যুক্ত, শাশ্বত 'বাঙ্‌মনৈবগোচরং'।

[ইহা দ্বিবিধ—"ততশ্চ মনোবৃত্তি মদ্বিষয়াবলম্বন চেষ্টাকালীন বিষয়াবলম্বন সামান্য ভাব সম্পাদনং তত্ত্বমুন্মনীত্বমিতি সা চ দ্বিবিধা সহস্রারাধরা নির্ব্বাণকুলরূপা এতৎস্থানস্থিতা বর্ণাবলীরূপা"]।

'সহস্রারাধরা নির্ব্বাণকুলরূপা' ও বর্ণাবলী রূপা। উন্মনী, 'ভবপাশ নিকৃন্তনী' এবং 'উন্মন্যধঃ সমনীমাহ'। সমনী শক্তি বা 'সমানা' চিদানন্দ স্বরূপ 'সমনা নাম সা শক্তি সর্ব্বকারণকারণং॥" (স্বচ্ছন্দসংগ্রহ)। বলা হয় এখানে ও 'পাশজাল' বর্ত্তমান! "মনঃ সহিত্বাৎ সমানা"—মনের সঙ্গে যায়, যতদূর মন নিয়ে যায়, মন না পেয়ে যেখান হ'তে ফিরে আসে। উন্মনী, "শুদ্ধবোধসা, শুদ্ধ জ্ঞানস্য প্রকাশো যস্মাৎ।" উন্মনী ও সমনী—পরা সম্বিদে নিহিত। উন্মনীকে 'পরশিব', ও সমনীকে 'পরাশক্তি' বলা হয়, আবার স্থূল মন লয় হলে, সাধককে সহস্রার পর্য্যন্ত অর্থাৎ সমাধি লাভের পূর্ব্ব অবস্থা পর্য্যন্ত যে অতি সূক্ষ্ম মন নিয়ে যায়, সেই তাদাত্মভাবে ভাবিত মনকে ও উন্মনা আখ্যা দেওয়া হয়। 'পর' বা 'পরা'—নিশ্চল অবস্থা। "তদেজতি, তন্নৈজতি"। পরাসম্বিদে সামরস্য জন্য শক্তির নানারূপ হয়।

["তদেব সামরস্যং পরংব্রহ্ম সগুণ শিবং শক্ত্যাদি নানারূপেন পরিণমতে।...চতস্র নানা পীঠত্বেন পরিণতাঃ ;

তথাচ মূলাধারে 'কামরূপং', হৃদি 'পূর্ণগিরিঃ', ভ্রূমধ্যে 'জালন্ধরঃ', সহস্রারে 'উড্ডীয়ানঃ'"]।

'পশ্যন্তির' সামান্যস্পন্দই সৃষ্টি-প্রাক্কালে 'আঞ্জি'।

['আঞ্জিতি তির্য্যকরেখারূপ মাত্রাকারা ইত্যর্থঃ। ইয়ংশক্তি সৃষ্টাদৌ আবির্ভূতা']।

নাদ, প্রথম শব্দ প্রকাশ। ইহা ত্রিবিধ, মহানাদ, নাদান্ত, নিবোধিনী। 'মহানাদ', শব্দব্রহ্মের প্রথম গতি ; 'নাদান্ত'—বিশ্বব্যাপ্ত। 'নিবোধিনী'—পুনঃ

অব্যক্তে ফিরে যাবার চেষ্টা—লয়মুখী। নাদস্পন্দনের বিকাশ চেষ্টাই স্ফোট অর্থাৎ চিন্তাশক্তির আধার। এই সূক্ষ্ম অবস্থার নাম 'অর্দ্ধচন্দ্র'। এই অর্দ্ধচন্দ্রই বিন্দুতে পরিণত হয়। 'অর্দ্ধচন্দ্র' যখন শুদ্ধবোধে বিবর্ত্তিত হয়—যা শুদ্ধ জ্ঞানমাত্রের প্রকাশ বা 'বোধে বোধ'—তখন তার নাম হয় 'অর্দ্ধমাত্রাকারা বোধিনী'। সবগুলির আকার আছে—সাধক সেইগুলি—বীজের 'পরা'বস্থা—দর্শন করেন। লাঙ্গলাকৃতি মহানাদ ⩗ এই রকম, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নাদ, ৺; অর্দ্ধমাত্রাকারা বোধিনী ∽। শব্দ মানে বিকাশিনী শক্তি। ঐ বিকাশিনী শক্তির নিশ্চল ভাব, শব্দ ব্রহ্ম। 'বোধ'কেও 'শব্দ' বলা যায়। সর্ব্বপ্রকার বোধের মূল স্থানই শব্দব্রহ্ম—চেতনা শক্তির পরা অবস্থা। তন্ত্র বলছেন, "ইদমপি পরশক্তেররাস্ত রূপম। ততশ্চাজ্ঞাচক্রোর্দ্ধে দ্বিতীয় বিন্দু শিবস্বরূপঃ। তদূর্দ্ধে শিব-শক্তি সমবায়রূপার্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নাদ...।" এইরূপে, 'সমনী'র ঊর্দ্ধে "উন্মনীতি ক্রমেণ সপ্তকারণ রূপানি বর্ত্তন্তে।" এই প্রকারে অক্ষর, বর্ণ ও ভাষার সৃষ্টি হয়েছে—মন্ত্রবিদ্যার প্রসারে।

[সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষার মূলেও ঐ মন্ত্রবিদ্যা—সাধন, তপস্যা, ধোলোবাদে বর্ণাদি লাঙ্গল প্রভৃতি হ'তে উৎপন্ন বলা হয় কেন, যখন বীজরূপী সঙ্কেত, তন্ত্রে বর্ত্তমান ও যখন বেদ বা তন্ত্র স্পষ্টই ভাষার সৃষ্টি কি রকমে হয়েছে বলেছেন ?]

'ব্যাপিনী' ও 'আঞ্জিনীকে' একই শক্তির 'নিমেষ' ও 'উন্মেষ' বলা যেতে পারে। ঐ সপ্তকারণ বা 'সপ্তভূমিকাকে' নিবোধিকা (নিবোধিনী) শক্তির অন্তর্গত বলা হয়; কারণ, প্রত্যভিজ্ঞা বা কল্পনাক্ষেত্রের ক্রমবিকাশ—প্রথম অসীম-চেতনা হ'তে সাধারণ চেতনা, তারপর বিশেষ চেতনা। মাত্র বিদ্যার দিক দিয়ে, এটা অপ্রসারিত বিন্দুতে প্রথম হয় সাধারণ ভাবে গতি এবং তার পূর্ণ পরিণতি—বিশেষ 'বাক্য' বা 'বাক্যার্থ'। এই হিসাবে, 'নাদ' শব্দ প্রকাশের 'সামান্যস্পন্দ'। বস্তুর ছন্দগতি ও মনের ছন্দগতি প্রায় একই প্রকার। কোন একটি বস্তুতে একাগ্রচিত্ত হওয়ার নাম 'ধ্যান'; মন্ত্রার্থ ধ্যানগম্য। সুতরাং একই অবস্থায় একই কালে একটির বেশী 'বোধ' সম্যক্ প্রকাশ পায় না। বুদ্ধিবৃত্তিই বিষয়ের প্রকাশক—বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়াকার হয়ে যায়। এইজন্য 'শক্তি' বা 'আত্মা' সর্ব্বব্যাপি হলেও, সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয় ঐ বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা প্রকাশ পায় না। আর ঐ সপ্তকারণ হ'তে নেমে না এলে (শক্তির অবতরণ না হলে), সমাধির পর সাধকের বাক্‌স্ফূর্ত্তিও হয় না।

শাস্ত্র বলেন, সমাধি দ্বিবিধ (১) ভাব সমাধি=সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, (২) অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। "যদত্রঃ নাত্রঃ নির্ভাসঃ স্তিমিতোধিবৎ স্থতম্। স্বরূপ-শূন্যং যদ্ধ্যানং তৎ সমাধি বিধীয়তে' (কুলার্ণব)। একাগ্রচিত্তে যখন ধ্যেয় বস্তু সম্যক্ প্রজ্ঞাত হয়, তখনকার অবস্থাই 'ভাব সমাধি'—ভাবের মূল দৃষ্ট হয়। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হ'লে ধ্যেয়বিষয়ক বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয়, সুতরাং তখন ধ্যেয় বস্তুও প্রজ্ঞাত হয় না। অর্থাৎ তখন বাহ্য বা অভ্যন্তর ব'লে কিছুই থাকে না। তন্ত্রের সাধক—কুণ্ডলিনী উত্থাপনের সময়—সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে কুণ্ডলিনীর দ্বারা গ্রসিত (গ্রস্ত) হ'তে দেখেন; সর্ব্ববৃত্তিই এইরূপে সকুণ্ডলিনী আনন্দে স্থিত হয় সর্ব্বশেষে, ইহা 'আনন্দ সমাধি'। ইহা সর্ব্ববৃত্তির একত্বে স্থিতি। আমরা যা কিছু বলি, যা কিছু প্রকাশ করি, সবই আমাদের করতে হয় জাগতিক দিক্ দিয়ে—সসীমের দিক্ দিয়ে; কিন্তু মন্ত্রদ্রষ্টা তত্ত্ব দর্শন করেন অতীন্দ্রিয় যোগজ জ্ঞান সহায়ে, সুতরাং সেখানে সসীম জ্ঞানের যে ভুল, তা হয় না। সমস্তই তত্ত্ব, এ বোধ থাকলে তত্ত্বেরই অবতরণ মনে হবে সর্ব্ব বস্তুকে, তখন 'তত্ত্ব' ও 'গুণ'—এই দুয়ের পার্থক্য নিয়ে বিবাদও হবে না।

জড় জগতে, একাগ্রচিত্ত বা যাকে 'বস্তু সমাধি' নাম দেওয়া যেতে পারে, সেই 'বস্তু সমাধি' না হলে জড়ের সত্যও প্রকাশ পায় না। অধ্যাত্ম সমাধির ক্ষেত্র ব্যাপক, অসীম ও সর্ব্বগ্রাসী, বস্তু সমাধির ক্ষেত্র বস্তুতেই নিবদ্ধ।

(জ্যোতির্ব্বিদ উইলিয়াম হার্শেল একবার ছায়াপথ পর্য্যবেক্ষণ করতে করতে তিনঘণ্টাকাল সংজ্ঞাশূন্য হয়ে যান—নিস্পন্দ স্থির হয়ে প'ড়ে থাকেন। তিনঘণ্টা অন্তে তাঁর বিদুষী জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদ্ ভগ্নী কেরোলিনাকে জানান যে তাঁর (উইলিয়ামের) এতদিন বিশ্বাস ছিল যে অসংখ্য অসংখ্য ঘন তারকাপুঞ্জপ্লাবিত দীপ্তির মধ্যে (ছায়াপথের মধ্যে) গহ্বর নেই, কিন্তু তিনি দেখেছেন যে সত্যই তার মধ্যে গহ্বর বর্ত্তমান অর্থাৎ ঐসব গহ্বরে নীহারিকা নেই।। আকাশের মধ্যে গহ্বর মানে নক্ষত্রশূন্য ঘোর তমসাবৃত স্থান। তাঁর ঐ দর্শন আজ শক্তিশালী দূরবীক্ষণ সত্য প্রমাণ করেছেন। বিজ্ঞান জগতে, আর্য্যের আবিষ্কারগুলি ঐ রকম ভাবে হ'তে পারে না কি ?]

বীজ ও বীজের অভিব্যক্তি

তন্ত্র বলেন, যিনি প্রণবের সপ্ত অঙ্গ, চতুষ্পদ, ত্রিস্থান ও পঞ্চদেবতা না জানেন তিনি ব্রাহ্মণ হ'তেই পারেন না। মহাভারত বলেন, জন্মকালে সবাই শূদ্র, উপনয়ন সংস্কারে দ্বিজ, বেদ পাঠে বিপ্র, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম—অর্থাৎ ওঁকার—জ্ঞাত হলে হয় ব্রাহ্মণ। মহাভারত অজগর প্রশ্নে আছে যে, ব্রাহ্মণ তনয় যদি ব্রহ্মজ্ঞান বিহীন হন, তিনি চণ্ডালাপেক্ষাও অধম এবং চণ্ডাল যদি ব্রহ্মজ্ঞান্ সম্পন্ন হন, তাঁকে উত্তম ব্রাহ্মণ ব'লে গণ্য করতে হবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে ওঁকারের বা ব্রহ্মের তিন নামের কথা উপনিষদে দেখেছি—পরব্রহ্ম, অপর ব্রহ্ম, তুরীয়। তন্ত্রশাস্ত্র সেই রকম বলেছেন—অপর-প্রণব, পরপ্রণব, মহাপ্রণব। উপনিষদ বলেন, সবই ব্রহ্ম, জীবাত্মা ও ব্রহ্ম—আত্মা চতুষ্পাৎ (কাবিকোপেত ২)। ঐ রকম ত্রিস্থান বা ত্রিমাত্রার কথা আছে, সপ্ত অঙ্গ ও একোনবিংশতি মুখের কথা আছে।

প্রশ্নোপনিষদে, "এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ যদোঙ্কারঃ ··"। ওঁকারের দুই রূপ, পর ও অপর; উভয়ের উপাসনায় একটি ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। তারপর ঐ ৫৮।৬ এ, "ওঁকারের তিন মাত্রা, সাধনকালে ঐ তিনটি পৃথক পৃথক বোধে প্রযুক্ত হলে সাধক মৃত্যুমতিই থেকে যান ('ত্রিস্রোমাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা···'), মৃত্যুর পারে যান না; পরস্পর পরস্পর যোগে সম্যক্ প্রযুক্ত হলে বাহ্য, অভ্যন্তর, মধ্যম (জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি) রূপ কোন অবস্থার ক্রিয়াতে সাধক বিচলিত হন না।" প্রণবের তিনটি মাত্রা সমষ্টি ভাবে ধ্যেয়, পৃথক ভাবে নয়—এই বলা হয়েছে।

'অ', 'উ', 'ম'=ওঁ; অপর প্রণব শব্দব্রহ্ম স্বরূপ। তাঁর সপ্ত অঙ্গ—'অ', 'উ', 'ম', 'নাদ', 'বিন্দু', 'কলা', 'কলাতীত'। 'কলা' মানে অঙ্কুর=মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, চিত্ত=(অন্তঃকরণ); 'কলাতীত' মানে এ সবের মধ্যে ওতঃপ্রোত চৈতন্য। চতুষ্পদ=স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ, সাক্ষি। পঞ্চদেবতা=ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, মহেশ্বর। বীজ, পরা অবস্থা; সাক্ষি=তুরীয়। অতএব তন্ত্র বলছেন যে ব্রহ্মা আদি দেবতার চতুষ্পদ বা চারি অবস্থা আছে—স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষি। সৃষ্টি কার্য্যে ব্রহ্মার চারি ক্রিয়াভাব, চারি অবস্থায় বিভিন্ন ভাবে স্থিতি; এই রকম সকলের। পুরাণে, সূক্ষ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাদির

দিব্যদেহ ও স্থূল সৃষ্টি প্রভৃতির শরীর—এই উভয়েরই বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁদের ভাবের ক্রিয়ার বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে, একটিকে অপরটির ঘাড়ে চাপানোর জন্য অসামঞ্জস্য বোধ হয়। সাম্যাবস্থাই মূল প্রকৃতি = নির্গুণ। এই নির্গুণ প্রকৃতি + ব্রহ্ম = পরপ্রণব ; আর পরপ্রণব + অপরপ্রণব = মহাপ্রণব। নির্গুণ প্রকৃতি + ব্রহ্ম মানে 'সচ্চিদানন্দ' = অর্দ্ধনারীশ্বর (আনন্দ স্থান)। এই ওঁকারের ভিন্ন ভিন্ন ভাব, সমস্তই আমাদের মধ্যেই আছে—চক্রমধ্যে। 'ষট্-চক্রের' মধ্য দিয়ে কুণ্ডলিনীর উত্থান হয়, সহস্রার নিলে হয় ৭টি চক্র—সবই আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান ; সুতরাং তন্ত্র বলেন 'আমিই অপর প্রণব, আমিই পর প্রণব, আমিই মহাপ্রণব। কারণ, আমার মূলাধারে 'অ'কার রূপী ব্রহ্মা —পৃথ্বী ; স্বাধিষ্ঠানে, 'উ'কার রূপী বিষ্ণু—অপ ; মণিপুরে, 'ম'কাররূপী বহ্নি—তৈজসদেহী রুদ্র ; অনাহতে 'নাদ'রূপী বায়ু—নাদস্বরূপ ঈশ্বর ; বিশুদ্ধে, আকাশরূপী বিন্দুস্বরূপ মহেশ্বর ; আজ্ঞায়, মনোরূপী কলাস্বরূপ 'পরশিব' ; আমার সহস্রারে কলাতীত চণকাকার ব্রহ্ম। সপ্তচক্রই আমার সপ্ত অঙ্গ ; ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ আমার পাদচতুষ্টয় ; ত্রিগুণই ত্রিস্থান—আমিই ওঁকার রূপী ব্রহ্ম, আমিই নানা ভাবে দৃষ্ট হই।

[৺ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার সংকলিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ইহার বিশদ বর্ণনা আছে, সম্পূর্ণ তন্ত্রের দিক্ দিয়ে]।

সাম্যাবস্থা বা মূল প্রকৃতির বিকৃতি বা 'অবরোহ' হয় না। 'অবরোহ'কেই বলা হয় 'বিকৃতি'। অবরোহে 'আদ্যাশক্তি'রই বিকৃতি আছে। মূল প্রকৃতি হ'তে যেন আর একটি দীপ জ্বলে উঠল। আদ্যাশক্তিতে বিকৃতি মানে অদৃষ্ট বশতঃ গুণক্ষোভ হওয়া। তখন তমোগুণের আবির্ভাব হয়, তাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন চৈতন্যযুক্ত শক্তি। আদ্যাশক্তি হ'তে জাত হন মহাকাল। এই বিভেদ বোঝবার জন্যই একটি পুংরূপ অপরটি স্ত্রীরূপা বলা হয়।

['স্ত্রীরূপং কালিকারূপং পুংরূপং পরমেশ্বরঃ। সুবর্ণং একরূপং হি দ্বিরূপং হি মূর্ত্তিকল্পনা''॥ পুনঃ ''একমেবাদ্বিতীয়ঞ্চ ব্রহ্ম নিষ্কলং সকলং। পুংস্ত্রীরূপং সকলঞ্চ একমেবাদ্বিতীয়কং॥ একরূপো মহাকালঃ পুরুষোনাস্তি তাদৃশঃ। তথৈব যোষিতা কালী কামরূপা মহোজ্জ্বলা''॥ (তন্ত্রকল্পদ্রুম ষড়াম্নায়তন্ত্র, ৩য় পটল ২৯৬ ও ৩৬৯ দ্রঃ]।

নিজশক্তি হ'তে আবির্ভূত তমোগুণে নিজে অনুপ্রবিষ্টা হন। তন্ত্রের ভাষায় ইহাই বলপূর্ব্বক 'বিপরীত রতি' দেবীর।

মহাবিন্দু=অহং—ইদং এ প্রতিভাত। অহং=অব্যক্ত, অর্থাৎ ব্যক্ত হবার আধার তখনও তৈরী হয়নি='শিববিন্দু' বা 'পরবিন্দু' বা 'প্রথমবিন্দু'। বহির্বৃত্তি, 'স্থূল অর্থ', মানসবৃত্তি, 'সূক্ষ্ম অর্থ'। স্থূল অর্থের যথার্থ প্রতিবিম্বই সূক্ষ্ম অর্থ। প্রথম বিন্দু সমষ্টিরূপী, সত্বগুণ—শ্বেত; দ্বিতীয় বিন্দু, অর্দ্ধচন্দ্রের পরিণতি, স্পন্দনতা, রজোগুণ—রক্তবর্ণ। ঐ দুই বিন্দুই "সিত শোণ যুগলং কামকামেশ্বরীরূপং দিব্য মিথুনং।" বিন্দু, বর্ণ, আদি বলা হয় বীজের দিক্ হ'তে। ইনিই অভিব্যক্ত হন শ্রীগুরুমূর্ত্তিরূপে। কামেশ্বর=পরাসম্বিৎ নিরুপাধিকা। 'কাম' অর্থে, এখানে করেছেন 'যোগীজন বাঞ্ছিত ঈপ্সিত বস্তু'; কামকলা=বিশ্বকাম।

[কাম—"কাম্যতে অভিলষ্যতে স্বাত্মত্বেন পরমার্থবিদ্ভিঃ মহদ্ভির্যোগিভিরিতি কামঃ। তত্র হেতু কমনীয়ত্বং স্পৃহনীয়ত্বং ...।" "...পুরুষো দ্বিবিধাকারঃ সকলো নিষ্কলাত্মকঃ। ৮৫। নিষ্কলশ্চ নিরাকারোঽহঙ্কারো দিবি গতঃ। চিৎকলা সকলা রেখা মহাশূন্য-প্রকাশিনী ॥৮৬। নাদরেখা ত্রিকোণা হি বিন্দুবর্ত্মনিরূপকঃ। অনাদিরাদির্ণাদোহি ভানুবিন্দু প্রকাশকঃ ॥ ৮৭। ষট্শূন্যে পরমা বিদ্যা ঘনস্থূল-প্রকাশিনী। জগদ্‌যোনিঃ কামকলা কলাপ্রচারিণী" ॥ ৮৮। পুনঃ 'আদিকাম স্বরূপঞ্চ অন্তকলা স্বরূপিনী...।" তন্ত্রকল্পদ্রুম, ষড়াম্নায় তন্ত্রে নিগম সন্দর্ভে ১ম পটলঃ ও ঐ ঐ ১১৩ দ্রঃ]।

স্ফুরণরূপের নাম 'বিমর্শশক্তি'। প্রলয়কালে শব্দব্রহ্ম ও বিমর্শশক্তির একীভূত অবস্থা। সত্বগুণ প্রকাশময়। বিমর্শশক্তি, 'শ্বেতবিন্দুতে' প্রবিষ্ট হলে হয় 'মিশ্রবিন্দু'। বিমর্শশক্তির এই ক্রিয়ায় বা 'বিপরীত রতিতে', ঐ সর্ব্বতেজোময় সৃষ্টিমুখী হলে, নাম হয় তাঁর 'নাদাত্মিকা শক্তি'—যাঁর গর্ভে 'বীজ' ও 'তেজ'রূপে বর্ত্তমান ৩৬ তত্ত্ব। এই ৩৬ তত্ত্বের বহির্বিকাশই জগৎ। নাদাত্মিকাশক্তির গর্ভস্থ বীজ ও তেজ অতি সূক্ষ্মরূপে থাকায় 'শৃঙ্গাটকের,' আকার ধারণ করে—অর্থাৎ 'ইচ্ছা' ও 'জ্ঞান', 'ক্রিয়া'রূপে তাতে যুক্ত হয়। এই মিলিত 'ইচ্ছা', 'জ্ঞান' ও 'ক্রিয়াই' 'কামকলা'='পরাহংস'। কলা=বিমর্শ শক্তি=বহ্নি, ইন্দু ও অর্কস্বরূপিণী। বেদে ও, 'অগ্নি', 'সোম'—একই সূর্য্যের প্রকাশ।

[৩৬তত্ত্ব = প্রকৃতি, অহংকার, মহত্তত্ত্ব, বুদ্ধি, পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চ মহাভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চকলা, ষডাধ্যাস। পঞ্চকলা = নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তা, শান্তাতীত। ষড়াধ্যাস = কলা, তত্ত্ব, ভুবন, বর্ণ, পদ, মন্ত্র। পঞ্চকলাকে 'তত্ত্বসমন্বয়' ও বলে]।

'কামকলা'ই মহাত্রিপুবসুন্দবী। কামকলাব 'পশ্যন্তিভাব' হ'তেই অক্ষব উৎপন্ন হয়। ঐ বক্তবিন্দুব 'বব'ই 'নাদব্রহ্ম'—অক্ষবৰূপী বর্ণোৎপত্তির মূলস্থান; এবং ঐ 'শ্বেতবিন্দু' হ'তে পঞ্চ মহাভূতের উদ্ভব হয়, অর্থাৎ 'শ্বেত' ও 'বক্ত'—এই উভয় বিন্দু হ'তেই ইহা সম্ভব হয়। আগমে আছে, যখন শ্বেতশিব বক্তশক্তিতে থাকেন, শম্ভু (শিবের মঙ্গলরূপ) কর্তৃক 'পবা' ভিদ্য হয়, তখনকাব ঐ শক্তিস্থিত 'বক্তশম্ভু'ই 'পবতত্ত্ব'; 'বক্তশিব যখন শ্বেতশক্তিতে থাকেন, তাকেই 'পবাশম্ভু' বা 'সচ্চিদানন্দ' নাম দেওয়া হয়। 'নাদ' সৃষ্টিমুখী হলে, ব্যোমৰূপে প্রথম প্রতিভাত হয়, আব 'বিন্দু'ই নাদে স্ফুটিত হয়। পঞ্চ মহাভূত ও অক্ষব হ'তেই বিশ্ব সৃষ্টি হয়—অর্থাৎ 'প্রকাশ-বিমর্শ' যোগে ব্রহ্মাণ্ডেব উদয়। 'পশ্যন্তি' ভাবাশ্রয়ে ইচ্ছা শক্তির গতি বা স্পন্দন অঙ্কুশাকাব হলে—হয় সৃষ্টিবীজেব প্রথমভাব—'বামা বেখা', 'বামা শক্তি' (সৃষ্টিব নিঃসবণ)। ঐৰূপে 'মধ্যমা বাক্' বা শব্দই জ্ঞানশক্তি, ঋজুবেখাকাব 'জ্যেষ্ঠা শক্তি'—যেখানে মাতৃকাভাবেব বিশেষ স্পন্দন বা প্রথম উপপন্ন। ক্রিয়াশক্তিই দেবী বৌদ্রী—বৈখবী ভাব, অর্থাৎ 'ত্রিকোণাত্মিকা আধাব'। 'বামা' ও 'জ্যেষ্ঠা'—এই দুই শক্তিব মিলিতাবস্থা হ'তেই মাতৃকাব অক্ষব বা বাসনাব উদ্ভব, আব বৌদ্রী হ'তে স্থূল অক্ষব বা সংস্কাব উদ্গত হয়।

'মাতৃকা' মানে মা—বিশ্বমাতা দেবী কুলকুণ্ডলিনীব আব এক ৰূপ বা নাম। কুণ্ডলিনীব আবোহ ও অববোহ লক্ষ্য কবলে বোঝা যায় যে, স্থূল হ'তে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হ'তে স্থূলৰূপে শক্তি নানা ভাবে আত্ম প্রকাশ কবেন। চিদাকাশ হ'তে অন্য সমস্ত আকাশ, ও, সেই আকাশেই শব্দ হ'তে ধ্বনি পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হয়। আমরা মনে কবি, শব্দ আকাশেব গুণ, বস্তুতঃ শব্দ আকাশে অভিব্যক্ত হয়—উৎপত্তি হয় না।

শৃঙ্গাটক আদিব ন্যায়, গান ও এমনভাবে গীত হয় যে, বেখাটি সোজা যায় বা অঙ্কুশাকাব হয় বা শৃঙ্গাটক হয়। তন্ত্রমতে, জগৎ = কামকলাব প্রসাবিত ভাব = শ্রীচক্র। এই শ্রীচক্রেব মধ্যস্থান বা কেন্দ্রই—'ইদং' বা বিন্দুতত্ত্ব। 'ইদং'ই পবারূপা বা পবশক্তি স্বৰূপা; 'ইদং' এবই বিকাশ ত্রিকোণরূপে। ইহাই

'বৈন্দবী চক্র'। শক্তিব প্রথম স্পন্দন বা 'ঈক্ষণ'ই 'পবমাকলা'। ইনিই 'অম্বিকাৰূপা', ইনিই 'পবাবাক্', ইনিই 'পবমাশান্তা'। 'শান্তা', চিন্ময়ীশক্তি বা 'সমবসাবস্থা', সেখানে সমস্তই শান্ত বা নিস্পন্দ—'শান্তধাতু, মন আস্ফালন নাহি কবে'। মহাকাল ও মহাকালীব বিপবীত বতিজাত বীজ প্রকৃতি গর্ভ হ'তে নির্গত হয়ে অক্ষব ৰূপে ব্যক্ত হয়। এই কুণ্ডলীব মহামাতৃকাসুন্দবী ৰূপেব ৫১টি কুণ্ডল অর্থাৎ ৫১টি মাতৃকা যা স্থূলে বর্ণরূপে প্রকাশ। কুণ্ডলীব ১টি কুণ্ডল হলে, নাম তার 'বিন্দু', দুটি থাকলে, বিসর্গ বা প্রকৃতি পুরুষ, ৩টিতে 'নাশশক্তি' ইত্যাদি ; ৫১টিতে নাম হয় 'শ্রীমাতৃকোপত্তিসুন্দবী'। দেহমধ্যে অব্যক্ত পবা শব্দই কুণ্ডলিনী শক্তি। ঈক্ষণ (পবমা কলা), অক্ষবাদিব মূল কাবণ, আত্মাব বিমর্শ শক্তি—পবমা শান্তা আদি। ইচ্ছাশক্তির অঙ্কুশাবস্থা—'পশ্যন্তি'ব শব্দাবস্থাই—বামা শক্তি ; যখন ঐ একই শক্তি ঐ রূপে 'জ্ঞানমুখে' অগ্রসব হন, তাঁব নাম তখন 'ঋজুবেখা' ইত্যাদি। এইৰূপে সাধক শেষে বোঝেন যে বাহ্য বলে কিছু নেই, যা তাঁবই মধ্যে ছিল, তিনি বাইরে দেখেছেন মাত্র।

শব্দ ও শব্দার্থ প্রকাশক পরম বিন্দু বা পবাবিন্দু ভিদ্যমান অব্যক্ত স্বৰূপই শব্দব্রহ্ম বা 'অপব প্রণব'। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই 'পবপ্রণব'। অপবপ্রণব ও পবপ্রণব সমষ্টিই 'মহাপ্রণব'। উপাসনাকালে ঐ তিন প্রণবই স্বৰূপতঃ অভেদ ও শক্তিতে অভেদ—এই বুদ্ধি সহায়ে ওঁ কাবেব আবাধনা কবতে হয়, ভেদবুদ্ধিতে প্রযুক্ত হলে মৃত্যুমতিই থাকে। "যে অবিদ্যাব উপাসনা কবে সে অন্ধতমঃ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, যে বিদ্যাতে বত সে আবো ঘোব তমে প্রবেশ কবে।" ৯। "যে বিদ্যা ও অবিদ্যাকে উভয়েব সহিত জানে সে অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম ক'রে বিদ্যাব দ্বাবা অমৃতত্ব লাভ কবে।" ১১। "যাবা অসম্ভূতিকে (কাবণৰূপা প্রকৃতিকে) উপাসনা কবে, তাবা অন্ধকাবময় তমোমধ্যে প্রবেশ কবে, যাবা সম্ভূতিকে (কার্য্যব্রহ্ম বা হিবণ্যগর্ভকে) উপাসনা কবে তাবা আবো ঘোব অন্ধকাবে প্রবিষ্ট হয়। ১২। সম্ভূতি ও 'বিনাশ' (প্রকৃতি পবিবর্ত্তনশীল—বিনাশ আছে)—এই দুইকে অভেদ ব'লে জানে, তাবা 'বিনাশে'ব দ্বাবা মৃত্যুকে অতিক্রম ক'বে অসম্ভূতিব দ্বাবা অমৃতত্ব লাভ কবে।" ১৪। ঈশ। উপনিষদ বলছেন, বিদ্যা ও অবিদ্যা, সম্ভূতি ও অসম্ভূতি—এই দ্বন্দ্বেব উপাসনায় যদি ভেদ বুদ্ধি থাকে, তাব ফল জড়ত্ব। ভেদবুদ্ধি লক্ষ্য যেন উপাসনায় না থাকে, কাবণ বিদ্যা ও অবিদ্যা—একই বস্তুব দুই দিক। যাবা

ভেদবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে বিদ্যার উপাসনা করে তারা বিদ্যার অহমিকায় আচ্ছন্ন হয়—(নিজেকে 'জ্ঞানী' ঠাওরায়) ও অবিদ্যাকে ঘৃণা করায় আরো তমোময় প্রদেশে প্রবেশ করে (অবিদ্যার উপাসক না জেনে না বুঝে করে—তত্ত্ব বোধের অহমিকা তার নেই)। কিন্তু যারা ঐ দুইকে 'অভেদ' জানে তারা (যাকে অবিদ্যা আখ্যা দেওয়া হয়েছে সেই) অবিদ্যার সাহায্যে মৃত্যু অতিক্রম করে (কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলে), (যাকে 'বিদ্যা' আখ্যা দেওয়া হয় সেই) বিদ্যার দ্বারা অমর হয়; উপাসনায় ওঁ কারের তিনরূপে ভেদবুদ্ধি না থাকে। তন্ত্র বলেন, গুরু, মন্ত্র, দেবতায় ঐক্য বুদ্ধি ভিন্ন সিদ্ধিলাভ বিড়ম্বনা। 'সমস্ত বিদ্যায়' স্থুল, সূক্ষ্ম ও 'পর' অভেদ ভাবতে হয়।

শিবের প্রত্যেক মুখকে এক একটি দিক্ বলা হয়। পূর্ব্ব মুখ = তৎপুরুষ; দক্ষিণ মুখ = অঘোর; পশ্চিম মুখ = সদ্যোজাত, ঊর্দ্ধমুখ = ঈশ্বর; উত্তরমুখ = বামদেব; অধোমুখ = নীলকণ্ঠ, সর্ব্বমুখের কেন্দ্রস্থল = চৈতন্য। জগতের হলাহল কণ্ঠে ধারণ ক'রে আছেন তাই নীলকণ্ঠ বা শ্রীগুরুর কল্যাণতমরূপ। গুরুতত্ত্ব সদা অব্যক্ত হলেও, শিষ্য হৃদয়ে—কারুণ্যে—আধার অনুসারে—গুরু ব্যক্ত হন। জগতের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ব'লেই সহস্রারে তিনি অধোমুখ। এক একটি আম্নায়ের উপদেষ্টা বা গুরু আছেন।

['ঋষ দর্শনে' = মন্ত্রদ্রষ্টাই ঋষি। আম্নায় গুরুগণ মন্ত্রদ্রষ্টা। ঋষি শব্দ তন্ত্রে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত দেখতে পাওয়া যায়; সেখানে ঋষি = সাক্ষাৎ শিবমুখ হ'তে যে শুদ্ধাত্মা শুনে জ্ঞাত হয়েছেন, "মহেশ্বর মুখাজ্ জ্ঞাত্বা যঃ সাক্ষাত্তম মন্ত্রং। সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষি রীরিত॥" যেমন দুর্গাকল্পে, নারদ ভৈরব ঋষি, কালিকল্পে মহাকালভৈরব ঋষি ইত্যাদি। (তন্ত্রতত্ত্ব—৺শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। দ্রঃ]।

ব্রহ্মা—পূর্ব্ব আম্নায়ের গুরু, চতুর্ব্বেদ প্রকাশক—'অ'কার; ঐরূপ, বিষ্ণু দক্ষিণ আম্নায়ের গুরু—'উ' কার; 'ম' কার বা রুদ্র—পশ্চিমাম্নায়ের, ঈশ্বর, উত্তরাম্নায়ের—'নাদ', মহেশ্বর—ঊর্দ্ধআম্নায়ের, 'কলা' বা পরশিব—'অধ আম্নায়ের', 'কলাতীত' বা পরশক্তি, সপ্তমাম্নায়ের গুরু। গুরুই তত্ত্বদ্রষ্টা বা মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থাৎ ঋষি বা প্রকাশক মাত্র। তন্ত্রমতে, সমস্ত বিদ্যা শিবের সপ্তমুখ হ'তেই নিঃসৃত হয়েছে। শিবতত্ত্বের এক একটি ভাবের প্রকাশকই এক একজন ঋষি—এই সপ্তর্ষি। ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডলই চরাচর ব্যাপ্ত হয়ে দিব্য জ্যোতিতে পূর্ণ প্রকাশিত হয়ে আছেন। ইঁহারা পুরাণের সপ্তর্ষি নন্।

সাধনরহস্য

ভারত চিরদিন তত্ত্ব পিয়াসী, তত্ত্বান্বেষী। ঋগ্‌ মন্ত্রের পূর্ব্বে ও আমরা 'নিবিদ' পাই। এই অন্তর্দৃষ্টি, এই বিশেষত্ব ভারত পেয়েছেন কোথা হ'তে? উপনিষদযুগ, সূত্রযুগ ত 'নিবিদ' আবিষ্কারের বহু বহু পরে। এই জগৎ দেখে, সাধক তত্ত্বকে বাইরে দেখেছেন, যেমন ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে পাই— তাঁর সহস্র শির, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ। ঋগ্বেদের ঋষি যেমন 'বিরাট' রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, তেমনি তাঁরা ব্রহ্মের 'হিরণ্যগর্ভ' রূপও দেখেছেন; তাঁরা অখণ্ডসত্তা আদিত্যকেও পেয়েছেন। যে তত্ত্ব ঋষি বাইরে দেখেছেন, সেই তত্ত্বই তিনি নিজের মধ্যে পেয়ে অবাক হয়েছেন; শুধু তাই নয়, তিনি দেখলেন, সেই তত্ত্বই তিনি নিজে,—তাঁর স্বরূপ, যেমন আমরা দেবীসূক্তে পাই। সাধন রাজ্যে সাধকের এই সব বোধ ক্রম প্রস্ফুটিত হয়—পর পর দেখা দেয়।

ধোলো বৈজ্ঞানিক দেশকালের অসীমত্ব দেখে বিস্ময়াপ্লুত ও স্তব্ধ হয়ে যান। সূর্য্য উদয় হবার ৫০০ সেকেণ্ড পরে আমরা সূর্য্যকে দেখি; সেই হ'তে আমরা কাল গণনা করি। মুহূর্ত্ত গণনায় গোড়ায় এই গলদ্। এই গলদের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের সূক্ষ্ম গণনায় বিষম গোল বাধে—ধোলো মনীষীরাই তা দেখাচ্ছেন আজ। এই গণনা 'আমি'ই করি, তার ভুল 'আমি'ই দেখাই, 'আমি'ই অতীত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করি, 'আমি'ই ভবিষ্যৎ ঠিক করি। এই 'অহং'ই সর্ব্ব বিষয়ের মাপকাঠি, এই 'অহং' এর মধ্যেই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, এই 'অহং'ই নিত্য বর্ত্তমান। ভারতের ঋষি এই তত্ত্ব জগতে প্রথম প্রকাশ করেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের এই সূর্য্য, অন্যান্য সূর্য্যের কাছে একটি খদ্যোৎ মাত্র, আমাদের এই সূর্য্যের পরিবারের মত কত কত সূর্য্য সপরিবারে ব্যোমমার্গে ভ্রাম্যমান কে জানে? ঋষিরা জানতেন যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেশ কালে ব্যাপ্ত।

['সংখ্যা চেৎ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন' (দেবী ভাগবত)]।

ররং ধূলিকণার সংখ্যা করা সম্ভব, কিন্তু বিশ্বসমূহের সংখ্যা করা যায় না। "ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদীনাং তথা সংখ্যা ন বিদ্যতে। প্রতি বিশ্বেষু সন্ত্যের ব্রহ্মা

বিষ্ণু-শিবাদয় ॥" (ঐ)। 'সেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবেরও সংখ্যা করা যায় না, প্রতি বিশ্বেই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি আছেন'। এ সমস্ত জেনেও, এই বৈচিত্র্যে ও, ঋষি-হৃদয়ে মোহ উদিত হয়নি। তিনি মূল অন্বেষণ করেছেন, দেখেছেন, 'যা হেথা, তা সেথা'—দেখেছেন সবই সপ্ত প্রধান আবরণে আবৃত—নিজ দেহও তাই। তাঁদের কাছে ঐ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, এই 'অহং' রূপ চিৎসূর্য্য দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছে। বাইরের ঐ সূর্য্য স্বপ্রকাশ—'একচক্ষু'—তাঁকে কেহ প্রকাশ করে না, কিন্তু তিনিই সকলকে প্রকাশ করেন; অতএব ঐ সূর্য্য 'অহং' এরই প্রতিনিধি। যে তত্ত্ববিদ্যার কথা আমরা নানা ভাবে, নবযুগের নতুন আলোক সম্পাতে বোঝবার চেষ্টা করছি, ভারতের সেই তত্ত্ববিদ্যা, মাত্র, সৌর-মণ্ডলান্তর্গত এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ধরার তত্ত্ব নয়. ইহা সমগ্র বিশ্বসমষ্টির অন্তর্গত তত্ত্ব, কারণ ইহা দেশকালাতীত। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডসমষ্টিও, ভারতের ঋষির চক্ষে একটি ছোট বিন্দু মাত্র—বাইরের প্রকাশ; সেই বিন্দুও সপ্ত আবরণে আবরিত!

অনুগীতাতে সপ্ত শিখার কথা আছে। দেহস্থ সমস্ত বায়ুর অন্তর্গত সমান বায়ুর মধ্যে জঠরানলের সপ্তশিখা, চক্ষুকর্ণাদি তার সমিধ, রূপ রসাদি তার সাত ঋত্বিক—এই সমস্ত শরীরস্থ সপ্ত অগ্নিতে রূপ রসাদি সপ্ত বিষয় আহুতি দিয়ে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করতে হয়। সুষুপ্তির সময় ঐ সব গুণ সাধারণ ব্যক্তির চিত্তে বাসনা রূপে থাকে ও জাগ্রত অবস্থায় চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হয়; যোগীদের কিন্তু তা হয় না—তাঁদের অন্তরেই ঐ সব গুণ উৎপন্ন হয় ও তাঁরা আত্মজ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে থাকেন। যে ব্রহ্মজ্যোতি ওতঃপ্রোত ভাবে সর্ব্বত্র রয়েছে, যা আত্মজ্যোতিরূপে প্রকাশ, সূর্য্যই তার প্রতিনিধি। শ্বাস প্রশ্বাসে, প্রতি চিন্তায়, আমাদের প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে আমাদের যে শক্তিক্ষয় হয়, সূর্য্য হ'তেই আমরা সেই শক্তি ফিরে পাই, আর আমাদের জীবনীশক্তির ধারা চলে। সাধনক্ষেত্রে ও এই ব্যাপার—ব্রহ্মজ্যোতিই আমাদের প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ রাখে। সূর্য্যের ৭টি ঘোড়া বলা হয়, ৭ ঘোড়ার রথে চ'ড়ে তিনি সংসারক্ষেত্রে প্রাণ সঞ্চার করেন। সূর্য্য নিজেও 'বাজি' বা ঘোড়া—সূর্য্যের বাজিরূপে পরিণত হবার গল্পও আছে। অনুগীতায় অন্যত্র আছে যে, যিনি পঞ্চ ইন্দ্রিয়, বাক্য, মন ও বুদ্ধিকে বশীভূত করতে পারেন, তিনি স্বরূপে

অবস্থান কবতে সমর্থ হন। কূর্ম্ম যেমন দেহ মধ্যে স্বীয অঙ্গ সঙ্কুচিত ক'বে, তেমনি যিনি বজোগুণ ত্যাগ ক'বে কামনা বা বাসনা সমূহকে সঙ্কুচিত ক'বে বিষয়সমূহ ত্যাগ কবতে পাবেন এবং বিষয়তৃষ্ণাবিহীন, সমাহিতচিত্ত, সর্ব্বজনবন্ধু হ'য়ে অবস্থান কবেন, তিনি যে শুধু সর্ব্বপ্রকাব কামেব প্রভু হন তা নয়, তিনি ঐ উপাযেই ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ কবেন। সাধকেব কূর্ম্মভাব অবলম্বন কবতে হয। জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদয়েব বিষয়, আকাশাদি 'অধ্যাত্ম ও 'অধিভূত' বলা হয়েছে, যেমন 'আকাশেব' 'অধিভূত' শব্দ, 'অধ্যাত্ম' তাব কর্ণ ইত্যাদি।

ভাবতেব সকল সাধকই সাধনাব দুটি অঙ্গ স্বীকাব কবেছেন (১) চিত্তশুদ্ধি (২) ভজন গান ইত্যাদি।

[চিত্তশুদ্ধিঃ শুদ্ধবুদ্ধির্বিনা ক্রমমুপাসনা। নির্গুণো নিষ্ফলো দেব উপদেব বিডম্বনা।" (পূর্ব্বোক্ত বডাম্নায়তন্ত্র ৪র্থ পঃ ১১৬)।]

তন্ত্রেব ক্রম উপাসনাতে ও কোন ফল হয় না চিত্তশুদ্ধি ও শুদ্ধবুদ্ধি বিনা। সঙ্গীত বিদ্যাব কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হয়েছে। ভাবতে জ্ঞানপন্থী সাধকও—যাঁদেব সম্বন্ধে অনেকেব ভ্রান্ত ধাবণা আছে, তাঁবাও—গীতবিদ্যাকে সাধনেব অঙ্গ বলে স্বীকাব কবেন। শ্রীশঙ্কবেব মত জ্ঞানপন্থী সাধক কোথায়? তিনি সঙ্গীত বিদ্যাব আদব কবতেন।

[শঙ্কব সম্প্রদায়ের শাখা 'গিবি' সম্প্রদায়ের লক্ষণ, 'বাসো গিরিবরে নিত্যং গীতাভ্যাসে হি তৎপর......"। 'সবস্বতী' সম্প্রদায়ের লক্ষণ "স্বরজ্ঞান বশো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্ববঃ. .]।"

ভাবতীয় মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষেব সাধককুলও সঙ্গীতকে সাধনাঙ্গ মনে কবেন। প্রাণ কোথা হ'তে আসে জড়বিজ্ঞান তা জানে না। সাধক বলেন "তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" স্থাননিবদ্ধ সুপ্ত আনন্দই জডবৎ প্রতীয়মান। বিকশিত আনন্দই প্রাণ। প্রাণই অধ্যাত্ম। অতএব সাধনা মানে আনন্দকে স্ফূর্ত্তিরূপে দেখবাব প্রচেষ্টা। গৌডীয় বৈষ্ণবসাধক বলেন যে তিনি 'চক্ষু মুদিলে' অন্তবে 'বস-ঘনকে' দর্শন কবেন, 'চক্ষু মেলিলে' সর্ব্বত্র তাঁবই স্ফূবণ দেখেন। বৈষ্ণব সাধকেব 'প্রেম', তান্ত্রিক সাধকেব শিবকাম।

[উক্ততন্ত্রে 'ক্রমের' কথাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "চিচ্ছক্তী সুপ্রসন্নেন সর্ব্বরূপস্য দর্শনং। গুরুকৃপা বিনা শক্তিঃ ন প্রসন্না ভবেৎ কদা ॥৯৭॥ প্রথমে গুরুদীক্ষাদিঃ ক্রমে একাগ্রসাধনা। ব্যগ্রত্বং জাগ্রত্বং শক্তেঃ ততঃ সদ্‌গুরু ভাবনা।" ৯৮। অন্যত্র "মন্ত্রহীনে ক্রিয়াহীনো জ্ঞানহীনো বিড়ম্বিতঃ। মন্ত্রার্থং মন্ত্র-চৈতন্যং যোনিমুদ্রা ন বেত্তি যঃ ॥১৬৬॥ শতকোটি জপেনৈব তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে।······"॥১৬৭॥"·· প্রথমে আত্ম-জ্ঞানং হি দ্বিতীয়ে বিদ্যা-চিন্তনং। তৃতীয়ে শিব-তত্ত্বঞ্চ সকল-নিষ্কলাত্মকং ॥১৭২॥ ত্রিবিধং ত্রিবিধং সর্ব্বং ক্রমেণ শৃণু সাদরং। দেহ-জ্ঞানেন দাসোঽহং আত্মজ্ঞানে তদংশকং ॥ ব্রহ্মজ্ঞানেন পূর্ণোঽহং ইতি মে নিশ্চলাত্মনঃ। বীর্য্যরূপ-পিতাস্ততো গর্ভাগারে প্রবেশনং ॥১৭৪॥ নভেদোভেদঃ প্রত্যক্ষঃ সেব্যসেবক রূপকঃ। স্থূল সূক্ষ্মমাত্রং ভেদো বীজং বৃক্ষে যদা ভবেৎ ॥১৭৫। (উক্ততন্ত্র ৩য় পঃ।]

অনুবাদ বা সারার্থ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন—এতই ভাষা সহজ। 'ঈশাবাস্যং' ক'রে নিলে সাধনরাজ্যের পথ সহজ হয়।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলিও সাধনশাস্ত্র, কেবল মনস্তত্ত্ব নয়। দর্শনশাস্ত্র ঋষি রচিত। বেদই দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ, এই চার রকম পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষই পরম পুরুষার্থ, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। অতএব, যে প্রণালীতে জীবন যাপন করলে বা কর্ম্ম করলে অভ্যুদয় হয় ও মুক্তি আসে, তাই সমস্ত দর্শনে আলোচিত হয়েছে—চার্ব্বাক দর্শনাদি নাস্তিক দর্শন ছাড়া। আত্মজ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ষাত্মক তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তিদ। আত্মশ্রদ্ধা জাগরিত না হ'লে ঐ জ্ঞানের উদয় হয় না। হিন্দু বলেন, আত্মশ্রদ্ধহীন ব্যক্তিই নাস্তিক, 'বেদ' অস্বীকার যে করে সেই নাস্তিক। সাংখ্য বা মীমাংসা, ঈশ্বর না মেনেও বা ঈশ্বর সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু না বলেও আস্তিকদর্শন ও বেদানুগামী। দর্শনশাস্ত্রে যে মতদ্বৈধ দেখা যায় তার প্রধান কারণ আমরা প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্রের নিজস্ব ভাব দিয়ে দর্শনগুলি বুঝতে চেষ্টা করি না। এক একটি দর্শন এক একটি দিক্ দিয়ে তত্ত্বালোচনা করেছেন। যাঁর যা দিক্ তার সঙ্গে অপরাপর দিকের কথা তুলে আমরা গোলযোগ করি। টীকাকার ভাষ্যকারদেরও প্যাঁচ আছে।

'বিবর্ত্তবাদ' নিয়ে বৃথা বিতণ্ডা হ'য়েছে। সে সব আলোচনায় বহুস্থলে আলোচনাই হয়েছে—জীবনাদর্শের দিকে কোন ঝোঁক্ না দিয়ে।

আমবা দেখি বহু, আমবা দেখি বৈচিত্র্য, আমবা চাই বৈচিত্র্য, আমবা পাই সুখ দুঃখ, দেখি সৃষ্টি শৃঙ্খলা আদি দ্বন্দ্ব—আমাদেব কাছে এ সমস্তই বাস্তব, সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাম দিয়ে ঐ সব বোধ হয়। বজ্জুতে সর্প ভ্রমেব মত, পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে—মাত্র একটি ইন্দ্রিয দ্বাবা গৃহীত হলে ভ্রম হবেই। 'মায়া' মানে যে বাস্তব ঘটনাব বিবৃতি, ইহা নতুন কথা হ'লেও তা বোঝবাব, বোঝাবাব সময এসেছে। ঈশ্ববেই সৃষ্টি কল্পনা, সৃষ্টি বয়েছে তাঁতে, অতএব দ্বন্দ্বেব মোহ নেই তাঁতে—তিনি মাযাধীশ, মায়াব মধ্যে থেকেও। ঈশ্বব ত দূবেব কথা, মহামানবেও যে আমবা ইহা দেখি। ঈশ্ববে ভেদ নেই, সবই তাঁতে, সবই তিনি। নিজেব প্রতিবিম্ব দেখাটা স্বগতভেদ বা কোন ভেদ নয়। আমবা ভুলে যাই যে আমাদেব 'সত্য' যেটি, ঈশ্ববেব 'কল্পনা' সেটি। সাধকেব অবস্থাব ক্রমই যে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত —ইহাও বোঝবাব ও বোঝাবাব সময় এসেছে।

তান্ত্রিক সাধনা

১

শ্রীরূপগোস্বামী মতে, সাধন = নিত্যসিদ্ধ স্বতঃসিদ্ধ ভাবগুলিকে হৃদয়ে উদ্দীপন কবা (তত্ত্বসন্দর্ভ)।

শ্রীমদ্ভাগবৎ বলেন, যে আশু হৃদযগ্রন্থিকে ত্যাগ কবতে হলে তন্ত্র মতে সাধন কবা উচিৎ।

["ব আশুহৃদয়গ্রন্থিং···তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্।"—১১শ স্কন্ধ দ্রঃ। শুনেছি শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "বেদ বেদান্ত শুনবি, সাধন করবি তন্ত্রমতে"।]

সাধনে দুটি জিনিষ প্রথম দরকাব, (১) দেহশুদ্ধি—ভাবধাবণ কববার আধাব যাতে প্রস্তুত হয়, (২) চিত্তশুদ্ধি। তন্ত্র বলেন, "সংস্কাবেণ বিনা দেহশুদ্ধির্ন জায়তে।" সেই জন্য দীক্ষাব দবকাব। যাতে দিব্যভাব স্ফুবণ হয়, ভববন্ধন দূব হয় তাব নাম দীক্ষা।

[দিব্যভাব প্রদানাচ্ছ ··ভববন্ধবিমোচনাৎ।"—কুলার্ণব ১৭ উ। ৫১।]

দীক্ষাব উদ্দেশ্যই চিত্তশুদ্ধি। তন্ত্র বলেন, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ কালে, তীর্থে বা সিদ্ধক্ষেত্রে, গুরুমুখে মন্ত্র শুনলেই হয় দীক্ষা। (বিশ্বসাব তন্ত্র)। অন্যান্য

যুগে দীক্ষা, মহাদীক্ষাদির ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কলিযুগে উপদেশেই দীক্ষা হয়। "উপদেশঃ কলৌ যুগে"—(তন্ত্রসারোদ্ধৃত বিশ্বসার তন্ত্রের বচন)। শিষ্য, গুরুকে প্রণাম করেন "হে দেব তোমার কৃপায় কৃত্যাকৃত্য হয়েছি," "মায়ামৃত্যু মহাপাশাদ্বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽহমস্মি"। গুরু আশীর্ব্বাদ করেন "বৎস ওঠ 'মুক্তোঽসি'—তুমি মুক্ত, আচারবান হও, আয়ুকীর্ত্তি ইত্যাদি লাভ কর"। ভারতে গুরু শিষ্য সম্পর্ক বড়ই স্নেহমধুর। অন্যত্র, গুরু বলছেন "হে বিদ্বান, নির্ভীক হও তুমি, ঐ সেই পথ যা ধ'রে যতিরা সংসারের পারে গেছেন, সেই পথ তোমাকে নির্দ্দেশ করব"।

["মা ভৈষ্ট...তব নিদিশ্যামি।" বিবেকচূড়ামানি-৪৩। ব্রহ্মমন্ত্রী তন্ত্রসাধক যখন ব্যক্তসন্ন্যাস গ্রহণ করেন, গুরু সে সময়ে শিষ্যকে আত্মস্বরূপ মনে করেন, "নমস্তভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ। ত্বমেব তৎ তৎ ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোঽস্তুতে।" (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—৮উঃ। ২৬৭)। অর্থাৎ তোমাকেও নমস্কার, আমাকেও নমস্কার, তুমি তৎস্বরূপ পবং ব্রহ্ম।]

ব্রহ্মমন্ত্রীর স্বমন্ত্রে শিখাচ্ছেদনেই হয় সন্ন্যাস। (ঐ ঐ ২৬৮)। ভারতে গুরু মানে 'চাবুক' নয়। শিষ্য নিজেই গুরুকে আত্মসমর্পণ করেন ভালবাসায়।

তন্ত্রে গুরু শিষ্যের লক্ষণ দেওয়া আছে। গুরুর সামিপ্য শিষ্যের হওয়া চাই, তা হলে উভয়ে উভয়কে পরীক্ষা করতে পারেন। গুরু শিষ্যকে, অন্ততঃ এক বৎসর পরীক্ষা করবেন। তন্ত্রে দীক্ষার কালাদি বিচার আছে। স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রে কালাদি নিয়ম নেই। সিদ্ধগুরু, ধ্যানে শিষ্যের উপযোগী বীজ ও মন্ত্র দর্শন করেন; এক্ষেত্রে গুরুর আহ্বানই দীক্ষার কাল। শিষ্যের উপযোগী মন্ত্র কি হ'তে পারে তার জন্য ফলিত জ্যোতিষের সাহায্য নিতে হয়। মন্ত্র মানে, যার চিন্তনে সংসার (যাতায়াত) হ'তে ত্রাণ পাওয়া যায়; সুতরাং এত বড় গুরুতর ব্যাপারে শিষ্যের কল্যাণ কামনায়, গুরু, নক্ষত্রচক্র ও রাশিচক্র বিচার করেন। মন্ত্র গৃহীতার নামের আদ্যক্ষর ও মন্ত্রের আদ্যক্ষর যদি 'একভূত' বা 'একদৈবত' হয় তাকে বলে 'স্বকুল' অন্যথা 'অকুল'। 'স্বকুল' মন্ত্রই গ্রহণীয়। এটার নাম কুলাকুল চক্র। তারপর 'অকথহ' চক্র 'অকডম' চক্র, বিচার ক'রে, 'ঋণী ধনী' চক্র বিচার ক'রে ঠিক করতে হয়। ঐ উপায়ে আদি অক্ষর যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ বিচার করতে হয়। তারপর তিথি, নক্ষত্র, মাস, বার, সময় আছে।

দেবতাময় হ'য়ে দেবতাব উপাসনা কবতে হয়, তন্ময়ত্ব বিনা ইহা সম্ভব হয় না। অতএব, সাধনে যাতে একাগ্রবুদ্ধি আসে তা প্রথম হ'তেই কবা দবকাব। কোন বস্তুকে হৃদযে ধ'বে বাখতে হলে, চাই ভাবেব গাঢ়ত্ব বা তন্ময়ত্ব। ভালবাসাব পাত্রে মনকে অটল বাখা সম্ভব হয় ভাবেব গাঢত্বে। নিত্যতাব দিকে মন ঠিক্ বাখাই ভালবাসাব লক্ষণ। ভালবাসা ভিন্ন ভাবেব একতানতা হয় না। ভাবেব একতানতাই নিষ্ঠা। নিষ্ঠা না থাকলে উপাসনা বৃথা। তাই তন্ত্র, ভাবেব প্রাধান্য দিয়েছেন—ভাব ভিন্ন সবই বৃথা। যেমন গুডেব মিষ্টতা জিহ্বাব দ্বাবাই অনুভব কবা যায়, ভাব সেইরূপ হৃদয় দিয়েই বোঝা যায়। এক মহাভাবই উপাধি ভেদে নানারূপ হয়। ভাবেব প্রগাঢতায় ঐ সব নানা ভাব, মহাভাবেই লয় পায়। এই ভাবই "আনন্দঘনসন্দোহ' প্রভু, এই ভাবই 'প্রকৃতিবূপধৃক্', এই ভাবই রসস্বরূপ সেই আত্মা, এই ভাবই পবম, এই ভাবই মহান্; এই ভাবরূপ বসই 'শ্রোতব্য', 'মন্তব্য', ও 'নিদিধ্যাসিতব্য'। (কৌলাবলী তন্ত্র-১১ উঃ দ্রঃ)। তাবপব তন্ত্র বলছেন যে, গুরুবাক্যরূপ প্রমাণ দ্বারাই এই ভাবময় আত্মা ধ্যাতব্য।

ভাব অনুসাবে তন্ত্র সাধককে তিন শ্রেণীতে ভাগ কবেছেন—পশু, বীব, দিব্য। পশু মানে জানওয়ার নয়। পাশবদ্ধ সাধক, প্রথম সাধকই 'পশু'। 'পশুব' শক্তি নিদ্রিত, তাঁব কাম ক্রোধাদি প্রবল। স্থতবাং তাঁকে কঠোর বিধি নিষেধেব মধ্য দিযে যেতে হয়। ভূয়োদর্শনজাত জ্ঞান নিয়েই আমবা কর্ম্মপথে অগ্রসব হই। ঐ ভূয়োজাত জ্ঞানেব বাহ্যপ্রয়োগেব নাম 'প্রবৃত্তি' আব উহাই সাধনে বা মনসংযমে প্রযুক্ত হলে, নাম তাব 'নিবৃত্তি'। ঐ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে যথাযথ চালনাই 'ধর্ম্ম', ইহা সাধাবণ ভাবেব কথা, শেষ পর্য্যন্ত ইহাতে ভেদজ্ঞান থেকে যায়। এই ভেদ বা দ্বৈতবুদ্ধি নিয়ে যাঁবা থাকেন, তাঁবা 'পশু'। এই পশুব মধ্যে দুই শ্রেণীব লোক দেখতে পাওয়া যায়; যাঁবা সাধক, যাঁবা দ্বৈতভাব হ'তে মনকে উর্দ্ধে তুলে 'বীব' হবাব চেষ্টা কবেন। এই এক শ্রেণীব। অপব শ্রেণীব লোকেবা, কিছুই কবেন না, কবতে চান না, বদ্ধভাবে থাকতে ভালবাসেন। "ঘৃণা-শঙ্কা-ভয়-লজ্জা-জুগুপ্সা-কুল-জাতি-শীলানাং ক্রমেণাবসাদনং।" (পবশুবাম কল্পসূত্র ১০, ৭০)। জুগুপ্সা= লোকনিন্দা—লোক নিন্দাব ভয়। কুলার্ণব ঐ গুলিকে "অষ্টপাশৌ পবিকীর্ত্তিতা" ব'লে পবে বলছেন, "পাশবদ্ধঃ পশু প্রোক্তঃ পাশমুক্ত সদাশিবঃ।"

সাধক ঐ অষ্টপাশ সাধন সহায়ে ছিন্ন করতে করতে অগ্রসর হন— "ক্রমেণাবসাদনং। সাধক মানে, যিনি সার সংগ্রহদ্বারা ধর্ম্মমার্গেস্থিত ও যাঁর করণ গ্রাম নিয়মিত।

দীক্ষা বহুপ্রকারে হয়, বহু দীক্ষার নাম আছে; যথা, স্পর্শদীক্ষা, দৃগ্‌দীক্ষা, বেধদীক্ষা, ক্রিয়াদীক্ষা ইত্যাদি। ক্রিয়াদীক্ষা ৮ রকম, বর্ণদীক্ষা ৩ রকম, কলা দীক্ষা ৩ রকম; তা ছাড়া পঞ্চায়তনী প্রভৃতি অনেক রকম দীক্ষা আছে। শাম্ভবী দীক্ষা ও মনোদীক্ষাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। "গুরোরালোক মাত্রেণ ভাষণাৎ স্পর্শনাদপি। সদ্যঃ সঞ্জায়তে জ্ঞানং সা দীক্ষা শাম্ভবী মতা॥" (কুলার্ণব ১৪।৫৬)। মনোদীক্ষা দু'রকম—তীব্র ও তীব্রতরা; গুরুর ইচ্ছা মাত্রেই অথবা শিষ্যকে স্মরণ মাত্রেই শিষ্যের কর্ম্মক্ষয় ও সঙ্গে সঙ্গে সমাধি! ইহা 'শাম্ভবীর' অন্তর্গত। প্রত্যেক দীক্ষাই এক একটি 'সংস্কার'। সাধক যতক্ষণ না 'অভিষিক্ত' হন ততক্ষণ তাঁর 'পশু' ভাবের সাধন। শাক্তাভিষেকে, কোন কোন স্থলে, গুরু, সাধককে 'বীর' ভাব সাধনের আংশিক অধিকার দেন। 'পূর্ণাভিষেক' ঠিক্ সাধারণ ভাবের দীক্ষা নয়, ইহা বেধাদি দীক্ষার অন্তর্গত। বেধাদি দীক্ষার আর একটি নাম 'আভ্যন্তরী'। বেধদীক্ষায়, ধ্যানদ্বারা গুরু শিষ্যকে পোষণ করেন। তন্ত্র বলেন, ধ্যানদ্বারা পোষণ ব্যাপারে গুরু 'কুর্ম্মবৎ' হন। বেধদীক্ষা মানস। তন্ত্র আরো বলেন যে, শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতা অথবা সাধকের গ্রহণক্ষমতা বা আধার না থাকলে দীক্ষা ফলপ্রদ হয় না। পূর্ণাভিষিঞ্চনে বা অভিষেকে গুরুদত্ত মন্ত্রের যাতে পূর্ণতা লাভ হয় তার উপায় শিক্ষা দেওয়া হয় মাত্র। যিনি শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষাগুরু বা আচার্য্য। আচার্য্য মানে, যিনি স্বয়ং আচরণ ক'রে বা জীবন দেখিয়ে শিষ্যকে আচারে স্থাপিত করেন। (কুলার্ণব ১১ উ। ১৭৬)। পাখী যেমন স্বপক্ষ আচ্ছাদনে নিজ শিশুকে রক্ষা ও পোষণ করে, স্পর্শ দীক্ষায় গুরু সেই রকম আজীবন শিষ্যকে রক্ষা করেন। দৃগ্‌দীক্ষা—গুরুর কৃপাদৃষ্টির দ্বারাই সাধিত হয়; মাছ যেমন দৃষ্টির দ্বারা ডিম রক্ষা করে, গুরু শিষ্যকেও সেই রকম রক্ষা করেন। এই রকম নানা দীক্ষার কথা কুলার্ণবে ও অন্যান্য তন্ত্রে আছে।

পূর্ণাভিষেক গ্রহণের পর সাধক প্রথম 'বীর' ভাব আশ্রয় করেন, সেই

সঙ্গে সাধক 'পাদুকা মন্ত্র' (গুরু সাধন তত্ত্ব) পান ; কিন্তু সম্প্রদায় বিশেষে, এমন অনেকে আছেন যাঁবা নিজেদেব পূর্ণাভিষিক্ত ব'লে পবিচয দেন, অথচ 'পাদুকা মন্ত্র' পান নি বা আংশিক পেয়েছেন। গুরুব কাছে যিনি যেটি পান, তাই নিয়ে গোলযোগ কবাব নাম অজ্ঞতা অথবা সাম্প্রদাযিকতা। তা ছাডা পাদুকা মন্ত্র একটি নয়। তন্ত্রবাজতন্ত্রে গুরুপূজায সপ্তাক্ষবী পাদুকামন্ত্রেব ব্যবস্থা আছে, অন্যত্র ৭।৮ বকম 'পাদুকা মন্ত্র' আছে। 'পাদুকা পঞ্চকে" দ্বাদশাক্ষবী পাদুকামন্ত্রেব কথা উক্ত হয়েছে। পাদুকামন্ত্র সাধনে, গুরুতত্ত্ব সাধকেব হৃদয়ে স্ফুবিত হয়, গুরু, ইষ্ট, ও ব্রহ্মেব একত্ব সাধন হয়—গুরুদত্ত বীজ ও মন্ত্রেব পূর্ণ সার্থকতা আসে। সাধকদের মধ্যে, সম্প্রদায় বিশেষে, 'পাদুকা' পেযেও, সাধক ব্রহ্ম মন্ত্র পান না। ব্রহ্মমন্ত্রও একটি নয়। সগুণ অর্থাৎ মন্ত্রবিগ্রাব 'বিন্দু' আদিব সাধক সগুণ ব্রহ্মমন্ত্র পান। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেব ব্রহ্মমন্ত্র একটি নয়, কুলার্ণবেব অন্য, এইরূপ বিভিন্ন তন্ত্রে। তন্ত্রেব সাধনায়, প্রথম গুরুমুখে প্রাপ্ত বীজ ও মন্ত্র পবিত্যক্ত হয না। সর্ব্বপ্রকাব 'মহাবাক্য' নামে পবিচিত ব্রহ্মমন্ত্রেব ব্যবহাব ও প্রয়োগ, তন্ত্র সাধনায়, বিশেষ বিশেষ স্থলে, সাধককে কবতে হয়।

সাধাবণতঃ, যাঁবা 'পশু' গুরুব কাছে দীক্ষা পান, তাঁদেব 'পশু' ভাবেব সাধন, বীবেব কাছে দীক্ষিত হলে 'বীবভাব', কৌলেব কাছে দীক্ষিত হলে 'দিব্যভাব'। দিব্যভাবই আদর্শ। দিব্যভাবেব দিকেই 'উত্তম বীব' দৃষ্টি স্থিব বেখে অগ্রসব হন। ব্রহ্মমন্ত্রী পূর্ণাভিষিক্ত সাধকই কৌল, দিব্যভাবেব সাধনাই তাঁব লক্ষ্য। দিব্যভাব অবলম্বন ক'বে, কৌল, কুলাচাব অবলম্বন কবেন, যিনি তা না কবেন, পূর্ণাভিষিক্ত হলেও, 'ভাব-বিচ্যুতিব' জন্য তাঁব পুনঃ সংস্কাবেব প্রয়োজন। কৌল কোন নিয়মেব অধীন থাকতে বাধ্য নন, তিনি জ্ঞানদণ্ড মথিত ক'বে সাধনে অগ্রসব হন। তমোগুণ ও বজোগুণকে যিনি রিপু জয় দ্বাবা অতিক্রম কবতে অভিলাষী তিনিই 'বীব'। কুলজ্ঞানী হলে তবে হয় কৌল। তিনিই সৎ কৌল যিনি সমস্ত বস্তুতে ব্রহ্মেব স্ফুবণ দেখেন ও ব্রহ্মই সমস্ত বস্তুর আধাব—এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হন (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—১০ম উঃ দ্রঃ)।

•

[দিক্ কাল নিয়মো নাস্তি স্থিত্যাদি নিয়মঃ প্রিয়ে। নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্র সাধনে।...মথিত্বা জ্ঞানদণ্ডেন বেদাগম মহোদধি। সার এবঃ মহাদেবি কৌলাচার

প্রকীর্ত্তিতঃ ॥" (কৌলমার্গরহস্য ধৃতবচন—৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ)। বীর—"বীত-রাগমদক্লেশ কোপ মাৎসর্য্য মোহতঃ। রজোস্তমো বিদূরত্বাদ্বীর ইত্যাভিধিয়তে ॥" (কুলার্ণব—১৭উ।২৫)। পূর্ণাভিষেক—"অহন্তাবহরাত্তীতি মথনাৎ সেচনাদপি। কম্পানন্দাদিজননাদভিবেক ইতি স্মৃতঃ ॥" (ঐ ১৭উ—৫২)। এই অভিষেক দুরকম, "অভিষেকস্তু দ্বিবিধং বাহ্যো বা জ্ঞানিনামপি। রাজ্যাভিষেকে দেবেশি বৈদাকঙ্ক চরেৎ। জ্ঞানিনামভিষেকস্তু সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্ ॥" (নিরুত্তর তন্ত্র)। অকুল কুল, কৌল—"অকুলং শিব ইত্যুক্তং কুলং শক্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা। কুলাকুল সম্বন্ধানান্নিপুণাঃ কৌলিকাঃ প্রিয়ে ॥" (কুলার্ণব-১৭উ।২৭)। "কৌগারাদি নিবোধত্বাৎ লয় জন্মাদি ভঞ্জনাৎ। অশেষ কুল সম্বন্ধাৎ কৌল ইত্যভিধীয়তে ॥" (কুলার্ণব-১৭উ।৪৫)।]

পূর্ণাভিষেকের সময় শিষ্যের একটি নাম হয়; সে নতুন নামের সঙ্গে 'আনন্দনাথ' যুক্ত হয়। ব্রহ্মমন্ত্রী 'নাথ' স্থলে 'স্বামী' নাম ও গ্রহণ করেন ও করতে পারেন। বৈদিক সন্ন্যাসেও নামকরণ হয়, সকলেই তা জানেন। পূর্ণাভিষেকের পর, সাধকের বীরাচার সাধনের বাহ্য উপকরণ সমস্তই থাকে; ধীরে ধীরে কৌল 'ভাবনাপর' হন ও তখন তাঁর আর বাহ্য উপচারের প্রয়োজন থাকে না। তিনি বাহ্যভাবে পূজা করলেও প্রত্যেক জিনিবটির 'বাসনা' জেনে সেইভাবে ভাবিত হন। দীক্ষার উদ্দেশ্য যখন দিব্যভাব স্ফুরণ, তখন 'বীর' ও সেই দিকে অগ্রসর হন। বীর কুলদ্রব্য নিয়ে সাধন করেন; কুলদ্রব্য = পঞ্চমকার = মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন। সব সময়ে সাধকের যে ঐ ৫টি চাই তা নয়। তন্ত্ররাজতন্ত্রে শেষতত্ত্ব বা 'মৈথুনের' উল্লেখ পর্য্যন্ত নেই, অথচ 'পর' সাধনার উপদেশ আছে। স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর (পরা)—এই তিন ভাবের সাধনের উপদেশ তন্ত্রে আছে। পশুর—স্থূলভাব, বীরের—সূক্ষ্ম ও পরা, এই দুই মিশ্রিত ভাব; কৌলের—পরা বা ভাবনা অর্থাৎ দিব্য। বীরকে সূক্ষ্ম বা 'বাসনা' অবলম্বন করতে হয়।

[পূর্ণাভিষেকে, নামকরণে, 'নাথ'—নামের সঙ্গে যুক্ত হয় (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ১০ম উ। ১৮২) স্বামী—"স্বান্তঃ শান্তি সমুন্মীলৎ পরতত্ত্বার্থ চিন্তনাৎ। মিথ্যাজ্ঞান বিহীনত্বাৎ স্বামীতি কথিতঃ প্রিয়ে (কুলার্ণব, ১৭উ।১৫)।]

কুল = জীব, প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক্, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু—এই নয়টি জিনিব বোঝায়। ঐ নয়টি জিনিবে ব্রহ্মবুদ্ধি অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্ম

ইত্যাকাব বুদ্ধিতে বা ভেদবুদ্ধি বহিত হয়ে যে আচবণ তাহাই কুলাচাব (কৌলেব আচাব)—(মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৭ম উ ৯৮)। বীব বা দিব্যভাবনাবলম্বী সাধকেব সামনে সর্ব্বদা দিব্যভাব জাগরুক থাকা চাই। তিনিই 'বীর' যিনি সত্ত্বগুণসম্পন্ন; "কুলদ্রব্যং নিষেবেত যদা সত্ত্বাধিকা মতিঃ। অন্যথা সেবন কুর্ব্বন পতনায়ৈব কল্পতে ॥" অর্থাৎ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন না হয়ে কুলদ্রব্য ব্যবহাবে পতন। যে বুদ্ধিব দ্বাবা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মোক্ষ বুঝতে পাবা যায় তাব নাম সাত্ত্বিকী বুদ্ধি—(শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা ১৮।৩০ দ্রঃ)। কু=পৃথিবী, পৃথ্বীতত্ত্ব যাতে লীন হয় তাব নাম 'কুল'। পৃথ্বীতত্ত্ব মূলাধাবে, সেইজন্য মূলাধাবকে ও 'কুল' বলা হয়। সুষুম্নাব সঙ্গে সম্বন্ধ বিধায় সুষুম্নাকে ও 'কুল' আখ্যা দেওয়া হয়। সুষুম্না সহস্রাবে মিলিত হয়; এই সহস্রাবাচ্যুত অমৃতেব নাম 'কুলামৃত'। (কৌলমার্গ বহস্য দ্রঃ)। পূর্ব্বে বলেছি' 'কুল' বা নযটি জিনিষে ব্রহ্মবুদ্ধি সম্পন্ন হ'তে হয়। পৃথ্বীতত্ত্ব, 'তত্ত্ব তখন হয়, যখন ইহাকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখা হয়।

['কুলতত্ত্ব' বলতে 'বজ্রপুষ্পাদি' যা বোঝায় সেগুলি বৌদ্ধ বামাচার হ'তে গৃহীত। 'তত্ত্ব' কথাটির অর্থ কষ্ট কল্পনা ক'বে বিকৃত করার দরকার নেই। ভারতীয় তন্ত্র ঐগুলিকে ও 'ঈশাবস্যং' ক'রে নিয়েছেন, এই পর্য্যন্ত এখানে বলা যায়]।

সাধন বা অধ্যাত্মবিদ্যা বুঝতে হলে যে উপায় অবলম্বন কবতে হয়, তা কবা দবকাব, নতুবা ভাসা ভাসা জ্ঞান হয় ও ভুল ধাবণা থেকে যায়। সাধন ক্ষেত্রে, সাধাবণের পক্ষে আলোচনা কববাব একটা বীতি আছে, তাব একটা নির্দ্দিষ্ট সীমাও আছে, গোঁড়ামি কোন ক্ষেত্রেই ভাল নয়। তন্ত্রে সম্বন্ধে যে সব বিষম ভ্রম বর্ত্তমান তা দূব কববাব জন্য প্রত্যেক ভাবতবাসীব, বিশেষতঃ বাঙ্গালীব, অগ্রণী হওয়া উচিৎ। ধোলো দেশে এসব বিষয়ে বহুদিন অনেকে অগ্রণী হয়েছেন, তাব মধ্যে উড্‌বফ সাহেবেব নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকেব ধাবণা যে কৌলাচাবে পশু ভাবেব সাধনাকে হীনচক্ষে দেখা হয়েছে; সত্য—ঠিক্ ইহাব বিপবীত। এক শ্রেণীব তন্ত্রেব নাম পশ্বাচাবতন্ত্র। ঐ সব তন্ত্রে পশুভাবেব প্রশংসা আছে; এমন কি কুলাচাবযুক্ত হয়ে যে তন্ত্রে সাধনেব কথা আছে, সেখানে ও উল্লেখ আছে যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন 'পশু' হঠাৎ নাবায়ণ তুল্য হয়ে যান। বীব ভাবেব প্রসঙ্গসময়ে বীবভাবেব ও যথেষ্ট প্রশংসা। দিব্য-ভাবকে সবাই একবাক্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিয়েছেন। যিনি যে ভাবেব সাধক, তাঁর

কাছে সেই ভাবই শ্রেষ্ঠ। যেখানে গোঁড়ামি থাকবে, তা আমাদের ত্যাগ করতে হবে, তবে শাস্ত্র মর্ম্ম বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। এক ঘেয়ে হ'তে নেই, ঝালে, ঝোলে, অম্বলে, রসাস্বাদন করতে হয়। ইহা মনে রাখতে হবে যে, তন্ত্রশাস্ত্র কেন, কোন শাস্ত্রই ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেন না। প্রভেদ এই যে, সব রকম রুচির লোক সাধনেচ্ছু হলে, তন্ত্রের মধ্যে প্রত্যেকে আপন আপন পথ দেখতে পাবেন। বুদ্ধির জোরে অধ্যাত্ম শাস্ত্র বোঝা যায় না। গুরুমুখী বিদ্যায় গুরুবর্ত্ম অনুসরণ ক'রে তপস্বী ও সংযমী হ'তে হয়। মাথা, বচন, আর অনুকরণে অভ্যুদয় আসে না।

বৈদিক সাধনায় অধিকারী ভেদ আছে; কিন্তু তন্ত্রের উচ্চাঙ্গ সাধনায় সকলের অধিকার। বিপ্র, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, সকলেই—মানুষমাত্রেই—কুলাচারী হ'তে পারেন (মহানির্ব্বাণতন্ত্র ১৪ উঃ ১৮)। মাত্র যোগ্যতা অর্জ্জন করা চাই। কুলাচারের সাধনকে গোপন রাখতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যাঁরা কুলাচার গ্রহণ করেন নি, যাঁরা এমতে সাধনা করেন না, তাঁদের কাছে ইহা গোপনীয়। ইষ্টমন্ত্র যে হিসাবে গোপনীয়, বিশেষভাবে ইষ্টের সাধনও গোপনীয়; বৈদিক সন্ন্যাস-সংস্কার-বিহীনের কাছে যেমন ঐ সংস্কার ও সন্ন্যাস-মন্ত্র (মহাবাক্য) গোপনীয়, কুলাচার ও কৌলদীক্ষা সেই হিসাবে অকৌলের নিকট গোপনীয়। ঔৎসুক্যে ধর্ম্মলাভ হয় না, হয় সাধনায়। বাহ্য আচার দেখে, 'রহস্য' জানা যায় না। কুলাচারীর ভাবই স্বতন্ত্র। বিচার ও একমাত্র মনস্তত্ত্বের মধ্য দিয়ে না গিয়ে, কৌল সাধক, বাহ্যআচার, বাহ্যভাব এবং চিন্তা, বিচার, মনের বল ও আনন্দের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে চান্। কুলাচারীর অসাধারণত্ব তাঁদের চিন্তার প্রণালীতে, নতুবা ইহার মধ্যে অলৌকিকত্ব কিছুই নেই। নিজ নিজ সাধনক্রম সকলেই গোপন রাখেন, প্রত্যেক সাধকই এতাবৎ এই গোপনীয়তার মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে এসেছেন; যাঁরা তা না করেন, তাঁদের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান আছে কিনা সন্দেহ। যাঁরা শ্রদ্ধাবান তাঁরা কখন কোন উন্নতি-কামী সাধকের মাথায় বিপরীত ভাব ঢুকিয়ে তাঁর উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেন না। "আত্মরহস্যং ন বদেৎ"। "শিষ্যায় বদেৎ"। (কৌলোপনিষদ্ ৩০।৩১)। এই নীতি সর্ব্বসম্প্রদায়ের সকল সাধকই স্বীকার করেন। "ন কুর্য্যাৎ পশুসম্ভাষণম্।" (ঐ ২৮)। ইহা 'পশু'র প্রতি

ঘৃণাজন্য নয়। প্রথম সাধকের পক্ষে সাবধানতা দরকার। নতুন ব্রহ্মচারী পক্ষেও গৃহীর সঙ্গে আলাপ করা নিষিদ্ধ। ইহার উদ্দেশ্য আত্মভাব র আত্মরহস্য রক্ষা করা।

"গতং শূদ্রস্য শূদ্রত্বং বিপ্রস্যাপি ন বিপ্রতা। দীক্ষাসংস্কার সম্পন্ জাতিভেদো ন বিদ্যতে।" (কুলার্ণব-১৪শ উঃ ৯০)। দীক্ষাসংস্কারে জাতি ভেদ ঘুচে যায়। এই জাতি ভেদ ঘুচে যাওয়া মানে পাত ছোড়াছুড়ি ক'রে খাওয়া নয় বা অযথা রক্তমিশ্রণ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "ভক্তের জাত নেই।" উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে মনের মলিনতা দূর হয় না। দীক্ষাসংস্কারে জাতিভেদ থাকে না, কারণ, "দীক্ষাগ্নিদগ্ধ কর্ম্মাসৌ মায়াবিচ্ছিন্ন বন্ধনঃ।" (ঐ-৩০)। এই রকম শ্রদ্ধা হৃদয়ে জাগ্রত হওয়া চাই।

"ম" কার নিয়ে সাধন করলেই 'বীর' হয় না। বীরের লক্ষণ, "অহং প্রলয়ং কুর্ব্বন্ ইদম্ প্রতিযোগিনঃ। স বীর ইতি বিজ্ঞেয় স্বাত্মানন্দ নিমগ্নধীঃ॥" অর্থাৎ যিনি আত্মানন্দে নিমগ্ন থাকেন ও যিনি মনে করেন 'মার' আজ্ঞায় আমি প্রলয় ঘটাতে পারি।'

[উক্ত বীরের লক্ষণ কৌলমার্গ রহস্যে পরশুরাম কল্পসূত্রে লক্ষণতন্ত্র ধৃতবচন দ্রঃ। (পরশুরাম কল্পসূত্রের শেষে পরশুরামের এইরূপ আত্ম পরিচয় দেওয়া আছে,—'ইতি শ্রী দুষ্টক্ষত্রিয়কুলকালান্তক বেণুকাগর্ভসম্ভূত—মহাদেব প্রধানশিষ্য—জামদগ্ন্য পরশুরাম-ভার্গব মহোপাধ্যায়-মহাকুলাচার্য্য নির্ম্মিতং কল্পসূত্রং সম্পূর্ণম্)]।

কৌল যখন বাহ্যভাব অবলম্বন করেন, তখন তিনি বীরাচারী বাহিরে। 'পশু' সাধকের 'ম'কারে অধিকার নেই। বীর বা কৌল 'ম'কার কি ভাবে গ্রহণ করবেন ব'লে দেওয়া আছে। বীরের বাহ্য যাগ ও অন্তর্যাগ (ভাবনা) দুইই অবলম্বন ক'রে অগ্রসর হ'তে হয়, তাঁর বাহ্যভাবই প্রধান, কিন্তু তিনি 'বাসনা' জানেন, কৌলের অন্তর্যাগই প্রধান অবলম্বন, বীরের সহায়তার জন্য বা শিক্ষার জন্য অথবা নতুন কিছু শেখবার ও বোঝবার জন্য তিনি বাহ্যভাব অবলম্বন স্বেচ্ছায় করতে পারেন। 'বাসনা' না জেনে 'ম'কারসেবী হলে পতন। বাহ্যপূজায় প্রত্যেক ক্রিয়াকে কি রূপে ভাবনা করতে হয় তার উপদেশ আছে, ইহার নামই 'বাসনা'। 'বাসনা' সম্যক্ জানা চাই অর্থাৎ শ্রীগুরু ও কুলশাস্ত্রের অর্থ বুঝে, ও গুরুবর্ত্ম অনুসরণ ক'রে দৃঢ় চিত্ত হ'য়ে পানাদি করতে হয়, নতুবা পতন। ঐ কল্পসূত্র বলছেন যে

'ম'কারকে ব্রহ্মের আনন্দরূপের অভিব্যঞ্জক মনে করতে হয়; তার সাধন গোপনীয়, প্রাকট্যে নিরয়। যাগকাল ভিন্ন অন্য সময়ে 'ম'কার সেবন নিষিদ্ধ। যজ্ঞকালে যেমন বিপ্রের সোম পান বিধি আছে, সেই রকম উপযুক্ত সময়ে মদ্যপান ভোগমোক্ষদ। মন্ত্রার্থ স্ফুরণ ও মনস্থৈর্য্যই উদ্দেশ্য থাকবে, ভোগের উদ্দেশ্যে যে পান করে সে পাতকী।

['শ্রীগুরোঃ কুলশাস্ত্রেভ্যঃ সম্যগ্বিজ্ঞায় বাসনাম্। পঞ্চমুদ্রা নিষেবেত চান্যথা পতিতো ভবেৎ॥" (কুলার্ণব, ৪।৯১) "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং, তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতং তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাঃ ত্রৈবর্চ্চনং গুপ্ত্যা, প্রাকট্যান্নিরয়ঃ।" (এই ভাবের কথা তন্ত্রে সর্ব্বত্র)। "মৎস্যমাংসসুরাদীনাং মাদকানাং নিষেবনং। যাগকালং বিনান্যত্র দূষণং কথিতং প্রিয়ে॥" (কুলার্ণব ৫।৮৯)। "যথা ক্রতুষু বিপ্রাণাং সোমপানং বিধীয়তে। মদ্যপানং তথা কার্য্যং সময়ে ভোগমোক্ষদম্॥" (ঐ, ঐ ৯০)। "মন্ত্রার্থ স্ফুরণার্থায় মনসঃ স্থৈর্য্য হেতবে। ভবপাশ নিবৃত্ত্যর্থং মধুপানং সমাচরেৎ॥" (ঐ ঐ ৮৩)। "তৃপ্ত্যর্থং পিতৃদেবানাং ব্রহ্মধ্যান স্থিরায় চ। সেবেত মধুমাংসানি তৃষ্ণায় চেৎ স পাতকী॥" (ঐ, ঐ ৮৬)। (তৃষ্ণা – রিপুর তৃষ্ণা)]।

সাধক কি ভাব অবলম্বন করবেন? আচার কি তাঁর? ঐ কল্পসূত্রের উত্তর—"নির্ভয়তা সর্ব্বত্র", আচার, "অন্তঃশাক্তঃ। বহিঃ শৈবঃ। লোকে বৈষ্ণবঃ। অয়মেবাচারঃ।" (কৌলোপনিষদ্)। অর্থাৎ হৃদয়ে থাকবে মহাতেজ, বাইরে হবেন সাধক ধীর, স্থির, শান্ত, আর, ব্যবহারে বিনয়নম্র ভক্তিভাব—ইহাই আচার।

তন্ত্রে যেখানে উচ্চাঙ্গ সাধনার উপদেশ আছে, সেখানে 'পশু'ভাবের নিন্দা আছে। এ নিন্দা তিরস্কার বা ঘৃণা নয়, নিষ্কাম সাধক যাতে সকাম না হ'য়ে পড়েন তার জন্য এই সাবধানতা। বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের কথায় ঐ রকম কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা আছে। ভারতের কালচার না বুঝলে ঐগুলিকে পরস্পর বিরোধী মনে হবে। গোঁড়ামি বাদ্ দিয়ে, যিনি যে দিক দিয়ে জিনিষটি বলছেন, তাঁর সেই দৃষ্টিকোণ দিয়ে বস্তু বোঝবার চেষ্টা করতে হয়। বালককে যুবার আচরণ করতে দেখলে শাসন করা হয়; উদ্দেশ্য সিদ্ধির মতলবে, যুবা বালকের অনুকরণ করলে তাকে 'ভণ্ড', 'ন্যাকা' বলা হয়—যৌবনকাল বা বাল্যকালকে নিন্দা করা হয় না। পশ্বাচারীর সাধন পুরাণাদি সম্মত, পুরাণ বেদ বিরোধী নয়। তাই ইহা 'বেদাচার'। স্বামীজি বলেন

যে, যাঁবা তন্ত্র সম্বন্ধে যা তা বলেন তাঁবা ব্রাহ্মণগ্রন্থেব, বিশেষতঃ অধ্যর্য্যু ভাগেব, সঙ্গে তন্ত্র মিলিযে পডলে দেখবেন যে বৈদিক মন্ত্রগুলি অবিকল তন্ত্রসাধনায় ব্যবহৃত হয়েছে, যে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানগুলি বৈদিক অনুষ্ঠানেব সংস্কৃত আকাব, আব, হিমালয় হ'তে কুমাবিকা অবধি শৈব বা বৈষ্ণব সকলেই তন্ত্রসম্মত অনুষ্ঠানের অনুগামী।

['The Tantras... .represent the Vedic rituals in a modified form, and before anyone jumps to the most absurd conclusion about them I will advise them to read the Tantras in connection with the Brahmans, especially the Adhawryu portion...As to their influence, apart from the Sroutha and Smarta, all other forms of ritual observed from the Himalayas to the Commorin have been taken from the Tantras and they are observed by the Shaktas, by the Saivas and by the Vaisnabs alike"—স্বামীজি]

তন্ত্রে সাধনাঙ্গ

[পূর্ব্ব বারের প্রশ্নের সংক্ষেপ উত্তব। নির্গুণ নির্বিকল্পের 'অবতরণ' হয় না। নিরপেক্ষ সাপেক্ষ হয় না। কিন্তু অবতাব পুরুষাদি নির্বিকল্প সমাধি হ'তে বিশ্ব-কল্যাণ-রূপ কাম-সূত্র ধ'রে অবতরণ করেন। ঐ সূত্রটি 'পররূপে' কল্যাণতম পরমসুখ বা নিত্যানন্দ স্থান। এই অবতরণ-প্রণালী নিয়েই সাধনশাস্ত্র। পর পর অবতরণ :—

পবাসম্বিৎ = নিষ্কল শিব = চণকাকার (অবিনাভাবসমবন্ধ) বা নিত্য মৈথুনস্থান। ইহা তত্ত্বাতীত। তারপর, 'তদেজতি তন্নৈজতি,' স্থির সাপ ও চলমান সাপ—শিব-শক্তিতত্ত্ব। ইহা সগুণব্রহ্ম—অবতরণের মূল কাবণ। উন্মনী শক্তি—শিব-শক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত, সমনীশক্তি—শক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত। এই শিব-তত্ত্বের শিব = 'শক্তি' এবং ঐ শক্তিতত্ত্বেব শক্তি = চিদ্রূপিণী। ঐ শিব-শক্তিতত্ত্বকে 'তত্ত্ব' বলা হয় সুবিধার জন্য—তত্ত্বের উদয় তখনও হয় নি। পরেব ধাপে 'অহং ভাব—সংস্কাব উদ্‌গত না হওয়ায়—'ইদংহীন' = সদাশিব = কেবলোঽহং = প্রকাশমাত্রা (জাগতিক 'অহং' এর 'পর')—তত্ত্বের উদ্ভব, 'ইদং', 'ধ্যামলপ্রায়' 'অহং'এর সামনে খাডা হয়েছেন। তারপর 'অহং-ইদং', এখানে 'অহং' প্রবলতম = মন্ত্রমহেশ্বর, 'ইদং' = 'নাদশক্তি'

—বিমর্শ (জাগতিক 'ইদং'এর 'পরা'। ইহাই 'সদাখ্যতত্ত্ব।' পরে 'ইদং' প্রবল হ'লে, 'অহং'=মন্ত্রেশ্বর, ইদং='বিন্দু'শক্তি। ইহাই ঈশ্বরতত্ত্ব। পরে 'অহং-ইদং'এর সমভাব, এখন 'অহং'=মন্ত্রাদি='ইদং'=সদ্বিদ্যাতত্ত্ব (শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব)। উন্মনী ও সমনী শক্তিদ্বয়ের আবির্ভাব হ'তে 'সদ্বিদ্যাতত্ত্ব' পর্য্যন্ত=শিবতত্ত্ব বা শুদ্ধতত্ত্ব। এ পর্য্যন্ত 'অহং' হ'তে 'ইদং' বিচ্ছিন্ন, বা পৃথক নয়। তারপর একে একে 'বিজ্ঞানকলা', 'মায়াকোশ' ও 'কঞ্চুকা'দিরূপে শক্তির প্রকাশ হ'লে, 'অহং' হ'তে 'ইদং' সম্পূর্ণ পৃথক হ'য়ে যায়—'মায়ারপ্রলয়কলা',=পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব (অহং+ইদং)। শিবতত্ত্বের অন্তর্গত 'ইদং'গুলি—সমস্তই 'অহং' এরই অবিভক্ত অংশ, তাই ইহার নাম 'শুদ্ধতত্ত্ব' —মায়াশক্তি ও দ্বৈতের পারে। অবতরণে, 'বিদ্যাতত্ত্ব'=মায়া+পঞ্চকঞ্চুক+পুরুষ ='শুদ্ধাশুদ্ধতত্ত্ব'। 'আত্মতত্ত্ব'=দ্বৈতজগৎ (প্রকৃতি হ'তে পুরুষ পর্য্যন্ত ২৪ তত্ত্ব) =অশুদ্ধতত্ত্ব। ২৪ তত্ত্বের ঊর্দ্ধের ধাপগুলি, পুরুষ—প্রকৃতি উদ্ভবের ইতিহাস বলা যায়। অর্থাৎ ঐ দ্বৈতভাবের ভেদক নির্দ্দেশ করা হয়েছে।

ব্রহ্ম অপরিণামী, কিন্তু শক্তিরূপে তাঁর পরিণামও দৃষ্ট হয়—সৃষ্টিতে তিনি বহুরূপে প্রতিভাত। ইহাই 'মায়া'। মায়া ব্রহ্মময়ী, চিদ্রূপিনী,—গুণত্রয়রূপ অনাদি কর্ম্মসংস্কার তাঁতেই ধৃত। যখন ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নেই তখন গুণগুলি=চিৎশক্তি। ঐ চিদ্রূপিনী মহাদেবী='প্রকাশবিমর্শসামরস্যরূপিনী।' মায়া, ভাবরূপ অজ্ঞান নয়— "পূর্ণস্যপূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"। সবই চিৎশক্তি। বলা হয়, অন্তঃকরণে আত্মার প্রতিবিম্বন=চিদাভাস (মন, চেতনবৎ প্রতীয়মান হয়) বা জীব। আগমমতে, এই চিদাভাস স্বীকার করবার প্রয়োজন নেই, কারণ, সবই চিৎ। সর্ব্বপ্রকার শক্তি বা শক্তি প্রকাশের কারণের নাম 'আদ্যাশক্তি' বা 'যোগিনী'। ইনি স্ববিদ্—নিজেকে নিজে জানেন, অন্য কেহ তাঁকে জানেনা। একমাত্র শিবই তাঁর হৃদয় জানেন। শিব বা ব্রহ্মই মায়াশক্তিরূপে গতি ও পরিণামের কারণ=শিব, ঈশ্বরীরূপে মায়াশক্তি। 'ব্যবহারিক' 'পারমার্থিক', 'প্রাতিভাসিক' সত্যগুলি কি ? 'অভাব'ই বা কি, 'ভাব'ই বা কি ? তন্ত্র বলেন "অভাবস্ত্বমেকা গুণাতীতরূপা, ত্বমেবাসি ভাবো···"। মনে রাখতে হবে, তন্ত্রশাস্ত্র, সাধনশাস্ত্র, ইহা সাধনার সর্ব্বাবস্থাতেই চিন্ময় বোধ দৃঢ় রাখতে বলেন। সাধারণ বা জাগতিক দৃষ্টিতে সাধনা হয় না। চিন্ময়বোধ ভিন্ন উপাসনা বা সাধনা জড়ের উপাসনা। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। কিন্তু পরিবর্ত্তন বা ভেদ দৃষ্ট হয় মায়াধীন অবস্থায়। তারপরে ইহা নেই। মায়া মানে, বা অরূপে রূপ প্রদান করে। তন্ত্র বলেন, বিমর্শশক্তি, মায়াশক্তিরূপে অরূপে রূপ দেন ও সেই 'রূপ'=চিৎশক্তির প্রকাশ। আমাদের আত্মা=শিব, আমাদের দেহমন=শক্তি।

শিব ও শক্তি অভেদ। জীবাত্মা = শিব-শক্তি। পরমাত্মা = শিব-শক্তির সমবন্ধাবস্থা। প্রভেদ এই যে, পরমাত্মা একটি তত্ত্ববৎ, জীবাত্মায় ঐ 'একই' বহুরূপে বর্ত্তমান। সুতরাং আত্মা আবরিত হয়েছেন নিজের দ্বারাই—নিজ-শক্তিবলে (দেহ মন বা 'শক্তি'ই আত্মার আবরণ)। অর্থাৎ যেন শিব আত্মগোপন করেছেন। এই আত্মগোপন (যেন অজ্ঞানতা) বা 'আবরণ', তন্ত্রের অবিদ্যা , 'শক্তি' আচ্ছাদক নয়—চিন্ময়শক্তির আচ্ছাদক হয় না—সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম।

মায়া সেই তত্ত্ব, যা 'শুদ্ধবিদ্যার' পরে উদয় হয়। পশু' বা জীবে, ঈশ্বরের 'ইচ্ছা', 'জ্ঞান' ও 'ক্রিয়া'শক্তিগুলি মায়ার প্রতিবিম্বনে সঙ্কুচিত দেখায়। বিন্দুত্রয় = ইন্দু, বহ্নি, অর্ক (সোম, অগ্নি, সূর্য্য)। সবই ব্রহ্ম-চৈতন্য। স্বশক্তিতেই ইনি নিজেকে নিজে আবরণ করেন। ইহাই তাঁর 'অচিন্ত্যশক্তি' (উপাদান কারণ)। পুরুষ-প্রকৃতির পারের তত্ত্বগুলির ক্রিয়ার ফলে—শব্দের দিক্ দিয়ে—শক্তি, নাদ, বিন্দু ও কলাদির আবির্ভাব হয়। শিব তিনভাবে আমাদের চক্ষুর বা মনের বিষয়ীভূত হন—'প্রকাশ', 'বিমর্শ', 'প্রকাশ-বিমর্শ' = 'চরণত্রিতয়'। শিব নিজেকে নিজে জানেন ও 'স্ব' কে ভোগ করেন = 'আত্মারাম'। এই ভোগ, বস্তুর বহির্বিকাশের আকারে নয় ; এই ভোগ, চিৎ এর সেই আত্ম-উপস্থাপন, যার বিক্ষেপই সর্ব্ববস্তু। সর্ব্ববস্তুকে প্রকাশ করাই ক্রিয়াশক্তির বিশেষ লক্ষণ। প্রকাশেরই আবরণ হয়। অতএব, প্রকাশই চেতন-অচেতন সমন্বিত সর্ব্ববস্তুর স্বভাব। ইহার নাম 'আভাস' ('চিৎ-সদৃশ', এই অর্থে নয়)। পঞ্চরাত্র আগমে সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকে 'ব্যূহ' আদি বলে, শৈব-শাক্তাগমে উহাই ৩৬ তত্ত্বের 'আভাস'।

সর্ব্ববস্তুর মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় 'সত্তা' = চিৎ = সৎ। চিৎই জ্ঞানশক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। চিৎ এর মধ্যেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বকালে ঐ 'ব্যাপ্ত সত্তাই' 'চিদাকাশ' (মায়াশক্তির ক্রিয়ার বিশেষ গুরুত্ব)। যুক্তি বা বিচার দ্বৈতভাব নিয়েই সম্ভব। দ্বৈতভাবের পারে যাবার প্রচেষ্টাই সাধনা। 'নেতি', 'নেতি' বিচার ও তাই। সবই চিন্ময়—এই ভাবকে সর্ব্বাবস্থায় রাখতে হয় কৌলাচারে। 'যন্ সাধন, তন্ সিদ্ধি'। প্রতিমাকে চিন্ময়-প্রতীক জ্ঞান না করলে জড়ের পূজাই হয়।

চিদাকাশে উচ্ছলিত ক্রমবিকাশপর শক্তির উন্মত্ত নর্ত্তন-পেষণে সৃষ্টি ব্যাপার সংসাধিত হয়। এই ব্যাপার অর্থাৎ নিঃসরণই 'আভাস', 'ব্যূহ'। বৈষ্ণব পঞ্চরাত্র আগমের এই 'আভাস', পরিবর্ত্তনের একটি রূপ—'সদৃশ-পরিণাম' (চিৎ-সদৃশ)। পুরুষ-প্রকৃতি পারের ঐ পরিবর্ত্তন, প্রকৃতির গুণ পরিণাম নয়। 'কারণ', কারণই

থাকে, ব্যত্যয় হয় না—কার্য্যরূপে প্রতিভাত হলেও। ইহাই 'বীর্য্য'। বহ্নিভাব; একটির দহন ক্রিয়া নেই, অপরটির আছে—এই মাত্র প্রভেদ।

মন্ত্রের দিক্ দিয়ে শিবতত্ত্ব+শক্তিতত্ত্ব='নাদ'। 'নাদ' হ'তে জাত হয় 'বিন্দু'। এই 'বিন্দু'='মহাবিন্দু' (অপরাপর 'বিন্দু' হ'তে পৃথক বোঝাবার জন্য এই নাম)। সমনী, ব্যাপিনী, আঞ্জিনী—শক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত। শব্দের সূক্ষ্মতম অভিব্যক্তিই 'নাদ', যা মন্ত্ররূপে ব্যক্ত। ত্রিরূপে 'নাদ' সদাখ্যতত্ত্বে বর্ত্তমান। 'অর্দ্ধ-চন্দ্র' ['মন্তব্যে'র প্রতি 'নাদের' সূক্ষ্মলক্ষ্য (কল্পনা, স্মৃতি, ঈক্ষণ) তথা 'বাচ্যাভিমুখী' সামান্য ক্রিয়া] ও তার পরিণতি 'বিন্দু'—ঈশ্বরতত্ত্বে। মহাবিন্দুই কামকলায় পরিণত হয়। শব্দব্রহ্ম, অভিব্যক্ত শব্দ ও অর্থের মূল কারণ=চৈতন্য। প্রকাশ ও বিমর্শশক্তি সংযোগে এই 'চৈতন্য' নানারূপে অভিব্যক্ত হন—গুণত্রয়, বিন্দুত্রয়, দেবতাত্রয়, প্রভৃতি। চিৎ= আপাতপ্রতীয়মান 'আবরণের' বিভিন্ন নাম—প্রকৃতি, মায়া, মায়াশক্তি। 'একের'ই দুই দিক্। 'একেকে' বোঝবার জন্যই বিচার ও যুক্তি। কিন্তু এই যুক্তি দ্বৈতভাব প্রসূত। বিচারে অনেক জিনিব সত্য বলে নিরূপিত হ'তে পারে, কিন্তু তন্ত্র বলেন, সাধনায় চিন্ময়বোধ নিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়। নতুবা দ্বৈতের আবরণ থেকে যায়। আবরণ মুক্তির চেষ্টা হ'তেই আসে চিত্তশুদ্ধি। বন্ধনমুক্তি অর্থাৎ বাধা অতিক্রম করবার শক্তিই গুরুশক্তি। গুরু-শক্তির আশ্রয় যিনি যত অধিক নিয়েছেন তাঁর চিত্তশুদ্ধি তত অধিক হয়েছে—চিত্তশুদ্ধির দিকে তিনি ততটা আগুয়ান। চিত্তশুদ্ধির ভাব গ্রহণ না করলে চিন্ময় ভাবের উন্মেষও হয় না। বিচার অবশ্য-কর্ত্তব্য—বোঝবার জন্য। "বেদ বেদান্ত বিচার করবি, সাধন করবি তন্ত্র মতে"—এই উক্তির তাৎপর্য্য এখন আমরা বুঝতে পারব। বিশ্বাস বা মনমুখ এক, অর্থাৎ পূর্ণ শ্রদ্ধা, থাকলে চিন্ময়বোধ স্বতস্ফূর্ত্ত হয়। (নাট্যসম্রাট কবিবর ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'হৃদয়' কবিতাটি আপনাদের পড়তে বলি)।

শব্দের চারিভাব='পরা' প্রভৃতি। পরাশব্দ=মহাবিন্দু ব্যক্ত হবার পূর্ব্বে, গতিমুখী যে শব্দ কারণ-কার্য্য গুণযুক্ত, অথচ স্থির। ইহা সুষুপ্তির সহিত তুলনীয়। 'মধ্যমা শব্দ'=মনের বহির্বংশ যা বস্তুর 'নাম' প্রদান করে='অর্থ বোধক মনের ছবি। ইহা স্বপ্নের সহিত তুলনীয়। মানস অর্থ=সূক্ষ্ম শরীরের পূর্ব্বসংস্কার যা সুষুপ্তি বা প্রলয়াবস্থা হ'তে পুনকথিত হয়। এই ক্রিয়ার কারণ=নাম। হিরণ্যগর্ভাবস্থায়, শব্দ সংস্কাররূপে মানস চিত্র গুলিকে ঠেলে তোলে, অতএব বিশ্ব=শব্দ+অর্থ=নামরূপ। অর্থ ভিন্ন শব্দ হয় না, শব্দ ভিন্ন অর্থ হয় না। জপ মানে ঘুমন্ত মানুষকে নাড়া দেওয়া। ক্রমাগত জপে সংস্কারগুলি জাগ্রত হয় ও অর্থ প্রকাশ পায়। ঐ অর্থ= 'শুদ্ধ' চিৎ-শক্তির প্রকাশ।]

পূজায় ব'সে সাধককে 'মুদ্রা', 'ভূতশুদ্ধি' আদি করতে হয়। এইগুলি সাধনাঙ্গ, সাধকের সাধন সহায়। 'মুদ্রা' সেই বস্তু যাতে দেবতার (ইষ্টের) প্রীতি উৎপাদন করে। সাধারণতঃ মুদ্রা দুরকম—'যোগমুদ্রা' ও 'ভোগমুদ্রা'। যোগমুদ্রার অন্তর্গত 'আসনাদি' ও বিভিন্ন অঙ্গুল্যাদি সঞ্চালনে বা সংযোগে যে আকৃতি হয় ও পূজায় প্রয়োগ হয়। অঙ্গুলি সমাবেশে যে মুদ্রা দেখান হয়, তার মধ্যে সাধক সম্প্রদায়ে একটু আধটু এদিক্ ওদিক্ দেখা যায়, যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের রীতি একটু অন্যরকম। ইহার কারণ, তাঁরা স্থিতি শক্তির সাধক—মুদ্রায় তাঁরা ঐভাব ফুটিয়ে তোলেন। অঙ্গুলি সমাবেশ জিনিষটি বোঝা দরকার। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে ধরা হয় আকাশাত্মক, সেই রকম তর্জ্জনী= বায়ুাত্মক, মধ্যমা=তেজাত্মক, অনামিকা=অমৃতাত্মক ; কনিষ্ঠা=পৃথ্ব্যাত্মক। গুরুর মানস পূজায় 'পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং' বলা হয় কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সংযোগে। অঙ্গুলি মূল সংযোগ করতে হয়। সর্ব্বসময়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বা আকাশাত্মকের সঙ্গে যোগ থাকবে, প্রত্যেকটি অঙ্গুলির বেলায়—এই রকম সব। আমিষাদি ছাড়া যা কিছু দেবতার ভোগে নিবেদন করা হয় তাহাই 'ভোগমুদ্রা'। দেবতা অকাম, সুতরাং সাধকের অন্তস্ফূর্ত্তি হওয়াটাই—দেবভাব স্ফুরণই—দেবতার প্রীতি। মুদ্রার প্রয়োগ তিন ভাবে হয়—স্থূল, সূক্ষ্ম, পরা। স্থূলমুদ্রা—কর, অঙ্গুলি, অথবা শরীরের দ্বারা সাধিত হয়। সূক্ষ্মমুদ্রা মন্ত্রময়ী। স্বরূপভাব বা তত্ত্বরূপই 'পরামুদ্রা'। ধ্যানের প্রথম অবস্থা সূক্ষ্মমুদ্রা, অনুভূতি পরামুদ্রা। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক—আচমন। আচমন, 'কবলীকাররূপ'—'কবলীকার-রূপমাচমনম্'। প্রলয়কালে যখন সমস্ত তত্ত্বই গুটিয়ে নিঃশেষরূপ ধারণ করে তাকে বলে কবলীকার। ইহা শিব-শক্তির একীভূত অবস্থায় সমরস। আচমন=অন্তঃস্থাপন। পরাভাব উদিত হলে, সাধকের তৎক্ষণাৎ সমাধি, হয়, পূজাও শেষ হয়। 'অহং' তখন ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করে—জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় লয় হয়।

["কবলীকৃত ভুবনমণ্ডলঃ কবলীকৃতং অন্তঃস্থাপিতং ভুবনমণ্ডলং ·।" "চিত্তময়োঽহঙ্কারঃ সুব্যক্তাহার্ণ সমরসাকারঃ। শিবশক্তিমিথুনপিণ্ডং কবলীকৃত ভুবনমণ্ডলং জয়তি ।" (কামকলাবিলাস তন্ত্র)।]

আরো কয়েকটি উদাহরণ। তত্ত্বমুদ্রা—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অনামা সহযোগে হয়=আকাশাত্মক ও অমৃত বা রসাত্মক। রস যখন অনন্তব্যাপ্ত হয় অর্থাৎ

চিদাকাশে উদিত হয়, তখনই তত্ত্বজ্ঞানের স্ফূরণ হয়। তত্ত্বজ্ঞান কখন নিরস হয় না।

যোনিমুদ্রা—স্থূলভাবে দুরকম, (১) করাঙ্গুলি সমাবেশে, (২) আসনে, (এক রকম যোগাসনে), সূক্ষ্মভাবে ঐ রকম আসনে ব'সে বিভিন্ন চক্রে কুণ্ডলিনী চিন্তা ও জপ অথবা মূলাধার হ'তে ব্রহ্মরন্ধ্র (গুরুস্থান) পর্য্যন্ত অধোত্রিকোণ ও ব্রহ্মরন্ধ্র হ'তে মূলাধার অবধি ঊর্দ্ধত্রিকোণ=ষট্ কোণ অর্থাৎ সমস্ত তত্ত্ব চিন্তা। এই যোনিমুদ্রা গুরুমুখ হ'তে শিখতে হয়। এই বিদ্যাকে 'যোনিবিদ্যা' বলে।

['যোনিবীজ' মানে সূক্ষ্মামৃত—৫০ কলার এক কলা=ঋক্ (অ)+যজুঃ (ই)+বিন্দু। ঐ বীজ চিন্তায়, ঐ মহাবিদ্যার প্রয়োগে যা কর্ত্তব্য তা গুরু ব'লে দেন. কারণ, ইহা একটি যোগবিদ্যা। যোনিমুদ্রায় তেজ নিহিত হ'ল ভাবতে হয়। "চতুর্বিধা তু যা সৃষ্টির্যস্যা যোনৌ প্রজায়তে। পুনঃ প্রলীয়তে তস্যাং কাল্যাগ্নাদি শিবান্তিকা। যোনিমুদ্রা · পরীকীর্ত্তিতা।" (কৌলাবলী ১৭ উ)। যোনিমুদ্রার লক্ষ্য জানা যায় 'পরাভবে', "জীবেন সহিতাং শক্তিং সমুত্থাপ্য পরাম্বুজে। শিবশক্তি সমাযোগাদেকান্তং ভুবি ভাবয়েৎ ॥ আনন্দঞ্চ স্বয়ং ভূত্বা অহং ব্রহ্মেতি সম্ভবেৎ" ॥ 'জীব'=জীবাত্মা।]

চিচ্ছক্তি সৃষ্টিমুখী হলে যে যে ভাবে পরিণত হ'তে থাকেন, লয়মুখী অবস্থায় যে তত্তৎভাব, তার নাম 'মুদ্রা' অর্থাৎ চিচ্ছক্তি যখন আত্মপ্রকাশ করেন ও যখন জগৎকে তাঁরই 'ইদং' ব'লে স্বীকার করেন—'ইদং'এর প্রসার হয়—সেই সময়ে তাঁর যে নানা রূপ হয় তার নাম 'মুদ্রা'। "ক্রিয়াশক্তিস্তু বিশ্বস্য মোদন দ্রাবণস্তথা। মুদ্রাখ্যা স যদা সম্বিদাম্বিকা ত্রিকালময়ী" ॥ সম্বিৎস্বরূপ ত্রিকালময়ী বিশ্বের মোদন দ্রাবণরূপ ক্রিয়াশক্তিই 'মুদ্রা'। সেইজন্য সাধকের তত্তৎভাবের দ্বারা (মুদ্রাদ্বারা) স্ফুর্ত্তির উদয় হলে দেবতার প্রীতি হয়। মুদ্রাতে জীবের বন্ধন দূর হয়। (কুলার্ণব ১৭ উঃ ৫৭ ও ঐ বলছেন)।

ত্রিখণ্ডমুদ্রা বা শক্ত্যুত্থাপন মুদ্রা—(বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী ও কনিষ্ঠাকে ঊর্দ্ধমুখী রাখা)। আমরা জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে পৃথক দেখি, ইহাই বন্ধনের কারণ। একই তিনভাবে, খণ্ডভাবে দৃষ্ট হয়। 'কেব'লাহহং' ভাবই জ্ঞাতা=অহন্তা ('I' ness); জ্ঞাতার বিষয়ই জ্ঞেয়। ঐ 'অহন্তা' ছাড়া যা কিছু সবই জ্ঞেয়='ইদন্তা' ('This' ness), আমি 'ইহা', 'উহা'

ইত্যাদিরূপে জগৎকে জানি, আবার আমি আমার অহং বোধের গোচর—সাক্ষিস্বরূপ। এই দুই অবস্থায় প্রবাহরূপে একই আমি। ঐ প্রবাহটি 'অহং'এরই বিক্ষেপ। ত্রিখণ্ডমুদ্রায় জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়—এই তিনের ভেদ দূর হয়। সাধারণভাবে, 'ঘট', 'পট' ইত্যাদি জানার নাম জ্ঞান। জ্ঞান—পৃথ্বীতত্ত্ব, এবং জ্ঞাতা—চিদাকাশের সহিত তুলনীয়; রস ও রূপ ওখানে (জ্ঞাতায়) অস্ফুরিতাবস্থায় বিদ্যমান। তন্ত্ররাজতন্ত্র বলেন, হোতাই (দেব-আহ্বানকারীই) জ্ঞাতা, অর্ঘ্যই জ্ঞান, হবিঃই জ্ঞেয় ইত্যাদি। এই ভাব ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থেও বর্ত্তমান। "শক্ত্যুত্থাপন মুদ্রৈষা জপ পূজা সমাধিষু··।" ত্রিখণ্ড মুদ্রায় সমাধির লক্ষণ, শ্রীরামকৃষ্ণের দাঁড়ান ছবিতে চিন্তনীয়। ডানহাতে ত্রিখণ্ড মুদ্রা—লয়মুখী ভাব। গুপ্ত আনন্দময়ীর ধ্যানে ত্রিখণ্ডী মুদ্রার কথা দৃষ্ট হয়।

গুরুকৃপায় সাধক যে মহাবিত্ত অর্জ্জন করেন, ন্যায়োপার্জ্জিত সেই পরম ধনকে রক্ষা করলে সর্ব্বরক্ষা হয়, এই পরম ধনকে নিজের মধ্যে বিনিয়োজন করতে হয়। এইরূপ করাই 'ন্যাস'।

["ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্তানামঙ্গেষু বিনিবেশনাৎ। সর্ব্বরক্ষাকরাদ্দেবি ন্যাস ইত্যভিধীয়তে ॥" (কুলার্ণব ১৭উ।৫৬।] (ব্যাকরণ শাস্ত্রে ও 'শক্তিন্যাস' আছে। সুন্দর অর্থাৎ হৃদয়গ্রাহী ও শ্রুতিমধুর করবার জন্য শব্দের অংশবিশেষের বা স্বরবিশেষের উপর জোর দিয়ে উচ্চারণ করার নাম 'শক্তিন্যাস', যেমন, তুমি কি 'গল্প' বলছো? এখানে 'গল্প' কথাটির উপর ন্যাস, তুমি 'কি' গল্প বলছো? এখানে 'কি' কথাটির উপর ন্যাস, শেষে 'তুমি' এই করলে?—'তুমি'র উপর ন্যাস। বিভিন্ন অর্থে ও বিভিন্ন স্থলে ঐ রকম ন্যাস হয়)।]

দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বা স্থানবিশেষে ন্যাস করা হয়, সেই সেই স্থানে দেবতার প্রতিষ্ঠা হল বা শরীর দেবময় হ'ল চিন্তা করতে হয়।

সমস্ত মন্ত্রে দুটি শক্তি নিহিত, (১) বাচ্যশক্তি, (২) বাচকশক্তি। বাচ্যশক্তি অব্যক্ত, বাচকশক্তি ব্যক্ত। অব্যক্তই ব্যক্ত হয়; ব্যক্ত অবলম্বন বিনা অব্যক্ত বোঝা যায় না। বাচ্যশক্তি ধ্যানগম্য, তত্ত্বমাত্র—উপাস্য দেবতার স্বরূপ, এই রূপের উপাসনা করতে হ'লে চাই বাচকশক্তি অর্থাৎ মন্ত্রময়ী দেবতা। অন্তরের ভক্তিপ্রীতি, জ্ঞানবুদ্ধি সমস্তই বাইরে প্রকাশ পায় 'বাচকশক্তিতে' বা উপাস্য দেবতাতে। ঐ অন্তর ও বাহিরের ঐক্য

বোধ ভিন্ন উপাসনা হয় না, কারণ, পৃথক্ বোধ থাকলে বাইরেরটিকে 'জড়' ব'লে মনে হয়। বাচ্যশক্তি যেন বীজ। ফলের মধ্যে থাকে বীজ। দুইই চাই—'সমস্তবিদ্যা'। বাচ্যশক্তি সূক্ষ্ম। উপাসনায় মনের সাহায্য চাই; মন চায় অবলম্বন। হৃদয়ের ভাবময় মূর্ত্তিকে সাধক বাইরে দেখে উভয়ে ঐক্যবুদ্ধি স্থাপন করেন। জগৎ—মন্ত্রময়, দেবতা—মন্ত্রতনু। সাধক নিজ দেহে মন্ত্র ন্যাস ক'রে দেহকে দেবতাময় করেন।

ব্রহ্মই প্রাণরূপে নিজেকে সৃজন করেন; এই জন্যই বলা হয় ব্রহ্ম হ'তে প্রাণের উৎপত্তি (প্রশ্ন ও মাণ্ডুক্য দ্রঃ)। অন্নই মনরূপে, অপ্ প্রাণরূপে, তেজ বাক্‌রূপে পরিণত হয় (ছান্দোগ্য ৬।৫।৪)। শাস্ত্রে প্রাণের সংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। বিভক্ত প্রাণ, সাধারণ বায়ু নয়। ব্রহ্মসূত্র, প্রাণকে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলেছেন (২।৪।৮)। ইন্দ্রিয় এই হিসাবে যে প্রাণ জীবের ভোগ সম্পাদক, কিন্তু অপরাপর ইন্দ্রিয়ের ন্যায় প্রাণ কোন বিষয় গ্রহণ করেন না। প্রাণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ধারক; ইহাই প্রাণের প্রথম বৃত্তি। স্থিতি ও উৎক্রান্তি—প্রাণের আর দুই বৃত্তি। বৃত্তিগুলির ক্রিয়া আছে, যেমন নিঃশ্বাস গ্রহণের নাম 'প্রাণ', নিঃশ্বাস ত্যাগের নাম 'অপান', নিঃশ্বাস ধারণ='ব্যান' ইত্যাদি। প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ হলে অন্য সব ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ হয়। 'জ্যোতি'ই প্রাণকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান। শাস্ত্র বলেন, বায়ু দেবতা নাসিকায় অধিষ্ঠিত হলে শ্বাস গ্রহণাদি ব্যাপার সাধিত হয়। 'প্রাণ'কে বায়ু বলা হয় সাধারণভাবে এই জন্য। প্রাণ ও আকাশের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। মূল আকাশ=চিদাকাশ=আভাস বা প্রকাশে বোধরূপ ব্যাপ্তিভাব=চিচ্ছক্তি।

সৃষ্টি, প্রলয়, পুনঃসৃষ্টি—শক্তির এই বিস্ফারিণী শক্তি, এই প্রদীপ্ত শক্তি—যাতে সৃষ্টি প্রকাশ পায়, লয় হয়, তার নামই 'শব্দ' অর্থাৎ ঐ চিচ্ছক্তির বিভূতি। চিচ্ছক্তির সমষ্টি সগুণ বিভূতিই শব্দব্রহ্ম বা চিচ্ছক্তিই শব্দব্রহ্মরূপে বিশ্বের বীজ। মন্ত্রবিজ্ঞান আলোচনায় আমরা দেখেছি যে শব্দই মন্ত্ররূপে স্ফুটিত হয়। শব্দাভাবে সমগ্র বিশ্ব অন্ধকারে পরিণত হয়। শব্দই জ্যোতিঃ। আনন্দরূপী এই জ্যোতির (শক্তির) অবতরণই দেবতা। জগজ্জীব ইহার বশীভূত (কুলার্ণব ১৭ উঃ।১৮)। এই দেবতাই উপাস্য বা ইষ্ট। ইনিই জীবন্মুক্তি প্রদান করেন, তাই ইনি শক্তি ("জীবন্মুক্তি

প্রদানাঞ্চ শক্তিবিত্যভিধীয়তে'—(কুলার্ণব ঐ ৩২)। "শব্দব্রহ্ম পবং ব্রহ্ম মামোভে শাশ্বতী তনু'। দেবীব মন্ত্রময়ী তনু—বিশ্ববীজময় ঐ তনু। ঐ তনুই উপাস্য। সাধক উপাসক। সাধক ন্যাস দ্বাবা নিজ শবীবকে মন্ত্রময়ী কবেন—'আমি' ডুবে যায় 'তুমিতে'। ন্যাস অনেক রকম। যেমন পরাভাবে অন্তর্মাতৃকা ধ্যানগম্য; সেই বকম বাচ্যশক্তি ধ্যানগম্য; কিন্তু তাদাত্মভাবেব অভাব হেতু, ভেদবুদ্ধিতে কোন উপলব্ধি হয় না। বাচ্যশক্তি ভিন্ন সাধক বাচকশক্তিব প্রাণ প্রতিষ্ঠা কবতে পাবেন না।

তন্ত্রে প্রত্যেক দেবতাব গায়ত্রী আছে। ভাব ভেদে যেমন নানা মন্ত্র, নানা ইষ্ট, তেমনি প্রত্যেক দেবতাব পৃথক পৃথক গায়ত্রী, আবাব সকল শক্তি উপাসকেব সাধাবণ গায়ত্রী আছে। গায়ত্রী = যিনি মূলাধাব হ'তে ব্রহ্মবন্ধ্র পর্য্যন্ত 'সুব' তুলে সাধকেব বন্ধন নাশ কবেন।

["মূলাদি ব্রহ্মবন্ধ্রান্তং গীয়তে মননাদ যতঃ। মননাৎ ত্রাতি ষটচক্রং গায়ত্রী তেন কীর্ত্তিতা" ॥—তন্ত্রতত্বোদ্ধৃততন্ত্র বচন।]

জন্ম কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয় সংস্কাব দ্বাবা; প্রত্যেকেই সংস্কাবেব দ্বাবা চালিত। এই সংস্কাবেব উপব কি উপায়ে আধিপত্য আসে তা ব'লে দেন গুরু। যাঁব দ্বাবা এই সংস্কাবেব উপব প্রভুত্ব আসে তাঁব নাম 'ইষ্ট'। সংস্কাবেব অতীত হওযাই একমাত্র অভিলষিত বস্তু। গায়ত্রীব যেমন ত্রিসন্ধ্যায় তিন রূপ—সবই মাতৃমূর্ত্তি, ধ্যানভেদে সেই বকম তিনি শুক্লবর্ণা ও প্রাণায়ামকালে তিনি পুংরূপে চিন্তনীয়। ষটচক্রে গায়ত্রীব ঝঙ্কাব বেজে ওঠে, তাব অনুবণনে সাধকেব মন্ত্রার্থ বোধ হয়, "কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, কাণেব ভিতব দিয়া মবমে পশিল গো," কাণেব ভিতব দিয়ে মর্ম্ম স্পর্শ কবলে মন্ত্রার্থ প্রকাশ পায়। সাধনায় ব'সে এই সব নানা উপায় অবলম্বনে, সাধক যখনই তন্ময়ত্ব লাভ কবেন, তখনই তাঁব তখনকাব উপাসনা শেষ হয়।

পূজায় মণ্ডল আঁকতে হয়। এই মণ্ডল কি? "অখণ্ডমণ্ডলাকাবং বিশ্বং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতম্। ত্রৈলোক্যং মণ্ডিতং যেন মণ্ডলং তৎ সদাশিবং॥" একটি মণ্ডল—ত্রিকোণবৃত্তচতুবস্রমণ্ডল আঁকতে হয়। চতুবস্র = মূলাধাবে পৃথ্বীতত্ব, তাঁব চাবটি দিক্—আত্মা, অন্তবাত্মা, জ্ঞানাত্মা, পবমাত্মা। এটি 'পরা'ভাব। ত্রিকোণ = ত্রিশক্তি = ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া; বৃত্ত—অনন্তবোধক

আবর্ত্তনময়ী শক্তি। ত্রিকোণবৃত্ত চতুরস্র হলে মণ্ডল পূর্ণ হয়। ঐ মণ্ডলে 'আধারশক্তয়ে নমঃ' ব'লে ফুল দিতে (পূজা করতে) হয়। আধার=যার উপর কোন বস্তু ন্যস্ত হ'তে পারে—পাত্র। পুরাণে আছে, মহাকারণার্ণবে বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শয়ান, তাঁর নাভিতে ব্রহ্মা। ব্রহ্মা হচ্ছেন স্রষ্টা; তাঁর আধার বিষ্ণু, বিষ্ণুর আধার অনন্ত, অনন্তের আধার কারণার্ণব। এইরূপে রসস্বরূপই সকলের আধার। শক্তিই রসবিস্তার করেন বা স্বয়ং বিস্তৃত হন। দেবীভাগবতে ঐ ব্যাপার বর্ণনার পর, স্তব, "একার্ণবস্য সলিলং রসরূপমেব। পাত্রং বিনা নহি রসস্থিতিরস্তি কচ্চিৎ॥ যা সর্ব্বভূতবিষয়ে কিল শক্তিরূপা। তাং সর্ব্বভূতজননীং শরণং গতোস্মি॥" এই সর্ব্বভূত-জননীই আধারশক্তি। আধারশক্তির স্থূল প্রকাশই 'আকৃষ্ট শক্তি'। ত্রিশক্তি আবর্ত্তনময়ী অনন্ত ব্যাপ্ত শক্তি ও তাতে ঐ চতুরস্রের ভাব সংযুক্ত না হলে, পূর্ণ আধারশক্তি হয় না। ত্রিকোণ, বৃত্ত, চতুরস্র—সবই, একই শক্তির বিভিন্ন রূপ। ঐ মণ্ডলোপরি কোশা কুশি রাখা হয়। অঙ্কশাস্ত্র দ্বারাও বোঝা যায় যে বিন্দুর অনুবর্ত্তনে নানা ছবি হয়। শূন্যগর্ভ বিন্দুই বৃত্ত। শূন্যকে নিষ্কলব্রহ্ম বলা হয়। ঐ মণ্ডলের মধ্যস্থলেও ইষ্টশক্তি। আমরা যাকে 'আবরণ' বলি, সেই আবরণ ধ'রেই আমরা বিচার করি ও স্বরূপ বোঝবার জন্য অস্থির হই, তখন অন্তরের শক্তি ভক্তের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রথম রূপ তাঁর 'বৃত্ত'—চরাচর ব্যাপি। ঘূর্ণ্যমান বা গতিশীল বৃত্ত দ্বিধা খণ্ডিত হলেই সেটি হয় 'কূর্ম্মপৃষ্ঠ'।

কূর্ম্মমুদ্রায় কূর্ম্মভাব অবলম্বন করতে হয়। অনুগীতায় কূর্ম্মভাবের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। 'বেধ'দীক্ষায় গুরু কূর্ম্মভাব অবলম্বন করেন অর্থাৎ কূর্ম্ম যেমন ধ্যানমাত্র সহায়ে স্বসন্তান পোষণ করে, গুরু সেই রকম সমস্ত মনকে গুটিয়ে নিয়ে ধ্যানদ্বারা শিষ্যকে উপদেশ করেন (কুলার্ণব ১৪ উ।৩৭)। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে কূর্ম্ম সম্বন্ধে একটি ইতিহাস আছে।

[অগ্রজাত পুরুষে কাম উৎপন্ন হওয়ায় তাঁর বহু হবার ইচ্ছা হ'ল। ত্যাগরূপ তাঁর যজ্ঞে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য আসতে হল পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির দেবতা বা বীজশক্তি ও বিদ্যাধর্ম্ম এবং সত্যরূপ প্রকাশক ঋষি। প্রজাপতি তপস্যায় ধ্যানমগ্ন হলেন—নিজের মধ্যেই দ্বাদশাহ যজ্ঞ দেখলেন, সৃজনীশক্তির দ্বাদশাহ ত্যাগ দেখে যজ্ঞে ব্রতী হলেন; দেখলেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টিতে বিশ্বরূপ গৃহের তিনিই ছিলেন পতি ও

দেবতারাও তাঁর সঙ্গে তখন যজমান হয়ে যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞে তাঁদের চিত্তিই 'স্রুক্', চিত্ত—'আজ্য', বাক্য—'বেদি', ধ্যান—'বর্হি' (কুশ), জ্ঞান—'অগ্নি', বিজ্ঞান—'আগ্নীৎ', প্রাণ—'হব্য', সাম—'অধ্বর্যু', বাচস্পতি—'হোতা', মন—'মৈত্রাবরুণ' ছিল। ইহাই পুরুষ যজ্ঞ। 'কাম' প্রজাপতিকে তপস্যায় প্রেরণা দেন। তপস্যার তাপে তাঁর শরীর স্পন্দিত হ'ল, একদল 'আরুণ-কেতু' নামে ঋষির আবির্ভাব হ'ল। প্রজাপতি সলিলমধ্যে একটি কূর্ম্ম দেখতে পেলেন। কূর্ম্ম পূর্ব্ব হ'তেই ঐ সলিলে ছিলেন। তিনি 'সহস্রশীর্ষা সহস্রপাৎ' পুরুষরূপে দেখা দিলেন, প্রজাপতি দেখলেন যে, তাঁর কামই বিরাট পুরুষরূপে বহিঃপ্রকাশমান, সুতরাং প্রজাপতি তাঁকেই সৃষ্টি করতে বললেন। সেই পুরুষ, অঞ্জলি অঞ্জলি সলিলরাশি বিক্ষিপ্ত করতে লাগলেন। 'লম্ফ ঝম্প আবর্ত্ত' উচ্ছ্বাসে আদিত্য, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্ভব হ'ল, সলিলকণায়—পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, অসুরাদি হ'ল। এই রকমে সমস্ত সৃষ্টির পর "প্রজাপতি প্রথমজা ঋতস্য আত্মনা আত্মনং অভিসংনিবেশ"—সমস্তের মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজ করলেন। শতপথব্রাহ্মণে 'আরুণ-কেতুক-অগ্নিচয়ন' নামে একটি অনুষ্ঠান আছে। সেখানে উক্ত বেদির নীচে জল ও সোণার ১টি পুংমূর্ত্তি রাখা হয়, পাশে থাকে একটি কচ্ছপ। চিতি, শ্যেন পাখীর আকারে গড়া হত। শ্যেনটি আমাদের পরিচিত সুপর্ণা। নারদপাঞ্চরাত্রেও কূর্ম্মের কথা আছে অন্যভাবে, ইনিও সৃষ্টির মূলে। এই রকম নানা স্থানে কূর্ম্মকথা আছে। তন্ত্র তার মধ্যে তত্ত্ব দেখেছেন ও সাধনায় প্রয়োগ করেছেন। ধোলো এই কূর্ম্মতত্ত্ব বুঝতে না পেরে Animism দেখেছেন।]

পূজার আসনে এই কূর্ম্মদেবতার স্মৃতি জেগে ওঠে। ভাবতে, পূর্ব্ব ইতিহাস বা তার মধ্যে সত্যবস্তুর স্মৃতি বজায় রাখবার রীতি ও সত্যকে অনুষ্ঠানগত সাধনায় বিনিয়োগ ও ধারা প্রাণবন্ত ক'রে রাখবার উপায়, ইত্যাদি ভাবলে আত্মহারা হ'তে হয়।

ভূতশুদ্ধি :—"শরীরাকার ভূতানাং যদ্বিশোধনং অব্যয় ব্রহ্মসংযোগাভূত-শুদ্ধিরিয়ং মতেতি।" যে ক্রিয়াদ্বারা শরীর, আকার, ও পঞ্চভূত পরিশোধিত হ'য়ে অব্যয় ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হয়, তার নাম ভূতশুদ্ধি। দৃঢ়াসনে ব'সে সমাহিত মনে ইষ্টদেবতারূপা কুণ্ডলিনীকে উত্থাপন করতে হয়, ভাবতে হয় যে, দেবী 'কোটি সৌদামিনীভাসাং' ও 'তৎপ্রভাপাটলব্যাপ্তং শরীরমপি'।

আমাদের শরীরের মধ্যে বহু নাড়ী আছে। এগুলি স্থূল। মেরুদণ্ডের পাশে দুটি নাড়ী আছে। তন্ত্র এগুলিকে 'নাড়ী' বলেন। মেরুদণ্ডের বামে

যে নাড়ী তার নাম 'ইড়া'। এই সব নাড়ীর রূপ ও গুণ বর্ণনা তন্ত্রে আছে। 'ইড়া' বামে, ঈষৎ শুক্লবর্ণা, চন্দ্রস্বরূপা ও অমৃতময়ী; 'পিঙ্গলা' দক্ষিণে, রক্তবর্ণা সূর্য্যস্বরূপা ও বিষস্রাবিনী। সুষুম্না—মধ্যে, অগ্নিরূপা। সুষুম্নার মধ্যস্থলে বজ্রিনী বা বজ্রানাড়ী, তন্মধ্যে চিত্রা বা ব্রহ্মনাড়ী। আমাদের মধ্যে অসংখ্য সংস্কার আছে। সেই সব সংস্কারই 'বৃত্তি'। বৃত্তিকেন্দ্র দেহমধ্যেই আছে। বৃত্তিকেন্দ্র অনেক, তার মধ্যে প্রধান কেন্দ্র ৬টি। এই কেন্দ্রগুলির অপর নাম 'চক্র'। ইহা ছাড়া ঐগুলির কাছে কতকগুলি 'গুপ্তচক্র' আছে—সব গুলিই ব্রহ্মনাড়ীতে গ্রথিত। সাধারণতঃ সুষুম্নাকেই ব্রহ্মনাড়ী বলা হয় ও ইহাই 'ব্রহ্মদণ্ড', 'শক্তিদণ্ড', 'মেরুদণ্ড' ইত্যাদি নামে পরিচিত। এই মেরুদণ্ডকে আশ্রয় ক'রে আমাদের শারীরিক ক্রিয়া ও বৃত্তি সমুদয় ঘুরছে। যে বিশ্বশক্তির দ্বারা এইটি সাধিত হচ্ছে তিনিই দেবী কুণ্ডলিনী, ও ঐ বিশ্বশক্তির জীবনক্রিয়া সম্পাদনকারী শক্তির নাম 'প্রাণশক্তি'। সুষুম্নার মধ্য দিয়ে কুণ্ডলিনী উত্থিতা হন। কবিরাজের নাড়ী-জ্ঞানের নাড়ী যেমন অস্ত্রোপচারে দেখা যায় না, সেই রকম ঐ নাড়ীগুলি ধোলো nerves নয়, ঐগুলি সূক্ষ্ম যোগনাড়ী। 'সূর্য্য', 'চন্দ্র' ও, সেই রকম, আকাশের সূর্য্য বা চাঁদ নয়। যা তেজোময়, দীপ্তিময়, বীর্য্যময়, তাই 'সূর্য্য'; যা স্নিগ্ধ ও অমৃতময় তাই 'চন্দ্র'। তন্ত্রসাধক কুণ্ডলিনীর উত্থান অনুভব করেন, প্রত্যেক চক্র দর্শন করেন—সবই তাঁর জ্ঞাতসারে হয়। যে সব চক্রের অনুভূতি সূক্ষ্মতর সেই গুলিই 'গুপ্তচক্র'। সাধক ঐ সমস্ত বৃত্তি-কেন্দ্রগুলির স্পষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করেন। ঐ সব বৃত্তিগুলি জীবের উপর প্রভুত্ব করছে; জীব নিদ্রিত, তাই মনে হয় কুণ্ডলিনী সুপ্তা—মহাশক্তির বিশ্রান্তি। জীব প্রবুদ্ধ হলে, সাধক দেখেন, দেবীও জাগরিতা। প্রবুদ্ধ হবার জন্যই শরীর ও পঞ্চভূত শোধনের দরকার। যে যে চক্রে যতগুলি বৃত্তি আছে, সেই সেই চক্রগুলিকে সেই সেই দলাকৃতি পদ্ম বলা হয়। বৃত্তি মানে যা বৃত্তাকারে যাতায়াত করে—ঘুরে ফিরে পুনঃ ফিরে আসে—বন্ধনের কারণ। বৃত্তিগুলির বর্ণ ও প্রভা আছে, আর তদনুযায়ী কেন্দ্রগুলিতে অক্ষর (বর্ণ মালা) আছে। ব্যাপ্ত বিশ্বশক্তি যেন চক্রে চক্রে ধৃত ও মূলাধারে সুপ্ত, যেখানে, গুটিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে (সাপের মত) অবস্থান করছেন। এই ধৃতশক্তির জাগরণই কুণ্ডলিনীর জাগরণ।

উত্থান অবস্থা স্থূল, ও নিত্যানন্দ প্রবোধদায়িনী শক্তিরূপে তিনি সূক্ষ্ম।

প্রাণকে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলা হয় এই জন্য যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মিলিত শক্তি ইহাতে যুক্ত হলে তবে জগৎ ও জগৎ সম্বন্ধীয় সমস্ত বস্তুর জ্ঞান হয় ও তার প্রবাহ চলে। প্রাণকে 'শক্তি' আখ্যা দেওয়া হয়, আবার তাঁকে 'শিব' ও বলা হয়। "চিৎ প্রাণ বিষযভূতা" (কামকলাবিলাস—৫১), অর্থাৎ 'চিৎ প্রাণেতি চিৎ প্রাণঃ পরম শিবঃ চিৎরূপত্বাৎ প্রাণরূপত্বাৎ' (ঐ টীকা)। ছান্দোগ্য বলেন, প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা। বৃহদারণ্যক বলেন, যেমন লবণের সবটাই লবণ, সেই রকম আত্মা—অন্তর ও বাহির—সমস্তই রসঘন ও প্রজ্ঞানঘন—আত্মা প্রজ্ঞাময়, অন্যত্র আছে, আত্মা প্রাণরূপী, আনন্দ ও অমৃতরূপী। "যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ" (কৌষিতকী উ-৩।৪)। বাহ্য সংস্পর্শে এসে এই প্রাণ দশ ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। দেহের মধ্যে পঞ্চধা বিভক্ত—পঞ্চবায়ু; বহির্বায়ু ও ৫টি। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও ব্যান—দেহাভ্যন্তরস্থ পঞ্চবায়ু; নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়—পঞ্চবহির্বায়ু, দেহের মধ্যেই, কিন্তু বহির্মুখী। (ভাবোপনিষৎ-১৭-১৯ দ্রঃ)। ইহাই দশশক্তি বা দশদেবতা। বায়ু কুপিত বা সক্রিয় হলে নানা ভাবে ইহা রেচক, শোধক, পাচক, দাহক ও প্লাবক—মুখ্যত্ব হেতু পঞ্চধা জঠরাগ্নি। ক্ষারকাদি প্রধান পঞ্চ বায়ু, ভোক্ষভোজ্যাদিরূপ পঞ্চবিধ অন্নের পচন ক্রিয়া সম্পাদন করে, সমষ্টিভাবে ঐ দশ দেবতাই জগৎ ব্যাপারের কারণ। মানসশক্তি দৃশ্য না হলেও ক্রিয়াশীল অর্থাৎ উহা কোন কারণের কার্য্য। কার্য্যের অবস্থাই শক্তি, অতএব অব্যক্ত হ'তেই প্রাণের উদ্ভব। মন, প্রাণের সহকারী অর্থাৎ মনের অবস্থা বিশেষই প্রজ্ঞা। ইন্দ্রিয়মুখে অন্ন যায়, প্রাণ তা গ্রহণ করেন; এই প্রাণই মন উৎপাদন করে অর্থাৎ প্রাণের পরিণতিই মন। এই মনেই চিন্তার উদয় হয়, চঞ্চল বিধায় বাক্ বা ধ্বনিরূপে প্রকাশিত হয়, বাক্ মনেই বিলীন হয়। অতএব, প্রাণ হ'তে বাক্ পর্য্যন্ত সমস্তই প্রাণের পরিণাম। আত্মা, আনন্দ ও অমৃতরূপী। যে আনন্দময়ত্ব ও অমৃতত্ব জীবের মধ্যে—ঘটাকাশের মত ঘটে—বদ্ধ তাহাই মূলাধারস্থিত শক্তি, দেবী কুণ্ডলিনী। প্রাণশক্তির সঙ্গে একীভূতা হলে, যখন তাঁর

বিভিন্ন গতি হয়, তখন তিনিই পরা, পশ্যন্তি ইত্যাদিরূপে প্রতীয়মান হন। তাই কুলকুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্মস্বরূপিনী। আনন্দ ও অমৃত, ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়ে প্রকাশ হওয়ার জন্য বিকৃত ভাব ধারণ করে, প্রজ্ঞাও, ঐ কারণে প্রবাহরূপে প্রতীয়মান হয়। আকাশ ব্যতীত প্রাণের অভিব্যক্তি হয় না। চিন্তা, গতি, কম্পন—সবই প্রাণের খেলা। আমরা যাকে 'জড়' বলি, সেই জড়ের আকার, বাধা, প্রভৃতি সব আকাশের পরিণতি। প্রাণ আকাশের সঙ্গে নিত্যযুক্ত, ইহাই প্রাণের স্বরূপাবস্থা। প্রকৃতি যখন নানা শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হন, তাঁকে তখন আমরা 'আকৃষ্ট-শক্তি' প্রভৃতি নামে অভিহিত করি। যাকে Force বা 'বল' বলা হয়, তাহাও ঐ প্রাণ ও আকাশের মিশ্রণ। এই জন্য ঐ সব 'চক্রগুলি' আকাশের পরিণতি ও তন্মধ্যস্থ দেবতাদি—প্রাণ।

তন্ত্র বলেন, কুণ্ডলিনী জাগরিতা হলে, সমস্ত বৃত্তিগুলি, সেই সেই স্থানের অক্ষরগুলি, দেব ও দেবশক্তি সমস্ত, বমণ করতে করতে, কুণ্ডলিনীর ঘাড়ে এসে পড়েন এবং কুণ্ডলিনী সমস্ত গ্রাস করতে করতে এক একটি চক্র ভেদ ক'রে উঠতে থাকেন। এ যেন সুপ্তোত্থিত বোড়া সাপের আকর্ষণে, যত পোকা মাকড়, বড় জীব—সমস্তই বোড়ার ঘাড়ে পড়া! ঐ প্রজ্ঞারূপী শ্রদ্ধাই—একমাত্র শ্রদ্ধাই—সমস্ত বৃত্তিকে গ্রাস করতে সমর্থ, অতএব শ্রদ্ধাই কুণ্ডলিনী শক্তি। সমস্ত শরীর ও পঞ্চভূত তখনই পবিশুদ্ধ হয়, মনের মোড় ফিরে যায়, মন ব্রহ্মমুখী হয়, যখন শ্রদ্ধা জাগে, যখন শ্রদ্ধা সকলকে আপন ক'রে নেন। তন্ত্রের সাধক শ্রদ্ধার জাগরণ ও তার নানা ক্রিয়া উপলব্ধি করেন, ভক্তিযোগী ও জ্ঞানযোগী ঐ সব ক্রিয়ার নানাত্ব হয়ত জানতে পারেন না (উক্ত ক্রিয়ার মধ্যে না যাওয়ায়); কিন্তু ফল হয় একই। সমস্ত অক্ষরগুলি পরা রূপে সহস্রারে—মস্তিষ্ককেন্দ্রে বা চিন্তাকেন্দ্রে—বর্ত্তমান।

কুণ্ডলিনীর চক্র

ইড়া পিঙ্গলাদির অন্য নাম আছে। ইড়া=যমুনা; পিঙ্গলা=সরস্বতী; সুষুম্না=গঙ্গা। গুণ হিসাবে, ইড়া=চন্দ্রামৃতা; পিঙ্গলা=সূর্য্যসংযুক্তা; সুষুম্না ('তয়োর্ম্মধ্যে')=বহ্নিসংযুক্তা। চিত্রিণী=সত্ত্বগুণময়ী; বজ্রা=রজোগুণময়ী; সুষুম্না=তমোগুণময়ী। "(সুষুম্না...গ্রীবান্তংপ্রাপ্য গলিতা তির্য্যগ্‌ভূতা শঙ্খিনী-নালমাস্য গতা সা ব্রহ্মসাদনম)।" সুষুম্নার উভয় পার্শ্বে দুই নাড়ী='সরস্বতী' ও 'কুহু'; ইড়ার পূর্ব্ব পার্শ্বেও দুই নাড়ী=গান্ধারী ও হস্তিজিহ্ব; শঙ্খিনী—গান্ধারী ও সরস্বতীর মধ্যে। "(শঙ্খিনী নাম সা নাড়ী সব্য কর্ণান্তমিধ্যতে)"; কণ্ঠ বিবর হ'তে ললাটের দিকে গিয়ে "মস্তকান্তং প্রাপ্তেতি," এইজন্য বাঁ কাণের দিকে গুর্ব্বাদির প্রণাম বিহিত আছে। প্রত্যেক নাড়ীর বিভিন্ন ক্রিয়া আছে, সে গুলির বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন এস্থলে। তন্ত্র বলেছেন, "অথ ষট্‌চক্রেষু পদ্মানাং দলাবচ্ছেদে দক্ষিণাবর্ত্তেন বর্ণযোগশ্চিন্তনীয়।" প্রতি চক্রে বর্ণাবলী ও দেবতা আছেন। "(মন্ত্রার্ণা দেবতা প্রোক্তা দেবতা মন্ত্ররূপিনী)।" প্রতি চক্রের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি আছেন। চক্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী বা শক্তি সকল সাধনায় একরকম নয়, ভাব হিসাবে পৃথক পৃথক স্থানে তাঁদের অবস্থিতি হয়।

১। মূলাধার:—গুহ্য ও মেঢ্রের মধ্যস্থলে—চতুর্দ্দল পদ্ম, চারিটি বর্ণ অর্থাৎ মাতৃকা আছে। পদ্ম মধ্যে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, "লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভু ভাবরূপেন তিষ্ঠতি।" তড়িদ্বর্ণা সূক্ষ্মা কুলকুণ্ডলিনী ত্রিবলয়াকৃতি হয়ে নিদ্রিতা। প্রতি চক্রে ত্রিকোণ বা 'যোনি' আছে। 'কামকলা'ই অরতরণ মুখে সর্ব্বত্রই 'যোনিরূপা'=ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া=ত্রিপুরসুন্দরী মাতা। রক্তবর্ণ ত্রিকোণবর্ত্তী মণ্ডলে 'স্বয়ম্ভু' আবদ্ধ। ত্রিকোণে কন্দর্পবায়ু, চতুষ্কোণ পৃথ্বীমণ্ডল। কামবীজ=রক্তাভ, স্বয়ম্ভু 'কামবীজেন চালিত'। ব্রহ্মা ও সাবিত্রী। এখান হ'তে তিনটি নাড়ী পৃথক হয়েছে (ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না)।

২। স্বাধিষ্ঠান:—লিঙ্গমূলের সমসমস্থানে অবস্থিত; ষড়দল—৬টি মাতৃকাবর্ণ। এই পদ্ম হ'তে বৃত্তির স্পষ্ট প্রকাশ। ৬টি বৃত্তি=প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা সর্ব্বনাশ, ক্রূরতা। বরুণবীজ, বরুণমণ্ডল, বরুণ-দেবতা—বীজমধ্যে। মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী।

৩। মণিপুর ঃ—নাভির পশ্চাতে ; দশদল, মেঘবর্ণ। বৃত্তি=লজ্জা, পিশুনতা, ঈর্ষা, তৃষ্ণা, সুষুপ্তি, বিষাদ, মোহ, ঘৃণা, ভয়। অগ্নিদেবতা, রুদ্র ও ভদ্রকালী। ভানুভবন ও ভানুমণ্ডল।

৪। অনাহত ঃ—মণিপুরের উপরে ; নীচে রক্তবর্ণ অষ্টদল হৃৎকমল, লগ্ন—ইষ্টচিন্তার স্থান। ইহার ঊর্দ্ধে অনাহতচক্র রক্তবর্ণ দ্বাদশদল ; বৃত্তি= আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, বিবেক, অহংকার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক, অনুতাপ ; ত্রিকোণশক্তির মধ্যে বাণলিঙ্গরূপী শিব, দ্বিভুজ ঈশ্বর।

৫। বিশুদ্ধ বা ভারতী—কণ্ঠমূলে। ষোড়শদল=ষোলটি স্বরবর্ণ। এখানে ব্যঞ্জন বর্ণ নেই। এই চক্রের কথা পূর্ব্বে বলা হ'য়েছে।

মূলাধার হ'তে তিনটি নাড়ী পৃথক হয়েছে। মূলাধারে সৃষ্টিবীজ, সুতরাং ওখানে আছেন ব্রহ্মা। চক্রগুলির মধ্যে ব্রহ্মা প্রথম শিব। স্বাধিষ্ঠানে ষড়দল, ষড়বৃত্তির কেন্দ্রস্থান, ও ত্রিকোণ মধ্যে মহাবিষ্ণু, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। এইখানে প্রথম সত্ত্বগুণের সাক্ষাৎ—বিষ্ণু নীলবর্ণ বা মেঘবর্ণ। এই চক্র 'অপ' স্থান, সুতরাং বরুণবীজাদি এই স্থানে। এই চক্রোপরি সূর্য্যস্থান ও দীপ্ত ভানুমণ্ডল। "সমান জয়াৎ প্রজ্বলনং ॥" (পাতঞ্জলদর্শন বিভূতিপাদ—৪১)। যে বায়ু নাভি হ'তে দেহের সর্ব্বনিম্নস্থান পর্য্যন্ত রক্তরসাদি প্রবাহ করায় তাহাই 'অপান', যে বায়ু নাভি দেশ ঘিরে জঠরাগ্নি ও দৈহিক তাপকে সক্রিয় ক'রে পচন ক্রিয়া, মলমূত্রাদির পার্থক্য, ও সাম্য আদি সম্পাদন করে, তাহাই 'অপান'। এই 'সমান' ক্রিয়াকে জয় করলে উহা প্রজ্বলিত হয় ও তীব্র তেজের উদ্ভব হয় ; কারণ, 'সমান' জিত হলেই—লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি'তে থেকে যা এতদিন ইন্দ্রিয়াত্মকবোধ দৃঢ় রেখেছিল, সেই বোধ শিথিল হয়ে যায়। অনাহত দ্বাদশবৃত্তিকেন্দ্রস্থান। ত্রিকোণশক্তিমধ্যে বাণলিঙ্গ, ঈশ্বর ও ভুবনেশ্বরী, জীবাত্মা ও পবন দেবতা। হৃৎপদ্ম এই চক্রান্তর্গত। যে বায়ুর ক্রিয়ায় উদরস্থ বায়ু হৃদয় হ'তে মুখ, নাসিকা পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয় বা যাতায়াতে রক্তবৃদ্ধি আদি সম্পাদন করে তাহাই প্রাণবায়ু। প্রাণ জিত হলে অর্থাৎ অনাহতে মন স্থির হলে, জ্ঞানের বিকাশ হয়, জিতেন্দ্রিয়ত্ব সহজ হয়, ধ্যানের স্ফুরণ হয়, সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়। বিশুদ্ধচক্র ধূম্রবর্ণ ষোড়শদল, ষোড়শবৃত্তিকেন্দ্রের স্থান। এ পর্য্যন্ত পদ্মগুলির বর্ণনায়,

প্রতিপদ্মের প্রতি কর্ণিকায় বিভিন্ন মাতৃকাবর্ণের নাম বলা আছে—সমস্তগুলিই ব্যঞ্জনবর্ণ। ব্যঞ্জন এইখানে শেষ। এখানে ষোড়শ স্বরবর্ণ। অন্যান্য চক্রে যেমন বৃত্তগুলির নাম আছে, এই চক্রে বৃত্তি নেই, আছে প্রতি বর্ণের এক একটি প্রতিনিধি, যথা—নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়জ, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম, অষ্টমদলে—বিষ আর ৭টি মন্ত্র=হুঁ, ফট্, বৌষট্, বষট্, স্বধা, স্বাহা, নমঃ, এবং শেষদলে আছে 'অমৃত'। এই চক্র 'আকাশস্থান,' আকাশ-দেবতা অর্দ্ধনারীশ্বর শিব বা সদাশিব। কুণ্ডলিনী দেবী এইখানে বৈখরীরূপে স্বর ও সুরে ব্যক্ত, সুতরাং এইস্থানে সমস্ত মন্ত্রের বীজ বর্ত্তমান। সদ্গুরু এইস্থানে মনস্থির ক'রে সাধকের ইষ্টবীজ ও ইষ্টমন্ত্র প্রত্যক্ষ করেন। এই খানে মন স্থির করতে পারলে সাধকের আত্মজ্ঞান উদিত হয়। "কূর্ম্ম নাড্যাং স্থৈর্য্যং" (পা বি. পা. ৩২)। কণ্ঠকূপের নীচেই সুদৃঢ় কূর্ম্মনাড়ী আছে, তাতে মন স্থির হ'লে সাধকের কায়চিত্তযোনির স্থৈর্য্য সাধিত হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও মনের উপর প্রভুত্ব স্থাপন হয়।

৬। ললনাচক্র বা কালচক্র :—বিশুদ্ধের উপরে একটি গুপ্তচক্র। এই চক্রের বা পদ্মের কোন বর্ণ (মাতৃকা) নেই—দ্বাদশ বৃত্তিময়=শ্রদ্ধা, সন্তোষ, অপরাধ, দম, মান, স্নেহ, শোক, খেদ, শুদ্ধতা, অরতি, সম্ভ্রম, ঊর্ম্মি।

৭। আজ্ঞাচক্র :—ভ্রূমধ্যে, দ্বিদল, জ্যোতির্ম্ময়। এইস্থানে বর্ণমালার মেরু (যেমন জপমালার মেরু) 'ক্ষ' ও 'হ' আছে, সূক্ষ্ম ক্ষিতিবীজ, প্রণবরূপী 'ইতরশিব', হংসরূপী পরশিব ও তাঁর শক্তি সিদ্ধকালী এবং সূক্ষ্ম বায়ুবীজ আছে। এই স্থান ত্রিগুণময়। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না বা গঙ্গা যমুনা সরস্বতী এইখানে মিলিত হ'য়ে, পরে পৃথক পৃথক প্রবাহিত হ'য়ে ঘুরে আবার মূলাধারে সংযুক্ত হয়েছে, তাই মূলাধার=যুক্তত্রিবেণী ; আজ্ঞা =মুক্তত্রিবেণী। এই চক্রে মন স্থির হলেই মন আপনা হ'তেই—যেন মহা আকর্ষণে—ব্রহ্মরন্ধ্রে লয় হয়। আজ্ঞাচক্রে, গুরুর আজ্ঞা মাত্র আছে অর্থাৎ গুরূপদেশ যে জন্য, তা তখন তাঁর কৃপায় সিদ্ধ হয়। আজ্ঞাচক্র, সূক্ষ্ম মনের স্থান। কৃকটিকা হ'তে শিরোদেশের শেষভাগ পর্য্যন্ত যে বায়ু মস্তিষ্কে দৈহিক উপাদানাদি, ধারণ করে তাহাই 'উদান' বায়ু, সর্ব্বশরীর-ব্যাপি যে বায়ু সমস্ত শরীরের বল রক্ষা করে তাহাই 'ব্যান'। ইহাই পঞ্চপ্রাণ। ভ্রূস্থান হ'তেই সহস্রার আরম্ভ। সমস্ত প্রাণের মিলিত শক্তিই

আমাদের জীবিত রাখে। 'জীবন' নামে বৃত্তিই প্রাণ। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মিলিত শক্তি তুষাগ্নির দীপ্ত শিখা ও যুগপৎ উত্থিত "জীবন শব্দ বাচ্যা বৃত্তিরস্তি"।

৮। মনশ্চক্র:—'আজ্ঞার' উপরে গুপ্ত চক্র। ষড়দল, ষড়বৃত্তি=শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, গন্ধজ্ঞান, রসজ্ঞান, স্বপ্ন। মনশ্চক্রে ধ্যানভাব প্রত্যক্ষ হয়। মন এখানে সূক্ষ্মতর অবস্থায় স্থিত।

৯। সোমচক্র:—মনশ্চক্রের উর্দ্ধে। ষোড়শদল, (ষোড়শ 'কলা')। ১ম কলা=কৃপা, ২য় ঐ=মৃদুতা, ৩য়—ধৈর্য্য, ৪র্থ—বৈরাগ্য ইত্যাদি। তদূর্দ্ধে—

১০। নিরালম্বপুরী:—এখানে সর্ব্বব্যাপি তেজোময় ও জ্যোতির্ম্ময় ইষ্ট সাক্ষাৎকার ঘটে। অবলম্বনশূন্যভাব এই খানেই প্রস্ফুটিত হয়। তদূর্দ্ধে শ্বেতবর্ণ 'নাদ', তদুপরি 'বিন্দু' ও দ্বাদশ পদ্ম—শ্রীগুরু চিন্তার স্থান, পরমশিবের স্থান। কুণ্ডলিনীশক্তি এই পরমশিবের সহিত মিলন চেষ্টায় বিভিন্ন চক্রভেদ ক'রে উত্থিতা হন। ওঠবার সময় কমলদলগুলি প্রস্ফুটিত হ'য়ে উর্দ্ধমুখ হয়; নামবার সময় একে একে পদ্মগুলি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই কুণ্ডলী-যোগের ব্যাপারই ভূতশুদ্ধি।

চক্র ভেদ

চক্র গুলির মধ্যে তিনটি গ্রন্থি আছে; গ্রন্থি মানে গাঁট্। উত্থানকালে কুণ্ডলিনী ঐ গ্রন্থিগুলি সহজে অতিক্রম করেন না, সাধককে বেগ পেতে হয়। ১ম গ্রন্থির নাম 'ব্রহ্মগ্রন্থি'—মণিপুর; ২য় গ্রন্থি—'বিষ্ণুগ্রন্থি,'—অনাহত; ৩য় গ্রন্থি—'রুদ্রগ্রন্থি'—আজ্ঞাচক্র। ব্রহ্মরন্ধ্রে অধোমুখ সহস্রদলকমলান্তর্গত উর্দ্ধমুখ দ্বাদশদল কমলের কর্ণিকাস্থ জ্যোতির্দীপ্ত 'অকথাদি' ত্রিকোণমধ্যে সুষুম্নার শেষ সীমা, অতএব কুণ্ডলিনী ঐ পর্য্যন্তই ওঠেন। অর্থাৎ ঐ দ্বাদশদলোপরি সহস্রদলের ক্রোড়ে পরমশিবের সহিত কুণ্ডলিনী যুক্ত করতে হয়।

প্রাণ ও অপান যোগে ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ হয়। অপান, প্রাণ বায়ুকে এবং প্রাণ অপান বায়ুকে কর্ষণ করে। প্রাণবায়ু প্রশ্বাসরূপে বেরিয়ে এলেও, অপানবায়ুর

আকর্ষণে নিশ্বাসরূপে দেহে প্রত্যাগমন করে। এই বিপরীত গমনাগমনে দেহ রক্ষা হয়। শ্যেন পাখী দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকলে, পালাবার চেষ্টা করলেও আবার ফিরে আসতে বাধ্য হয়। আকৃষ্ট হয়ে প্রাণবায়ু নাভিস্থান পর্য্যন্ত যাওয়া আসা করে, আধারপদ্ম বা মূলাধার হ'তে নাভিগ্রন্থি পর্য্যন্ত অপান বায়ু যাতায়াত করে, অতএব 'পূরক' কালে ঐ দুই বায়ু নাভিস্থানে আঘাত করে ও রেচকের সময় তারা স্ব স্ব স্থানে যায়। অনাহতে আছে বায়ুবীজ। এই বায়ুই, অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ বায়ুরূপে দশটি নামে পরিচিত। অনাহত, জীবাত্মার স্থান। সেইজন্য অনাহত হ'তে জীবাত্মাকে সুষুম্নাপথে এনে কুণ্ডলিনীর সঙ্গে একীভূত করতে হয়, পরে বায়ুবীজ ও তেজোবীজ নাসিকাদ্বয়ে আকর্ষণ দ্বারা মূলাধারস্থিত কন্দর্প বায়ু উদ্দীপিত করতে হয়, ফলে, ঐ স্থানের বহ্নি উত্তপ্ত ও প্রজ্জ্বলিত হয়। বিশেষ বিবরণ গুরুমুখে জানতে হয়, হাতে নাতে শিখতে হয়, প্রতি পদে উপদেষ্টার উপদেশ ক্রমে চলতে হয়, নতুবা এই যোগবিদ্যায় পদে পদে বিপদ, কারণ, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসই জীবন, নিঃশ্বাস বেরিয়ে গিয়ে ফিরে না আসাই মৃত্যু। বই প'ড়ে, ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করতে যাওয়ার এই বিপদ, গুরূপদেশ মতে চললে সে ভয় থাকে না। তন্ত্র সেই জন্য বারবার 'অভিজ্ঞ' গুরুর কথা বলেছেন। নাভির অধঃ অপান বায়ুকে গুরূপদিষ্ট প্রণালীতে গুহ্যদেশ হ'তে পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করতে হয়। ইহাই 'উড্ডিয়ানবন্ধ সাধন'। যে পর্য্যন্ত না নাভিস্থ অগ্নি বশীভূত হয়, তাবৎ ত্রিসন্ধ্যায় ইহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করতে হয় ("ত্রিসন্ধ্যাং মানসং যোগং নাভিকুণ্ডে প্রযত্নতঃ)। নাভিপদ্ম হ'তে তিনটি নাড়ী তিন দিকে গেছে। একটি উর্দ্ধে সহস্রার পর্য্যন্ত, ২য়টি মূলাধার অবধি, ৩য়টি মণিপুর পদ্মের নাল স্বরূপ, যাতে নাভিপদ্ম গ্রথিত। নাভিস্থানে বায়ুর বহির্মুখী গতি পরিত্যক্ত হ'য়ে অন্তর্মুখী গতিতে প্রাণ ও অপানবায়ু একত্র হলে, দেবী কুণ্ডলিনী ব্রহ্মদ্বার ছেড়ে দেন—বায়ু সুষুম্নার পথে প্রবেশ করে।

আত্মাগ্নি অনাহতে। একত্বপ্রাপ্ত প্রাণাপান বায়ু উর্দ্ধমুখে সুষুম্নার মধ্য দিয়ে চালিত হলে অনাহতে তার ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সেখানেও অপান বায়ুকে আকর্ষণ ক'রে প্রাণবায়ুর সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। কোন্ উপায়ে মূলাধার সংকোচ ও প্রসারণ করতে হয়, গুরু মুখ হ'তে তা পেতে হয়।

উর্দ্ধগামিনী বায়ু অন্তবস্থ তেজের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে সর্ব্বশবীবে বিচবণ কবে ও মন স্বতঃই তখন ব্রহ্মমুখী হয়। মনেব এই অবস্থাকে 'মনোন্মনী' বলে। "বিশোকা যা জ্যোতিষ্মতি।" (পা. স. পা.৩—৬)। "মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধ দর্শনম্" (পা. বি. পা.—৩৩)। জ্যোতিঃ, সাত্বিক প্রকাশ। হৃৎপদ্মসম্পুট মধ্যে 'ক্ষীবোদার্ণব' নামক স্থানে বুদ্ধি সত্ব ধ্যানে মহা জ্যোতিব প্রকাশ হয়। এই জ্যোতিব স্ফুবণে চৈতন্যপ্রদীপ্ত অস্মিতাব উদয়ে সর্ব্বপ্রকাব শোক বিগত হয়, ঐ জ্যোতি সুষুম্নাব মধ্য দিযে গিযে ব্রহ্মবন্ধ্রে পিণ্ডিত হয। এই অবস্থায় সিদ্ধ মহাপুরুষগণেব দর্শন হয়।

রুদ্রগ্রন্থি ভেদ অতীব কঠিন। এই গ্রন্থি ভিন্ন হ'লেই কুণ্ডলিনী স্বযং উত্থিতা হয়ে পবমশিবে মিলিতা হন। কাবণ, আজ্ঞাচক্রেই সত্ব, বজ, তম, এই গুণত্রয আছে, আব আছে প্রণবময ইতবশিব ; সুতরাং, এই চক্র ভিন্ন হলে স্বয়ং গুণত্রয়েব পাবে যাওযা যায। সহস্রাবাস্থ গুরুরূপী পবমশিবেব আজ্ঞাতেই কুণ্ডলিনী ঐ স্থান ভেদ ক'বে ধাবিতা হন। এই চক্রেব আব একটি নাম 'পবম কুল'। এই আজ্ঞাচক্রে বা ললাটে পূর্ণচন্দ্ররূপী আত্মজ্যোতি, তদূর্দ্ধে জ্যোতির্ম্ময় প্রণব।

অনাহতচক্রান্তর্গত অষ্টদল হৃৎপদ্মই ইষ্ট চিন্তাব স্থান। এখানকাব অধিষ্ঠাত্রী শক্তিব বিশেষ এই যে, ইনি "সহস্রদলকমলান্তর্ব্বিগলিত পবমামৃত বসস্তেনাদ্রং পবমানন্দোৎফুল্ল..." অর্থাৎ জপাৎ ও ধ্যানাৎ সহস্রাবাচ্যুত সামবস্তে ইনি প্রীত, ও সাধকেব মন্ত্র সিদ্ধিদাতা, এই কাবণে হৃৎপদ্মে ইষ্ট পূজায় তাঁহাব কৃপায, সাধক সহজে সহস্রাবে যেতে পাবেন। সেইবকম, নাভিচক্রেব সঙ্গে সহস্রাবেব সম্বন্ধও বিচিত্র। সহস্রাবে আছে অমৃত (চন্দ্র) মণ্ডল, ঐ মণ্ডল হ'তে যে অমৃত ক্ষবণ হয় তা এখানকাব সূর্য্যমণ্ডলে গ্রস্ত হয। সুতবাং নাভিগ্রন্থি ভেদে 'নাভিচৈতন্য' হয় অর্থাৎ 'জ্ঞানসমূহ সংপ্রাপ্তিতে' জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হযে বিষয়মুক্ত পবিচ্ছিন্ন :চিন্তাব অধিকাব সাধক লাভ কবেন। বায়ুবীজ মধ্যে 'ঈশস্থিতিমাহ্'।

[সূর্য্যমণ্ডল রয়েছে কর্নিকাব্যাপক বায়ুমণ্ডলের উপর। "তদুপরি বায়ুবীজ ত্রিকোণাদিকং ধ্যায়েৎ।" 'মং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ ইতি পূজা।' এই পদ্মেই যথার্থ-ধ্যানক্ষমতা লাভ হয় ও শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানেব উদয় হয়।]

তন্ত্র বলেন, "নবচক্রং কলাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোম পঞ্চকম।
স্বদেহে যো ন জানাতি স যোগী নাম ধারকঃ ॥" (প্রাণতোষিণী দ্রঃ)।
ত্রিলক্ষ :—আদি লক্ষঃ স্বয়ম্ভূশ্চ দ্বিতীয় বাণসংজ্ঞকম্।
ইতরং তৎপরে দেবী জ্যোতিরূপ সদা ভজে ॥"

কুণ্ডলিনী সাধনায় ষট্‌শিব ও শক্তিত্রয় জানা দরকার। ষট্‌শিব=ব্রহ্মা, বিষ্ণু (জনার্দ্দন), রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, পরশিব। ইহারা "চিত্রাখ্যানাড্যান্তরস্থাঃ পঞ্চভূতাধিদেবতাঃ।" শক্তিত্রয়=কণ্ঠ—'ঊর্দ্ধশক্তি', মূলাধার 'অধঃশক্তি'; নাভি—'মধ্যশক্তি'; "শক্ত্যাতিতং নিরঞ্জন।' মন—ইন্দ্রিয়গণের প্রভু, মরুৎ বা প্রাণ—মনের প্রভু, সুতরাং বায়ু বশীভূত হলে মনের লয় হয়—ঐ লয়ই নাদে অবস্থিত। হৃৎপদ্মে ইষ্ট ধ্যানে মনোলয়ে সেই কারণে অনাহতধ্বনি শোনা যায়।

[নবচক্র=(১) মূলাধার, (২) স্বাধিষ্ঠান. (৩) 'নাভিদেশে তু দিগ্‌দলং', (৪) অনাহত (হৃদয়), (৫) বিশুদ্ধ (কলাপত্র), (৬) আজ্ঞা, (৭) তালুচক্র ("চতুঃষষ্টি দলং তালুমধ্যে চক্রন্তু মধ্যমম্"), (৮) "ব্রহ্মরন্ধ্রে৷ ইষ্টম চক্রং শতপত্রং মহাপ্রভম্' (৯) 'নবমন্ত' মহাশূন্যং চক্রন্তু তৎপরাৎপরম্। তন্মধ্যে পদ্মং সহস্রদলমদ্ভুতম্ ॥" ঐ গুলি প্রধান চক্র। "ইন্দ্রিয়ানাং মনোনাথো মনোনাথস্তু মারুতঃ। মারুতস্য লয় নাথঃ স লয়ো নাদ মিশ্রিতঃ ॥" এই সব শক্তি="আসীদ্বিন্দুস্ততোনাদো নাদাচ্ছক্তিঃ সমুদ্ভবা। নাদরূপা মহেশানি চিদ্রূপা পরমাকলা ॥"]

স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষি—সর্ব্ববস্তুর এই চারি অবস্থা। ঐ চারি অবস্থার গুণমাত্রে অবস্থিতিই বীজভাবে অবস্থিতি। কুণ্ডলিনী জাগরিতা বা ঊর্দ্ধমুখী হলে সমস্ত বীজভাবে পরিণত হয়, উক্ত বীজ, স্বাধিষ্ঠানে স্বাধিষ্ঠানের বীজে লীন হয়; এইরূপে চক্রের পর চক্রগুলি বীজে পরিণত হয় ও বীজগুলিও কুণ্ডলিনীতে লীন হ'তে থাকে (ঘাড়ে পড়ে ও গ্রাস করেন)। আজ্ঞাচক্রে সবই অহংকারতত্ত্বে ও অহংকারতত্ত্ব কুণ্ডলিনীতে লীন হয়। তারপর অহংকারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে ও মহত্তত্ত্ব কুণ্ডলিনিতে লয় হয়। কুণ্ডলিনী পরমশিবের সঙ্গে একীভূত হ'লে সেই সামরস্য দ্বারা সমস্ত শরীর প্লাবিত হয়। সহস্রারে নিত্যউন্মনী ও সূক্ষ্মতম বা শুদ্ধমন অর্থাৎ সমস্তচক্রই পরারূপে সহস্রারে বর্ত্তমান। তাই অহংকারতত্ত্ব সম্ভূত মনের ও জীবাত্মার লয় হলেও, ভূতশুদ্ধি কর্ম্ম ঐ উন্মনী সমাধান করেন। ভূতশুদ্ধি, মন্ত্রস্নান,

অজপাদি—সমস্তই অন্তর্যাগের অন্তর্গত। সাধনায় প্রথম জাগরিতা হন বাচক শক্তি, তখন বাচ্যশক্তির স্বরূপবোধ উদয় হয়। অকারাদি ক্ষকারান্ত মাতৃকাশক্তিই দেবী কুলকুণ্ডলিনী—বিশ্বচরাচর প্রসূতি,। সর্ব্বমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি এই কুণ্ডলিনীরই অঙ্গরাগ। এই মাতৃকাশক্তিই বিশ্ববীজ-রূপিনী; তার মধ্যে বিন্দু—পুরুষ, ও, বিসর্গ—শক্তি। এই পুংপ্রকৃতির সংযোগই 'অজপা'র 'হংসমন্ত্র'। এই বর্ণাত্মক মন্ত্র হ'তেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের উৎপত্তি।

["অকরাদি ক্ষকারান্তা স্বয়ং পরমকুণ্ডলী। সর্ব্বং চরাচরং বিশ্বং বর্ণাত্মা শ্রূয়তে ধ্রুবম্।" "হংসঃ সকল ব্রহ্ম হি কারণং শব্দদেহিনাং। শিবশ্যক্ত্যাত্মকোহংসঃ বিসর্গো বীজ-ব্যাপিনঃ। ৬৯। অনুলোমো ভবেচ্ছিবঃ বিলোমো জীব উচ্যতে। নির্গুণো ব্যঞ্জনং হেসৌঃ সগুণঃ স্বর উচ্যতে॥" ৭০। (রহস্য ষডাম্নায় তন্ত্রে নিগম সন্দর্ভে ১ম পটলঃ)।]

যন্ত্র

তন্ত্রের সাধক যন্ত্রের উপর পূজা করেন। যন্ত্র সাধারণতঃ দুই প্রকার। বাণলিঙ্গ, শালগ্রামশিলা আদিকে সিদ্ধযন্ত্র বলা হয়। সিদ্ধযন্ত্রে আবাহন বা বিসর্জ্জন নেই। অন্যপ্রকার যন্ত্র যা পূজার সময় আঁকা হয়, তা হিন্দুমাত্রেই দেখেছেন। বৃত্তের মধ্যে বৃত্ত—বৃত্ত পদ্মাকৃতি—বৃত্তের মধ্যে ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ আদি, সমস্ত বৃত্তের চারিদিকে ভূপুর—এইরকম ইষ্টভেদে বহুপ্রকার যন্ত্র পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে আঁকা হয়।

সাকার অবলম্বন বিনা উপাসনা হয় না অর্থাৎ অবলম্বন ভিন্ন কোন বস্তুর প্রকাশ হয় না, বহিঃসংঘাত ভিন্ন অন্তরের কোন শক্তির বিকাশ বা ক্রমস্ফূর্ত্তি অসম্ভব। এই বহিঃসংঘাত দরকার হয় অন্তঃস্ফূর্ত্তির জন্যই। আমরা দেহকে বলি যন্ত্র, যন্ত্রী আছেন অন্তরে—অন্তরের শক্তিই যন্ত্রী; সেইরকম জগৎ ও যন্ত্র; যন্ত্রী—যিনি জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করেন। ইষ্টই অন্তরের শক্তি। এই শক্তির বহিঃস্ফুরণই যন্ত্র। তন্ত্র বলেন, মন্ত্রময় জগৎ, অতএব, অক্ষরগুলি ব্রহ্মশক্তির যন্ত্র। সাধকের যন্ত্র মন্ত্রময়, ইষ্ট মন্ত্ররূপা। জীবের কামক্রোধাদি দোষোত্থ সর্ব্বদুঃখ নিয়ন্ত্রণ হেতু ঐ রেখাময় সাকার বিগ্রহের নাম যন্ত্র। যন্ত্রে, পূজায় তাই সহসা ইষ্ট প্রসন্ন হন (কুলার্ণব ষষ্ঠ উঃ ৮৫।৮৬।৮৭)। যন্ত্র

নিয়ে সাধনাও "জ্ঞাত্বা গুরুমুখাৎ সর্ব্বং পূজয়েৎ বিধিনা।' যন্ত্রের স্বরূপ, যন্ত্রের তত্ত্ব ও মন্ত্রের শক্তি না জানলে পূজাদি ব্যর্থ হয়। উক্ত তন্ত্র গাভীর উপমা দিয়েছেন, দুধ হ'তে ঘি হয়, এই ঘি গাভীতেই বর্ত্তমান, কিন্তু দুধ দোহন করতে জানা চাই, নতুবা বৃথা আশা ঘি পাবার! অতএব, সাধকের সাধনশক্তিও থাকা চাই। প্রতিমা ও একটি যন্ত্র, জগতের যা কিছু সবই যন্ত্রবৎ ব্যবহার হ'তে পারে।

যে যন্ত্র এঁকে সাধক পূজা করেন, সেটি সাধকের স্ব ইষ্ট প্রতীক, তাতে মাত্র সাধকের স্ব ইষ্ট পূজা হয়। সিদ্ধযন্ত্রে সকল দেবতারই পূজা হয়। বাণলিঙ্গ ও শালগ্রামে প্রভেদ এই যে, বাণলিঙ্গের উপর সমস্ত পূজাই হয়, শালগ্রামে শববাহিনীর পূজা ছাড়া আর সমস্ত পূজাই হয়। যন্ত্রটি ইষ্ট, অতএব বিশ্বাত্মা। যে যন্ত্র আঁকা হয় সেটি বিশ্বাত্মা, আকারটি তাহাই, যা জগৎরূপে প্রকাশিত, সুতরাং সাধকের শরীর ও যাবতীয় অবয়বই যন্ত্র। সৃষ্টি কর্ম্ম ও লয় কর্ম্ম, এই উভয় ভাবেই যন্ত্রের পূজা হয় অর্থাৎ আরোহ প্রণালীতে বা অবরোহ প্রণালীতে সাধন করা হয়। যন্ত্রের মধ্যে ত্রিকোণ আছে, ত্রিকোণের মধ্য বিন্দুই ইষ্টস্বরূপ, জীবের জীবাত্মা ও নিরাকার পরমাত্মা। পূজার বিন্দু হ'তে আরম্ভ ক'রে ভূপুর পর্য্যন্ত যাওয়ার নাম 'সৃষ্টিকর্ম্ম', ভূপুর হ'তে বিন্দুতে আসার নাম, লয় কর্ম্ম'। সৃষ্টি কর্ম্মে ত্রিকোণই সর্ব্বানন্দময় চক্র বা যোনি=বিশ্বযোনি। বিশ্বই, বিশ্বজননীর শরীর, কিন্তু স্বরূপ বা প্রকাশ অবস্থায়—সব সময়েই মা শক্তিরূপিনী; 'সর্ব্বং সম্বিদং ব্রহ্ম'। যাকে জড় বলি, যেমন অন্নাদি', তাই আহার ক'রে আমরা জীবনী শক্তি পাই। জড় ও চৈতন্যে মাত্র মাত্রায় তফাৎ, মাত্রা, শক্তিরই আর একরূপ মাত্র। মন ও শক্তি। ব্রহ্ম বা শিব-শক্তিই বিশ্বাত্মা। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিও শক্তি। বিশ্বাত্মাই মূলাধারে ধ্রুতশক্তি কুণ্ডলিনী, আর, দেহের মধ্যে আছেন প্রাণশক্তি। গুরূপদেশে সাধক ভাবতে শেখেন যে, শরীর ও শরীরের প্রতি অঙ্গ এবং তাদের বিভিন্ন ক্রিয়া সবই শক্তি এবং এই সমস্তকে নিয়ন্ত্রণ করেন ঐ সবের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি। যন্ত্রের বিন্দু, ত্রিকোণ, ও বৃত্তাদিকে বিভিন্ন চক্র বলা হয়। সাধক চক্রের পর চক্রের সমুদয় শক্তির সঙ্গে নিজ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বৃত্তির ঐক্য চিন্তা করতে করতে অগ্রসর হন। অভ্যাসের ফলে সাধক যন্ত্রস্বরূপতা লাভ করেন—সর্ব্বক্ষেত্রে চৈতন্য চিন্তা করতে করতে সাধক

সর্ব্বত্র চৈতন্যই দেখেন। প্রথম অবস্থায় সাধক যাকে বাহিরের মনে করেছিলেন, এখন তিনি নিজেই তাই ('আমি হই বিকাশ আবার')। আমরা ওঁকারের ত্রিনরূপ সাধনায় ইহা দেখেছি।

[মহাযান বৌদ্ধতন্ত্রেও অনুরূপ ভাব বর্ত্তমান , সাধক সেখানে দেবতার 'মণ্ডলে' চিত্ত নিবেশ করেন , 'আবরণ দেবতা' ও 'শূন্যতার সঙ্গে' সেখানে সাধকের ঐক্যানুভূতি আসে। গুরুমুখ হ'তে তত্ত্ব জেনে, গুরুমন্ত্র ও যন্ত্র অভেদ এই জ্ঞান সাধকের উদয় হয়।]

["মন্ত্র যন্ত্র ষডাম্নায় ইষ্টদোগুরু তত্ত্বতঃ। মন্ত্রবাচকঃ শাস্ত্রং হি ন মন্ত্রঃ শাস্ত্র-সম্ভবঃ।।" ৫। গুরৌ মন্ত্রে তথা দেবে একত্মা দৃঢ়ং নিশ্চিতঃ। ঐক্যজ্ঞানে ভবেৎ সিদ্ধো ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন।।" ১৫। "গুরুরূপে সহস্রারে দয়া করুণয়া যুতঃ। মন্ত্রদাতা যন্ত্ররূপং চক্রো যন্ত্রং যথা হরে।। ৪৪। অভেদো যন্ত্রদেবেষু তথামন্ত্রে পরেশ্বরে। সদ্‌গুরুঃ সচ্চিদানন্দো বিগ্রহো বিগ্রহান্তরে।।" ৪৫ (রহস্যষডাম্নায় নিগমসন্দর্ভ তন্ত্রে ২য় পটলঃ)।]

ধ্যান

ধ্যান দ্বিবিধ—স্থূল ও সূক্ষ্ম। তন্ত্র বলেন, স্থূল ধ্যানে নিশ্চল চিত্ত হ'লে, সূক্ষ্মধ্যানেও নিশ্চলত্ব আসে। ধ্যানে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। স্থূল ধ্যানে ইষ্টের সমগ্র অবয়ব ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়। কিন্তু স্থির হলে মূর্ত্তি থাকে না, মাত্র থাকে ভালবাসার গাঢ়ত্ব। সঙ্গে ইষ্ট বুদ্ধি থাকায়, তখন "করপাদোদর-স্যাদি রহিতং পরমেশ্বরং। সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দ নিষ্কলম॥" সচ্চিদানন্দময়স্বরূপ ও সর্ব্বতেজোময় রূপে ইষ্ট প্রতিভাত হন। ক্রমশঃ সাধক "নিশ্বাসোচ্ছ্বাসহীন" হ'য়ে যান, তখন মন সুখ দুঃখ জানতে পারে না, কোন সংকল্পও করে না, কাষ্ঠবৎ অবস্থিতি করেন ও ইষ্টে 'বিলীনাত্মা' হ'য়ে সমাধিস্থ হন। এই স্থানে তন্ত্র বলেন যে, সাধকের ধ্যানসামর্থ্য অনুসারে ব্রহ্মানুভূতি হয়। ধ্যানবলে যখন কীটও ভ্রমরে পরিণত হয়, তখন ধ্যানে কি না হ'তে পারে? "ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্য্যাদাত্মচিন্তনম্। স সর্ব্বং পাতকং হন্যাত্তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা" ॥ "ন হি ধ্যানাৎ পরো মন্ত্রো ন দেবাস্ত্বাত্মনঃ পর।" এই রকম ধ্যানসিদ্ধ সাধক "মন্ত্রোদকৈর্ব্বিনা সন্ধ্যাং পূজাহোমৈর্ব্বিনা

তপঃ। উপচারৈর্ব্বিনা পূজাং যোগী নিত্যং সমাচরেৎ॥" কুলার্ণব ৯ উঃ—৩—৩৯ দ্রঃ)। এই ধ্যানাবস্থা আনবার জন্যই বাহ্যপূজা।

আকাশে শব্দের অভিব্যক্তি এই প্রকার:—(১) বর্ণাত্মক শব্দ, ইহা অর্থযুক্ত, (২) দুই বস্তুর আঘাতজনিত ধ্বন্যাত্মক শব্দ, ইহা অর্থহীন। বর্ণ, শক্তিগর্ভে নিহিতশক্তির একটি অংশ। ঐ নিহিতশক্তি=বিশ্বমনের স্বপ্নজগৎ। শব্দ=সৃজনীশক্তির একটি গঠনমূলক শক্তি। শব্দব্রহ্ম=মহাবিন্দুর প্রসারণে কামকলায় পরিণত প্রকাশোন্মুখ শব্দ+অর্থ='পরা'বাক ('পর' শব্দ)। পরাবাক, শব্দের চতুর্থ অবস্থা। পশ্যন্তি আদি অপর তিন অবস্থায় চিন্ময় বীজের ভাঁজ খুলে যায় ও মনোজগতের নানা প্রকার বাসনা উদ্গত হয়। ঐ গুলির অভিব্যক্তির জন্য জীবশরীরের দরকার। শব্দব্রহ্মই মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি।

কোন বিষয় (অর্থ) মনের কাছে উপস্থাপিত হ'লে, বিষয়গ্রহণের সঙ্গে মন তদাকারে পরিণত হয়। ইহাই বৃত্তি। বৃত্তিরূপী মন বহির্বস্তুর একটি প্রতিরূপ। একই মন, 'গ্রাহক' ও 'গ্রাহ্য' অর্থাৎ 'প্রকাশক' ও 'প্রকাশ্য', 'বাচক' ও 'বাচ্য'। বস্তুর বোধ হবামাত্রই মন তদাকারে আকারিত হয়। ইষ্ট চিন্তাতেও ঠিক ঐ ব্যাপার হয়। সেইজন্য দীর্ঘস্থায়ী নিরবচ্ছিন্ন দেবতা চিন্তনে মন দেবতাময় ও বিশুদ্ধ হয়। যা অনুভূত হয় তাহাই অর্থ। অতএব, অর্থই 'ভোগ্য'। অর্থরূপী মন=বহির্বস্তু বা স্থূল অর্থের যথার্থ প্রতিচ্ছায়া। শব্দ+অর্থ=নামরূপ। শব্দরূপী মন='ভেদসংগ্রহবৃত্তি-শক্তি'। বৃত্তি চিৎ-মুখী হ'লে, পরে আর বৃত্তি থাকে না। অন্যথা নানা অনর্থ উৎপাদন করে। অতএব, ধ্যানকালে বৃত্তিকে দমন করতে হয়, অথবা সর্ব্বপ্রকার বৃত্তিতে চিন্ময় বোধ উদ্দীপিত করতে হয়। নামরূপই মনের বিষয়; ভেদ-জ্ঞানে ইহা চিত্তবিক্ষেপের কারণ। নামরূপের মিলিতাবস্থাই 'বিশুদ্ধভাব'। বিশুদ্ধভাবে চিত্তবিক্ষেপ বন্ধ হয়। ঐ বিশুদ্ধভাবের ধ্যানই সগুণ ধ্যান। এ পর্য্যন্ত একটা সূক্ষ্ম অবলম্বন থাকে। ক্রমশঃ মন বিষয়হীন হ'লে আসে নিরালম্ব ও নির্গুণভাব (নিরাকার)। বাহ্যপূজার, "অন্তর্যাগং বহির্যাগং ঘটার্ঘ্যস্থাপনাদিকং" সব করতে হয়; একমাত্র ধ্যানদ্বারাও সিদ্ধকাম হওয়া যায়। উক্ততন্ত্রের ১৬ উল্লাসে ধ্যানভেদ বলা হয়েছে, যার দ্বারা "ঈপ্সিতং লভতে যেন পূজা হোমাদিকং বিনা।" মনোহর স্থানে, গুরুবন্দনার পর

দৃঢ়চিত্ত হ'য়ে আসনে ব'সে "মস্তকস্থিত সম্পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলমধ্যগম" (শ্রীগুরুস্থানে), ইষ্ট মন্ত্র ঐ "সচ্চন্দ্রবিম্বসঞ্জাত সুধাপ্লাবিত বিগ্রহম আত্মানং ভাবয়েন্নিত্যং নিশ্চলেনাত্মবাত্মনা" হয়ে ধ্যানস্থ হওয়াই—সাত্ত্বিকধ্যান। ইহাও একপ্রকার মন্ত্রস্নান—সহস্রারাচ্যুত অমৃতধারায় স্নান। এই ধ্যান দিব্যভাবাবলম্বী সাধকের। রাজস ধ্যানে মূর্দ্ধায় মনোনিবেশ ক'রে জপ পরায়ণ হ'লে, সাধক সমস্ত প্রকৃতিজয়ী হন—বীরভাব।

গানের যেমন বিভিন্ন সময় আছে, সুরের যেমন নির্দ্দিষ্ট কাল আছে, ধ্যান সম্বন্ধেও 'জপরহস্যে' সেই রকম ব্যবস্থা তন্ত্রে আছে—সবই বিভিন্ন অবস্থায় নীত হবার চেষ্টা। হৃদয়ে জপের পর মন্ত্রস্নানে মন্ত্র ধ্যান করতে হয়, যথা ব্রহ্মরন্ধ্রে, দিনের প্রথম ১০ দণ্ডের মধ্যে; দ্বিতীয় দশদণ্ডের মধ্যে নিষ্কল স্থানে; তৃতীয় দশদণ্ড মধ্যে ভ্রুর অন্তর্গত মনশ্চক্রে; রাত্রিতে প্রথম দশদণ্ডের মধ্যে হৃদয়াকাশে বা নিষ্কলে; তারপর ঐরূপ দশদণ্ডের পর বিন্দুস্থানে; পরে ঐরূপে কলাহীন নিষ্কলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মন্ত্র ধ্যান করতে হয়। স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে মন্ত্রের সমস্তবর্ণই ধ্যান করতে হয়, তাতে 'জপরহস্য' প্রকাশ পায়। সাধক, জপের সঙ্গে ইষ্ট চিন্তা করতে থাকেন, কারণ, মন্ত্রের অর্থ মন্ত্রময় দেবতা। জপের উদ্দেশ্য, ধ্যানে একাগ্রতা লাভ করা। মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসহীন ও লক্ষ্যহারার জপ নিষ্ফল। জপ, অতিদ্রুত বা অতি ধীরে করা নিয়ম নয়। জপ হয় তালে তালে, ছন্দানুবর্ত্তী হ'য়ে, তাতে সাধকের চিত্ত সহজে সরস হয় ও জপে ক্লান্তি সহজে আসে না।

আমাদের দেহই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। আমাদের মধ্যেই সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠান। মানুষের মধ্যেই হুঁষ বা চেতনার বিশেষ স্ফূর্ত্তি, তাই মানবদেহ সামান্য নয়। সহস্রারই এই দেহের ব্রহ্মপুরী। সুষুম্নার মধ্যেই নিখিল তীর্থ ভূর্ভুবঃ আদি সমস্তই বর্ত্তমান। তীর্থের তীর্থত্বাদি বোধ—সবই অনুভূতিগম্য। গুহ্য লিঙ্গ নাভির উপরে মনকে না তুলতে পারলে, জীব, জীবই থাকে—বদ্ধভাব যায় না। সুতরাং, মূলাধার হ'তে নাভি—সমস্তটাই 'ভূ' স্থান। প্রথম গ্রন্থি ভিন্ন হলে সাধক বুঝতে পারেন যে, তিনি ঊর্দ্ধ পথেই ঠিক্ চলেছেন। তিনি দেখেন যে, নাভিদেশেই ভূর্লোক, উদরে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্লোক; তিনি যখন স্বহৃদয়ে সূর্য্য, সোম, বুধ, শুক্রাদির স্থিতি দেখতে পান, তিনি বোঝেন যে, তাঁর হৃদয়ই 'মহর্লোক' কণ্ঠ 'জনলোক'

ভ্রূ 'তপোলোক', শিরোদেশ 'সত্যলোক'। ঐ ভূর্লোকেই 'অনন্ত' অনন্ত কামনার ফনা বিস্তার ক'রে ফণিমণ্ডলে বাস করছেন। এই 'অনন্তের' একটি নাম বাসুকি। নাভিদেশের অধোদেশেই বাসুকীর আবাস—'মহাপাতাল', মহাঘোর কালাগ্নিনরক। অনন্ত, সর্ব্বব্যাপ্ত—উর্দ্ধ, মধ্য, অন্তর, বাহির, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। অনন্তই বিরাট। যা ব্যষ্টিতে তা সমষ্টিতে, যা সমষ্টিতে তা ব্যষ্টিতে। বিরাটের পাদদেশের অধোভাগই 'অতল', চরণই 'বিতল', পাদসন্ধি 'নিতল', জঙ্ঘা 'সুতল', জানু 'মহাতল', উরু 'রসাতল', কটিদেশ 'তলাতল'—এই সপ্তপাতাল। ব্যষ্টিভাবে, আমাদের চরণ, জানু, জঙ্ঘা ইত্যাদিতে সপ্তপাতালের স্থিতি উপলব্ধি হয়—বিরাটের সঙ্গে ঐক্য অনুভব হয়। ঐ বিরাটই—দৃশ্য বিশ্বরূপ 'অ'কার, 'উ', স্বপ্নবিশ্ব—হিরণ্যগর্ভ। অনাহতে হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর ও তাঁর শক্তি ভুবনেশ্বরী। 'ম' সুষুপ্তি=প্রাজ্ঞ। ধ্যান সাধনে দরকার 'অ'কে 'উ'তে বিলীন এবং 'অ' ও 'উ'কে 'ম' এ বিলীন করা, এইটি সাধিত হলে উদ্ভাসিত হন 'প্রাজ্ঞ' পুরুষ। এইবার তাঁকে ও 'ম'কে, পরমাত্মায় বিলীন করতে হবে। নাভিচৈতন্য হলে, মন যখন অনাহতে যায়, তখন জীবাত্মাকে স্থির দীপশিখার মত বোধ হয় ও এই জীবাত্মাই 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। এ পর্য্যন্ত মন, স্থূলরাজ্যের গতিই অনুভব করেছে। হৃৎপদ্ম হ'তেই মন অন্তররাজ্যে প্রবেশোন্মুখ হয়। মন, 'সমস্ত গুণের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে সত্য ধরতে চায়, সত্য স্বভাবতঃ গুণাতীত। সমস্তই সত্যস্বরূপ চণকাকার হ'তে উৎপন্ন হ'য়ে স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়—পৃথক পৃথক বোধ নিয়ে। এই ভেদ দূর হলেই দ্বন্দ্বের দাসত্ব হ'তে নিষ্কৃতি পেয়ে স্বস্থানে চায় ফিরে যেতে। হৃদয়ের স্থান অনাহতে, কিন্তু সূক্ষ্ম হৃদয় ভ্রূস্থানে—দ্বিদলপদ্মে। তার পর মনশ্চক্র, তারপর সোমচক্র—মন 'ধাওয়ে অমৃতলোভে'। নিরালম্বপুরীতে, বিনা অবলম্বনে বায়ু ও দৃষ্টি স্থির হয়—উন্মনীর কার্য্য আরম্ভ হয়। সাধক, পরাভাবের 'খেচরীমুদ্রা' অবলম্বন করেন, ঐ স্থানের কাছেই উর্দ্ধে মহাজ্যোতি-প্লাবিত নাদ, বিন্দু, শ্রীগুরুস্থান, সহস্রার, চণকাকার।

[জ্ঞানসংকলিনীতন্ত্রে খেচরীমুদ্রার লক্ষণ, "মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনং। বায়ুস্থিরা যস্য বিনা নিরোধনম্॥ দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনাবলোকনম্। সা এব মুদ্রা বিচরন্তি খেচরা॥"]

সূক্ষ্মভাবে এই মুদ্রা, "চিদ্ব্যোমচারিণী মুদ্রা শিবাস্থা তু খেচরী" (বামকেশ্বরতন্ত্রার্গত নিত্যাশোধিনী), স্থূলভাবে খেচরী মুদ্রা বিভিন্ন অঙ্গুলীর সমাবেশে হয়—'সব্যং দক্ষিণদেশে তু দক্ষিণং বামদেশতঃ···' ইত্যাদি। সকাম ভাবে প্রযুক্ত হলে, এই মুদ্রা রচনার দ্বারা পূজায় অপরের তেজ হরণ করা যায়। ধ্যানে বা সূক্ষ্মভাবে এই মুদ্রায় সর্ব্বতেজ আত্মস্থ হয়, তখন 'একাদশ স্বরূপেতং বীজং' অনুভূত হয়।

সাধনের স্থান নির্ণয় করতে হয়। কুলার্ণবে, ১৫ উল্লাসে এ বিষয় বলা আছে। জপ ধ্যান সেইখানেই প্রশস্ত যেখানে সাধকের চিত্ত প্রসন্ন হয়। পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, গুহা, পর্ব্বতের চূড়া, তীর্থ, উদ্যান, নদীসঙ্গম, সমুদ্রের কূল অথবা নিজগৃহ প্রভৃতি স্থান সাধনে প্রশস্ত। জীর্ণ দেবালয়, সৌখীন লোকের বাগানবাড়ী, বৃক্ষতল, নদীকূপ বা তড়াগের একেবারে গর্ত্ত, ভূছিদ্র আদি স্থান বর্জ্জনীয়। কীট মশকাদি উপদ্রুত স্থানে বসতে নেই।

জপ মনে মনে করাই প্রশস্ত (ঠোঁট না নড়ে)। জপ করতে করতে যদি "আনন্দাশ্রু চ পুলকো দেহাবেশ কুলেশ্বরী। গদ্‌গদোক্তিশ্চ·"—এই সব লক্ষণ দেখা দেয়, বুঝতে হবে জপ করা সার্থক হচ্ছে, নতুবা মাত্র বর্ণমালার আবৃত্তি হচ্ছে। পুরশ্চরণে বা ঐ রকম পুনঃ পুনঃ জপে 'মন্ত্রস্নান' হয়। পুরশ্চরণে, আহার বিহারে নিয়ম পালন করতে হয়। মন্ত্রস্নান হয় যখন সাধক, "শিব কুণ্ডলিনী যোগস্যন্দনামৃতধারয়া। আপাদমস্তকং দেবি প্লাবয়েৎ প্লাবনং ভবেৎ॥" (কু. ঐ, ৩৯)। সাধনে পঞ্চযোগ অবলম্বন করতে হয়। যে কোন প্রকারে ইষ্টে তন্ময়ত্ব আনা দরকার।

["শ্রদ্ধাভক্তি ধ্যানং জ্ঞানং মন্ত্রযোগেন মিলিতম্। পঞ্চযোগঃ পঞ্চযোগঃ পঞ্চযোগ উদাহৃতঃ॥" (রহস্য রত্নায় নিগম সন্দর্ভে তন্ত্রে ৪র্থ পটলঃ।—১৫২)।]

মন্ত্রস্নান ঃ—মন্ত্রস্নানকে মানস (আভ্যন্তর) বা যৌগিকস্নানও বলে। ইহাও গুরুমুখে শুনতে হয়, কারণ, কুণ্ডলিনীর প্রতি চক্রই তীর্থ; এই সব তীর্থে চিত্ত একাগ্র করতে হয়, প্রাণাদি বায়ুর সাহায্যে। তন্ত্র বলেন, যাঁরা বিশুদ্ধচিত্ত ও অনাসক্ত তাঁরাই মন্ত্রস্নানের অধিকারী।

[আজ্ঞাচক্রে 'বিন্দুতীর্থ', বিশুদ্ধে 'অষ্টতীর্থ' ইত্যাদি। মন্ত্রস্নানের একস্থানে সম্বিদ্রস চিন্তার কথা আছে। সম্বিৎ = ব্রহ্মচৈতন্য; তিনভাবে তাঁর প্রকাশ—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ। ব্যষ্টি স্থূলের সমষ্টি = বিরাট বা বিশ্ব ; ব্যষ্টি সূক্ষ্ম সমষ্টি = হিরণ্যগর্ভ ;

ব্যষ্টি কারণদেহের সমষ্টি = সূত্রাত্মা, স্বপ্নাবস্থায় চিন্তার বিচরণ = তৈজস, সুষুপ্তিতে (সমাধিতে), প্রাজ্ঞ = কারণশরীর অ + উ + ম = জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ।]

প্রাণায়াম:—ধ্যানের সহায়তার জন্যই প্রাণায়াম করা হয়। প্রাণায়াম অনেক প্রকার; তার তিন অঙ্গ—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। বায়ুকে দেহের মধ্যে নিঃশ্বাসের দ্বারা টেনে নেওয়ার নাম পূরক, সেই বায়ুকে ধারণ করাই কুম্ভক ও ধীরে ধীরে সেই বায়ুকে নিঃসারণ ক'রে দেওয়াই রেচক। এইরকম মাত্র নাক টেপাটেপিতে প্রাণায়াম হয় না। প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য প্রাণসংযম। ঐ উদ্দেশ্য না থাকলে, নাক টেপাটেপিতে নাড়ীশুদ্ধি মাত্র হয়।

["চিত্তাদি সর্ব্ব ভাবেষু ব্রহ্মত্বেনৈব ভাবনাৎ। নিরোধঃ সর্ব্ববৃত্তিনাং প্রাণায়াম স উচ্যতে ॥ নিষেধনং প্রপঞ্চস্য রেচনাখ্য সমীরণঃ। ব্রহ্মৈবাস্মীতি যা বৃত্তি পূরকো বায়ুরীরিতঃ ॥ ততস্তদ্বৃত্তি নৈশ্চল্যং কুম্ভকঃ প্রাণসংযমঃ। অয়ঞ্চাপি প্রবুদ্ধানামজ্ঞানাং ঘ্রাণপীড়নম্ ॥" (অপরোক্ষানুভূতি)]

অর্থাৎ, 'সর্ব্বভাবে ব্রহ্মভাবনা করতে করতে সর্ব্ববৃত্তি নিরোধের নাম প্রাণায়াম, এই প্রপঞ্চ বিশ্বের নিষেধ ব্যাপার, বিষয়বাসনা ত্যাগ বা অনিত্য বোধই রেচক (ত্যাগ), সমস্তই ব্রহ্ম, এই পরিপূর্ণতার ভাবই পূরক (গ্রহণ), ঐ ব্রহ্মভাবকে নিশ্চল জ্ঞানে ধারণই কুম্ভক। ঐ রকম রেচক, পূরক ও কুম্ভকই প্রাণায়াম, অজ্ঞেরা ঘ্রাণপীড়নকে প্রাণায়াম বলে'। সর্ব্ববৃত্তি নিরোধের কথা বলা হয়েছে। একটা অবলম্বন পেলে ব্রহ্মভাব উদ্দীপনার সুবিধা হয়। এজন্য পূরকের সময় ব্রহ্মার ধ্যান (সৃষ্টি), কুম্ভকে বিষ্ণুর ধ্যান (স্থিতি) ও রেচকে শিবের ধ্যান (সংহার)—সাধকসম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে অথবা 'অ', 'উ', 'ম'—এ তিন জ্যোতির্ম্ময় বর্ণ কিম্বা 'ওঁ' চিন্তা করার রীতিও বর্ত্তমান। ধ্যান গভীর হলে প্রাণায়ামের কার্য্য আপনাআপনি হয়, জপে আনন্দ উদয় হলেও সেই রকম হয়। তন্ত্রশাস্ত্র ভাবের উপর জোর দিয়েছেন সর্ব্বত্র। ভাবহীন, 'অ'কার, 'উ'কার বর্ণমাত্র, ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি মানসচিত্র মাত্র।

আচমনে তত্ত্বত্রয়:—তান্ত্রিক আচমনে, আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা বলতে হয়। স্বাহা = নিবেদন, দান, প্রক্ষেপ। দিব্যলক্ষ্য সাধক ঐ তত্ত্বত্রয়ই ব্রহ্মাগ্নিতে প্রক্ষেপ করেন (আহুতি দেন)।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত সমস্ত অভিমানী পুরুষই বিরাট; তাঁর আত্মাভিমানত্বই 'আত্মতত্ত্ব', অর্থাৎ ব্যষ্টিভাবে 'আমি আমার' সম্বন্ধযুক্ত যা কিছু সবই 'আত্মতত্ত্ব'। যার জন্য বা যাতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সংঘটিত হয় তার নাম 'বিদ্যাতত্ত্ব', ব্যষ্টিভাবে, যে বিদ্যার বা বিজ্ঞানপ্রভাবে শ্রদ্ধা জাগরিত হয়, গুরুমুখী সেই বিদ্যাই 'বিদ্যাতত্ত্ব'। আনন্দস্বরূপই 'শিবতত্ত্ব', সহস্রার ভাসমান আনন্দসমুদ্রে বা শক্তিসমুদ্রে। ঐ সমুদ্রমধ্যে স্থিত মহান্ পুরুষই 'শিবতত্ত্ব'। এই আচমনের পর প্রণব উচ্চারণে 'সামান্যার্ঘ্যস্থাপন' করতে হয়।

তন্ত্রসাধন, মাত্র আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয়। দর্শনশাস্ত্রকে পিণ্ডীকৃত ক'রে এই সাধনার উদ্ভব হয়েছে। প্রতিপদে 'বাসনা' জানা দরকার, নতুবা হাত পা নাড়া আর ঘণ্টা নাড়াই সার হয়।

গুরুতত্ত্ব

গুরুতত্ত্ব সাধনাঙ্গ নয়, সমস্ত সাধনশাস্ত্র জুড়ে শ্রীগুরু রয়েছেন। 'মানুষ গুরু মন্ত্র দেন কাণে, জগদ্গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।' এই জগদ্গুরু বা শ্রীগুরু আনন্দস্বরূপ, বিশ্বে তিনি আনন্দ বিতরণ করছেন। গুরু মানেই বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক। আনন্দস্বরূপ বিশ্বাতীগ বিশ্বাতীত হয়েও বিশ্বের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু তাঁকে চিনিয়ে দেয়, জানিয়ে দেয় কে? যিনি তা দেন, তিনিই মানুষ গুরু।

দীক্ষার সময় গুরু নিজদেহে 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' করেন। প্রতিমায় 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' ক'রে পূজা হয়, শিষ্যের যে ইষ্ট, সেই ইষ্ট তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠায় ধারণ করেন। সে সময়ে, "দীক্ষাকালে মহাকাল-প্রবেশো বিদ্যুতাকৃতিঃ" (রহস্যষডাম্নায় তন্ত্রে নিগম সন্দর্ভে ২য় প. ২৮)। গুরু শুধু দীপ জ্বেলে দেন, শিষ্যহৃদয়ে দাবানল জ্বলে ওঠে সাধনায়। গুরু, শিষ্যে শক্তিসঞ্চার করেন। শিষ্যকে যোনিমুদ্রা ও মন্ত্রের 'বীর্য্যযোজনা' শিখিয়ে দেন; তাতে শিষ্য আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন। বীর্য্যযোজনা গুরুমুখে জানতে হয়। যোনিমুদ্রার সংকেত পূর্ব্বে বলা হয়েছে। এ হেন গুরুকে মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে দেখলে, শিষ্যের বৃথা মন্ত্রসিদ্ধির আশা, বৃথা তাঁর দেবপূজা। প্রতিমাতে

যেমন শিলাবুদ্ধি কবলে, পূজাদি সব নিষ্ফল হয়, গুরুকে সাধাবণ মানব মনে কবলেও সেইরূপ হয়। দেবতা, মন্ত্র ও গুরু অভিন্ন—শিষ্যকল্যাণেব জন্যই নামরূপেব পার্থক্য।

["গুরু প্রকাশতে দীপং বহ্নি-প্রকাশ পূর্ব্বকম্। স্বপ্রকাশ পবংব্রহ্ম তথা সদ্গুরুরীশ্ববী॥" (বহস্য ষডাম্নায় ঐ, ঐ, ১৯।)। "স্বরূপং কালঃ কালী চ অরূপং সর্ব্ব ব্যাপিতং। বিন্দুনাদঃ সূক্ষ্ম মাত্রং পুষ্পবন্তঃ প্রকাশিতঃ॥" (ঐ, ঐ-৪০)। "বন্ধনং যোনিমুদ্রায়া মন্ত্রাণাং বীর্য্যযোজনম্। উভয়ং বোধয়ন শিষ্যং সংরক্ষেৎ গুরুবাত্মবান্॥" (তন্ত্রবাজতন্ত্র, ২,৮২)।]

তন্ত্রশাস্ত্র সদ্গুরুব কথাই বলেছেন। সাধনায় উচ্চাৎ উচ্চতব সোপান আছে। প্রত্যেক সোপানেব জন্য অর্থাৎ উচ্চতব অধিকাব লাভ কববাব জন্য 'সংস্কাব' বা শিক্ষালাভ দবকাব, গুরুব দবকাব। তন্ত্রমতে গুরু একজনই। শৈবেব গুরুত্রয়, বৈষ্ণবেব গুরুপঞ্চক, বেদশাস্ত্রেব শত শত গুরু, কিন্তু কৌল সাধকেব একই গুরু, সুতবাং দীক্ষাগুরুই গুরু, অপবাপব সকলেই শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু অনেক হ'তে পাবেন। যিনি পূর্ণাভিষেক গুরু, তাঁব কাছে 'পাদুকা' পাওয়া যায়—অর্থাৎ গুরুতত্ত্বেব সাধনা শিক্ষা পাওয়া যায়, সেইজন্য তিনিও গুরুবৎ পূজার্হ। গুরু দ্বিবিধ—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু।

[কৌলমার্গ রহস্যে ভাস্কববায় ধৃত বচন হ'তে জানা যায় যে, যদি দীক্ষা-গুরু উচ্চতব সাধনাব উপদেশ দিতে অসমর্থ হন, শিষ্য, দীক্ষাগুরুর অনুমতি নিয়ে জ্ঞানবান অন্য গুরুব আশ্রয় নিতে পারেন। নতুন উপদেশ যা শিষ্য পাবেন, তাহা দীক্ষাগুরুকে জানিয়ে তাঁরই উপদেশ মত কার্য্য কববেন। ঐ বকম জ্ঞানবান গুরুই শিক্ষা গুরু।] পিচ্ছিলাতন্ত্রেব বচন এ সব বিষয়ে খুব স্পষ্ট। যিনি দীক্ষা গ্রহণের প্রেবণা দেন তিনি 'প্রেবক', যিনি সাধককে সাধনায় উদ্বুদ্ধ করেন তিনি 'সূচক', যিনি সাধনা ও সাধ্য তত্ত্ব বুঝিয়ে দেন তিনি 'বাচক', যিনি সাধনা ও সাধ্য বিষয়ের একত্ব স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন, তিনি 'দর্শক', যিনি সেই সাধ্য ও সাধন তত্ত্বের শিক্ষা দেন তিনি 'শিক্ষক' যিনি হৃদয়গ্রন্থি ভেদ ও জ্ঞানদানে সমর্থ হ'য়ে তত্ত্বজ্ঞান দেন তিনি 'বোধক'। এই ষডবিধ গুরু।]

প্রথম পঞ্চ গুরু কার্য্যস্বরূপ। 'বোধক' গুরু কাবণস্বরূপ। ইহাবা সকলেই পূজনীয়।

["মন্ত্রদাতা গুরু একজন হইলেও শিষ্য তাঁহার নিকট যাহা শিক্ষিতব্য শিক্ষা ও নিজ জীবনে সাধন করিয়া, ধর্ম্মবিষয়িনী অপর শিক্ষাসমূহ অপর গুরুর নিকটে যে সম্পূর্ণ করিতে পারে ইহা বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রের বিধান" (ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ) ।]

দীক্ষাগুরু যদি দূরে থাকেন, তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁরই প্রদত্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্য শিষ্য অন্য গুরুর আশ্রয় নিতে পারেন, দীক্ষাগুরুর অবর্ত্তমানে ও তাঁর ইচ্ছা বা আজ্ঞায় অন্য গুরু গ্রহণ করা যায়। গুরু শিষ্যকে বহু বৎসর পরীক্ষা করতে পারেন, সুতরাং সেই সময়ের মধ্যে যদি তিনি লোকান্তরে যান, শিষ্য তাঁর পূর্ব্ব ইচ্ছা বা আদেশ অনুসারে অন্য গুরু গ্রহণ করতে পারেন। (শ্রীমদ্ স্বামী ব্রহ্মানন্দ রচিত 'গুরু' প্রবন্ধ দ্রঃ)।

["গুরুরেকঃ" (কৌলোপনিষদ—২৩)]।

"শৈবে গুরুত্রয়ং প্রোক্তং বৈষ্ণবে গুরুপঞ্চকম্।
বেদশাস্ত্রেষু শতশো গুরুরেকঃ কুলার্ণবে ॥ ১২৭
প্রেরকঃ সূচকশ্চৈব বাচকোদর্শকস্তথা।
শিক্ষকঃ বোধকশ্চৈব ষড়েতে গুরবঃ স্মৃতা ॥১২৮

পঞ্চৈতে কার্য্যভূতাঃ স্যুঃ কারণং বোধকো ভবেৎ।
পূর্ণাভিষেক কর্ত্তা যো গুরুস্তস্যৈব পাদুকা।
পূজনীয়া মহেশানি বহুত্বেপি ন সংশয়ঃ ॥"
(১২৯, কুলার্ণব ১৩ উঃ)।

["একগুরুপাস্তিরসংশয়ঃ।" (পরশুরাম কল্পসূত্র ১।২০) = এক গুরুরই উপাসনা করবে, তাতে সংশয় হ'তে পারে না।]

"গুরুস্তু দ্বিবিধঃ প্রোক্তো দীক্ষা শিক্ষা প্রভেদতঃ।
আদৌ দীক্ষাগুরুঃ প্রোক্তঃ শেষে শিক্ষাগুরুর্মতঃ॥
যন্মুখাত্তমহামন্ত্র শ্রুবতোঽভস্যতে হ্শিবা।
স গুরু পরমোজ্ঞেয় স্তদাজ্ঞা সিদ্ধিদায়িনী।"
(তন্ত্রতত্ত্বোদ্ধৃত পিচ্ছিলাতন্ত্রবচন)।]

অনভিজ্ঞ গুরু ত্যাগে দোষ নেই। যে গুরু ক্রুর, দাম্ভিক, শঠ, প্রবঞ্চক, লোভী, শিষ্য-বিত্তাপহারক প্রভৃতি বহু দোষযুক্ত সেই গুরু তৎক্ষণাৎ বর্জ্জন করবে, তন্ত্র এ কথা স্পষ্ট বলেছেন। কামাখ্যাতন্ত্র বলেন যে, যখন জ্ঞানই মোক্ষের কারণ, তখন, যে গুরু জ্ঞানদানে অক্ষম, তাঁকে ত্যাগ



করবে। কুপথগামী অর্থাৎ চরিত্রহীন প্রতিপন্ন হবামাত্রই সে গুরুকে ত্যাগ করবে, "উৎপথগামী প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে।" কিন্তু শিষ্যের সংশয়চ্ছেদকারী জ্ঞানী গুরু পেলে অন্য গুরুর আশ্রয় করবে না। সদ্‌গুরু (দীক্ষাগুরু) যে কোন কারণে যদি শিষ্যকে উচ্চসংস্কার দিতে অস্বীকার করেন, সে ক্ষেত্রে শিষ্য গুর্ব্বন্তরগ্রহণ না ক'রে দীক্ষাগুরুর উপদেশমতই সাধন ক'রে যাবেন—এ বিধিও তন্ত্রে দেখা যায়। তন্ত্রের এই সব বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও, গুরুব্যবসায়ীরা কুলার্ণবের একটি বচন উদ্ধৃত ক'রে থাকেন, ঐ তন্ত্র না প'ড়েই, যথা, "মন্ত্রত্যাগাদ্ভবেন্মৃত্যু গুরুত্যাগাদ্দরিদ্রতা। গুরুমন্ত্রোভয়ত্যাগাদ্রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥" গুরুব্যবসায়ীরা ও অজ্ঞেরা জানেন না যে, তন্ত্রমতে উচ্চ সংস্কার গ্রহণ করলে মন্ত্রত্যাগও হয় না, গুরুত্যাগও হয় না।

[অনভিজ্ঞং গুরুং প্রাপ্য সদা সংশয়কারকম্।
গুর্ব্বন্তরন্তু গত্বা স নৈতদ্দোষেণ লিপ্যতে॥ ১৩১। (কুলার্ণব ১৩ উঃ)।
মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথাশিষ্যঃ গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥ ১৩২ ঐ ঐ

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের পূর্ব্বে কুলার্ণব, অভিজ্ঞ বা জ্ঞানী গুরুত্যাগ নিষেধ করেছেন,
"শ্রীগুরুং লক্ষণোপেতং সংশয়চ্ছেদকারকম্।
লব্ধা জ্ঞানপ্রদং দেবি ন গুর্ব্বন্তরমাশ্রয়েৎ"॥ ১৩০। ১৩ উঃ।]

শ্রীরামকৃষ্ণের বহু সাধনায়[1] বহু গুরুগ্রহণ-কথা আজ সকলেই জানেন। যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ নন, তিনি সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন না; সুতরাং অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছে যেতে হয়।

["স্থূল চক্ষুর গোচর না হইলেও ধর্ম্ম জীবন্ত শক্তি। অনুষ্ঠানে উহার ফল প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে এবং অপরকে অনুভব করাইতে পারা যায়। বিশেষ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ আপন শরীর মন হইতে ঐ শক্তি অপরে সঞ্চারিত করিতে পারেন এবং ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোক সম্বন্ধীয় যে সকল অনুভব জীবনে প্রত্যক্ষ করা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল সে সকলও অপরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন।...আবার বহুকালব্যাপি চেষ্টা, ধ্যান ও একাগ্রতার দ্বারা ভাববিশেষ উপলব্ধি করিয়া তাহাকে শব্দবিশেষের সহিত এমন সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করা যাইতে পারে যে, উহার উচ্চারণমাত্রেই ঐ ভাববিশেষ উজ্জ্বলবর্ণে অপরের মনে উদিত হইয়া তাহাকে অপূর্ব্ব অনুভব প্রত্যক্ষ করাইবে, এবং

প্রত্যেক অনুভব, যেমন ফলস্বরূপ আনন্দ বা দুঃখ প্রসব করিয়া মানবজীবন পরিবর্ত্তিত করে, ঐ বিচিত্রানুভবেও তদ্রূপ তাহার মন বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিশেষ আনন্দ বা দুঃখের অধিকারী হইবে। উহারই নাম মন্ত্রশক্তি। মন্ত্রশক্তির উপর বিশ্বাসই মন্ত্রদাতা গুরু উপাসনার মূলে বর্ত্তমান।

মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস বিষয়াসক্ত মনের অনেক সময় অপকারেরও কারণ হইয়া থাকে। এক ব্যক্তির মন অপর ব্যক্তির মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে জানিয়া কামক্রোধান্ধ পুরুষ অনেক সময় নিজ স্বার্থ তৃপ্তির আশায় ঐ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। অথবা দুর্ব্বল নীচচেতা পশুবৃত্তি মানব, আপন পাশবপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য, পবিত্র গুরু নামের অযোগ্য, অপর নীচতর পুরুষের সহায়ে ঐ শক্তি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যে শক্তিরই উপাসনা কর, অতি পবিত্রভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। স্বার্থানুসন্ধানের নামগন্ধ পর্য্যন্তও মন হইতে দূরে রাখিতে হইবে। নতুবা উপাসনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব এবং অনেক সময় বিপরীত ফলেরও উদয় হইয়া উপাসককে অবসন্ন করে। এ কথাটি মনে সর্ব্বদা জাগরুক রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।" (ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ)।]

[উক্ত গ্রন্থকার বলছেন যে তন্ত্রে, মারণ, উচাটনাদির 'বিশেষ ব্যবস্থা', বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময় পাশবপ্রবৃত্তি দুর্ব্বৃত্তের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থেও অভিচার প্রয়োগের কথা আমরা দেখেছি। পৌরহিত্যের চাপে যেমন বৈদিক ধর্ম্মাচারের মধ্যে ঐ রকম নানা দোষ প্রবেশ করে এবং শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ জীবন ও শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে ঐ সব অনাচারে প্রবল আঘাত পড়ে, সেই রকম গুরুগিরির বা গুরুব্যবসায়ীর চাপে, বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতিকালে, তন্ত্রে মারণ, উচাটনাদি "বিশুদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া ধর্ম্মের নামে প্রবৃত্তির পৈশাচিক অভিনয় দেখাইয়া কলঙ্কিত করিয়াছে।" এই সব তন্ত্রের নামে ব্যভিচার বন্ধ করেন শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্য। ইঁহাদের প্রভাবেই বৌদ্ধবিপ্লব রুদ্ধ হয়]

বাঙ্গলায় কুলগুরু প্রথা বেশী প্রচলিত। কুলগুরু প্রথার সুবিধা এই যে, গুরু ও শিষ্য উভয়ে উভয়কে বোঝবার খুব সুবিধা পান ও বংশগত গুরু, শিষ্যবংশের সব রহস্যই সহজে জানতে পারেন. শিষ্যের প্রকৃতিও তাঁর অজ্ঞাত থাকে না এবং বংশধারা ও গুরুপারম্পর্য্য বজায় থাকে। ভারতের অন্য সব স্থানে এ বিষয়ে অত বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই; যেখানে গুরু, শিষ্য শক্তিসঞ্চার করতে সমর্থ, সেখানে দীক্ষা নেন তাঁরা। সন্ন্যাসী গুরুর সুবিধা এই যে, তিনি শিষ্যের মধ্যে যে আদর্শ স্থাপন করতে

সমর্থ হন, সে আদর্শ শিষ্যহৃদয়ে স্থায়ী হয়। অকাম পুরুষের ত্যাগপূত জীবনের আদর্শ, শিষ্যকে অধ্যাত্মরাজ্যে যে পরিমাণে উন্নত করতে পারে, যে পরিমাণে তিনি শক্তিসঞ্চার করতে পারেন, তা গৃহস্থ গুরুর দ্বারা সম্ভব হয় না—গৃহস্থগুরুর সান্নিধ্য পাবার সুযোগ শিষ্যের থাকলেও।

অবতার পুরুষই মানবের নিত্যগুরু, যুগাবতারের 'নামই' মহামন্ত্র। অবতারকুলের জীবন চিরদিন মানবের আদর্শ হয়ে থাকবে। শাস্ত্র বলেন, সিদ্ধপুরুষদত্ত মন্ত্রের শক্তি দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত থাকে ইত্যাদি। সদ্‌গুরু-প্রদর্শিত পথে শিষ্যকে চলতে হয়। তাই তন্ত্রের আদেশ, "অপি তন্ত্র-বিরুদ্ধং বা গুরুণা কথ্যতে যদি। তৎসম্মতং ভবেদ্বেদৈর্মহারুদ্র বচো হি যথা॥" (তন্ত্রতত্ত্বোদ্ধৃত তন্ত্রবচন)। অর্থাৎ তন্ত্রবিরুদ্ধ আজ্ঞা করলেও, গুরুর বাক্য, বেদসম্মত মহারুদ্রবাক্য ব'লে জানবে। গুরুবাক্য মে'নে না চললে, সাধনপথ ভ্রষ্ট হয়ে শিষ্য নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করতে পারেন। লৌকিকবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা (chemistry), শিখতে হলে পদে পদে কেমিষ্ট গুরুর নির্দ্দেশ ও শিক্ষামত চলতে হয়। সাধনপথ ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান কি এতই সহজ যে, তা বোঝবার জন্য গুরুর দরকার নেই? সাধনপথের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করলে সাধকের এমন অবস্থা হয় যখন "সে বড় বিষম ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নেই।" সব জিনিষেরই ব্যতিক্রম আছে। যখন মহাশক্তির লীলা বিশ্বে হ'তে থাকে, তখন অসম্ভব সম্ভব হয়, তখন সেই শক্তিতেই বিশ্বে নতুন প্রাণ আনে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকলের ম'ধ্যে একটা অজানা প্রেরণা আসে, অন্য কারোর অপেক্ষা সে শক্তি রাখে না, কিন্তু সেই শক্তির অনুভূতি হয় কজনের, বিশ্বাসই বা হয় কজনের?

গুরুআজ্ঞা শিরোধার্য্য ক'রে শিষ্যকে চলতে হয়। আজ্ঞাবহতাই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল। ইহা যেন মনে না হয়, শিষ্যের কোন স্বাধীনতা দেওয়া হয় নি। পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক আমরা জানি; ভারতে, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ তার চেয়েও গভীর, তার চেয়েও ভালবাসাময়, তার চেয়েও মধুময়। গুরুর শাসন আছে, দরকার হ'লে, কিন্তু দরকার অদরকারে শিষ্যের আবদারও গুরুকে সহ্য করতে হয়। শিষ্যের চিন্তার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ, গুরু তার মধ্য দিয়েই শিষ্যকে ধীরে ধীরে নিয়ে যান।

আমরা দেখেছি, গুরু শিষ্যকে কিভাবে গ্রহণ করেন। ব্রহ্মবিদ্যার পথ সব সময়ে সকলের কাছে খোলা, গুরু কখন সে পথ আটকে দাঁড়ান না। বরং শিষ্যকে সেই পথে অগ্রসর ক'রে দেবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল। গুরু, মাত্র শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করতে বলেন। যেমন বিলাতে যে কেহ প্রধান মন্ত্রী হ'তে পারেন, কিন্তু প্রার্থীকে ঐ পদের যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হয়, তবে তিনি নির্ব্বাচিত হন। গুরু সর্ব্বক্ষম, কিন্তু তাঁর একটি ক্ষমতা নেই—তিনি শিষ্যের অমঙ্গল করতে পারেন না।

সাধন যেমন 'স্থূল', 'সূক্ষ্ম' ও 'পর' ভেদে তিন রকম, সংস্কারও সেই রকম। স্পর্শদীক্ষা, দৃগ্‌দীক্ষা আদি সূক্ষ্ম দীক্ষা। 'শাম্ভবী' দীক্ষা, অর্থাৎ গুরুর ইচ্ছামাত্রেই শিষ্যের মন পরিবর্ত্তিত হয়ে একেবারে সমাধিতে মগ্ন হওয়ার নাম, 'পর' (পরা) দীক্ষা। এখানে ইহাও বুঝতে হবে যে ঐরূপ সূক্ষ্ম বা পর সংস্কার, সিদ্ধপুরুষ অথবা অবতারকল্প পুরুষেই দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা, উভয়েই শক্তিসম্পন্ন হওয়া চাই। 'সংস্কার' ভিন্ন সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। গান শিখতে হলেও, সাধককে প্রথম কণ্ঠসংস্কার করতে হয়, বাণী শুদ্ধ করতে হয় ইত্যাদি। ওসব বই পড়ে হয় না। 'সংস্কার' গ্রহণে 'অধিকার' লাভ হয়। অধিকার লাভে একটা সুযোগ হয় মাত্র, সিদ্ধিলাভ সাধনসাপেক্ষ, মানসিক শক্তির উন্মেষ সাধনসাপেক্ষ। বিভিন্নভাবে সংস্কার গ্রহণ-প্রথা বৈদিককাল হ'তে চলে আসছে।

বৈদিক যুগে যজ্ঞাদি ক্রিয়া হত। শিষ্যকে যজ্ঞে দীক্ষিত হ'তে হত, স্বাধ্যায় বা মন্ত্রোচ্চারণের কৌশল শিখতে হত—গুরু বলতেন 'সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যং', কারণ, ব্রহ্ম 'সত্যস্য সত্যম'। যখন নানারূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠানের পর শিষ্য বুঝতেন যে, মন সূক্ষ্ম গ্রহণের যোগ্য হ'য়েছে, তখন তিনি বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করতেন—নতুন সংস্কার নিয়ে তিনি হ'তেন 'আরণ্যক'। তখন গুরু বলতেন, "বাহ্য যাগাদি যা করেছ, তা ব্যয়সাপেক্ষ ও তাতে অনেক হাঙ্গাম, তা এখন তোমার দরকার নেই, এখন তা তোমার পক্ষে সম্ভবও নয়, এখন হ'তে তুমি নিজ দেহেই যজ্ঞ ও যজ্ঞাঙ্গ ভাবনা কর। গুরু শিষ্যকে চালিত করতেন, আজ্ঞা করতেন না। শিষ্য

ব্রহ্মবিদ্যা লাভেচ্ছু হয়ে গুরুর কাছে গেলেন, বিনীতভাবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্রহ্ম নিত্যস্বরূপ, কিন্তু তাঁকে জানব কেমন ক'রে?' গুরু :—'কি দেখছ? কে দেখছে?' শিষ্য :—'দেখছি এখানকার সব জিনিষ, আর, চক্ষুই সব দেখছে।' গুরু :—'চক্ষুই ব্রহ্ম—এই চিন্তা কর।' কিছুদিন পরে শিষ্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'চক্ষু অনিত্য, ইহা ব্রহ্ম হবে কিরূপে?' গুরু :—'চক্ষু দিয়ে আমার চক্ষুর মধ্যে কি দেখছ?' শিষ্য :—'প্রতিবিম্ব।' গুরু :—'উহাই ব্রহ্ম।' প্রত্যেক বারেই শিষ্য গভীর চিন্তা করতেন; ক্রমশঃ গুরু বললেন 'অন্নই ব্রহ্ম, অন্নই সকলকে রক্ষা করেন, অন্নের জন্যই ধ্যান-সামর্থ্য হয়'। তারপর এইরূপে শিক্ষা দিলেন, 'প্রাণই ব্রহ্ম' ইত্যাদিক্রমে 'মনই ব্রহ্ম', 'আকাশই ব্রহ্ম' প্রভৃতিরূপ উপদেশ দ্বারা শিষ্যকে নিজের পথ নিজের চেষ্টার দ্বারাই পরিষ্কার করতে হ'ত, ধ্যান ধারণা করতে হত, গুরু শুধু মনের অর্গল খুলে দিতেন। উপনিষদে এরকম উপদেশ-শিক্ষা দেখা যায়। শিষ্য শুনেছেন যে ব্রহ্ম নিত্যস্বরূপ, কিন্তু শিষ্য তা উপলব্ধি করতে চান। গুরু ও বৃথা উপদেশ দিতেন না; শিষ্য শেষে উপলব্ধি করতেন 'সবই ব্রহ্ম'; গুরু সব সময়েই সত্য বলেছেন ও সত্যপথে তাঁকে পরিচালিত করেছেন। শিষ্যের সরলতা ও বিশ্বাস বা 'মনমুখ এক' লক্ষ্য করতে বলি। ঐ রকম ভাবনা, কল্পনাও নয়, রূপকও নয়, কবিকল্পনাও নয়। অনুগীতাতে শ্রীকৃষ্ণ জঠরানলের 'সপ্তশিখা', চক্ষু আদির 'সপ্তসমিধ' প্রভৃতি উপদেশে ঐ ভাবেরই শিক্ষা দিচ্ছেন। তন্ত্রসাধকও গুরুর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি সাধককে প্রশ্নের উত্তরে শুধু একটা কিছু করবার উপদেশ দেন, সে কাযটি সম্পূর্ণ হলে আবার হয়ত নতুন কায দেন। শিষ্যের উত্তর শিষ্য নিজেই আবিষ্কার করে। গুরু-গিরির চেষ্টা কোথাও নেই। শিষ্যকে কৃতি দেখলে, গুরু-শিষ্যের আলোচনা হয়, শিষ্যের সাধারণ প্রশ্নের উত্তর গুরু সব সময়েই দেন ও শিষ্যকে সকল সময়েই অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করেন। গুরুর ব্যবহারে শিষ্য অদ্ভুত প্রেমের পরিচয় পান, যার কাছে সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার ভালবাসাই তুচ্ছ ব'লে সাধক বুঝতে পারেন, সুতরাং শিষ্য স্বেচ্ছায় গুরুতে আত্মসমর্পণ করেন। গুরুকৃপা বিনা মন্ত্রসিদ্ধি হয় না সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে, যে শিষ্য মহাবীর্য্য প্রকাশ ক'রে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য উদ্যম করেন, গুরুর কৃপাও সেখানে সাধককে প্লাবিত করে।

মন্ত্রসিদ্ধ হলে সাধকের মন গুরুময় হয়ে যায়। গুরুরূপে মনই সাধকের হৃদয়ে তখন বাস করেন—সাধক গুরুময় জগৎ দেখেন। প্রতিরোধশক্তি, বাধা অতিক্রম করবার শক্তিই গুরুশক্তি, বহু বাধা অতিক্রম ক'রে, মন্ত্রসিদ্ধ সাধক উপলব্ধি করেন যে, কারুণ্যই গুরুশক্তি, আর কারুণ্যই প্রেম। এই প্রেমের কাছে ত্যাগ, ভোগ, বা অনুষ্ঠান তুচ্ছ ব'লে মনে হয়—প্রেমই একমাত্র ধন, প্রেমদৃষ্টি তাঁর সর্ব্বত্র হয়। ভাবতের সাধক উপলব্ধি চান, সত্যের সাক্ষাৎ পরিচয় চান।

তন্ত্রশাস্ত্র গুরুকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ, মানবৌঘ। শাস্ত্র বলেন ইঁহারা অখণ্ড শিবরূপী, ইঁহারা "সততং নিবসন্তি মদাত্মকাঃ", যাঁরা ব্রহ্মে নিত্য লগ্ন থাকেন তাঁরা 'দিব্যৌঘগুরু'—"দিব্যাঃ মদন্তিকে নিত্যম্"; যাঁরা ব্রহ্মভাবে যুক্ত থেকেও নরলোকে থাকেন, তাঁরা 'সিদ্ধৌঘগুরু'—"ভূমিবিহারিণি চ", যাঁরা নরলোকেই থাকেন, তাঁরা 'মানবৌঘ গুরু'—"তে ভূম্যাবেব নিবসন্তি মদাত্মকাঃ।" সাধনশাস্ত্রের অন্তর্গত 'ককারাদি' মন্ত্র সমূহই 'কাদি'শক্তি বা কাদিমাতা। কাদিশক্তি ঐ গুরুত্রয়ের সাহায্যেই 'কৃতযুগে' (সত্যযুগে) তন্ত্রশাস্ত্রের পূর্ণমাহাত্ম্য প্রচার করেন। ঐ গুরুত্রয় সকলেই মানবরূপী—"দ্বিনেত্রা, দ্বিভুজা।' ইঁহারা জগতের কল্যাণে নিত্যরত।

(তন্ত্ররাজতন্ত্র দ্রঃ)।

["গুরবাখ্যা ভবেচ্ছক্তিঃ সা বিমর্শময়ী মতা।
নবত্বং তস্য দেহস্য রন্ধ্রত্বেন ভবাস্তে।"]

বিমর্শময়ী আদিশক্তিই গুরু, গুরু-শরীরের নবদ্বার 'বিমর্শশক্তিরই' রূপ। ঐ নবদ্বার দ্বারা ভূয়োদর্শনজাত জ্ঞানলাভ, শিষ্যের মহাকল্যাণের কারণ হয়। ঐ নবদ্বারকেই 'নবনাথ' বলা হয়। শিবস্বরূপ ঐ গুরুত্রয়, এই 'নবনাথের' অন্তর্গত। তন্ত্ররাজতন্ত্রে, শ্রীচক্রের (যন্ত্রের) নয়টি চক্র আছে। ঐ শ্রীচক্রের প্রতি অঙ্গে অভেদ ভাবনাসহ সাধনে অগ্রসর হ'তে হয়, তা ঐ তন্ত্রে বলা আছে।

[কালি ও কাদি অভিন্ন, কারণ, দেবী মন্ত্রময়ী। বাঙ্গলা 'ক' ও প্রাচীন দেবনাগরের 'ক' প্রায় একরকম দেখতে। 'ক' বা ঐ ত্রিকোণ=‘রক্তব্রহ্মা', 'শ্বেতবিষ্ণু' ও 'মরকত রুদ্র' এবং ঐ 'অঙ্কুশ'=বিদ্যুন্ময়ী কুণ্ডলিনী, মধ্যের শূন্যস্থান='কোটিচন্দ্র

প্রতীকাশং' সুদর্শন , জ্যেষ্ঠা, বামা ও রৌদ্রী বেথাব ত্রিকোণে আছেন কৈবল্যদায়িনী দেবী কালি। ত্রিকোণই 'যোনিমণ্ডল', দেবী ত্রিপুরাব আসন। 'কং ব্রহ্ম' অর্থাৎ 'ক'-ই সেই শক্তি যা ঐ নবনাথের দ্বাবা কল্পে কল্পে প্রচারিত হয। সাধনশাস্ত্র শেষ হয় নি, এখনও প্রকাশিত হচ্ছে ও পবে হবে—ইহাই তন্ত্রশাস্ত্রেব মত। সাধনশাস্ত্রে হক্ষাবাদি মন্ত্রসমূহেব নাম 'হাদি', , 'কহাদি = যাতে 'ক' ও 'হ' দুইই আছে।]

গুরুকে 'আদি শক্তি' বলা হয়। "শ্রীগুরু জ্ঞানদাতা চ ফলদাতা পবেশ্ববী। উভয়ঃ চিদ্‌ঘনাকাবঃ করুণা সাগবো গুরুঃ॥" (বহস্যষডাম্নায তন্ত্রে, নি স. ২য় প.)। যিনি শিষ্যেব কল্যাণোদ্দেশ্যে নিজ দেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কবেন ও তথায় মহাকাল, মহাকালীব আবির্ভাব হয, শিষ্য তাঁকে মানুষ বুদ্ধিতে দেখতে পাবেন না। খোলো মনোবৃত্তি নিযে, শিষ্য কেবলই গুরুবাদেব সমালোচনা কবতে থাকবেন আব শিষ্যেব কোন লক্ষণ থাকবেনা, ইহা হয না , আর্য্য দৃষ্টিতে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ বিচাব কবতে হয়। সদ্‌গুরুব শিক্ষায শিষ্য-মন বেশী বিচাবপবায়ণ হয়, বেশী সূক্ষ্মভাব ধাবণক্ষম হয়। গুরুভক্ত শ্রীশঙ্কব ও শ্রীবামানুজ আদিব সূক্ষ্মাদি সূক্ষ্ম বিচাবপবায়ণতা দেখলে অবাক্ হ'তে হয়। গুরুব আশ্রয়ে শিষ্যেব বিচাববুদ্ধি লোপ পায় না। সাধন ভজন বিহীন হ'য়েও, একমাত্র গুরুব প্রতি দৃঢ ও অব্যভিচাবী ভক্তি সহায়ে, শিষ্য সিদ্ধকাম হয়েছেন, এ দৃষ্টান্তও বিবল নয়। গুরু যে শুধু অধ্যাত্মবাজ্যেবই গুরু তা নয়, তিনি শিষ্যজীবনেব সর্ব্বক্ষেত্রেবই গুরু। গুরুভক্তি বলে শিবাজী হযেছিলেন অজেয়, গুরুভক্তি বলে শিখসম্প্রদায়েব ছিল অতুল প্রতাপ। সর্ব্বক্ষেত্রেই ছিল শিষ্য-চবিত্র ত্যাগ মহিমায় মণ্ডিত। দৃঢভক্তি পবায়ণ বৈবাগ্যময় জীবনেই গুরুতত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

সাক্ষাৎ ভাবে দীক্ষাগ্রহণ না ক'বেও একমাত্র উপদেশে, শ্রদ্ধাবান শিষ্য পূর্ণকাম হয়েছেন দেখা যায়। তবে ইহাব দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিবল। কথিত আছে, প্রহ্লাদ যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁব মা নাবদেব কাছে তত্ত্বোপদেশ পান ও গর্ভস্থ শিশুব ঐ হ'তে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। গর্ভস্থ শিশুব ঐ বকমে উপদেশ প্রাপ্তিব কথা ছেড়ে দিলেও, প্রহ্লাদ যে তাঁব মাব কাছে উপদেশ পেয়েছিলেন ইহা নিশ্চিৎ। একলব্য অধ্যাত্ম বিদ্যাব প্রয়াসী ছিলেন না, অস্ত্রবিদ্যায় পাবদর্শী হওয়াই তাঁব উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মনে মনে দ্রোণাচার্য্যকে গুরু স্বীকাব ক'বে তাঁব নিকট উপস্থিত হন। হীনবর্ণসম্ভূত ব'লে ব্রাহ্মণ

দ্রোণাচার্য্য তাঁকে তাড়িয়ে দেন, তাতে অণুমাত্র বিরক্ত বা পশ্চাদ্‌পদ্‌ না হয়ে, একলব্য নির্জ্জনে দ্রোণাচার্য্যের প্রতিমা সম্মুখে রেখে ধনুর্বিদ্যা সাধন আরম্ভ করেন। বহুকাল পরে দ্রোণাচার্য্য ও অর্জ্জুন ঘটনাক্রমে সেখানে আসেন ও একলব্যের অদ্ভুত ধনুর্বিদ্যাজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে উভয়ে অতিমাত্রায় বিস্মিত হন। একমাত্র শ্রদ্ধাই প্রহ্লাদ ও একলব্যকে মহান্‌ করেছিল।

[হীনবর্ণজাত একলব্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষা'কে দ্রোণ বর্দ্ধিত হ'তে দেন নি, তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকারস্বরূপ একলব্যের বুড়ো আঙ্গুল—অর্জ্জুনের নিষেধ সত্ত্বেও—দক্ষিণাস্বরূপ প্রার্থনা করেন। প্রসন্নচিত্তে একলব্য তা প্রতিপালন করেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য যে অর্জ্জুনের জন্য দ্রোণাচার্য্য এই কার করেন, সেই অর্জ্জুনের হাতেই দ্রোণাচার্য্যের পতন হয় ও শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সেই অর্জ্জুনের শরেই দ্রোণাচার্য্যের ভবলীলা শেষ হয়।]

গুরুনির্ব্বাচনস্থলে তন্ত্র বলেন যে, জ্ঞানবতী ও ভক্তিমতী জননীর কাছে দীক্ষিত হ'লে সন্তানের মন্ত্রশক্তি শীঘ্র জেগে ওঠে। প্রহ্লাদ মার কাছে উপদেশ পেয়েছিলেন। ভাব শুদ্ধ হলে সবই সম্ভব হয়। "ভাবস্ত মনসো ধর্ম্মঃ স হি শাব্দঃ কথং ভবেৎ।" ভাব, মনের ধর্ম্ম, বাক্যে তার প্রকাশ হয় কখন? তন্ত্র বলেন, ভাবরূপী চিদানন্দময়ী, কারণ ও কার্য্য, উভয়ই; ভাবই সাধকের সিদ্ধিদাতা, ভাবই রসরূপী আত্মা (কৌলাবলী ১১শ উঃ দ্রঃ)। অবশ্য "ভাবের ঘরে চুরি না থাকে" অর্থাৎ মনমুখ এক হয়। হস্তামালক নামে একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁর অদ্ভুত আচরণে সকলে তাঁকে পাগল মনে করত, ছেলের দল তাঁর অঙ্গে ধূলামাটি দিত, প্রহার পর্য্যন্ত করত, তাঁর পিতামাতা তাঁকে একটা নিরেট বোকা মনে করতেন, কিন্তু হস্তামালক নির্ব্বিকার চিত্তে সবই সহ্য করতেন। জন্মাবধি ছিল তাঁর সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত ভাব। তাঁর কোন প্রকার দীক্ষা হয় নি। শ্রীশঙ্কর তাঁকে অযত্নে প'ড়ে থাকতে দেখে যখন পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, হস্তামালকের উত্তরে পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হন। হ'তে পারে ইহা জন্মান্তরীন সংস্কার, কিন্তু মানবের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, তা যে কখন,ও কিসে প্রকাশ পায়, তার কোন বাঁধা ধরা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবে ইহাও সত্য যে, শ্রীমদ্‌শঙ্করই হস্তামালককে

আবিষ্কার করেন, তাঁর সান্নিধ্যেই হস্তামলকের পূর্ব্ব চেতনার বিকাশ হয়! শ্রীশঙ্করই তাঁর সুপ্ত জ্ঞানের উত্তেজক কারণ। ইতিপূর্ব্বে তাঁর জন্মান্তরীন শিক্ষার কোন লক্ষণই ধরা পড়েনি কারোর কাছে।

মানুষের গুরু মানুষই হয়। নিরাকার উপদেশ দেয় না, কথা কয় না, গুরু হয় না। বহুধা বিচ্ছিন্ন, বহুত্বে পূর্ণ প্রকৃতিও, মানুষের একত্ব-বোধক গুরু বা জ্ঞানদাতা হয় না—যতক্ষণ মানুষ প্রকৃতির কার্য্যের মধ্যে একাগ্রবৃত্তির সন্ধান না পায়। প্রকৃতির বৈচিত্র্য, বৈচিত্র্যরূপে একত্বের সন্ধান দেয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত অবধূতের চব্বিশ গুরুর উদাহরণ ইহাই শিক্ষা দেয় যে, শ্রদ্ধাবনত শিষ্য সর্ব্বস্থানেই ধ্যানের বা তৈল-ধারাবৎ একাগ্রচিত্তের আদর্শ দেখতে পান ও সেইভাবে নিজ জীবনকে গঠন করবার একটা প্রেরণা পান। সাধকের হৃদয় সত্য পাবার জন্য ব্যাকুল হলে, গুরু তাঁর কাছে স্বয়ং আসেন, শিষ্যের সদ্‌গুরুর অভাব হয় না—এমনই গুরুকৃপা।

তান্ত্রিক সাধক প্রাতঃকৃত্যের সময় 'কুলগুরুর' নাম স্মরণ ক'রে ধ্যান করেন। এই 'কুলগুরু', বংশপরম্পরার কুলগুরু নয়। ইহারা "সর্ব্বে কুলতন্ত্রার্থ-বাদিনঃ" ও দেবী কুণ্ডলিনীর দিব্য জ্যোতিতে তাঁদের শরীর প্রভান্বিত এবং ইহারাই 'কুলধর্ম্মের' বিশিষ্ট আদি প্রচারক। ইহাদের পরিচয় এই মাত্র পাওয়া যায় যে ইহারা "কুলশিষ্যৈঃ পরিবৃতাঃ পূর্ণান্তঃকরণোদ্যতাঃ। বরাভয়করাঃ সর্ব্বে কুলতন্ত্রার্থবাদিনঃ ॥"

পূজার সময় (যেমন দক্ষিণ কালিকা পূজা কালে), সাধক গুরুপঙ্‌ক্তির পূজা ও তর্পণ করেন। এই গুরুপঙ্‌ক্তির মধ্যে প্রথম গুরুত্রয় (দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ, মানবৌঘ) ও পরে সাধকের নিজ গুরুপঙ্‌ক্তির পূজা ও তর্পণ করতে হয়। নিজ গুরু পঙ্‌ক্তি মানে স্বগুরু, তস্য গুরু='পরমগুরু,' তস্যগুরু= 'পরাপর গুরু', পুনঃ তস্যগুরু= 'পরমেষ্টি গুরু'। সর্ব্বত্র 'শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ' বলতে হয়। 'পাদুকা' বলতে সাধারণতঃ বোঝায় খড়ম বা চরণের আধার, কিন্তু এখানে শ্রীপাদুকা অর্থে 'গুরু'ই বুঝতে হবে। 'পাদুকা' সম্মানার্থে ব্যবহৃত। ইহারা গুরু পঙ্‌ক্তির অন্তর্গত। এইভাবে গুরু পঙ্‌ক্তির পূজা মানে সম্প্রদায়ের পূজা। সাধক কোন না কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকই সম্প্রদায়ের আদিগুরু। চৈতন্যদেব পুরী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, মাধবেন্দ্রপুরী তাঁর সন্ন্যাস গুরু। কিন্তু মহাপ্রভুর

নিজস্ব ভাব-বৈশিষ্ট্য ছিল। সে জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে 'চৈতন্য সম্প্রদায়' নামে অভিহিত করা হয়—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি গুরু। সেই রকম শ্রীশঙ্কর সম্বন্ধেও বলা যায়। এই সম্প্রদায়-উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শন সাধারণ পূজার অন্তর্গত। "সম্প্রদায় বিশ্বাসাভ্যাং সর্ব্বসিদ্ধিঃ"। (পরশুরাম কল্পসূত্র ১।৯)। গুরু পরম্পরায় যে সাধনাচার চ'লে এসেছে ও যা অনুসরণ ক'রে কত সাধক সিদ্ধ হয়েছেন সেই সাধনাচার অনুসরণ করাই সম্প্রদায়, সম্প্রদায়ে বিশ্বাস রাখলে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়।

যাঁরা উচ্চাঙ্গ সাধনার অধিকার পান, তাঁরা গুরুপরম্পরা (গুরু, পরমগুরু, পরমেষ্ঠি গুরু) অন্যভাবে গ্রহণ করেন। ভাব হিসাবে সাধকেরা বিভিন্ন ভাবে গুরুপঙ্‌ক্তির বর্ণনা করেছেন। মুণ্ডমালাতন্ত্র বলছেন, গুরু ইষ্টদেবের পিতামহ, এইভাবে ভাবিত সাধক দীক্ষাগুরুকে পরমগুরু বা পরাপর গুরু বলেছেন, পূর্ব্বে, পিচ্ছিলাতন্ত্রবচনে দেখেছি যে, যিনি মহামন্ত্র দেন বা দীক্ষাগুরু তিনিই পরমগুরু (এখানে পরম=শ্রেষ্ঠ)। যোগিনীতন্ত্র বলেন, মহাকালই সকলের গুরু, মন্ত্রদাতা গুরুতে মহাকাল অধিষ্ঠিত হন ব'লেই সেই মানবগুরুই গুরু। যামল বলেন, শিবই গুরু, দেবী ও গুরু, মন্ত্র ও গুরু, তাই গুরুইষ্টে ভেদবুদ্ধি করবে না, কখন সহস্রারে গুরুধ্যান করবে, কখন বা হৃদয়ে করবে, কখন বা গুরুর নরদেহ ধ্যান করবে। চণকাকার-ব্রহ্ম অবরোহে আদ্যাশক্তি ও মহাকালরূপে আবির্ভূত হন, আরোহে তাঁরাই শেষে ব্রহ্মরন্ধ্রে চণকাকৃতি। আজ্ঞাচক্র হ'তেই গুরুচিন্তার স্থান আরম্ভ, তাই বীর ও দিব্যভাবাশ্রয়ী জানবেন যে মন্ত্রদাতাই দীক্ষাগুরু, মন্ত্রই পরমগুরু ইত্যাদি।

মুণ্ডমালায় :—"গুরোর্জাতশ্চ মন্ত্রশ্চ মন্ত্রাজ্জাতা তু দেবতা। অতএব বরারোহে। দেবতায়াঃ পিতামহঃ।। (তন্ত্রতত্ত্বোদ্ধৃত)। যোগিনীতন্ত্র :—"আদিনাথো মহাদেবি! মহাকালো হি যঃ স্মৃতঃ। গুরুঃ স এব দেবেশি। সর্ব্ব মন্ত্রেষু না পরঃ।...মন্ত্রবক্তা স এব স্যাৎপরঃ পরমেশ্বরী। মন্ত্র প্রদানকালে হি মানুষে নগনন্দিনি। অধিষ্ঠানং ভবেত্তস্য মহাকালস্য শঙ্করী। অতাস্ত গুরুতা দেবি। মানুষে নাত্র সংশয়ঃ॥" যামল— "গুরুরেকঃ শিবঃ প্রোক্তঃ সোঽহং দেবি। ন সংশয়ঃ।। গুরুস্ত্বমপি দেবেশি। মন্ত্রোঽপি গুরুরুচ্যতে॥ অতো মন্ত্রে গুরৌ দেবে ন হি ভেদঃ প্রজায়তে। কদাচিৎ স সহস্রারে পদ্মে ধ্যেয়ো গুরুঃ সদা॥ কদাচিদ্ধৃদয়াম্ভোজে কদাচিদ্দৃষ্টিগোচরে"। রহস্যবরাম্নয়

তন্ত্রে নিগমসন্দর্ভে ২য় পটলে :—"দীক্ষাগুরুর্মন্ত্রদাতা মন্ত্রশ্চ পরমগুরুঃ। পরাপর গুরুর্বিদ্যা কুলকুণ্ডলিনী পরা।" ১৬]

সম্প্রদায়গুরু অথবা সংঘগুরু ও সাধকের স্বগুরু—এই দু'য়ে পার্থক্য আমাদের জানা দরকার। সম্প্রদায়গুরুর ধারা বজায় রাখেন পরবর্ত্তী অন্য সব গুরু। শিবই গুরু, কিন্তু জগতের সঙ্গেই গুরুর সম্বন্ধ; তাই, শিষ্যের জন্য মহাকালরূপে তাঁকে আসতে হয় মানব দেহে। বহু তন্ত্রে, উচ্চাঙ্গ সাধনায় গুরুর স্থান স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। ষটচক্রনিরূপণে,

["তেজোরূপা প্রিয়া তস্য ব্রহ্মবর্ত্ম সুদুর্লভা। পরমংব্রহ্ম যৎ পাদপঙ্কজদ্যুতি—বৈভবম॥ শিবঃপদ্মে মহাদেব স্তথৈব পরমোগুরু। তৎসমো নাস্তি দেবেশি পূজ্যোহি ভুবনত্রয়ে॥ তদ্রূপং চিন্তয়েদ্দেবী বাহে গুরুচতুষ্টয়ম্। হংসপীঠে মন্ত্রময়ে স্বগুরং শিবরূপিণম॥"]।

'তদ্রূপং'=তাঁরই বিভিন্নরূপ, ('তদংশং' পাঠ ও দৃষ্ট হয়)। সাধক ইচ্ছানুসারে যে কোনভাবে চিন্তা করতে পারেন। তারপর 'গুরুচতুষ্টয়ের' কথা শিবমুখে ব্যক্ত,

"মন্ত্রদাতা গুরুঃ প্রোক্তা মন্ত্রার্ণাঃ পরমোগুরুঃ।
পরাপর গুরুস্ত্বং হি পরমেষ্ঠি গুরুস্ত্বহম্॥'

অর্থাৎ, গুরু=দীক্ষাদাতা বা মন্ত্রদাতা।
পরমগুরু=মন্ত্রবর্ণাবলী।
পরাপরগুরু=দেবী (ত্বং)।
পরমেষ্টিগুরু=শিব (অহং)।

[তারা উপাসকের গুরুত্রয়,
"আদৌ সর্ব্বত্র দেবেশি মন্ত্রদঃ পরমোগুরুঃ।
পরাপর গুরুস্ত্বংহি পরমেষ্টিরহং গুরু।
(বৃহন্নীলতন্ত্র-২য় পটল)]

উচ্চাঙ্গ সাধনায়, এইরূপে গুরুত্রয় ও কুলগুরুগণ সবই সহস্রারে চিন্তনীয়। গুরুতত্ত্ব যেখান হ'তে উদয় হয়, অন্যান্য ভাবের মূল যে যে স্থান, বীর ও দিব্য সেই সেই স্থানের স্বরূপ চিন্তা করেন—সেখানে সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত ভাব নেই। গুরুত্রয় ও অন্যান্য গুরুগণ সম্বন্ধে এখানে এই পর্য্যন্ত বললেই যথেষ্ট হবে যে, তাঁরা সবাই শ্রীগুরুর নিত্য পার্ষদ বা 'রশ্মিবৃন্দ'—'অঙ্গদ্যুতি'! তাই তন্ত্রে 'গুরুরেকঃ'। গুরু-চিন্তাপর সাধক গুরুস্থানে ভাব চাপাবেন না অর্থাৎ অন্য চিন্তা করবেন না।

["শিরসা ন বহেদ্‌ভারং গুরুপাদাম্বু ধারিণা। তদাজ্ঞয়া তু কর্ত্তব্যমাজ্ঞারূপো গুরু স্মৃতঃ॥ (কুলার্ণব ১২ উ।৬০)। অন্যরকম পাঠও আছে "শিরসা ন বহেদ্‌ভারং পাদুকাভাবনাপরঃ। নাভিমানং গুরোঃ কার্য্যে লজ্জাং কুর্য্যাং কদাচ ন।]"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে গুরুর স্থান ইষ্টের বামে। শ্রীজীব গোস্বামীপাদ তাঁর ভক্তিসন্দর্ভে বলেছেন, "তস্য পীঠ পূজায়াং ভগবদ্ বামে শ্রীগুরু পাদুকাঃ পূজনং সঙ্গচ্ছতে। যথা য এব ভগবানত্র ব্যষ্টিরূপতয়া তদ্ভাবতাবত্বেন শ্রীগুরু রূপো বর্ত্ততে স এব তত্র সমষ্টিরূপতয়া স্ববাম প্রদেশে সাক্ষাদবতার-ত্বেনাপি তদ্রূপোবর্ত্ততে।' গৌতমীয় (বৈষ্ণব) তন্ত্রের প্রাণায়াম বিধির সঙ্গে হরিভক্তিবিলাসোক্ত প্রাণায়াম বিধির পার্থক্য আছে। হরিভক্তিবিলাসমতে পীঠন্যাসে নিজদেহকেই পীঠকল্পনা করতে হয়; ঐ গ্রন্থ মতে, দেবতার সহিত অভেদকল্পনা শুদ্ধা ভক্তির বিরোধী, সুতরাং তাহা ত্যজ্য। সেই কারণে ভূত-শুদ্ধির সময়, সাধক আপন দেহকে পার্ষদদেহ, (যেমন মধুরভাবে নিজেকে গোপী ভাবা)—"ভগবৎ সেবৌপায়িক" ভাবতে হয়।

[হরিভক্তিবিলাসে, "ভূতশুদ্ধিনিজাভিলষিত ভগবৎ-সেবৌপায়িক-তৎ-পার্ষদ দেহ-ভাবনা পর্য্যন্তৈব তৎ সেবৈক-পুরুষার্থিভিঃ কার্য্য নিজানুকূল্যাৎ। এবং যত্র যত্রাত্মনো নিজাভীষ্টদেবতারূপত্বেন চিন্তনং বিধীয়তে তত্র তত্রৈব পার্ষদত্বে গ্রহণ ভাব্যম। অহংগ্রহোপাসনায়াঃ শুদ্ধভক্তিদ্বিষ্টত্বাৎ।"]।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতেও দুই কারণে গুরু ত্যজ্য হন, (১) "বৈষ্ণব বিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব," (২) "উৎপথ প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—জীবগোস্বামীপাদ)। গৌড়ীয় মতে, গুরু চার প্রকার, (১) শ্রবণ গুরু, (২) বর্ত্মোদ্দেশক গুরু, (৩) দীক্ষাগুরু, (৪) শিক্ষা গুরু। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী মতে, অবৈষ্ণব গুরু সর্ব্বসময়ে ত্যজ্য। তন্ত্রে কৌলসংস্কার গ্রহণেচ্ছু সাধক, অকৌলের নিকট কৌলসংস্কার গ্রহণ করবেন না, কারণ, যিনি নিজে কৌলসংস্কার গ্রহণ করেন নি ও কৌলমতে সাধনা জানেন না, তিনি কিরূপে অপরকে কৌলসংস্কার দেবেন? অকৌলগুরু যদি সদ্‌গুরু হন, শিষ্য যদি কৌলসংস্কার গ্রহণাভিলাষী হন, শিষ্য গুরুর অনুমতি নিয়ে কৌলগুরুর নিকট সংস্কার গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু দীক্ষাগুরুপ্রাপ্ত ইষ্টমন্ত্র ত্যাগ করবেন না বা দীক্ষাগুরুকে অশ্রদ্ধা করবেন না।

[অহংগ্রহোপাসনা—অভেদ ভাবা (যেমন, পূজাকালে শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের মাথায় ফুল দিয়া পূজা।]



শ্রীপাদুকা

তত্ত্ব বোঝবার জন্য আমরা শাস্ত্র ও শাস্ত্রার্থ আলোচনাই করতে পারি, কিন্তু ইহা ঠিক্ যে উপলব্ধি ভিন্ন তত্ত্বপ্রকাশ পায় না। বড় বড় কথায় কিছুই হয় না। ধোলো দর্শনের সঙ্গে আর্য্যদর্শনের এইখানে প্রভেদ। এই কারণে আর্য্যপ্রভা মানবজীবনের উপর আপন প্রভা বিকীরণ ক'রে, মানবকে তার জীবনগতি নিয়ন্ত্রিত করতে চিরকাল সহায় হয়েছে ও বারবার মানবের মহা কল্যাণের নিদান হয়েছে।

পরাসম্বিৎই শ্রীগুরু। ভাবোপনিষৎ (সূত্র ২৬) বলেন যে, দেব কামেশ্বরই 'নিরুপাধিক সম্বিৎ', আর দেবী কামেশ্বরীই তাঁর শক্তি। সাধকের আত্মাই দেবী কামেশ্বরী (ঐ)। সমবন্ধ কামেশ্বর ও কামেশ্বরী, জীবের জীবাত্মা ও সর্ব্বাতীত পরমাত্মা। এই ত্রিপুরসুন্দরীই গুরুশক্তির একটি নাম।

["অথ ত্রিপুরসুন্দরীস্বরূপয়া রক্তবর্ণয়া গুরুশক্ত্যাযুক্তং পরব্রহ্মশিবস্বরূপং গুরুং ধ্যায়েৎ। অভিষিক্তশ্চেৎ সহস্রারাবস্থিত-চন্দ্রমণ্ডলে কুলগুরূনপি স্মরেৎ।" তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজা-পদ্ধতি—৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার সঙ্কলিত, ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত]।

পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের যেমন নাম গোত্র বদলে যায়, যেমন পূর্ণাভিষিঞ্চন রহস্য *'সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা'*, সেই রকম, সাধক ও, পূর্ণাভিষেক প্রাপ্তিমাত্রই দিব্যভাবের অধিকারী হন ও পাদুকার সঙ্গে ব্রহ্মদীক্ষায় দীক্ষিত হন; সুতরাং পাদুকাতত্ত্বও 'সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা' বলা হয়। কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলে, "পাদুকাতত্ত্ব সাধনে গুরু সত্যং প্রকাশিতং।" পাদুকাতত্ত্বই শ্রীগুরুতত্ত্ব; ব্রহ্মদীক্ষাই শ্রীগুরুতত্ত্বের পূর্ণতা। তন্ত্রে ব্রহ্মদীক্ষাকে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষা' বলা হয়েছে। এই "কৌলাচারে ক্রমদীক্ষা মহাসাম্রাজ্য মিলিতা'।

["জাগ্রৎ কুণ্ডলিনী ব্যগ্রা পথপ্রজ্ঞা যদা ভবেৎ। সুবিস্তারং সহস্রারং গুরুপদ প্রদর্শিতং॥ ১৪১। পাদুকাতত্ত্ব সাধনে গুরুসত্যং প্রকাশিতং। নাথসাথী দয়াময়ী চিন্ময়ী প্রেমফলদা॥ ১৪২ (রঃ ষডাম্নায়তন্ত্রে নিগমসন্দর্ভে ৪র্থ পটলঃ)। "প্রেমভাব মহালাভ দ্বাদশেন প্রবেশনং। ব্রহ্মদীক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা অবিবেক-প্রবর্ত্তনা॥ ১৪০। ক্রমদীক্ষা মহাশিক্ষা সাধক পূর্ণ সেচনং।...(ঐ ঐ ১ম পটল—১৪১)। "কৌলাচারে ক্রমদীক্ষা

মহাসাম্রাজ্য মিলিতা। ব্রহ্মজ্ঞানং পূর্ণধ্যানং সর্ব্বজ্ঞে প্রাজ্ঞে দর্শিতং ॥ ২৬ (ঐ ঐ ৪র্থ পটলঃ)]।

সহস্রদলে 'পরমশিবের' স্থান ; কুণ্ডলিনী ইঁহাতেই মিলিতা হন। পরম-শিবই অজ্ঞানতিমিরের সূর্য্যস্বরূপ ; এইখানেই সুধাসাগর, মণিদ্বীপ, মণিপীঠ ও অকথাদি ত্রিকোণ এবং তার মধ্যে নাদবিন্দু। নাদবিন্দুর উপরে 'হংসপীঠ' ও সেইখানেই 'শ্রীগুরুপাদুকা' বা সকলেরই গুরুচিন্তার স্থান। এই হংস, জীবাত্মার হংস নন, ইনি 'পরমহংস' নামে আখ্যাত। এই 'পরম হংস'-শরীর জ্ঞানময়, পক্ষদ্বয়—আগম নিগম, চরণদ্বয়—শিব-শক্তিময়, চঞ্চুপুট—ওঁকার, নেত্র ও কণ্ঠ—কামকলাস্বরূপ। এই সহস্রদলকমলে আছেন বিদ্যুন্ময়ী, ওজোময়ী রক্তবর্ণা নির্ম্মলা 'অমাকলা' (চন্দ্রের ষোড়শী কলা)। এই অমাকলাই চন্দ্রক্ষরিত অমৃতধারার আধার। এইখানেই আছেন, অমাকলার ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রচণ্ড তেজোময় 'নির্ব্বাণকলা' ও তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিকা দীপ্তিমতী 'নির্ব্বাণশক্তি' বা সকলেরই ইষ্টদেবতা। ইহার পর শিবের সপ্তম মুখ অব্যক্ত, গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ এই পর্য্যন্ত। সপ্তম মুখ বা অব্যক্তের পূর্ব্বে—নির্ব্বাণশক্তির উর্দ্ধে আছেন বিন্দু ও বিসর্গশক্তি।

সুষুম্নাই সূক্ষ্মপথ। শক্তি উর্দ্ধগতি হলে 'সুপ্রেম ফলং', নিম্নগতিতে আসে জড়ত্ব। দ্বিদলে বা 'আজ্ঞায়' গুণত্রয়ের শান্ত অবস্থা ; উহা সূক্ষ্ম হৃদয়স্থান। তন্ত্র বলেন উহাই 'নিশানাথ', ; চিচ্চন্দ্র হৃদযাকাশে, তাঁর প্রকাশ বদনে, মহাকাল কোটিচন্দ্র সমপ্রভ ও ইনিই বৈষ্ণবের কৃষ্ণচন্দ্র। তন্ত্র বলেন, "সঙ্কেতজ্ঞস্তন্ত্রবেত্তা ন বেত্তা ধাতুবাদিনঃ।'

["ত্রিধারা ত্রিবেণী ধারা স্থূল সূক্ষ্ম পথিগতিঃ। সূক্ষ্মপন্থা মহারথঃ সুষুম্নামার্গ-সংস্থিতঃ ॥৩৫১। যদি শক্তি উর্দ্ধগতিঃ তদা সুপ্রেমফলম্। অধোবর্ত্ম কামমত্তং সৃষ্টি-স্থিতি লয়াত্মকং ॥৩৫২। এবম্ভূতো নিশানাথো দ্বিদল পদ্ম উজ্জ্বলঃ। চিচ্চন্দ্রো হৃদয়াকাশে প্রকাশ মুখমণ্ডলঃ ॥৩৫৩। অকলঙ্ক চন্দ্রমুখঃ কলঙ্ক শূন্য মণ্ডলে। পূর্ণচন্দ্রঃ শতশতং হস্ত-পদনখান্তরে ॥৩৫৪। মহাকালঃ কৃষ্ণচন্দ্রঃ কোটিচন্দ্র সমপ্রভঃ। সূর্য্য প্রকাশকশ্চন্দ্রঃ কমলং কমলালয়ে ॥ ৩৫৬।...সবিতুর্বরণীয়ঞ্চ চিৎসূর্য্যো হৃদয়ে স্থিতঃ। নাভিমূলে কুলাকুলে ত্রিপুরে তেজ বিস্তৃতঃ ॥ ৩৫৮। চিচ্ছক্তিঃ কালিকা সূর্য্য পদ্মানি হুং শবাসনা।......"
৩৫৯। বড়াম্নায়ে ঐ ঐ ৩য় পটলঃ]

পূর্ব্বে শশিকলা, নির্ব্বাণকলা, নির্ব্বাণশক্তি, সকলেব উপাস্য স্থান, শব্দব্রহ্মময় সুধাপূর্ণস্থান প্রভৃতিব কথা বলা হয়েছে। সেইগুলি একবাব স্মবণ কবতে বলি। ব্রহ্মবন্ধ্রোপবি 'মহাশূন্যে' নানাবর্ণোজ্জ্বল বিভূষিত সহস্রাব। সহস্রদল কমলেব চারিদিকে ৫০দল ২০ স্তব যুক্ত, প্রতি স্তবে ৫০ দলে ৫০ মাতৃকাবর্ণ। ঐ সহস্রদলকমলেব কর্ণিকায় 'হ', 'ল', 'ক্ষ'—এই তিন বর্ণযুক্ত ত্রিকোণচন্দ্রমণ্ডল বা শক্তিমণ্ডল, তাব মধ্যে তেজোময় বিসর্গাকার মণ্ডল, তদূর্দ্ধে বিদ্যুন্ময় বিশুদ্ধ স্ফটিকাভ বিন্দু (পবমশিব)। এই বিন্দু হ'তেই সদা সুধাধারা গলিত হচ্ছে, ইহাবই মধ্যে সর্ব্ব সুধাব আধাব 'অমাকলা' বা 'আনন্দভৈববী'। ত্রিপুবসুন্দবী (ললিতা) বক্তবর্ণা, আনন্দভৈববীও বক্তবর্ণা —বিমর্শশক্তিই বক্তবর্ণা (বজোগুণ); কিন্তু সুন্দবীবিষযে বক্তবর্ণা মানে 'তপ্তকাঞ্চনাভাসা।' তন্ত্রে সাত্ত্বিক, বাজসিক ও তামসিক ধ্যান আছে। আনন্দভৈবব বা আনন্দভৈববী সর্ব্বসময়েই বক্তবর্ণারূপে ধ্যেয় হন না। ঐ অমাকলাব মধ্যে সশক্তিক 'নির্ব্বাণকামকলা'ই সকলেব ইষ্ট। "নিবাকাবং পবং জ্যোতির্ব্বিন্দুঞ্চাব্যয় সংজ্ঞকম্। বিন্দুশব্দেন শূন্যংস্যাৎ তথা চ গুণ সূচকম॥" "বিন্দুরূপং পবং ব্রহ্ম সহস্রদল সংস্থিতম্।' পূর্ব্বে উক্ত হয়েছে যে 'খ' রূপী সর্ব্বাত্মা পবমশিব হ'তেই সুধাধাব ক্ষবিত হচ্ছে ও তাঁব সুধাময় বাক্যে আত্মজ্ঞানাস্ফুবিত হচ্ছে।

[টীকাকাব এখানে স্পষ্ট বলেছেন, যে পরমশিবই গুরু। ("পূর্ব্বশ্লোকোক্ত পরম-শিবস্যৈব গুরুত্বাৎ, অতএব ললিতারহস্যে .....'খ্যাত্যোহয়ং পুরুষ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বদাত্মরতি প্রিয়'')। আজ্ঞাচক্রের সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে শাস্ত্র বলছেন, যে, শঙ্খিনী নাডীর উর্দ্ধে শূন্যরূপ ও মূলাধারস্থ ধরামণ্ডলের মধ্যে অর্থাৎ মূলাধারাৎ সহস্রার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত জ্যোতি সাধকের দর্শন হয়। এই "আজ্ঞাচক্রে সহস্রারবৎ পবমশিবস্থিতি-মাহ ইহস্থানে ইতি' অর্থাৎ ''ভগবান পরমশিবঃ ইহস্থানে সাক্ষাৎ ভবতি স্বয়ং বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ।'' এইখানে গুরুদর্শনলাভ ঘটে ও তাঁর 'আজ্ঞামাত্র' সঞ্চরিত হয় এবং ঐ আজ্ঞাবলে সাধক চণকাকারে বা পরাসম্বিতে মিলিত হন। আজ্ঞাচক্রে "শম্ভুবীজং হি তন্মধ্যে সাকাবং হংসরূপকম্। .. এবং হংসো মণিদ্বীপে তস্য ক্রোড়ে পরঃ শিবঃ। বামভাগে সিদ্ধকালী সদানন্দরূপিণী। ...তস্য ক্রোডে হংসঃ ইত্যস্য বিন্দুদ্বয়রূপ বিসর্গ মধ্যে। বিন্দুদ্বয়স্তু তন্মধ্যে বিসর্গরূপমব্যয়ম। তন্মধ্যে শূন্যদেশে তু শিবঃ পরম সংজ্ঞকঃ"।]

অর্থাৎ শম্ভুবীজের মধ্যে সাকার হংসরূপ; এই হংসের স্থিতি মণিদ্বীপে, তার ক্রোড়ে পরশিব ও বামে সিদ্ধকালী। বিন্দুদ্বয়রূপ বিসর্গমধ্যে শূন্যদেশে পরমশিবস্থিতি। এই বিন্দু 'মকারাত্মরূপ' পরবিন্দু। আজ্ঞাচক্রে গুণত্রয় বীজরূপে আছে, সুতরাং সহস্রারস্থ চণকাকাররূপী পরমশিব এই স্থানে সৃষ্টি-বীজরূপে বর্ত্তমান (অবরোহে)। সহস্রারের ন্যায় এখানেও, অতএব, অর্ক, ইন্দু ও বহ্নিমণ্ডল আছে ('অর্কাদিমণ্ডলে ভগবত্যেবস্থানং প্রসিদ্ধং')। সহস্রারেও ঐ গুলি আছে ব'লেই, শ্রীগুরুর পীঠপূজায় "অর্কেন্দ্বগ্নিমণ্ডলোপরি পরমাত্মজ্ঞানাত্মনোঃ পূজা বিধীয়তে পরমাত্মা পরমশিবঃ জ্ঞানাত্মা জ্ঞানশক্তিস্তদুভয়াভিন্ন শিবশক্ত্যাত্মকশ্চণকাকার বিন্দুরিতি ধ্যেয়ম্"। (উদ্ধৃতাংশের জন্য 'ষটচক্র নিরূপণ,' Arthur Avalon সংস্করণ দ্রঃ)।

["শিব কথিত 'পাদুকাপঞ্চকে' শ্রীগুরুর স্থান নির্দ্দেশ করা আছে। দুইভাবে ঐ পাদুকা পঞ্চক চিন্তা করা যায়, (১) পদ্ম, (২) তৎকর্ণিকাস্থলে অকথাদি ত্রিকোণ, (৩) তদন্তর্নাদ-বিন্দু-মণিপীঠমণ্ডল, (৪) তদধঃস্থ হংস, (৫) পীঠোপরি ত্রিকোণ। অথবা, (১) পদ্ম, (২) ত্রিকোণ, (৩) নাদবিন্দু, (৪) মণিপীঠমণ্ডল, (৫) তদূর্দ্ধস্থ ত্রিকোণাকারকামকলারূপা হংস।]

ব্রহ্মরন্ধ্র কি? কঙ্কালিনী তন্ত্র বলেন, "তৎকর্ণিকায়াং দেবেশি অন্তরাত্মা ততো গুরুঃ। সূর্য্যস্য মণ্ডলং তত্র চন্দ্রমণ্ডলমেবচ। ততো বায়ুর্মহানাগা ব্রহ্মরন্ধ্রং ততঃ স্মৃতম্"॥ অর্থাৎ, সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডলযুক্ত মহাবায়ুর স্থানই ব্রহ্মরন্ধ্র; এই স্থানের সহস্রদলে পদ্মের কর্ণিকায় অন্তরাত্মা স্বরূপ শ্রীগুরুর স্থান; ঐ সহস্রদলপদ্মগহ্বরে অবিনাভাবসম্বন্ধে নিত্যলগ্ন হয়ে আছেন অদ্ভুত ব্রহ্মতেজোময় দ্বাদশাক্ষরী পাদুকামন্ত্রবিশিষ্ট পদ্ম। পূর্ব্বোক্ত সহস্রদল কমল ও দ্বাদশ কমল—এই দুই পদ্ম পরস্পর আক্রান্ত হয়ে রয়েছেন এবং ঐ আক্রান্ত কর্ণিকাত্মক আধার স্থানে রয়েছেন 'কামকলা' বা 'অবলালয়' (অমলালয়)। অবলাশক্তি মানে, বিন্দুত্রয়াঙ্কুরভূত ত্রিশক্তিরূপ রেখাত্রয় (বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী) মিলিত ত্রিকোণরূপা কামকলাত্মক আলয়। যামলে, "ত্রিবিন্দুঃ সা ত্রিশক্তিঃ সা ত্রিমূর্ত্তিঃ সা সনাতনী।" অকথাদি রেখাযুক্ত হলক্ষ মণ্ডলীর নামই কামকলা। অকথাদির কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। এই ত্রিকোণ বামাবর্ত্তে লেখণীয়। এই স্থানকে তন্ত্রজীবনে, "রজঃ সত্ত্ব তমোরেখা যোনিমণ্ডলমণ্ডিত" বলা হয়েছে। উক্ত ত্রিকোণমধ্যে নাদবিন্দুমণিপীঠ-

মণ্ডল—হৃদয়ে ধ্যেয়। মণিপীঠের সর্ব্বাঙ্গ মণিময়; নাদ—শুক্লবর্ণ; বিন্দু—রক্তবর্ণ; সারদাতিলকে "পরশক্তিময়ঃ সাক্ষাত্রিধাসৌ ভিদ্যতে পুনঃ। বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদা সমীরিতা'। পরশক্তিময় ত্রিধা ভিন্ন হ'য়ে—বিন্দু, নাদ ও বীজ—এই তিনে পরিণত হন। এই—বীজ, বিন্দু, নাদ=বহ্নি, ইন্দু, ও অর্কস্বরূপ। শুক্লরক্তত্ব বিধায়, ইহা সর্ব্বব্যাপ্ত পিঙ্গলবর্ণ জ্যোতিরূপে চিন্তনীয়; ঊর্দ্ধে নাদ, অধোভাগে বিন্দু, মধ্যে জ্ঞানময়বপু মণিপীঠমণ্ডল, অথবা, ঐ চিন্ময় গুরুমন্ত্রময় বাগ্‌ভববীজ (দেবী ত্রিপুরা) স্বরূপ দ্বাদশকমল চিন্তনীয়। কাল্যূর্দ্ধ আম্নায়ে, "ত্রিবিন্দুং পরম তত্ত্বং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকং। বর্ণময়ং ত্রিকোণন্তু জায়বিন্দুতত্ততঃ ॥"

[বাগ্‌ভব বীজের স্বরূপ—দক্ষিণা মূর্ত্তৌ, "নিঃসরন্তি মহামন্ত্রা মহাগ্নেশ্চ স্ফুলিঙ্গ-বৎ। তথৈব মাতৃকাবর্ণা নিঃসৃতা বাগ্‌ভবাৎ প্রিয়ে। অতএব দেবাস্থা বাগ্‌ভবং বীজমুচ্যতে॥ যোষিৎ পুরুষরূপেণ স্ফুরন্তি বিশ্বমাতৃকা। মহামোহেন দেবেশি কীলয়ন্তি জগত্রয়ম্। অতস্তং কীলকং দেবি তেন সৌভাগ্য গর্ব্বিতা। পালয়ন্তি জগৎ সর্ব্বং তেনেয়ং শক্তিরুচ্যতে॥" বিশ্বমাতৃকা পুং প্রকৃতিরূপে স্ফুরিত হন। (পাদুকা-পঞ্চকস্তোত্র দ্রঃ)।

শ্রীগুরুস্থান্, "হংস পীঠোপরি নাদবিন্দুমধ্যস্থ মণিপীঠোর্দ্ধ ত্রিকোণে গুরোরধিবাসঃ"। কামকলাই হংসরূপে পরিণত। প্রেমযোগ তরঙ্গিনী ধৃতবচনে (সহস্রদল মধ্যে), "তন্মধ্যে তু ত্রিকোণন্তু বিদ্যুদাকারমুত্তমম্। বিন্দুদ্বয়ঞ্চ তন্মধ্যে বিসর্গরূপমব্যয়ম্। তন্মধ্যে শূন্যদেশে চ শিব পরমসংজ্ঞকঃ" ॥ পরমশিবই গুরু, ইনিই 'খ'রূপী সর্ব্বাত্মা, ইঁহারই জ্যোতিতে মূলাধার অর্থাৎ ধরা হ'তে মহাশূন্য পর্য্যন্ত প্রভান্বিত। তাই সহস্রারে শ্রীগুরু মহাতেজোময়—ইহাই ধ্যেয়, জিহ্বামূলে মন্ত্রবর্ণ তেজোময়, হৃদয়ে ইষ্টমূর্ত্তি তেজোময় এবং ঐ মিলিত তেজে ধরা হ'তে মহাশূন্য পর্য্যন্ত (মূলাধার হ'তে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত) তেজোময় রূপে ধ্যেয়। ছত্রিশতত্ত্বময় এই জগৎ। তেজোরূপে শ্রীগুরুই ঐ বিশ্ব; পরমানন্দ তন্ত্রে, "ষট্‌ত্রিংশদ্বিধমেতদ্বৈ তত্ত্বচক্রং সমীরিতং" —ইহাই সর্ব্বতত্ত্বময় নিখিল জগৎ। প্রকৃতির গুণক্ষোভে বিন্দুত্রয়ের আবির্ভাব। নাদই বিন্দুত্রয়ধর্ম্মিণী। অবরোহে, নাদই মূল প্রকৃতির প্রথমোচ্ছ্বাস। আপনাকে কামকলাময় ভাবতে হয়, মুখ=ঐ কামকলার বিন্দু; স্তনদ্বয়=সূর্য্যচন্দ্র, পৃথিবী হার্দ্ধকলা। যামলে, "ত্রিবিন্দুঃ সা ত্রিশক্তিঃ সা

ত্রিমূর্ত্তিঃ সা সনাতনী॥ নভোবেত্তা বিন্দুমুখী চন্দ্রসূর্য্যস্তনদ্বয়ী। পৃথিবী হার্দ্ধকলা যা ত্রিলোকিনাং তবাত্মিকা"॥ বেখায় ইহাব আকাব ∴। Woodroffe সাহেব ইহাকে anthropological' বলেছেন। "সাপি কুণ্ডলিনী শক্তিঃ কামকলারূপিণী"—কুণ্ডলিনী শক্তি এখানে কামকলারূপিণী।

পূর্ব্বে বলেছি, সমস্ত চক্রেই কুণ্ডলিনী ত্রিকোণরূপে অবস্থিতা। অববোহে, কামকলা সর্ব্বত্র যোনিরূপে বিদ্যমান। কামকলাই যোনিবিদ্যা। দেবী পঞ্চযোনিরূপা—ব্রহ্মযোনি, বিশ্বযোনি, জগৎযোনি, হংসযোনি, শাস্ত্রযোনি। ব্রহ্ম—লিঙ্গমাত্র। শব্দ প্রকাশেই বিশ্ব, সুতবাং, "মন্ত্ররূপা ব্রহ্মযোনি'। যোনিমুদ্রাই মহামন্ত্র। দেবী কালিকা মহাযোনিস্বরূপিনী; কামকলা জগদ্‌যোনি। দেবী ত্রিপুবাকেও 'বিশ্বযোনি' বলা হয়। 'হংসযোনি কালী'—ইহাও বলা হয়। ব্রহ্মসূত্রেব 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' সকলেই জানেন; বেদরূপ শাস্ত্রই সকলেব প্রমাণভূমি, তাই "শাস্ত্রযোনিঃ সনাতনী।" "ষটচক্র ধ্যানং প্রত্যক্ষং সপ্তমচক্রে গুরু সদা।" 'তাই' "কুণ্ডলী ত্রিবিধা নিত্যা জাগ্রতা সুপ্তা নিদ্রিতা।" কুণ্ডলিনী, "শ্যামাং, সূক্ষ্মাং সৃষ্টিরূপাং সৃষ্টিস্থিতি লয়াত্মিকাং।

[শ্যামা মানে,—"শীতকালে ভবেদুষ্ণাচোষ্ণকালে চ শীতলা। প্রতপ্তকাঞ্চনাভাসা শ্যামা স্ত্রী পরিকীর্ত্তিতা॥" "রক্তমিতি (বা কাঞ্চনাভাসা) সুন্দবী বিবয়ে জ্ঞেয়মিতি॥" পঞ্চযোনি—"ব্রহ্মবীজং মন্ত্রবৃক্ষো ব্রহ্মসকলো নিষ্কলঃ। ব্রহ্মযোনির্বিশ্বযোনির্জগদ্‌যোনি-স্তৃতীয়কঃ॥ ৬। হংসযোনিঃ শাস্ত্রযোনিঃ পঞ্চযোনিঃ ত্বং হি ভব। অনাদিসৃষ্টির্নিত্যশ্চ বীজবৃক্ষ পরম্পবঃ॥ ৭। (ষডাম্নায়তন্ত্রে নিগমসন্দর্ভে ২য় পটলঃ)। পঞ্চপাদুকাস্তোত্রে একস্থানে শাস্ত্র বলছেন, "লযস্থানং বায়োস্তদুপবি চ মহানাদরূপং শিবার্দ্ধং সিবাকারা শান্তং বরদমভয়ং শুদ্ধবুদ্ধি প্রকাশম। যদা যোগীপশ্যেৎ গুরুচবণযুগাম্ভোজ সেবানুশীলনস্তদা বাচাং সিদ্ধিঃ করকমলতলে তস্যভূয়াৎ সদৈব॥" শিবাকার—"শিবস্যার্দ্ধনাবীশ্বরত্বাৎ তদর্দ্ধং শক্তিস্তদ্রূপং নাদমিত্যর্থঃ। ...অথবা শিবাকাবমিতি তেন শিবশক্তিময়োঽয়ং নাদ।" হংস—অর্দ্ধনাবীশ্বর—শিব-শক্তি। কুলার্ণবে 'পরাপ্রসাদ মন্ত্র'—হংস।]

ভূতশুদ্ধিতে স্পর্শতত্ত্বে (অনাহতে) বায়ুব লয় সাধিত হয়, কিন্তু মহাবায়ুব ক্রিয়া চলে, উহা লয় হয় মহানাদে। ঐ নাদ শিব-শক্তিময় (শিবাকাব)। যখন 'শান্তং ববদমভয়ং শুদ্ধবুদ্ধি প্রকাশং' গুরুপাদপদ্ম-সেবাপবায়ণ সাধক আজ্ঞাচক্রোর্দ্ধে ঐ মহানাদ দর্শন কবেন, তখন তাঁব বাক্‌সিদ্ধি হয়। বিন্দু চিন্ময়রূপী বা 'সর্ব্ব প্রাণময়ঃ'। নিগমাগম পক্ষযুক্ত শিবশক্ত্যাত্মক চবণযুগল

—জ্ঞানময এই হংস=আদিহংস—সাধকেব সর্ব্বার্থসিদ্ধিদাতা। ইনি 'অন্তবাত্মা সংজ্ঞক পবমহংস এব গৃহ্যতে ন তু দীপকলিকাবৎ জীবাত্মা হংস। অয়ং হংসঃ প্রকৃতি পুরুষঃ"। অজপা জপে, হংস—স্থূল, সূক্ষ্ম ও পবরূপে চক্রে চক্রে বর্ত্তমান। মূলাধাবে যেখানে সাডেতিনপাকযুক্ত কুণ্ডলিনীব উর্দ্ধে, লিঙ্গাকাবে চিৎকলা দণ্ডাকাবে স্থিত ও যেখানে "মনোধ্যায়েৎ চিৎকলাং ঈ সমাশ্রিতাং। প্রদীপকলিকাকাবাং কুণ্ডল্য ভেদরূপিনীং", সেই স্থানে মূলাধাবমণ্ডপে হংস গায়ত্রীসহিতায় গণনাথরূপে বিবাজিত, অনাহতে তিনি হবগৌবী রূপে, বিশুদ্ধে প্রাণশক্তিসহ জীবাত্মারূপে, আজ্ঞায় মায়াযুক্ত পবমাত্মারূপে ও শেষে শ্রীগুরুস্থানে 'পবহংস' রূপে বিদ্যমান।

যাকে Anthropological idea বলা হয়, উহা সাধকেব কোন কল্পনা নয়, সাধকেব কাছে দেবী প্রথম বেখারূপে প্রতিভাত হন, পবে ঘনীভূত হয়ে পবিপূর্ণ মূর্ত্তিতে দেখা দেন, তাঁব স্তনদ্বয়—তেজ ও অমৃতরূপে মাতৃক্ষীবে পূর্ণ। সমস্ত মাতৃকাবর্ণেব স্বরূপাবস্থাই বিন্দু। ঐ উর্দ্ধবিন্দু=তুবীয় বা স্বরূপভাব। ঈ=বিসর্গ বা অধোবিন্দুদ্বয=মায়া। দেবীব চিন্তায়—গুরু, দেবতা ও সাধকেব একাত্ম অনুভূতি আসে। কামকলাবিদ্যাকে 'অতি বহস্যবিদ্যা' বা 'যোনিবিদ্যা মহাবিদ্যা' বলা হয়, কাবণ ইহাব সাধন গুরুমুখে জানতে হয়।

মূলাধাবাদিতে যা কিছু স্থূল বা সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান, সহস্রাবে সে সমস্তই 'পব' রূপে অবস্থিত। 'মণিপীঠকে, 'মণিদ্বীপ' বা 'বত্নময়দ্বীপ'ও বলা হয়; এই দ্বীপ নববত্নময়। দেবীব দেহই বত্নদ্বীপ। মাতৃকাও নবধা বিভক্ত; প্রত্যেক বিভাগে, গুরু, এক্ একরূপে শিষ্যেব কল্যাণে বত—শিষ্যেব বাক্-শুদ্ধি ও ভাবশুদ্ধি কবছেন। কাল বা সময়কেও আমবা নবধারূপে দেখি; ঘটিকা, যাম, অহোবাত্র, বাব, তিথি, পক্ষ, মাস, ঋতু, অব্দ—এই নয় কালরূপে থেকে গুরু সর্ব্বাবস্থায় বক্ষা কবেন। জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই তিনেব ত্রিগুণই নযটি তত্ত্ব, গুরু এই নবতত্ত্বেব প্রত্যেকটিতে কামকলারূপে (যোনিরূপে) সদা বর্ত্তমান। এই মণিমণ্ডপ (মণ্ডল) শ্রীগুরুব 'করুণাতোয়' পরিখা পবিবৃত! যন্ত্র পূজায় দেশ, কাল—এই দুই 'সংকোচকাবিণী' শক্তির পূজা কবতে হয়; যে শক্তি বহুরূপে সকলকে পবিণত কবে অর্থাৎ নানা পবিবর্ত্তন আনায—তাঁব পূজা এবং স্থবকেন্দ্র হ'তে যে শক্তি উত্থিত হ'য়ে সঙ্গীত ধাবা বর্ষণ কবে, তাঁব পূজাও কবতে হয়।

[নবরত্ন :—"পুষ্পং নীলং চ বৈদুর্য্যং বিদ্রুমং মৌক্তিকং তথা। ঈশান্মরকতং বজ্রং গোমেদং পদ্মরাগকম্ ॥" (তন্ত্ররাজতন্ত্র, ৫ম পটলঃ—২৩)। অর্থাৎ, পুষ্পরাগ, নীল, বৈদূর্য্য, বিদ্রুম, মৌক্তিক, মরকত, বজ্র, গোমেধ, পদ্মরাগ। ঈশাৎ = ঈশানদেশে। ঘটিকা = ২৪ মিনিট; যাম = ৩ ঘণ্টা; ঋতু = ষড়ঋতু। মাণিক্যমণ্ডপাদি— "ককণাতোয়পবিধং মধ্যে মাণিক্যমণ্ডপং। দেশং কালং তথাহহংকারং শব্দং কোণেষু পূজয়েৎ। রূপিণীশক্তিসহিতং ততঃ সঙ্গীতিযোগিনীঃ॥ ২৭।২৮ (তন্ত্ররাজতন্ত্র ৫ম পটলঃ)। "দেশমিত্যাদিনা সংকোচকারিকাঃ শক্তীরূপদিশতি।…অত্র দেশকালাকার শব্দানাং দ্বিরূপাদানং কার্য্যকারণানুরূপত্বেন, তত্র কার্য্যরূপং নবধাভূতং প্রথমং কারণরূপং দ্বিতীয়ম্।" সংগীতযোগিনীঃ—"নৃত্যগীতবাদ্যবিনোদিকাঃ শক্তীঃ · ।" (টীকা দ্রঃ)]।

ইতিপূর্ব্বে বলেছি আজ্ঞাচক্র = পরমকুল ও তথায় আছেন 'পরশিব'; দ্বাদশদলের উর্দ্ধে, সহস্রদলের কাছে আছেন 'পরম শিব'; এই স্থান 'কুলস্থান' বা 'অকুলস্থান'। পরমহংস বা হংসপীঠের উপরেই সকলের গুরুচিন্তার স্থান ও 'নির্ব্বাণকলাই', সকলের ইষ্টদেবতা। হৃদয়ে আছেন জীবাত্মা। কুণ্ডলিনীর উর্দ্ধগতিতে জীবাত্মার লয় হয়, পরে আকাশতত্ত্বের সঙ্গে, আজ্ঞাচক্রোর্দ্ধে, মনেরও লয় হয়। তখন কেই বা চিন্তা করে, কেই বা গুরু ইষ্টস্থানে সাধককে নিয়ে যায়? শাস্ত্র বলেন, উন্মনীই এই কার্য্য সমাধা করেন। সহস্রারে আছেন নিত্য উন্মনী। কৌলমার্গরহস্যে ধৃত ভাস্কররায় বচনে, "আদৌ নির্গুনাদ্‌ব্রহ্ম ব্রহ্মণো ধ্বনিরূপোন্মনাত্মনা সূক্ষ্মরূপবাগুৎপন্না।" —ধ্বনিরূপ উন্মনাত্মক সূক্ষ্ম বাক্ উৎপন্ন হয়েছিল। উন্মনী, 'শিবতনু' প্রাপ্তি স্থান, 'উন্মন্যতে পরশিব'। পরশিব হ'তেই শুদ্ধবোধ ও শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ হয়। পরশিব সাধককে তাঁর নিজস্বরূপ জানিয়ে দেন ও 'পরম' স্থানে নিয়ে যান। ঐ মণিপীঠের উর্দ্ধে, "উর্দ্ধমস্য হুতভূক শিখাত্রয়ং, তদ্বিলাস পরিবৃংহণাস্পদম্। বিশ্বঘস্মর মহোচ্চিদোৎকটং ব্যামৃষামি যুগমাদি হংসয়োঃ …(পাদুকা পঞ্চক)। যখন সাধকের মন সমস্ত বিষয় চিন্তা ত্যাগ ক'রে স্থির হয়ে যায়, তখন তিনি ঐ স্থানে বিশ্বগ্রাসী হুতভূক শিখাত্রয় দর্শন করেন, ঐ শিখাত্রয়, বিশ্বঘস্মর (বিশ্বানাং ঘস্মরা ভক্ষিকা)। ঐ শিখাত্রয়—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শম্ভু, বা সূর্য্য, চন্দ্র, বহ্নি বিন্দুত্রয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শম্ভুরূপী রেখাত্রয়ের (ত্রিকোণ) মধ্যে আছেন শ্রীগুরু।

["পরিবৃংহণাস্পদম্—'উদ্দিশ্যমান মণিপীঠরূপাস্পদম্'। ব্যামৃষামি—'তৎপ্রতিবন্ধক বিষয়চিন্তাদি ত্যাগেন স্ব স্ব স্থানে স্থিরতবং ভাবয়মীতি'। মহোচ্চিৎ—'মহাপ্রকাশস্তয়া'।]

শ্রীগুরু স্থানে শ্রীগুরুর স্বরূপে অবস্থিতি। এই স্থান কিরূপ ?

["নাত্রকালকলাভানং ন তন্নং ন চ দেবতাঃ।
অনির্ব্বাণং পরং শুদ্ধং রুদ্রবক্ত্রং তদুচ্যতে।
শিবশক্তিরিতি খ্যাতা নির্ব্বিকল্পা নিরঞ্জনা॥
তত্ত্বাতীতং বরারোহে বাঙ্মন নৈব গোচরন্।"]

তন্ত্র বলছেন এই স্থান "নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" অর্থাৎ "পরম কুলপদমিতি, পরং উন্মন্যাঃ পরং অকুলপদং অকুলাখ্য পরশিবাত্মক পদং বিশ্বস্য বিশ্রামস্থানত্বাৎ।" বিশ্বের বিশ্রামস্থান।

(স্বামীজীর Kali the Mother, ইহার সহিত তুলনীয়)।

ইহাই রুদ্রবক্ত্র। ঐ বিশ্বসংহারিকা হুতভূক শিখাত্রয়ে "তত্র নাথ চরণারবিন্দযোঃ কুঙ্কুমাসব ঝরিমরন্দয়োঃ"—শ্রীগুরুস্থান। এইখানে আছে সকলের মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী 'কল্পতরু'।

["কল্পবৃক্ষবনান্তঃস্থ নবমাণিক্যমণ্ডপে।
নবরত্নময় শ্রীমৎ সিংহাসন গতেঽম্বুজে॥
অর্দ্ধাম্বিকা সমাযুক্তং প্রবিভুক্ত বিভূষণম॥

*　　　　*　　　　*

এবং চিন্তাম্বুজে ধ্যায়েৰ্দ্ধনারীশ্বরং শিবম।
পুং রূপং বা স্মরেদ্দেবী স্ত্রীরূপং বা চিন্তয়েৎ।
অথবা নিষ্কলং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম।
সর্ব্বতেজোময়ং দেবী সচরাচর বিগ্রহম্॥

(কুলার্ণব ১০৯—১১৫ ৪র্থ উঃ)।

"লাক্ষাভং পরমামৃতং পরশিবাৎ পীত্বা পুনঃ কুণ্ডলী নিত্যানন্দো মহোদয়াৎ কুলপথান্মূলে বিশেৎ সুন্দরী। তদ্দিব্যামৃতধারয়া স্থিরমতিঃ সন্তর্পয়েদ্দৈবতম্, যোগী যোগীপরম্পরা বিদিতয়া ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডস্থিতম্॥ জ্ঞাত্বৈতৎ ক্রমমুত্তমং যতমানা যোগী যমাদৈর্যুতঃ, শ্রীদীক্ষাগুরু পাদপদ্মযুগলামোদ প্রবাহোদয়াৎ। সংসারে ন হি জন্যতে ন হি কদা সংক্ষীয়তে সংক্ষয়ে নিত্যানন্দ পরম্পরা প্রমুদিতঃ শান্তঃ সতানগ্রণীঃ॥"

লাক্ষাভা = অলক্তরক্তাভ। সামরস্য = শিবশক্তির সমপ্রধান ভাব বা রস (সমপ্রধানরূপে মেলন)।]

সাধকের ভাব অনুসারে শ্রীগুরু ধ্যেয়। (ঐ অর্দ্ধনারীশ্বর = সদাশিব), 'শিব' মাত্রকেই 'সদাশিব' অনেক সময় বলা হয়, অর্দ্ধনারীশ্বর, বিশেষ ভাব। প্রয়োগ অনুসারে অর্থ বুঝতে হয়। শ্রীগুরুর চরণদ্বয় হ'তে নিরন্তর পরমামৃত নিঃসরণ হচ্ছে। ব্রহ্মরন্ধ্র হ'তে মূলাধার পর্য্যন্ত ঐ বিগলিত সামরস্যোৎপন্ন পরামৃত ধারায় তখন ইষ্টদেবতা ও ষট্‌চক্রস্থ সমস্ত দেবতার তর্পণ সাধিত হয়। তর্পণ = পান—পূর্ণ অমৃত পান; তর্পণে পূজা সিদ্ধ হয়। ইহাই পাদুকাপঞ্চক—ইহাই পাদুকাতত্ত্ব, যা আমরা বোঝবার চেষ্টা করেছি। "পরমামৃত সরোবরোদিত সরোজ সদ্রোচিরং, ভজামি শিরস্থিতং গুরুপদারবিন্দদ্বয়ম্॥"

ঐ নির্ম্মল প্রকাশরূপ পদ্ম পরামৃতসরোবরে উদিত; প্রত্যেকটি ইহার শ্রীগুরুপাদুকা। প্রত্যেক পূজায় মানসপূজার ব্যবস্থা আছে, সেইরকম পূজান্তে মানস হোমের ব্যবস্থা আছে। এই দুই—মানস পূজা ও হোম—অন্তর্যাগ। এই সমস্ত অন্তর্যাগের বাক্যার্থ সহজ, কিন্তু ইহার মর্ম্ম গুরুমুখে শুনতে হয়। তন্ত্র বলেন, এই অন্তর্যাগ জ্ঞানিদের জন্য। জপ সমর্পনান্তে হোম করতে হয়।

[মানস হোম।

"অথাধারময়ে কুণ্ডে চিদগ্নৌ হোমযেত্ততঃ। আত্মান্তরাত্মা পরম-জ্ঞানাত্মা চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
এতদ্রূপস্তু চিৎকুণ্ডং চতুরস্রং বিভাবয়েৎ॥ আনন্দমেখলারম্যং বিন্দু-ত্রিবলয়াঙ্কিতম্॥
অর্দ্ধমাত্রা যোনিরূপং ব্রহ্মানন্দময়ং ভবেৎ॥ বামে নাড়ীমিড়াং ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ।
সুষুম্নাং মধ্যতো ধ্যাত্বা কুর্য্যাৎ হোমং যথাবিধি॥ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সাধকেন্দ্রো হবিস্তেন প্রকল্পয়েৎ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং জপেদমুং। নাভিচৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষা মনসা স্রুচা।
জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহং॥ ১॥ ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দ্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা।
সুষুম্না-বর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহং॥ ২॥ প্রকাশাকাশ হস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্মনী-স্রুচা।
ধর্ম্মাধর্ম্মকলাস্নেহ-পূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহম্॥ ৩॥...অন্তর্নিরন্তর নিরিন্ধন মেধমানে মায়ান্ধকারপরিপন্থিনী সম্বিদগ্নৌ।
কস্মিংশ্চিদদ্ভুতমরীচিবিকাশভূমৌ বিশ্বং জুহোমি বসুধাদিশিবাবসনাম (স্বাহা)॥ ৪॥
ইদন্তু পাত্রভরিতং মহত্তাপ-পরামৃতং॥ পূর্ণাহুতিময়ে বহ্নৌ পূর্ণহোমং জুহোম্যহম্॥"
(কৌলাবলী তন্ত্র—৩য় উ। দ্র।)।

মূলমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে—এক একটি মন্ত্র আহুতি দিতে হয়; সুতরাং প্রতি মন্ত্রের পর 'স্বাহা' বলতে হয়। আধারময় কুণ্ড (চিৎকুণ্ড)=মূলাধার। চিদগ্নিই এখানে অগ্নি। এই অন্তর্হোমে চিদগ্নি উদ্দীপ্ত চিন্তা করতে হয়। মূলাধারে চতুষ্কোণ পৃথ্বী, উহাই চতুরস্র কুণ্ড, এই কুণ্ডের চারিটি কোণ। আত্মা =আত্মা প্রাণরূপী=সঞ্জীবনীশক্তির ধারক। অন্তরাত্মা=পরমাত্মার যে স্ফুলিঙ্গ সর্ব্বানুস্যূত ও সর্ব্বব্যাপ্ত (যা পঞ্চভূতরূপে ব্যক্ত হয় পরে)। পরমাত্মা= ব্রহ্ম। জ্ঞানাত্মা=(মহত্তত্ব) (শুদ্ধবুদ্ধি)। ঐগুলির দ্বারা এই কুণ্ড নির্ম্মিত,—সমস্তই পরমাত্মার এক একটি প্রকাশ। মেখলা=বেষ্টনী। মূলাধারস্থিত নিম্নস্থ রেখা অর্দ্ধমাত্রা (⌣)। বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা, মধ্যে সুষুম্না ধ্যান ক'রে হোম করতে হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম= হবিঃ (ঘি)। নাভিচৈতন্যরূপ অগ্নি, জ্ঞানদ্বারা উদ্দীপ্ত। এখানে মনই স্রুক। অক্ষবৃত্তি=ইন্দ্রিয়বৃত্তি। ১ম আহুতি—ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ঘৃতের সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি; ২য় আহুতি—ঐরূপ, আত্মরূপ অগ্নিতে সুষুম্না পথে মনোময় স্রুক দ্বারা অবিরত (নিত্য) ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমুদয়, ৩য় আহুতিতে, হস্তদ্বয়=প্রকাশ ও আকাশ, ঘৃত= ধর্ম্মাধর্ম্ম কলা স্নেহ বা মায়াবিকাশ; মনোময় স্রুক=উন্মনী, ইহাদের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান। ৪র্থ আহুতিতে—নিরিন্ধন মেধমানে=ইন্ধন ব্যতিরেকেও যা দীপ্ত হ'য়ে আছে, যা মায়ান্ধকারের প্রতিকূল ও যা অদ্ভুত মরীচিবৎ জগৎ প্রপঞ্চ দিব্য জ্যোতিতে প্রকাশ করে—সেই সমস্তই—পৃথ্বী হ'তে শিব পর্য্যন্ত—স্বাহা। পূর্ণাহুতি—পাত্র=মনোময়, ঐ পাত্র আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক তাপত্রয়রূপ ঘৃতে পূর্ণ ক'রে—স্বাহা।]

এই মানসহোমে সাধক "চিন্ময়তাং ব্রজেৎ," ব্রহ্মময় হয়ে যান। 'তত্ত্বমসি,' 'নিত্যং আনন্দং ব্রহ্ম', তারপর? "অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্॥"

দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতমেব সাধনা হয় না। একটা কিছু—ইহাও নয়—ভাষায় বলা যায় না, যা তাই—এই পর্য্যন্তই বলতে পারা যায় শুধু। প্রমাণ? প্রমাণ যে 'চণকাকার' শুদ্ধবুদ্ধির গোচর, চণকাকারই আভাষ—আভাষ আছে, ইহাই প্রমাণ। আভাষ পর্য্যন্তই গুরু-শিষ্য ভাব।

তান্ত্রিক সাধনা

২।

পুরাণের রীতি দিয়েই পুরাণ বুঝাতে হয়, তন্ত্রশাস্ত্র বা সাধনশাস্ত্রের রীতি দিয়ে তন্ত্র বুঝাতে হয়। তন্ত্রকে তার নিজের ভাবে গ্রহণ না করলে, সবই কুহেলিকার সাম্রাজ্য মনে হবে, অথচ এই কুহেলিকা সাম্রাজ্যের চাবিকাটি বাঙ্গালী বহুকাল পেয়েছেন। বলেছি, তন্ত্রে সব তত্ত্বের সূত্র পাওয়া যায়, তবে তন্ত্রের ভাবে সেগুলি বুঝাতে হয়।

দুঃখ বা ক্লেশের হাত এড়াতে সকলে চায়; সাধন দ্বারা ক্লেশ দূর হয়। ক্লেশ পাঁচ প্রকার=অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ। অবিদ্যাই অন্য ক্লেশের মূল কারণ। অবিদ্যাতে সব বিপরীত বোধ হয়; অনিত্যকে নিত্য মনে করা, অশুচিকে শুচি মনে করা, দুঃখকে সুখ মনে করা ও অনাত্মকে আত্মতা বোধ করা প্রভৃতির নাম অবিদ্যা (পাতঞ্জল দর্শন—১৫ দ্রঃ), আত্মতা মানে দেহাত্মবোধ—দেহ সম্বন্ধে, 'আমি' 'আমার' বোধ। শরীর ও শরীরের ব্যাপার দেখলে, দেহকে অশুচিই বোধ হবে, অথচ এই দেহকেই আমরা শুচি মনে করি ও মোহগ্রস্ত হই। দৃক্ ও দর্শন শক্তির একাত্মতার নাম 'অস্মিতা' (ঐ ১।১৬)। চিচ্ছক্তির (পুরুষ বা আত্মার= চেতন দৃক্শক্তির) প্রতিবিম্ব বুদ্ধিবৃত্তিতে (সাত্ত্বিক অন্তঃকরণে) পড়লে, ঐ বৃত্তিগুলি সচেতন হয়, তাই আত্মার প্রতিবিম্বপাতের আধার হেতু ঐগুলির নাম দর্শনশক্তি=বুদ্ধিতত্ত্ব। অতএব পুরুষ দ্রষ্টা, দ্রষ্টা ও বুদ্ধি-পরম্পরার একাত্মতা বোধ বা তাদাত্ম্যাধ্যাস হওয়ার নাম 'অস্মিতা'। আমরা চিত্ত বা বুদ্ধিকে, পুরুষ বা আত্মা মনে ক'রে ভ্রমে পড়ি; এই চিত্তের প্রতি 'আমি' 'আমার' প্রতীতিই 'অস্মিতা'। পূর্ব্বানুভূত সুখস্মৃতি থাকলে তৎজাতীয় সুখ সাধনে তৃষ্ণা জন্মায়; সুখজ্ঞের এই সুখ সাধনেচ্ছাই 'রাগ' অর্থাৎ ঐ সুখাসক্তিই 'রাগ' (ঐ ১।৭)। ঐ প্রকার দুঃখে দ্বেষ জন্মায়। জীব মাত্রেরই মৃত্যু ভয় আছে। শিশুরও ঐ ত্রাস, তার পূর্ব্ব সংস্কার মাত্র। জীব মৃত্যু চায় না, অথচ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, ইহাই দুঃখ বা 'দ্বেষ'। বারবার এই মরণ দুঃখভোগ করায় তার চিত্তে দুঃখসমূহের সংস্কার বা বাসনা সঞ্চিত হ'য়ে আসছে। এই বাসনার নাম 'স্বরস'; এই স্বারস্য জীবের মধ্যে সূক্ষ্ম ভাবে

নিহিত। ঐ দুর্লক্ষ্য বৃত্তিবিশেষই 'অভিনিবেশ' (ঐ ১।৯)। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই 'অহং' বোধ সংযুক্ত থাকে—অন্যদেহে মৃত্যুভোগ হয়েছিল সেই ত্রাস বর্ত্তমান দেহে অনুবৃত্তি হয়। এই সংস্কারের স্রোত—মরণ-দুঃখানুভববাহিত সংস্কারসমূহ বা 'স্বরবাহী' অনুবর্ত্তন—প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ঐ নিহিত সূক্ষ্মভাব এই স্রোতে বহমান ব'লে জীব. ইহা স্পষ্ট বুঝতে পারে না, বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান হলে জানতে পারত। সূক্ষ্ম ও অন্তর্নিহিত ঐ বোধ প্রচ্ছন্ন সংস্কার-জাত ব'লেই তার কারণ অজ্ঞাত থাকে। এই অজ্ঞতাই ত্রাসের কারণ, ক্লেশের কারণ। দর্শনশাস্ত্র বলেন যে, ক্রিয়াযোগের দ্বারাই ঐ ক্লেশ সূক্ষ্ম হয়ে যায়, ক্রমশঃ অবিদ্যা—দগ্ধ বা ভর্জ্জিত বীজের ন্যায়—নিঃশক্তি হয়ে পড়ে। ফলে, ঐ প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যায় ও সংসারাঙ্কুর জন্মায় না। বিষয়সম্বন্ধ হবামাত্রই চিত্ত তদাকার প্রাপ্ত হয়। চিত্ত বা অন্তঃকরণের এই পরিণামই বৃত্তি—আমাদের সাধারণ জ্ঞান। বাহ্যবস্তুর ইন্দ্রিয়সংযোগে স্বরূপবোধক বৃত্তিই প্রত্যক্ষ। জাত্যন্তর পরিণাম হয়, প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা (ঐ. কৈ. পা. ২)। সাধনবলে মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। এক জাতি হ'তে অন্য জাতিতে পরিণত হওয়ার কারণ প্রকৃতির আপূরণ। বিভিন্ন শরীরের বিশিষ্ট উপাদান আছে। তির্য্যকের উপাদান মানবে নেই। এক শরীরে অন্য উপাদান প্রবেশ করলে তার পরিণাম হয়। গাছ, কালে পাথর হয়, পাথর মাটি হয়, জীবাস্থিও পাথরে পরিণত হয়। গাঢ় চিন্তা বা ধ্যানের ফলে অসম্ভব সম্ভব হয়। 'সাধন সমর' লেখক একটি ঘটনা স্বচক্ষে দেখে তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। স্ত্রীজাতির স্তনোদ্গম ও তাতে দুগ্ধ সঞ্চার, তাঁর মাতৃত্বের সূচনা করে। একটি মাতৃহারা শিশুর নিত্য অস্থিরতায়, শিশুর পিতা উৎকট চিন্তাগ্রস্ত হ'য়ে বাৎসল্যের আতিশয্যে শিশুকে নিজ স্তন দিয়ে ভুলাতে আরম্ভ করায়, কিছুদিন পরে ঐ পিতার স্তনোদ্গম ও স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারিত হয়। গ্রন্থকার জানাচ্ছেন যে তখনও সেই পিতা জীবিত।

সংসার ক্লেশের আগার, সংসার দুঃখময় ইত্যাদি চিন্তা হৃদয়ে বৈরাগ্য জাগায়; ইহাই সকলে শিখিয়ে এসেছেন; আর, সেটি সত্য। কিন্তু নতুন শিক্ষা বলেন যে, ঐ সমস্ত দুঃখ, ঐ সমস্ত জালা—সবই 'মা'য়েরই রূপ; বীরহৃদয়ে যিনি ঐগুলিকে আলিঙ্গন করতে পারেন, মা তাঁর কাছেই

আসেন—দুঃখ মহামারি, সব রূপে, 'তাঁরি আগমন'। পাদুকাতন্ত্রে তা আমরা বুঝেছি। তান্ত্রিক সাধনা ও অদ্বৈত বেদান্তের 'নেতি নেতি' সাধনা যেন সমান্তরাল সরল রেখা (parallel straight lines)। আমরা স্বামীজীর "মৃত্যুরূপা মা" কবিতা পড়েছি, তান্ত্রিক মানসহোমও দেখেছি। 'নেতি নেতি' সাধক গোড়া হ'তেই 'নিরালম্ব' ভাব অবলম্বন করেন—সমস্তকে তুচ্ছ ক'রে সোজা অগ্রসর হন। উক্ত মানসহোমে সাধক বিরাটরূপী, প্রকাশ ও আকাশ হস্তদ্বয়ে উন্মনীরূপ স্রুক অবলম্বনে পূজায় রত; সে পূজায় 'বসুধাদিশিবাবসনাম'—ব্রহ্মাগ্নিতে স্বাহা—বিলীন! তাপত্রয়ে তাঁর পূর্ণাহুতি, বিলুপ্ত দেহাত্মবোধ, দুঃখসুখবোধ; বিলুপ্ত ব্যষ্টি, বিলুপ্ত সমষ্টি! সরল রেখাদ্বয় এখানে মিলিত। দুই সাধনা যেন সমদ্বিভুজ; সাধনার প্রারম্ভে উভয় সাধকের আচরণ পৃথক—গন্তব্যস্থান একই। এ সম্বন্ধে আরো কিছু বোঝবার আছে, যথাসময়ে তা বোঝবার চেষ্টা করা যাবে।

'পশু', 'বীর' ও 'দিব্য' এই তিন শ্রেণীর সাধক। উচ্চাধিকার প্রাপ্তির পর সাধক 'বীর' বা 'দিব্য'ভাব অবলম্বন করেন। 'সর্ব্বত্র নিষ্পরিগ্রহতা' (পরশুরাম কল্পসূত্র ১।২১) 'ম'কারাদিতে সাধক অপরিগ্রহ ভাব রাখবেন। ভোগকামনায় গ্রহণই অপরিগ্রহ। সাধকের 'ম'কারে ভোগকামনা থাকবে না, দেবতার প্রীতির জন্যই অথবা ব্রহ্মার্পণ ক'রে সব দ্রব্য নিবেদিত হবে। "ফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মকরণম্" (ঐ ঐ ১।২২)—ফলকামনা ত্যাগ ক'রে কর্ম্ম করবে। এ সকল বলা সত্ত্বেও, তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে সাধারণের একটি বিষম ভ্রম ধারণা আছে। ত্যাগপূত জীবন ভিন্ন কোন সাধনাই হয় না; যোগ ও ভোগ একসঙ্গে হয় না। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র জোর ক'রেই বহু স্থলে বলছেন, "যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষো, যত্রাস্তি মোক্ষ ন চ তত্র ভোগঃ।

শিবাম্পদাম্ভোজ যুগার্চ্চকাণাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব॥" অর্থাৎ—'যেখানে ভোগ সেখানে মোক্ষ নেই, যেখানে মোক্ষ সেখানে ভোগ নেই; কিন্তু যাঁরা দেবী (ইষ্ট) পাদপদ্ম অর্চ্চনায় রত, তাঁদের ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই করতলগত।' লক্ষ্য করতে বলি যে, এখানে স্পষ্টভাবে 'দেবী' ভক্তদের সম্বন্ধেই ঐ কথা বলা হয়েছে। তাঁদের—ইষ্টপাদপদ্ম সেবারত সাধকদের—ভোগ মানে সাধারণের ভোগ কামনা ও বিলাস নয়। 'ভোগ' এই শব্দটির অর্থ সাধারণভাবে ক'রে সাধকের ঘাড়ে দোষ চাপান হয়।

কোন্ প্রকাব পূজায় ভোগেব প্রাচুর্য্য নেই ? সে সব স্থানে 'ভোগ' মানে কি বিলাসোপকবণ ? সঙ্গীতবিদ্যাব সাধনায় যে যোগ ও ভোগ একসঙ্গে হয়, সে 'ভোগ' কি সাধনেব অন্তবায় ? "শিবাপদাম্ভোজযুগার্চ্চকাণাং" যে ভোগ, তাহা দিব্যভোগ, এই ভোগ সাধকদেবই হয়।

অনুগীতায় একটা গল্প আছে। ব্রহ্মাব নিকট উপদিষ্ট হয়ে 'ওঁ' মন্ত্র জপেব ফলে সাপেব ফণায় হ'ল দংশনবৃত্তি, অসুবদেব দেখা দিলে দম্ভভাব, দেবতাদেব হল দানপ্রবৃত্তি, আব মহর্ষিদেব দম আদি গুণবৃত্তি জেগে উঠল। উপদেষ্টা এক ব্যক্তি হলেও, উপদেশ এক হলেও, নিজ নিজ সংস্কাবেব বিভিন্নতায বিভিন্ন ফল হল। সকাম সাধককে 'ফলং ত্যক্ত্বা' কর্ম্ম কবতে বলা হয় নি। অনুগীতায় একস্থানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, যাবা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গে অনুবক্ত হয় তাবা 'বাজস'। এই 'বাজস' সাধকই এখন দেশে বেশী দবকাব। বজোগুণেব মধ্য দিয়ে না গেলে উচ্চাধিকাব লাভেব যোগ্যতা আসে না। দুনিয়াদাবীব দিক্ দিয়ে যোগ ও ভোগ—এই দু'য়েব আপোষ বা বফা হয় না। স্বার্থবুদ্ধিতে যোগ হয় না সর্ব্বশাস্ত্রেই বলে। তন্ত্রশাস্ত্র কোন্ বিষয়ে দুনিযাদাবীব সঙ্গে বফা কবেছেন, দুনিয়াদাবীব মতে চলেছেন কেহ দেখাতে পাবেন কি ? "ন গণয়েৎ কমপি" (কৌলোপনিষদ্ ৩০), 'লোক না পোক্'—শ্রীবামকৃষ্ণ বলতেন। কৌল সাধক আপন গুরুবর্ত্মে দৃঢ বিশ্বাস স্থাপন কববেন, স্বয়ং ব্রহ্মাব কথাও গ্রাহ্য কব্বেন না ; ইহাই বীবভাব। "আত্মজ্ঞানান্মোক্ষঃ" (ঐ. ৩৭), কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তি আসতে পাবে, এ ভয় সাধক কববেন না, গুরুবর্ত্ম ঠিক থাকলে, সাধক কোন কিছু গ্রাহ্য না ক'বে আত্মানুসন্ধানেব সঙ্গে সাধনায় অগ্রসব হবেন। "লোকান্ ন নিন্দ্যাৎ" (ঐ ৩৮) ; সাধক ভিন্নমতাবলম্বীদেবও নিন্দা কববেন না, কাবণ নিন্দাব দ্বাবা নিজেব হীনত্ব আসে। "ইত্যধ্যাত্মম্" (ঐ. ৩৯)। কৌলসাধক সর্ব্বত্র আত্মভাব অবলম্বন কবেন, পবনিন্দায় এই আত্মভাবেব হানি হয়—আত্মভাব অবলম্বনই অধ্যাত্ম। "কৌলজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে" (কৌলার্চ্চনদীপিকা) ; ব্রহ্মজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, ইহাই কৌলজ্ঞান। 'মেদাটে ভক্তি' বীব ভাব নয়। 'আয় মা সাধনসমবে, তুই হাবিস্ কি আমি হাবি' —বীবভাবেব লক্ষণ ; 'খাল কেটে এখনই পুকুবে জল আনতে হবে'—

বীব ভাব, "আবে বে পবেত প্রভো মে ন ভীতির্মদীয়ে শবীবে ন বা তেঽধিকাবঃ। ন জানাসি কিং ত্বং শিবস্তজমধ্যে গুবোঃ পাদপদ্মং ভাবয়ামি॥"—বীবভাব; তাই বীবেব পূজা, "ভৈববোঽহমিতি জ্ঞানাৎ সর্ব্বজ্ঞাদি গুণান্বিতঃ। ইতি সংচিন্ত্য যোগীন্দ্রঃ কুলপূজাবতো ভবেৎ॥" (কুলার্ণব)। যিনি অমৃতসাগবেব আভায পেয়ে, বীরেব মত অবিদ্যাপাশ কেটে বেবিয়ে আসতে দৃঢপ্রতিজ্ঞ, তিনি 'বীব'। যিনি 'বীব', তিনি—জগৎ ও সর্ব্ববস্তু ব্রহ্মশক্তিব বিভূতি—এই ধাবণায় সাধনে অগ্রসব হন, পবে তিনি দিব্যভাব অবলম্বন কবেন, যখন অদ্বৈতভাব তাঁব মধ্যে দৃঢ হয়। "অনিত্য কর্ম্মলোপঃ" (পবশুবাম কল্পসূত্র ১।২৩), নিত্যকর্ম্ম লোপ কববে না। 'বেঁশো আগুণ ফুঁ দিযে বাখতে হয়।' 'আ মন্ত্রসিদ্ধেঃ' (কৌলোপনিষদ্—২৫)। মন্ত্রসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সাধনাচাব পালন কববে। কোন্ কোন্ নিয়ম (আচাব) অবশ্য পালনীয? বলছেন, 'মদাদিস্ত্যাজ্যঃ' (ঐ. ২৬)। যাতে মত্ততা আনায়, তাহা, ও কামক্রোধাদি ('আদি')—সমস্তই ত্যজনীয, সাধনকালে যাতে চিত্তবিভ্রম আনায সে সমস্ত হ'তে সাধক বিবত থাকবেন; প্রথম 'ম'কাব সেবনেব উদ্দেশ্য 'মত্ততা' নয়, অতএব সাধক এ বিষয়ে সাবধান হবেন। 'প্রাকট্যং ন কুর্য্যাৎ' (ঐ. ২৭)। আচাব প্রকাশ কববে না। 'পশু'সম্ভাষণ কববে না ইত্যাদি নিয়মেব কথা পূর্ব্বে বলেছি। 'আত্মবহস্যং ন বদেৎ' (ঐ. ৩১), নিজেব বিশেষ ভাব (আত্মবহস্য) বলবে না। আবণ্যকেবাও তাঁদেব যজ্ঞাদিব ক্রিয়া গোপন বাখতেন। সাধনেব উদ্দেশ্য অপবেব বুদ্ধিকে বিচলিত কবা নয। ব্রহ্মমন্ত্রী কৌলেবই দিব্যভাব, সুতবাং 'ব্রতং ন চরেৎ'—কাম্যকর্ম্ম কববে না; 'ন তিষ্টেন্নিয়মেন'—কোন নিয়মেব দাসত্ব কববে না, কাবণ "নিয়মান্নমোক্ষঃ"—নিয়মে মোক্ষপ্রাপ্তি হয না, নিযম ও বন্ধন—গণ্ডী। "কৌল প্রতিষ্ঠাং ন কুর্য্যাৎ" (ঐ ৪০-৪৩) কৌলমার্গ তর্ক দ্বাবা প্রতিষ্ঠা কববাব চেষ্টা কববে না, কাবণ, কৌলসাধনবহস্য গুরুমুখে জানতে হয়। গুরুমুখী বিদ্যা অর্জ্জন কবতে হয় সাধন দ্বাবা, তর্ক দ্বাবা নয়। "অহং গুরুবহং জ্যেষ্ঠস্ত্বহং বেদ্মীতি গর্ব্বিতঃ। অহমেব গতির্যেষাং কৌলিকা ন ভবন্তি তে॥" ৪২ (কুলার্ণব, ১১ উঃ)।—'আমিই গুরু, আমিই জ্যেষ্ঠ, আমিই সব বুঝি' ইত্যাকাব গর্ব্ব যাঁব আছে, তিনি কৌল হ'তে পাবেন

না।' ঐ স্থানে শিব বলছেন যে ব্রহ্ম হ'তে স্তম্ব পর্য্যন্ত—সবই তাঁর গুরু, সবাইয়ের কাছে তাঁর শিক্ষনীয় বিষয় আছে, অতএব বৃথা গর্ব্ব করবার কি আছে? 'যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি।' শ্রীরামকৃষ্ণ 'গুরু' কথাটি সহ্য করতে পারতেন না।

সাধনের প্রথম অবস্থায় বাহ্য পূজা ও আভ্যন্তর পূজা দুইই ক'রে যেতে হয়, কৌল অন্তর্যাগককেই প্রধান করবেন। অন্তর্যাগে নিরূঢ় হ'লে, বাহ্য পূজা সাধকের ইচ্ছাসাপেক্ষ। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন,

["অথাভ্যন্তর পূজায়ামধিকারো ভবেদ্‌যদি। ত্যক্ত্বা বাহ্যমিমাং পূজামাশ্রয়েদপরাং বুধঃ॥ পূজা যাঽভ্যন্তরা সাঽপি দ্বিবিধা পরিকীর্ত্তিতা। সাধারা চ নিরাধারা নিরাধারা মহত্তরা॥ সাধারা যা তু সাধারে নিরাধারা তু সংবিদি। আধারে বর্ণসংকৢপ্তবিগ্রহে পরমেশ্বরীম॥ আরাধয়েদতিপ্রীত্যা গুরুণোক্তেন বর্ত্মনা। যা পূজা সংবিদি প্রোক্তা সা তু তস্যাং মনোলয়ঃ॥ (কৌলমার্গরহস্যোধৃত তন্ত্রবচন দ্রঃ]।

'আভ্যন্তর পূজায় অধিকার লাভ হলে, বাহ্য পূজা ত্যাগ ক'রে আভ্যন্তর পূজাকেই আশ্রয় করবে। এই অন্তর্যাগ দ্বিবিধ—সাধারা ও নিরাধারা। সাধারা পূজায়, মাতৃকাবর্ণকৢপ্ত আধারে, গুরুবর্ত্মানুযায়ী দেবীর পূজা করবে। নিরাধারা পূজায়, সংবিদ্‌রূপিণী দেবীতে মনোলয় করবে'। সংবিদ্ = নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানধারা। মনোলয় = আত্মলয় = অদ্বয় আত্মাই 'শুদ্ধব্রহ্ম' এই ভাবে ভাবিত হ'য়ে সাধক স্বয়ং শুদ্ধ 'কেবল' রূপে অবস্থান করবেন।

শব্দের সাধারণ অর্থ ও সাধনক্ষেত্রের অর্থ এক নয়, অথচ অনেকে সেটি না জেনে, সুরুচি ও কুরুচিরূপ নীতিবাদের সংস্কারের দ্বারা চালিত হয়ে ভ্রমে পড়েন। সাগরস্থ = (সাধারণ অর্থ) কামভাবে নরনারীর সংযোগ। সাধনক্ষেত্রের অর্থ পূর্ব্বে বলা হয়েছে। সেই রকম চক্র = (সাধারণ অর্থ) চাকা; সাধনক্ষেত্রে 'চক্র' = বিচরণ, পাদবিক্ষেপ, প্রকাশিত হওয়া, "যৎ এবং চক্রমৎ তচ্চ চক্রমভবৎ"—যে স্থানে বা পীঠে শক্তি আত্মার সঙ্গে বিহার করতে পারেন, তার নাম 'চক্র'—'আত্মসংক্রমণ বিহরণাত্র পীঠঃ'। যখন চণকাকারে শক্তির ক্ষোভ হয়, যখন শক্তি, স্ফুরণভাব 'ঈক্ষণ' করেন (পশ্যন্তিভাব), তখনই তাহা পরিণত হয় 'চক্র' রূপে। এই রূপে যেমন নানা দেবতার উৎপত্তি হয়, সেইরূপ দেহমধ্যে বৃত্তিকেন্দ্রের উদ্ভব হয়;

উপাসনায় দেবতাবোধ পরিস্ফুট হয়; ভূতশুদ্ধি আদিতে বৃত্তিকেন্দ্র সব ভিন্ন হ'যে স্বরূপবোধ আনিয়ে দেয়, যখন ভেদজ্ঞান ও অনাচারাচার ভাবসমূহের সাম্য হ'যে দেবতাবোধ প্রসারিত হয় অর্থাৎ সকলের ইষ্ট—একেরই স্ফুরণ—এই বোধ এনে দেয়, তখন ঐ ভাবকে সাধকেরা 'চক্র' বলেন। দেবীর দুই পাদবিক্ষেপ পূর্ব্বে বলা হয়েছে। একটি পাদক্ষেপণে যে শক্তির প্রসার হয়, তাহাই তাঁর 'আবরণ দেবতা' বা 'চক্র' ও 'আবরণ চক্র'। শক্তির প্রসার সাধারণতঃ নযভাবে দৃষ্ট হয়; (১) কাল—নিমেষ হ'তে প্রলয়, (২) রূপ বা কুল—আকার ও বর্ণ, (৩) নাম, (৪) জ্ঞান—চিৎ, মহত্তত্ত্ব (সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প), (৫) চিহ্ন—মনস্তত্ত্ব—উন্মনী, চিত্ত, বুদ্ধি, মন, অহংকার, (৬) নাদ—রাগ=পরা=মায়া ও ইচ্ছা (পশ্যন্তি)=শুদ্ধবিদ্যা, কৃতি (কার্য্যকরী বাসনা)=মধ্যমা=মহেশ ও প্রযত্ন=সিদ্ধিলাভ চেষ্টা=বৈখরী=সদাশিব, (৬) বিন্দু=ষট্চক্রাদি, (৮) কলা—মূলাধার হ'তে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত ৫১টি অক্ষর, (৯) জীব=দেহাবরণযুক্ত আত্মা। অক্ষরগুলি ভাব মাত্র—পরা হ'তে উদ্ভূত; অতএব পরা=চৈতন্যরূপা। দেবীর প্রকাশ তিন প্রকার='দেবীব্যূহ', যথা 'ভোক্তা', 'ভোগ্য' 'ভোগ'। ভোক্তার অন্তর্গত জীববিভাগ, 'ভোগ'—ইহার অন্তর্গত 'কাল', 'কুল', 'নাম', 'জ্ঞান', 'চিত্ত', 'নাদ', 'বিন্দু', 'কলা'; 'ভোগে'র অন্তর্গত জ্ঞানবিভাগ='জ্ঞানব্যূহ'। ঐ নয় প্রকার রূপ, জীবকে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিযে যখন মুক্ত বা স্বরূপ বোধ আনিয়ে দেন, তখন তাঁর নাম 'আনন্দভৈরব'; যখন তিনি চৈতন্যরূপে প্রকাশমানা, তখন তিনিই 'আনন্দ ভৈরবী'। ঐ দু'যের সামরস্য বা সংযোগে জগৎ দৃষ্ট হয; অতএব আনন্দ+চৈতন্য=জগৎ। এই দু'য়ের মূল উপাদান কারণ পৃথকভাবে প্রতীযমান হলেও অভিন্ন। দেবীর অপর পাদবিক্ষেপে 'গুরু' ও 'গুরুমণ্ডলের' প্রসার হয়। শ্রীগুরু, অমাকলা, আনন্দভৈরব, আনন্দভৈরবীর উল্লেখ পূর্ব্বে হয়েছে, সেখানে আনন্দভৈরব, 'অমৃতার্ণবমধ্যস্থং ব্রহ্মপদ্মোপরিস্থিতং' ও আনন্দভৈরবী 'হিমকুন্দেন্দু ধবলাম্'।

['সামরস্য' শব্দের ন্যায় আরো কতকগুলির সাধারণ অর্থ নিয়ে গোল করা হয়; 'লিঙ্গ' শব্দের বহুল প্রয়োগ দর্শনশাস্ত্রে ও অন্যান্য স্থানে আছে। "আকাশঃ লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা। আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥"

(স্কন্দপুরাণ)। শিবকে 'ব্যক্তযোনি'ও বলা হয়। বৈদিক সাহিত্যে 'ভগ' = পূজনীয় (সায়ন), 'ভগ', বৈদিক সাহিত্যে একজন আদিত্য। সূর্য্যের একটি নাম 'ভগ' (ভগোদয় কাল)। তন্ত্রে, দেবীর এক নাম 'ভগমালিনী'। দেবীকে 'ভগবতী' বলা হয়। "ভগবান", 'ভগধরা'—এই শব্দগুলির মধ্যে ভগ = ঐশ্বর্য্য "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ।" আত্মাই ভূতগণের সৃষ্টির কারণ, বিবেকজা প্রজ্ঞাই আত্মার 'ভগ' (ঐশ্বর্য্য) (অনুগীতা ৩৭ অঃ)। দেবী কুণ্ডলিনীকে 'ভগরূপিণী' বা 'যোনিরূপা' বলা হয়। এ সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।]

Congregational prayer বলতে ধোলো বোঝেন, একসঙ্গে তারস্বরে সবাই মিলে একটি স্তোত্রের বা প্রার্থনার আবৃত্তি, আমাদের সংকীর্ত্তন, পাঁচালি, প্রত্যেক পূজায়, বিশেষ বারোয়ারী পূজায়, সকলের একসঙ্গে অঞ্জলিপ্রদান ও মন্ত্রপাঠ, একসঙ্গে ব'সে ধ্যান, জপ, নাম গান, স্তোত্রপাঠ, একসঙ্গে প্রদক্ষিণ—এগুলি কি? একসঙ্গে উপবাস, রাত্রিজাগরণ—এসব কি? হিন্দুর কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই তিন প্রকার আত্মনিবেদন আছে; একসঙ্গে চীৎকার করলেই Prayer হয় না। যাতে মন সরস হয় ও চিত্তশুদ্ধি উপজাত হয়, এ প্রকার উপায়গুলি অবলম্বন করাকেই হিন্দু 'প্রার্থনা' বলেন।

কুলাচারের পূজায় 'ম'কারাদি কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে সেবন করতে হয়, তন্ত্রশাস্ত্র বহু স্থানে তা বলেছেন। লোভপরবশ হয়ে স্বার্থসুখের জন্য মদ্যাদি পান নিষিদ্ধ। 'বাসনা' সম্যক্ না জেনে কুলপূজায় রত হলে পতন হয়। "যিনি মূলাধার হ'তে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ গতায়াত ক'রে, কুণ্ডলিনীশক্তির সামরস্য সম্পাদনান্তে সহস্রারস্থিত চন্দ্রক্ষরিত অমৃত পান করেন তিনি সুধাপায়ী—অপরে মদ্যসেবক, যিনি পুণ্য ও অপুণ্য—এই পশুদ্বয়কে জ্ঞানখড়্গে হনন করেন ও চিত্তকে 'পরতত্ত্বে' লয় করেন, তিনিই মাংসাশী—এবং যিনি ইন্দ্রিয় মনকে সংযম ক'রে আত্মায় যোগ করতে পারেন তিনি মৎস্যাশী—অপরে জীবহিংসা করে; পশুর শক্তি অপ্রবুদ্ধ, কৌলের জাগ্রত, এই জাগ্রত শক্তির যিনি সেবা করেন, তিনি শক্তিসেবক। পরাশক্তির আত্ম-মিথুন সংযোগানন্দে নির্ভরতাই মৈথুন—অপরে কেবল স্ত্রীসঙ্গমকারী।" 'বাসনা'য় অনুপ্রাণিত হ'য়ে

বাহ্যাচারের মধ্য দিয়ে 'বীর' সাধকের ভোগ ও আনন্দ। মন্ত্রার্থ-স্ফুরণের জন্যই—একাগ্রতার জন্যই ইষ্টপ্রীত্যর্থে 'বীরের' 'ম'কার স্বীকার। বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ঐ 'ম'কার সেবন, বীর সাধক যখন তখন করতে পারেন না, "মৎস্য মাংস সুরাদীনাং মাদকানাং নিষেবনং। যাগকালং বিনান্যত্র দূষণং কথিতং প্রিয়ে।" (কুলার্ণব, ৫ম উঃ ৮৯)। যাগকাল অর্থাৎ সাধন বা পূজার সময় ব্যতীত 'বীর' কোন 'ম'কারই অঙ্গীকার করেন না। গৃহস্থের সাধারণ পূজা পুরোহিত করেন। তন্ত্রে—সাধনভাবের পূজায় (বাসনা জেনে পূজায়) পুরোহিত নিয়োগ নিষিদ্ধ; সে স্থলে সাধক নিজে পূজা করবেন, বা সাধকের দ্বারাই পূজা করাবেন, কদাচ পুরোহিতের দ্বারা পূজা করাবেন না—ইহা তন্ত্রের অনুজ্ঞা। বীরের ঐ 'যাগকাল' নিত্য হয় না; মাসে একবার অথবা বৎসরে একবারের বিধিও দৃষ্ট হয়। নিত্যকর্ম্মে, সাধক অন্তর্যাগকে প্রধান ক'রে সাধারণ ভাবে পূজা ক'রে যাবেন, মনকে অন্তর্যাগের জন্য প্রস্তুত করবেন; যাগকালে, বিশেষভাবে পূজা করবেন—গুরূপদিষ্টমার্গে। যাঁরা নিরামিষাশী ব'লে গর্ব্ব করেন, তাঁদের চেয়ে বীর সাধকেরা অধিকাংশ স্থলে সংযমী। যিনি বরাবর যা নিত্য আহার করেন, যা তাঁর অভ্যাস আছে, তা নিত্য ব্যবহার সাধক করতে পারেন। বীর সাধক 'প্রসাদ' ভিন্ন যত্র তত্র ভোজন করেন না, যখন করেন, আহারীয় দ্রব্য নিবেদন না ক'রে গ্রহণ করেন না—সবই তিনি কুণ্ডলিনীমুখে আহুতি দেন ('জুহোমি'—কুণ্ডলিনীমুখে)। দেবোদ্দেশ্য ছাড়া, কুলাচারী,—"অনিমিত্তং তৃণং বাপি চ্ছেদয়ন্ন কদাচন" (কুলার্ণব, ৫ম উঃ ৪৪)—বৃথা তৃণ পর্য্যন্ত নষ্ট করবেন না।

["সেবেত মধুমাংসানি তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী॥ ৮৬॥ মন্ত্রার্থস্ফুরণার্থায় মনসঃ স্থৈর্য্য হেতবে। ভবপাশ নিবৃত্ত্যর্থং মধুপানং সমাচরেৎ॥ ৮৭॥ সেবেত স্বসুখার্থং যো মদ্যাদীনী স পাতকী। প্রাশয়েদ্দেবতা প্রীত্যৈ স্বাভিলায বিবর্জ্জিতঃ" ॥ ৮৮ (কুলার্ণব ৫ম উঃ)। "শ্রীগুরোঃ কুলশাস্ত্রেভ্যঃ সম্যক্ বিজ্ঞায় বাসনাম। পঞ্চমুদ্রা নিষেবেত চান্যথা পতিতো ভবেৎ॥" (ঐ. ঐ. ৯১)। "আমূলাধারমাব্রহ্মরন্ধ্রং গত্বা পুনঃপুনঃ। চিচ্চন্দ্র কুণ্ডলী শক্তি সামরস্য সুখোদয়ঃ॥ ১০৭॥ ব্যোমপঙ্কজনিস্যন্দ সুধাপানরতো নরঃ। সুধাপানমিদং প্রোক্তমিতরে মদ্যপায়িনঃ॥ ১০৮॥ পুণ্যাপুণ্য পশুং হত্বা জ্ঞানখড়্গেন যোগবিৎ। পরে লয়ং নয়েচ্চিত্তং ফলাশী ন নিগদ্যতে॥ ১০৯॥

মনসা চেন্দ্রিয়গণং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ। মৎস্যাশী স ভবেদ্দেবী শেষোঃ স্যুঃ প্রাণীহিংসিকাঃ ॥ ১১০ ॥ অপ্রবুদ্ধো পশোঃ শক্তিঃ প্রবুদ্ধা কৌলিকস্য চ। শক্তিং তাং সেবয়েৎ যস্তু স শক্তি সেবকঃ ॥ ১১১ ॥ পরাশক্ত্যাত্মমিথুনসংযোগানন্দ নির্ভরঃ। য আস্তে মৈথুনং তৎ স্যাদপরে স্ত্রীনিষেবকাঃ ॥ ১১২ ॥ পঞ্চমুদ্রাণাং বাসনাং কুলনায়িকে। জ্ঞাত্বাগুরুমুখাদ্দেবি যঃ সেবেত স মুচ্যতে" ॥ ১১৩ (ঐ. ঐ)।]

তন্ত্রশাস্ত্র বারবার বহু স্থানে সকলকে সাবধান করেছেন, কোন স্থানে বলেছেন যে কদাচ তন্ত্রের কূটার্থ করবে না, অন্য স্থানে বলেছেন যে, বাক্যার্থ ধ'রে তন্ত্র বুঝতে কখন চেষ্টা করবে না—গুরুবাক্য ও বাসনা জেনে অর্থ বুঝবে, ইত্যাদি; নতুবা বিপদ, কারণ "কৃপাণধারাগমনাৎ ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ। ভুজঙ্গধারণান্নূমশক্যং কুলবর্ত্তনম্।" (কুলার্ণব ২য় উঃ ১২২)।—'তরওয়ালের মুখের আগায় চলার মত, বাঘের কণ্ঠ অবলম্বনের মত, সাপ নিয়ে খেলার মতই কুলবর্ত্তন বা কুলাচার।' উদাহরণ স্বরূপ, ঐ তন্ত্রের ৭ম ও ৮ম উল্লাসের বর্ণনা পড়া যেতে পারে। ৭ম উল্লাসের "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে। উত্থায চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। আনন্দাত্তৃপ্যতে দেবী মূর্চ্ছয়া ভৈরবঃ স্বয়ম্। বমনাৎ সর্ব্বদেবাশ্চ ত্রিবিধমাচরেৎ ॥ দিব্যপান রতানাং বৈ যৎ সুখং কুলযোগিনাম্। তৎসুখং সার্ব্বভৌমস্য নৃপস্যাপি ন বিদ্যতে" ॥ ইহাতে সাধকের যে অবস্থা হয়, তার বর্ণনা আছে, সাধকের ঐ অবস্থায় তাঁর জল্পনাই জপ, বিক্রিয়া বা ঘুরে বেড়ানই পূজা, উর্দ্ধে উত্থান—ভৈরববলি, শক্তিসংযোগ মুক্তি, অবয়ব স্পর্শ—ন্যাস, বীক্ষণ—ধ্যান, শয়ন—বন্দনা, ভোজন—হোম (বমন), ঐ অবস্থায় পুরুষ, প্রকৃতির ঘাড়ে পড়ে, ইত্যাদি রূপ বর্ণনা আছে। উক্ত শ্লোকগুলিকে অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলতে চেয়েছেন। প্রক্ষিপ্ত ও আবর্জ্জনা সব তাতেই ঢুকেছে, কিন্তু নিজের মনোমত না হলেই কোনটা প্রক্ষিপ্ত হয় না। প্রক্ষিপ্ত বাছাই করবারও একটা নিয়ম আছে। সাধনরাজ্যে ভাবের দিক দেখতে হয়, মনে রাখতে হবে যে, ভাবের গাঢ়ত্বে ভাষাও বদলে যায়। উক্ত শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলা যেতে পারত যদি ১০২এর শ্লোকে "দিব্যপানরতানাং বৈ যৎ সুখং" ইত্যাদি বাক্য না থাকত। উক্ত শ্লোকগুলি স্পষ্টতঃ দিব্যভাবের কথা। ৫ম উল্লাসে উক্ত হয়েছে যে, তিনিই সুধাপায়ী যিনি মূলাধার হ'তে ব্রহ্মরন্ধ্র

পর্য্যন্ত 'পুনঃ পুনঃ' গতায়াত ক'রে সহস্রার ক্ষরিত অমৃত পান করেন। এই যে বারবার গতায়াতজনিত সুধাপানের মত্ততা, তার আনন্দ যথার্থই "সার্ব্বভৌম নৃপস্যাপি ন বিদ্যতে"—সম্রাটেরও ও রকম আনন্দপ্রাপ্তি অসম্ভব। দিব্যপানই দিব্যভোগ। পরিষ্কার অন্তর্যাগের কথা এখানে বলা হয়েছে। যেখানে আমাদের ধুরন্ধরেরা, শিব গাঁজার দম্ চড়িয়েছেন মনে করেছেন, সেখানে বিদেশী Woodroffe সাহেবও ঐ 'পান'কে "Yoga drinking" বলেছেন! ঐ অবস্থার কল্পনা, বিক্রিয়া প্রভৃতিকে অন্তর্যাগের ফলস্বরূপ সাধকের ভাবাবস্থা ব'লেই দৃঢ় ধারণা হয়, কারণ, পূজার সময় জল্পনা, ঘুরে বেড়ান, হৈ হৈ করা বা ঘটচালনা করা একেবারে নিষিদ্ধ সকল তন্ত্রশাস্ত্রে। তা ছাড়া, ঐ কুলার্ণবে, অপরাপর তন্ত্রশাস্ত্রের মতই, ৫ম উল্লাসে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে যে মত্ত মাতালকে পূজাস্থল হ'তে দূর ক'রে দেবে। "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতং। তস্যাভিব্যঞ্জকং মদ্যং যোগিভিস্তেন পীয়তে॥" (ঐ ৫ম উ ৮০)। 'আনন্দই ব্রহ্মের রূপ, মদ্য তার অভিব্যঞ্জক—যোগীরাই তা পান করেন।' অতএব, উক্ত পান—দিব্যপান। এই আনন্দ আমাদের মধ্যেই আছে ('দেহে ব্যবস্থিতম্')। অন্যত্র বলা হয়েছে যে পূজার উপকরণই আনন্দের প্রতিনিধি। গুরুই তত্ত্বত্রয় স্বরূপ—এই জ্ঞানে সাধক জীবন্মুক্ত হন। অষ্টম উল্লাসে, উল্লাসের স্বরূপ বর্ণনা আছে। উল্লাস ৭ রকম—আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, তদন্ত, তত্তঃ ('অনবস্থ' বা)। সাধকের সাধনেচ্ছা যখন জাগ্রত হয়, দেহমন প্রফুল্ল হয়, সেই অবস্থার নাম 'আরম্ভ'; যখন সুখ বা আনন্দের আভাস আসে তার নাম 'তরুণ'; আনন্দ স্থায়ীভাব ধারণ করবার উপক্রম হ'লে, তার নাম 'যৌবন' বা মধ্য অবস্থা; ইষ্টে তন্ময়মুখী ভাবই 'তদন্ত'; ইষ্টে মনোলয় সামর্থ্যই 'প্রৌঢ়'—"স্খলনং দৃঙ্মনোবাচাং প্রৌঢ়মিত্যভিধীয়তে।" মন কখন বা তন্ময়, কখন বা তন্ময়মুখী (চেষ্টা)—এই ভাবের নাম 'প্রৌঢ়ান্ত' বা 'তদন্ত'; 'উন্মন' অবস্থায়, মন কিয়ৎকালের জন্য সমাধিস্থ হয়; এই অবস্থা আসা যত্নসাধ্য; যখন সমাধি সহজে ভাঙ্গে না, সাধক স্থির হয়ে অবস্থান করেন, সেই অবস্থার নাম 'তত' বা 'অনবস্থ'। 'আরম্ভ' হ'তে 'তদন্ত' পর্য্যন্ত সাধক উন্মনাভিমুখী থাকেন; 'প্রৌঢ়ান্ত' ('তদন্ত') অবস্থা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব, 'উন্মনা'—

পূর্ণ অনাসক্তির ভাব, 'তত'—পরামন্ত্র বা হংসস্বরূপাবস্থা। 'প্রৌঢ়ান্ত' পর্য্যন্ত, 'জাগ্রত' অবস্থা, 'উন্মনা'—স্বপ্ন, 'অনবস্থা'—সুষুপ্তি; সপ্তম উল্লাসই তুরীয়াবস্থা। উল্লাসে, "অষ্টাবস্থাশ্চ কম্পাদৌ জায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ"—কম্পাদি অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার দেখা দেয় (কু. ৮ উ ৯১)। সপ্তোল্লাস-বেত্তাই কৌল। প্রৌঢ়োল্লাসে সাধক 'পান' বন্ধ করবেন (যাঁরা পান করেন), সাধক তখন নিশ্চিন্ত হবেন। ইতিপূর্ব্বে সাধকের ভাব-রাজ্যে বিচরণ-কথা ('জল্প' আদি) বর্ণিত হ'য়েছে—কুণ্ডলিনীর উত্থানকালীন অবস্থাই ঐ ভাবে বর্ণিত।

["স্থূলান্তমাত্মতত্ত্বং স্যাৎ সূক্ষ্মং বিদ্যান্তগোচরম্। পরান্তং শিবতত্ত্বং স্যাদিতি তত্ত্বত্রয়ং জগৎ ॥ ৩৭ ॥ এবং তত্ত্বত্রয় জ্ঞানং গুরোর্জ্ঞাত্বা য আচরেৎ। স জীবন্নেব মুক্তঃ স্যাদিতি শঙ্করভাবিতম্ ॥ ৩৮ ॥ (কুলার্ণব ৭ম উঃ)। "আরম্ভস্তরুণশ্চৈব যৌবনং প্রৌঢ়মেব চ। তদন্তোশ্চোন্মনাশ্চৈব ততোল্লাসশ্চ সপ্তমঃ ॥ ৪ ॥ তত্ত্বত্রয় স্যাদরম্ভঃ কথিত কুলনায়িকে। কথিত (পাঠান্তর 'কায়ত') স্তরুণোল্লাসস্তরুণং সুখমন্বিকে ॥ ৫ ॥ যৌবনং মনসঃ সম্যগুল্লাসঃ সুস্থিতিঃ প্রিয়ে। স্খলনং দৃঙ্মনোবাচাং প্রৌঢ়মিত্য-ভিধীয়তে ॥ ৬ ॥ (কুলার্ণব ৮ম উঃ)। "আরম্ভস্তরুণশ্চৈব যৌবনং প্রৌঢ়মেব চ। তদন্তো জাগ্রদিত্যুক্ত শ্চোন্মনাঃ স্বপ্ন উচ্যতে ॥ অনবস্থা সুষুপ্তিস্যাৎ অবস্থাত্রয়সংযুতা। সপ্তোল্লাসঞ্চ যো বেত্তি স মুক্ত স চ কৌলিকঃ ॥" (ঐ ৮ম উঃ ৯৪, ৯৫)। "প্রৌঢ়োল্লাসে কুলেশানি কুর্য্যাদলি বিসর্জ্জনম্" ॥ (ঐ ঐ ২৭)।]

পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, উত্থানকালে দেবী কুণ্ডলিনী প্রতিচক্রস্থিত শিববিগ্রহের সঙ্গে রমণ করতে করতে অগ্রসর হন ও প্রতিচক্রস্থ সমস্ত দেবদেবী উল্লিখিতভাবে কুণ্ডলিনীর ঘাড়ে পড়েন—কুণ্ডলিনী-শরীরে পড়েন ও বিলীন হন। বিশুদ্ধ বা কণ্ঠস্থান—আকাশ স্থান। আকাশই লিঙ্গ, এই লিঙ্গ কুণ্ডলিনীমুখে প্রবিষ্ট হন। ঐ স্থানের বর্ণিত 'উপদংশ' শব্দটি= 'মুদ্রা' (যেভাবে পরিণতি হয়)=(সাধারণ অর্থ)=যা চর্ব্বণ করা যায়—ভোগ মুদ্রা। (কবিরাজী অর্থের সঙ্গে এখানে কোন সম্পর্ক নেই)। 'ভাবতী' বা বিশুদ্ধ চক্র ভেদ করতে পারলেই, মন আপনি উন্মনীতে চলে যায়। অলি বিসর্জ্জন করতে হয়, আনন্দজনিত মোহ ত্যাগে আনন্দ বিস্তৃতাকার ধারণ করে—আনন্দ ক্রমবর্দ্ধিত হ'তে থাকে। "উন্মনাঃ পতনোত্থানে মূর্চ্ছনা চ মুহুর্মুহুঃ। উন্মাখ্য তদুল্লাসে চক্রে বীর সমর্চ্চিতে"

(ঐ. ঐ. ৮১)। দিব্যভাবপ্রধান বীবই উল্লাসেব অর্চ্চনা করেন। যখন দেহ ও ইন্দ্রিয় অবশ হয়, সেই অবস্থাব নাম 'সমাবস্থা'; তারপব সবই মন্ত্রময বোধ হয়—পবামন্ত্রস্বৰূপতা আসে। "সন্নিকর্ষোহিমূলং" অর্থাৎ ইহাব তিন স্তব—অন্তর্লক্ষ্যো বহির্দৃষ্টির্নিমেষোন্মেষবৰ্জ্জিতঃ। এষা তু শাম্ভবী মুদ্রা সৰ্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥" (ঐ. ঐ. ৮৫)। 'সামবস্য সমাকৃতি' বীব, সাক্ষাৎ দেবীব স্বৰূপ। ইহাই তত্ত্বত্রয়োল্লাস। আনন্দজনিত মোহই সাধককে প্রলুব্ধ কবে; এই মোহ থাকলে আনন্দেব সংকোচ হয়, আব বাড়ে না। এই মোহ ত্যাগ কবতে হয, এই বকম ত্যাগশক্তিই সাধকেব 'ভগ' বা ঐশ্বর্য্য। পবমব্যোমে—সহস্রাবে শিব-শক্তিব সংযোগানন্দই—চণকাকারে উপস্থিত হওয়াই—'ভগ-লিঙ্গামৃত', ইহাই 'কৌল-সন্ধ্যা'। আনন্দেব অবস্থাক্রমই উল্লাস। 'আবম্ভ' হ'তে 'প্রৌঢ়ান্ত' পর্য্যন্ত ঐ আনন্দচক্র, প্রথম 'উন্মনাব' সম্মুখীন হয়, পবে হয 'তত'ব সম্মুখীন। [তন্ ধাতুব উত্তব কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয়ে তত=যা নিববচ্ছিন্নভাবে বহু দেশ ব্যাপিয়া আছে; 'তত্ত্ব'= (তন+কর্ত্তৃবাচ্যে ক্বিপ, 'তৎ'এব ভাব) যা সৰ্ব্বভূতেব ভোগ প্রদানকারী হ'য়ে আপ্রলয় পর্য্যন্ত থাকে, সুতবাং শবীব, ঘট ইত্যাদিকে 'তত্ত্ব' বলা যায় না।]

["দেহেন্দ্রিয়াণামবশঃ সমবস্থা ('শ্চানবস্থা' ইতি বা পাঠঃ) নিগদ্যতে। সমবস্থাভিধে তস্মিন তত্ত্বল্লাসে সমং ভবেৎ ॥ ৮৩ ॥ পরামন্ত্রস্বৰূপোঽহসৌ জায়তে মূর্চ্ছনাপবা। মূর্চ্ছনং সন্নিকর্ষোহি মূলং মুক্তেঃ পরং বিদুঃ ॥ ৮৪ (ঐ ৮ম উঃ)। "সৰ্ব্বোত্তীর্ণা সদাঽহন্তা সামরস্য সমাকৃতিঃ। অনয়োল্লাসিনো বীবা শিবা এব ন সংশয়ঃ ॥ ৮৬ (ঐ. ঐ.)। "মধুকুম্ভ সহস্রোস্ত মাংসভার শতৈরপি। ন তুষ্যামি বরারোহে ভগলিঙ্গামৃতং বিনা ॥ ন চক্রাঙ্কং ন পদাঙ্কং চ তস্মাচ্ছক্তি শিবোক্তকম্। শিব-শক্তি সমাযোগো যস্মিন্ কালে প্রজায়তে, সা সন্ধ্যা কুলনিষ্ঠানাং সমাধি স বিধীয়তে" ॥ (ঐ. ঐ. ১০৭—১০৯)। তত্ত্ব="আপ্রলয়ং যৎ তিষ্ঠতি সৰ্ব্বেষাং ভোগদায়ি ভূতানাম্। তৎ তত্ত্বমিতি প্রোক্তং ন শবীব ঘটাদি তত্ত্বমতঃ" ॥ তন্=বিস্তার, বিস্তৃতিই ব্যাপ্তি। যিনি সৰ্ব্বদেশ ও সৰ্ব্বকাল ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহার নাম তৎ। ব্রহ্ম সৰ্ব্বদেশ ও সৰ্ব্বকাল ব্যাপিয়া আছেন, এই জন্য ব্রহ্মেব নাম 'তৎ'। 'তৎ'এর যে ভাব বা ধৰ্ম্ম, তাহার নাম 'তত্ত্ব'। শিবাদি পৃথিব্যন্ত ষট্‌ত্রিংশৎ পদার্থ ঐ ব্রহ্মের ভাব বা ধৰ্ম্ম, এই জন্য ইহাদেব নাম 'তত্ত্ব'।" কৌলমার্গ রহস্য দ্রঃ।]

উল্লিখিত উল্লাস বর্ণনাব লক্ষণ 'অমনস্কবিববণেব' সঙ্গে মিলিয়ে পডলে বোঝাবাব সুবিধা হবে। "স্পর্শনং পবতত্ত্বং স্যাদুত্থানঞ্চ পুনঃ পুনঃ। ঘর্ম্মশান্তি ('মর্ম্মশান্তি' ইতি বা পাঠঃ) প্রজাযতে মুহুর্নিদ্রা চ মূর্চ্ছনা॥" (অমনস্কবিববণং ৩১)। 'স্পর্শ' অর্থাৎ সাধক যখন চণকাকাব স্পর্শ কবেছেন।

[পবতত্ত্ব = "যস্মাদুৎপাদ্যতে সর্ব্বং যস্মিন সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম। যস্মিন বিলীয়তে সর্ব্বং পরং তত্ত্বং তদুচ্যতে॥ ভাবাভাববিনির্ম্মুক্তং নাশোৎপত্তি বিবর্জ্জিতম। সর্ব্ব সঙ্কল্পনাতীতং পরং তত্ত্বং তদুচ্যতে॥ অগোচবমবিচ্ছিন্নমবগ্রাহ্যং চলং ধ্রুবম। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং সর্ব্বকামবিবর্জ্জিতম॥" (ঐ ৬-৮)।]

অর্থাৎ যাতে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয তাহাই পবতত্ত্ব, যা নাশোৎপত্তি বিবর্জ্জিত, ইন্দ্রিয়াতীত, অখণ্ড অবগ্রাহ্য সত্যস্বরূপ, উপাধিবর্জ্জিত ও অকাম, তাহাই পবতত্ত্ব। এই পবতত্ত্বেব সাধন হয়—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই চিন্তাব অভ্যাস দ্বাবা।

["তত্ত্বস্য সম্মুখে জাতে হ্যমনস্কং প্রজায়তে। চিন্তাদি বিলয়ে জাতে পবনস্য লয়ো ভবেৎ॥ ১৬॥ মনঃ পবনয়োর্নাশাদিন্দ্রিযার্থান বিমুঞ্চতি। ইন্দ্রিয়ার্দৈর্যথা মুক্তো বাহ্যজ্ঞানং ন জায়তে॥ ১৭॥ · বাহ্যজ্ঞানে বিনষ্টে চ ততঃ সর্ব্বসমোভবেৎ"॥ (ঐ)।]

"স্পর্শনং পবতত্ত্বং স্যাদুত্থানঞ্চ পুনঃ পুনঃ"—এখানেও পুনঃ পুনঃ কথা দুটি লক্ষ্য কবতে বলি।

পবতত্ত্বেব সম্মুখীন হ'লে—অমনস্ক প্রাপ্তিতে—সাধকেব মন স্থিব হয়। চিন্তাব বিলয়ে মনেরও লয় হয়, মন ও পবন (মনেব গতি) নাশে ইন্দ্রিয়েব বিষয়সমূহ থাকে না, অতএব বাহ্যজ্ঞানও বিলুপ্ত হয়। বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হলে 'সর্ব্বসম' অবস্থা হয়। সমাধি ভিন্ন অন্য কিছুতে ইষ্টেব (দেবতাব) পূর্ণ প্রীতি হয না—"ন তুষ্যামি ববারোহে"—মা আডম্বব ও জাঁকজমকে ভোলেন না।

ঋগ্বেদ ৮।৬।১০ম—১১৯ সূক্তেও দেখি যে, সাধকেব পুনঃ পুনঃ সোমপানে সাধককে এতদূব 'উন্ম' (মনকে উন্নমিত কবেছে) যে তাঁব স্বরূপজ্ঞান স্ফুবিত হয়েছে, "মহামহোভিনুভ্যমুদীষিতঃ"...—'আমি মহতেব মহৎ, অনন্ত পথে আমার গতি...সকলেই আমাকে স্তব করে, আমিই "দেবেভ্যো-হব্যবাহনঃ", আমি সাধক-হৃদয়েব মতি—"হৃদা মতি"—আমি পৃথ্বীকে

দগ্ধ করতে পারি, সর্ব্বস্থান ধ্বংস করতে পারি, আকাশ আমার এক পার্শ্ব মাত্র…।' তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লাস বর্ণনায় দিব্য ভাবের কথা—পূর্ণাভিষিক্ত বীর সাধকের কথা—উল্লাসের অবস্থা বর্ণনায় যে ইঙ্গিত আছে, তাতে অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। অনেকে রূপক বা আধ্যাত্মিক অর্থ পছন্দ করেন না; কিন্তু যেখানে 'বাসনা' পূর্ব্বে ব'লে দেওয়া হয়েছে ও তদনুরূপ শ্লোক রচিত হ'য়েছে, সেখানে আধ্যাত্মিক অর্থ ভিন্ন উপায় কি? তা ছাড়া, সাধন যখন স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর, তখন সাধকের অবস্থা অনুসারে সেইরূপ অর্থই করতে হবে। আধ্যাত্মিক অর্থ আজকাল যেরূপ দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত, তাতে এ রকম অর্থ যে বিকৃত ভাব ধারণ করবে তাতে আর সন্দেহ কি? সাধারণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত অর্থ ছেড়ে দিলেও, অনধিকারীর কাছে ভাব প্রচ্ছন্ন রাখবার জন্য কোন কোন স্থলে 'সান্ধ্যভাষার' প্রয়োগও দৃষ্ট হয়। এগুলির অর্থ জানতে হয়। অনেক স্থলে বিশেষ পরিভাষা আছে, সে সবের অর্থও শাস্ত্রে দেওয়া আছে।

[Avalon সাহেব একস্থানে বলেছেন "There are many other technical terms in the Tantra Shastra which it is advisable to know before criticising" অর্থাৎ এরূপ বহু পারিভাষিক শব্দ তন্ত্রশাস্ত্রে আছে যে, সেগুলির অর্থ না জেনে সমালোচনা করতে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। উদাহরণ স্বরূপ,—করবীর পুষ্প = লিঙ্গ; অপরাজিতা পুষ্প = মাতৃযোনি, বিল্বপত্র = ভগিনীর স্তন, কুণ্ডলিনী ও জীবাত্মা = ভগিনী ও ভ্রাতা, ইত্যাদি।]

সুষুম্নার মধ্যেই সমস্ত চক্র। সহস্রার হ'তে নানা নাড়ী প্রসূত হয়ে শরীরের সর্ব্বস্থানে রয়েছে। তাই কুণ্ডলিনীর উত্থাপনে তত্ত্ববিৎ সাধকেরা প্রতি নাড়ীর স্বরূপ জানতে পারেন ও প্রতি চক্রজাত আনন্দ উপভোগ করতে করতে অগ্রসর হন—যোগ ও ভোগ একসঙ্গেই হয়। কুণ্ডলিনী একে একে সবই গ্রাস করেন। আকাশ গ্রাস করেন, সামনে খাড়া হয় মন, মন যায়—খাড়া হয় বুদ্ধি; তাও যায়—খাড়া হয় 'অহংবোধ'—এইরূপে 'চিত্ত', 'ক্ষেত্রজ্ঞ'—সবই পরমাত্মায় বিলীন হয়! এ যেন ধ্রুপদের পরদার পর পরদার লয়—সাধারণ কীর্ত্তনের হুস্ ক'রে ওঠা, ভুস্ ক'রে নেমে যাওয়া নয়। কুণ্ডলিনীর কূজন থামলেও ধক্ ধক্ শিবের ত্রিনেত্র জ্বলতে থাকে!

["রক্তস্তু করবীরং বৈ তথা কৃষ্ণাপরাজিতা। এতৎ প্রোক্তং লিঙ্গ-যোন্যোঃ পুষ্পং

তত্র তু যোজয়েৎ।" (যোগিনীতন্ত্র)। ঐ দুই পুষ্প পঞ্চমকারের প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হয়। হস্তাঙ্গুলীর পর্ব্বগুলিকেও 'মাতৃযোনি' বলা হয়।]

মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে যে ভাবোন্মাদ দেখা দিত ও উত্তেজনার সৃষ্টি হত, তাতে নৃত্যরত ভক্তেরা কে কার ঘাড়ে পড়তেন তার ঠিক থাকত না। গৌরাঙ্গদেবের বিরহোন্মাদ বর্ণনায়, বৈষ্ণব কবি, "আরে মোর গৌর কিশোর। নাহি জানি দিবানিশি, মনের ভরমে পঁহু ভোর। খেনে উচ্চৈস্বরে গায়, কারে পঁহু কি সুধায়, কোথায় আমার প্রাণনাথ। খেনে শীতে অঙ্গ কম্প, খেনে খেনে দেয় লম্ফ, কাঁহা পাও, যাও কার সাথ। খেনে উর্দ্ধবাহু করি, নাচি বোলে ফিরি ফিরি, খেনে খেনে করয়ে প্রলাপ। খেনে আঁখিযুগ মুদে, হা নাথ বলিয়া কাঁদে, খেনে খেনে করয়ে সন্তাপ।" কবির আর এক বর্ণনা, "দোঁহে কহে দুঁহু অনুরাগ। দুঁহু প্রেম দুঁহু হৃদে জাগ। দুঁহু দোঁহা করু পরিহার, দুঁহু আলিঙ্গই কতবার। দুঁহু বিম্বাধর দুঁহু দংশ, দুঁহু জন সজল নযান্। দুঁহু ভুজ-পাশপরি দুঁহু জন বন্ধন, অধর সুধা করি পান।" রাসগীতায়, "পুষ্পিতে মাধবীকুঞ্জে পুষ্পতল্লোপবিস্থিতং। বিপরীত রতাসক্তং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্॥ রাসক্রীড়া পরিশ্রান্ত মধুপান পরায়ণং…।" ইত্যাদি। তীক্ষ্ণতর উদাহরণ আর বাড়াতে চাই না। আমাদের তৈরী ভাষায় ভাবপ্রকাশ করতে হয়। প্রাকৃত কামবর্জ্জিত অহৈতুক প্রেম ভাষায় এঁকে দেখাতে হয়, চিত্রকে জীবন্ত করতে হয়। এসব রূপক—রূপক ও বাস্তব দুইই, দেবত্ব ও মানবত্ব, একাধারে। সাধকের দৃষ্টি দিয়ে এসব বুঝতে হয়। উল্লাস বর্ণনার সঙ্গে বৈষ্ণব কবিদের বর্ণনা তুলনা করতে বলি।

দিব্য ও বীরের সাধনা সম্বন্ধে যোগিনীতন্ত্রে, "তৎ যোগদভবৎ কৌলো দিব্য বীর মহেশ্বরী।" ইত্যাদি; 'দিব্য ও বীর সাধক তাঁরাই যাঁরা 'তৎ' যোগ অনুষ্ঠান করেন। যিনি ঐ 'তৎ'যোগ ব্যতীত অর্থাৎ 'তৎ' ভাবে ভাবিত না হ'য়ে 'তৎ' উদ্দীপক কর্ম্ম করেন, তিনি কেমন ক'রে মুমুক্ষু হবেন?" তৎ=সেই=ব্রহ্ম—'ওঁ তৎ সৎ', 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের 'তৎ'। "তৎস্বরূপিণী" প্রভৃতি ব'লে যা করা যায় তাকে বলে 'তৎ কর্ম্ম', এসব কর্ম্ম 'তৎ' উদ্দীপক। 'তৎ' ভাবে মন স্থির রেখে, 'তৎ' ভাবে ভাবিত হয়ে কর্ম্ম করাই 'তৎযোগ'। এই ভাব দৃঢ় যাঁদের তাঁরাই মুমুক্ষু।

দিব্য ও বীরের লক্ষ্য এক—মাত্র চিন্তাধারার পার্থক্য। দিব্যসাধক, "আত্মানং পরং ব্রহ্ম চিন্তযেদথবা নচেৎ। আত্মদেহং স্বেষ্টরূপং পরিচিন্তয়েৎ॥ ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ তথা সর্ব্বং স্বরূপেন বিভাবয়েৎ।" ইহাই 'তৎযোগ' বা 'দিব্য যোগ'। 'বীরযোগ', "কামকলারূপং স্বাত্মদেহং বিচিন্তয়েৎ।" নিজ শরীরই কামকলা—বীরের ইহাই চিন্তনীয়। জ্ঞানসংকলনীতন্ত্রে, "ন বেদং বেদমিত্যাহুর্বেদ ব্রহ্ম সনাতনম্। ব্রহ্মবিদ্যা রতো যস্ত স বিপ্রো বেদপারগঃ॥" 'বেদ নামধেয় বই বেদ নয়—ব্রহ্মই বেদ, ব্রহ্মবিদ্যারত ব্যক্তিই বিপ্র ও বেদপারগ।

তন্ত্রে প্রচ্ছন্ন ভাষার স্বরূপ ব্যাখ্যা গুরুপরম্পরায় চলে আসছে; ঐ সব ব্যাখ্যা সাধনবর্জ্জিত লোকের হাতে প'ড়ে বিকৃত হয়েছে। গুরূপদিষ্ট মার্গে না গিয়ে, আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে, যদি অন্য শ্রেণীর সাধকও নিজেকে 'সবজান্তা' মনে ক'রে ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর হন, তিনিও ভ্রমে পড়বেন। 'সান্ধ্যভাষা' ছাড়া আর এক প্রকার ভাষার ব্যবহার, তন্ত্রে দুএক স্থলে দেখা যায়, সেগুলি 'ব্যাকুলিতাক্ষরে' লিখিত। এগুলি 'কুহেলিকাচ্ছন্ন সংকেত লিপি' (mystic symbol) নয়। ব্যাকুলিতাক্ষরে প্রথম অক্ষর থাকে অষ্টম স্থানে, ২য় অক্ষর থাকে চতুর্থ স্থানে। ব্যাকুলিতাক্ষরে যে শ্লোক তৈরী হয়, সেগুলি ঐ রকম ক'রে পড়তে হয়। Avalon সাহেব, তন্ত্ররাজতন্ত্রে তাঁর 'Introduction'এ একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—মদ্যপ্রস্তুত প্রণালী ঐভাবে লিখিত। তান্ত্রিক সাধক, অন্তরঙ্গ ছাড়া, তাঁর সাধনার স্থলে অপর কাহাকেও প্রবেশ করতে দেন না। ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারও বলতে পারেন যে, যখন 'কম্পাউণ্ডিং রুমে' ওষুধ তৈরী হয় তখন অপরের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। মহাপ্রভু বলতেন, "বহিরঙ্গ সনে করি নাম সংকীর্ত্তন, অন্তরঙ্গ সনে করি রস আলাপন।" তত্ত্ব বুঝতে কারোর নিষেধ নেই, কিন্তু সাধনব্যাপারে কুতূহলী হ'লে হাতেনাতে সব করতে হয়। কুলজ্ঞানের অধিকার মানুষ মাত্রেরই আছে, এ কথা তন্ত্র জোর ক'রেই ঘোষণা করেন, এখানে স্ত্রী শূদ্র নেই, ম্লেচ্ছ চণ্ডাল নেই; কিন্তু শাস্ত্রব্যুৎপত্তি দ্বারা এই শাস্ত্রের জ্ঞান, পেঁচার সূর্য্যজ্ঞান সদৃশ, আর তন্ত্রে কূটার্থ গ্রহণে পতন—এইগুলি জেনে রাখতে হবে।

["এতস্মিন শাম্ভবে শাস্ত্রে ব্যক্তার্থপদবৃংহিতে কূটেনার্থং কল্পয়ন্তঃ পতিতা

বাস্ত্যধোগতিম্ ॥" (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—১১উঃ১৬৯)। "তন্ত্রার্থং শাস্ত্রব্যুৎপত্ত্যা জ্ঞাতুমিচ্ছতি যঃ পুমান্। স এবান্ধো বিজানীয়াদুলুক ইব ভাস্করম্ ॥" (ভৈরবডামর)]।

'দিব্যপানে'র আর একটি নাম 'মহাপান'। 'বিন্দুর সহিত কুণ্ডলিনীর মিলনে যে পরামৃত ক্ষরণ হয়, যোগীরা তাহাই পান করেন, ইহাই মহাপান।' তন্ত্রের সাধনায়, মহাশ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংযতচিত্ত ও সমস্ত প্রলোভনের মধ্যে নির্ব্বিকার, হওয়া চাই। অমৃতই পীত হয়, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ভাবনায় সাধক ব্রহ্মময় হয়ে যান।

["কুণ্ডল্য মিলনাদ্বিন্দোঃ স্রবতে যঃ পরামৃতম্। পিবেদ্ যোগী মহেশানি সত্যং সত্যং বরাননে। কুলযোগং মহাদেবী মহাপানমিদং স্মৃতম্।" (যোগিনীতন্ত্র)। "সমস্তমেব ব্রহ্মেতি ভাবিতে ব্রহ্ম বৈ পুমান্। পীতেঽমৃতময়ঃ কোনামনভবেদিতি ॥" (যোগবাশিষ্টসার)]।

যাদের 'ম'কারে আপত্তি, তাঁদের জন্যও তন্ত্রশাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমান যুগে, কার বলবার সাহস আছে যে, ধোলো উচ্চাঙ্গসাধনের অধিকারী হ'তে পারেন না? ধোলো যেমন আহারের সঙ্গে নিত্য পান করেন, তন্ত্রের সাধক তা করতে পারেন না, অধিকন্তু তাঁর পাত্রের পরিমাণ বাঁধা আছে। যাগকালেও, গুরু, আচার্য্য অথবা জ্ঞানবৃদ্ধ সাধক তাঁকে পরিচালনা করেন। 'পান' যে করতেই হবে, তারও কোন নিয়ম নেই বা বাধ্যবাধকতা নেই—মাত্র ঘৃণা বা বিরক্তিবোধ না থাকলেই হল।

ইডা পিঙ্গলা—এই দুই নাড়ী—ধোলো হিসাবের কোন স্নায়ুমণ্ডল নয়। সহভাববাহী—অনুকম্পায়ী নাডীর (sympathetic nervous systemএর) রসসঞ্চার বা শুষ্কতা আনা রূপ কোন গুণের কথা ধোলো চিকিৎসা শাস্ত্র বলে না। ঐ শাস্ত্রমতে, মেরুমজ্জার দুপাশে যে স্নায়ুরজ্জু (nerve fibre) আছে, সেটি সমস্ত দেহে মিলিত হযে ছড়িয়ে গেছে, তার একটি ক্রিয়া-উদ্দীপক (motor), অপরটি স্থুল-বোধ-উদ্দীপক (sensory)। কবিরাজ বলবেন, বায়ু, পিত্ত, কফ্—এই তিন নাডীর গতি ও ক্রিয়া তাঁরা জানেন, কিন্তু মড়া চিরে উক্ত তিন নাডী পাওয়া যায় না। সেই রকম ইডা পিঙ্গলার বোধ সাধকের মধ্যে স্ফূর্ত্ত হয়, বহির্মুখী গতিকে অন্তর্মুখী করবার জন্য সুষুম্নার বোধ সাধকের মধ্যেই জাগ্রত হয়।

তন্ত্রশাস্ত্র সকাম সাধককে হেয়জ্ঞান করেন নি, তন্ত্রশাস্ত্র অবাধ প্রবৃত্তির

মুখে সাধককে ভেসে যেতে দেন নি। স্থূল, সূক্ষ্ম, পর—'ক্রমশঃ এগিয়ে যাও' এই ব'লে এসেছেন, কারোকে নিরুৎসাহ করেন নি। যাকে 'মন্দ', 'আবর্জ্জনা', বলা হয়, ভারতীয় তন্ত্র তার মধ্যেই মাতৃমূর্ত্তি সাধককে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা পেয়েছেন, কারণ সবই ত মায়ের মূর্ত্তি! সব সমাজের মধ্যে এমন অনেক পাপ বা কলঙ্ক আছে যা অবশ্যম্ভাবী, সেগুলি মানব-প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তির মধ্যেই বর্ত্তমান। সমাজ রক্ষার জন্য সেই সব কলঙ্কের একটা স্থান সমাজের বাইরে নির্দ্দেশ ক'রে দেওয়া হয়, যাতে সমাজ-শরীর না দূষিত হয়। তন্ত্রশাস্ত্র ঐ উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিকে 'মোড়' ফেরাবার জন্য অদম্য উৎসাহে সাধককে নির্ভীকভাবে মাতৃমূর্ত্তির চিন্তায় একাগ্রবুদ্ধি প্রয়োগ করবার পন্থা নির্দ্দেশ করেছেন। গোপনে বীভৎস সাধনের কথা? যাকে বীভৎস বলা হয়, সে রকম বিকট সাধনার উৎকট প্রযোগ করতে কজন সাহস করে? সে রকম কঠোর পরিশ্রম, উদ্ভট আয়োজন কজন করতে পারে? সেই নগণ্য সংখ্যার মধ্যে আবার কজন বা ও সব ভয়াবহ ব্যাপারে নিজের কাজ হাসিল করতে ভরসা করে? তার মধ্যে কজন বা সিদ্ধিলাভ করতে পারে? ক্ষতি হ'তে পারে ব্যক্তি-বিশেষের, সাধারণের কি অনিষ্ট হয়—যে কায গোপনে হয়, যে কাযে সাধারণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই? অর্থ প্রতিপত্তির অপপ্রয়োগে যে ইহা অপেক্ষা শতসহস্রগুণ ক্ষতি হচ্ছে তার আমরা কি করতে পারি? কামকাঞ্চনের অত্যাচার যে জাতীয় জীবনকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে তা রোধ করতে আমরা কি করছি? এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, যে মনোবৃত্তি নিয়ে ঐ সব পাটুওয়ারদের সমালোচনা করা হয়—ভয়ে ভয়ে কতকটা রফা ক'রে—সেই রকম মনোবৃত্তি নিয়ে কি সাধনরাজ্যের সমালোচনা করা হয়? মন্ত্রশক্তির প্রভাব, মারণ উচ্চাটনাদিকে যাঁরা কুসংস্কার ব'লে বিশ্বাস করেন, তাঁরা বৃথা তর্ক করেন কেন? শিক্ষা ও সদাচার প্রবর্ত্তনের জন্য তাঁরা কি করেছেন ও করছেন? দেশ ত নির্লজ্জ সাহিত্যে পূর্ণ হয়ে উঠছে। বিকট সাধকের মনোবৃত্তির প্রশংসা কেহ করেন না, তন্ত্রও না, কিন্তু কে বাতলে দেবে ঐ রকম মনোবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করবার শ্রেষ্ঠ উপায়? বড় বড় দিগ্‌গজেরা যদি তা না পারেন, যাঁরা উপায় দেখিয়ে দেবার ভরসা রাখেন, তাঁদের বাধা দিতে যান ঐ সব পাণ্ডারা

কোন্ হিসাবে ? ধর্ম্ম মানে যে অভ্যুদয়, ধর্ম্ম মানে যে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন, ধর্ম্ম মানে যে দেবত্বের বিকাশ—এ সকল বাণী ঐ সব সাধকদের শোনাতে ও বোঝাতে অগ্রসর করুন ?

অমৃতময়, পিযূষময দেহমন হওয়া চাই, তবে আসে শুদ্ধবুদ্ধি, সাধক হলে তবে আসে সিদ্ধি। ভোগব্যসনাসক্তেকের শুদ্ধবুদ্ধি হয় না, বদ্ধভাব দৃঢ় ধ'রে থাকলে, কুণ্ডলিনী জাগেন না। 'জাগা ঘরে চুরি হয় না'— সদা জাগ্রত থাকা চাই। "জাগ্রতো তস্য ন স্ত্রী ন মোহো ন ভ্রমস্তথা"— জাগ্রতের স্ত্রীতে মোহ বা ভ্রম হয় না, স্ত্রী মানে স্ত্রী পুত্রাদি সব—যার কেন্দ্র স্ত্রী। বীরসাধক নির্ভীকচিত্তে সাধনায় অগ্রসর হন; অবধূত বলেন, 'তোমরা আমার বাইরের রূপ দেখছো ? আমার হাতে কপাল—আমি দ্বিতীয় মহেশ, আমি অবধূত। আমি ত্রিশূলধারী, আমার অঙ্গে বিভূতি, আমার ভূষণ নাগ, আমি অবধূত, আমি দ্বিতীয় মহেশ ! আমি প্রচণ্ডাত্মা, আমি সদাতুষ্ট ·" ইত্যাদি।

সাধন সম্বন্ধে অন্যান্য কথা

নিত্যকর্ম্ম লোপ করতে নেই; কিন্তু অবস্থাবিশেষে পঞ্চ প্রকারে পূজা সিদ্ধ হয়। (১) অসমর্থে, জল দিয়ে পূজা করা অথবা মনে মনে পূজা করার নাম—সাধনাভাবিনী পূজা, (২) বিপৎপাতের সময মনে মনে পূজা করার নাম—ত্রাসী পূজা; (৩) অশৌচকালে স্নানান্তে মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ ও পূজা—সৌতকী পূজা। ব্রহ্মমন্ত্রী পূর্ণাভিষিক্তের শৌচাশৌচ নেই, সুতরাং ঐ বিধি তাঁর জন্য নয়। (৪) কিছু না বুঝে, কৌতূহলবশতঃ সরল বিশ্বাসে পূজা—দৌর্ব্বধা পূজা; (৫) অসুস্থ ব্যক্তির পূজা নিষিদ্ধ—তিনি মাত্র ইষ্টমন্ত্র জপ করবেন। সিদ্ধসংকল্প গুরুতে ভক্তিমান অথবা যাঁদের মহাপুরুষ সংশ্রয় হয়েছে ও যাঁরা তাঁর কৃপা লাভ করেছেন, তাঁদের মাত্র ইষ্টচিন্তা ও মানসজপেই পূজা সিদ্ধ হয়। উপলব্ধির জন্য যাঁরা গুরূপদিষ্ট মার্গে গুরুর আদেশে সাধনায় ডুব দেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র—তাঁদের বস্তুলাভ ঝটিতি হয়। নির্ভীক হ'য়ে সদা স্ফূর্ত্তির ভাব হৃদয়ে পোষণ ক'রে সমদর্শিত্ব লাভ করাই কৌল জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাবেব প্রধান কথা, সাধককে 'নামাপবাধ' হ'তে অতি সাবধানে থাকতে হবে। নামাপবাধ দশ প্রকাব, তাব মধ্যে চাবটিব পালনে অন্য সব পালন কবা সুসাধ্য হয় ঃ—

(১) 'সতাং নিন্দা'—সজ্জনেব নিন্দা কববে না; (২) 'শ্রীবিষ্ণোঃ সকাশাচ্ছিব নামাদেঃ স্বাতন্ত্র্যমননং'—বিষ্ণু ও শিবনামে ভেদবুদ্ধি কববে না, (৩) 'গুর্ব্বাজ্ঞা'—গুরুকে অবজ্ঞা কববে না, (৪) 'শ্রুতি তদনুগত শাস্ত্রনিন্দন'—বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রেব নিন্দা কববে না। শ্রীমদ্ভাগবত মতে অদ্বয় জ্ঞানই 'তত্ত্ব'। আচার্য্য বলদেব ভূষণ মতে, ভক্তি তাহাই যা "হ্লাদিনীসাবসমবেতশক্তিরূপা"; বর্ত্তমান বৈষ্ণবেবা অনেকেই বলেন যে হ্লাদিনীশক্তি—মাত্র প্রেমরূপিণী, সেখানে শক্তিব কোন সম্পর্ক নেই। তাঁবা কি শক্তি মানে বিভূতি বোঝেন? প্রেমিকেব কাছে বিভূতি অতি তুচ্ছ; কিন্তু বলহীনেব প্রেম হয় না—ইহাও সত্য। দ্বিজ চণ্ডীদাস বলেন "দুই ঘুচাইযা এক আত্ম হও থাকিলে পিবিতি আশ।" বৈষ্ণবকবি মতে, "পবম ভক্তিব সূত্র কবহ শ্রবণ। সর্ব্বোপাধি বহিত হৈঞা কৃষ্ণনিষ্ঠমন॥ সর্ব্বোপাধিবহিত অন্য অভিলাষশূন্য। নাহি অভিলাষ মুক্তি স্বর্গাদিব জন্য"॥ ইহাই অব্যভিচাবিণী ভক্তি।

["বিহি এক চিতে, ভাবিতে ভাবিতে নিরমাণ কৈল পি। বসের সাগর মন্থন কবিতে উপজিল তাহে রি। পুনঃ সে মথিয়া, অমিয়া হইল ভিজাইল তাহে তি। সকল সুখেব আকর এ তিন তুলনা দিব যে কি?" (চণ্ডীদাস)। অর্থাৎ বিধাতার গভীব ধ্যানে পিযূষেব আবির্ভাব—পি; ধ্যানজাত বসসমুদ্র মথিত ক'বে আবির্ভূত মহাতেজ—রি; পুনঃ মন্থনে অমৃতে বিশ্বসিক্ত হল—তি। এই তিন অক্ষর আনন্দস্বরূপ]।

সাংখ্যশাস্ত্র বলেন, 'পুরুষেব বন্ধনমুক্তি বা দেহান্তব প্রাপ্তি নেই, প্রকৃতিই—ধর্ম্ম, বৈবাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অজ্ঞান, অধর্ম্ম, অবৈবাগ্য, অনৈশ্বর্য্য—এই সাতরূপে আপনাকে আপনি বন্ধন কবেন, আবাব প্রকৃতিই পুরুষার্থ সাধনরূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বাবা নিজেকে বিমুক্ত কবেন' (সাংখ্যকাবিকা ৬২।৬৩)। ইহাই 'ববণ'। তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃতিবই দান। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ, শক্তিব পবিণতিতেই আসে ভেদ কল্পনা; কিন্তু ঐগুলিও শক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। তাই শক্তিপূজায়, পীঠপূজা কালে, 'ধর্ম্মায় নমঃ', 'জ্ঞানায়

নমঃ', 'বৈবাগ্যায় নমঃ', 'ঐশ্বর্য্যায় নমঃ', 'অধর্ম্মায় নমঃ', 'অবৈবাগ্যায় নমঃ', 'অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ' ব'লে প্রত্যেকেব পূজা কবতে হয়।

পূর্ব্বমুখী বা উত্তবমুখী হয়ে পূজা কবতে হয়; বিভিন্ন পূজায় বিভিন্ন পুষ্পে পূজা কবতে হয়, নিষিদ্ধ পুষ্প ব্যবহাব করতে নেই—এই সব বিধি আছে। কিন্তু তন্ত্রেব সিদ্ধান্ত এই যে, সাধনকালে, (সাধনভাবে যে পূজা হয়, তৎকালে), দিঙ্‌নিরূপণ কবতে না পাবলে, দেবতাব সম্মুখই পূর্ব্বদিক্ ভেবে তিনি সাধনে বত হবেন; ভক্তিযুক্ত হলে, যে কোন পুষ্পে পূজা কববে। সাধনেব প্রধান অঙ্গ উপাসনা। উপাসনা চাব প্রকাব—সম্পদ, আবোপ, সম্বর্গ, অধ্যাস। মলিন মন বা আববণযুক্ত মন অল্প দেখে (সংকুচিত), মন গণ্ডীব মধ্যেই ঘুরে বেড়ায়, মনেব আববণ যত ক'মে যায়, ততই মনেব প্রসার হয়, তখন ঐ অল্পে অর্থাৎ ঐ সংকুচিত মনে অধিক গুণ আবোপ-জন্য মনেব অনন্ত বিস্তৃতি হয়; সেই আধিক্যই দেবতা—এই ভাবনাই সম্পদ উপাসনা। বেদে উদ্গীতবাচ্য ওঁকাবেব উপাসনাব ন্যায় অঙ্গে আবোপ ক'বে উপাসনাই—আবোপ উপাসনা। ওঁ, এই অক্ষবকে পবমাত্মাব প্রতীকস্বরূপ কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীতরূপে উপাসনাব ব্যবস্থা বেদে আছে। যোষিৎ অর্থাৎ নাবীকে অগ্নি অর্থাৎ তেজ বা শক্তি জ্ঞানে বুদ্ধিপূর্ব্বক যে উপাসনা তাহাই—অধ্যাস উপাসনা। ক্রিয়াযোগ সহায়ে উপাসনাই 'সম্বর্গ' উপাসনা। প্রলয়কালীন সম্বর্ত্ত বায়ুব ন্যায় এই উপাসনায় সমস্ত ভূতগ্রাম অবসন্ন হয়ে সাধকেব বশীভূত হয়। উক্ত চাব রকম উপাসনা, সমস্তই—বহিবঙ্গ উপাসনা। বহিবঙ্গ উপাসনায় সাধকেব সংকল্প দৃঢ় হয়। অন্তবঙ্গ উপাসনা দুভাবে হয়; গুরুমুখাৎ লব্ধ বিদ্যায় গুরুবর্ত্মানুযায়ী দৃঢ় বুদ্ধিতে ('উপসঙ্গম' বুদ্ধিতে), দেবতা ও নিজে অভেদ—এই প্রকাব জ্ঞানে নিঃসন্দেহ হ'য়ে উপাসনাই—অন্তবঙ্গ উপাসনা। সম্পদাদি উপাসনা বহিবঙ্গ। অবাস্তব জ্ঞানকে অপসাবিত ক'বে 'সজাতি' (স্বেষ্ট বিষয়ক) জ্ঞানকে অবিচ্ছিন্নভাবে ধাবণ কবায় আত্মাব সঙ্গে অভেদ বোধ ধাবণ কবাই যথার্থ উপাসনা। তন্ত্রশাস্ত্রে, ভক্তি—ভগবদাকাবা দৃঢ়বুদ্ধি।

[যে কোন পুষ্পে পূজা হ'তে পারে:—"বিহিতৈর্বা নিবিদ্ধৈর্বা ভক্তিযুতেন চেতসা···।" তন্ত্ররাজতন্ত্র। রাঘব ভট্ট মতে সকল দেবতারই সর্ব্বপুষ্পে পূজা হ'তে পারে, কারণ, "কর্ত্তব্যা সর্ব্বদেবানাং ভক্তিযোগঃত্র কারণং;" তন্ত্রসার মতে, বিহিত

পুষ্পের অভাবে যে কোন পুষ্পে পূজা হয়। (তান্ত্রিক নিত্যপূজাপদ্ধতি—৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার সঙ্কলিত দ্রঃ)। শিবগীতায় সম্পদাদি উপাসনা,—

(১) "অল্পস্য চাধিকত্বেন গুণযোগাদ্বিচিন্তনম্। অনন্তং বৈ মন ইতি সম্পদ্বিধিকদীরতঃ ॥"

(২) "বিধাবায়োপ্যযোপাসা সারোপঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

যদ্বদোঙ্কারমুদ্গীথমুপাসীতে তুদাহৃতঃ ॥"

(বিধারা = শরীরের অঙ্গ।)

(৩) ছান্দোগ্য = ১৷১ দ্রঃ

(৪) "আরোপো বুদ্ধি পূর্ব্বেণ য উপাসাবিধিশ্চ সঃ।

যোষিত্যগ্নিমিতির্যত্তদধ্যাসঃ স উদাহৃতঃ ॥"

(৫) "ক্রিয়াযোগেন চোপাসাবিধিঃ সম্বর্গ উচ্যতে।

সংবর্ত্ত বায়ুঃ প্রলয়ে ভূতান্যেকোঽবসীদিতি ॥"

(৬) "উপসঙ্গম্য বুদ্ধ্যা যদাসনং দেবতাত্মনা। তদুপাসনমন্তঃ স্যাত্তদ্বহিঃ সম্পাদয়ঃ ॥"

(৭) "জ্ঞানান্তরান্তরিত সজাতি জ্ঞান সন্ততেঃ। সম্পন্ন দেবতাত্মত্বমুপাসনমুদীরিতম্ ॥"

(৮) "বেদস্যোপনিষৎ সত্যং সত্যোপনিষদ্ দমঃ।

দমস্যোপনিষেন্মোক্ষং এতৎ সর্ব্বানুশাসনম ॥"] হংসগীতা

সাধারণ অবস্থায়, প্রাণাদি বায়ু ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করে—বহির্মুখী। ইড়ার কার্য্য—শরীরে রস সঞ্চার করা। সকল রসই অমৃতময়, কিন্তু যার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, কতকটা তার গুণ পায়। রস ক্ষরিত হয় 'অমাকলা' হ'তে। চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতি সহস্রারে। দেহে রস সঞ্চার করে, এই জন্য ইড়াকে 'চন্দ্রনাড়ী' বলা হয়; পিঙ্গলা, উক্ত রসকে শুষ্ক করে, তাই পিঙ্গলা 'সূর্য্যনাড়ী'। ইড়া পিঙ্গলাৎ প্রাণাদি বায়ুকে আকর্ষণ ক'রে সুষুম্নার মধ্য দিয়ে চালিত হ'লেই হয় কুণ্ডলিনীর জাগরণ; অতএব যখন ঐ চন্দ্রসূর্য্যের মিলিত গতি হয়, তখনই সাধকের যথার্থ 'অমাবস্যা'; আর তখনই ঐ গতি সুষুম্নার দ্বার মহাবেগে ভেদ ক'রে শ্রীগুরুস্থানে মিলিত হয়। তখন শুদ্ধাভক্তি ও বিশুদ্ধজ্ঞানের একীভাব হয় অর্থাৎ পরাপ্রেমরূপী সর্ব্বপীযুষস্রাবী রসঘন, সহস্রারস্থিত 'চন্দ্র' আক্রমণ করেন। তাতে যে অমৃত ক্ষরণ হয়, সেই অমৃতে মুক্ত ত্রিবেণীর (আজ্ঞাচক্রের) চন্দ্রমণ্ডল সিক্ত হ'য়ে বিশুদ্ধে, ও তথা হ'তে ক্রমশঃ সর্ব্বদেহে সঞ্চারিত হয়।

কামনা বা বাসনা অহঙ্কাবেব একটি রূপ। বাসনা ও প্রাণ হ'তেই চিত্ত বা মনেব উদ্ভব হয়; সুতবাং একেব সংযমে অপবটিও সংযত হয়। উক্ত সর্ব্বদেহসঞ্চাবী বসেব কামনাজড়িত একান্ত বহির্ম্মুখী ভাবেব নাম 'শুক্র'। প্রাণবায়ুকে সুষুম্নাব মধ্য দিয়ে চালনা কবলে, ঐ সর্ব্বসঞ্চাবী বস (শুক্ররূপে) সুষুম্নাপথে চালিত হয়। স্থূলরূপী শুক্র মস্তিষ্কে যায না, যায় ওজোরূপী শুক্রের উপাদান। এই ব্যাপাব সাধিত হয প্রাণায়ামেব দ্বাবা—তা সে প্রাণাযাম ভাবনাব দ্বাবাই হোক্ বা অন্য উপায়েই হোক্। স্থূল কিছুই মস্তিষ্কে যেতে পাবে না, ইহা বুঝতে হবে। বহির্ম্মুখী ঐ শুক্র—'আমি বহু হব', এই মূল ভাবেব—অর্থাৎ, বহুত্বভাবরূপ ইচ্ছাশক্তি, জডত্বেব মধ্য দিয়ে প্রকাশচেষ্টায়—প্রাকৃতকামেব দ্বাবা আকর্ষিত হ'য়ে স্থূলরূপে পবিণত হয় ও অধোগতিসম্পন্ন অপান বায়ু কর্ত্তৃক তাডিত হ'য়ে নির্গত হয়। এই উপায়ে ঐ 'একই' বহুরূপে অনন্ত ভাব ধাবণ কবেন !! অন্তর্গতি হলে, ঐ শুক্র, স্থূলরূপে পবিণত না হ'য়ে, প্রাণেব সঙ্গে একযোগে সহস্রাবে চালিত হয—উত্থানেব সময় কুণ্ডলিনীব শবীবে একে একে সমস্ত তত্ত্বই লয় হয়। এইরূপে সহস্রাবে সমস্ত লয় হওয়াব নাম 'শিব-শক্তিব মিলন।' ঐ মিলন সাধকেব অনুভূতি হয়। ইহাই শৃঙ্গাব বস; ঐ বসেব বসিক যিনি, তিনিই 'যতি'। ব্রহ্মনিষ্ঠ যতিব বাহ্য কর্ম্মানুষ্ঠান ক্রমে ক'মে আসে। তিনি পবা পূজা বা 'ভাবনা' নিয়েই থাকেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহাই "তদর্থ-প্রাণ স্থান"।

[শৃঙ্গার রস আট প্রকার :—শৃঙ্গাব, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র। উক্ত আট প্রকার ছাডা 'শান্ত' ও 'অপরিগ্রহ'—এই দুই ভাব নিলে শৃঙ্গার রস হয় দশ প্রকার। শৃঙ্গাব রসকে 'আদিরস' বলা হয়, কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্রমতে, 'অদ্ভুত রস'ই প্রধান, শৃঙ্গারাদি সমস্ত রসই তাঁদের মতে, 'অদ্ভুতের' অন্তর্গত। আলঙ্কারিকদের দৃষ্টিকোণ স্বতন্ত্র, তবু তাঁরাও রসকে আনন্দস্বরূপ ও বিস্তাররূপী বলেন, 'চমৎকারশ্চিত্ত বিস্তাররূপো বিস্ময়াপরপরপর্য্যায়ঃ' এবং "লোকোত্তরচমৎকার প্রাণঃ" ইত্যাদি আখ্যা দেন। এই চমৎকারত্ব বিধার সর্ব্বত্র অদ্ভুত রসই উপলব্ধ হয়। ঐভাবে তাঁদের দিক্ দিয়ে 'চণকাকাবকে' চমৎকাররূপী অদ্ভুত রস বলা যেতে পারে।

'ভাবনা' বা পরা পূজার উদাহরণ :—"শয়নে প্রণামজ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, ওরে নগর ফির, মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।" ইত্যাদি।]

তন্ত্ৰশাস্ত্ৰ সম্বন্ধে যাঁদেৰ ভাসা ভাসা জ্ঞান, তাঁৰা 'বীৰাচাৰ' ও 'বীৰ' এই তুই শব্দ শুনলেই, ভয় পান, যেন 'বীৰেৰ' আচৰণ একটা কিম্ভূত-কিমাকার বস্তু। বীৰেৰ লক্ষণ, আমৰা ইতিপূৰ্ব্বে দিয়েছি। বীৰেৰ লক্ষণ তন্ত্ৰে—'......স্বাত্মানন্দনিমগ্নধীঃ॥' "যিনি প্ৰতিযোগী 'ইদং' পদার্থকে 'অহং' পদার্থে বিলীন কৰিতে পাৰিয়াছেন, যাঁহাৰ চিত্ত স্বাত্মানন্দে নিমগ্ন, তাঁহাৰ নাম বীৰ।" (কৌলমাৰ্গৰহস্য দ্ৰঃ)। আমৰা পৰে দেখৰ যে শ্ৰীৰামকৃষ্ণ বীৰাচাৰ মতে সাধন কৰেছিলেন; তাঁতে এই লক্ষণ সাধনাৰ পূৰ্ব্ব হ'তেই পূৰ্ণমাত্ৰায় বৰ্ত্তমান ছিল ও তিনি বীৰাচাৰ মতে সাধনেও এক অভিনব পন্থা দেখিয়েছিলেন। যাঁৰা তন্ত্ৰ সাধনা সম্বন্ধে একেবাৰে অজ্ঞ, তাঁদেৰ এক প্ৰধান আপত্তি যে ঐ শাস্ত্ৰে নাকি ব্ৰহ্মচৰ্য্যেৰ ব্যবস্থা নেই। ইহা যে কতবড ভ্ৰান্ত ধাৰণা তাহা বলা যায় না। যে শাস্ত্ৰেৰ সাধনায় ভূতশুদ্ধিৰ ব্যবস্থা সকল সাধকেৰ জন্যই আছে, যে শাস্ত্ৰে উচ্চাঙ্গ সাধনায় যোগমাৰ্গেৰ কথা আছে, যে শাস্ত্ৰ বাৰবাৰ সাধককে কতৰকমে সাবধান করেছেন, যে শাস্ত্ৰে 'বীৰেৰ'ও পাণ্ডিত্যাভিমানেৰ স্থান নেই, যে তন্ত্ৰশাস্ত্ৰেৰই চৰম উক্তি "মৰণং বিন্দুপাতেন জীবিতং বিন্দুধাৰণাৎ", যে শাস্ত্ৰ কামুক ও লোভী গুৰু পৰ্য্যন্ত বৰ্জ্জনেৰ ব্যবস্থা দিতে কুণ্ঠা বোধ কৰেন নি, সেই শাস্ত্ৰে ব্ৰহ্মচৰ্য্য সম্বন্ধে উদাসীন যাঁৰা বলেন তাঁৰা যেন তন্ত্ৰশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰেন, এইমাত্ৰ আমাদেৰ অনুৰোধ। যে তন্ত্ৰসাধক উচ্চাঙ্গ সাধনাৰ অধিকাৰ লাভ কৰেন নি, তাঁকেও তন্ত্ৰশাস্ত্ৰ ব'লে দিচ্ছেন যে ব্ৰহ্মচৰ্য্যই সকল সাধনাৰ মূল। "ব্ৰহ্মচৰ্য্যং তপমূলং পাপঘ্নং শুদ্ধচিত্তবান্। পশুভাবে চৰেদাদৌ সৰ্ব্বমঙ্গল কাৰণং' ॥ ১০ ॥ (ৰহস্য ষড়ম্নাযতন্ত্ৰে নিগম সন্দৰ্ভে ৪ৰ্থ পটলঃ)। উচ্চাঙ্গেৰ ভক্তিমান সাধকেৰ পক্ষে, "বৈৰাগ্যং মনোভূমিশ্চ সমাযোগেন ৰোপণং। ভক্তিবাৰি জলচক্ৰে মন্ত্ৰ যন্ত্ৰে প্ৰসেচনং" ॥ ১৭০ ॥ (ঐ. ঐ. ৩য় পটলঃ)। যিনি 'হংস' তিনি অখণ্ড ব্ৰহ্মচৰ্য্যধাৰী পুৰুষ, "হংসো ন কুৰ্য্যাৎ স্ত্ৰীসঙ্গং বিধি যোনি বিহারবান্" (ঐ. ঐ. ৪ৰ্থ পটলঃ ১২)। সত্ত্বগুণ স্ফুৰণই দীক্ষাৰ উদ্দেশ্য, পূৰ্ব্বে বলা হয়েছে।

ব্ৰহ্মমন্ত্ৰী কৌল তুই শ্ৰেণীৰ—গৃহী ও সংসাৰত্যাগী। গৃহধৰ্ম্ম অবলম্বন কৰলেও, সন্ন্যাসেৰ ভাব অন্তৰে পোষণ ক'ৰে তাঁকে সাধনে অগ্ৰসৰ হ'তে

হয়, তিনিও 'যতি'র মধ্যে গণ্য। সন্ন্যাসের ভাব পোষণ করায়, সাধককে লৌকিক অসুবিধা কিছু ভোগ করতে হয়; কিন্তু সাধক সানন্দে সে সমস্ত কষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ করেন। সংসারত্যাগী দিব্যভাব অবলম্বন করলেও, বাহ্য অনুষ্ঠান করা না করা তাঁর ইচ্ছাসাপেক্ষ। 'বাসনা' বা 'ভাবনার' কথা পূর্ব্বে বলেছি। উহাই 'রহস্য বিদ্যা'। এই 'রহস্য বিদ্যা'র সাধনা কৌল বাহ্যপূজাবলম্বনে—বাহ্যপূজার মধ্য দিয়েই করেন। গৃহী থেকেও সন্ন্যাসভাবের সাধন করায় আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। গৃহস্থাশ্রমের আদর্শ এখন আমরা ভুলেছি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে গুহ্য বিদ্যা ও সন্ন্যাসের উপদেশ দেওয়া হয়েছে; সন্ন্যাসের উপদেশ তিনি একাধিকবার পেয়েছেন। বর্ত্তমান যুগেই উহা বন্ধ হয়েছে। শাস্ত্রে দেখা যায়, গুহ্য বিদ্যা ও সন্ন্যাসের উপদেশ অনেকে পেয়েছেন। ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা বন্ধ ক'রে দেওয়ার ফলে, ব্রহ্মচর্য্যের ভাব ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে জনসাধারণের মধ্যে, বেদবিদ্যার আলোচনা পর্য্যন্ত বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল কিছুকাল পূর্ব্বে; ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই দেশের সর্ব্বদুঃখের মূল কারণ। এই ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা বন্ধ হয় পৌরাণিক যুগ হ'তে।

[পুরাণের মতে, একমাত্র ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাসে অধিকার, ঐ ব্রাহ্মণ মানে গুণগত ব্রাহ্মণ নয়, বংশগত ব্রাহ্মণ। বংশপরম্পরায় ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন থাকলে, কোন প্রশ্নই উঠত না। বামন পুরাণ মতে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ. ভৈক্ষ্য বা সন্ন্যাস—একমাত্র ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের অধিকার প্রথম তিনটিতে—সন্ন্যাসে নয়, বৈশ্যের অধিকার প্রথম দুটিতে—বানপ্রস্থেও নয়, সন্ন্যাসেও নয়, শূদ্রের অধিকার—মাত্র গার্হস্থ্যাশ্রমে, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যেও অধিকার নেই ॥ বলা বাহুল্য, উক্ত নিয়ম কোন মহাপুরুষ মানেন নি।]

তন্ত্রে, 'পশু' ভাবের সাধন প্রথম—প্রথম হ'তেই তন্ত্রশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলেছেন; প্রভেদ এই যে, অন্যান্য শাস্ত্র, বৈরাগ্য বর্ণনায়, বীর্য্য বা শুক্রকে—সাধারণ দৃষ্টিতে দে'খে, অতি কদর্য্য বস্তু বলেছেন, তন্ত্রশাস্ত্র তাকে "ঈশাবাস্যং" ক'রে নিয়েছেন. ও উহাকে উর্দ্ধমুখী করবার উপায় নির্দ্দেশ ক'রে, সাধককে শিবশক্তির মিলন সাক্ষাৎকার করতে বলেছেন। ইহা যেন আমাদের তন্ত্রালোচনার সময়ে সর্ব্বদা মনে থাকে যে তন্ত্রশাস্ত্র—

প্রথম ও শেষ তত্ত্ব সম্বন্ধে—যত সাবধানতা ও কঠোরতা অবলম্বন করেছেন, বৈদিক সাধনায় সে রকম দৃষ্ট হয় না।

আমরা দেখেছি যে, শেষতত্ত্বের প্রতিনিধিস্বরূপ করবী ও কৃষ্ণ অপরাজিতা ব্যবহারের বিধি আছে। যাঁরা বিবাহিত তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'শেষতত্ত্ব নির্বীর্য্য কলিতে একমাত্র স্বপত্নীতে অনুষ্ঠেয; ইহা সর্ব্বদোষশূন্য।' কারণ, ইহাতে কোন লুকোচুরির ভাব নেই। দুষ্ট মন লুকোচুরি করে—যখন গোপন পাপের ভয় থাকে। তন্ত্র বলছেন, 'প্রবল কলিতে মানব, নারীকে সামান্যবুদ্ধিতে দেখে, মহাশক্তিরূপিণী যে তিনি, তা যখন ধারণা করতে পারে না, তখন ঐ ব্যবস্থাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ'। তন্ত্র ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেন নি। যাঁরা আবার শেষতত্ত্বের ওরূপ কোন বাচনিক অর্থ নিতে চান না—যাঁরা 'বাসনা' অনুসারেই ঠিক অগ্রসর হ'তে চান, তাঁদের পক্ষে শেষতত্ত্বের প্রতিনিধি—ইষ্টপাদপদ্ম ধ্যান ও ইষ্টমন্ত্র জপ।

["শেষতত্ত্বং মহেশানি নির্বীর্য্যে প্রবলে কলৌ। স্বকীয়া কেবলা জ্ঞেয়া সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা" ॥ (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৬ উঃ—১৪)

"স্বভাবাৎ কলিজন্মানঃ কামবিভ্রান্তচেতসঃ। তদ্রূপেণ ন জানন্তি শক্তিং সামান্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৭৩॥

অতস্তেষাং প্রতিনিধৌ শেষতত্ত্বস্য পার্ব্বতী। ধ্যানং দেব্যাঃ পদাম্ভোজে স্বেষ্টমন্ত্রজপস্তথা॥" ১৭৪॥ (ঐ ৮ম উঃ)]

মানব স্বভাবতঃ, কলির প্রভাবে নির্বীর্য্য, কামবিভ্রান্তচিত্ত, নারীকে 'তদ্রূপেণ ন জানন্তি', সেই জন্য ঐ সামান্যবুদ্ধি মানবের জন্য শেষতত্ত্ব স্বপত্নীতে অনুষ্ঠেয় ও ঐ একই কারণে অর্থাৎ নারীকে 'তৎ' বুদ্ধিতে বুঝতে সমর্থ হয না ব'লেই দেবীর পাদপদ্মধ্যানাদিই ব্যবস্থাপিত। তন্ত্রে অন্যত্র, রক্তচন্দনকেও ঐ প্রকার প্রতিনিধিরূপে ব্যবহার করবার আদেশ আছে। সকল সাধকের মন একভাবে গঠিত নয়, অবস্থাও সকলের এক নয়, সুতরাং সাধক, ইচ্ছানুসারে যেটি ইচ্ছা বেছে নিতে পারেন। পূর্ণাভিষিক্ত গৃহী সাধকও 'গৃহকামৈকচিত্ত' থাকতে পারেন না।

তন্ত্রশাস্ত্র কখনও নারীকে হীন করেন নি। তন্ত্র বলেন যে, পিতার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলে সে মন্ত্র নির্বীর্য্য হয়, কিন্তু মাতার কাছে দীক্ষিত হলে, সে মন্ত্র সত্বর চেতন হয়। তার কারণ, মাতার কাছে

সন্তানেব জোব, আব্দাব, যতটা খাটে, মাকে যত আপন বোধ হয, পিতাব কাছে সেবকম হয় না, পিতাব কাছে সন্তান অনেকটা ভয়ে ভয়েই থাকে। নাবী সম্বন্ধে তন্ত্র বলেন যে, সাধনভজন ও নিয়মাদি পুরুষেব জন্য, নাবীব একমাত্র জপেই সিদ্ধিলাভ হয়। "নিযমঃ পুরুষে জ্ঞেয়ো ন যোষিৎসু কথঞ্চন। ন ন্যাসো যোষিৎ মাত্র ন ধ্যানং ন চ পূজনম্। কেবলং জপমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিদ্ধন্তি যোষিতাম॥" (বীবতন্ত্র—তন্ত্রসাবধৃত বচন)। ইহাব কাবণও বেশ বুঝতে পাবা যায। পুরুষ চঞ্চল—হুটোপাটিপ্রিয়, বিচাব-পবাযণ বা তত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত, নাবী ধীব, সবল, অধিকতব ভক্তিপ্রবণ ও সেই কাব'ণ তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁব বিশ্বাসী চিত্ত কোন সন্দেহ কবে না। তা ছাডা নাবীহৃদয় সহজে সকলকে আপন ক'বে নিতে পাবে। ইহাই 'ভাবতীয়' তন্ত্রেব ভাব—যে শাস্ত্র নাবীকে কখন ভোগেব যন্ত্রস্বরূপ মনে কবেন নি। আমবা সচবাচব দেখি যে, সংসাবক্ষেত্রে নাবী সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রকাব উন্নতিব 'উত্তেজিকা শক্তি', তন্ত্রশাস্ত্র, এই শক্তিকে উর্দ্ধমুখী কববাব উপায় স্পষ্ট ব'লে দিয়েছেন, যাতে নাবীব যথার্থ স্বরূপ মানব বুঝতে পাবে।

পথ নির্ণয়—১।

["নির্গুণ এব শিবঃ যো 'বহুস্যাং প্রজায়েয়' ইতি ইচ্ছাশক্ত্যাযুক্তঃ সৃষ্ট্যুন্মুখঃ স এব শক্তিপদবাচ্যঃ"—পবশুবাম কল্পসূত্র টীকা—৬।১ (কৌলমার্গ-বহস্যোদ্ধৃত বচন)।]

শক্তি বহুত্বেব কাবণ, তাই নাবী শক্তিরূপে বর্ণিত। ভাবত, শক্তিকে মাতৃরূপে দর্শন কবেছেন। স্ত্রীশবীবে শক্তি সঞ্চিত থাকে, জীবতত্ত্বেব আলোচনায় আমবা দেখেছি। মানবে, শবীব ও মনেব পূর্ণ পবিণতি। নাবী শক্তি-প্রতীক—শক্তিরূপিণী। তাই নাবীব জপেই সিদ্ধিলাভ হয়। সে জপও তাঁব দবকাব আত্মবক্ষা ও আশ্রিতেব কল্যাণার্থে। "রূপং দেহি, জয়ং দেহি" প্রার্থনা যে সব সময়েই ঘোব সকাম তা নয়। সাধনবিঘ্ন অপহত কববাব জন্য, আত্মবক্ষাব জন্যও, বীব সাধক এই বকম প্রার্থনা কবেন। জগদ্ধিতায় শক্তিমন্ত্র প্রচাবকল্পে, সিদ্ধ সাধক বা মহাপুরুষও রূপ, জয়, যশ আকাঙ্ক্ষা কবতে পাবেন। ঐ প্রকাব মনোভাব স্বার্থদুষ্ট হয় না।

আগুন ঘর পোড়ায়, আবার আগুন কত কল্যাণ সাধন করে। শক্তির ব্যবহার জানা চাই। নারী উত্তেজিকা শক্তি। সাধনসহায় হলে, সশক্তিক সাধনে, এই শক্তি, সাধককে উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে 'গুণ' টেনে নিয়ে যান; তখন গুরুশক্তি উভয়কে হাত ধ'রে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।

তন্ত্রে, বিশেষ বাঙ্গলার তন্ত্রে, বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব অত্যন্ত মিশ্রিত হয়ে রয়েছে। সাধকের পক্ষে, সাধনপথ নির্ণয় করা কঠিন হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্যান্য মতের মত, শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রমতেও সাধন ক'রেছিলেন। তাঁর সাধকজীবনের অধিকাংশ কাল, তন্ত্রমতের সর্ব্বপ্রকার সাধনে ব্যয়িত হয়েছিল। পথনির্ণয় তিনি করেছেন। এখন দরকার, বিরাট তন্ত্রশাস্ত্র হ'তে খাঁটি ভারতীয় ভাব বাছাই ক'রে দেখান। সাধককুল ও বিদ্বদ্‌মণ্ডলী এই ভাব গ্রহণ করুন—এই আমাদের অনুরোধ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর জন্য 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ' (স্বামী সারদানন্দ) পড়তে বলি। তন্ত্রের দুই অংশ—আগম ও নিগম। "আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে। মতঞ্চ বাসুদেবস্য আগমং পরিচীক্ষ্যতে॥ নির্গতো গিরিজা বক্ত্রাৎ গতশ্চ গিরিশশ্রুতিম। মতশ্চ বাসুদেবস্য নিগম পরিকথ্যতে॥" বাসুদেব সম্মত শিবপ্রোক্ত তন্ত্রের নাম আগম ও দেবীর উক্তিই নিগম। নিগম হ'তে আগম—ইহাও উক্ত হয়।]

স্বনামধন্যা ভক্তিমতী তেজস্বিনী রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পূজারী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অগ্রজ। তিনি দশকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণের যা কর্ত্তব্য তা শ্রীরামকৃষ্ণকে শিখিয়ে দেন। বিধিমতে শাক্তীদীক্ষা না নিয়ে দেবীপূজা প্রশস্ত নয়। তখন কলিকাতার বৈঠকখানা বাজারে কেনারাম ভট্টাচার্য্য নামে একজন প্রসিদ্ধ শক্তিসাধক ছিলেন ও তাঁর দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত ছিল। তাঁর কাছে দীক্ষাগ্রহণ মাত্রই শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হ'য়ে পড়েন। কেনারাম তাঁর নবশিষ্যের অবস্থা দেখে, অতিমাত্রায় মুগ্ধ হন ও শ্রীরামকৃষ্ণকে ইষ্টলাভ বিষয়ে প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ করেন। গুরুর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তির অবধি ছিল না। শাস্ত্রে সাধনবিধি আছে, আবার বংশগত প্রথা ও দেশাচারও আছে—যেগুলি সাধারণের কাছে অলঙ্ঘনীয় বিধি ব'লে গণ্য হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাধীনচিত্ত সব সময়ে ঐ প্রথা বা দেশাচার মেনে চলে নি। তিনি শাস্ত্রবিধির মর্য্যাদা

বেখেছিলেন, সমস্ত সাধনবিধি তিনি পালন ক'বেছিলেন। বাল্যকালে যথাসময়ে তাঁব গায়ত্রী দীক্ষা হয়। তাঁব পিতা ছিলেন, সাধক নিষ্ঠাপবায়ণ অতিথিবৎসল তেজস্বী ব্রাহ্মণ। তাঁব তপপ্রভাবেব কথা আজও শ্রীবামকৃষ্ণেব জন্মস্থান কামাবপুকুবে শোনা যায়। শ্রীবামকৃষ্ণেব গর্ভধাবিণী ছিলেন ভক্তিমতী তপস্বিনী, সর্ব্ববিষয়ে পতিঅনুগামিনী ও অত্যন্ত সবল প্রকৃতিব নাবী। শ্রীবামকৃষ্ণেব পিতা কখন শূদ্রেব দান গ্রহণ কবতেন না বা শূদ্রবাড়ীতে যজন যাজন কবতেন না, কিন্তু তিনি কাবোকে ঘৃণাও কবতেন না।

শ্রীবামকৃষ্ণেব উপনযন। তিনি জেদ্ ধবলেন, ধনী নামে এক কামাবেব মেয়ে তাঁব ভিক্ষামাতা হওয়া চাই, নতুবা তাঁব উপনয়নে দবকাব নেই। যে বংশে শূদ্রেব দান পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয় না, সে বংশে ধনীব কিরূপে ভিক্ষামাতা হওয়া সম্ভব? আত্মীয় স্বজনেব কোন যুক্তিই তিনি শুনলেন না। 'ধনী কামাবণী' তাঁব ভিক্ষামাতা হলেন। যে প্রথা বা যে আচাব হৃদয়কে সংকুচিত কবে, শ্রীবামকৃষ্ণ তা কখন স্বীকাব কবেন নি।

শক্তি দীক্ষাকালে শ্রীবামকৃষ্ণেব ভাবসমাধি হ'য়েছিল। এই ভাবসমাধি তাঁব নতুন নয। শ্রীবামকৃষ্ণের বয়স যখন ছয় বা সাত, তখন আলেব ধাবে 'টেকোয়' মুড়ি নিয়ে যেতে যেতে আকাশে জলভবা কাল মেঘ উঠল; সেই কাল মেঘেব নীচে এক ঝাঁক সাদা দুধেব মত বক্ উড়ে যেতে দেখে তাঁব ভাবসমাধি হয়। কে জানে, তাঁব মনে তখন কি ভাবেব উদ্দীপনা হয়েছিল? শিশুকাল হ'তেই তিনি ইচ্ছামত ভাববাজ্যে বিচবণ কবতেন— তন্ময়তা ছিল তাঁব স্বভাবসিদ্ধ। উপনয়নেব পূর্ব্বে, প্রথম তাঁব ঐ ভাব-সমাধি, বয়স তাঁব তখন ৮ বৎসব মাত্র। উহাব পবেব ঘটনা:— কামাবপুকুবেব উত্তবে প্রায় এক ক্রোশ দূবে দেবী বিশালাক্ষীকে দর্শন কবতে একদল মেয়ে যাত্রীব সঙ্গে বালক গদাই (শ্রীবামকৃষ্ণেব বাল্যেব ডাক্ নাম) দেবীব মহিমা কীর্ত্তন কবতে কবতে চলেছেন, হঠাৎ তাঁব গান থেমে গেল—তাঁব সর্ব্বাঙ্গ অবশ আড়ষ্ট, চক্ষে জলধাবা, 'বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত। দেবীব নাম তাঁব কাণে বাববাব শোনাতে তাঁব হুঁস ফিবে এল! ঐ মেয়ে যাত্রীব মধ্যে, তাঁব দুএকজন আত্মীয় ছাড়া—ছিলেন সেখানকাব জমিদাব ধর্ম্মদাস লাহাব বিধবা কন্যা প্রসন্ন। সবলা ভক্তিমতী প্রসন্নের

কথাতেই তাঁকে দেবীব নাম শোনান হয়। প্রসন্ন গদাইকে অত্যন্ত স্নেহ কবতেন। গদাইএব বাল্যসঙ্গী ছিল চিনু শাঁখাবী, খেলুড়ে ছিল দবিদ্র বাখাল বালকগণ। উক্ত লাহাদেব বাড়ীব সকলেই তাঁকে স্নেহ কবত, আপনজন ভাবত, তাঁকে আদব ক'বে কত কি খাওয়াত, তিনিও দ্বিধাশূন্য হ'য়ে তাদেব খাবাব গ্রহণ কবতেন। বংশগত সংস্কাব বা আভিজাত্য তাঁকে বিচলিত কবতে পাবে নি। ভালবাসাব দান সবসময়েই পবিত্র—ইহাই তিনি প্রমাণ কবেছিলেন। দীন দবিদ্র ব্যথিত ছিল তাঁব প্রিয়জন।

সাধাবণ নিয়ম, আগে ফুল, পবে ফল। শ্রীবামকৃষ্ণেব জীবনে আগে ফল অর্থাৎ আগে দর্শন ও সাক্ষাৎকাব, তাব পব সাধন; আগে বেদময় জীবন—বেদেব প্রকাশ—তাব পব অন্য সব। শাস্ত্রে নানা উপলব্ধিব কথা লিপিবদ্ধ আছে। দর্শনেব পব ঐ সমস্ত উপলব্ধিব সত্যতা পবীক্ষাব জন্যই তিনি সাধনে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন। সব জিনিষ তিনি নিজে 'বাজিয়ে' নিয়েছিলেন। পববর্ত্তীকালে তিনি সকলকে সব জিনিষ 'বাজিয়ে' নিতে বলতেন। সাধনকালে ৺জগদম্বাব দর্শনেব জন্য তাঁব হৃদয় কি আকুল হয়েছিল। ধ্যানে বসলে, তাঁব মাথায় পাখী ব'সে ঠোকবাত—তিনি যে স্থিব সেই স্থিবভাবে ব'সে আছেন। 'মা' 'মা' ববে কেঁদে তিনি ভূমিতে মুখ ঘর্ষণ কবতেন, মুখ বক্তাবক্তি হযে যেত, যে সব স্ত্রীলোকেবা তাঁকে ঐরূপে যন্ত্রণায় ছটফট্ কবতে দেখতেন, তাঁবাও কাতব হ'য়ে বলতেন, "আহা অমন কবছে, কোথায় হতভাগী ওব মা, আসে না কেন বাছাব কাছে?" ইত্যাদি। কেহ বা মনে কবতেন, তাঁব শূল বেদনা হয়েছে। শ্রীবামকৃষ্ণ পবে বলতেন যে, লোকে স্ত্রীপুত্রেব বিযোগে বা সম্পত্তি হাবিযে ঘটি ঘটি কাঁদে, ইষ্টেব জন্য কাঁদে যে সে তাব দর্শন পায়।

ছেলেবেলায় তাঁকে পাঠশালে পাঠান হয়। সেখানে তাঁব অক্ষবপবিচয় হয় ও সামান্য লিখতে পড়তে তিনি শেখেন। তাঁব অদ্ভুত সঙ্গীতশক্তিতে পাঠশালাব গুরুমহাশয় সছাত্রবর্গ মুগ্ধ হয়ে তাঁব গান শুনতেন—গদাই বালকদেব নিয়ে যাত্রাব পালা গাইতেন।

["ঠাকুবেব জীবনে সাধকভাবের প্রথম বিশেষ বিকাশ আমবা দেখিতে পাই, তিনি যখন কলিকাতায় তাঁহার ভ্রাতাব চতুষ্পাঠিতে—যে দিন বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হইবার জন্য অগ্রজ রামকুমাবেব তিবস্কার ও অনুযোগেব উত্তবে

তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন—'চাল-কলাবিদ্যা' আমি শিখিতে চাহি না; আমি এমন বিদ্যা শিখিতে চাহি যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়। তাঁহার বয়স তখন ১৭ বৎসর।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব)।]

[কথার ছটায়, যিশুর কসরতে, ধর্ম্মলাভ হয় না। সব মহাপুরুষ, নিজে আচরণ ক'রে উপদেশ দেন। হজরৎ মহম্মদ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। এক দরিদ্র বৃদ্ধের বৃদ্ধ বয়সের একটি ছেলে ছিল। ছেলেটি অত্যন্ত মিঠাইপ্রিয় ও আদুরে। প্রত্যহ মিঠাই যোগান দরিদ্রের পক্ষে কষ্টদায়ক। মিঠাই খাওয়া বন্ধ করতে না পারায়, ঐ বৃদ্ধ হজরতের শরণাপন্ন হন। হজরৎ একমাস পরে ছেলেটিকে আনতে বলেন। একমাস পরে বালকটি, মহম্মদের উপদেশ পেয়ে মিঠাইএর লোভ ত্যাগ করতে সমর্থ হয়। একমাস বিলম্ব করা হল কেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দেন, "আমার নিজেরই মিঠাইএর প্রতি আসক্তি ছিল। উপদেশ দেবার পূর্ব্বে এই একমাস আমাকে মিঠাইএর প্রতি টান ত্যাগ করতে হয়েছে, এখন মিঠাইএর প্রতি কোন টানই নেই, আর দেখ, উপদেশও কেমন ফলপ্রদ হয়েছে।" হজরতের শিষ্যবর্গ, মহাঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস ক'রেও স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করেছিলেন। তাঁদের জন্যই ব্যাপকভাবে ইসলামধর্ম্ম প্রসার লাভ করে।]

"চালকলাবাঁধাবিদ্যা শিখব না।" চালকলা মানে উদরপূর্ত্তি। যা দেখা যাচ্ছে, ধোলো সভ্যতায়, উদরপূর্ত্তিই জীবনের প্রধান লক্ষ্য, ধর্ম্ম একটি পোষাকী আচার—দশ রকম কাযের মধ্যে একটি উৎসাহহীন ক্ষীণ আচার। উদরের জন্যই শিক্ষা—এই আদর্শ জগতে অশান্তি এনেছে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ 'চালকলাবাঁধা' বিদ্যা পরিহার করলেন। উদরপূর্ত্তি জীবনের আদর্শ হ'তে পারে না, মনেরও খোরাক চাই। আচরণ নেই, সংযমী হবার চেষ্টা নেই, অথচ বিদ্যার অহঙ্কার ও সেই দম্ভের বশীভূত ঐ বিদ্যার অপপ্রয়োগে দরিদ্রশোষণ—ইহাই ধর্ম্মজগতের একটি গ্লানি। বেণেবুদ্ধির—কাঞ্চন লোভের—এই বিদ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা এসে ভেদবুদ্ধি বাড়িয়ে তুলেছে, সকল সমস্যার সমাধান প্রায় অসম্ভব ক'রে তুলেছে, তাই ঐ রকম বিদ্যার উপাসনায় জগৎ ঘোরতর অন্ধতমের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সেই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় বহিঃশিক্ষা উপেক্ষা ক'রেছিলেন। অন্তরের শিক্ষাই—মনুষ্যত্ব অর্জ্জনই—জীবনের লক্ষ্য, উদরপূর্ত্তি তার ফল, তার একটা দিক্ মাত্র। শুধু বহিঃশিক্ষা ত্যাগ ক'রে তিনি ক্ষান্ত হন নি। ঐ বহিঃশিক্ষার

ফল যে 'টাকা ও মাটি', সেই টাকা ও মাটি হাতে নিয়ে—'টাকা মাটি', 'মাটি টাকা' বাব বাব ব'লে উভয়ই—গঙ্গাগর্ভে ফেলে দিলেন! টাকা ও মাটি, উভয়ই তুল্য মূল্য—উভযই অন্নেব কাবণ, উভয়ই মানুষে মানুষে বিদ্বেষেব কাবণ। দম্ভ-দ্বেষ প্রসূত ঐ বিদ্যাই অবিদ্যা। শাস্ত্র বলেন, যিনি বিদ্যা অবিদ্যায ভেদবুদ্ধি না ক'বে বিদ্যাব উপাসনা কবেন অর্থাৎ আত্মবিকাশপব হন, তিনি দেবত্ব লাভ কবেন। শ্রীবামকৃষ্ণের ঐ কাঞ্চন-ত্যাগ, মাত্র বিচাব ক'বেই শেষ হয় নি। যে মন তাঁব কাঞ্চন ত্যাগ কবেছিল, সেই মনেব ক্রিয়া তাঁব দেহেব অণুপবমাণুকেও চেতন ক'বে তুলেছিল—মনমুখ যা ত্যাগ ক'বেছিল, তাঁব দেহেব অণুপবমাণুও তাই ত্যাগ কবেছিল! ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, দৈবাৎ অথবা অজ্ঞাতে ধাতুস্পর্শে তাঁব শবীব বিকল হত—হাত 'তেওড়ে' যেত!! এ বকম জীবন্ত বৈবাগ্যেব, এ বকম ত্যাগশক্তিব দৃষ্টান্ত, জগতেব ইতিহাসে এই প্রথম। জড় ও চেতন—এই দু'য়েব ভেদ কল্পনা এতদিন বৃথাই মানুষ কবেছে। 'চেতন যমুনা, চেতন বেণু' শোনা যায়, শোনা যায়নি তাব সঙ্গে, 'চেতন দেহেব অণুপবমাণু'। বহিঃশিক্ষা পবিত্যক্ত হয়েছিল; শ্রীবামকৃষ্ণ বাইবেব রূপও নিয়ে আসেন নি। শ্রীচৈতন্যেব পাণ্ডিত্য ছিল, অদ্ভুত রূপ নিয়ে এসেছিলেন তিনি; শ্রীবামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ছিলেন সর্ব্ববিদ্যায় পাবদর্শী, অতি সুন্দব ছিল তাঁদেব মূর্ত্তি। তাঁদেব রূপ ও পাণ্ডিত্য সকলকে সহজে আকর্ষণ কবত। নানা স্থানে ঘুবে তাঁবা ভাব প্রচাব কবেছিলেন। পাণ্ডিত্য ও রূপ তাঁদের দবকাব ছিল। শ্রীবামকৃষ্ণেব এসব কিছুই ছিল না। প্রচাবেব জন্য ঐ গুণগুলি ছিল তাঁব জীবন-ভাষ্যকাব স্বামী বিবেকানন্দেব। রূপ ও পাণ্ডিত্য না থাকলেও, শ্রীবামকৃষ্ণেব নিকট সব মতেব সব বকম সাধকেব সমাগম হয়েছিল। ৺জগদম্বার দর্শনে সত্যই মানবেব শান্তিলাভ হয় কি না তাই তিনি পবখ ক'বেছিলেন। তাঁব ঐ পবীক্ষা এই যুগকে সার্থক কবেছে।

মন ফাঁকি দেয়। মনেব জুয়াচুবি ধবা পড়ে ধ্যানচেষ্টায—মনকে একাগ্র কববাব চেষ্টায়। সংস্কাব যেতে চায় না। বিচাববুদ্ধিতে অনেক কিছু বোঝা যায়, কিন্তু উপলব্ধি আব এক বাজ্যে নিয়ে যায়। অভেদ জ্ঞানে সমদৃষ্টি হয়। জাত্যাভিমানেব সংস্কাব দূব কববাব জন্য তিনি কাঙ্গালীদেব ভোজনাবশিষ্ট পবিষ্কাব ক'বেছিলেন; মেথব অপেক্ষা তিনি

বড নন—ইহা প্রমাণ কববাব জন্য—তিনি তাঁব সাধনকালেব বড বড মাথাব চুল দিয়ে, মেথবেব অশুদ্ধি স্থানও পবিষ্কাব ক'বেছিলেন। দৃঢ কোন সংস্কাবকে তাড়াতে হলে ঠিক্ ঐ সংস্কাবেব বিপবীত আচবণ কবতে হয়; তাঁব আচবণ এই শিক্ষাই দেয়। দীনতাব চবম উপলব্ধি তাঁতে প্রকাশ পেয়েছিল।

শাস্ত্রে বিধি আছে, বিধি পালন কবতে হয়। সর্ব্বপ্রকাব বিধিকে অতিক্রম কবতে হয়, ইহাও ঐ শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে। একবাব জবা বিল্ব দিযে অর্ঘ্য সাজিয়ে, শ্রীবামকৃষ্ণ সেই অর্ঘ্য নিজেব মাথায়, বুকে, সর্ব্বাঙ্গে, নিজেব পায়ে ঠেকিয়ে দেবীব (কালী বিগ্রহেব) পাদপদ্মে অর্পণ কবলেন! অন্য সময়ে দেবীর সিংহাসনে উঠে মাকে অন্ন নিবেদন কবছেন ও বলছেন, "মা, আমি খাব? এই খাচ্ছি," সেই অন্ন নিজে কিঞ্চিৎ খেয়ে— "মা আমি খেয়েছি, এইবাব তুই খা"—বলছেন। আব একবাব, দেবীব ভোগ তিনি বিডালকে খাওয়ালেন! উল্লাস বর্ণনা পূর্ব্বে কিছু কবা হয়েছে। ঐ উল্লাসেব শেষে সাধকেব 'স্বৈবাচাব' স্বয়ং এসে পড়ে। মাতালেব 'আগলান্তং' মদ্যপান ও সাধকেব স্বৈবাচাবে 'আগলান্তং মহাপানে' আকাশ পাতাল প্রভেদ। শ্রীবামকৃষ্ণ, বেদ, তন্ত্র, পুবাণ—সকলকেই পূর্ণতা দিয়েছেন, সবাইকে ছাপিযে গেছেন। তাঁব সাধনায় সবই আজ জীবন্ত হয়েছে। অলিপানবত সাধক—মা মা ববে—কাতব হয়ে মাকে ডাকেন, মা নামে মত্ত হন। পান না ক'বেও শ্রীবামকৃষ্ণেব চক্ষু ভাবে লাল হত, বুকে বক্তেব আভা ফুটে উঠত, অবিকল মাতালেব মত টল্‌তে টল্‌তে মাব সিংহাসনে উঠে মাব চিবুক ধ'বে আদব করতেন, হাসি তামাসা কবতেন, শ্রীমূর্ত্তিব হাত ধ'বে নৃত্য কবতেন।

শ্রীবামকৃষ্ণেব বৈধী পূজা অসম্ভব হয়ে উঠল। অন্য পূজাবী নিযুক্ত হলেন। বাণী বাসমণিব জামাতা মথুববাবুব একান্ত প্রার্থনায় শ্রীরামকৃষ্ণ কালীবাড়ী ত্যাগ কবলেন না। কর্ম্ম ছাডায় কামাবপুকুবে নানা গুজব বট্‌ল। শ্রীবামকৃষ্ণ দেশে ফিবলেন। এইবাব তাঁব জননী চন্দ্রামণি দেবী, পুত্রেব বিবাহেব জন্য ব্যস্ত হলেন। শ্রীবামকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় বিবাহ কবলেন, বিবাহে ছিল তাঁব খুব স্ফূর্ত্তি। পাত্রীনির্ব্বাচনেও কাহাকেও বেগ পেতে হয়নি। শ্রীবামকৃষ্ণ নিজেই জানিয়ে দিলেন যে হেথা হোথা পাত্রীব

অন্বেষণ বৃথা, "জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বিবাহের পাত্রী 'কুটাবাঁধা' হয়ে রক্ষিত আছে।" শ্রীশ্রীমা—উক্ত রামচন্দ্রের মেয়ে—তখন সবে পাঁচ উত্তীর্ণ হয়েছেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীশ্রীমা—শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর 'বর' ব'লে চিনিয়ে দিয়েছিলেন। বিবাহের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সবে ২৩ উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিবাহের পর গদাধর, দেশে প্রায় ১ বৎসর ৭ মাস কাল ছিলেন; সে সময়ে তাঁর দিব্যোন্মাদ দেখে তাঁর জন্য ওঝা আনান হয়, 'ঝাড়ফুঁক্' করা হয়। তিনি দক্ষিণেশ্বর ফিরলেন। দেবী চন্দ্রামণির সংসারে তখন খুব অনটন, সুতরাং গদাধর শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবাকার্য্যে ব্রতী হলেন। কিন্তু পূজায় তন্ময় হলে কোথায় থাকত তাঁর সংসারচিন্তা, কোথায় থাকত তখন কামারপুকুরের কথা মনে! আবার দেবোন্মাদ দেখা দিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমান মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে বায়ুরোগাক্রান্ত মনে ক'রে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদকে দিয়ে তাঁর চিকিৎসা করান। রোগ উপশম হল না। ওদিকে দেবী চন্দ্রামণি কামারপুকুরে 'বুড়ো শিবের' কাছে হত্যা দিয়ে জানতে পারলেন যে তাঁর গদাধর পাগল নয়।

রাণী রাসমণির দেহত্যাগ হয়েছে। পূর্ব্বমত, তাঁর কনিষ্ঠ জামাতা মথুরবাবুর উপর মন্দির তত্ত্বাবধানের সব ভার পড়েছে। রাসমণির মন্দির-প্রতিষ্ঠা যেন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্যই হয়েছিল। মন্দির প্রতিষ্ঠিত হলেও, শাস্ত্রবিধিমতে তাঁর অগ্রজ সেখানে পূজারী থাকলেও, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম প্রথম কিছুদিন স্বপাকে আহার করতেন, মন্দিরের অন্ন গ্রহণ করতেন না। ৺রাসমণি ছিলেন কৈবর্ত্ত রমণী। অনেকে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন নাম যশের জন্য, কোন কামনা পূরণোদ্দেশ্যে; পুরোহিত সেখানে ঘণ্টা নেড়ে চিরাচরিত প্রথা বজায় রেখে যান ও 'চালকলা' বেঁধে তাঁর সংসার প্রতিপালন করেন। রাণীর যথার্থ অনুরাগ আছে কি না, তাঁর অগ্রজের পূজা 'চালকলা' বাঁধায় পর্য্যবসিত হয় কি না—ইহাই কি শ্রীরামকৃষ্ণ লক্ষ্য করছিলেন? শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে রাণীর যথার্থ অনুরাগ আছে—দেবসেবার জন্যই তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন—তাঁর অগ্রজের মধ্যেও সেবাবুদ্ধি প্রবল, তখন সেই জন্য কি তাঁর, পরে, প্রসাদগ্রহণে আপত্তি রইল না, পূজারী-পদ গ্রহণে কোন কুণ্ঠা রইল না, অথবা তখনও তাঁর

মধ্যে সূক্ষ্মভাবে বংশাভিজাত্যের সংস্কার ছিল ? যাই হোক্, এই কালে একজন আলুলায়িতকেশা সুন্দরী গৈরীকধারিণী প্রৌঢ়া ভৈরবী দক্ষিণেশ্বরে এলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেই ভৈরবী সজলনয়নে ব'লে উঠলেন, "বাবা তুমি এখানে রয়েছ! তুমি গঙ্গাতীরে আছ জেনে তোমায় কত খুঁজেছি, এতদিনে দেখা পেলাম।" ভৈরবী ছিলেন মহাবিদুষী, সুকণ্ঠ ও গভীর শাস্ত্রজ্ঞ। তন্ত্রমতে সাধনা করবার কথা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে 'ভৈরবী ব্রাহ্মণী' নামে, পরে ভক্তদের কাছে, তাঁর পরিচয় দেন। এই ভৈরবী ব্রাহ্মণীই প্রথম প্রচার করেন, "এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব শ্রীরামকৃষ্ণে।" 'অবতার' ব'লে বিশ্বাস থাকলেও, বাৎসল্যভাবে মুগ্ধা ব্রাহ্মণী, শ্রীরামকৃষ্ণকে শিশুর মতই দেখতেন। ব্রাহ্মণীর ঐ প্রকার উক্তি সত্ত্বেও, শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। প্রমাণ ভিন্ন তাঁর বিচারশীল মন কোন জিনিষ গ্রহণ করত না। নানা প্রকার তাঁর দর্শনাদি, মাথার বিকার কিনা তার প্রমাণ কি ? এতদিন তিনি বিশ্বাস ও অনুরাগ সহায়েই সাধনে অগ্রসর হয়ে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন। গুরুপরম্পরাগত শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথে এগিয়েছেন, কিন্তু শাস্ত্রে এমন কিছু আছে কি যার প্রত্যেক উপলব্ধিটি লিপিবদ্ধ আছে ? শুনলেন, তন্ত্রে সেই রকম আছে। তবে ত তা পরীক্ষা করা চাই। তিনি জগন্মাতার অনুমতি পেয়ে ব্রাহ্মণীর কাছে 'পূর্ণাভিষিক্ত' হলেন। পূর্ণাভিষিক্তের 'সর্ব্বাধিকার' প্রাপ্তি হয়। শাস্ত্রবিধির এই মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে, তিনি সব রকম সাধনা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু প্রথম প্রাপ্ত 'মা' নাম ছাড়েন নি তিনি আজীবন। তাঁর দীক্ষাগুরু কেনারাম ভট্টের নাম তখন শোনা যেত না। হয়ত তখন তাঁর দেহত্যাগ হয়েছিল অথবা তন্ত্রসম্মত উচ্চাঙ্গ সাধন দেবার 'অধিকার' তিনি প্রাপ্ত হন নি, কিম্বা হয়ত তিনি দূরদেশে ছিলেন। উচ্চাঙ্গ সাধন গ্রহণেচ্ছু সাধককে পূর্ণাভিষেকে ব্রহ্মমন্ত্র দেওয়া হয়। তন্ত্রমতে, ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণে গুরুবিচার ও কালাকাল বিচার নেই।

[তন্ত্র সাধনার্য, যে দেশে যে সাধনাচার সেই দেশের সেই আচার অবলম্বনীয়, তন্ত্রে সীমা নির্দ্দেশ করা আছে। বিন্ধ্যপর্ব্বতকে কেন্দ্র ক'রে তিনটি সীমার নাম— বিষ্ণুক্রান্তা, রথাক্রান্তা, অশ্বক্রান্তা। বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্ব হ'তে ব্রহ্মদেশের পশ্চিমাংশ ও

উত্তর মহাচীন পর্য্যন্ত—বিষ্ণুক্রান্তা, বঙ্গদেশ বিষ্ণুক্রান্তার অন্তর্গত। বিন্ধ্যপর্ব্বতের পশ্চিমোত্তর খণ্ডের নাম রথাক্রান্তা, দক্ষিণপশ্চিম খণ্ড অশ্বক্রান্তা। প্রতি ক্রান্তায় উপতন্ত্রসহ ৬৪ খানি তন্ত্র সাধনার জন্য বিহিত আছে। তখন যাতায়াতের পথ সুগম ছিল না, সুতরাং ঐ রকম বিভাগ সুবিধার জন্যই হয়েছিল অথচ কোন স্থানের আচারে হস্তক্ষেপ করা হয় নি। ভারতীয় তন্ত্রের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত ছিল, এই বিভাগ হ'তেই বোঝা যায়। বিস্তৃতির সময় যে সব অপরাপর যথার্থ সাধনাচার অন্যত্র ছিল, সেই সমস্তকে তন্ত্র আত্মস্থ করেন নিজস্ব ভাব দিয়ে; কোন স্থানের আচারকে নিজ ভাবে গ'ড়ে উঠতে তন্ত্র বাধা দেন নি।]

ব্রাহ্মণীর সাহায্যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বিষ্ণুক্রান্তার সমস্ত তন্ত্রেরই সাধনা করেছিলেন। অতি তীব্র আগ্রহে তিনি সাধনসাগরে ডুব দিলেন। গঙ্গাহীন দেশ হ'তে পঞ্চপ্রাণীর কঙ্কাল সংগৃহীত হল। দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর-বাড়ীর উত্তর সীমান্তস্থিত বিল্বতরুমূলে পঞ্চবটীতলে দুই বেদিকা নির্ম্মিত হ'ল। মুণ্ডাসনে দিবারাত্রি কোথা হ'তে কেটে গেল। জপও তিনি করতে পারতেন না, একেবারে সমাধিস্থ হতেন! কত অদ্ভুত দর্শন, কত উপলব্ধির পর উপলব্ধি এই সময়ে তাঁর হ'য়েছিল তার ইয়ত্তা কে করবে? তাঁর সাধনকথা উত্তরকালে তিনিই তাঁর ভক্তদের বলেন।

["একদিন দেখি, ব্রাহ্মণী নিশাভাগে কোথা হ'তে এক পূর্ণযৌবনা সুন্দরী রমণীকে ডাকিয়া আনিয়াছে এবং পূজার আয়োজন করিয়া ৺দেবীর আসনে তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিয়া বলিল, 'বাবা, সাক্ষাৎ জগজ্জননী জ্ঞানে ইহার ক্রোড়ে বসিয়া তন্ময়চিত্তে জপ কর'।—তখন আতঙ্কে ক্রন্দন করিয়া মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) বলিলাম, 'মা তোর শরণাগতকে একি আদেশ করিতেছিস? দুর্ব্বল সন্তানের ঐরূপ দুঃসাহসের সামর্থ্য কোথায়?'—ঐরূপ বলিবামাত্র দিব্যবলে হৃদয় পূর্ণ হইল এবং দেবতাবিষ্টের ন্যায়, কি করিতেছি, সম্যক না জানিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে রমণীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইবামাত্র সমাধিস্থ হইয়া পড়িলাম। অনন্তর যখন জ্ঞান হইল তখন ব্রাহ্মণী বলিল, 'ক্রিয়া পূর্ণ হইয়াছে বাবা, অপরে কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করিয়া ঐ অবস্থায় জপ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তুমি এককালে শরীরবোধ শূন্য হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছ।...।" "যেদিন সুরতক্রিয়াসক্ত নরনারীর সম্ভোগানন্দ দর্শনপূর্ব্বক শিব-শক্তির লীলা-বিলাস জ্ঞানে মুগ্ধ ও সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেইদিন বাহ্যচৈতন্য লাভের পর ব্রাহ্মণী বলিয়াছিল, 'বাবা তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ হইয়া দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহাই এই মতের (বীরভাবের) শেষ সাধন'।"]

ব্রাহ্মণী দেখলেন, শ্রীবামকৃষ্ণ হেলায় বীবভাবেব শেষসাধনে উত্তীর্ণ হলেন। বীবভাবেব পব দিব্যভাব; সুতবাং ব্রাহ্মণী বললেন "তুমি দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত্ হ'লে"। কিন্তু দিব্যভাবেব পূর্ণ প্রকাশ যে কি, তা তিনি জেনেছিলেন পবে, যখন তাঁব বাধাপ্রদান ও নিষেধ সত্ত্বেও, অদ্বৈত-বেদান্তেব সাধন, মুসলমান ধর্ম্মেব সাধন প্রভৃতিতেও শ্রীবামকৃষ্ণ সহজে সিদ্ধিলাভ কবেন, যখন বুঝলেন যে শ্রীবামকৃষ্ণ মানবমনেব সর্ব্বপ্রকাব সংস্কাব নিয়ে খেলা কবেন অথচ শ্রীবামকৃষ্ণ যে বালক সেই বালক। দিব্যভাবেব পূর্ণ প্রকাশ একমাত্র অবতাবপুরুষেই সম্ভব—জগতেব আধ্যাত্মিক ইতিহাস ইহা প্রমাণ কবে। দিব্যভাবেব পূর্ণপ্রকাশে, সাধাবণ জীবেব শবীব থাকে না। "দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধনেব সময় আমাব বমণীমাত্রে মাতৃভাব যেমন অক্ষুণ্ণ ছিল, তদ্রূপ বিন্দুমাত্র কাবণ গ্রহণ কখন কবিতে পাবি নাই!—কাবণেব নাম বা গন্ধমাত্রেই জগদ্যোনিব উদ্দীপনায় সমাধিস্থ হইতাম।" (উদ্ধৃতাংশ—শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব)। তন্ত্র সাধনাব ফলে, শ্রীবামকৃষ্ণ চেষ্টা ক'বেও অঙ্গে যজ্ঞসূত্রাদি ধাবণ কবতে পাবতেন না, তাঁব পবণেব কাপড়ও ঠিক থাকত না। ঐ সময়ে তাঁব অদ্বৈতবুদ্ধি বেড়ে গিয়েছিল। তিনি বলতেন "তুলসী ও সজনে গাছেব পাতা সমান পবিত্র বোধ হয়।" ঐ সময়েই তিনি দিব্যশক্তিপ্রভাবে জানতে পাবেন যে, উত্তবকালে বহু ব্যক্তি তাঁব কাছে ধর্ম্মলাভেব জন্য এসে কৃতার্থ হবে। ব্রাহ্মণীব সাহায্যে তিনি তন্ত্র সাধন সম্পূর্ণ কবেছিলেন আবার ব্রাহ্মণীও শ্রীবামকৃষ্ণেব সহায়তায় দিব্যভাবে আরূঢ়া হয়েছিলেন (ঐ. ঐ. গুরুভাব দ্রঃ)। বমণীমাত্রে সর্ব্বতোভাবে মাতৃজ্ঞান অক্ষুণ্ণ বেখে বীবভাবেব সাধন এ পর্য্যন্ত কেহ কবেন নি। আমরা দেখেছি—তন্ত্র বলছেন যে কলির মানব স্বভাব-দুর্ব্বল ও নাবীকে শক্তিস্বরূপিণীরূপে গ্রহণ কবতে পাবে না (বমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞান কবতে পাবে না) সুতরাং সস্ত্রীক ইত্যাদি—পূর্ব্বে বলা হয়েছে। ইহা বীবভাবেব কথা। 'কলিতে পাবে না,' অন্যযুগে বীবভাবেব সাধনায় ইহা সম্ভব হয়েছিল কি না তাবও কোন প্রমাণ নেই। তবে তন্ত্রেব ঐ উক্তি বীবভাবে বমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞানও সমর্থন কবে ইহা নিশ্চয়। যাই হোক্, কার্য্যতঃ দিব্যভাবেব সাধকদেব জন্যই ঐ ব্যবস্থা এতাবৎ ছিল। বীবেব ও দিব্য সাধকের একই উপায়ে যে একই গন্তব্যস্থান—ইহাই

শ্রীরামকৃষ্ণ পুনঃস্থাপিত করলেন। সাধারণের ধারণা, বীরভাবে শক্তি একান্ত আবশ্যক ; এই ধারণার জন্যই কেহ কেহ 'পরকীয়া' শক্তি গ্রহণেও কুণ্ঠিত হন না। লোকে এই জন্য তন্ত্রশাস্ত্রের নিন্দা করে। "আজীবন কখন তিনি স্বপ্নেও স্ত্রীগ্রহণ করেন নাই। অতএব মাতৃভাবাবলম্বী ঠাকুরকে বীরমতের সাধনসমূহ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাতে শ্রীশ্রীজগদম্বার গূঢ় অভিপ্রায় সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়।" (ঐ. ঐ. সাধকভাব)। বৈদিকযুগে সস্ত্রীক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হত। তন্ত্রযুগে 'স্ত্রী' শব্দটির পরিবর্ত্তে 'শক্তি' শব্দ ব্যবহারে যে একটি গভীর উদ্দেশ্য ছিল তা সাধকশ্রেণী পরে ভুলে যান বা সেই ভাব গুলিয়ে যায় বৌদ্ধপ্লাবন যুগে। বীরাচারী সাধক কুমারও হ'তে পারেন অথবা বিবাহিতও হ'তে পারেন। বিবাহিতের নিজ স্ত্রীই স্বশক্তি বা 'আদ্যশক্তি'। 'শক্তি' মানে যে ভোগ্যা নারী এ ভাব ভারতীয় তন্ত্রে ছিল না। অধুনা তন্ত্রসাধকদের মধ্যে দুটি ক্রম আছে।

["প্রধানতঃ নীলক্রম ও চীনক্রম এই দুই ক্রম অনুসারে দেবতার পূজাদি হইয়া থাকে। নীলক্রমের সাধকগণ শক্তি ব্যতিরেকে সাধন করিতে পারেন। পরন্তু চীনক্রমের সাধকগণ শক্তি ব্যতিরেকে কোনও কার্য্য করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে পূজা জপ প্রভৃতির সময় যে কোন স্থান হইতেই হউক, যে কোনরূপ একটি শক্তি আনিয়া বামে বা দক্ষিণে বসাইতেই হইবে।" (৺ বৃদ্ধ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার অনূদিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ষষ্ঠোল্লাসের টিপ্পনি দ্রঃ)।]

শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনব বীরভাবের সাধনায় বীরাচারী সাধককুল এবার তাঁদের পথ নির্ণয় করতে পারবেন—তাঁদের আদর্শ পাবেন। নানা ভাব মিশ্রিত হয়ে আছে যেখানে, তার মধ্য হ'তে শাস্ত্রে বিশ্বাসবান সাধকের পথ নির্ণয় করা ঐ আদর্শানুসরণ ছাড়া কঠিন হত। বিপরীত ভাবমিশ্রণ সম্বন্ধে কৌলমার্গ রহস্যের উপসংহারে গ্রন্থকার বলছেন—

["কালী তারা প্রভৃতি দেবতাভেদে কৌলাচারের কিছু কিছু ভেদ আছে ; দেবতা-ভেদে কৌলাচারের নামও ভিন্ন ভিন্ন ; যেমন—তারার উপাসনায় বিহিত কৌলাচারের নাম চীনাচার বা মহাচীনাচার।......বামাচার ও কৌলাচার ভিন্ন ; উভয় আচারেই পঞ্চমকারের সেবন বিহিত হইয়াছে।...দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি বৈদিকমার্গ পরিত্যাগ করেন নাই। বাঙ্গলাদেশ হইতে বিশুদ্ধ বৈদিকমার্গ বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এই জন্য বেদপরায়ণ দাক্ষিণাত্য বামাচারের আশ্রয় না লইয়া

দক্ষিণাচার হইতেই কৌলাচারে প্রবেশ করিতেন, আর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ বামমার্গের আশ্রয় লইয়া, পরে কৌলমার্গ অবলম্বন করিতেন। এইজন্য দাক্ষিণাত্য নিবন্ধে বিশুদ্ধ কৌলাচাব বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে বামাচারের গন্ধও নাই, কিন্তু বঙ্গীয় নিবন্ধগুলিতে প্রায়ই বামাচার ও কৌলাচার মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, কোনটি বামাচারের কথা, কোনটি কৌলাচাবের কথা তাহা বাছিয়া নেওয়া অনভিজ্ঞের পক্ষে দুঃসাধ্য।··· বামমার্গের সাধনা তামসিক সাধনা, কৌলমার্গের সাধনা সাত্ত্বিক সাধনা। বেদাচার-পরায়ণ সাধক সত্ত্বগুণপ্রধান, এইজন্য তাঁহার পক্ষে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তামসিক সাধনার প্রয়োজন হয় না, ঐহিক ভোগ কামনা করিলে তিনিও তামসিক বামমার্গ অবলম্বন করিতে পারেন।···এখনও বঙ্গদেশে কৌলমার্গেব সাধনা অন্তর্হিত হয় নাই, তবে প্রকৃত কৌলাচার অতি বিবল। প্রকৃত কৌলসাধক প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া স্বীয় আচার গোপন রাখেন বলিয়া কেহ তাঁহাদেব চিনিতে পারে না। ভোগলম্পট বিষয়াসক্ত ভণ্ডগণ কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হইয়া কৌলাচার বা বামাচারের ভাণ করত মদ্য পানে মত্ত হইয়া নানা কুৎসিত আচরণ করিয়া থাকে; ইহা দেখিয়াই জনসাধারণ প্রকৃত কৌলাচার বা বামাচারের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন।"]

দাক্ষিণাত্যে শ্রীবিদ্যাব সাধক বেশী, শ্রীকুলে বা কাশ্মীবাদি অঞ্চলে আদ্যা কালী ও শ্রীবিদ্যাব সাধক বেশী, বাঙ্গলায় বা কালীকুলে কালীসাধক বেশী, শ্রীবিদ্যার সাধক ও যথেষ্ট। সর্ব্বস্থানেই সববকম সাধক আছেন। নিয়ম এই যে, কালীকুলেব সাধক যেখানেই থাকুন, তিনি কালীকুলেব আচাব অবলম্বন কববেন। অন্যান্য কুল সম্বন্ধেও তাই অর্থাৎ যিনি যে আচাব অবলম্বন কবেছেন তাঁব সেই আচাবেই নিষ্ঠা দবকাব। অতএব আচাবেব বিভিন্নতা সত্ত্বেও যখন সিদ্ধি লাভ হয়, তখন সাধকেব অনুবাগই সিদ্ধিব কারণ, আচাব নয়। আচাব সাধকেব সহায় মাত্র।

এ স্থলে আমাদেব জেনে বাখা উচিত যে, সমস্ত বৌদ্ধতন্ত্র ব্যভিচাবেব প্রশ্রয় দেন নি। বৌদ্ধ বামাচাবেই পঞ্চমতত্ত্বেব ছড়াছড়ি। তাহাবই ভাব, ভাবতীয় তন্ত্রে, বিশেষ বাঙ্গলাব তন্ত্রে, চেপে ব'সে আছে। এমন কি পঞ্চমতত্ত্ব বিশেষ আবশ্যক ('বিশেষতঃ') বলা হয়েছে কোন কোন স্থানে। এ সব দেখে সমগ্র শাস্ত্রেব উপব দোষাবোপ কবা ঠিক নয়। ভাবতীয় তন্ত্র পঞ্চম সম্বন্ধে প্রতিনিধি দ্বাবাই কার্য্য সাধন করতে বলেছেন অথবা স্বদাব-বত থাকতে বলেছেন ইহা যেন আমাদেব সর্ব্বদা স্মবণ থাকে।

[তন্ত্রসাধনায় লক্ষণভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেবীব পূজায় মোট ১১৫ প্রকার শক্তির উল্লেখ দেখা যায়। ঐ স্থানের বর্ণনাদৃষ্টে ইহাই মনে হয় যে, ঐ সব শক্তি বীবসাধকেব পূর্ণাভিষিক্তা সহধর্ম্মিণী। বহু বিবাহ প্রচলন থাকায়, উক্ত ব্যবস্থায়—মনে হয়—কোন্ দেবীর সাধক কয়জনের অধিক বিবাহ কবতে পারবেন না তাও বেঁধে দেওয়া আছে। যে কোন ব্যবস্থাই থাকুক্ না কেন, বীরসাধকের প্রতি অনুজ্ঞা যে তিনি ক্রমশঃ বাহ্য ভাব ত্যাগ ক'বে অভ্যন্তরে প্রবেশ করবেন।]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেব মধুবভাবেব কথা, মীবাবাইএব কথা আমবা জানি। সে ভাবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ, আব সমস্তই প্রকৃতি। তন্ত্রেব সাধক সোঽহং চিন্তা কবেন, ব্রহ্মেব সহিত একাত্মভাব ধাবণ ক'বে :'অহং'কে শিবরূপী জেনে অপব সমস্তকেই শক্তি ব'লে স্বীকাব কবেন, ইহাই সাধকেব 'বণিতা' ভাব। দক্ষিণমার্গেব সাধকদেব মধ্যে 'শিব' ভাবের সাধনা প্রবল। তাঁদেবও শ্রেণী বিভাগ আছে। ঐ প্রকাব 'তদ্রূপিণী' ভাবে গৃহীত শক্তিই 'পবশক্তি'। "স্বশক্তৌ সিদ্ধমাপ্নুয়াৎ পরশক্তৌ সদাজপেৎ' বা "সিদ্ধমন্ত্রী কুলাচাবে পবযোষাম প্রপূজয়েৎ"—এসব বচন উড্‌বফ্ সাহেবও লক্ষ্য কবেছেন, সাধাবণেব ভ্রান্ত ধারণা সম্বন্ধে কটাক্ষ কবেছেন, আর আমাদের ধুবন্ধেবা কিছু না জেনেই দিগগজ। "সিদ্ধমন্ত্রী" কথাটি লক্ষ্য কবতে বলি। দশমহাবিদ্যাব মন্ত্রকে 'সিদ্ধবিদ্যা' বলা হয়। বংশ পবম্পবায় ক্রমাগত তিনপুরুষ যিনি সিদ্ধবিদ্যাব সাধনা কবেছেন তিনিই 'সিদ্ধমন্ত্রী'! সশক্তিক সাধনা কবতে হয়। স্বশক্তি মানে নিজ স্ত্রী (প্রথম) বা 'আদ্যশক্তি'। স্নুতবাং দেবীই 'পবশক্তি'। ঐ 'আদ্যশক্তি' এবং 'আদ্যাশক্তি' এই দুই কথা নিয়েও, তন্ত্রে গোলযোগ দেখা যায়, একটীব ঘাড়ে অপরটি চাপান হয়েছে। তন্ত্রে 'বাসনা' ব'লে দেওয়া আছে, সাধক যদি নিজেব বুদ্ধি না খাটিয়ে সদ্‌গুরুব উপদেশে চলেন এ সব ভ্রমেব হাত হ'তে সহজে নিষ্কৃতি লাভ কবেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব বীবভদ্র ঠাকুবের 'যুবতীব কোল্ মাগুব মাছেব ঝোল্'—উক্তিতে যে কোন আধ্যাত্মিক ভাব থাকুক না কেন, তিনি তা সাধনক্ষেত্রে বুঝিযে দেন নি, তাতে শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে ব্যভিচাব এসেছিল, তন্ত্রে সেই রকম দুষ্ট লোকের দ্বাবা বিপবীত অর্থ কবায় ও কথাব ওলট্ পালট্ কবায় নানা গোলযোগ এসেছে। তবে দীক্ষাব উদ্দেশ্যই যখন সত্বগুণ-স্ফূরণ স্পষ্ট ব'লে দেওয়া আছে তখন সাধকেব এ রকম ভ্রমও অন্যায়।

পথ নির্ণয়—২।

বাঙ্গলাব 'তন্ত্রে তথা ভাবতীয় সমগ্র সাধনশাস্ত্রে শ্রীবামকৃষ্ণ নতুন ভাব দিয়েছেন, যা সাধাবণে ভুলে গিয়েছিল তাতে নতুন প্রাণ এনে দিয়ে সাধক-কুলকে পথ নির্দ্দেশ কবেছেন। তন্ত্রেব সর্ব্বপ্রকাব সাধনাব তিনি 'মোড' ফিবিয়ে দিয়েছেন, 'ঈশাবাস্তং' ক'বে নিয়েছেন, যাতে সাধককুল আদর্শচ্যুত না হয়। সকল শাস্ত্রবিধিব পূর্ণতা সম্পাদন কবেছেন তিনি। বিধিব বিপর্য্যয় কবেন নি তিনি। সাধনকালে তাঁব সামনে চাব মকাবই থাকত। পূজাব উপকবণ হিসাবে সমস্তই থাকত, তিনি কোনটিকে ঘৃণাব চক্ষে দেখেন নি বা হেয় জ্ঞান কবেন নি। পান আদি না ক'বেও যে বীব ভাবেব সাধনে সিদ্ধিলাভ হয় তাই প্রমাণ কবেছেন তিনি। দুর্গাদি পূজাব সময় কোন কোন স্থলে মহিষ বলি দেওয়া হয়, কিন্তু মহিষ মাংস যাবা খায় তাবাই খায়—পূজক বা সেবক তাহা খান না। পান যে কবতেই হবে তা নয়, পানেব জন্য সাধক সাধনা কবেন না। সাধনে স্ফূর্ত্তিলাভ ও মন্ত্রার্থস্ফূবণেব জন্যই পানের ব্যবস্থা। বৈবাগ্য বশতঃ পানাদি হ'তে বিবত থাকাব নাম 'পবিসংখ্যাবিধি'। শ্রীবামকৃষ্ণ এই বিধি পালন কবেছিলেন অর্থাৎ ঐ বিধিবও পূর্ণতা লাভ হয়েছিল তাঁব উপকবণাদি দর্শন মাত্রেই ভাবোদ্দীপনায়। বৈধ স্থলেও যে নিবৃত্তিব বিধান তাব নাম 'পবিসংখ্যাবিধি'। (কৌলমার্গবহস্য দ্রঃ)। 'যদ্ ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুবায়াস্তথা " (শ্রীমদ্ভাগবৎ ১১শ স্কন্ধ দ্রঃ)। ঘ্রাণভক্ষ অর্থাৎ অবঘ্রাণই বিহিত, 'পান' নয়, সেইবকম 'ব্যবায়োঽপি প্রজয়া নিমিত্তভূতয়া, নতু বত্যৈ।' শ্রীবামকৃষ্ণ আনন্দাসনাদি যে সব বিপদ্‌সংকুল সাধন ক'বেছিলেন তাব সাধাবণ নাম 'দূতিযাগ'। তন্ত্র বিশেষে 'দূতিযাগ' পবস্ত্রীতে সম্পাদন কববাবও বিধি দৃষ্ট হয়। শ্রীবামকৃষ্ণেব 'দূতিযাগ' পূর্ণ হয় 'পশুদেব' ক্রীড়া দর্শনেই। পবমানন্দ তন্ত্রে, "অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠো যো যোঽসৌ সংসাবপাবগঃ। স এব যজনে দূত্যা অধিকাবী তু নাপবঃ॥"—যিনি অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠ ও সংসাব সমুদ্র পাবে অবস্থিত তিনিই দূতীযাগেব অধিকাবী (কৌলমার্গবহস্য দ্রঃ)। তন্ত্র এ স্থানেও দূতিযাগ সম্পূর্ণ কবতে বলেছেন 'স্বযোষিৎসু' (ঐ দ্রঃ)। এই ব্যবস্থা ঠিক্ 'স্বভাব দুর্ব্বল কলিব মানবেব' পক্ষেব ন্যায় ব্যবস্থা। শ্রীবামকৃষ্ণ সাধন কবতে ব'সেছেন, পূর্ণ মাতৃভাব ছাড়া তাঁব মধ্যে অন্য কোন

ভাব নেই। ঐ সাধন বীরের শেষ পরীক্ষা। বিধি অনুসারে 'পরস্ত্রী' আনা হয়েছিল; বিধির বিপর্য্যয় হ'য় নি তন্ত্র বিশেষের মতে ও; কিন্তু বালকের কাছে 'মা'ই সব! মানবের যাতে প্রবৃত্তি আছে, তাকে সংযম করবার জন্যই বিধির দরকার, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবৃত্তিও ছিল না, ঘৃণাও ছিল না।

শ্যামারহস্যে লিঙ্গাগমধৃত বচনে আছে, "মাতৃরূপং পরিত্যজ্য স্ত্রীরূপং শক্তিমাদরেৎ। স যাতি নরকং ঘোরং জন্ম কোটি শতানি চ॥" শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বিভিন্ন ভাবের সাধক আসতেন; তাঁদের আচরণ দেখে বলতেন "এখানকার (নিজের দেহ দেখিয়ে) মাতৃভাব, মধুরভাব নয়।" বড়াম্নায় তন্ত্রে"…পরাভক্তি প্রসাদেন মাতৃভাবে প্রপশ্যতি।…স্ত্রীভাবঃ কল্পনালাভঃ কল্পান্তরে সুসিদ্ধতি"॥ বামাচার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায়। বামাচার ত্রিবিধ। উক্ত তন্ত্রে মিথ্যাচারী ও তথাকথিত 'বীরে'র নিন্দা আছে। জিহ্বালোলুপ যথেচ্ছাচারপরায়ণ সাধকনামধারী ব্যক্তিদের দেখে শাস্ত্রের নিন্দা করা বৃথা।

["পুং ভাবঃ অলাভভাবঃ লাভভাবঃ বামাগতিঃ।
পরাভক্তি প্রসাদেন মাতৃভাবে প্রপশ্যতি॥ ২০৫॥
বামিনী কামিনী বর্জ্জ্যা পূজ্যা সর্ব্বত্র পূজিতা।
স্ত্রীভাবঃ কল্পনা-লাভঃ কল্পান্তরে সুসিদ্ধতি॥ ২০৬॥
(রহস্য বড়াম্নায় তন্ত্রে নিগমসন্দর্ভে ৪র্থ পটলঃ)।
"ইন্দ্রিয়ার্থো ধনার্থো বা যশার্থো বিধিলঙ্ঘনং।
প্রকাশ সাধকবেশো মিথ্যাবেশ পরায়ণঃ॥৩২॥
ততোঽধিকো ভবেন্ মন্ত্রী মন্দকামপরায়ণঃ।
বামাচারঃ ত্রিবিধশ্চ প্রবর্ত্তঃ সিদ্ধিঃ সাধনং॥৩৩॥
বামাভাবো মহাভাবঃ তত্ত্বমসি অভেদকঃ।
বামা ভূত্বা যজেদ্ বামাং সাধনং সিদ্ধিলক্ষণং॥৩৪॥
বিভাবঃ কল্পিতভাবঃ ক্রমে সিদ্ধিপ্রদায়কঃ।
কল্পনা দক্ষিণাভাবঃ শিবো ভূত্বা যজেৎ শিবাং॥৩৫॥
(ঐ. ঐ)।]

["বামা ভূত্বা যজেদ্বামাং", এই ভাব হ'তে ঐ সাধনের নাম বামাচার; আবার 'বাম' মানে বিপরীত। 'ম'কারাদির প্রয়োগ সাধারণ ধর্ম্মাচারের বিপরীত, ঐরূপ বিপরীত আচার সম্পন্ন হ'য়েও, শাস্ত্র সাধককে পূর্ণ সংযমে থাকতে শিক্ষা

দেন, এজন্যও ঐপ্রকার আচারকে বামাচার বলা হয়। "কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হইয়া মস্তকস্থ সহস্রারে উঠিবার সময় মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি চক্রকে বামাবর্ত্তে পরিবেষ্টন এবং চক্রস্থ বর্ণ সকলকে নিজাঙ্গে মিলিত করিয়া লয়েন, এবং সমাধিভঙ্গের পর মস্তক হইতে পুনরায় মেরুচক্রে আসিবার সময় প্রতি চক্রকে বিপরীত ভাবে অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্তে পরিবেষ্টন করিতে করিতে নিম্নে নামিয়া আসেন, কুণ্ডলিনী শক্তিকে ঐরূপ জনসাধারণে বামাবর্ত্তে পরিভ্রমণ করাইয়া সহস্রারে উঠাইয়া সমাধিমগ্ন হইতে যে আচার শিক্ষা দেয় তাহাই বামাচার।" (ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ)।]

শেষ অর্থটি, ব্যাপক ভাবের অর্থ। বামাচারেও 'বাম' ও 'দক্ষিণ' আছে। অনেকের ধারণা 'ম'কার নিয়ে সর্ব্বপ্রকার সাধনাই বামাচার। ত্রিকূটা-রহস্যে বামাচারের লক্ষণ, "বামাচারং প্রবক্ষামি শ্রীবিদ্যাসাধনং প্রিয়ে। যং বিধায় কলৌ শীঘ্রং মান্ত্রিকঃ সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ॥ মালা নৃদন্তসম্ভূতা পাত্রং মানুষমুণ্ডকং। আসনং সিংহ চর্ম্মাদি কঙ্কনং স্ত্রীকচোদ্ভবং" ॥ ইত্যাদি। (কৌলমার্গরহস্যে ধৃত)। ইহার পর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ঐ বর্ণনায় মুখ্য 'ম'কার অর্থাৎ মদ্যের নাম ও নেই, অন্য তন্ত্রে অবশ্য মুখ্য 'ম'কারের কথা আছে। ইহাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই; ভারতীয় তন্ত্রে সাধককে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া আছে। তন্ত্ররাজতন্ত্রেও পঞ্চম 'ম'কারের নাম পর্য্যন্ত নেই। বামাচারীর মধ্যে এরকম সাধক আছেন যিনি সম্পূর্ণ নিরামিশভোজী ও সত্ত্বগুণী। শ্বেতকালীও আছেন। ত্রিকূটারহস্য বা তন্ত্ররাজতন্ত্র, পশুতন্ত্র নয়। কথিত আছে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ছিলেন বামাচারী কৌল ও শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন সর্ব্বজনবিদিত কৌল। তন্ত্রের 'পরশক্তি' ও বৈষ্ণবের 'পরকীয়া' এক বস্তু বোঝায় না। 'পরকীয়া' সম্বন্ধেও সাধারণের ভুল ধারণা বর্ত্তমান।

বৈষ্ণব কবি ভাবের স্বরূপ নিয়েছেন। "এ দেহে সে দেহে একই রূপ। তবে সে জানিবে রসেরই কূপ॥ এ বীজে সে বীজে একতা হবে। তবে সে প্রেমের সন্ধান পাবে॥" চণ্ডীদাস অন্যত্র বলছেন, "স্বরূপে আরোপ যার রসিক নাগর তার প্রাপ্তি হবে মদনমোহন॥" এই স্বরূপ আরোপের পরিণতি শ্রীচৈতন্যে—"মহাভাগবৎ দেখে স্থাবর জঙ্গন, তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ। স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি, সর্ব্বত্র

হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি।” নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু—হয় পরিণত ‘তুঁহুতে’ বা ‘মুইসেই’ ভাবে। সাধনাবস্থায় বৈষ্ণবসেবক দীনভাব অবলম্বন করেন। সর্ব্ব আপদ, সর্ব্ব দুঃখ বরণ ক’রে ইষ্টে একান্ত নির্ভরশীল ভাবই দীনভাব আনায়। এই দীনতার অপপ্রয়োগে আসে—মনুষ্যত্বাপহারী প্যান্‌পেনে ভাব। সখীভাব বা মধুরভাব কখন জাতিগত হয় না। যদিও নায়িকা সাধনে “শুষ্ক কাষ্ঠের সম দেহ করিতে হয়” অথবা “স্বরূপ বিহনে রূপের জনম কখন নাহিক হয়,” তথাপি ব্যবহারিকে “বাইরে দক্ষিণে, থাকিবি পশ্চিমে, বলিবি পূরব মুখে। গোপন পিরিতি গোপনে রাখিবি ··” ব্যক্তিগতভাবেই সাধন হয়, প্রচার হয় না। প্রচারে পতন অনিবার্য্য। ‘বিশুদ্ধচিত্তে শুদ্ধসত্ত্ব প্রকাশ পায়, সূর্য্যাংশুরূপ প্রেমের কিরণে রুচির উদয় হয়, ঐ রুচিই ভাব।’ ঘনীভূত জমাট ভাবই প্রেম। এই প্রেমই মহাভাবে পরিণত হয়।

[“শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মাপ্রেমসূর্য্যাংশুভাক। রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে।” (শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)। অন্যস্থানে, “···সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।” (সান্দ্রাত্মা = জমাট ঘন)]

শ্রীরূপ গোস্বামী সাত্ত্বিক ভাবের চার স্তর দেখিয়েছেন—ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত। ‘ধূমায়িত’ ক্রমবর্দ্ধিত হ’য়ে ৪র্থ অবস্থায় উপনীত হয়। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলেছিলেন “প্রেম কি কৈতব? অকৈতব ধন জীবে কি সম্ভবে সনাতন?” কৈতব মানে হেতুযুক্ত। যে প্রেমে হেতু বা স্বার্থ গন্ধ থাকে তাহাই কৈতব। ‘স্বকীয়া’ প্রেম হেতুক। অতএব অহেতুক প্রেমই অকৈতব বা ‘পরকীয়া’। এই অকৈতব প্রেম কেবল অবতার বা অবতারকল্প পুরুষেই সম্ভব হয়। ভাবসাধনে ভাবের আধার চাই। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে চণ্ডীদাস ঠাকুর ‘বামীকে’ তাঁর প্রেমের আধার কল্পনা ক’রে সিদ্ধ হয়েছিলেন। বামীকে তিনি তাঁর ‘পিতামাতা’ প্রভৃতি বলেছেন। এ রকম স্থূল বা বাহ্য আধার কল্পনা ক’রে সাধনা ব্যক্তিগত হ’তে পারে, সমাজগত হ’তে পারে না।—সাধক ও সাধকের ঐ রকম আধার—উভয়েরই দেহ মন—শুদ্ধ ও চিন্ময় হওয়া চাই। তাই মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিলেন, যোষিৎসঙ্গ বর্জ্জন করলেন এবং নিজে ‘পরকীয়া’ ভাব সাধন ক’রে ভক্তিশাস্ত্রে এক অভিনব উচ্চাঙ্গ সাধন পথ দেখালেন।

তাঁর 'না সো রমণ, না হাম্ রমণী'—পুংস্ত্রীরূপ ভেদজ্ঞান শূন্যতা। পঞ্চ ভাব—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—পারিবারিক জীবন হ'তে গৃহীত; কিন্তু ঐগুলির সাধনায় পারিবারিক বৃত্তিগুলির মোড় ফিরে যায়, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্র মধুময় হয়ে যায়। শ্রুতির সেই বৃক্ষের উপর দুটি পাখীর গল্প মনে পড়ে। একটি নির্ব্বিকার ও জ্যোতির্ম্ময় সদানন্দ, অপরটি নানা রকম ফল খাচ্ছে, ঊর্দ্ধের নির্ব্বিকার পাখীটিকে দেখছে মহা তৃপ্তদৃষ্টিতে, আবার ফল খাচ্ছে—একটু একটু এগুচ্ছে ও ঊর্দ্ধের পাখীটিকে দেখছে। শেষে, ঊর্দ্ধে উঠে, দ্বিতীয় পাখীর শরীরে বিলীন হ'যে একাত্ম হয়ে গেল। একটি জীব, অপরটি 'পুরুষ'। 'পুরুষের' দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে প্রথমটি শাখার পর শাখায় উঠেছে। ছোট 'অহং', বড় 'অহং'এর দিকে চলেছে ও শেষে বড় 'অহংএ' মিলিত হচ্ছে।

প্রেমময়ত্বই পূর্ণত্ব, এই 'পূর্ণং'কে, বৈষ্ণবসাধক পাঁচদিক্ দিয়ে দেখেছেন, ভাবকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। "ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" সুতরাং যিনি যে ভাবের সাধক তাঁর কাছে সেই ভাবই শ্রেষ্ঠ, সেই ভাবই পূর্ণ। বাঙ্গলার বৈষ্ণবসাধক, শান্তের স্বরূপ ভাব, দাস্যের স্বরূপ ভাব অর্থাৎ প্রত্যেকটি ভাবের স্বরূপ সাধন ক'রে জীবনকে মধুময় করেছেন। 'চিদ্বিভ্রবদ্বপু সকল সুন্দরসন্নিবেশং'—এই সর্ব্বসৌন্দর্য্যই, প্রেমস্বরূপই একমাত্র আরাধ্য বস্তু। এই 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দর' বিশ্বে দুইরূপে আপন মধুরিমা বিকাশ করছেন—একটি 'পুরুষ', একটি 'স্ত্রী'। ঐ মিথুনই 'হংস'। "একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে · সন্নিবিষ্টঃ। তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽনায়॥" —'তেজরূপ সলিল-সন্নিবিষ্ট একটি হংস এই ভুবনমধ্যে আছেন, সাধক তাঁকে জেনেই মৃত্যু অতিক্রম করতে পারেন—অন্য উপায় নেই'। মধুর-ভাবে 'সুন্দরের' দুই বিগ্রহ—রাধা ও কৃষ্ণ—উভয়ের প্রেমে উভয়ে বিভোর! এই বিশ্বভোলা সুন্দরের সাধনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধক অতি তীব্র উদ্দামভাবে —স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ গতিতে—বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, ঘৃণা, লজ্জা আদিকে—সর্ব্বপ্রকার কামনাকে, সর্ব্বপ্রকার বিধিকে ভাসিয়ে দিয়ে সেই রসস্বরূপের রসপিযূষধারা পান ক'রে, আত্মহারা হ'য়ে, সাধনায় এক অভিনব মধুময় পথ জগৎকে দেখিয়েছেন—ভাবরাজ্যের পূর্ণমূর্ত্তি প্রকাশ করেছেন।

'বড় অহং'ই পুরুষ বা আত্মা। তিনিই একমাত্র চেতন। শ্রুতি বলেন, জায়া পুত্রাদি প্রিয় হয়—ঐ প্রেমস্বরূপ আত্মার জন্যই—জায়া আদির জন্য জায়া প্রিয় হয় না। প্রকৃতির লীলা—পুরুষের প্রীতির জন্যই। বৈষ্ণব বলেন, ঐ পুরুষই কৃষ্ণ এবং সাধক মাত্রেই প্রকৃতি—কৃষ্ণ ছাড়া অন্য সমস্তই প্রকৃতি। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিই প্রাকৃতকাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিই প্রেম। সাধকের নিজের জন্য কোন চেষ্টা নেই, নিজের নিজত্ব বা স্বকীয়ত্ব পর্য্যন্ত 'পরার্থে' অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রীতির জন্য নিয়োজিত। ইহাই 'পরকীয়া' সাধনের গূঢ় রহস্য। 'স্ব' ও 'পর'—এই দুই কথার মধ্যে প্রকৃতির স্বকীয়ত্ব বাদ দিলে থাকেন একমাত্র 'পর' (পুরুষ) বা কৃষ্ণ। এই পরার্থই 'পরকীয়া' ভাব—পরস্ত্রী নয়। বৈষ্ণবসাধক বলেন, যে, গৃহকর্ম্মরতা কুলটার মন যেমন সর্ব্বক্ষণ তার উপপতিতে প'ড়ে থাকে ও সেই 'টান' যেমন উদ্দাম এবং সর্ব্বরকম বাধাবিঘ্ন না মেনে উপপতিতে মিলিত হ'তে চায়, সেই উদ্দাম টানই 'পরকীয়া' সাধনে গ্রহণীয়। 'আত্মেন্দ্রিয়' ও 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়'—এই দুই কথার মধ্যে 'ইন্দ্রিয়' কথাটি নিয়েই সাধারণে গোলযোগ পাকায়।

সব ভাবের সাধকই সংসারকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখেন না—সংসার তাঁদের সকলের কাছেই তুচ্ছ। ভক্ত সাধক চিনি হ'তে চান না, চিনির আস্বাদ নিতেই চান। তাঁর উক্তি, 'তুমি আছ ও আমি আছি।' এই ভাবে সাধক ইষ্টকে 'আরো কাছে'—'আরো কাছে'—ভাবতে ভাবতে ইষ্টের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান দেখা যায়, তথাপি তিনি জোর ক'রে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন! বৈষ্ণব কবির মিলনেও স্বাতন্ত্র্য বর্ত্তমান, দিব্য 'সম্ভোগের ভাব' বর্ত্তমান। 'নাম সাধন' গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। শ্রীচৈতন্য বলেছেন যে, তিনিই নাম সাধনের অধিকারী যিনি 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরীব সহিষ্ণুণা। অমানিনা মানদেয়ং কীর্ত্তনীয়া সদা হরিঃ॥" এবং বৈষ্ণব তিনিই যাঁকে দেখলে কৃষ্ণনাম মনে উদয় হয়—ভগবদ্ভাব জেগে ওঠে।

মধুরভাব, সমস্ত .ভাবের সমষ্টি, এমন কি ততোধিক—বৈষ্ণব মতে। শ্রীচৈতন্য বিষয়সুখ বিষবৎ পরিত্যাগ ক'রে দেশে ব্যভিচার বন্ধ ক'রেছিলেন, মহাভাবে ভাবিত তাঁর স্পর্শে কত পাষণ্ডের উদ্ধার সাধন হয়েছিল, তার

ইতিবৃত্ত সামান্যই লিপিবদ্ধ হয়েছে ব'লে মনে হয়। মিলনে যে সত্যই অষ্ট সাত্বিক বিকাব উপস্থিত হয় তা প্রমাণ কবেছেন মহাপ্রভু তাঁব জীবন দিয়ে। মধুবভাব সাধনায়, সাধক শ্রীভগবানকে পতিরূপে ভাবেন। ভাবেব গাঢত্বে 'মুই সেই' বা 'সাহং' বোধ জাগ্রত হয়। পুরুষ সাধক নিজেব পুংস্ব অন্য ভাব সহায়ে অপনয়ন কবেন, আবো অগ্রসব হলে তিনি 'আমি স্ত্রী' এই ভাবেবও অতীত হ'তে পাবেন। কিন্তু "বৈষ্ণব গোস্বামী উহা অস্বীকাব পূর্ব্বক সখীভাব প্রাপ্তিই সাধ্য এবং মহাভাবময়ী শ্রীবাধিকাব ভাব লাভ সাধকেব পক্ষে অসাধ্য বলিয়া প্রচাব কবিলেও উহাই সাধকেব চবম লক্ষ্য বলিয়া অনুমিত হয়" (শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব)। বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত মধুব ভাবেব সাধনা, প্রাচীন গোস্বামীগণ কবেছিলেন, তাব প্রমাণ তাঁদেব গ্রন্থাবলী হ'তে পাওয়া যায়। উক্ত ভাবসাধনা তাঁবা সাধাবণেব কাছে প্রকাশ কবেন নি। পাছে অসাধকেব হাতে প'ড়ে শাস্ত্র বিকৃতভাবে গৃহীত হয়—এজন্য তাঁরা ঐসব ভাব গোপন বেখেছিলেন, এমন কি প্রকাশে অভিসম্পাৎ কবেছেন। চিন্ময়ভাব সকলেব জন্য হ'তে পাবে না।

["কৃষ্ণস্য সুখে পীডাশঙ্কয়া নিমষস্যাপি অসহিষ্ণুতাদিকং যত্র স রূঢো মহাভাবঃ। কোটি ব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত সুখং যস্য সুখস্য লেশোঽপি ন ভবতি, সমস্ত বৃশ্চিক সর্পাদি দংশকৃত দুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশো ন ভবতি, এবম্ভূতে কৃষ্ণসংযোগবিয়োগয়োঃ সুখদুঃখে যতো ভবতঃ স অধিরূঢঃ মহাভাবঃ॥ অধিরূঢস্যেব মোদন মাদন ইতি দ্বৌরূপৌ ভবতঃ" ॥ ইত্যাদি। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ভক্তিগ্রন্থাবলী (শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাবে ধৃত বচন)।

"যে চিত্তং তনু ক্ষোভয়ন্তি তে সাত্বিকাঃ। তে অষ্টৌ স্তম্ভঃ স্বেদঃ বোমাঞ্চ স্বরভেদঃ—বেপথু—বৈবর্ণ্যাশ্রু প্রলয় ইতি। তে ধূমায়িতা জ্বলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তা সুদীপ্তা ইতি পঞ্চবিধা যথোত্তর সুখদাঃ স্যুঃ—(আকর গ্রন্থ"—ঐ—ঐ ধৃত বচন)। তন্ত্রে—"বামভাবো মহাভাবঃ সকল-মূর্ত্তি-সেবনং। স্বভাবঃ সুভাবো ভাবো বিভাবো অংশরূপকঃ ॥২২৬॥ বামাচারঃ পঞ্চভাবঃ পঞ্চরসসমন্বিতঃ। স্বয়ং কামকলা ভূত্বা বন্দনং পরমং প্রীতং ॥২২৭॥ সুভাবো যুগলধ্যানং যোগজ্ঞানসমন্বিতং। ভাবঃ সুললিতাকারঃ পরস্পববসান্বিতঃ ॥২২৮॥ বিদগ্ধা রসিকং বেত্তি রসজ্ঞো রসসাধনং। ক্রিয়াভাবো বিভাবানাং একভাবো বিধিমতঃ" ॥২২৯॥ পুনঃ "একবৃক্ষসমারূঢো দ্বিখগঃ শক্তিসংযুতঃ। সমোজ্জ্বলা লীলা কেলিঃ পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডব্যাপিতা" ॥২৫১॥ (রহস্য বড়াম্নায় তন্ত্রে নিগম সন্দর্ভে ৪র্থ পটলঃ)]

পতিভাবে সাধনা স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক ও সহজ হ'তে পারে, কিন্তু পুংশরীরধারী হ'য়ে শ্রীগৌরাঙ্গ কেন ঐ ভাব গ্রহণ করলেন—ইহা বুঝতে হলে দেশের তখনকার আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝতে হবে।

["পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, বৌদ্ধযুগের অবসানকালে দেশে বজ্রযানরূপ মার্গ এবং ঐমতে আচার্য্যগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন— নির্ব্বাণপ্রয়াসী মানবমন বাসনাসমূহের হস্ত হইতে মুক্তপ্রায় হইয়া ধ্যান সহায়ে যখন মহাশূন্যে লীন্ হইতে অগ্রসর হয়, তখন 'নিরাত্মা' নামক দেবী তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে ঐরূপ হইতে না দিয়া নিজাঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখেন, এবং সাধকের স্থূলশরীররূপ ভোগায়তনের উপলব্ধি তখন না থাকিলেও সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্ট তাহাকে ইন্দ্রিয়জ সর্ব্ব ভোগসুখের সার সমষ্টি নিত্য উপভোগ করাইয়া থাকেন। স্থূলবিষয় ভোগত্যাগে ভাবরাজ্যের সূক্ষ্ম নিরবচ্ছিন্ন ভোগসুখপ্রাপ্তিরূপ তাঁহাদিগের প্রচারিত মত, কালে বিকৃত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন স্থূলভোগ প্রাপ্তিকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য করিয়া তুলিবে এবং দেশে ব্যভিচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ ঐ সকল বিকৃত বৌদ্ধ ধর্ম্মমত অবলম্বন করিয়া নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। উচ্চবর্ণ অধিকাংশের মধ্যে তন্ত্রোক্ত বামাচার বিকৃত হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার সকাম পূজা ও উপাসনাদ্বারা বিভূতি ও ভোগসুখ লাভরূপ মতের প্রচলন হইয়াছিল।·· ভগবান শ্রীচৈতন্য নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া অদ্ভুত ত্যাগ বৈরাগ্যের আদর্শ ঐ সকল সাধকের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।...ঐরূপে পথভ্রষ্ট লক্ষ্যবিচ্যুত বহুল বিকৃত বৌদ্ধ সম্প্রদায় সকল তাঁহার কৃপায় পুনরায় আধ্যাত্মিক পথে উন্নীত হইয়াছিল। বিকৃত বামাচারীর দল সকল প্রথম প্রথম প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও পরে তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব জীবনাদর্শের অদ্ভুত আকর্ষণে ত্যাগশীল হইয়া, নিষ্কামভাবে পূজা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শনলাভ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব) ।]

এইরূপে বৌদ্ধ বামাচার ভারতীয় তন্ত্রে স্থান পেয়েছে। যে মেথর ও হাড়ি সম্প্রদায় আজ অস্পৃশ্য, বৌদ্ধতন্ত্রযুগে সেই হাড়ি, পুরোহিতের কাজ পর্য্যন্ত করেছে। শুনেছি, পূজার ন্যায় 'মহত্তর' কর্ম্মে রত 'মহত্তরের' অপভ্রংশই মেথর। ঐ 'মহত্তর' ও হাড়ি—বৌদ্ধতন্ত্রের হীন ও বীভৎস সাধনায় মলমূত্র ও অতি কদর্য্য এবং ক্রূর পন্থা অবলম্বন করায় এবং তাহারাই ঘরে ঘরে পুরোহিতের কায করায় সমাজের অধঃপতন আসে।

যুগযুগান্তব্যাপী শীলানুশীলন, সদাচাব, ধর্ম্মাচাব ও সর্ব্বপ্রকাব শিক্ষা হ'তে বলপূর্ব্বক ঐ সব নিম্ন জাতিদেব বঞ্চিত ক'বে বাখাব বিষম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় বৌদ্ধ প্লাবনে। জীবনাদর্শ নিজেবা না দেখিয়ে যাদেব অস্পৃশ্য ক'বে বাখা হয়, দায়ী তাবা নয়—এই প্রতিক্রিয়াব জন্য দায়ী হিন্দুসমাজ, দায়ী পুবোহিতকুল। তন্ত্রশাস্ত্রেব কারুণ্য এইখানে যে, ঐ সব কদাচাবেব মধ্য দিয়েও তন্ত্রসাধক সাধন পথ খুঁজেছেন, কাবণ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' যদি সত্য হয়, উহাব মধ্যেও সত্য আছে—ঐবকম সাধন 'পাইখানাবপথ' হলেও! এই 'পাইখানাবপথে' কত সাধকেব যে পতন হয়েছে কে জানে? কিন্তু সত্যলাভে দৃঢপ্রতিজ্ঞ, ঐ 'পাইখানাব পথে', যে সব সাধক অগ্রসব হ'তে গিয়ে বিফলকাম হয়েছিলেন, তাঁবা ও পূজ্য—পতনসত্বেও সাধকচমূ পতাকা হস্তে বীরদাপে একের পব একে এগিয়েছেন—শেষে একটা 'পথ' আবিষ্কাব ক'বে ক্ষান্ত হয়েছেন! এই বকম তীব্র নিষ্ঠা ভারতেই সম্ভব।

[বজ্রযান (মহাযান-শাখা) লামাবাদেরই অঙ্গ। লামাদের আদি গুরুর নাম পদ্মসম্ভব। তিনি তাঁর শিক্ষাকে 'রহস্য বিদ্যা' নাম দিয়ে গোপন রেখেছিলেন। তাঁর পাঁচজন নারী শিষ্যেরা ঐ গুপ্ত বিদ্যা প্রকাশ করেন। বিশ্বকল্যাণই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। এখানে এই মাত্র বললেই হবে যে, বজ্রযানমার্গে ভারতীয়-তন্ত্রের বহু নাম পাওয়া যায়, কিন্তু সবগুলি ভারতীয় ভাবে গৃহীত নয়। 'রুদ্র' ও তিব্বতীয় রুত্র একই ধাতু হ'তে নিষ্পন্ন হলেও আমরা 'রুদ্র' বলতে বুঝি প্রলয়দেবতা, সর্ব্ব বন্ধনদূরকর্ত্তা, 'রুদ্রবক্তে্র' কথা আমরা পূর্ব্বে পেয়েছি। কিন্তু 'রুত্র' মানে, সর্ব্বপ্রকার দম্ভ, অহংকার লোভ, বদমাইসি ও ভীষণতার প্রতীক (যথা—'মাতমরুত্র = দেহগত দম্ভ ইত্যাদি)। মাতম্রুত্রের জন্ম হয় লঙ্কায়। দেবী কালিকা তাকে লঙ্কা জয় করতে বলেন। ঐ রুত্রের প্রধান আড্ডা হয় মালয় পর্ব্বতে। তন্ত্রশাস্ত্রে যতপ্রকাব বীভৎস আচার বর্ণিত আছে, সে সমস্তগুলির প্রথম প্রবর্ত্তক, মাতম্রুত্র। পূর্ব্ব জন্মে এই রুত্র বুদ্ধত্ব লাভ করতে গিয়ে বিভূতির লোভে তার পতন হয়। মাতম্রুত্র যাতে বুদ্ধত্ব লাভ করতে সমর্থ হয় তার জন্য বুদ্ধবজ্রসত্ত্ব ও বোধিসত্ত্ববজ্রপাণীকে—হয়গ্রীব ও বজ্রবারাহীরূপে—অবতীর্ণ হ'তে হয়। মাতম্রুত্রের স্ত্রী 'ক্রোধীশ্বরী' যখন একলা আছেন সেই সময়ে হয়গ্রীব—মাতমের রূপ ধ'রে—ক্রোধীশ্বরীর সতীত্ব নষ্ট করেন। শেষে অবশ্য মাতমের মুক্তি লাভ হয়। এই উপাখ্যান প'ড়ে শ্রীবৃক্ষ-

তুলসী ঘটিত যে গল্প আছে তাহা মনে পড়ে। ভারতীয় তন্ত্রের 'মহাকাল' ও বজ্রযানের 'মহাকাল' একার্থক নয়। বজ্রযানের শূন্যৎ, অশরীরী যোনি। ভারতের হয়গ্রীব, বজ্রযানের হয়গ্রীব নয়। এই রকম নামের সাদৃশ্য আছে, ভাবের নয়। যাইহোক, বজ্রযান অবতারে বিশ্বাসী; একজন বুদ্ধ ও গুরু জগদ্ধিতায় বিভিন্ন সময়ে জগতে আসেন। বুদ্ধ প্রচার করেন শাস্ত্র, গুরু করেন তন্ত্র। অমিতাভবুদ্ধ থাকেন 'সুখবতী লোকে'—তাঁর একটি রশ্মি অবতীর্ণ হয় জগতের কল্যাণের জন্য। বোধিসত্ব চার রকমে জীব ত্রাণ করেন—(১) শান্তি প্রদানে, (২) মহা আকর্ষণী শক্তির দ্বারা জীবকুলকে নিজের দিকে আকর্ষণ দ্বারা (৩) বশীকরণ দ্বারা (৪) বলপ্রয়োগে। বৌদ্ধতন্ত্র অত্যধিক বিভূতিপ্রিয়। বজ্রযানে ১৩টি 'ভূমি' পার হলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।]

ভারতে যে সময়ে নারী ধর্ম্মাচারের সকল অধিকার হ'তে তাড়িত, যে সময়ে তাঁর শালগ্রামশিলা পর্য্যন্ত স্পর্শ নিষিদ্ধ, বাঙ্গলা বেদচর্চ্চা বিহীন, যখন তথাকথিত তন্ত্রের বিভীষিকা ও বৈষ্ণবের কদাচার দেশে বিস্তার লাভ করেছে, সেই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নারীর নিকট সাধনশাস্ত্রে দীক্ষিত হলেন, বৈষ্ণব মতের ও, সাধন তাঁর কাছে গ্রহণ ক'রে গভীর সাধনায় নিমগ্ন হলেন! যে কালে ভারতে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা, মুসলমান রাজ্যের অবসান, ধোলোর কাঞ্চনলোভ, ধোলোর কূটনীতি ও সিপাহী বিদ্রোহের হুমকিতে দেশ মহা অশান্তিপূর্ণ, সেই কালে শ্রীরামকৃষ্ণ মহা শান্তির রাজ্য অনুসন্ধানে কায়মনোবাক্যে ব্যাপৃত! যে সময়ে ভারতের জনসাধারণ শাস্ত্র মর্ম্মছেড়ে একমাত্র লোকাচার বা দেশাচারকে ধর্ম্মাচার মনে ক'রে শাস্ত্রের অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অবিশ্বাসী ও সকল ধর্ম্মমতে সন্দিহান, ধোলো জগতে মধ্যযুগের অবসানে বিশুদ্ধ নিরীহ অহিংসাবাদ যখন বিদূরিত হয়েছে, যখন মুসলমানশক্তি ধীরে ধীরে নিশ্চিতরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, তখন ধোলো ভক্ত বাঙ্গলার—ধোলো সভ্যতার ভারতে কেন্দ্রস্থলের পাশে ব'সেই শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা ক'রে তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করছেন ও সকল মতবাদের যাচাই করছেন, তাদের সত্যতা নিজ জীবনে আচরণ ক'রে প্রমাণ করেছেন! 'মত' মানে অভিপ্রায় বা ধোলো opinion নয়, 'মত' মানে 'সাধনপথ', যে পথে 'ভাবের ঘরে চুরি না ক'রে, 'মন মুখ এক ক'রে', অগ্রসর হলে সত্য লাভ হয়, ভগবদ্‌সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন

গীতার সিংহনাদে সাধককুলের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার ক'রেছিলেন, সে সময়ে ভারতে এত মতবাদ ছিল না—তাঁর 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' ভারতীয় মতবাদকেই লক্ষ্য ক'রে উক্ত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের অভূতপূর্ব্ব এই সাধনরত জীবনও জগতে নতুন, অভিনব ও অতীব বিস্ময়কর। কি অদ্ভুত ছিল তাঁর মনের গঠন, প্রত্যেকটিকে বিচারসহ গ্রহণ করতেন, বাজিয়ে নিতেন; অথচ ছিলেন তিনি আত্মভোলা। আত্মভোলা হলেও, পরণের কাপড় পর্য্যন্ত অঙ্গে না থাকলেও—তিনি তাঁর বেটুয়া কোথায়ও ফেলে আসতেন না, গাড়ী হ'তে নামবার সময় গাড়ীটি পরীক্ষা ক'রে নিতেন। ধর্ম্মরাজ্যে সব জিনিষকে পরীক্ষার স্বভাব শুধু নয়—সর্ব্ববস্তুকে পরীক্ষা করাই ছিল তাঁর স্বভাব। শ্রীজগদম্বার আদেশই ছিল তাঁর জীবন। তিনি ছিলেন জগদম্বার বালক। বালক ভাবের অবতার অতি দুর্লভ।

["ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামীশ্বরো জগদীশ্বরঃ। তস্য সন্তি মহাভাগা অবতারাঃ সহস্রশঃ। তেষাং মধ্যেঽবতারাণাং বালত্বমতি দুর্ল্লভম্। অমানুষাণি কর্ম্মাণি তানি তানি কৃতানি চ।" (ত্রৈলোক্যসম্মোহন তন্ত্র।]

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নাম ছিল যোগেশ্বরী। শ্রীরামকৃষ্ণ যোগেশ্বরী দেবীকে যোগমায়া অংশ সম্ভূতা জ্ঞান করতেন। তিনি বাৎসল্যেপূর্ণ যোগেশ্বরীর সঙ্গে বালকবৎ আচরণ করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবের সাধন করেছিলেন। প্রত্যেক সাধনে তাঁর মন অদ্বৈতভাবভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রমাণ করে যে সকলেরই গন্তব্য স্থান একই। শ্রীমতী যোগেশ্বরী দেবী তাঁকে মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত করবার জন্য মধুরভাবাত্মক গান গাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তখন তা ভাল লাগত না, দেবী তাঁকে অন্য গান শোনাতেন। পরীক্ষা ভিন্ন কোন বস্তুর দোষগুণ স্থির করা ঠিক্ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বৈষ্ণব কুলসম্ভূত। ক্রমশঃ তাঁর মধুরভাব সাধনের ইচ্ছা জাগ্রত হল—সহায় হলেন ব্রাহ্মণী। তিনি বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত মধুরভাবের সাধনায় ডুব দিলেন। শাস্ত্র বলেন, সাধনায় সিদ্ধ হ'তে গেলে সেই সেই সাধনার লিঙ্গ ধারণ করতে হয়। বৈষ্ণবের লিঙ্গ 'ভেক', সন্ন্যাসীর লিঙ্গ গৈরিক। শ্রীরামকৃষ্ণ 'ভেক' নিলেন। "রামা ভূত্বা রামাং যজেৎ"। লোকোত্তরচরিত্র

শ্রীরামকৃষ্ণেব দেহোপবি তাঁব অশ্রুতপূর্ব্ব মনেব ক্রিয়া! তিনি এখন নাবী; কৃষ্ণ তাঁব সখি, তাঁর প্রিয়তম। এইকালে তাঁব প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে, প্রতি কথায়, হাস্যে, কটাক্ষে ও পাদবিক্ষেপে বমণীব ভাব! কাতব হৃদয়ে ব্রজবালাদেব মত দেবী কাত্যায়ণীব কাছে কৃষ্ণ পাবাব জন্য প্রার্থনা! কৃষ্ণ বিবহে তাঁব বোমকূপ ভেদ ক'বে বিন্দু বিন্দু বক্ত ঝবত সে সময়ে! স্বাধীষ্ঠান চক্রেব অবস্থান প্রদেশেব বোমকূপ হ'তে সে সময়ে যুবতী নাবীব ন্যায়, প্রতি মাসে তিন দিন যাবৎ শোণিত নির্গমন হত!! মনেব সঙ্গে দেহেব এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পবিবর্ত্তন, সাধনবাজ্যে নতুন বিপ্লব এনেছে, জড বিজ্ঞানেও ইহা অ-ভূতপূর্ব্ব ব্যাপাব। তাঁব দেবচবিত্র দেখে, মথুববাবু বিশ্বাসে ও ভক্তিতে পূর্ণ হয়েছিলেন এবং শ্রীবামকৃষ্ণে তাঁব ইষ্ট দর্শনে তৃপ্ত হয়ে তাঁতে আত্মসমর্পণ ক'বেছিলেন। বালক বামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর 'বাবা'; 'বাবাব' প্রত্যেক কার্য্যে ছিলেন তিনি সহায় ও যত দিন বাণী বাসমণি জীবিত ছিলেন, ভক্তিমতী বাণীও শ্রীবামকৃষ্ণে ছিলেন পূর্ণ বিশ্বাসী। ছয় মাস প্রায় শ্রীবামকৃষ্ণ নাবীভাবে ছিলেন।

ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী বাধাবাণীব কৃপা কটাক্ষ বিনা কৃষ্ণ দর্শন মানবেব অসম্ভব। কৃষ্ণ বিবহে শ্রীবামকৃষ্ণেব দেহ অসাড ও মৃতবৎ সংজ্ঞাশূন্য হয়ে যেত। তাঁব শবীবেব গ্রন্থি সকল শিথিল হয়ে যেত!। ভাগবতেব বাসপঞ্চাধ্যায়ে বাসমণ্ডলেব বর্ণনায় "অনয়া বাধিতো নূনং ভগবান্ হবিবীশ্ববঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনযদ্রহঃ॥" কৃষ্ণ অন্বেষণে ধাবিতা গোপীবা এক নাবীকে ঐ বকম নিষ্পন্দ ভাবে প'ড়ে থাকতে দেখেছিলেন। 'বাধয়তি' মানে 'আবাধয়তি'। যাঁব আবাধনা পূর্ণ তিনিই বাধা। 'বাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ হ্লাদিনীনামশক্তিঃ'। (শ্রীরূপ)। পণ্ডিতকুল বৃথা নাম নিয়ে তর্কজাল বিস্তাব কবেন। পবিপূর্ণভাব—মহাভাব প্রকাশ যাঁব দেহে তিনি 'বাধা', যে নামই সংসাব তাব দিক না কেন। শ্রীবামকৃষ্ণ এই মহাভাবময়ী শ্রীমতীকে দর্শন ক'বেছিলেন—কৃষ্ণপ্রেমে সর্ব্বস্বহাবা সেই দিব্যোজ্জ্বল পবিত্রমূর্ত্তিব অঙ্গকান্তি নাগকেশব পুষ্প-কেশবেব ন্যায় গৌরবর্ণ। গোবাচাঁদেব গাত্র-বর্ণও ছিল ঐ বকম। বাঙ্গলাব গোবাই প্রথম বাধাপ্রেমেব মন্দাকিনী প্রবাহে বঙ্গদেশকে প্লাবিত কবেছিলেন। সন্ন্যাসী গোবা দেখিয়েছিলেন যে, সে প্রেম কামগন্ধহীন

অহৈতুকী। বাঙ্গলা তা ভুলে গিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ ভাবে কিছু কাল ছিলেন, তারপর সচ্চিদানন্দঘন কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করেছিলেন।

['গোপীগণের প্রেমের রূঢ় ভাব নাম। শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম।' (চৈতন্য-চরিতামৃত—মধ্যখণ্ড)। "সচ্চিদ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ॥ আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করে মানি॥ হ্লাদিনীর সার অংশ প্রেম তার নাম। আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥ প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি। সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥ মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সখি তাঁর কায়ব্যূহরূপ॥" (ঐ. ঐ)। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরা শক্তি ও শক্তিমান—রাধা ও কৃষ্ণ—অভিন্ন মনে করতেন। শ্রীরূপ গোস্বামী, তাঁর উজ্জ্বলনীলমণিতে বলছেন "রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাৎ যুঞ্জন্নদ্রি নিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমং চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ড হর্ম্ম্যোদরে ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুকৃতী"। অর্থাৎ 'শিল্পী কন্দর্প তোমার ও শ্রীরাধিকার চিত্তজতুদ্বয় পুনঃপুনঃ দেখে প্রেমাগ্নিরূপ স্বেদের দ্বারা তোমাদের ভেদভ্রম দূর ক'রে কেমনঃ অনুরঞ্জিত করেছে']।

নিরক্ষর দরিদ্রব্রাহ্মণের জীবন পণ্ডিতকুলের বিদ্যার দর্প ও দম্ভ নাশ করেছে। নির্ম্মল মনই যে সর্ব্বশক্তির আধার তা প্রমাণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—আচরণ ক'রে। তাঁর মন—তাঁর সঙ্কল্প অনুযায়ী, শরীরের অণু পরমাণুরও পরিবর্ত্তন এনেছে। মাতৃমূর্ত্তিতে, নৃসিংহমূর্ত্তিতে অথবা ষড়ভুজ মূর্ত্তিতে শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনদান, যা লিপিবদ্ধ আছে, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্য সময়োপযোগী ঐশ্বর্য্য প্রকাশ, এ রকম সকল অবতারেই দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের নারীভাব প্রভৃতি তাঁর বিভূতির প্রকাশ নয়—তাঁর তীব্র ইচ্ছার পরিণতি, দেহমনের সম্পূর্ণ ভাবৈক্য! শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সময়ে কৃষ্ণময় জগৎ দেখতেন!

শ্রীরামকৃষ্ণের দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্র সাধনা শেষ হয়েছে। ভৈরবী ব্রাহ্মণী বিস্ময় মুগ্ধ, তাঁর বালক শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত। সাধনা শেষের কয়েক মাস পরে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন একজন মহাযোগী অদ্বৈতবাদী শ্রীমৎ তোতাপুরী। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেই তোতাপুরী বুঝলেন যে, তিনি অদ্বৈতবেদান্ত সাধনার উত্তম অধিকারী। জটাধারী বিপুলকায় নেংটা তোতা শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন "তুমি বেদান্ত সাধনা

করবে ?" শ্রীরামকৃষ্ণ—"আমি কিছুই জানিনা, যার আদেশ হলে করব।" শ্রীমৎ তোতা—"তবে যাও, অনুমতি নিয়ে এস; আমি এখানে বেশী দিন থাকব না।" শ্রীরামকৃষ্ণের বৃদ্ধা জননী তখন গঙ্গাতীরে বাসোপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে অবস্থান করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জননীর কাছে না গিয়ে মন্দির ঘরে ঢুকলেন দেখে তোতা ঈষৎ হাসলেন—তিনি মূর্ত্তিপূজার উপকারিতা স্বীকার করতেন না। কিছুক্ষণ পরে অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ এসে তাঁকে শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশ শোনালেন। শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁকে বৈদিকসন্ন্যাস নিতে বলেছেন ও আরো বলেছেন যে তাঁরই ইচ্ছায় শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য ঐ নেংটা মহাপুরুষের আগমন হয়েছে। শ্রীমৎ তোতা প্রস্তুত, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের এক সর্ত্ত—তিনি তাঁর বৃদ্ধা জননীর মনে কোন আঘাত দিতে পারবেন না, অতএব গোপনে সন্ন্যাস হওয়া চাই। সুতরাং, শুভদিন দেখে জগদম্বার প্রিয় বালক সন্ন্যাস নিলেন, শিখাসূত্র ত্যাগ করলেন, সন্ন্যাসের লিঙ্গ ধারণ করলেন। গুরু হোম করালেন, শেষ মন্ত্র সাধকের দ্বারা উচ্চারিত হ'ল "চিদাভাস ব্রহ্মস্বরূপ আমি নিঃশেষে সমস্ত বাসনা ত্যাগ করছি, জগতের সর্ব্বভূতকে অভয় প্রদান করছি—স্বাহা"। এইবার তাঁর নামকরণ। শ্রীমৎ তোতা নাম দিলেন "রামকৃষ্ণ"। 'পরমহংস' উপাধিও তাঁহারই দত্ত।

"আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সন্ন্যাস দীক্ষাদানের সময় শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী ঠাকুরকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। অন্য কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের পরমভক্ত সেবক শ্রীযুত মথুরামোহনই তাঁহাকে ঐ নামে অভিহিত করেন। প্রথম মতটিই আমাদিগের সমীচিন বলিয়া বোধ হয়।" (লীলাপ্রসঙ্গ —সাধকভাব)। 'রামকৃষ্ণ' নাম যে ভৈরবী ব্রাহ্মণী প্রদত্ত, এ কথার উল্লেখ পর্য্যন্ত লীলাপ্রসঙ্গে নেই। লীলাপ্রসঙ্গকার বা উক্ত "অন্য কেহ কেহ" পর্য্যন্ত একথা জানতেন না. অথচ অধুনা বাহিরের লোকের মুখে অনেক কথাই শোনা যায়। ব্রাহ্মণীর উক্তি, "গৌরাঙ্গদেব নিতাইএর খোলে" ইহা তাঁর বিশ্বাস বা অন্তর্দৃষ্টির কথা, নামকরণের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ ? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিতে দেখি "এই রামকৃষ্ণ সেই গৌর গুণধাম"। বলা বাহুল্য, পুঁথিলেখক সর্ব্বত্র 'রামকৃষ্ণ' নামে তাঁকে সম্বোধন করায় ঐস্থানে ঐ নাম ব্যবহার করেছেন; কিন্তু ঐ নাম যে পূর্ণাভিষেক কালে ব্রাহ্মণী প্রদত্ত নাম, তার কোন

প্রমাণ নেই। স্মরণ রাখতে হবে যে, (১) পূর্ণাভিষেকে আচার্য্য প্রদত্ত নাম প্রায় গোপনেই থাকে, কারণ পূর্ণাভিষেক ব্যক্ত সন্ন্যাস নয়, (২) ব্রাহ্মণীর উক্তি যাই হোক শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সম্বন্ধে কি বলতেন? ইহাও বুঝতে হবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম প্রথম শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান ছিলেন, প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহ হন নি]।

সন্ন্যাস গ্রহণে অগ্রসর জানবামাত্রই, ব্রাহ্মণী ভীত হলেন, ঘোর আপত্তিসহ শ্রীরামকৃষ্ণকে "শুষ্ক সাধন পথ" নিতে দৃঢ় ভাবে নিষেধ করলেন। কিন্তু কে কার নিষেধ শোনে? সাক্ষাৎ জগদম্বার আদেশ, তাঁকে সঙ্কল্পচ্যুত করে কে? তিনি দেবী যোগেশ্বরীর অনুরোধ, উপরোধ ও যুক্তি অগ্রাহ্য ক'রে সন্ন্যাস নিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণ এত গোপনে হয় যে "পাছে প্রবেশয়ে কথা জননীর কাণে। সন্ন্যাসগ্রহণ রাত্রে কেহ না জানে॥" (ঐ. পুঁথি)।

[ব্যক্ত সন্ন্যাসে "যজ্ঞসূত্রং করে কৃত্বা···বহ্নিজায়াং সমুচার্য্য ঘৃতাক্তমনলে ক্ষিপেৎ ॥২৫৭॥ হুত্বৈবমুপবীতঞ্চ···ছিত্ত্বা শিখাং করে কৃত্বা ঘৃতমধ্যে নিয়োজয়েৎ ॥২৫৮॥,' (মহানির্ব্বাণতন্ত্র. ৮ম উঃ)। ইহা তন্ত্রমতের ব্যক্ত সন্ন্যাস॥ ইহাতে সাধকের ভাব হওয়া উচিৎ "ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ। সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥ ১১৩॥ বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে। পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥১১৪॥ (মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্র ১৪ উল্লাস)]।

দেবী যোগেশ্বরী ছিলেন পরিব্রাজক। তিনি ব্যক্ত সন্ন্যাসকে ভয় করতেন। তন্ত্রে ব্রহ্মমন্ত্র বা ব্রহ্মমন্ত্রসাধন এক প্রকার নয়। যে ব্রহ্মমন্ত্র সাধনে 'নামরূপ'কে ত্যাগ করতে হয়, যে সাধনে জগতের সমস্ত বস্তুকে 'মায়া-কল্পিত' মনে করতে হয়, যে ব্রহ্মমন্ত্র প্রদান ক'রে গুরু, শিষ্যকে 'নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ' বলেন, আত্মতুল্য মনে করেন, সেই সাধনাকে—সেই ব্রহ্মমন্ত্রগ্রহণে ব্যক্ত সন্ন্যাসকে 'শুষ্ক' মনে ক'রে তিনি ত্রাসিত হ'তেন। ব্রাহ্মণী, সুতরাং, এই ব্যক্তসন্ন্যাস গ্রহণ করেন নি, শ্রীরাম-কৃষ্ণকে এই তন্ত্রোক্ত সন্ন্যাস তিনি দেন নি বা বিধিমতে তাঁর দেবার অধিকার ছিল না। তন্ত্রমতে শিখাসূত্ররূপ সন্ন্যাসের যে ব্যবস্থা আছে তাতেও আত্মশ্রাদ্ধ করতে হয়! সে সংস্কার প্রাপ্ত হওয়া থাকলে, শ্রীরাম-কৃষ্ণের শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণে, আত্মশ্রাদ্ধ ও শিখাসূত্র ত্যাগের ও সেইগুলি গোপন রাখবার কোন প্রশ্নই উঠতনা। এই ব্যক্ত সন্ন্যাস

গ্রহণ না করলেও, শ্রীরামকৃষ্ণ যে ইহার পূর্ব্বেও নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেছিলেন তা ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখেছি, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নতুন পরীক্ষার জন্য—নতুন বস্তু বাজিয়ে নিয়ে তার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য—অতিমাত্রায় ব্যগ্র হয়েছিলেন, জগন্মাতার আদেশ পেয়ে।

পূর্ণাভিষেকে 'সর্ব্বাধিকার' প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ অতঃপর সব রকম সাধনাই সাধক করতে পারেন। ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র ও সাধন পদ্ধতি আছে। নানা প্রকার 'সংস্কার' ও এই জন্য আছে। সূক্ষ্ম বা পর সংস্কার-ফল সাধক জীবনে দেখা দিলে, আনুষ্ঠানিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা হয় কেবল আয়োজন ও উপকরণ সংগ্রহে, ঐ সব সংস্কারের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই। ইহা স্মরণ রাখতে হবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রকার বিধিকে অতিক্রম করেছিলেন। তাঁর সাধনকালে, বিধিমতে আয়োজন সব ঠিক্ থাকলেও সাধনার 'উপকরণ' দর্শন মাত্রই অথবা মন্ত্র উচ্চারণ শোনবামাত্রই তিনি সমাধিস্থ হ'তেন, বাহ্য অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সার্থক হত—সেই সেই সাধনা তাঁর পূর্ণ হত। আজ শ্রীরামকৃষ্ণের নাম প্রচার হওয়ায়, তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই উঠেছে, সেজন্যই এখানে এত কথার অবতারণা করেছি। তিনি যাঁকে 'মা চিন্ময়ী মা' বলতেন, সেই বিগ্রহের কাছেই তিনি সব সময়ে আত্মনিবেদন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। তিনি একের মধ্যে বহু, বহুর মধ্যে এক দেখতেন। এ দু'য়ের ভেদ ছিলনা তাঁর কাছে। সমস্ত দেবতা—ব্যষ্টি ও সমষ্টি রূপে—তাঁর ইষ্ট. অভেদত্ব ও একাত্মতা হেতু তিনি সর্ব্বদেবদেবীস্বরূপ। তত্ত্বতঃ সর্ব্বদেবতাই তাই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আচরণ দ্বারা—সাধনার দ্বারা, কর্ম্মদ্বারা উহা প্রমাণ করেছেন। আর একটি কথা। নানা সম্প্রদায়ের নানা প্রকার সাধনা আছে। সম্প্রদায়ই সাধকের পরিচয়। তন্ত্র মতের সাধনাতেও তাই। শ্রীশঙ্কর তন্ত্রমতের সাধনা ক'রেও, তিনি দশনামী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক—তাঁর প্রপঞ্চসারে কুলাচারের সকল কথা না থাকলেও, তাঁর তন্ত্রসাধনার পরিচয় দেয়, শ্রীচৈতন্যও ছিলেন তন্ত্রমতের সাধক, নিত্যানন্দ ঠাকুরও তাই, তবু তাঁরা 'পুরী' সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এসব পূর্ব্বে বলেছি। বহু দৃষ্টান্ত দেখান যায়; কিন্তু কেন এমন হয়, কেন তাঁরা সম্প্রদায় অনুযায়ী সম্প্রদায়ের নাম গ্রহণ করেন নি? ইহার উত্তর এই যে, তন্ত্রমতের সাধক, সম্প্রদায়ের নাম নিজেদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন, ইহার

একমাত্র উত্তর এই যে, তন্ত্রশাস্ত্র কৌলমার্গের প্রতিষ্ঠা চান না, ইহা নিষিদ্ধ—"কৌলপ্রতিষ্ঠাং ন কুর্য্যাৎ"। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্ব সম্প্রদায়ের, সর্ব্বসম্প্রদায়-সমষ্টির মহাজন—অসাম্প্রদায়িক—সম্প্রদায়-হীন নন। তিনি সর্ব্বসম্প্রদায়-স্বরূপ, অধিষ্ঠাত্রীশক্তি যার শুধু দেবী কালিকা নন, কিন্তু স্বয়ং তন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী শক্তি। এ সম্বন্ধে যিনি যে ভাবে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। তবে ইহা ঠিক যে তাঁর কোন 'আম্নায' ছিল না। "সর্ব্বং শাম্ভবীরূপং" যে সাধকের উপলব্ধ হয় তাঁর "আম্নায ন বিদ্যতে।" (কৌলোপনিষদ্ ২১।২২ দ্রঃ)। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্ব-আম্নাযস্বরূপ। সম্প্রদায় গঠনের উদ্দেশ্য, বিশেষ সাধনাদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা। ইহাও ঠিক্ যে সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে মানব সাম্প্রদায়িকতার কোলাহলে হাবুডুবু খাচ্ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার করলেন 'যত মত তত পথ', 'ভগবান লাভই জীবের উদ্দেশ্য'—সম্প্রদায়প্রতিষ্ঠা নয। ইহাও সত্য যে সকল 'ক্রান্তার' সাধক ও সিদ্ধ মহাজন আসতেন, সকলেই তাঁর সংস্পর্শে এসে নতুন ভাব, নতুন প্রেরণা নিয়ে যেতেন।

পূর্ব্বে বলেছি, তন্ত্র সাধনার ও নেতি নেতি সাধনার গন্তব্য স্থান এক হ'লেও, কিছু বোঝবার আছে। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী সহায়ে সেটি এবার বোঝবার চেষ্টা করা যাবে। এত কাল যে সমস্ত সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণ ক'রেছিলেন, সে সকলগুলিরই একটা অবলম্বন ছিল, প্রথম অবস্থায় ভক্তি বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিল তাঁর অবলম্বন, দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁর প্রধান অবলম্বন স্বয়ং জগন্মাতা। এই অবলম্বন নিয়েই তিনি সর্ব্ববস্তুকে বিচার, বিশ্লেষণ দ্বারা পরীক্ষা ক'রেছিলেন। বৈদিকসন্ন্যাসে সাধক নিরালম্ব ভাব ধারণ করবার চেষ্টা করেন। অবলম্বনযুক্ত সাধনা নামরূপ বা ভাব নিয়ে—বিরাট নিয়ে। এই নামরূপের ভাবনা ও অনুষ্ঠানই সাধনা বা উপাসনা। ইহাই হিরণ্যগর্ভের উপাসনা। উপাসনা মানে 'ইতির' দিক্ দিয়ে সাধনা; বৈদিকসন্ন্যাসে সাধক 'নেতি' 'নেতি' ক'রে অগ্রসর হন, 'ন ইতি', ইহা নয় এই বোধের অন্তর্গত যা কিছু, ব্রহ্ম নয়, 'দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতং' নয়। 'নেদং যদিদমুপাসতে' (কেন), ইহাই সাধক প্রথম হ'তে আরম্ভ করেন। যতক্ষণ দ্বন্দ্ববোধ থাকে, সর্ব্ববস্তুই দোষগুণ মিশ্রিত অনুভূত হয়। ইহা স্পষ্ট। 'নেতির' সাধক ঐ উভয়কেই বর্জ্জন করবার চেষ্টা করেন। সাধারণ নিয়ম, সর্ব্ববস্তুতে

দোষ দর্শন করা, দোষটা যে যথার্থ ইহা হৃদয়ঙ্গম করা, তা হলে দোষ ত্যাগ করা সহজ হয়। তারপর বিচার দ্বারা দোষত্যাগে, গুণদর্শনে অর্থাৎ বস্তুর অপর দিক্ দেখে, সাধক উৎসাহিত হন ও তখন অগ্রগতি সহজ হয়। পরে তিনি গুণদোষ উভয় বর্জ্জন ক'রে নিরালম্বভাব গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণও প্রথম অবস্থায় 'টাকা মাটি' সমান জ্ঞানে ত্যাগ ক'রেছিলেন। তাঁর 'দোষ' দর্শনের মধ্যেও নতুনত্ব ছিল—তিনি একেবারেই সার গ্রহণে উন্মুখ হ'য়েছিলেন। এখন শ্রীজগদম্বার আদেশে, এই নতুন সাধনা তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলেন, কিন্তু এখন তাঁর কাছে 'ভাল' 'মন্দ' আদি যত প্রকার দ্বন্দ্ব সবই 'মায়ের রূপ'—দোষ দেখবেন কেমন ক'রে? ইতিপূর্ব্বে একরকম সাধনা হ'তে সাধনান্তরে রত হবার সময় পূর্ব্ব সাধন-সংস্কার হ'তে মনকে তুলে এনে নতুন সাধনায় নিমগ্ন করা তাঁর কঠিন হয় নি। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার সাধনার সংস্কার—সমষ্টিভাবে হিরণ্যগর্ভোপাসনার সংস্কার তাঁর মনে দৃঢ় অঙ্কিত হয়েছিল। সেইজন্য যখন 'নেংটা' তাঁকে উপদেশ দিয়ে ধ্যানস্থ হ'তে বল্লেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যানস্থ হলেন বটে, কিন্তু তাঁর মন সম্পূর্ণ নিরালম্ব ভাব গ্রহণে যেন অসমর্থ হল, তাঁর মনে চিরপরিচিত সেই তাঁর একমাত্র সম্বল ৺জগদম্বার মূর্ত্তি উদয় হ'য়ে, মন তাঁর 'মা'ময় হয়ে যায়! কিন্তু মনের মনত্বই থাকবে না এই নিবৃত্তির সাধনায়—'নেদং যদিদমুপাসতে'। শ্রীরামকৃষ্ণ এক একটি সংস্কারের উর্দ্ধে সহজে গিয়েছিলেন পূর্ব্বে; এবার সামনে খাড়া হয়েছে যে সর্ব্বসংস্কারসমষ্টি। বারবার মনকে নির্ব্বিকল্প করবার চেষ্টায় বিফলপ্রায় হ'য়ে, হতাশ হয়ে, তিনি গুরুকে নিবেদন করলেন, "হল না, পারলাম না মনকে বিকল্পশূন্য ক'রে আত্মধ্যানে নিমগ্ন হ'তে।" বিষম উত্তেজিত হ'য়ে, ধমক্ দিয়ে, নেংটা ব'লে উঠলেন—'কেঁও, হোগা নেহি'—ব'লেই কুটীরে পতিত এক কাচখণ্ডের সূচ্যগ্রভাগ দিয়ে তাঁর ভ্রূতে আঘাত ক'রে পুনরায় আদেশ করলেন—'এই বিন্দুতে মন গুটিয়ে আন।" এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর বিচারসিদ্ধ নির্ম্মল মনের দ্বারা ৺জগদম্বার মূর্ত্তিকে, কার্য্য-কারণ সর্ব্বকারণকারণব্রহ্ম, ইহা নয়, নেতিরূপ জ্ঞান খড়্গের দ্বারা—ঐ শ্রীমূর্ত্তিকে দ্বিখণ্ড ক'রে ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার ভাব ও অভাব অন্তর্হিত হল!! এই ব্যাপার নেংটা দেখলেন, কুটীরে তালা লাগিয়ে পঞ্চবটীতলে নিজ আসনে ব'সে শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বান প্রতীক্ষা করতে

লাগলেন। দিনেব পব দিন যায়, বাত্রিব পব বাত্রি আসে, শিষ্যেব কোন সাড়া নেই। তালা খুলে দেখেন, শিষ্য তাঁব, তখনও নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপবৎ স্থিব, নিশ্চল, মৃতকল্প। বিস্ময়বিস্ফাবিত নেত্রে, স্তম্ভিত হৃদয়ে, তিনি তাঁব শিষ্যেব লক্ষণ দেখবাব জন্য শ্রীবামকৃষ্ণেব শবীব পবীক্ষায় নিযুক্ত হলেন। শ্রীমদ্ তোতাব ৪০ বৎসব সাধনাব ফলে নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। ইহা কি সম্ভব যে তাঁব শিষ্যেব একদিনেই ঐ অবস্থা লাভ হবে? বাববাব শিষ্যেব নাসিকা ও অঙ্গাদি পবীক্ষাব পব মহাপুলকে ও বিস্ময়ানন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে চীৎকাব ক'বে উঠলেন—"য়হ্ ক্যা দৈবী মায়া॥" শিষ্যপ্রেমে মুগ্ধ গুরু এইবাব শ্রীবামকৃষ্ণকে ব্যুত্থিত কববাব জন্য প্রক্রিয়া আবম্ভ কবলেন—'হবি ওঁ' মন্ত্রেব ধ্বনিতে পঞ্চবটিব স্থল জল ব্যোম পূর্ণ হয়ে উঠল। শ্রীমদ্ তোতা অল্পকয়েক দিন মাত্র দক্ষিণেশ্বেব থাকবেন প্রথম মনে ক'বেছিলেন, কিন্তু দীর্ঘ এগাব মাস কাল সেখানে থেকে গেলেন। মূর্ত্তি বিবোধী নেংটা, তাঁব শিষ্য সংস্পর্শে এসে, শেষে স্বয়ং মন্দিব ঘবে কালীমূর্ত্তিব কাছে সাষ্টাঙ্গ হয়ে 'মা' 'মা' ববে প্রণিপাত কবেন—আর্ত্তশবণাগত হ'তে বাধ্য হন। আশ্চর্য্য গুরু আশ্চর্য্য শিষ্য !

ঐ ঘটনাব পব শ্রীবামকৃষ্ণেব নির্ব্বিকল্প অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান কববাব ইচ্ছা জাগ্রত হল। দীর্ঘ ছয়মাস তিনি সমাধিস্থ ছিলেন। সেই সময়ে একজন সাধু—যেন শ্রীশ্রীজগদম্বা প্রেবিত হ'য়ে—দক্ষিণেশ্ববে আসেন। শ্রীবামকৃষ্ণেব ঐ অবস্থা দেখে তিনি তাঁব শবীব বক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন ও তাঁব দেহে চেতনা ফিবিয়ে আনাব জন্য বাববাব ডাণ্ডাপেটা কবতে থাকেন, বাব বাব ঐ বকম কবায় যেই ক্ষণিকেব জন্য চেতনা ফিবে আসত, সদাপ্রস্তুত সেই সাধুটি তাঁব মুখে তবল আহার্য্য ফেলে দিতেন, শ্রীবামকৃষ্ণ ও আবাব পূর্ব্ববৎ হয়ে যেতেন॥ শাস্ত্র বলেন, ২১ দিন নির্ব্বিকল্প অবস্থায় একাদিক্রমে অবস্থান কবলে দেহ থাকে না। এক্ষেত্রে, শ্রীবামকৃষ্ণ শাস্ত্রকেও অতিক্রম কবেছেন। শাস্ত্রমর্য্যাদা এইভাবে বক্ষিত হয়েছিল যে, ডাণ্ডা পেটায় তাঁব মাঝে মাঝে ক্ষণিকেব জন্য চেতনা আসত; কিন্তু ইহা যেন চুম্বক হ'তে লোহাকে সামান্য একপাশে উঁচু ক'বে ধবাব মত। ছয়মাস পবে তিনি ৺জগদম্বাব আদেশ পেলেন 'ভাব-মুখে থাক।'

ইসলামধর্ম্ম বহুকাল যাবৎ ভাবতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অধিকাববাদের দাপটে, স্ত্রীশূদ্রেব ন্যায় স্বধর্ম্মীকেও ধর্ম্মাচাব এবং ধর্ম্মসাধনাব সকল সুবিধা হ'তে বঞ্চিত ক'বে বাখবাব প্রথা মুসলমানদেব মধ্যে দেখা দেয় নি; হীন দবিদ্র সকলেই 'আল্লা' নাম সাধনেব অধিকাবী, সকলেই এক সঙ্গে মস্‌জিদে প্রার্থনা কববাব অধিকাবী ইত্যাদি। ইসলামধর্ম্মে কত মহাজন জন্মেছেন, ইসলাম ও ত ঈশ্বব লাভেব এক পথ—এই চিন্তা শ্রীবামকৃষ্ণেব মনে উদয় হওয়াব সঙ্গে, শ্রীশ্রীজগদম্বাব ইচ্ছায়, শ্রীবামকৃষ্ণ এই মত দেখতে ইচ্ছা কবলেন। তৎকালে দক্ষিণেশ্ববে পঞ্চবটীব তলায় গোবিন্দবায় নামে এক মুসলমান সাধক সাধনবত ছিলেন। দক্ষিণেশ্ববেব কালীবাড়ীতে তখন জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল সংসাবত্যাগী সাধককে সমভাবে আতিথ্য প্রদর্শন কবা হত। অতএব গোবিন্দকে অপব কোন দ্বাবে ভিক্ষাব জন্য যেতে হয় নি। শ্রীবামকৃষ্ণ গোবিন্দেব নিকট মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হলেন। এবাবেও, শ্রীবামকৃষ্ণেব সেবক ও ভাগিনেয় হৃদয়নাথ, মথুব বাবু এবং সকলের, অনুবোধ উপেক্ষিত হয়। শ্রীবামকৃষ্ণ আল্লা নাম জপ কবতেন, তাঁব হাবভাব পবিচ্ছদ সমস্তই মুসলমানেব ন্যায় হয়ে যায় সেই সময়ে, এমন কি তাঁর মন হ'তে সর্ব্বপ্রকাব হিন্দুভাব অন্তর্হিত হয়। তৃতীয় দিবসে তিনি এক দীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট জ্যোতির্ম্ময় পুরুষপ্রববেব দর্শন পান। অতঃপব তিনি সগুণ বিবাট ব্রহ্মেব উপলব্ধি কবেন ও তুবীয় নির্গুণ ব্রহ্মে তাঁব মন লীন হয়। বহুকাল একত্রে বাস ক'বেও, হিন্দু ও মুসলমানেব মধ্যে যেন পর্ব্বতেব ব্যবধান আজও। কাবোব ভাবে আঘাত না দিয়ে স্ব স্ব ভাব বজায় বেখে, মানব একই উদ্দেশ্যে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হ'তে পাবে, ইহাই এবাব সম্ভব হবে, শ্রীবামকৃষ্ণেব জীবনীই ইহা সম্ভব কববে। শ্রীবামকৃষ্ণ খৃষ্টধর্ম্মও সাধন ক'বেছিলেন এবং দিব্যদর্শন লাভ কবেছিলেন, প্রভু যীশুব দর্শন পেয়েছিলেন।

["শ্রীবামকৃষ্ণদেব আপন অন্তবঙ্গ শিষ্যমণ্ডলীব নিকট আপন অবতাবত্বেব কথায় বলিতেন—'রাজা যেমন প্রজাদেব অবস্থা জানবার জন্য ছদ্মবেশে সহর দেখতে বেরোয় এবাব সেই বকম জানবি'"। (ভারতে শক্তিপূজা দ্রঃ)। গীতাব সেই উক্তি—'যদা যদাহি'। ভক্তিশাস্ত্র মতে, একই পুরুষপ্রবর বারবার নরদেহ ধারণ করেন। শ্রীবামচন্দ্র অবতাব, শ্রীকৃষ্ণ অবতার, যে বাম যে কৃষ্ণ সেই এবার শ্রীরাম-কৃষ্ণ। স্বামীজি বলেন "শ্রীবামকৃষ্ণদেবকে অবতাব বলিলেই হয় না—শক্তিব বিকাশ-

চাই, হাজাব হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী-চাই—যাহাবা আগুণের মত হিমাচল হ'তে কন্যা-কুমারী—উত্তব মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়াইয়া পড়িবে'। এবারে জীবন দেখে—একমাত্র নামরূপ বা ঐশ্বর্য্যের দিক্ দিয়ে নয়—জীবনের প্রাধান্য দেওয়া হবে, নিত্য সত্য তত্ত্ব (Principle) কোন্ জীবনে কতটা বিকশিত, জীব কল্যাণে কতটা শক্তি নিয়োজিত, তাহারি প্রাধান্য এবাব—নামের নয়, এমন কি শ্রীরামকৃষ্ণবিবেকা-নন্দের ও নয়। ভাব, পূতজীবন, চবিত্রবল, ইহাই মানব আজ চায়, ইহাই ভবিষ্যতের আদর্শ।]

ভাবত, স্ত্রী শবীবেব স্বরূপ দর্শন কবেছেন। তাই গায়ত্রী বেদমাতা, অদিতি দেবজননী, তাই বেদে নাবীমুখে ব্যক্ত "মম যোনিবপস্বন্তঃ সমুদ্রে" (দেবীসূক্ত)—'আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব যোনি, আমিই পবমব্রহ্মে নিত্য যুক্ত'—তাই নাবীই দেবকুলেব উপদেষ্টা—"সা উমা হৈমবতী", তাই তন্ত্রে 'তদ্রূপিণী' ভাবে স্ত্রীশবীবকে উপলব্ধি কববাব উপদেশ। এই আদর্শ ববাবব চ'লে এসেছে, তাই শ্রীকৃষ্ণেব ইষ্টদেবী দুর্গা, তাই শ্রীশঙ্কবেব ও শ্রীচৈতন্যেব ইষ্টদেবী অন্নপূর্ণা। মহাপুরুষেবা নাবীব মর্য্যাদা বেখে এসেছেন; কিন্তু এখন? ভাবতেব অধঃপতন যুগ সেই দিন হ'তে, যখন নাবীকে 'নবকেব দ্বাব' বলা হল। নাবী নবকেব দ্বাব! যীশু এইখানে বলবেন 'আগে তোমাব চোখ্ উপড়ে ফেল'। নাবীও বলতে পাবেন—'পুরুষ সাক্ষাৎ নবকাগ্নিব শিখা'! দোষ শবীবেব মধ্যে নয়—নিজেব মনই দুষ্ট, দৃষ্টি কলুষিত। অধঃপতনযুগে ভাবতে বৌদ্ধপ্লাবন, যবনেব আগমন, সর্ব্বত্র আত্মকলহ—কোনটিই নাবীত্বেব আদর্শসহায় নয়, ববং প্রত্যেকটিই প্রাচীন আদর্শকে ক্ষুণ্ণ কবেছে। নাবীত্বেব আদর্শ এতাবৎ ভাবতেব নাবীকুলই বজায় বেখে এসেছেন। শত বাধা, শত বিপ্লবেব মধ্যে তাঁবা নাবী-আদর্শ অক্ষুণ্ণ বেখে তাঁদেব স্বরূপেব—মহাশক্তিব—পবিচয় বাববাব দিয়েছেন। অবতাব পুরুষেব অলৌকিক শক্তিব পবিচয় আমবা পাই, ধর্ম্মস্থাপনায় তাঁদেব অদ্ভুত চেষ্টা জগতকে আদর্শ দান কবে, কিন্তু তদ্‌ভাবে বঞ্জিতা তাঁদেব লীলাসঙ্গিনীবা নীববেই চলে যান—তাঁদেব মাতৃহৃদয়-প্রেবিত জীবকল্যাণে নিভৃতে নিগূঢ় সাধনাব কথা, লোকচক্ষুব গোচব হয় না। ইহাবাই যথার্থ গুপ্তভাবে বারবাব আসেন। শ্রীবামকৃষ্ণ এসেছিলেন গোপনভাবে। আব শ্রীশ্রীমা? শ্রীরামকৃষ্ণেব লীলাব ঐশ্বর্য্য

ছিল, উগ্রকঠোর সাধনা ও তার তোড়্‌জোড়্‌, সাধক ভক্তদের আগমন—এসব নানা প্রকার ছিল। আর শ্রীশ্রীমার? কে তার খবর রাখে? যাঁরা রাখেন, তাঁরাই বা তাঁর কতটুকু জানেন? সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় নারী সমস্তই সহ্য করেছেন, তবু কেহ কেহ বলতে সাহস পেয়েছেন যে নারীচরিত্র দেবতাদেরও অগোচর, অতএব নারীকে বিশ্বাস করবে না ইত্যাদি। এই রকম হীন বুদ্ধিতে নারীচরিত্রের বর্ণনা সত্ত্বেও, সত্যই নারীর মহিমা দেবতাদেরও অগম্য। আজ নারীজাতি আত্মবিস্মৃতা, তাই হয়েছে নারীর অপমান করবার সাহস। শ্রীশ্রীমার আদর্শেই নারীজাতির স্বস্বরূপবোধ জেগে উঠবে, তখন হবে ঠিক্ তাঁদের সঞ্চিত অবমাননার প্রতিশোধ। মনে রাখতে হবে আমাদের যে, নামের মহিমা, নামের শক্তি—জীবনাদর্শে, শ্রদ্ধায়—নামের জন্য নামের শক্তি নয়। পুরুষ শরীরধারী আমাদের দৃষ্টিকে পবিত্র করতে হবে, নারীকে শক্তি অথবা শক্তির অংশ জ্ঞান করতে শিখতে হবে—শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন হ'তে ইহাই আমরা যেন শিখি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা—অদ্ভুত এই দুই জীবনের লীলা বাঙ্গলার বুকের উপর এই সেদিন হয়ে গেছে। ঐ দুই জীবনের আর এক অধ্যায় অতি চমৎকার, অতি বিস্ময়কর ও সম্পূর্ণ মৌলিক।

হৃদয়নাথ ও ব্রাহ্মণীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে এসেছেন। শ্রীশ্রীমাও জয়রামবাটি হ'তে কামারপুকুরে এসেছেন। বিবাহের পর ইহাই ঐ চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকার প্রথম পতি সন্দর্শন। শ্রীমদ্ তোতার উপদেশ ছিল যে স্ত্রী নিকটে থাকলেও "যাঁর ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান, সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, তিনিই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, স্ত্রীপুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্রহ্মবিজ্ঞান হ'তে বহুদূরে।" নিজ পত্নীর কল্যাণসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ মনোনিবেশ করলেন, শ্রীমদ্ তোতার উপদেশ স্মরণ ক'রে, তাঁর বহুকাল-ব্যাপী সাধনলব্ধ ব্রহ্মবিজ্ঞানের পরীক্ষায় নিযুক্ত হলেন। গুরু—ভালবাসায় শিষ্যকে অত্যন্ত আপন ক'রে নেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কামগন্ধহীন প্রেমে শ্রীশ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেন। পতি পরমগুরু; শ্রীশ্রীমার 'পরমগুরু'র ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা। শ্রীশ্রীমাই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যভাবের উন্মাদনায়, এই সময়ে শ্রীশ্রীমা সর্ব্বদা অনুভব

করতেন যে, তাঁর হৃদয়ে এক আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত রয়েছে। ইতিপূর্ব্বে, সন্ন্যাস গ্রহণকালে 'ব্রাহ্মণী' বহু আপত্তি তুলেছিলেন, এবারেও, ঐ দুই আনন্দ-ঘন বিগ্রহের মিলনে তিনি ঘোর আপত্তি জানালেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও শ্রীরামকৃষ্ণ কোন আপত্তিই গ্রাহ্য করলেন না। শ্রীশ্রীজগদম্বার বালক, যে তাঁরই আজ্ঞা পালন করছেন। ক্ষুব্ধা ব্রাহ্মণী পরে নিজের ভ্রম বুঝে নানা কারণে কামারপুকুর ত্যাগ ক'রে পুনঃ তপস্যায় নিযুক্ত হ'তে উদ্যত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ব্রাহ্মণীর বাৎসল্য, ব্রাহ্মণীর উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রীতি, সমানই ছিল। এই সময়ের একটি ঘটনার উল্লেখ দরকার মনে করি। একদিন পল্লীরমণীরা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে নানা গল্প করছেন। তাঁর অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা। তথাপি রমণীদের গল্প সমান চলেছে। তাঁকে তদবস্থ দেখে রমণীদের মধ্যে কেহ কেহ সকলকে চুপ করতে বল্লেন। একজন রমণী ব'লে উঠলেন 'উনি এখন মীন হ'য়ে সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসছেন, আমাদের কোন কথাই তাঁর কাণে যাবে না।' পরে শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বিস্মিত হযে জানালেন যে উক্ত 'রমণীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। কেমন ক'রে তিনি জানলেন?' মনে পড়ে মহাভারতের সেই সাধনভজনহীনা—একমাত্র কায়মনোবাক্যে পতি-সেবারতা নারীর কথা, যিনি বিভূতি প্রাপ্তিতে আত্মবিস্মৃত যোগীর 'কাক বক' ভস্মের কথা জানতে পেরে যোগীকে সত্যপথের সন্ধান দেন। আমরা নাম নিয়ে মারামারি করতেই পটু, লীলা বুঝতে চাই না। নারীতে যে কত শক্তি সঞ্চিত তাও আমরা ভাবি না, অথচ তাঁকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখবার স্পর্দ্ধা রাখি।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরেছেন। পূর্ণ চার বৎসর অতীত হয়েছে। শ্রীশ্রীমা এখন পূর্ণ আনন্দ সম্পদের অধিকারিণী। জয়রামবাটী ও কামার-পুকুরে রব উঠেছে যে তাঁর স্বামী একেবারে উন্মত্ত বা ক্ষিপ্ত হয়েছেন। কথা বেড়ে পল্লবিত হ'য়ে শ্রীশ্রীমার কাণে গেল। তাঁর পিতা মেয়ের মনের ভাব বুঝে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে রাত্রি ৯টার সময় নিয়ে উপস্থিত হলেন, পিতা গৃহাভিমুখে ফিরলেন। পথে শ্রীশ্রীমার জ্বর হয়েছিল শুনেই, ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে শ্রীশ্রীমার শয়নের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবোন্মাদ, ঘন ঘন সমাধি, সমস্ত রাত্রি ঐভাবে স্থিতি—এই সব দেখে শ্রীশ্রীমা ব্যাকুল হলেন। সরলা বালিকা

তখন অত বুঝতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে উদ্বিগ্ন হ'তে নিষেধ করলেন এবং যখন যে 'ভাবে' তাঁর সমাধি হয় সেই ভাবানুযায়ী ব্যবস্থা করতে তাঁকে শিখিয়ে দিলেন। তাঁর নিত্য ঐরূপ আচরণে ও নিত্য রাত্রি জাগরণে, শ্রীশ্রীমার উদ্বেগ ও স্বাস্থ্যহানি আশঙ্কায়, নহবৎ ঘরে শ্রীশ্রীমার থাকবার স্থান ঠিক্ ক'রে দিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁর সেবাধিকার পেয়ে ও তাঁর সপ্রেম ব্যবহারে আনন্দে উৎফুল্ল হলেন, তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত গুজব-কথা যে মিথ্যা তাও বুঝলেন—হায় বদ্ধ মানব, এ হেন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এ রকম কথা সব রটায়। তীব্র বৈরাগ্যোদয়ে স্ত্রী ত্যাগ করতে হয়, ইহাই সকলে জানে, সংসার সম্বন্ধ যেখানে আছে তার সংস্পর্শ হ'তে দূরে থাকতে হয়, ইহাই সকলে জানে। শ্রীবুদ্ধ, তাঁর সদ্যপ্রসূত শিশু, স্ত্রী, পিতা মাতা সব ছেড়ে চলে যান, শ্রীশঙ্কর তাঁর মাকে ছেড়ে দূরে চলে যান; শ্রীচৈতন্য তাঁর মা ও স্ত্রী উভয়কেই পরিত্যাগ ক'রে যান—মার সঙ্গে তাঁর মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হলেও, স্ত্রীর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণও এই অবস্থায় অভিনব—সাধন জগতে সম্পূর্ণ নতুন। পাছে বৃদ্ধা মাতার মনে ক্লেশ হয়, এজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ গোপনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, আবার যখন শ্রীশ্রীমা স্বয়ং তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন, তাঁকে তিনি তাঁর পূর্ণ সেবাধিকার দিলেন, সকল বিষয়ে শিক্ষা দিলেন, একই স্থানে রইলেন! এইকালে একদিন শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পদসম্বাহ করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন 'আমাকে তোমার কি ব'লে বোধ হয়?" শ্রীরামকৃষ্ণ—"যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ ব'লে তোমাকে সত্য সত্যই সর্ব্বদা দেখতে পাই!" শ্রীরামকৃষ্ণ 'ষোলটাং' দেখিয়েছেন, জীব তার 'একটাং' করলেও যথেষ্ট, কিন্তু ঐ রকম উদাহরণ অবতার পুরুষেই বা কোথায়? যেখানে সবাই স্ত্রী ত্যাগ করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে তাঁকেই মাতৃভাবে গ্রহণ করেছেন—নারীবর্জ্জন তিনি করেন নি, নারী মাত্রকেই 'মা' ব'লে গ্রহণ করেছেন; কাম কামিনী তিনি ত্যাগ করেছেন, স্ত্রী মূর্ত্তিকে মাতৃভাবে গ্রহণ করেছেন—শক্তিকে তিনি কায়-মনোবাক্যে 'তদ্রূপে' দর্শন করেছেন!



জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রায় শেষ সপ্তাহ, দক্ষিণেশ্বরে অমাবস্যায় ফলহারিণী কালিকা পূজা। শ্রীরামকৃষ্ণ গোপনে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। তাঁর ভাগিনেয় হৃদয়নাথ মন্দিরে জগন্মাতার বিশেষ পূজা করবেন। যথাসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজায় বসলেন। অন্য একজন মন্দিরের পূজারী তাঁকে সাহায্য করবার জন্য সেখানে উপস্থিত। তন্ত্রমতে পূজা। শ্রীশ্রীমা এসেছেন সেখানে। দরকার হ'লে পূজায় দু' রকম শক্তির আসন হয়, 'ভোগ্যাশক্তি' বামে বসেন, 'পূজ্যাশক্তি' (মাতৃস্থানীয়া শক্তি) বসেন দক্ষিণে। দু' রকম আসনই পাতা ছিল। শ্রীশ্রীমাকে আসন গ্রহণ করবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করলেন। শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেস্থিত আসন গ্রহণ করলেন, তাঁর তখন অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা, হৃদয় আনন্দে পূর্ণ। সাক্ষাৎ ৺দেবী জ্ঞানে শ্রীশ্রীমাকে শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শোপচারে পূজা করলেন, ভোগ নিবেদন ক'রে তাঁর মুখে সমস্ত বস্তু একটু একটু দিলেন। শ্রীশ্রীমা ঐ সমস্ত গ্রহণ ক'রে সমাধিস্থ। মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সমাধিস্থ। রাত্রি নয়টায় শ্রীরামকৃষ্ণ পূজার আয়োজন শেষ ক'রে মন্দিরে যান। এখন গভীর রাত্রি, দ্বিপ্রহর বহুক্ষণ অতীত হয়েছে —উভয়েই সমাধিমগ্ন। এতক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণের বাহ্য চেতনা ফিরেছে— অর্দ্ধবাহ্য-অবস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণ ৺দেবীকে আত্ম নিবেদন করলেন, শ্রীপাদপদ্মে নিজের জপের মালা, সমস্ত সাধন ফল, তাঁর যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে প্রণাম করলেন "ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোঽস্তুতে।" এইরূপে মানবীর দেহাবলম্বনে তাঁর উপাসনার পরিসমাপ্তি হল। উভয়ের দেব-মানবত্ব পূর্ণ হল। এই পুণ্য দিন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বাঙ্গলায়, ভারতে, বিশ্বে।

[তন্ত্রে একই দেবতার অন্তর্গত বিভিন্ন দেবতার, একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ও নামে সাধনার বিধি আছে, যথা ষোড়শীর অন্তর্গত—মহাষোড়শী, ষোড়শী প্রভৃতি; কালীর অন্তর্গত—কালী, মহাকালী প্রভৃতি, লক্ষ্মীর অন্তর্গত—লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী প্রভৃতি। ষোড়শী, কালী, লক্ষ্মী—এইগুলি সাধারণ নাম। ঐ সবস্থলে নামের বিভিন্নতার সঙ্গে ভাবের বিভিন্নতা, মাত্রায়—'সূক্ষ্ম' ও 'পর' হিসাবে]।

কি অপূর্ব্ব মনের গঠন নিয়ে শ্রীশ্রীমা এসেছিলেন। হিন্দুনারী, পূর্ণ যৌবনা বিবাহিতা পত্নী, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ঘরের বালিকা, শরীরের সংস্কার,

আবহমানকালের সামাজিক সংস্কার—এই রকম সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের উর্দ্ধে উঠে, তাঁর 'পরমগুরুর' ইচ্ছার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে—স্বস্বরূপে হেলায়, অতি সহজে অবস্থিত। এ দৃশ্য নারী জগতেও এই প্রথম, আধ্যাত্মিক জগতে যেমন নতুন, তেমনই বিস্ময়কর, তেমনই চমৎকার। প্রিয়তমের ইচ্ছায় এমন আত্মবিলোপ জগৎ দেখেনি! উগ্র তপস্যা, দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সাধনার অভাব সত্ত্বেও শক্তির পূর্ণ বিকাশ! ঐ ত বিশ্বরূপিনী শ্রীশ্রীমা, ঐ ত মাতৃভাবসরস্বতীর মূর্ত্ত বিগ্রহ। নারী শক্তিরূপিনী প্রমাণ করেছেন শ্রীশ্রীমা।

উক্ত ঘটনার পর, শ্রীশ্রীমা একবৎসর কাল দক্ষিণেশ্বরে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর বৃদ্ধা জননীর সেবায় নিযুক্তা ছিলেন। শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে ফিরে আসেন। তাঁর পিতামাতার দেহত্যাগ হয়। এদিকে দেবী চন্দ্রা-মণিও দেহরক্ষা করেন। সদা উচ্চভূমিতে মন অবস্থান করলেও, শ্রীশ্রীমা অত্যন্ত পরিশ্রমী গৃহকর্ম্মনিপুণা ছিলেন, গৃহস্থালীর সব কাষ পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে করতেন—সবদিকে দৃষ্টি তাঁর সমভাবেই ছিল! "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা"—তিনি ছিলেন মূর্ত্তিমতী লজ্জা, অথচ নির্ভীকা সত্যসংকল্পা। সর্ব্ববিষয়ে তিনি ছিলেন নারীজাতির আদর্শস্থানীয়া। তাঁর স্নেহকরুণার স্মৃতি আজও অনেকে বহন ক'রে নিজেদের ধন্য মনে করছেন। প্রায় এক বৎসর পরে তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করেন।

পথনির্ণয়—৩

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনযজ্ঞ শেষ হ'য়েছে। এতাবৎ তিনি যেসব লোকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁরা ছিলেন শ্রদ্ধাবান ও হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী, অনেকে ছিলেন সাধক ও ভক্ত। এইবার কিন্তু তাঁকে হ'তে হল ধোলো প্রভাবের সম্মুখীন। ধোলো শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের, ব্রাহ্মসমাজের গণ্যমান্য প্রধান ব্যক্তিরা এই সময় হ'তে তাঁর কাছে আসতে আরম্ভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বহু ভক্ত ব্রাহ্মসমাজ প্রত্যাগত।

ধোলো প্রভাব তখন ভারতব্যাপী, বাঙ্গলার মজ্জায় মজ্জায় ধোলো ঢুকেছে। ধোলো জাতি খৃষ্টান; সে খৃষ্টানীতে বিশুদ্ধ সন্ন্যাস আদর্শ নেই।

কিন্তু তাতে কি ? শিষ্টিতেবা ভাবেন যে, ধোলো, জগতে উচ্চস্থান পাচ্ছে, তাব অদ্ভুত বল বীর্য্য ও চমকপ্রদ জড়বিদ্যা, অতএব খৃষ্টান হলেই বুঝি ধোলোব সব গুণ আয়ত্ত হয়! মনীষী বামমোহন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন কবায় খৃষ্টান হবাব হুজুক প্রায় বন্ধ হয়। বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ। বৌদ্ধপ্লাবনে বাঙ্গালী বৌদ্ধ হয়েছিল, মুসলমান যুগে বাঙ্গালীতে মুসলমানী প্রভাব ঢুকেছিল, ধোলো আসায় খৃষ্টান হবাব আগ্রহ বাঙ্গালীব জাগ্রত হল, তাবপব ব্রাহ্ম হবাব পালা। বাঙ্গলায় নব্যন্যায়েব জন্ম, বাঙ্গালী কূট তার্কিক। ভারতেব অন্যান্য স্থানেব মত বাঙ্গালী পৌবহিত্যেব আদব কবেননি। বাঙ্গালী স্বাধীন-চিন্তাপ্রিয় ঐ সব নানা কাবণে। নেতাব আজ্ঞাবহতাই যে স্বাধীনতাব মূলে অবস্থিত তা বাঙ্গালীব হৃদয়ে আজও বসেনি। ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধা, বহুধা বিভক্ত। আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্ম ভক্তগণ শ্রীবামকৃষ্ণেব পূতসংস্পর্শে আসায় ব্রাহ্মসমাজ নতুন রূপে দেখা দেয়। ব্রাহ্মসমাজেব প্রভাবে খৃষ্টান বা মুসলমান হওয়া বন্ধ হ'লেও, অনাচাব ও অনুকবণপ্রিয়তা খুবই ছিল। শ্রীকেশবেব চবিত্রবলে ব্রাহ্মসমাজ হ'তে ঐ দোষগুলি দূব হ'তে আবম্ভ হয়। বাঙ্গলাব বৈষ্ণব সমাজেব উপব আচার্য্য বামমোহনেব 'নেক' নজব ছিল না। শ্রীবামকৃষ্ণসংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মসমাজে খোল বেজে উঠল। শ্রীকেশব বিবাহ-বিধি ভঙ্গ কবায় নতুন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হল; সেখানে মধুব 'মা' নাম প্রথম ধ্বনিত হল, খোল কবতালেব সঙ্গে বৈষ্ণবভাবেব সাধনাব প্রয়াস হ'তে লাগল, সব মহাপুরুষকে সম্মান প্রদর্শন কবা হ'তে লাগল, বেদি হ'তে অন্যান্য ধর্ম্মেব নিন্দা বন্ধ হল। সকল শ্রেণীব ব্রাহ্ম সাধকগণ শ্রীবামকৃষ্ণকে তাঁদেব মতেব লোক মনে কবতেন, যে কোন সাধক তাঁব পূতসংস্পর্শে আসতেন, তিনি শ্রীবামকৃষ্ণকে নিতান্ত আপন জন মনে করতেন।

শ্রীযুত মথুববাবু পূর্ব্বে ৺গঙ্গালাভ কবেছেন। মথুবেব নিষ্কাম ভক্তিব উদয় হ'য়েছিল। একবাব মথুব 'ভাবমগ্ন' হন। ভাবেব উপশম না হওয়ায়, তিনি শ্রীবামকৃষ্ণকে ঐ ভাব সম্বরণ ক'বে দিতে অনুবোধ কবেন। ভাব সম্ববণ হয়। দীর্ঘকালব্যাপী ভাবমুখে থাকলে অন্যান্য সব কাবেব ক্ষতি হয়, মথুর বুঝলেন। দীর্ঘকালব্যাপী ভাব ধাবণ কববাব আধাব কি তাঁর ছিল না, নিষ্কাম ভক্তি লাভ ক'বেও ? কে জানে ? অন্য সময়ে, একবার

হৃদয়কে ভাবাবিষ্ট দেখে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন "হৃদুর আবার এ কি অবস্থা হল বাবা? ·· বাবা, এ তোমারই খেলা··· আমরা দুজনে নন্দী ভৃঙ্গীর মত থেকে তোমার সেবা করব, তোমার কাছে থাক্‌ব, আমাদের এসব কেন?" বৈষ্ণবকবি বলেছেন, "নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে।" (চৈতন্য চরিতামৃত আদিখণ্ড)। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রীতিই ছিল মথুরের সুখ। ধোলোসংস্কার বেশ পেয়েও মথুরের হিন্দুসংস্কার প্রবলতম ছিল। ধোলো-শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের সংস্পর্শে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝলেন যে, ঐ শিক্ষিতেরা সর্ব্বপ্রকার হিন্দু-সংস্কারের বিরোধী, অনেকে ঘোর সংশয়বাদী ও গুরুবাদে সম্পূর্ণ আস্থাহীন, সর্ব্বোপরি তাঁরা অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যপালনের ঘোর বিরোধী। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশব প্রমুখ ব্রাহ্ম ভক্তদের বল্‌লেন, "তোমরা তাঁর অত ঐশ্বর্য্য বর্ণনা কর কেন?··· তাতে তিনি কত মহান্‌, আমাদের নিকট হ'তে কত দূরে—এই সব ভাব আসে। তাঁকে খুব আপনার বলে ভাব, তবে ত হবে?" ব্রাহ্মভক্তগণ হিন্দুকে 'পৌত্তলিক' বলতেন। তাঁরা দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণের যা কিছু সবই ঐ 'পৌত্তলিকতার' ফল। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁরা শুনলেন 'শোলার আতা দেখলে সত্যিকার আতা মনে আসে'; তাঁরা এই রকমে ভাববার খোরাক পেলেন, পরে অনেকে হিন্দুর প্রতীকোপাসনার মর্ম্ম বুঝলেন। তাঁদের তথাকথিত স্বাধীন চিন্তায় আঘাত পড়ল। বুঝলেন তাঁরা যে প্রেমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে না। এইকালে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে, প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্গের গৌরব ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বনামধন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ অনেকের সাক্ষাৎ হয়। দুঃখের বিষয়, তাঁদের জীবনচরিত লেখকগণ এসকল বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন নি। সকলেই তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হন। শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগের সময় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে ডাকা হয়। ডাক্তার সরকার প্রথম প্রথম ডাক্তার হিসাবেই যাতায়াত করতেন। পরে কিন্তু তিনি তাঁর সব কাযকর্ম্ম ছেড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আলাপে অতিবাহিত করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধির অবস্থায় মৃতকল্প তাঁর দেহ দেখে ডাঃ সরকার ষ্টেথিস্‌কোপ দিয়ে তাঁর বুক পরীক্ষা

কবেন, নাডী আছে কিনা দেখেন, ডাঃ সবকাবেব একজন বন্ধু শ্রীবামকৃষ্ণেব চক্ষুব ভিতব আঙ্গুল চালিয়ে পর্য্যন্ত দেন। মৃতেব লক্ষণ—ধোলো বিজ্ঞানে ইহাব কথা নেই—একি ? তাবপব অন্য কয়েকজন ভক্তেব ভাবাবেশ দেখে অবাক্ হয়ে যান! শ্রীশ্রীজগদম্বাব ইচ্ছায়, শ্রীবামকৃষ্ণ দিব্যভাবসহায়ে ধোলো ভাবকে পবাভূত কবেছিলেন। ডাক্তাব প্রমুখ অনেকে প্রত্যক্ষ কবেছিলেন যে, তাঁব দিব্যশক্তিব স্পর্শে প্রবৃত্তিব মোড় ফিবে যায! ইহারও হদিশ ধোলোবিজ্ঞানে নেই। ধোলোবিদ্যায় পাবদর্শী অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত যুবকগণ কি কাবণে একজন দবিদ্র নিবক্ষব ব্রাহ্মণে আত্মসমর্পণ কবেন, তাঁবাও ক্রমশঃ বুঝলেন।

শ্রীবামকৃষ্ণ নিজেব ঘবে ব'সে আছেন। কয়েকজন বয়স্যেব সঙ্গে এক বলিষ্ঠ আয়তলোচন যুবক এসে উপস্থিত হলেন। তাঁব নাম নবেন্দ্রনাথ—উত্তবকালেব স্বামী বিবেকানন্দ। নবেন্দ্রনাথ কলেজে পডেন—ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। তিনি ধোলো শিক্ষাব পবিপক্ক ফল। তিনি গুরুবাদ স্বীকাব কবেন না, সাকাবে বিশ্বাসহীন, অদ্ভুত তর্কশক্তি তাঁব। এ সকল সত্ত্বেও তিনি নিজেব 'স্ব' সম্পূর্ণ বজায় বেখে এসেছেন; তিনি গোঁডামি ভালবাসেন না। বাঙ্গালী-ভাবপ্রবণনতাব যে দোষ তা পূর্ব্বে আমবা দেখেছি—যখন যেভাব প্রবল হয বাঙ্গালী তাতেই মেতে যায়; কিন্তু বাঙ্গালী যা ধবে তাব শেষ না দেখে ছাডে না। এই স্বজাতীয গুণ বিশেষভাবে নবেন্দ্রনাথে পবিস্ফুট ছিল। ভাবপ্রবণতা ঠিকপথে চালিত হলে তাতে বহু গুণ দৃষ্ট হয়। নবেন্দ্রনাথ দুর্ব্বল ভাবপ্রবণতা পছন্দ কবতেন না; কিন্তু যে ভাবপ্রবণতায় মানুষকে ভগবদ্মুখী কবে তাহাই যথার্থ ভাবপ্রবণতা; কিন্তু ইহাতেও নবেন্দ্রনাথ বিচাবশক্তি প্রযোগে ক্ষান্ত হ'তেন না। তিনি সংযমী, সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভীক ছিলেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে বিশ্বাসী হিন্দু, সন্ন্যাস বা অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যকে চিবদিন শ্রদ্ধা কবেছেন, জীবনেব আদর্শ ব'লে স্বীকাব ক'বে এসেছেন। ইহা হিন্দুব জাতীয় সংস্কাব। হিন্দু, নিজেব দুর্ব্বলতা স্বীকাব কবেন, আদর্শকে ছোট কবেন নি কখন হিন্দু, ত্যাগ ও ভোগেব মধ্যে একটা 'বফা' কববাব চেষ্টা কবেননি, এ বিষয়ে হিন্দুর মন মুখ এক। নবেন্দ্রনাথ সন্ন্যাস সংস্কাবে বিশ্বাসহীন হলেও, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যব্রত তাঁব প্রাণেব বস্তু ছিল। তাঁর পিতামাতা তাঁকে বিবাহে

বাজি করাতে পারেন নি। বাল্যকালে তিনি সীতারাম মূর্ত্তি নিয়ে খেলা করতেন; কিন্তু রামচন্দ্র বিবাহিত যেই শোনা, অমনি সেই মূর্ত্তিদ্বয় ছুড়ে ফেলে দেন। সাধারণ ব্যক্তি অল্প ধ্যানধারণা অভ্যাস ক'রেই সন্তুষ্ট হয়, নরেন্দ্রনাথের ধ্যানে স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল, বার বার ধ্যান ক'রেও তৃপ্ত হ'তেন না—তিনি ধ্যানে ডুবে থাকতে চাইতেন। মতকে তর্কমাত্র দ্বারা প্রতিষ্ঠা ক'রেই ক্ষান্ত হ'তেন না; পরীক্ষান্তে সত্যের সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত স্থির থাকতে পারতেন না! বিনা বিচারে কোন বস্তু গ্রহণ করতেন না। পরদুঃখকাতর ও অত্যন্ত উদার ছিলেন তিনি। প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণ ব'লে উঠলেন "এত বড় সত্ত্বগুণের আধার বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় থাকাও সম্ভবে!" শ্রীরামকৃষ্ণকে একজন ঈশ্বরানুরাগী পুরুষ জেনে, কোন এক আত্মীয়ের কথায় নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসেন। সকলে ঈশ্বরের উপাসনা করে; কেন? যদি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করা যায়, এ সবই ত বৃথা। প্রমাণ কোথায়? নরেন্দ্রনাথ ব্যাকুল হ'য়ে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের নিজ প্রাণের কথা ব্যক্ত করলেন, কোনস্থানে সদুত্তর না পেয়ে অতিমাত্র ব্যাকুল হয়ে এসেই শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন "মহাশয়, আপনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন?" তৎক্ষণাৎ উত্তর হল, "হাঁ ঈশ্বর দর্শন করেছি—যেমন তুমি আমাকে দেখছ, আমি তোমাকে দেখছি, সে দর্শন তা অপেক্ষা স্পষ্ট। প্রত্যক্ষ করতে চাও প্রত্যক্ষ করাব।" নরেন্দ্রনাথ চমৎকৃত, বিস্মিত ও মহা আনন্দিত হলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গান শুনিয়েছিলেন মাত্র, কিন্তু ঘনিষ্ঠতাও হয়নি, কেহ কাহাকে বিশেষ লক্ষ্যও করেন নি। নরেন্দ্রনাথের এই প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আগমন। ঘনিষ্ঠতা বাড়ল, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণে তিনি তাঁকে অর্দ্ধোন্মাদ ঠাওরালেন! তবে ইহাও বুঝলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা স্বার্থলেশশূন্য ও তিনি ঈশ্বরের জন্যই সর্ব্বত্যাগী। ক্রমশঃ তাঁর ভ্রম দূর হল যখন তিনি পুনঃ পুনঃ দেখলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেকটি বস্তু বিচারসহ নিতে বলেন, এমন কি, তাঁকে পরীক্ষা-করতে-উদ্যত কোন ভক্তের ব্যবহারে খুসী হ'য়ে তিনি বলেন "সাধুকে দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি, তবে সাধুকে বিশ্বাস করবি।" নরেন্দ্রনাথ পবিত্রতা ভালবাসতেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি

পবিত্রতাব সচল বিগ্রহ দেখলেন, তাঁকে সবল শিশুব ন্যায় দেখে মুগ্ধ হলেন। অপবেব মনেব উপব শ্রীবামকৃষ্ণেব অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তাব কববাব শক্তি দেখে তিনি সাবধান হলেন—যাতে শ্রীবামকৃষ্ণ তাঁকে 'Hypnotise' (মোহাচ্ছন্ন) কবতে না পাবেন। শ্রীবামকৃষ্ণকে ভালবাসলেও, তিনি তাঁব সব কথা বিচাবসহ গ্রহণ কবতেন।

পিতাব মৃত্যুতে নবেন্দ্রনাথ সংসাবেব পবিচয় প্রথম পেলেন। দাবিদ্র্য—ভীষণ দাবিদ্র্য—মা ভাই সবাই দাবিদ্র্যেব কবলে! এমন ঘোব দুর্দ্দিন নবেন্দ্রনাথেব আব কখন হয়নি। তাঁব পিতৃঋণ বর্ত্তমান, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়েব গ্রাজুয়েট নবেন্দ্রনাথ মাসেব পব মাস চাকবীব জন্য বৃথা অন্বেষণ কবলেন। অসময়ে প্রায় সকল বন্ধুই তাঁকে ত্যাগ কবলেন, সুযোগ পেয়ে জ্ঞাতিবা অত্যাচাব আবম্ভ কবলেন, উপবাসে উপবাসে তিনি দুর্ব্বল হ'য়ে পডলেন। এ সমস্ত সহ্য হলেও, যখন তাঁব অন্তবঙ্গ কোন কোন বন্ধু তাঁব চবিত্রে সন্দেহ কবেছেন দেখলেন, তখন অভিমানপূর্ণ হৃদয়ে তাঁদেব কাছে ঘোর নাস্তিক সাজলেন, বুঝলেন সংসাবে সবলতাব স্থান নেই, সত্যনিষ্ঠাব আদব নেই ও ঈশ্ববিশ্বাসীব পদে পদে দুর্গতি এবং লাঞ্ছনা। তাঁব চবিত্রহীনতাব গুজব শ্রীবামকৃষ্ণেব কাণে উঠল। শুনে শ্রীবামকৃষ্ণ বল্লেন "চুপ্‌ কব শালাবা, মা বলেছে ওসব মিথ্যে! তোবা যদি ফেব ঐ সব বলবি তোদেব মুখ দেখতে পাববো না"! দুর্দ্দশায় প'ড়ে এতদিন তিনি দক্ষিণেশ্ববে যাননি, এখন শ্রীবামকৃষ্ণের ঐ কথা শুনে তিনি বুঝলেন যে একমাত্র শ্রীবামকৃষ্ণেব বিশ্বাস ও ভালবাসা তাঁব প্রতি অটুট্‌। নবেন্দ্রনাথ ঈশ্ববিশ্বাসী ছিলেন ও বুঝতেন যে কষ্ট যতই হোক্‌ না কেন, ঈশ্ববলাভ হবেই; কিন্তু সংসাবেব অভাব দূব কববাব কোন উপায়ই দেখতে পান না। এই সময়েব কথা পবে তিনি নিজে বলেন,—

["একদিন উপবাস ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাত্রে অবসন্নপদে বাড়ী ফিরিতেছি—এমন সময়ে শরীবে এত ক্লান্তি অনুভব করিলাম যে আর এক পদও অগ্রসর হইতে না পারিয়া পার্শ্বস্থ বাটীব 'রকে' জড়পদার্থের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম।·· সহজে উপলব্ধি করিলাম কোন এক দৈবশক্তি প্রভাবে একের'পর অন্য এইরূপে ভিতবের অনেকগুলি পর্দ্দা যেন উত্তোলিত হইল এবং শিবের সংসারে অশিব কেন ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য, প্রভৃতি যে সকল বিষয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এতদিন নানা

সন্দেহে আকুল হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম। অনন্তর বাটী ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ, এবং রজনী অবসান হইবার স্বল্পই বিলম্ব আছে।" (লীলাপ্রসঙ্গ—দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ)।]

এই ঘটনায় নরেন্দ্রের মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হ'ল, তিনি বুঝলেন যে সাধারণ লোকের মত পরিবার প্রতিপালন ক'রে দিন কাটিয়ে যাবার জন্য তাঁর জন্ম হয় নি। সংসারত্যাগে দৃঢ়সংকল্প হ'য়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য তাঁর সংকল্প স্থগিত রাখতে হল—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকাল পর্য্যন্ত সংসারে থাকতে স্বীকৃত হ'লেন। এদিকে নরেন্দ্রনাথের সংসারে অভাবের তাড়না বেড়ে গেল। অত্যন্ত অধীর হ'য়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ধ'রে বসলেন, "মা ভাইদের আর্থিক কষ্ট নিবারণের জন্য আপনাকে মাকে জানাতে হবে।" শ্রীরামকৃষ্ণ—"ওরে ওসব কথা যে আমি বলতে পারিনা। তুই জানানা কেন।" শেষে নরেন্দ্রনাথ মন্দিরে যেতে স্বীকার হলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়ে বললেন "আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি, আজ রাত্রে 'কালীঘরে' গিয়ে প্রণাম ক'রে তুই যা-চাইবি, মা তোকে তাই দেবেন"। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যথা সময়ে নরেন্দ্র শ্রীমন্দিরে গেলেন, দেখলেন মা সত্যই চিন্ময়ী, মা সত্যই জীবিতা, মা সত্যই অনন্ত প্রেম ও অসীম সৌন্দর্য্য প্রস্রবণ স্বরূপিনী। তিনি প্রেমে বিহ্বল হয়ে নিবেদন করলেন "মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, মা তোমার অবাধ দর্শন যেন নিত্য পাই এমনি ক'রে দাও"। শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে নরেন্দ্র ফিরে এলে শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে সাংসারিক অভাব দূর করবার প্রার্থনা ক'রেছিস ত?" নরেন্দ্রের যেন নেশার ঘোর কেটে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ—"এবারে ভুলিস্ নি, যা-যা ফের যা, আবার ঐ কথা জানিয়ে আয়।" নরেন্দ্র আবার গেলেন, আবার সেই ভুল হ'ল, সেই বিবেক বৈরাগ্যাদির প্রার্থনা ক'রে ফিরে এলেন! শ্রীরামকৃষ্ণ আবার পাঠালেন; এবার মন্দিরে চিন্ময়ী মার মূর্ত্তি দেখে নরেন্দ্রনাথের মনে হ'ল, "রাজাকে দেখে লাউ কুমড়ার প্রার্থনা! এমন হীন বুদ্ধি আমার?" দারুণ লজ্জায় ঘৃণায় প্রার্থনা করলেন "মা আর কিছু চাই না, জ্ঞান ভক্তি কেবল দাও মা"। আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে ফিরে এলেন; কিন্তু তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে কিছুতেই ছাড়লেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ—"আচ্ছা যা,

তাদেব মোটা ভাত কাপডেব অভাব হবে না"। যিনি সাকাব মানতেন না, এখন তিনি বুঝলেন যে বৈদিক যুগ হ'তে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্য-সংস্কাবের ধাবা সবই তাঁব মধ্যে বয়েছে, আব শ্রীবামকৃষ্ণে আর্য্য-প্রভাব পূর্ণ পবিণতি।

আজ ও অনেকেব ভ্রান্ত ধাবণা যে কাম-কাঞ্চন ত্যাগী পূর্ণ-বৈবাগ্য-মূর্ত্তি শ্রীবামকৃষ্ণ ও শ্রীবিবেকানন্দ গৃহস্থেব আদর্শ হ'তে পাবেন না। তাঁবা বোঝেন না যে, সাধু, গৃহস্থ, বা আপামব সাধাবণ—সকলকেই একটা আদর্শ ধ'বে উঠতে হয়, ওঠবাব প্রণালীও একটি মাত্র নয়। নাবায়ণগঞ্জ দেওভোগেব নাগমহাশয়েব মত মহাপুরুষ ও একটা আদর্শ পেযে তাঁব জীবন গঠন ক'বেছিলেন, যুধিষ্ঠিব বা অপবাপব অনেক মহাজনদেব সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়। শ্রীবামকৃষ্ণ বা শ্রীবিবেকানন্দ 'একঘেয়ে' ভাব ভল বাসতেন না। তা ছাডা, তাঁবা কি এসেছিলেন শুধু সন্ন্যাসীদেব জন্য—না, আপামব দীন পতিত অনাথেব জন্যও? কেন তাঁবা জীবনেব শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উপদেশ দিতে ক্ষান্ত হন নি, কেন তাঁবা জডপ্রায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ কববাব চেষ্টা পেয়েছেন আজীবন? তাঁদেব মত কোন্ জীবনে দীন অনাথেব জন্য এত করুণা যে তাবা অন্য আদর্শ নেবে?

এক দিন নবাগত বহু নব-নাবী ও শ্রীবামকৃষ্ণেব অনেক ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ চলেছে। শ্রীবামকৃষ্ণ বলছেন যে, ঐ মতে তিনটি বিষয় পালনে যত্ন কবতে হয়—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন। নামই ঈশ্বব—নাম নামী অভেদ, ভক্ত ভগবান অভেদ, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জেনে সাধুভক্তদেব বন্দনা করতে হয়, যে, কৃষ্ণেব এইজগৎ জেনে জীবে দয়া—'দয়া', এই কথা উচ্চাবণ কবেই তিনি সহসা সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন! কিঞ্চিৎ চেতনা ফিবে এলে অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় তিনি বলতে লাগলেন, "জীবে দয়া, জীবে দয়া? দূবশালা। কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া কববি? দয়া কববাব তুই কে? না, না—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবেব সেবা।" (লীলাপ্রসঙ্গ, ঐ)। ভাবাবিষ্ট শ্রীবামকৃষ্ণেব ঐ সকল কথা শুনে সে দিন একমাত্র নবেন্দ্রনাথ এক নতুন' আলো পেলেন, ভবিষ্যতে 'রামকৃষ্ণমিশনেব' সেবা-ধর্ম্মেব বীজ সে দিন রোপিত হ'ল! কর্ম্মযোগ সাধনায় নতুন আলোক এল! সেবা অর্থাৎ পূজা বা প্রেম। ভক্তিব সঙ্গে অদ্বৈতজ্ঞানেব—

কর্ম্ম পরিণত অদ্বৈতজ্ঞানের—কি অপূর্ব্ব সম্মিলন। বরাবর সবাই শুনে এসেছে যে অদ্বৈত পথ গ্রহণ করলে, ভক্তি ভালবাসা, জগৎ সংসার, সব সবলে হৃদয়ে হ'তে উৎপাটিত করতে হয়, কিন্তু এই কর্ম্মযোগের সাধনায় বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কর্ম্মে ইহাকে অবলম্বন করা যায়—ইহাতে সকলের অধিকার!

শ্রীরামকৃষ্ণকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আনা হ'ল। তিনি এখন শ্যামপুকুরে। শ্রীশ্রীমা ও এসেছেন। কি অন্তরিধার মধ্যে, কত সন্তর্পণে, লোকচক্ষুর অগোচরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার ভার নিয়ে অবস্থান করতেন, সে সব কথা বর্ণিত হয়েছে লীলাপ্রসঙ্গে। এই কালে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে লোকের ভিড় লেগে থাকত, নারীদের ভিড় ও যথেষ্ট হত। তাঁর উপদেশদানের বিরাম ছিল না। কঠিন গলরোগ; ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁর বিশ্রাম অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আহার পথ্যাদি যথাসময়ে প্রস্তুত ক'রে রাখা ও অন্যান্য কাজের ভার ছিল শ্রীশ্রীমার, রাত্রি জাগরণাদির সমস্ত ভার নিয়েছিলেন ভক্তেরা। এত লোকের আয়োজন এমন নীরবে শ্রীশ্রীমা সম্পাদন করতেন যে তাঁর অস্তিত্বও জানতে পারা যেত না! এই স্থানেই নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যুবকগণ শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য সংঘবদ্ধ হন ও ক্রমশঃ সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে সাধন ভজনে রত হ'তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন—সাধনভজনের উৎসাহ শ্রীরামকৃষ্ণ হ'তেই তাঁরা পান। তাঁদের ঐসময়ের কঠোর সাধনার সব কথা আজ ও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সমস্ত খরচের ভার গৃহী ভক্তেরা নিয়েছিলেন। সাধক-ভক্ত-সম্মিলনে সব সময়ে ঐস্থান জমজমাট্ থাকত। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ গুণে ও তাঁর সেবার ফলে ভক্তগণের হৃদয়ে ভক্তি বিশ্বাস দিন দিন বৃদ্ধিলাভ করলেও—তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য ভাবসমাধি দেখে—ভাবোচ্ছ্বাসকেই ধর্ম্মের চূড়ান্ত পরিণতি ব'লে মনে করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে বিশ্বাসী অনেকে, ভিন্ন ভিন্ন অবতারের সময় কে কার সাঙ্গোপাঙ্গ—কে কত বড় ইত্যাদি—স্থির করতে উদ্যত হলেন। নরেন্দ্রনাথ এই ভাবুকতার প্রবল বিরোধী হলেন, বারবার তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধি কঠোর সংযম ও তপস্যার ফল। নরেন্দ্রনাথের কথা দৃঢ়চেতা সবল যুবকগণই বুঝতে পারবেন ও কার্য্যেও পরিণত করতে পারবেন জেনে, নানা যুক্তি সহায়ে তাঁদের সর্ব্বদা বলতেন—

["যে ভাবোচ্ছ্বাস মানব-জীবনে স্থায়ী পরিবর্ত্তন উপস্থিত না করে—যাহার প্রভাব মানবকে এইক্ষণে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিয়া পরক্ষণে কাম-কাঞ্চনের অনুসরণ হ'তে নিবৃত্ত করতে পারে না,—তাহার গভীরতা নাই, সুতরাং তাহার মূল্যও অল্প। উহার প্রভাবে কাহারও শারীরিক বিকৃতি, যথা অশ্রুপুলকাদি, অথবা কিছুক্ষণের জন্য বাহ্যসংজ্ঞার আংশিক লোপ হইলেও তাঁহার (নরেন্দ্রের) নিশ্চয় ধারণা, উহা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রসূত; মানসিক শক্তি বলে উহাকে দমন করিতে না পারিলে পুষ্টিকর খাদ্য ও চিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ করা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য।" আরো বলতেন "ঐরূপ অঙ্গবিকার এবং বাহ্যসংজ্ঞা লোপের ভিতর অনেকটা কৃত্রিমতা আছে। সংযমের বাঁধ যত উচ্চ এবং দৃঢ় হইবে মানসিক ভাব তত গভীর হইতে থাকিবে, এবং বিরল কোন কোন ব্যক্তির জীবনেই আধ্যাত্মিক ভাবরাশি, প্রবলতায় উত্তাল তরঙ্গের আকার ধারণ করিয়া ঐরূপ সংযমের বাঁধকেও অতিক্রমপূর্ব্বক অঙ্গবিকার এবং বাহ্যসংজ্ঞার বিলোপরূপে প্রকাশিত হয়। নির্ব্বোধ মানব ঐ কথা বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত ভাবিয়া বসে। সে মনে করে, ঐরূপ অঙ্গবিকৃতি সংজ্ঞাবিলুপ্তির ফলেই বুঝি ভাবের গভীরতা সম্পাদিত হয়, এবং তজ্জন্য ঐ সকল যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক চেষ্টা করিতে থাকে। ঐরূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চেষ্টা ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয় এবং তাহার স্নায়ুসকল দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া ঈষন্মাত্র ভাবের উদয়েও তাহাতে ঐ সকল বিকৃতি উপস্থিত করে। ফলে উহার অবাধ প্রশ্রয়ে মানব চরমে চিররুগ্ন অথবা বাতুল হইয়া যায়। ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর হইয়া শতকরা আশীজন জুয়াচোর এবং পনরজন আন্দাজ উন্মাদ হইয়া যায়। অবশিষ্ট পাঁচজন পূর্ণ সাক্ষাৎ ক'রে ধন্য হইয়া থাকে। অতএব সাবধান।" (ঐ ঐ.)]।

নরেন্দ্রনাথের যুক্তির সত্যতার প্রমাণ ভক্তেরা অতি শীঘ্রই পেলেন। গুরূপদেশে যে ভাব অবলম্বন ক'রে সাধক সাধনায় অগ্রসর হন, সাধকের আত্তিতে যে ভাব পরিস্ফুট হয়—তার মূলে থাকে সংযম, তপস্যা, দৃঢ় সংকল্প ভক্তি, বিশ্বাস। সেই ভাব পরীক্ষিত সত্য, সাধক সাধন দ্বারা উহার স্বরূপ বুঝতে পারেন, উহা অনুকরণজনিত ভাবোচ্ছ্বাস নয়। সংযমশক্তিবিহীন ভাবুকতাতেই গোঁড়ামি আনায়, মানুষকে একঘেয়ে করায়—ইহাও ভক্তেরা বুঝলেন। মনের হীনতা প্রকাশ পায় তখনই যখন আদর্শের দিকে স্থির লক্ষ্য না রেখে ছোট বড় বিচারে মন প্রবৃত্ত হয়, নঙর্থবোধক ভাবেরই প্রাধান্য দেয়, ইহার ফল—দল ও দলাদলি। আদর্শের জন্য যাঁরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত, তাঁরাই যে আদর্শ-সাধক—অপরে নয়—ইহা তখন কেহ

পা আছে কিনা বুঝতে পাবছেন না! যখন হাত স্পর্শ কবিয়ে দিয়ে তাঁব বোধ আনাবাব চেষ্টা হচ্ছে ও তাঁকে চলতে বলা হল, তিনি মাটিতে পা ফেলতে পাচ্ছেন না! কোথায় পা ফেলবেন,—তিনি সব শূন্যময় দেখেছেন !!

একবাব কোন ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা কবেন "আপনি ঠাকুবকে কি ভাবে দেখেন ?"—উত্তব "সন্তান ভাবে"। বৈবাগ্যবানকে তিনি বৈবাগ্যে প্রোৎসাহিত কবতেন। শ্রীবামকৃষ্ণের ন্যায় তাঁব মধ্যে বিপবীত ভাবেব সমাবেশ ছিল। জননীব একমাত্র পুত্রকে তিনি সন্ন্যাস জীবন যাপন কববাব জন্য উৎসাহ দেন, আবাব পতিব ঘবে প্রবেশ কবতে শঙ্কিতা ও কুণ্ঠিতা নববধূকে বুঝিয়ে তাব শয়নঘবেব দবজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দেন। শ্রীবামকৃষ্ণও শ্রীশ্রীমা এই দুই পূত চবিত্র অনুধ্যানেব বিষয়—বর্ণনা অসম্ভব। তাঁদেব কথা সামান্য লিখে লেখনী ধন্য হল। আব গুটিকতক কথা।

নবেন্দ্রনাথ যথার্থ সাধক সকলকে সমান জ্ঞান কবতে শিক্ষা দিতেন, কাবণ তা না কবলে শ্রীবামকৃষ্ণকেই অশ্রদ্ধা কবা হয়। শ্যামপুকুবে শ্রীবামকৃষ্ণকে দর্শন কববাব জন্য প্রভুদয়াল মিশ্র নামে জনৈক খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক আসেন। নবেন্দ্রনাথ তাঁকে প্রশ্ন কবলেন যে তিনি খৃষ্টান হ'য়ে গৈবিক বস্ত্র ব্যবহাব কবেন কেন ; উত্তব—

["ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ভাগ্যক্রমে ঈশামসির উপর বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে ইষ্টদেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই কি আমাকে পিতৃপিতামহগত চালচলনাদি ছাড়িয়া দিতে হইবে ? আমি যোগশাস্ত্রে বিশ্বাস এবং ঈশাকে ইষ্টদেবতারূপে অবলম্বন করিয়া নিত্য যোগাভ্যাস করিয়া থাকি। ভারতের ঈশ্বরপ্রেমিক যোগীরা সনাতন কাল হইতে গৈরিক পরিধান করিয়া আসিয়াছেন, স্থতরাং উহাপেক্ষা আমার নিকট অন্য বসন কি প্রিয়তর হইতে পাবে ?" (ঐ ঐ)]।

গোঁড়ামি বর্জ্জিত সাধন-সহায় হিন্দু প্রতিষ্ঠানেব উপব এই শ্রদ্ধা সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছিল।

শ্যামপুকুব হ'তে শ্রীবামকৃষ্ণকে কাশীপুবেব এক প্রশস্ত বাগানবাড়ীতে আনা হয়। ঐ দুইস্থানেই ভবিষ্যৎ বামকৃষ্ণমিশনেব বীজ উপ্ত হয়—যুবক ভক্তগণ ঐখানেই প্রথম সংঘবদ্ধ হন। রামকৃষ্ণ মিশনেব গোড়াব কথা একটু জানা দবকার।

[শ্রীরামকৃষ্ণের নশ্বর শরীরের লীলা শেষ হয়েছে। নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ১৮।১৯ জন যুবক পবিত্রতা ও ত্যাগব্রত গ্রহণ ক'রে বরাহনগরে এক ভগ্নপ্রায় বাড়ীতে স্থান নিয়েছেন। সেস্থান হ'তে পরে তাঁরা আলমবাজারের এক বাড়ীতে উঠে যান। ঐ দুই স্থান—'বরাহনগরের মঠ' ও 'আলমবাজারের মঠ' নামে বিদিত ছিল। সাধনভজন রত ঐ সন্ন্যাসী যুবকবৃন্দের চরিত্রবলে সেই সব স্থানে লোকসমাগম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বামীজি পরিব্রাজকরূপে নানাস্থান ভ্রমণ ক'রে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন ও সেখান হ'তে আমেরিকায় যান। এইকালে বাগবাজার ৫৭নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে (৺বলরাম মন্দিরে), শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ স্বামী ও যোগানন্দ স্বামীর উদ্যোগে একটি সভা স্থাপিত হয়। ঐ সভার সম্পাদক (Secretary) ছিলেন ৺শরচ্চন্দ্র সরকার। ৺ডাক্তার শশীভূষণ ঘোষ, ৺প্রিয়নাথ সিংহ, সুরেন্দ্রনাথ সেন, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটের ৺চুনীলাল বসু ও আরো কয়েকজন তখন ঐ সভার সভ্য ছিলেন। সভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে নানা বিষয় আলোচিত ও ধ্যান জপাদি হত। সভার কার্য্য পরিচালিত হত শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর নির্দ্দেশে। ব্রহ্মানন্দ স্বামী সকল বিষয়েই শ্রীমদ্ যোগানন্দ স্বামীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। সভার বিবরণী সম্পাদক লিখতেন। পরে এই ভার ৺ডাক্তার ঘোষ গ্রহণ করেন। সময়ে সময়ে মঠের সাধুরা উপদেশ দিয়ে সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করতেন। প্রশ্নোত্তরের মীমাংসা সাধুরাই করতেন। চাঁদা আদায়ও অনেক সময় স্বয়ং শ্রীমদ্ যোগানন্দ স্বামী করতেন। কোন সভ্য অনুপস্থিত হলে যোগানন্দ স্বামী সভ্যের গৃহে পদার্পণ ক'রে তাঁর খবর নিতেন—এমনই ছিল পরস্পর ভালবাসার সম্পর্ক তখন। সভ্যেরাও সাধুদের নিত্য দর্শনের জন্য ব্যগ্র হয়ে থাকতেন। কয়েক বৎসর পরে স্বামীজি ফিরে এসে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামে যে সভা স্থাপন করেন, ঐ ৫৭নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে, তাহাতে শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ স্বামী পরিচালিত সভা ও ইতস্ততো বিক্ষিপ্তভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের যে কার্য্য চলছিল (যা ব্রহ্মানন্দ স্বামী ও সাধুদের নির্দ্দেশে পরিচালিত হত)—সবই ঐ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যায়। সেই সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য, ব্রত, কার্য্যপ্রণালী, ভারতবর্ষীয় কার্য্য প্রভৃতির এক মুদ্রিত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। ঐ বিজ্ঞাপনে, ভারতবর্ষীয় কার্য্য সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, "ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্য্যব্রত গ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষার আশ্রম-স্থাপন এবং যাহাতে তাঁহারা দেশদেশান্তরে গিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন তাহার উপায় অবলম্বন।" (উদ্বোধন, ১ম বর্ষ—৩য় সংখ্যা দ্রঃ)]।

বলা বাহুল্য, আজ ও "আচার্য্য-ব্রত গ্রহণাভিলাষী" গৃহস্থদিগের শিক্ষার

জন্য কোন আশ্রম স্থাপিত হয় নি। আশা করা যায় এই 'শতবার্ষিকী' উপলক্ষে ঐ বিষয়ে চেষ্টা হবে। শতবার্ষিকীর উদ্যম স্থায়ী ফল প্রসব করবে অনেকে বিশ্বাস করেন। যে ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষা সমাজ হ'তে লুপ্তপ্রায়, ঐ রকম আশ্রম স্থাপন হলে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার বহুল প্রচার সম্ভব।

তন্ত্রের কাল, প্রভাব ও পুরাণ কথা

আপনাদের অভিপ্রায় অনুসারে এবার তন্ত্রের কাল, ভারতীয় জীবনে তন্ত্রের প্রভাব ও পুরাণ কথা সম্বন্ধে গুটি কয়েক কথা বোঝবার চেষ্টা করা যাবে।

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের সঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রের সাদৃশ্য ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখেছি। বৈদিক যুগে কুণ্ডলিনীবিদ্যাও অজ্ঞাত ছিল না। অতএব তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত বিদ্যা ভারতে বরাবর চলে আসছে। 'তন্ত্র'—এই নামটি পরে হয়, যখন একটি বিশেষ বিদ্যা বা সাধন প্রণালীকে পৃথক ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। ধোলো মনীষিগণেরও অনেকের মত যে, উপনিষদ্ যুগের পর সাধনশাস্ত্র বা তন্ত্রশাস্ত্রের যুগ। নানা কারণে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড অপ্রচলিত হওয়ায়, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ব্যয়বহুল জটিলতা দূর ক'রে, বৈদিক ভাবের মূলনীতি সম্পূর্ণ বজায় রেখে, তন্ত্রশাস্ত্র সাধককে এক নতুন সাধন পথ দেখিয়ে দেন।

ঋগ্বেদে যজ্ঞ বেদিকে 'যুবতী' (স্থিরযৌবনা) বলা হয়েছে, তিনি 'ঘৃত প্রতীকা,' সেখানে দুটি পাখী আছে; "একঃ সুপর্ণা" সমুদ্রে প্রবিষ্ট হ'য়ে বিশ্বভুবনে স্ফুরিত হন, অপরটি মাতাকে দেখে ইত্যাদি; সূক্ত বলছেন, একই পাখী—"বিপ্রাঃ কবয়োঃ···বহুধা কল্পয়ন্তি"—বহু ভাবে কল্পিত। (১০ম ম.-১১৪।৪।৫)।

['ভারতী'—স্বর্গস্থ 'বাক্', 'ইলা'—পৃথিবীস্থ 'বাক্', 'সরস্বতী'—অন্তরীক্ষস্থ 'বাক্' (সায়ন)। ঋক্ ১ম—১৫০।৩ সূক্তে অগ্নিস্তুতিতে "সচন্দ্রো বিপ্র মর্ত্ত্যো মহোব্রাধীং তমোসিবি ··।" 'সচন্দ্রো মর্ত্ত'—মানব অমৃতময় বা আনন্দময় হয়ে যান। এখানে 'চন্দ্র'—একই অর্থে ঋগ্বেদে ও তন্ত্রশাস্ত্রে ব্যবহৃত, কিন্তু দত্ত মহাশয়ের অনুবাদ—'মানুষ চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদকর হয়'।]

ঋগ্বেদ ১ম-১৬৪।৪১ সূক্তে 'বাক্'—একপদী, চতুষ্পদী, অষ্টাপদী, নবপদী, ও 'সহস্রাক্ষবা পবম ব্যোমন্' রূপে বর্ণিত। এই বর্ণনা স্পষ্টতঃ কুণ্ডলিনীব। 'বাক' এখানে ব্রহ্মময়ী। মূলেব 'গৌবী'=মাতৃকা নয় কি? (পবেব ৪২।৪৩ সূক্ত দ্রষ্টব্য)। সহস্রাবই সুধা-সমুদ্র। 'পৃশ্নি' অর্থাৎ সোম ক্ষবিত হয় সহস্রাব হ'তে। সহস্রাবাচ্যুত অমৃতই সর্ব্বকামদ—'উক্ষাণং'। 'শকময় ধূমমাবাদ পশ্যং'—ইহা কি ধ্যামলরূপ দর্শন? মূলেব 'বীবাস্তানিধর্মাণি প্রথম ন্যাসন্" এ, 'বীর' শব্দেব অর্থ কি? 'গৌবী'=মেঘেব বব (সায়ন) —ধ্যামলেব প্রথম ববও স্ফুট, কি? "চত্বাবি বাক্ পবিমিতা পদানি তানি বিদু ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ...।" (১৬৪।৩৮ ও ১৯ দ্রঃ)। অর্থাৎ 'বাক্ পবিমিতা চাবটি পদ মনীষী ব্রাহ্মণেবা জানেন, তিনটি গুহায় নিহিত (অপ্রকাশ), চতুর্থটি মানুষেবা বলে।' (এখানে 'তুবীয়'=৪র্থ, তূর্য্য সংখ্যাবাচক)। ইহা স্পষ্টতঃ—পব, পশ্যন্তি, মধ্যমা, বৈখবী=এই চাবি প্রকাব বাক্। ব্রাহ্মণ=বেদ্‌বিদ্ (সায়ন)।

[এই সূক্ত, ধোলোমতে, ঋগ্বেদেব শেষভাগে রচিত হয়, কারণ অথর্ব্ববেদে এই সূক্তের সমস্ত ঋক্ পাওয়া যায় এবং ১০ম মণ্ডলেও উচ্চভাব আছে। উচ্চভাব পেলেই শেষে রচিত, এ যুক্তি মন্দ নয়। ধোলো যেন মেধা ও প্রতিভাকেও অস্বীকাব করতে উদ্যত।]।

ঐ অষ্টম মণ্ডলে বলা হয়েছে যে 'সত্যই' পৃথিবীকে উন্নত ("সত্যেনোত্ত-ভিতা") ক'বে বেখেছেন, সূর্য্য বেখেছেন স্বর্গকে, ঋত বেখেছেন আদিত্যগণকে দিব্যলোকে—'সোম' ঐ স্থানে অধিষ্ঠিত, অগস্ত্য ও লোপামুদ্রাব আলাপ শুনে শিষ্যেব বৈবাগ্যসঞ্চাব হয় (১ম ম-১৭৯)। সোমেব কাছে শিষ্যেব প্রার্থনা যে, হৃদয়মধ্যে পীত সোম যেন তাঁকে শান্তি দেন, কাবণ মানব বহু কামবান! এখানে সোম 'হৃৎসুপীত'। এই বকম ঋগ্বেদেব বহু বচন দ্বাবা প্রমাণিত হয় যে পববর্ত্তী তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সাধন তত্ত্ব ঋগ্বেদেব যুগেও অজ্ঞাত ছিল না। তন্ত্রশাস্ত্র ভাবতের নিজস্ব সম্পত্তি।

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেব ক্রিয়ায় অধিকাংশ স্থলে স্বর্গকামনায় যজ্ঞ হত। এই সাধনাব ফল, পবলোকে সুন্দব সুখস্থান প্রাপ্তি। এবকম যজ্ঞ ব্রহ্মযজ্ঞ নয়, জ্ঞানকাণ্ডাভিমুখী ক্রিয়া নয়। জ্ঞানকাণ্ড বা বেদ নিজেকে ক্রিয়ামুখে অভিব্যক্ত কববাব জন্যই তন্ত্রশাস্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ কবেছেন। যে সাধনা ব্রহ্মযজ্ঞ নয়,

তাহাই তন্ত্রের 'পশু' সাধনা। শাক্ত-শৈবাগমের সাধনা 'বীর' ও 'দিব্য' ভাব নিয়ে। গন্ধর্ব্বতন্ত্র বলেন যে এই সাধনার অধিকারী তিনিই যিনি 'দক্ষ', 'জিতেন্দ্রিয়', 'সর্ব্ব হিংসাবিনির্ম্মুক্ত', 'সর্ব্বজীবহিতে রত', 'শুচি' ও 'ব্রহ্মনিষ্ঠ'। (হিংসা=বৃথা হিংসা, হিংসার ভাব)। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ফল, ইহলোকে ও পরলোকে সুখ=ভোগানন্দ লাভ। শক্তি সাধনায়, শুধু সমষ্টি ভাব নিয়ে নয়, প্রত্যেক ভাব বা রূপ ব্যষ্টিভাবে সাধকের কাছে সম্বিৎ বা চিৎ। ইহার ফল যোগ ও ভোগ একসঙ্গে=আত্মানন্দ।

একটা শক্তিবাদ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হ'তে ভারতের সর্ব্বদেশেই ছিল। একমাত্র ভারতই শক্তিকে মাতৃরূপে পেয়েছেন। অন্যত্র শক্তিবাদ, অনেক স্থলে ব্যভিচার-দুষ্ট ছিল। সাধন ক্ষেত্রে, শেষ তন্ত্রের 'ব্যভিচার' সমগ্র হিন্দু-সংস্কৃতি বিরোধী। বর্ত্তমানে 'শিবোক্তির' দোহাই দিলেই হয় না। গন্ধর্ব্বতন্ত্রোক্ত লক্ষণের সঙ্গে মিল কোথায়? ব্যভিচারদুষ্ট সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় কি? যে সিদ্ধি লাভ হয় বলা হয়, সে সিদ্ধিলাভের স্বরূপ কি?

যাঁরা কেবল ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তন্ত্রশাস্ত্র দেখেন, তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে শক্তিবাদের সঙ্গে প্রথমে শৈববাদের সম্বন্ধ ছিল না!! অথচ তাঁদের ঐ উক্তি সমর্থনের জন্য তাঁরা কোন যুক্তি দেন নি। মাহেন-জা-দাড়া প্রভৃতি স্থানে যে সব লিঙ্গমূর্ত্তি পাওয়া গেছে, সেই সব লিঙ্গমূর্ত্তি গৌরীপট্টের উপরেই বিরাজ করছেন, যেমন এখনও করছেন; যেন ইহাই দৃঢ়রূপে প্রমাণ করছে যে শৈববাদ ও শাক্তবাদ একেরই দুই রূপ—আর্য্যহৃদয়ের দুটি ভক্তি অর্ঘ্য।

কুলালিকাম্নায় ('কুব্জিকা' মত) দেবীর উক্তি, "গচ্ছত্বং ভারতবর্ষে" ইত্যাদি দেখে ৺পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে তন্ত্রশাস্ত্রের জন্মস্থান ভারতের বাহিরে। তাঁর মতে, খৃঃ ৭ ও ৮ শতকে যখন উম্মেদিয়া ও আব্বাসিয়া খালিফগণ তুর্কিস্থানে ইসলামধর্ম্ম প্রচার করেন, সেই সময় পুরোহিতেরা ভারতে পালিয়ে আসেন ও তাঁরাই ভারতে তন্ত্র বা সেখানকার জনমত প্রচার করেন। তার পরেই শাস্ত্রী মহাশয় স্পষ্ট স্বীকার করেছেন যে, (১) 'তন্ত্র'—এই নামটি ঐ সময়ের বহু পূর্ব্বে পাওয়া যায়, যেমন শৈবতন্ত্র ও পঞ্চরাত্র বা বৈষ্ণবতন্ত্র; তাঁর মতে, একই তত্ত্বোপদেশ থাকলে ও 'পঞ্চরাত্রটি' জাল, যে, (২) বৌদ্ধবিহার মাত্রেই তন্ত্র

ছিল—বৌদ্ধতন্ত্রই বাঙ্গলায় বেশী ছিল ও ব্রাহ্মণেরা তন্ত্রচর্চ্চা হ'তে একরকম বিরত ছিলেন ও পরে বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দু আকার ধারণ করায় ব্রাহ্মণেরা তা গ্রহণ করেন ; যে, (৩) নৈমিষারণ্যে তন্ত্র সম্বন্ধে যে প্রসঙ্গ হয় তাতে বোঝা যায় যে তন্ত্রদীক্ষা ও পুরাণদীক্ষা। শাস্ত্রী মহাশয় ভারতীয় তন্ত্রের সঙ্গে—বহির্বাগত যে সব ভাব তন্ত্রে ঢুকেছে ও তন্ত্র নামে পরিচিত হয়েছে, ঐসব তন্ত্রের (যেমন বৌদ্ধতন্ত্র, অথবা যেগুলি মিশ্রিত হয়ে রয়েছে, যেমন বাঙ্গলার তন্ত্র)—গোলযোগ পাকিয়েছেন। ব্রাহ্মণেরা তন্ত্রচর্চ্চা হ'তে বিরত ছিলেন না, ছিলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতকুল যাঁরা তন্ত্রমতের বিশেষপূজার অধিকার হ'তে বঞ্চিত ছিলেন। পৌরাণিকি দীক্ষা মানে কি? 'গুরুকরণ' 'মন্ত্র', 'যন্ত্র' প্রভৃতি—এগুলি কি? তন্ত্র ছাড়া আছে কি? বৈদিক দীক্ষা ব'লে বিশেষ কিছু আছে কি? ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারণ কোথায় এখন? তিন দিন ঘরে বালককে বন্ধ ক'রেই সে নিয়ম রক্ষা করা হয়। গায়ত্রীসাধন আছে কজনের? উডরফ্ সাহেবও এদেশের বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মুখে শুনে বলেছিলেন যে কৌতুহল-বৃত্তির অনুশীলন ছাড়া ভারতে অন্য বেদ চর্চ্চা নেই। একমাত্র সন্ন্যাস সম্প্রদায় ছাড়া বেদ এখনও যাদুঘরের প্রদর্শিত কঙ্কালবৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'দীক্ষা' এত পবিত্র ও শুদ্ধ আচার যে তান্ত্রিকদীক্ষাকে পুরাণদীক্ষা নাম দিলে ক্ষতি নেই, কিন্তু (১) তান্ত্রিকদীক্ষায় যে উদার ভাব বর্ত্তমান ও বিভিন্ন অবস্থার জন্য সাধকের জন্য যে সব নানা প্রকার দীক্ষার ব্যবস্থা আছে তার সঙ্গে পুরাণদীক্ষার পার্থক্য স্পষ্ট ; (২) পুরাণে ও পৃথক ভাবে তন্ত্র মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে ; (৩) বেদ ও তন্ত্রের কথা পুরাণে পাশাপাশি বলা হয়েছে। ভারতের সঙ্গে ভারতেতর দেশসমূহের সম্বন্ধ যে কত প্রাচীন তা বোঝবার চেষ্টা আমরা পূর্ব্বে করেছি—খৃঃ ৭ ও ৮ শতকের কথা ত তুচ্ছ। ভারতীয় শক্তিবাদের বিশেষ রূপও বোঝবার চেষ্টা করেছি।

[অধ্যাপক সুনীতিকুমার প্রদত্ত এক বক্তৃতার সার মর্ম্ম হিন্দু পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩৪১) বাহির হয়, তাহাতে লিখিত আছে—"১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রেরিত কাপ্তেন বাওয়ার কর্ত্তৃক, পামিরের পূর্ব্বে ভূর্জ্জপত্রের পুঁথি পাওয়া যায়। তারপর রুশ, জার্ম্মান, ফ্রেঞ্চ, ইংলণ্ড ও জাপানের পণ্ডিতগণ মধ্যএশিয়ার গিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্ত করেন যে খৃষ্টজন্মের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ অশোকের

সময় হ'তে খৃষ্টের মৃত্যুর হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ভারতীয় সভ্যতা 'উপছিয়া পড়িয়া' সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে গিয়েছিল, মধ্যএশিয়ার নানা অজ্ঞাত বিদেশী ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে 'লিখিত ভাষার পদে' ভারতীয়েরা 'উন্নীত করেন'। এই সব আবিষ্কারের পর য়ুরোপের পণ্ডিতসমাজ মধ্যএশিয়ার একটি নতুন নাম দিয়েছেন 'Ser India' (চীনে ভারত)—অর্থাৎ চীন ও ভারতীয় সভ্যতায় গড়া দেশ। Aurel Stein (জর্ম্মাণ পণ্ডিত) মধ্যএশিয়ায় যান ও অনুসন্ধান বলে তিনি ও পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেন যে পূর্ব্বে মধ্যএশিয়ার লোকেরা তুর্কী বলিত না, তাহারা আর্য্যভাষা-ভাষী ছিল। খৃষ্টের পূর্ব্বে বৌদ্ধেরা তাহাদের দেশে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তাহাদিগকে সংস্কৃত অক্ষর দেন।"]

পরশুরামকল্পসূত্র রচয়িতা (তন্ত্রসূত্র রচয়িতা) পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক। কথিত আছে সে সময় তুর্কীস্থান লব কুশের রাজ্য ছিল (ভারতধারা ২য় খণ্ড দ্রঃ)। কেন যে বহুদেশ আর্য্যভাষাভাষী ছিল তার সূত্র ইহা হ'তেও বোধ হয় পাওয়া যেতে পারে। মন্ত্রব্রাহ্মণ গ্রন্থে, মহাভারতে ও বহু পুরাণে স্পষ্টতঃ তন্ত্রসাধনার কথা আছে। শাস্ত্রী মহাশয় যাকে 'অকথ্য' বলেছেন, তা অপেক্ষাও তীক্ষ্নতর আচার অশ্বমেধাদি যজ্ঞে—এমন কি আরণ্যকেও—বর্ত্তমান। ভারতের ভাব অপরের দ্বারা কোন্ কোন্ স্থলে কুৎসিত আকার ধারণ করেছে ও কেন করেছে তাহাই পণ্ডিতকুলের দেখান উচিৎ, ইহাই আমরা আশা করি। বর্ণগত সাম্প্রদায়িক ভাব তাঁদের অশোভন। শাস্ত্রী মহাশয় 'নারদপঞ্চরাত্র'কে 'জাল' বলেছেন, কিন্তু কোন্ শাস্ত্র হ'তে জাল করা হয়েছে? সাধন-তত্ত্বের উপদেশ বা সাধন-প্রণালী সাধকের দরকার, শাস্ত্র আধুনিক কি প্রাচীন ইহাতে সাধকের ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। অনেকের ধারণা, হিন্দু রাজাদের সময়ে বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দু আকার ধারণ ক'রে; ইহা আংশিক সত্য। হিন্দু সাধককুল সাধন দ্বারা পরীক্ষা ক'রে বৌদ্ধতন্ত্রকে বিরাট হিন্দুশরীরে আত্মস্থ করবার চেষ্টা করেছেন, ধোলোদের মত একটা নীতি (policy) প্রয়োগ তাঁরা করেন নি; হিন্দুরাজগণ ঐ সব সাধককুলের গুণপণা দেখে সমাদর করেছেন এবং হিন্দুরাজগণের আশ্রয়ে থেকে তাঁরা নির্বিঘ্নে সাধন ভজন করতে পেরেছেন। স্মরণ রাখতে বলি যে, বৌদ্ধতন্ত্রাচারের যুগপৎ ভীষণতা ও কদর্য্যতা দেখে স্বয়ং শিবেরও হৃৎকম্প হয়েছে—ইহা ভারতীয় তন্ত্রে শিবোক্তিরূপে প্রকাশ

পেযেছে। (কুলার্ণবসংহিতা দ্রঃ)। গায়ত্রী-দীক্ষা ছিল ত্রিবর্ণেব দীক্ষা। বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্ন রুচি অনুসাবে যে ইষ্ট নির্ব্বাচন ও ইষ্টেব সাধন—তাহাই পববর্ত্তী কালে এতাবৎ 'দীক্ষা' নামে পবিচিত; এই দীক্ষাই তন্ত্রেব নিজস্ব—পুবাণেও ইহা স্বীকৃত। ঐ সব আচাবেব মধ্যে সেমিটিক জাতিব ভোগবাদেব আচাব, ভাবতেব অন্যান্য জাতিব আচাব, ভাবতেব অনার্য্যজাতি-সমূহেব আচার প্রভৃতি কতটা স্থান পেয়েছে ইত্যাদি প্রদর্শন কববাব সময় এসেছে ভাবতীয় পণ্ডিত শ্রেণীব। বৈদিকযুগে বংশগত জাতি বিভাগ ছিল না, ছিল শ্রেণী বিভাগ। সংহিতাব দ্বাবা অর্থাৎ ঋগ্বেদাদিব মন্ত্র সংগ্রহ ক'বে জনসাধাবণেব কোন উপকাব হয় না, যদি তাতে প্রয়োগবিধি বা সামাজিক ব্যবহাব না থাকে, জনশক্তি যদি তাতে আদর্শ-পথে চলবাব কোন নির্দ্দেশ না পায়। মন্ত্রগুলিব প্রযোগ বা কোন্ কোন্ কর্ম্মে কোন্ কোন্ মন্ত্র প্রয়োগ কবতে হবে প্রচার কবেছিলেন যাঁরা, তাঁবাই ব্রাহ্মণ এবং যাতে ঐ সব প্রয়োগ-কথা আছে তাব নাম ব্রাহ্মণগ্রন্থ। ব্রাহ্মণ-জীবন ছিল প্রধানতঃ অনুষ্ঠান-বহুল, ক্ষত্রিয়-জীবন ছিল প্রধানতঃ চিন্তা ও ধ্যান প্রবণ। ঐ সব অনুষ্ঠানই ছিল যজ্ঞ, অর্থাৎ ত্যাগেব আদর্শ সব সময়েই সামনে ধবা হ'ত। যজ্ঞে সোমবস পান বেশ চলত—তন্ত্রেব পান-পাত্রেব মত কড়া নিয়ম তেমন ছিল না; কিন্তু যাঁবা যজ্ঞ পবিদর্শন কবতেন তাঁবাই সাধককে নিয়মিত কবতেন। সোমযজ্ঞও একটি বিশেষ যজ্ঞ। উহা শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। কালে সোমপানটিকে ব্রাহ্মণেবা তাঁদের একচেটিয়া অধিকাব ক'বে নিতে চান। বৈশ্য সোমবস পেতেন না, পেতেন অন্য বস, ক্ষত্রিয় সোমবসের বদলে পান কবতেন অশ্বত্থেব বস, যজ্ঞডুমুবেব বস প্রভৃতি। বিধি হল যে বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় অন্যবস পান কবলেই সোমপানেব ফল পাবেন! বৈশ্য বেচাবা দই পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন, ক্ষত্রিয় কিন্তু এবকম আচবণেব ঘোব প্রতিবাদ কবলেন; বেজায় গণ্ডগোল দেখা দিল। বাজসূয় যজ্ঞে ও ব্রাহ্মণদেব সৌত্রামণি যজ্ঞে ক্ষত্রিয় বাজা ও ব্রাহ্মণেবা 'পান' কবতেন। কতকগুলি যজ্ঞে সোমবস চলত, কতকগুলিতে সুরা চলত। কালক্রমে সোমের বদলে সুবা চলত অর্থাৎ সুবাই সোম। ব্রাহ্মণেবা সর্ব্বযজ্ঞেই 'পান' করতেন।

[(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩৪ অ ৮ ও পরের অধ্যায় দ্রঃ)—যজ্ঞের হবিঃশেষ যজমানকে ভক্ষণ করতে হয়। পুরোহিতকে ক্ষত্রিয়ের 'অর্দ্ধাত্মা' বলা হ'ত ; তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণদের যুক্তি হল যে, যে হেতু ব্রাহ্মণেরাই 'হুতাদ', সেই হেতু হুতভোজন ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের নিষিদ্ধ। বিশ্বন্তর নামে এক ক্ষত্রিয় শ্যাপর্ণ ব্রাহ্মণদের নিবারিত করেন। ব্রাহ্মণেরা এসে যজ্ঞবেদির মধ্যে চেপে বসলেন, বিশ্বন্তরের লোকেরা ব্রাহ্মণদের উঠিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণেরা চীৎকার ক'রে বলতে লাগলেন "একবার ভূতবীর নামে ঋত্বিকদের সাহায্যে পরিক্ষিতের পুত্র জন্মেজয় কশ্যপবর্জ্জিত যজ্ঞ করায়, কশ্যপদের মধ্যে অসিতমৃগেরা ঐ ভূতবীরদের হাত থেকে সোমযাগকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নেন ; কে এমন বীর এখানে আছেন যিনি বিশ্বন্তরের হাত হ'তে সোমযাগ কেড়ে নিতে পারেন ?" তখন মৃগবুর পুত্র রাম অগ্রসর হয়ে রীতিমত বিতণ্ডা আরম্ভ করলেন। শেষে বিশ্বন্তর ব্রাহ্মণগণকে বহু গো-দান করায় গোলযোগ মিটে যায় ও শ্যাপর্ণেরা যজ্ঞে এলেন।]

(ঐ ৩৭ অ. ৪ খ, ৮ প —পুনরাভিষেক দ্রঃ)—এই অভিষেকে সুরার ব্যবহার প্রথম। সুরা, সোম—এই দুইটিকে পৃথক করা হয়েছে। সুরা, ক্ষত্রস্বরূপ ও অন্নের রস। মন্ত্র উচ্চারণে কাংস্যপাত্রে সুরা স্থাপনীয়। (তুলঃ—"যস্তে রসঃ সম্ভৃত ওষধীসু সোমস্য শুষ্ম সুরয়াঃ ..।") (ঐ ৩২শ অ. ষষ্ঠ খ.—ক্ষত্রিয়ের মহাভিষেক দ্রঃ)—দুটি মন্ত্রে, 'সংস্কৃত' অর্থাৎ শোধন ক'রে পানের বিধি, বিধিপূর্ব্বক সুরাপানে সোমরসের ফল হয়।]

বৈদিক যজ্ঞ সপত্নীক করতে হয়। স্ত্রীর অধিকার স্বামীর সঙ্গে সমান ছিল, সুতরাং যজ্ঞে নারীদেরও 'পান' নিষিদ্ধ ছিল না। শুক্রের অভিশাপ ও শ্রীকৃষ্ণের অভিসম্পাত-ফলে মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়। শুক্র ছিলেন অসুরগুরু,' আর শ্রীকৃষ্ণ আর্য্য শ্রেষ্ঠ। পরবর্ত্তী যুগে, 'পান' নিষিদ্ধ হয়েও চিরদিনের মত অন্তর্হিত হয় নি।

যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণেরা সুরা পান করতেন। রাজসূয়, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সোমযাগেরই শাখা। ঐ সব যজ্ঞে ক্ষত্রিয়েরা সোম পান করতেন, কিন্তু তা নিষিদ্ধ হয়। যজ্ঞ বা যাগকালেই সুরা চলত, অতএব বুঝতে হবে যে 'পান' যখন তখন চলত বা মাতলামিতে দাঁড়িয়েছিল মনে করাই ভুল। রামায়ণে আছে যে দেবলোকের প্রিয়বস্তু সুরা, আর তাতে বঞ্চিত যারা তারাই অসুর, সুরলোকের প্রিয় ব'লেই নাম "সুরা'। মর্ত্তে তেমনি ব্রাহ্মণদের প্রিয় বস্তু ছিল সুরা বা সোম। মহাভারত-যুগে সুরার খুব চল্ ছিল। আরব সাগরে ছিল এক দ্বীপ। একটি আর্য্য-শাখা সেখানে উপনিবিষ্ট হন, তখনকার এক

আর্য্যবংশ ভারতে এসে যে বংশের পত্তন করেন তার নাম যদুবংশ। মাতলামির জন্য যদুবংশের দুর্ণাম ছিল। মাতলামির জন্যই যদুবংশ ধ্বংস হয়। সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে সুরা চলত না। যে সব চীনা ও গ্রীক পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন তাঁরা ভারতবাসীর অলোভ, শুচিতা ও ধর্ম্ম-প্রিয়তা দেখে বিস্মিত হয়ে গেছেন। হিউয়েন্সাঙ্ বলেন যে, ভারতবাসী মাত্রেরই শুচিতা অর্থাৎ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য আছে, যে, ভারতবাসী প্রধানতঃ ফলমূল ভোজী—মৎস্য বা মৃগমাংস নিষিদ্ধ না থাকলেও, তবু তিনি বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে মদ্যপান দেখেছেন; ক্ষত্রিয়েরা তখন ইক্ষু ও দ্রাক্ষারসজাত-পানীয় পান করতেন। তিনি বলেন যে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের পানীয়, ইক্ষু ও দ্রাক্ষারসজাত হলেও, মাদকগুণ বর্জ্জিত ছিল। কালিদাসের নাটকে নারীদেরও পান করতে দেখা যায়।

কয়েকটি বিষয়ে এখানে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। উচ্চাঙ্গ সাধনায় তন্ত্রশাস্ত্র, নরবলি ত দূরের কথা, স্বগাত্র হ'তে রুধির দান পর্য্যন্ত সমর্থন করেন নি।

[যোগিনী তন্ত্রে, "আনন্দং ব্রহ্মাণোরূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্। এবং বিপ্রো দেবতায়ৈ স্বগাত্ররুধিরং দদেৎ॥ শক্তিনাশ বিকারোঽস্তি স্বদেহ রুধিরার্পণে। তস্যাভিব্যঞ্জনং দ্রব্যং দীয়তে কুলযোগিভিঃ॥"]

'আনন্দই ব্রহ্মের রূপ, দেহে তাঁর অধিষ্ঠান, অতএব স্বগাত্র হ'তে রুধির দেওয়া উচিৎ—এই যুক্তি ঠিক্ নয়, কারণ তাতে শক্তিনাশ ও বিকার উপস্থিত হয়, সুতরাং কুলযোগীরা শোণিতের অভিব্যঞ্জক দেবেন—স্বগাত্র রুধির দেবেন না।' তারপরই তন্ত্র বলছেন যে নিবেদিত দ্রব্যই আনন্দের অভিব্যঞ্জক ও অপরার্দ্ধ স্বরূপ। যেখানে স্বগাত্ররুধির দেওয়া নিষিদ্ধ সেখানে নরবলি যে সুসিদ্ধ—ইহা অসম্ভব। ঐ নিষেধ ব্যাপারেই বোঝা যায় যে, সাধনার নামে ভারতীয় তন্ত্রে নররক্ত দেওয়ার প্রথা চালাবার চেষ্টা হয়েছিল এবং সেই অপচেষ্টার ক্ষীণ স্মৃতি আজও বর্ত্তমান। কামনা তৃপ্তির জন্য যে সব বিকট সাধনা তন্ত্রের নামে প্রচলিত হয়েছে, সেইগুলির কোনটিই প্রকাশ্য ভাবে অনুষ্ঠিত হত না। গোপনে ঐ রকম আচার যা অনুষ্ঠিত হয়, তার জন্য দায়ী সেই গুপ্ত বা ভণ্ড সাধক। ঐ সব অনুষ্ঠানের বিপত্তির কথা তন্ত্র পুনঃ পুনঃ বলেছেন; তা সত্ত্বেও যে সব প্রকৃতির লোক নরযজ্ঞকে সেমিটিক আদি

জাতির মত ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ মনে করে, যে সব দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নরহত্যা করতে কুণ্ঠিত নয়, তাদের জন্যও তন্ত্র একটা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন মাত্র, আবার স্পষ্ট বিধানও দিয়েছেন সেই সঙ্গে যে, নরবলি একমাত্র রাজাই দিতে পারেন, অন্যথা রাজদণ্ডার্হ এবং নরবলি অনুকল্পেও সিদ্ধ হয় অর্থাৎ পিঠালির মূর্ত্তি গঠন ক'রেও হয়। দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির লোককেও সাধকে পরিণত করবার চেষ্টা তন্ত্রের কম নয়। এসব অবশ্য সকাম সাধনার কথা। মহীরাবণের গল্প হ'তে শ্রীশঙ্করের কাপালিক সংঘটন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দেখা যায় যে তথাকথিত সাধক নরবলি ত দিতেই পারে নি, বরং নিজেরাই মৃত্যুমুখে পড়েছে। "অলিপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধ-স্বীকার লক্ষণম" (মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৬উ ১৯৪)। অর্থাৎ গন্ধস্বীকারেই কুলস্ত্রীর অলিপান। বৈদিক যুগের পর নারীর সম-অধিকার ছিল না যজ্ঞে বা সাধনায়। কিন্তু তন্ত্র বরাবর নারীকে সম-অধিকার দিয়েছেন। গৃহস্থ যতিকে, তন্ত্রমতে পূজা, সস্ত্রীক করতে হয়—পূর্ব্ব বৈদিক ধারা বজায় আছে, কিন্তু নারীর 'পান' নিষিদ্ধ। গন্ধস্বীকারের কথা উক্ত হয়েছে এই জন্য যে যখন মদ্য নিবেদিত হবে, তখন ঘ্রাণ যাবেই। বৈদিক যজ্ঞে সুরার অনুকল্প ছিল, তন্ত্রে অনুকল্পের ও দিব্যকল্পের ব্যবস্থা আছে। তবে, তন্ত্রমতে অভিষিক্ত না হলে 'পানের' অধিকার হয় না। অভিষিক্ত ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। ("অভিষিক্তঃ শিবঃ সাক্ষাৎ··· স এব ব্রাহ্মণো ধন্য দেবীদের পরায়ণঃ" (কামাখ্যাতন্ত্র। এই অভিষেক = পূর্ণাভিষেক)।

বৈদিক দীক্ষা এখন কোথায়? গৃহ্য-অগ্নি, শ্রৌত-অগ্নি,—গার্হপত্য, আহবনীয় দক্ষিণাগ্নি—যা না হলে কোন যজ্ঞই বিধিমত হয় না—এখন কোথায়? তন্ত্র ছাড়া আছে কি? বেদতত্ব গল্প গাথায় বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে পুরাণাদিতে, থেকেছে গল্পগুলি মাথায়, তত্ত্বকে ব্যবহারগম্য করবার চেষ্টা করেছেন তন্ত্রই। পৌরাণিক দীক্ষা মানে কি? তন্ত্র প্রকাশ্যভাবেই পুরাণে বর্ত্তমান।

৺দুর্গা পূজাদিতে বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকা আনার প্রথা আছে। 'পশু' শব্দটি যেমন তন্ত্রে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত, 'বেশ্যা' শব্দটিও সেইরকম বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত। গুপ্তসাধনতন্ত্রে ঐ 'বেশ্যার' লক্ষণ দেওয়া আছে। তন্ত্র বিধানানুযায়ী, দুর্গোৎসবাদি দেব-পূজার সময় কৌল, বেশ্যা, ব্রাহ্মণ

ও গুরুজনদের আশীর্ব্বাদ নিতে হয়। তন্ত্র বলেন, বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকা ও তজ্জলে দেবতার অভিষেকে দেবতার আবির্ভাব হয়। তন্ত্রে উচ্চাঙ্গের সাধিকা বা পূর্ণাভিষিক্তা কুলস্ত্রীই 'বেশ্যা' নামে অভিহিত ।

[এই বেশ্যা ৭ রকম। "এবম্বিধা ভবেদ্বেশ্যা, ন বেশ্যা কুলটা প্রিয়ে। কুলটা সঙ্গমাদ্দেবী রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।" (গুপ্তসাধন তন্ত্র)। কালী, তারা, ষোড়শী আদি দশ মহাবিদ্যা ও তাঁদের আবরণ দেবতাকেও 'বেশ্যা' বলা হয়। উচ্চাঙ্গের সাধিকা স্বইষ্টের আবরণ দেবতার মধ্যে গণ্যা ; তাঁকে শুদ্ধা ও দেবীদের ন্যায় সালঙ্কারা বা উত্তম সাজে সজ্জিতা হয়ে ধ্যানপরায়ণা হ'তে হয়। নিরুত্তরতন্ত্রে ঐ সপ্তপ্রকার বেশ্যার কথা আছে। (৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার সম্পাদিত মহানির্ব্বাণতন্ত্র —১৩উ.—১৮১ টিপ্পনি দ্রঃ।]

তন্ত্রশাস্ত্র কুলস্ত্রীর অর্থাৎ সাধিকার সহমরণ নিষেধ করেছেন। "তব স্বরূপা রমণী জগত্যাচ্ছন্ন বিগ্রহা। মোহাদ্ভর্ত্তুশ্চিতারোহাৎ ভবেন্নরকগামিনী।" মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এই উপদেশ (১০ম উ.-৮০) মতেই রাজা রামমোহন সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন মনে হয়। তিনি ছিলেন তন্ত্রভক্ত। তন্ত্রমতে তিনি 'শৈববিবাহ' করেন এক মুসলমানীকে। এরূপ বিবাহ বিষ্ণুক্রান্তাতে নিষিদ্ধ তন্ত্রমতে, অনুলোম বিবাহই প্রশস্ত—ব্রাহ্মী-বিবাহই শ্রেষ্ঠ। এই বিবাহ সামাজিক বিবাহ। বিশেষ বিশেষ সাধনকালে, সাধকদের উপস্থিতিতে 'শৈববিবাহ' হয়। বলা বাহুল্য, তন্ত্র শৈব-ভার্য্যার স্থান সকল বিষয়ে ব্রাহ্মীভার্য্যার নিম্নে দিয়েছেন। 'পরকীয়া গ্রহণ' ও ব্যভিচার বন্ধ করবার জন্যই শৈব-বিবাহের বিধি হয়, এস্থলে তন্ত্র স্পষ্টই বলেছেন যে, মানুষ ভোজন ও মৈথুনপ্রিয় ব'লেই তাদের হিতের জন্য সংক্ষেপে এই শৈববিবাহের বিধি বলা হল (ঐ তন্ত্র, ৯ উ. ২৮৩)। তাও, সিদ্ধ-সাধক ভিন্ন অন্য কেহ ঐরূপ বিবাহ করতে পারে না।

গ্রীক ভাষায় Periplus of the Erythrœan sea অনুমান খৃঃ ১ম শতকে লেখা হয়। তাতে বাণিজ্য ও বাণিজ্যের জন্য দেশদেশান্তরে যাতায়াতের কথা আছে। তখন পশ্চিম ভারতের Barygaza (ভৃগুকচ্ছ—বর্ত্তমান Broach) এর রাজার জন্য ভাল বিদেশী মদ্য, সঙ্গীতকারী বালক ও সুন্দরী রমণী দিতে হত! পশ্চিমভারতে এই প্রকারে সুশ্রী বালক ('লৌণ্ডা' ?) ও যবনীকুলের আমদানী আরম্ভ হয়।

[শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'শকুন্তলার নাট্যকলা'র ভূমিকায় অধ্যাপক· শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী M A P R. S মহাশয়ের উক্তি দ্রঃ।]

খৃঃ ১ম শতকে মদ্য ও বমণী প্রভৃতি আমদানী হত বিলাসীব ও বিলাসেব জন্য। তাব বহু পূর্ব্বে আলেক্‌জাণ্ডাবেব গ্রীকবাহিনী ভাবতে আসে। ভাবতে ঐ সময়ে ঐ সব বিলাসোপকবণ গ্রীক সৈন্যদেব সঙ্গেই আমদানী হয়েছিল। ভাস ও কালিদাসেব গ্রন্থে নাবীব ও যবনীব মদ্যপানেব কথা দেখা যায়। ভাবতেব সঙ্গে অন্যান্য দেশেব আদান প্রদান বহু বহু পূর্ব্ব হ'তে থাকলেও, আলেকজাণ্ডাবেব পব আদান প্রদানেব একটা সুযোগ এসেছিল। গ্রীস হ'তে, বহু জিনিষেব মধ্যে ভাবতে আমদানী হয় মদ্য ও নাবী; ভাবত—বহু বত্নেব সঙ্গে—আলেক্‌জাণ্ডাবকে দেন দশজন জ্ঞানী সন্ন্যাসী, যাঁদেব তিনি সঙ্গে নিয়ে যান!

যে বালিকার পতি-মর্য্যাদাবোধেব উদয় হয়নি, যে বালিকা পতিসেবাব উপযুক্তা হয়নি, এ বকম বালিকাব বিবাহ নিষেধ কবেছেন তন্ত্র অর্থাৎ, এ অবস্থায়, বাল্যবিবাহ নিষেধ কবেছেন। (ঐ. ৮ উ. ১০৭)। অক্ষতযোনি বাল-বিধবাব পুনর্বিবাহও তন্ত্র সমর্থন কবেছেন (ঐ ১০ উ. ৮০)। আজও বিবাহব্যাপাবে তন্ত্রেব প্রভাব যথেষ্ট। বয়স অনুসাবে কুমাবীব বিভিন্ন নাম জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে দৃষ্ট হয়, যথা একাদশ বর্ষীয়া কুমাবী—রুদ্রাণী; ত্রয়োদশ বর্ষীয়া—মহালক্ষ্মী; ষোড়শ বর্ষীয়া—অম্বিকা ইত্যাদি। সম্প্রদানকালে সম্প্রদানকর্ত্তাকে 'ববেব' হাঁটু স্পর্শ কবতে হয়, ইহাব কাবণ, কন্যাকে তখন বয়স হিসাবে তত্তৎ দেবীরূপে দেখতে হয় ও 'বব' তখন শিব-রূপী ("কন্যাদানন্তু তত্তদেবতাপ্রীতয়ে···।···তত্তদ্বর্ষীয়য়াঃ কন্যায়াস্তত্তদ্বুদ্ধ্যা শিব-রূপত্বং সম্প্রদানীয়ে বিভাব্য দদ্যাদিতি···"। (তন্ত্রসাব দ্রঃ)। সমাজে ও ধর্ম্মাচাবেব মধ্যে সবদিকেই তন্ত্রেব প্রভাব। ভাবতীয় তন্ত্র কখনও অসদাচাবকে সমর্থন কবেন নি। যে সময়ে তন্ত্রেব প্রভাব প্রবল ছিল, সেই সময় তন্ত্রেব প্রভাবেই নাবীব সর্ব্বাবস্থাতে মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়, অভিসম্পাতেব ভয়ে যা সম্ভব হয় নি, তন্ত্রেব দ্বাবাই তা সম্ভব হয়েছে।

•

পুরাণ কথা

পুৰাণেৰ আখ্যায়িকা ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ম্মেৰ একটি ফল। সেই আখ্যায়িকা হ'তে গুটিকয়েক পুষ্প আজ চয়ন ক'ৰে আপনাদেৰ সামনে ধৰব। সেগুলিৰ সৌন্দৰ্য্য-বিচাৰেৰ ভাৰ আপনাদেৰ।

পুৰাণেৰ কথায়—গঙ্গাৰ উৎপত্তি গীতে। নাৰদ ছিলেন দেবৰ্ষি। অদ্ভুত সঙ্গীতজ্ঞ তিনি, বিভুর নামগুণ গান ক'ৰে সৰ্ব্বত্র আধ্যাত্মিকতা প্ৰচাৰ কৰতেন। তাঁৰ অহমিকা এল যে তাঁৰ মত গীতজ্ঞ সংসাৰে দ্বিতীয় নেই। যেন তাঁৰ দৰ্প চূৰ্ণ কৰবাৰ জন্যই স্বয়ং শিব বিষ্ণুৰ কাছে গিয়ে গান ধৰলেন। গানেৰ বিশ্ববিমোহিনী শক্তিতে বিষ্ণুৰ শৰীৰ, চৰণ হ'তে আৰম্ভ ক'ৰে, গ'লে যেতে আৰম্ভ ক'ৰল। আপন ভাবে মত্ত হ'য়ে শিব গান গেয়ে যেতে লাগলেন, বিষ্ণু অদৃশ্য হ'লেন। সেই দ্ৰবীভূত বিষ্ণু-শৰীৰই গঙ্গা। বিষ্ণু হচ্ছেন প্ৰেম-ঘন-বিগ্ৰহ। শিব সেই ব্ৰহ্মদ্ৰৰবাৰী নিজেৰ জটায় ৰাখলেন—ব্ৰহ্মাৰ কমণ্ডলুতেও গঙ্গাজল। যাই হোক্, গঙ্গা পৰে ত্ৰিধাৰায় প্ৰবাহিত হলেন—স্বৰ্গে একধাৰা, মৰ্ত্তে অপৰ একটি, পাতালে তৃতীয় ধাৰা। কঠোৰ তপস্যা ক'ৰে, শিবজটা হ'তে মুক্ত ক'ৰে ভগীৰথ আনলেন গঙ্গা মৰ্ত্তে—তাঁৰ পূৰ্ব্বপুৰুষ—ভস্মীভূত সগৰ-বংশকে গঙ্গাৰ বাৰিস্পৰ্শে উদ্ধাৰ কৰবাৰ জন্য। হিমালয়েৰ অত্যুচ্চ শৃঙ্গে, ভগীৰথ শিবেৰ দৰ্শন লাভ কৰেন। গঙ্গা হিমালয় হ'তে নামতে সুৰু কৰলেন, শাঁক বাজিয়ে ভগীৰথ অগ্ৰসৰ হলেন, গঙ্গা তাঁৰ অনুসৰণ কৰতে লাগলেন। যে পথ দিয়ে ঐরূপে ভগীৰথ সাগৰে এসে পৌছালেন, আজ পৰ্য্যন্ত তাকেই 'গঙ্গা' বলা হয়, গঙ্গাজল পবিত্ৰ, গঙ্গাৰ কোন কাটা-খাল গঙ্গা নয়—জল হলেই গঙ্গা হয় না। গঙ্গা সাগৰে মিলেছে। সমুদ্ৰেৰ কল্লোল, সমুদ্ৰেৰ গৰ্জ্জন, বজ্ৰেৰ কড়্কড়্, মেঘেৰ গড়্গড়্—আকাশে ভীষণ ব্যোম্ ব্যোম্ ৰব, বাতাসেৰ সোঁ সোঁ, বাতাসেৰ মৃদু হিল্লোল, নদীৰ চল্চল্ ছল্ছল্, ঝৰণার ঝৰ্ঝৰ্—এই সব হ'তেই নিৰ্গত হয় ষড়জাদি সপ্ত স্বৰ—সমস্ত প্ৰকৃতিই ধ্বনিৰূপে বিশ্বগীত গাইছেন। শাঁকেৰ ধ্বনিতে ৰয়েছে সমুদ্ৰেৰ কল্লোল ও আছে সুপ্ত সমুদ্ৰেৰ গৰ্জ্জন, পাহাড়েৰ ধাক্কায় ফেনাইত জলেৰ আওয়াজে, ঐৰাবতেৰ দৰ্পচূৰ্ণকালে গঙ্গাৰ বেগে, ঐৰাবতেৰ

গড়গড়িতে গিরিশৃঙ্গের পতনে ও বিষম জলোচ্ছ্বাসে আছে বজ্রনিনাদ, শত শত বজ্রের কড় কড়, গঙ্গার অবতরণে আছে মধুর ঝর্ ঝর্, আছে পবনের মৃদু হিল্লোল, উদ্দাম সোঁ সোঁ, আছে অনন্ত পথের কোমল আহ্বান—চল্ চল্, স্নেহপ্লাবিত ছল্ ছল্ নেত্র। সুর-কেন্দ্র হ'তে গঙ্গার উৎপত্তি, গঙ্গার মহিমায় শাস্ত্র মুখর, সাধক মুগ্ধ আজও ভারতে। ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ সব গঙ্গার কূলে। দিবারাত্রির মধ্যে এমন মুহূর্ত্ত নেই যখন দেখতে পাওয়া যাবে না ভক্তকে, গঙ্গাপূজা, গঙ্গার কোন না কোন কূলে করতে। যুগযুগান্ত ধ'রে সাধকের তপস্যায় পূত গঙ্গোত্রী হ'তে সাগর পর্য্যন্ত ভূমি। আজও গঙ্গাজল রামেশ্বর শিবের মাথায়—ভারতের দক্ষিণ সীমায়—পড়ছে। বিলাতের টেম্স নদীর বর্ণনায়—সে দেশের কবির ভাব উথলে উঠে। ইহা নদীর মহিমা নয়—ইহা স্বদেশভক্তি, আর গঙ্গার বর্ণনা? ভারতের ভক্তহৃদয়, সাধকচিত্ত তাতে চিরমুগ্ধ। যাতে হৃদয়কে সত্যরাজ্য স্পর্শ করায়, অখণ্ড প্রেমের স্বাদ এনে দেয় তাহা কি কুসংস্কার?

বাঁশীর স্বরে যমুনা উজানপথে যেত; বিশ্বপ্রেমের সঙ্গীত যমুনাকূলকে পবিত্র করেছিল—যমুনা আজও পবিত্র। সামগানে সরস্বতীর উদ্ভব, সামগানে বাকদেবীর প্রবাহিনী রূপ। যুগ যুগ ঋষিদের সামগান স্তব্ধ,—অভিমানে সরস্বতীর পৃথ্বীর গুহ্যাতিগুহ্য দেশে গমন। মেরুমজ্জার বহির্দেশে —বামে—ইড়া নাড়ীই গঙ্গা, অমৃতময়ী; দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ীই যমুনা—মহাকালীয় সাপের উদ্গীরিত বিষে বিষস্রাবিনী; মধ্যে সুষুম্না—সরস্বতী রূপে অবস্থিতা। ইড়া চন্দ্রস্বরূপা রসস্রাবী, পিঙ্গলা সূর্য্যস্বরূপা, প্রাণরূপা, ভীষণা, শুষ্কা—বৃথা-সঞ্চিত-রসকে শুষ্ক করেন পিঙ্গলা। সুষুম্না চন্দ্র, সূর্য্য—সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময়ী। মূলাধারে যুক্তত্রিবেণী, আজ্ঞায় মুক্তত্রিবেণী। এই ত্রিবেণীর কৃপায় সঙ্গীতধারা প্রাণাপানাদি যোগে গ্রন্থিত্রয় ভেদ ক'রে শেষে সুরকেন্দ্রে উপনীত হয়—সাধকের দিব্যদেহ হয়, অন্তর বাহির পবিত্র হয়, যোগমার্গের কৃচ্ছ্র দরকার হয় না। মাত্র বাইরের রূপ দেখে আখ্যায়িকা হ'তে জাতীয় জীবনের ইতিহাস খুঁজতে আরম্ভ করেছেন খোলো, এই সেদিন হ'তে। ভারতের ইতিহাস—বাইরের রূপের সঙ্গে অন্তরের রূপের মিলন; অন্তরই বাইরে প্রকাশ হবার চেষ্টা করেছেন

ভারত—জ্ঞাতসারে। 'হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে' গঙ্গা মর্ত্তে প্রবাহিনী; বিষ্ণুপাদস্পর্শে মহানাগের চৈতন্য—সমুদ্রে তার গমন, যমুনা বিষবিমুক্ত, ব্রহ্মপথ দিয়েই বিষ্ণুর 'পরমপদে' যেতে হয়, সুষুম্নাই ব্রহ্মদ্বার—ব্রহ্মপথ; বজ্রা, চিত্রা, ঐ পথের সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম রূপ। ইড়া, পিঙ্গলা বাহ্যভাব, তাই ঐ ভাবের গতিকে সুষুম্না পথে চালিত করতে হয়—বেদপথে যেতে হয়। সরস্বতী অন্তঃসলিলা—অদৃশ্য। গঙ্গাযমুনার মিলিত গতি—সাম-গানের—বেদধ্বনির—সঙ্গে সুর মিলিয়ে সেই 'পরম পদের' দিকে ধাবিত হয়, বেদের সুর তখন পাওয়া যায়, বেদের ছন্দ তখন নৃত্য করতে থাকেন। আখ্যায়িকার অন্তরের রূপ ও বাইরের রূপ—দুইই সত্য।

ভরত পিতামাতার উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী-দ্বয়ের মধ্যস্থলই ব্রহ্মাবর্ত্ত। নদীদ্বয় শুষ্ক, বিলুপ্ত, দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি; সমস্ত দেশ মহামারীর হাহাকারে পূর্ণ! বালক ভরতের হৃদয় উদ্বেলিত, কাতর প্রাণে নারায়ণ আরাধনায় মগ্ন। তাঁর কাতর আহ্বানে শেষে নারায়ণের আবির্ভাব। ভরতের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ—ভরত 'বর' পেয়েছেন। বর পেয়ে মহাবলে-বলীয়ান ভরত সরস্বতীকে আনবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন হিমালয়ের উচ্চচূড়ায়। 'কোথায় মা সরস্বতী, কোথায় তুমি?' দূর হ'তে ঐ নির্জ্জন স্থানে বীণার সুমধুর ঝঙ্কার বালকের কাণ স্পর্শ ক'রল, বালকের সমস্ত দুঃখ ক্লেশ দূরে গেল! কিন্তু কোথায় মা? ধ্বনি অনুসরণ ক'রে আরো, আরো, অগ্রসর হ'তে লাগলেন। ঐ যে দেখা যায় শ্বেত-কমল-শোভিত সরোবর, ঐ যে শ্বেত পদ্মাসীনা দেবী। উনিই বুঝি মা। 'মা, মা, বিদ্যারূপিনী, সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপিনী, অজ্ঞাননাশিনী মা সরস্বতী—চিনেছি মা তোমাকে; মা এইবার বালকের পূজা গ্রহণ কর'। ভরতের সঙ্গে মা চললেন। সেই চিৎ-সরোবরের একটি ধারা ধরার দিকে প্রবাহিত হল; দেবী শ্বেত পদ্মাসনে ব'সে বীণার ঝঙ্কারে সেই প্রবাহের সঙ্গে নামতে আরম্ভ করলেন। ঐ প্রবাহের উপর আর একটি কমলে ভরতও দেবীর সঙ্গে সঙ্গে চললেন! সরস্বতী মর্ত্তে এলেন; ব্রহ্মাবর্ত্ত আবার শস্যশ্যামলা হল, সরস্বতীর বারি-স্পর্শে ভরতের পিতামাতার ও সকলের উর্দ্ধগতি হল। মাঘের শুক্লা পঞ্চমীতে সরস্বতী মর্ত্তে আসেন, আজও ঐ মাসের ঐ পুণ্য তিথিতে সরস্বতী পূজা হয়। এই ভরতই, কথিত আছে, মর্ত্তে নাট্যশাস্ত্র আনেন।

পুবাণে সতী-শিব। সতী-শিব, শিব-সতী—চলমান 'অহং'-'ইদং'; স্বরকেন্দ্রকে দু'ভাবে দেখা, অভেদ আত্মা—অধ্যাত্ম শিল্পেব অপরূপ রূপ! অভেদ আত্মাকে খণ্ড ভাবে 'বোধেব' অভিমান—ভস্মীভূত সংস্কাব-দেহ সতীব! স্ববকেন্দ্রেব স্থূল-'অহং'এব স্কন্ধে লগ্ন স্থূল-'ইদং'—সতীদেহ স্কন্ধে নিয়ে শিবেব ভ্রমণ! বিষ্ণুচক্রে স্থূল দেহ ছিন্ন—ভাবতেব ৫১ স্থানে ৫১ দেবী-পীঠ—ভাবতেব মহাতীর্থ—মাতৃত্ব, সতীত্ব ৫১ অক্ষবে ঝঙ্কৃত! অক্ষব অবর্ণ। ভগবান অর্জ্জুনকে 'ওঁ'কাবরূপী অক্ষবেব কথা বলেছেন "অঘোষব্যঞ্জনস্ববক্ষ" অর্থাৎ সেই অক্ষব উচ্চাবণ-জাত নয়, স্বব ব্যঞ্জন বহিত ক্ষয়হীন। সতী-শিব এই ওঁকাব বিগ্রহ। সতীব দেহই শক্তিপীঠ। স্থূল স্বব ব্যঞ্জনে যে অক্ষব ৫১টি রূপে ব্যক্ত—প্রতি অক্ষবই যাব এক একটি স্বব—সেই প্রত্যেকটি অক্ষরই ভাবতেব চাবিদিকে, সুদূব বেলুচিস্থানেও ছড়িয়ে রয়েছে, প্রত্যেক অক্ষবই ভৈবব ভৈববী রূপে বিবাজ কবছেন! 'অ'কাবেব ভৈবব—শ্রীকণ্ঠ, ভৈববী—পূর্ণোদবী; 'আ'কাবেব ভৈবব—অনন্ত, ভৈববী—বিজয়া, এইরূপ সমস্ত। 'ক্ষ'কাব মেরু, ভৈবব—সংবর্ত্তক, ভৈববী—মায়া। সতীদেহ শিবস্কন্ধচ্যুত—কেবলোহহং-শিব সমাধিস্থ, নিষ্পন্দ—স্বস্বরূপাভিমুখী। শক্তি অন্তর্লীন; দেবলোকেব উৎকণ্ঠা। ওদিকে আবাব সতীব পার্ব্বতীরূপে আগমন, গম্ভীব প্রশান্ত শিবরূপ দর্শনে বিমোহিত, দেবী শিবপূজাবতা—অক্লান্ত ভাবে নিত্য আবাধনাপবা। বাহ্য চেতনা আনাবাব জন্য, দেবগণেব উৎকণ্ঠায়, মদন প্রেবিত। মদনেব অতি তীক্ষ্ণ পঞ্চ শবে—পুষ্প শবে—দেহাত্মবোধ জাগবিত হয়, ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ হয়, বসন্তেব আবির্ভাব হয়, কোকিল পঞ্চমে গান ধবে। শিব মহাধ্যানমগ্ন, মদনও উপস্থিত। পূজাবতা দেবীকে দেখে উৎফুল্ল মদন পঞ্চশব যোজনা কবতে উদ্যত; কিন্তু কে ও? স্বেচ্ছায় শিবের পাহাবায় নিযুক্ত নন্দী। নন্দী ভক্ত, নন্দী মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত। মাতৃমন্ত্র-সাধকেব উপব মদনেব অধিকাব নেই—ভক্তেব দাস হয়ে থাকেন মদন। কিন্তু মদনেব এই অবসব—শর নিক্ষিপ্ত হল। শিবেব দেহ কেঁপে উঠল, ধ্যান ভাঙ্গল, ধক্ ধক্ ত্রিনেত্রে আগুণ জলে উঠল—মদন ভস্মীভূত। শিব এইবাবে দেবীব দিকে দৃষ্টি ফেবালেন, চ'খেব চাহনি স্নিগ্ধ, শান্ত—সে দুবন্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত। দেবীও সেই চাহনি দেখলেন, ভক্তিতে পূর্ণ হলেন; কিন্তু অদ্ভুত শিবের আচবণ। শিব একবার মুচকে হাসলেন, ঐ স্থান ছেড়ে

উঠলেন, ধীর ভাবে অন্যত্র গেলেন! দেবীর মনে ধিক্কার এল। হীন কামনা কি তাঁর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে কাজ করছিল? দেবী ত তা জানেন না; তবে, শিব পূজা প্রত্যাখান করলেন কেন? এবার দেবী আরম্ভ করলেন নিরালায় গিয়ে অতি কঠোর তপস্যা। তপস্যার ফলে এবার শিবের দর্শন লাভ হল, আবার মিলন হল। শিবের সহচরেরা, দেবীর সহচরীরা এ মিলনে তৃপ্ত হলেন, দেব লোকের উৎকণ্ঠা দূর হল।

ইন্দ্রিয়াত্মক-বোধের কামনা নিয়ে অনুরাগ দেখাতে যাওয়াটা অনুরাগই নয়—ইহা ভারত নানা দিক দিয়ে বুঝিয়েছেন। অধুনা ভারতের সাহিত্যে আবর্জ্জনা ঢুকেছে—ভণ্ডামির চূড়ান্তরূপ দেখা দিয়েছে। উপন্যাসে, গল্পে, ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়-শক্তির সকল দ্বারকে উন্মুক্ত রেখে অন্তরীন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বারে শিকল টেনে স্বেচ্ছাচারপরায়ণতা, আর যাই হোক, সেটা চিত্তকে স্বাধীনতা দেওয়া নয়—তাহা স্বাধীনতার নামে স্বার্থপরতা। ত্যাগ ও সংযম বিনা স্বাধীন বৃত্তি জাগে না। ভারত আদর্শ-চিত্ত দেখতে চান, জীবন চান।

আর একটি আখ্যায়িকা। মিত্রাবরুণ নামে একজন ঋষির এক ছেলে হয়। কলসীতে জন্ম হওয়ায় নাম হল তার 'কুম্ভযোনি'—ডাক্ নাম 'মান'। মান ছোট্ট মানুষ, খর্ব্বকায়, ক্ষুদে। পিতার শিক্ষায় মান তপস্যা আরম্ভ করলেন। সবাই ভাবে, ঐ ক্ষুদে মানুষটির আর কত ক্ষমতা? কিন্তু পিতার শিক্ষায় মান জানতেন যে, মানুষের মধ্যে সব ক্ষমতা বিকাশ করবার শক্তি নিশ্চয় আছে, নচেৎ সে ক্রমাগত আরো চাই আরো চাই করে কেন? একনিষ্ঠ তপস্যার ফলে অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য্য, অদ্ভুত বিভূতি-শক্তি লাভ হল তাঁর, তখন নাম হল ঋষি অগস্ত্য। অগস্ত্য ক্ষুদে, কিন্তু ভক্তেরা তাঁর বিপুলকায় প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেছেন বহু বহু পরে। বিন্ধ্য পর্ব্বতের রাজা বিন্ধ্যরাজ অগস্ত্যের একজন বড় শিষ্য। শিষ্যের আশ্চর্য্য রকম বিভূতি লাভ হয়েছে। যোগসিদ্ধি হলেই হয় না—বিভূতিতে অনেকে উপসর্গ দেখা দেয়, তখন যোগীর মনে অহমিকা আসে—'মনোদোষ', 'আবর্ত্ত' নামে উপসর্গের উদয় হয়—জ্ঞানাবর্ত্ত আকুল হয়ে চিত্তের সমতা বিধ্বস্ত হয়। রূপ রসাদিতে অনাসক্তি না থাকলে যোগী যোগ ভ্রষ্ট হন। সিদ্ধ যোগী অনাসক্ত থাকেন—তত্ত্ববিদ্ হয়ে জগতে বিচরণ করেন। অগস্ত্য ছিলেন তত্ত্ববিদ্। সূর্য্য আকাশ পথে যান; বিন্ধ্যরাজ সূর্য্যের গতিরোধ করতে দৃঢ় সংকল্প। বিভূতি বলে তাঁর মাথা এত

উঁচু হল যে সত্যই সূর্য্য-পথ রুদ্ধ হল; তাঁর রাজ্যের অপরার্দ্ধ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন—ব্রহ্মাণ্ড বিক্ষুব্ধ। সদ্‌গুরুর করুণা অসীম, লৌকিক বা অলৌকিক উপায়ে তিনি শিষ্যকে রক্ষা করেন। বিন্ধ্যরাজের কাছে অগস্ত্য উপস্থিত হলেন। গুরুকে দেখে বিন্ধ্যরাজ মাথা অবনত করলেন, গুরুর কাছে দীনতা প্রকাশ করলেন। অত্যন্ত শক্তিমান হয়েও যিনি দীন-ভাব আশ্রয় করেন, তিনি অহমিকা হ'তে মুক্ত হন। অগস্ত্যের ইচ্ছা দাক্ষিণাত্যে যাবার। সেই ইচ্ছা জানিয়ে, শিষ্যকে ঐ রকম মাথা নীচু ক'রেই অবস্থান করতে আদেশ করলেন, যাবৎ তিনি ফিরে আসেন। তিনি আর ফিরলেন না। সূর্য্যও আকাশ পথে আবার চলতে লাগলেন। ঘটনাটি হয় ভাদ্র মাসের ১লা। সেই অবধি মাসের প্রথম দিনকে অগস্ত্যযাত্রা বলা হয়। গুরুকৃপার স্মৃতি আজও বজায় রেখে আসছেন হিন্দু।

নাভিচৈতন্য হলে সাধক মণিপুরের উর্দ্ধাংশে 'ভানুভবন' ও 'ভানুমণ্ডল' দেখতে পান—হৃদয়ের ইষ্টজ্যোতি দূর হ'তে দেখতে পান; আর দেখেন যে সোমমণ্ডল-ক্ষরিত অমৃত, ঐ ভানুমণ্ডলে গ্রস্ত হয়েছে—'স্বরের' নাদঘোষ নাভি হ'তেই ধ্বনিত হ'তে আরম্ভ হয়েছে, জ্যোতির আলয় জ্যোতির্ম্মণ্ডলে 'স্বরের' রস-ভাব সঞ্চিত হয়েছে। সাধক দেখলেন "ভানোর্ম্মণ্ডলমণ্ডিতান্তরলসৎ কিঞ্জল্ক শোভাধরং" হৃৎপদ্মকে, সূর্য্যমণ্ডল মণ্ডিত দ্বাদশদলকে। বিশুদ্ধ চক্রেই আকাশ। সূর্য্য উদিত হয়ে অবিরাম গতিতে আকাশ পথে চ'লে শেষে আকাশেই অদৃশ্য হন। রুদ্রগ্রন্থি যতক্ষণ না ভিদ্য হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই সাধকের নিম্নগামী হবার আশঙ্কা থাকে, মণিপুরের সত্ত্ব রজ তমের স্থূল বিভূতি ও হৃদয়ের বাহ্য ঐশ্বর্য্য মনকে লুব্ধ করে। এই উপসর্গ হ'তে মুক্তি পেতে হলে "ব্রহ্মসঙ্গি মনঃ কুর্ব্বাৎ"—মনকে ব্রহ্মসঙ্গী করতে হয়। বিন্ধ্যরাজের অহমিকাই বিষ উদ্গীরণ করেছে। উর্দ্ধেস্থিত 'কালচক্র' স্তম্ভিত হল। যথাসময়ে গুরু এলেন, ব্রহ্মসঙ্গী লাভ হল, কালচক্রের—'শুদ্ধতা' 'অরতি' 'উর্ম্মি' আদিতে আকাশ প্লাবিত হল; স্থূল ভাব গিয়ে গুণত্রয় 'আত্মায়' সূক্ষ্মভাবে স্থিত হল, রুদ্রগ্রন্থি ভিদ্য হল, বিন্ধ্যরাজ সোমচক্রে স্থিত হলেন, সেখানে আছে 'মৃদুতা', 'বৈরাগ্য' 'বিনয়' আদি মহৎ গুণ সকল।

যোগশাস্ত্র বলেন, যোগীর কাম্য কর্ম্মে অনাসক্তি এলে সব উপসর্গ শান্ত হয়, কিন্তু "উপসর্গৈর্জিতেরেভিরুপসর্গাস্ততঃ পুনঃ। যোগিনঃ সম্প্রবর্ত্তন্তে

সাত্ত্বরাজস তামসাঃ" ॥ উপসর্গের উপশমন হলেও সত্ত্ব রজ ও তমের পুনর্ব্বার আবির্ভাব হয়। গুরুকৃপায় বিদ্যারাজের আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই—তিনি এখন স্থির, অচল, শান্ত!

পুরাণে জীবন দেখান হয়েছে; ছন্দময় জীবন ও সত্যজীবন—অধ্যাত্ম-শিল্প বর্ণ ও রূপে প্রকাশ পেয়েছে। আদর্শকে প্রাণবন্ত, জীবন্ত করতে হলে কোন্ পথ ধ'রে যেতে হয়, ভারত সকল বিদ্যার মধ্য দিয়ে—কাব্যের মধ্য দিয়েও—দেখিয়েছেন, তাই সবই রূপক ভাবে বর্ণিত বলতে পারা যায়। সে রূপক কিন্তু আমাদেরই মত বাস্তব। এই জন্যই পুরাণ-কথা জ্যোতিষ শাস্ত্র মতেও ব্যাখ্যা করা যায়।

দাক্ষিণাত্যে আর্য্যভাব প্রচারক ঋষি অগস্ত্যের সঙ্গে সীতারাম ও লক্ষণের সাক্ষাৎ হ'য়েছিল। যেমন এক সময়ে বাঙ্গলায় 'কানু' ছাড়া গীত হ'ত না, সেই রকম ভারতের বড় বড় কবিকুল সীতারাম চরিত্রের বর্ণনা ক'রে তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি ও লেখনীকে ধন্য করেছেন। ভারত আজও সীতারাম ও লক্ষণের স্মৃতির পূজা করে। চৈত্রের নবমীতে (বাসন্তী পূজার নবমীতে) রামচন্দ্রের জন্ম—আজও রামনবমীব্রত পালিত হয়, সীতাদেবীর জন্ম বৈশাখের মধ্যাহ্নকালে শুক্লানবমীতে—আজও সীতানবমী ব্রত পালিত হচ্ছে। ভারতে নারীকুলই প্রধানতঃ এই সব স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছেন, লক্ষণের মত দেবর তাঁরা আকাঙ্ক্ষা করেন আজও। ইন্দ্রিয়াত্মক বুদ্ধি নিযে আমরা চাই বাহ্য লক্ষণ—চাই বুঝতে বাহ্য ভাব দিয়ে সব, কিন্তু বাহ্য লক্ষণের দ্বারা তত্ত্ববিদের লক্ষণ জানা যায় না। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির, বিষয়ের ভোগেও বিষয়ের সংস্কার হয় না।

[তত্ত্ববিদ্ "বিচরতি গৃহকার্য্যে ত্যক্ত দেহাভিমানো বিহরন্তি জনসঙ্গে লোক যাত্রানুরূপম। পবনসমবিহারী রাগ সঙ্গ প্রমুক্তো, বিলসতি নিজরূপে তত্ত্ববিদ্ব্যক্ত লিঙ্গঃ" (অনুগীতা)।]

সাধারণ লোক, সংস্কারের দাস হয়ে অবস্থান করে। আমরা ভুলে যাই যে তত্ত্ববিদের প্রশস্ত বিশাল হৃদয়ে অনুভূতি অত্যন্ত তীব্র হয়, তাই তাঁদের জীব-দুঃখে কষ্ট বা যাতনাও বেশী হয়, দুঃখের বেগ অসহনীয় হয়। জল কেটে জাহাজ চলে যায়, একটা বড় দাগ হয়ে যায়, কিন্তু সেই দাগ কিছুক্ষণ পরে জলে মিলিয়ে যায়; পাথরে

লোহার ঘা দিলে, দাগ দৃঢ় অঙ্কিত হয়ে থেকে যায়। তত্ত্ববিদের জলের দাগ—ভোগে তাঁর মোহ নেই, এই পর্য্যন্ত। ভারতের সাধনা ভারতের ভাবে বুঝতে হয়। অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে ভারত গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেন নি। দ্বিতীয় কাশী প্রতিষ্ঠা করবার বাসনায় কোন এক গোঁড়া 'ব্যাস' তপস্যা আরম্ভ করলেন। ব্যাস-কাশীতে মৃত্যু হলে 'গাধা' হয়। ভেদবুদ্ধি নিয়ে অন্য একজন গোঁড়া কাণে ঘণ্টা ঝুলিয়ে 'নামযজ্ঞ' আরম্ভ করলেন। আজও ঘণ্টাকর্ণ পূজা লাঠি পেটা ক'রে হয়। গোঁড়ামির দুই নিদর্শনের স্মৃতি আজও ভারত রক্ষা করছেন। যেখানেই গোঁড়ামি থাকুক, তাকে প্রশ্রয় দিতে নেই।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—১।

(ব্যক্তি ও জাতি)

'ধৃ' ধাতু হ'তে ধর্ম্ম; 'ধৃ' ধাতু ধারণার্থ। কি ধারণ করে? 'বিশ্বং ধরতি'; কে বিশ্বকে ধারণ করেন? সত্যই বিশ্বকে ধারণ ক'রে আছেন; সত্যের দ্বারাই জগৎ ধৃত ('সত্যেনোত্তভিতা')। যা হৃদয় ধারণ করে তাহাই ধর্ম্ম। সত্যের প্রয়োগ ব্যবহারিকে জানা চাই।

এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা মূর্ত্তি পূজা দেখে, মূর্ত্তিকে বসন ভূষনে সজ্জিত করা দেখে, অঙ্গে পুষ্পমাল্য দেখে মুখ বাঁকান, বলেন, উহা একটি কল্পনা; অথচ দেখা যায় যে তাঁরা মৃত পরিবারের ছবিটি বেশ ভাল ক'রে সাজান, অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে ঐ ছবিটি রাখেন। তাঁদের মতে উক্ত ছবিটি বাস্তবের স্মৃতি। কল্পনা ও বাস্তবের যুক্তি এক্ষেত্রে খাটে না, উভয়ই আরোপ মাত্র। উভয় ক্ষেত্রেই নিজের ভালবাসার অর্ঘ্য দেওয়া হয়। পূজা যে ভালবাসার অর্ঘ্য নয়, ইহা বলবার সাহস আছে কার? যাই হোক, ঐ দুই অর্ঘ্যে প্রভেদ বর্ত্তমান। সাধক বলবেন যে একটিতে ব্রহ্মভাবের আরোপ—ঈশ্বরতত্ত্বের আরোপ—অতি বিশালতার বা সমস্ত ভাবসমষ্টির আরোপ—, অপরটিতে খণ্ড ভাবের আরোপ, ব্যক্তিগত দেহাভিমানরূপ সংস্কারের আরোপ। অনন্ত সংস্কারের তাড়নায় মন যখন কাতর হয়, সাধক তখন ঐ সমষ্টি জ্বালাকে মহাশক্তিরই—নিজ ইষ্টেরই—রূপ মনে করেন; তাঁর জ্বালা

নিবৃত্ত হয়, প্রশান্ত চিৎসাগর দেখা যায়; খণ্ডভাবে জ্বালাকেই পুষ্ট করা হয়। যাকে সবাই 'বন্ধন' বলে, তাকে যদি নিজ ইষ্টেরই আর এক রূপ, আর একরূপে তাঁর খেলা মনে করা যায় ও সেই ধারণা দৃঢ় হয়—তাতে বন্ধন থাকেনা, তাতে সমস্ত বোধই অনন্ত প্রসারিত হয়—আসে মোক্ষ।

আমরা নানা কথার আলোচনা করছি, বোঝাবার চেষ্টা করছি। এই বোঝাবুঝির ব্যাপারটি হচ্ছে মাথা দিয়ে, অর্থাৎ বুদ্ধি দিয়ে বুঝছি। মাথা দিয়ে বোঝা খুব ভাল, খুব দরকার, কিন্তু তাতে হৃদয়ের সংযোগ, প্রাণের আবেগ না থাকলে উপলব্ধি আসে না—সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হলে কোন জিনিষ ঠিক বোঝা যায় না।

বোঝাবুঝিও অনেক রকমের। চৈতন্যচরিতামৃত প'ড়ে মহাপ্রভুর ভাব বুঝতে পারি, আলোচনা করতে পারি—তাঁর ভাব অনুযায়ী জীবন যাপন করবার চেষ্টা না ক'রেও। এই এক রকমের বোঝা। ভক্তসাধক সেই অনুযায়ী নিজের জীবন গঠন করছেন, ভাবের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এসেছেন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। এ বোঝাটা একটু অন্য রকমের, তাতে প্রাণের আবেগ আছে, উপলব্ধির আগ্রহ আছে। মহাপ্রভুর পার্ষদরা মহাপ্রভুকে দেখেছেন, তাঁর জীবনের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন, তাঁর হাব ভাব, বলবার ভঙ্গী, তাঁর চালচলন, তাঁর ভাবের তরঙ্গ দেখেছেন ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে, অন্তঃকরণ দিয়ে, নিজ নিজ ভাবে বুঝেছেন। এরকম বোঝা আবার অন্য রকম। ভক্তসাধক হাব ভাব, বলবার ভঙ্গী ইত্যাদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পান না; তিনি জীবন দেখে, অনুমান ক'রে তত্ত্ববিদ্‌কে মনপ্রাণ দিয়ে ধারণা করবার প্রয়াস পান। যাঁদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধের 'বোধ' হয়, তাঁদের ভুল হয় না, সরলতা ও হৃদয় প্রেমপূর্ণ থাকায় গোঁড়ামিও আসে না কোন ক্ষেত্রে—স্থূলে বা সূক্ষ্মে। 'তদ্‌ভাবে' ভাবিত হলে—ভাবময় জীবন গঠিত হলে, সূক্ষ্ম ভাবেরও ধারণা আসে। সরলতা, দৃঢ়তা, একনিষ্ঠ ভাব ও বিবেক না থাকলে একমাত্র ভাবাবেগে অর্থাৎ ভাবপ্রবণতায় কিছু হয় না। 'সেবা ও পরিপ্রশ্নের' কথা গীতা বলেছেন। দেখার ও অনেক রকম আছে। যাঁরা মহাপুরুষ দর্শন করেছেন, তাঁকে ভালবেসেছেন, তাঁর সেবা প্রভৃতি করেছেন, তাঁদের মধ্যে যদি কারোর কারোর কোন উপলব্ধি নাও হয়, তাঁরা অনেক জিনিষ বুঝতে পারেন, সঙ্গ গুণের স্মৃতির ছাপ তাঁদের থাকে ও হৃদয়ে বিশ্বাস

জাগরূক থাকে। উপলব্ধিবান পুরুষের কার্য্যক্ষেত্রে দৃঢ়তা, স্থৈর্য্য ও কর্ম্ম-কৌশল দেখে জগৎ অবাক্ হয়।

মহাপ্রভুর পার্ষদ হরিদাস, যবন হ'য়েও হরিনাম করেন, এই অপরাধে কাজি তাঁকে বেত্রাঘাতের হুকুম দিলেন, বেত্রাঘাতে হরিদাস সংজ্ঞা হারালেন। তিনি হাসি মুখে সব সহ্য করলেন, তাঁর চিত্তের প্রসন্নতা মলিন হ'ল না, কারোকে শত্রু ব'লে মনে করলেন না, প্রতিকারের চেষ্টাও করলেন না। চিন্তা-বিলাপ-বর্জ্জিত হয়ে এরকম সর্ব্ব দুঃখ সহ্য করার নাম তিতিক্ষা—"Non resistance of evil is the highest virtue", এই প্রকার তিতিক্ষা শত্রুর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রধান অন্তরায়। হরিদাস ঠাকুরের জীবনে কখন কাপুরুষতা দেখা দেয়নি—তাঁর প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের আশীষ অবিচারে সকলেই পেয়েছে। এরকম তিতিক্ষা ব্যক্তিগত ভাবে সিদ্ধ-সাধকেই সম্ভব হয়। বাহ্য লক্ষণ দেখে মহামানবকে বোঝা যায় না। একবার যখন কাজির আদেশে কীর্ত্তন করা নিষিদ্ধ হয়, সেই সময়ে স্বয়ং মহাপ্রভু প্রকাণ্ড দল নিয়ে নগর পরিভ্রমণ ক'রে কাজির প্রাঙ্গনে উপস্থিত হন ও ঘোর কীর্ত্তনের তরঙ্গ তোলেন—ফলে, ঐ আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রত্যাহৃত হয়। এখানে প্রতিকারের জন্য সংগ্রাম-পরায়ণ হ'তে হয়েছে। ব্যক্তিগত ভাবে যেটি অভ্যুদয়ের কারণ, জন সাধারণের জন্য অন্য রকম আচরণই ধর্ম্ম। জন সাধারণের পক্ষে non resistance of evil—মন্দকে বাধা না দেওয়াই অধর্ম্ম। মহাবীর্য্য প্রকাশ ক'রে, বাধা বিঘ্ন চূর্ণ ক'রে—হৃদয়দৌর্ব্বল্য দূর ক'রে—অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হওয়াই ধর্ম্ম। আদর্শের দিকে লক্ষ্য ঠিক রেখে এবং কারোর অভ্যুদয়ের পথ রুদ্ধ না ক'রে অভ্যুদয়ের হেতুরূপ করণীয় কর্ম্মই 'কর্ত্তব্য কর্ম্ম'—ঘোলো duty নয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ হ'তে আমরা ইহাই পাই। নির্ভীকত্ব ব্যতীত অভ্যুদয় হয় না। বীরত্ব চাই, বাধা সরান চাই। যেটা ধৃতি, যেটা ধ'রে রাখে তার নামই ধর্ম্ম। প্রশস্ত হৃদয়ই সব ধ'রে রাখতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের ভাবপ্রবণতাকে—ভাবোচ্ছ্বাসকে—প্রশ্রয় দেন নি। কোমলতার মুখোসকে তীব্র আঘাতে ভেঙ্গে দিয়ে যে বীর্য্য প্রকাশের উপদেশ দিয়েছেন, তাহা পশুবল নয়, তাহা মোহধ্বংসকারী মহৎ হৃদয়ের উপদেশ—মানবজাতির চির কল্যাণের নিদান। যুদ্ধক্ষেত্রে ওরকম উপদেশ দেওয়া, ওরকম উপদেশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকা ভারতেই সম্ভব, ভ্রূকুটি-

কুটিল-নয়না সংগ্রামবতা মহিষমর্দ্দিনীব হাস্যানন ভাবতেই সম্ভব, সমব-নিষ্ঠুবতা সত্বেও, হৃদয়ে অপাব করুণা ভাবতেই সম্ভব। সদা প্রফুল্ল নির্ব্বিকাব চিত্তেব ছবি—সন্ন্যাসীব জাতি আর্য্য ভাবতই বুঝতে পাবেন।

অনুগীতাতে একটি গল্প আছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন 'একটা ইতিহাস শোন'। কোন ব্রাহ্মণ সাংসাবিক সমস্ত ব্যাপাব হ'তে দূবে থেকে নির্জ্জনে তপস্যা কবেন। একদিন তাঁব স্ত্রী এসে তাঁকে বললেন—"তুমি ধর্ম্মকর্ম্ম পবিত্যাগ ক'বে বৃথা সময় নষ্ট কবছ কেন?" ব্রাহ্মণ—"আমি কর্ম্মেব নানা গতি দেখে বিবক্ত হয়ে জ্ঞাননেত্রে হৃৎপদ্ম দর্শন কবছি, আমি কর্ম্ম ত্যাগ কবিনি…" ইত্যাদি অনেক কথাই ব্রাহ্মণীকে বলেন; এই বকম বহু তত্ত্বোপদেশেব ফলে, শেষে ব্রাহ্মণী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কবেন। ব্রাহ্মণীব ভ্রম দূব কববাব জন্য ব্রাহ্মণ তাঁকে বলেন "তুমি তোমাব বর্ত্তমান অবস্থায বুদ্ধি দিয়ে আমাকে সাধাবণ দেহাভিমান সর্ব্বস্ব মানুষ মনে কোবোনা; তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ, জীবন্মুক্ত, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ বা ব্রতচাবী যা ইচ্ছা বলতে পাব। জেনে বেখো যে ব্রহ্মসাধন-তৎপব ব্রাহ্মদেব মধ্যে গৃহস্থ বা বানপ্রস্থাবলম্বী সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু—যিনি যে লিঙ্গ ধাবণ ক'বে অবস্থান করুন না কেন—সকলেব গন্তব্য স্থান একই, সকলেই বিবেকেব উপাসক; তাঁদেব মধ্যে যাব যেমন আচাব থাকুক না কেন, বিবেক তাঁদেব জ্ঞানমার্গেই নিয়ে যান"। এই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-সংবাদ শুনে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা কবেন "তাঁবা এখন কোথায়?" শ্রীকৃষ্ণ—'হে অর্জ্জুন, আমাব চিত্তই ব্রাহ্মণ, বুদ্ধিই (বিবেকই) ব্রাহ্মণী ও আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ'। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীকে বুঝিয়ে দেন যে, কর্ম্মই দেহোৎপত্তি ও দেহ ক্ষয়েব কাবণ, যে, এই পবিবর্ত্তনশীলতা নিবাবণ কবতে হলে অর্থাৎ অমবত্ব লাভ কবতে হলে ইহলোক বা পবলোকেব জন্য ভীত হলে চলবেনা।

অনুগীতাব আব একটি 'সম্বাদ'—অধ্যর্যু-যতি-সম্বাদ বা 'ইতিহাস' ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বলছেন। কোন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, যজ্ঞে পশুবধ করবাব আয়োজন কবছেন, একজন সন্ন্যাসী এসে ঐ যাজ্ঞিককে পশু হনন কবতে নিষেধ কবছেন। সন্ন্যাসী—"পশু নিবপবাধ, যদি মন্ত্রবলেই পশুব প্রাণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত কবা হয়ে থাকে, তা হলে ঐ নিশ্চেষ্ট শবীবও কাষ্ঠখণ্ডে প্রভেদ থাকে না, অতএব এ বকম হিংসাব চেয়ে কাঠ বলিয়া দেওয়া উচিৎ; হিংসা

করবোনা যখন সঙ্কল্প তখন প্রত্যক্ষ হিংসাটা দোষের।" যাজ্ঞিক—"যখন ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়ে সবই করছি ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করছি তখন হিংসা নেই বলা যায় না'। শেষে সন্ন্যাসী বলছেন "সোপাধিক আত্মাই 'ক্ষর', উপাধিযুক্তে তাহাই 'অক্ষর'। যার আত্মা মায়ামুক্ত হ'য়ে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়ে কায করে তাহারই হয় হিংসা ও তজ্জনিত ভয়, পরন্তু যার আত্মা নির্লিপ্ত থেকে নির্দ্বন্দ্ব ও সমদর্শী হয় তার হিংসার আশঙ্কা থাকে না; অতএব প্রাণাদি হ'তে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থানই অহিংসা"। শেষে যাজ্ঞিক এই উত্তর দিয়ে নিরস্ত করেন যে তিনি উপলব্ধি করেছেন—তাঁর নিশ্চিত বোধ এসেছে—যে তিনি নির্লিপ্তাত্ম পুরুষ, তাঁর অপরাধী হবার আশঙ্কা নাই।

বলিদানের মূল তত্ত্ব এইখানে পাওয়া যায়, বলিদান কি ভাবে অর্থাৎ কোন প্রেরণায় করা হত তা বুঝতে পারা যায়। তা ছাড়া আর একটি দিক্ আছে বোঝবার। যার যা আহার তার তাকে আহরণ করাটা হিংসা নয়, কারণ তাতে মনে কোন দুষ্ট বৃত্তি জাগে না। পাখীতে পোকা মাকড় খায়, মাংসাশী জীবেরা মাংস খায়, স্বভাবের প্রেরণায় তারা যা করে তা হিংসা নয়। আমরা মাছ খাই, ধোলোরা মাংস খায়। এই রকম আচরণে অন্তরের বৃত্তি দূষিত পথ অবলম্বন করে না—এ সব হিংসা নয়। প্রত্যক্ষ হিংসার কথা অনেকে বলেন। ✓ ডাঃ জগদীশচন্দ্র 'বিজ্ঞান সহায়ে' প্রমাণ করেছেন যে গাছ পালারও প্রাণ আছে, তাদের উল্লাস আছে, অবসাদ আছে, অনুভূতি আছে—যন্ত্রের সাহায্যে এসব প্রত্যক্ষ করা যায়। ইহা আজ কাল সবাই জানে, আর ইহাও সবাই জানে যে, শ্বাস-প্রশ্বাসে, প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে, কতশত জীবাণু ধ্বংস হচ্ছে। ইহা নিত্য ব্যাপার, কিন্তু ইহার জন্য কারোর মনে ছাপ পড়ে না, মন এসবে লিপ্ত হয় না। মাছ মাংস খাওয়া সম্বন্ধেও তাই। জেলে আমাদের জন্য মাছ ধরে, কসাই মাংস কাটে, আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ এতে গাছপালা নষ্ট করার চেয়ে কম। বিলাসীর সন্দেশ-রসগোল্লাদির ভোজনে দরিদ্রের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হয়, মাছ মাংস খাওয়ায় বরং দরিদ্র-পোষণ হয়। আহার করতেই হবে, সকলেই আহার করে। মানুষের বিশেষত্ব এই যে, মানুষ উচ্চ ভাবের অধিকারী, অতএব যা করা যায় সেগুলি গতানুগতিক ভাবে না ক'রে সেই সমস্তকে 'ঈশাবাস্যং' ক'রে নিলে মনের অভ্যুদয়ই হয়—মনে কলুষ ছাপ পড়া ত দূরের কথা। শরীর থাকলেই হিংসা

অবশ্যম্ভাবী ; তর্কজাল জুড়ে মনকে চোখ-ঠারা বৃথা। অহিংসাসাধন করতে হলে এমন উপায় অবলম্বন করতে হয়, এমন আচরণ করতে হয় যাতে শরীর ধারণ আর না হয়, অনাবশ্যক হিংসা বা ভোগেচ্ছা হ'তে কায়মনোবাক্যে দূরে থাকতে হয়। অহিংসা পরম ধর্ম্ম—শুধু কথার কথা নয়। একমাত্র কোমল বৃত্তিকে জাগালে হয় না। জীবনসমস্যা একমাত্র ললিতভাবের দ্বারা সমাধান হয় না। জীবন দ্বন্দ্বময়, সুতরাং সংঘর্ষময়। দ্বন্দ্বকে পরিচালন করবার ক্ষমতা ফুটিয়ে তুলতে হয়। ব্যবহারিকে কোমল ভাবের স্থান কতটুকু ? ছেলেদের শাসননীতি হ'তে আইন আদালত পর্য্যন্ত—সব স্থানই—রৌদ্রভাবের পরিচয়। যেখানে শৃঙ্খলা, সেখানেই কোমল বৃত্তিকে সংযত ক'রে আচরণে রৌদ্র ভাবের আবশ্যকতা দেখা যায়। সংযত রৌদ্রভাব অর্থাৎ কোন আদর্শকে পরিস্ফুট করবার জন্য রৌদ্রভাব মানবতার পরিপোষক ; মনের অগ্রগতির জন্য ঐ রৌদ্রভাব দরকার, জীবনসংগ্রামের জয় যাত্রা মনের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য দরকার। হিন্দুর সমস্ত শাস্ত্রের, সমগ্র সাহিত্যের, সর্ব্বপ্রকার গল্প-গাথার লক্ষ্য—চিত্তশুদ্ধি, রৌদ্রভাবেরও তাই। বেঁচে থাকবার জন্য জয়ী হওয়া দরকার, সুতরাং নির্ভীকতাই জীবনের ধ্রুবতারা—একমাত্র অবলম্বন-ভূমি। মানুষ যখন পশু নয়, তখন ঐ রৌদ্রভাব, নির্ভীকতার সঙ্গে হৃদয়ের উৎকর্ষতা-সাধক বৃত্তির সংযোগ, দরকার দ্বন্দ্বকে পরিচালন করবার জন্য। কোমলতা ও কমনীয়তা—হৃদয়ের ললিতভাব—তখনই ঠিক্ ঠিক্ পরিস্ফুট হয়। অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ব্যূহ রচনা ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে যখন বিপক্ষ রণসাজে সজ্জিত হয়ে আঘাত করবার সুযোগ খুঁজছে, পূর্ব্ব হ'তে যুদ্ধের আয়োজন সোৎসাহে সম্পূর্ণ ক'রে যে সময় অর্জ্জুন শত্রুর সম্মুখীন, ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে অর্জ্জুনের মোহ, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও জ্ঞাতি বধের আতঙ্ক দেখা দেয়। অর্জ্জুনের সেই অবসাদকে যদি অহিংসা-ধর্ম্মের মহিমা ব'লে সমর্থন করা হত, তা হ'লে অর্জ্জুনের অভ্যুদয়ের পথ বন্ধ ক'রেই দেওয়া হত। আবার চৈতন্যদেবের কাজির বিরুদ্ধে অভিযান জাতীয় অভ্যুত্থানের আর একটি ইঙ্গিত—দেশ কাল পাত্রানুসারে ধর্ম্মের বিভিন্ন প্রয়োগ। উভয় ক্ষেত্রে বাধাকে অতিক্রম করবার প্রযত্ন যথেষ্ট, উভয় ক্ষেত্রে প্রতিকারের চেষ্টা বর্ত্তমান। এই অভ্যুদয় লাভের চেষ্টাই গুরুশক্তি। মহামানব যেমন ব্যক্তির গুরু, তেমনই তিনি লোকগুরু। শাস্ত্র বলেন,

বিবেকজ্ঞান উদয় হ'লে মিথ্যা-জ্ঞানের মূলোচ্ছেদ হয়, সুতরাং কারণ অভাবে কার্য্য বা কার্য্য-ফলভোগের—উৎপত্তি হয় না। অর্জ্জুন প্রথম বিবেকীর মত ব'লেছিলেন, অথচ স্বকৃত আচরণের ফলভোগ আশঙ্কায় ভীত হ'য়েছিলেন। নির্দ্বন্দ্ব অবস্থাই জ্ঞানীর লক্ষণ। গুণই দ্বন্দ্ব-ভাবের কারণ, অতএব ত্রিগুণাতীত অবস্থায় উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত তিতিক্ষার দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকাই অধর্ম্ম।

তিতিক্ষায় বিলাপ পর্য্যন্ত থাকবেনা। যিশুর শেষটিও অপ্রতিকার-ভাবের দৃষ্টান্ত, কিন্তু একবার ক্ষণেকের জন্য হতাশের বিলাপ তাঁর মনে উঠেছিল যখন তিনি ব'লে উঠলেন "বাবা! আমাকে কেন ত্যাগ করলে"? ("Father why Hast Thou forsaken me?") অত্যাচারীর জন্য যিশু প্রার্থনা করলেন, ঐ সব অজ্ঞদের জন্য ক্ষমা চাইলেন ("Father! Forgive them, they know not what they do"); আর নিত্যানন্দ প্রভু শুধু যে জগাই মাধাইকে ক্ষমা করলেন, তাদের হয়ে ক্ষমা চাইলেন, তা নয়—তাদের ভগবদ্ভক্তে পরিণত করলেন, যদিও নিমাই আশ্রিতকে রক্ষা করবার জন্য সংগ্রাম-পরায়ণ। তিতিক্ষা ও প্রতিকারের বিপরীত সমাবেশ এইখানে।

যিশু জনের শিষ্য, জন ছিলেন এসিনি (ঈশানী?) সম্প্রদায়ভুক্ত। সেই এসিনিদের যখন জেরিকোর রোমানরা চাকার মধ্যে ফেলে পিষে মারে তখন তাঁরা টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করেন নি, তাঁদের প্রফুল্লতাও নষ্ট হয় নি! ইহা তিতিক্ষার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এসিনিরা ছিলেন ভারতীয় সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁদের আড্ডা ছিল মৃত সাগরের (Dead sea র) কাছে।

[এসিনিদের মধ্যে গৃহী ও সন্ন্যাসী ছিলেন। সন্ন্যাসীরা ("Practised the most rigid celebacy and entirely forbade all communications with the other sex") অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যধারী ছিলেন ও নারী হতে দূরে থাকতেন। তাঁরা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন, দাস-প্রথাকে মনুষ্যত্বের অবমাননাকারী প্রথা মনে করতেন। গৃহীদের মধ্যে চারি শ্রেণী অর্থাৎ জাতি বিভাগ ছিল, অস্পৃশ্য জাতি ছিল, ছুৎমার্গও ছিল তাঁদের মধ্যে। ('In their civil constitution they were all equal, as regards their rights but divided into four classes of which the superior class looked down so much on those beneath them that if touched by one of a lower order, they were

defiled and washed themselves…They were tortured, racked, had their bones broken on the wheel inorder to compel to blaspheme their law giver or eat forbidden meats They did not appease their tormentors, they uttered no cry, shed no tear and even smiled in the worst agony of torment‥" (History of the Jews by Henry Hart Milman D D.) । এসিনিরা সংখ্যায় সেখানে ৪০০০ হাজার জন ছিলেন। ঈজিপ্টের 'থিরাপুত্ত' (Therapeuts) রাও ছিলেন ঐ একই সম্প্রদায়ভুক্ত। ("Dean Milman maintains that the Therapeuts sprang from the contemplative fraternities of India"—Renans Life of Jesus) । এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় যিশু জন্মাবার বহু পূর্ব্বে।]

ডিন্ ম্যানসেলের ন্যায় খৃষ্টানও বলেন যে ঈজিপ্ট ও প্যালেষ্টাইনে আলেকজাণ্ডারের আবির্ভাবের দুই শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ প্রচারকগণের প্রচার-ফলেই উক্ত সম্প্রদায়ের প্রসার হয়। ধোলো পণ্ডিতদের মতে তাঁরা বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বর্ণবিভাগ সত্ত্বেও, তাঁহা নিষিদ্ধ মাংস না খেলেও। তখন বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে পৃথক্ হয নি। সন্ন্যাসী ও গৃহীরা মিলে ঐ দূর দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। গৃহী ও সন্ন্যাসীদের একটি সাধারণ ভাণ্ডার ছিল, তাতে সকলেরই সমান অধিকার ছিল। গৃহীদের, আশ্রমের আদর্শ ছিল; তাঁরা সংযমী ছিলেন ও নবাগত অতিথিদেরও, উক্ত ভাণ্ডারে সম-অধিকার ছিল। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে (Pythagoras) পাইথাগোরাস ভারতের জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করেন ও যিশুর সময জন্মান্তরবাদ য়াহুদিরা গ্রহণ করেন। খৃঃ পূঃ ১৭৫ এ বাসুদেব সম্প্রদায়ের ভাব গ্রীসে ও ঐ সব অঞ্চলে প্রসার লাভ করে। যিশুর মধ্যে যে বৌদ্ধভাব ও বৈষ্ণব প্রভাব দৃষ্ট হয় তাহার কারণও এইখানে। এসিনিরা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, 'বাসাংসি জীর্ণ'বৎ তাঁরা দেহত্যাগ করতে পারতেন। আতিথেয়তা ভারতের চির-সমাজধর্ম্ম। ইহাও তাঁদের মধ্যে ছিল।

["That the movement which those sects embodied was due to Buddhist missionaries who visited Egypt and Palestine within two generations of the time of Alexander the Great…the theory of

metempshycosis which was first originated in India and borrowed from the Hindus by Pythagoras in the 6th. Century B. C under the name of 'Gilgal' (John x)"—(Renan's Life of Jesus)। মোক্ষমূলারের (Theosophy or Psychological Religion, Lecture iii) গ্রন্থ হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে সক্রেটিসের সঙ্গে একজন হিন্দু পণ্ডিতের দার্শনিক আলোচনা হয়। পারসীকদের নিকট হ'তেও গ্রীক এবং য়াহুদিরা ভারতের ভাব পান। মধ্য ভারতের বেশ নগরের স্তম্ভ-লিপি হ'তে প্রমাণ পাওয়া যায় যে গ্রীক-রাজ আন্টিয়ালকিডাস (Antialkidas) এর সময়ে হিলিওডোরাস (Heliodorus) বাসুদেব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন (খৃঃ পূঃ ১৭৫—কানিংহাম মতে, ও উইলসন মতে খৃঃ পূঃ ১৩০)। স্তম্ভলিপিতে Antialkidos কে 'মহারাজ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে (Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, Part IV October দ্রঃ)। খৃষ্টীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে বৈদিক ভাব, বৌদ্ধপ্রভাব ও বৈষ্ণবতন্ত্রের প্রভাব স্পষ্ট (ভারতধারা ২য় ভাগ ও ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত যজ্ঞকথা দ্রঃ)।]

"যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্ম"—পূর্ব্বে বলেছি, অতএব ধর্ম্ম বল্‌তে দুটি জিনিস বোঝায়—যে সব কর্ম্মের দ্বারা অভ্যুদয় হয় এবং যার দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষই পরম ধর্ম্ম, অভ্যুদয় তার সহায়ক বা 'অপরধর্ম্ম'। মানুষ চায় শান্তি। যথার্থ শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে কৃত কর্ম্মের নাম নিবৃত্তিধর্ম্ম এবং সকাম কর্ম্মের নাম প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম। চিত্তনিবৃত্তি ভিন্ন শান্তি আসে না, ঐ শান্তি লাভই পরমধর্ম্মের মূল। চিত্ত-স্থৈর্য্য ভিন্ন চিত্তনিবৃত্তি হয় না। উপাসনাদি অনুষ্ঠানে চিত্তের স্থৈর্য্য আনায়। মনের চাঞ্চল্য সত্ত্বগুণের প্রকাশে দূরীভূত হয়। ধর্ম্মের বিপরীত কর্ম্মের নাম অধর্ম্ম। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় সত্ত্বগুণ প্রকাশে। জগতে অনেক সময়ে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের অত্যাচারও নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সম্প্রদায় বিশেষের অত্যাচারে অপর সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়। কিন্তু তা হয় কি? যিশু প্রাণ দিলেন, তাঁর পবিত্র জীবনের প্রভাব কি লোপ পেয়েছে, না, তাঁর জীবনাদর্শ সকলকে মুগ্ধ ক'রে রেখেছে? অত্যাচারীই শেষে পরাভূত হয়, যাঁরা জীবন দান করেন, তাঁরা চিরদিনের জন্য মানবহৃদয়ের রাজা হয়ে থাকেন। ত্যাগ, অনাসক্তি ও বৈরাগ্যের শক্তি কখন বিফল হয় না, যদিও তৎক্ষণাৎ তার ফল দেখতে

বা বুঝতে পারা যায় না। তিতিক্ষাদি ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম। আর সব ধর্ম্মাচারের পরিবর্ত্তন হয়। সনাতন ধর্ম্ম দেশকাল জয়ী। ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর ধর্ম্মাচার ও গৃহস্থের ধর্ম্মাচার সর্ব্বক্ষেত্রে এক নয়, সমান নয়। পূজা অনুষ্ঠানাদিতে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থে কর্ম্মের বিনিযোগ করতে বলা হয়। অভ্যুদয়ের পথ ত্যাগ ক'রে, সকলেই মোক্ষধর্ম্মাচার গ্রহণে উদ্যত হয় বৌদ্ধ বিপ্লবে ; ফল—জাতীয় অধঃপতন।

ভক্তিশাস্ত্র বলেন 'নাম ও নামী অভেদ'। এইটিই ঠিক্। ব্যক্তিতে যে ভাব পূর্ণ অভিব্যক্ত হয়, তাহাই 'নামী'—নামের স্বরূপ। এক নাম অনেকের হ'তে পারে। 'নামী' যে জীবনে অভিব্যক্ত হয়, সেই নামই 'নাম'। নাম ও নামীর ভেদ করা অধর্ম্ম। ভেদবুদ্ধি নিয়ে নাম-সাধন বৃথা।

ধর্ম্মই আমাদের জাতীয় মেরুদণ্ড। সেইজন্য, ভারতে সব জিনিষের আলোচনায় ধর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হয়েছে। অর্থশাস্ত্রেও (চাণক্যসূত্রে ও) দেখি "সুখস্য মূলং ধর্ম্ম। অহিংসা লক্ষণো ধর্ম্ম। বিজ্ঞানদীপেন সংসার-ভয় নিবর্ত্তন্তে। সর্ব্বমনিত্য ধ্রুবম্। ক্ষমাযুক্তস্য তপোবর্দ্ধতে। ধর্ম্মস্য মূলমর্থঃ। অর্থস্য মূলং রাজ্যম্। রাজ্যমূলমিন্দ্রিয়জয়ঃ।" কর্ম্মক্ষেত্রে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রভৃতির প্রয়োগে গীতোক্ত উপদেশই ধর্ম্ম। ভারতের আদর্শ মোক্ষ, সুতরাং সকল শিক্ষার গতি ঐ দিকে। ধর্ম্মের মূল অর্থ—এই সূত্র সম্বন্ধে টীকাকার বলছেন "ধর্ম্মস্য জগতোবিধারকস্যাভ্যুদয় নিশ্রেয়সযোশ্চ মূলং অর্থঃ ইত্যর্থঃ। অর্থশাস্ত্র পুনঃ বলছেন, "অর্থদূষকং শ্রী পরিত্যজতি।" অর্থের অপব্যবহারে শ্রী ত্যাগ করে। কিসে শ্রী আসে? বলছেন, "সাহসে খলু শ্রীর্বসতি।" শ্রী, সাহসেই বাস করেন। "যো ধর্ম্মার্থো ন পীডয়তি স কামঃ।" যা ধর্ম্ম ও অর্থের পীড়াদায়ক নয় তার নাম 'কাম'। "ন হি ধান্যো সমোঽর্থঃ, ন ক্ষুধাসম শত্রুঃ, নাস্ত্যভক্ষ্যং ক্ষুধিতস্য, ইন্দ্রিয়াণি জরাবশং কুর্ব্বন্তি।" সবল সুস্থ শরীর দরকার, বিকলেন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন হয়না, সুতরাং ধর্ম্ম ও হয়না—ক্ষুধিতের ধর্ম্ম হয় না ; এইটি আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ।

[উদ্ধৃত অংশগুলি যথাক্রমে, চাণক্য সূত্র—১ম অ. ২য় সূ, ; ষষ্ঠ অ. ৭০ সূ, ৭৫।৭৬ ঐ, ৮১ সূ, ঐ, ১ম অ. ৩,৪।৫ ; ১ম অ. ৭৬ , ২য় অ. ৫০ , ঐ ৫৭ , ৩য় অ, ৬৬, ৬৭,

৬৮, ৬৯। অর্থশাস্ত্র, লঘুচাণক্য, বৃদ্ধচাণক্য প্রভৃতি নানা গ্রন্থের রচয়িতার নাম চাণক্য; প্রাচীন তক্ষশীলার অধিবাসী চণকমুনির বংশজাত। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর (খৃঃ পূঃ ৩২৩) যখন চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক বাহিনীকে পদানত করেন, তখন এই তীক্ষ্ণধী ব্রাহ্মণ চাণক্য তাঁর প্রধান মন্ত্রী। কূটরাজনীতিবিৎ নামে চাণক্য প্রসিদ্ধ। তিনি উদার ও শরণাগতবৎসল ছিলেন। তাঁর একটি নাম কৌটিল্য। বিষ্ণুশর্ম্মা, বিষ্ণুগুপ্ত ইত্যাদি নামেও তিনি পরিচিত, চন্দ্রগুপ্তের বীরত্ব ও নতুন রণকৌশলের সঙ্গে চাণক্যের বুদ্ধিকৌশল মিলিত হয়ে চন্দ্রগুপ্তকে অজেয় ক'রে তোলে। চাণক্যই নন্দবংশ ধ্বংসের মূলে। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্ ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের রাজ সভায়। তিনি বলেন যে সে সময়ে ভারতে চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। হিন্দুর বীরত্ব ও হিন্দু নারীর সতীত্ব দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের ছিল রাজ্যলিপ্সা, হিন্দু জাতির জাগরণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তবে তিনি জাতির সামর্থ্যের পরিচয়।]

লঘু চাণক্যের "বৃত্তেন রক্ষ্যতে ধর্ম্মো"—সদাচারেই ধর্ম রক্ষা হয়। আমাদের সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, "মাতৃবৎ পরদারেষু"—এই নীতিও সর্ব্বত্র প্রযুজ্য। এইগুলি প্রশস্ত ধর্ম্মাচার। 'ধর্ম্ম' কথাটির ঠিক্ প্রতিশব্দ ধোলো ভাষায় নেই। ধোলো Religion একটি বাদ বা মনস্তত্ত্বের একটি দিক্ মাত্র, অন্ততঃ এখন Religion বলতে তাই বোঝায়। মনীষি Kant এর মতে 'Moral principle within' অন্তরে স্থিত সৎনীতিই ধর্ম্ম, এই moral principle টি যে কি বস্তু তা বোঝা যায় না। Moral principle বা Moralityর সংস্কার নানা রকমের, Moral principle কতকগুলি সংস্কারের ফলও হ'তে পারে। পবিত্রতা, ত্যাগ, সংযম, সেবা, নিরপেক্ষ-ভাব, সমদৃষ্টি প্রভৃতি স্ফুরিত হ'লে, যে জীবন দেখা দেয় তাহাকেই ভারতে ও এশিয়ায় ধর্ম্মজীবন বলা হয়—সে ধর্ম্মজীবনে ঈশ্বরে বিশ্বাস থাক্ বা নাই থাক্ (যেমন শ্রীবুদ্ধের জীবন)। ধর্ম্ম চায় সংস্কারের উপর উঠতে। বৈদিক সাহিত্যে নীতিবান মানে বেদ বা শ্রুতি-নির্দ্দিষ্ট পথে চলা অর্থাৎ সাধকজীবন হওয়া—একত্বাভিমুখে অগ্রসর হওয়া। সত্যপথ অবলম্বনে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টির উদয় হয় ও 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু'—এই নীতির সার্থকতা উপলব্ধ হয় তখন। এই রকম জীবন লাভ করার নামই নীতিবান হওয়া, এই জীবনের কাছে morality গৌণ। অধুনা morality মানে, পারিবারিক ও সামাজিক

বিধি-নিষেধ মেনে চলা ও উহাদের পুষ্টি সাধনে যত্নবান হওয়া। ধোলোর moral principle, এই পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কার্য্যকারিতার দিক্ দিয়ে—utilityর দিক দিয়ে—বোঝা, আর্য-নীতি মানে, মানবের মধ্যে যে সৎ হবার স্বাভাবিক প্রেরণা আছে তাকে উদ্বুদ্ধ করা; অর্থাৎ শ্রদ্ধাকে জাগিয়ে তোলা—শ্রদ্ধা ভিন্ন ধর্ম্মলাভ হয় না।

চাণক্যের "মাতৃবৎ পরদ্রব্যেষু" ইত্যাদি নীতি, রাজনীতি ক্ষেত্রেও ভারতে প্রয়োগ হয়েছিল; তাই আর্য্যনীতিবাদের সঙ্গে মানবজাতির কোন নীতির বিরোধ নেই; আদর্শ সর্ব্বক্ষেত্রে—"আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু", পণ্ডিতের লক্ষণ বলা হয়েছে। সমদর্শিত্বই অহিংসা। এই সমদর্শিত্ব জ্ঞান, বুদ্ধির কসরৎ নয়। হৃদয় অনন্ত প্রসারিত না হলে ঠিক সমদর্শিত্ব আসে না। অতএব দরকার, মাথার সঙ্গে হৃদয়ের যোগ। হৃদয় ও মাথার মিলন ক্ষেত্র আত্মবৎ জ্ঞানে। সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বা ধোলো Equality and Brotherhood সমদর্শীত্ব নয়। সমদর্শীত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া মানে হিন্দুজীবনের মেরুদণ্ড বা জাতীয় কুণ্ডলিনীকে উদ্বুদ্ধ করা। সেই কারণে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সদা আদর্শের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা চাই, ত্যাগশক্তির দ্বারা, বিশাল হৃদয়ের দ্বারা, আদর্শকে ব্যবহারগম্য করা চাই। এখনও ভারতের জনশক্তি ত্যাগাদর্শের কাছে মাথা নীচু করে। ভারত বোঝেন তপস্যার শক্তি। 'হৃদয়' 'সত্যময়'—'হৃদয়ই' বিশ্বাস। (কবিবর গিরীশচন্দ্রের 'হৃদয়' কবিতা দ্রঃ)। নীতিবান হওয়া চাই, হৃদয় চাই।

ধোলো Equality ও Brotherhood মানে সম-ভোগাধিকার; এই সম-ভোগাধিকারবাদ ধোলো ব্যাপক ভাবে কার্য্যকরী করতে কখন পারেন নি, স্বজাতি বা অতি সংকীর্ণ স্থানেই তা সীমাবদ্ধ। ভোগের সঙ্গে থাকে স্বার্থ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সুতরাং ঐ Equality কথার-কথা মাত্র হয়ে রয়েছে। সমদর্শিতাকে ব্যবহারগম্য করতে হলে, চাই প্রথম মানুষকে মানুষ ব'লে স্বীকার করা অর্থাৎ প্রত্যেক মানব যে মানবধর্ম্মী ইহা স্বীকার করা চাই। ইহা হওয়া চাই সাধনা, সাধকের-ভাব থাকা চাই। মানুষ যে মানবধর্ম্মী, এই দাবী প্রত্যেকেই করতে পারে। অভ্যুদয়ের পথে ঐ দাবী অঙ্গীকার করার অর্থ, গুণ ও কর্ম্মানুসারে বিভাগ মেনে চলা শ্রদ্ধার সঙ্গে, সকলের উন্নতির পথ খুলে রাখাই ঐ

অঙ্গীকারের অর্থ। বহুকাল হ'তে হিন্দুর সমাজ-জীবনে এই প্রাচ্য ভাবের Equality ও Brotherhood এর অভাব। গুণকর্ম্মানুসারে বিভাগ মানে শ্রেণী বিভাগ, জাতির মধ্যে ভেদবুদ্ধি আনা নয়। অভ্যুদয় কোন একচেটে দাবী সাপেক্ষ হ'তে পারে না।

সামাজিক ব্যবস্থায়, অন্য সুবিধা ও অসুবিধার মধ্যে, একটি মস্ত সুবিধা আছে—উত্তরাধিকারের সুবিধা, কিন্তু এই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ, পোষণ ও বর্দ্ধন না হ'লে, ঐ প্রাপ্ত বস্তু নষ্ট হয়—উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আভিজাত্যরূপ অধিকারবাদের দাবীর বৃথা আস্ফালনে কোন ফল হয় না। ঐ আভিজাত্যরূপ গর্ব্বটি কেবল পূর্ব্বস্মৃতির ক্ষীণ সংস্কার এখন। উত্তরাধিকার সূত্রের পুনঃ পুনঃ অপপ্রয়োগে—ধারাবাহিক-ক্রমে অপপ্রয়োগে স্মৃতি ভ্রংশ হয়, স্মৃতি ভ্রংশে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশে সুসংস্কারও নষ্ট হয়। পূর্ব্ব স্মৃতির গর্ব্ব তখনই কার্য্যকরী হয় ও অভ্যুদয়ের কারণ হয়, যখন আভিজাত্য সৎসঙ্গ স্পৃষ্ট হয়—সৎ সঙ্গে স্মৃতি ভ্রংশের পথ রুদ্ধ হয়—"সজ্জনসঙ্গতিরেখা ভবতি ভবার্ণবতরণেনৌকা।" পূজার নিয়ম—সকল জিনিষকে শোধন ক'রে নিতে হয়। সকল সংস্কারের শোধন হয় এই সৎসঙ্গে। সৎসঙ্গ লাভই ধর্ম্মের বা অভ্যুদয়ের কারণ সর্ব্বক্ষেত্রে।

বিষয়লাভ উত্তরাধিকার সূত্রে হয়, কিন্তু জ্ঞানার্জ্জন বা বস্তুলাভ সাধন সাপেক্ষ, বংশের কর্ষণাজাত-সংস্কার সাধনার সহায় অতি সামান্য ক্ষেত্রে। তাও আবার ঐ সংস্কার, বংশের সকলের উপর সমান প্রভাব বিস্তার করে না। বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থা যদি উন্নতির পরিপন্থি হয়, বৃথা ভাঙচুরের দিকে, ভেদবুদ্ধি বর্দ্ধনের দিকে শক্তিক্ষয় না ক'রে সমাজকে শক্তিশালী করাই বেশী দরকার। তার জন্য সংহতিশক্তির সৃষ্টি ও সংঘবদ্ধ হয়ে একই উদ্দেশ্যে কায করে যেতে হবে। একজনের দ্বারা যে কায হয় না, একই উদ্দেশ্যে ঐক্য-বদ্ধ হয়ে—মতভেদ সত্বেও—কায করলে কত বড় বড় কায করা যায়। আজ ধোলো মনীষীরা দেখাচ্ছেন—সংহতিশক্তির অতুল প্রতাপ প্রমাণ করছেন পদে পদে সর্ব্বক্ষেত্রে। তবে ভারতের সংহতিশক্তি সমদর্শীস্বরূপ সত্বধারাকে স্পর্শ ক'রে থাকা চাই। সমাজ-শক্তির-জাগরণে সমাজ-ধর্ম্মের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মের পথ রোধ না ক'রে সমাজকে সচেতন হয়ে অগ্রসর

হ'তে হবে। ধোলো জীবন-সঙ্গীতের Harmonyর সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবন-গীতির বৈশিষ্ট্যকে যথাযথ স্থান দিতে হবে। Sir Thomas Roe, পাৎসা কন্যাকে আরাম ক'রে পারিশ্রমিকের পুরস্কার স্বরূপ আদায় করলেন স্বজাতির সুবিধা—নিজ জাতির কল্যাণ। তাঁর স্ব-স্বার্থের দিকে দৃষ্টি ছিল না, ছিল জাতিরূপ সমষ্টির দিকে। তিনি নিজের বিলাস অপেক্ষা স্বজাতির ঐশ্বর্য্য, যশ ও গৌরব চেয়েছিলেন। এই 'ধনং দেহি যশং দেহি' ভাবই সমাজ-ধর্ম্ম। নিজ প্রভুত্ব জ্ঞাপন করা সমাজ-ধর্ম্ম নয়, সমাজদ্বেষী বা সংঘদ্বেষী হয়ে পৃথক দল সৃষ্টি করবার চেষ্টাও ব্যক্তির ধর্ম্ম নয়। উন্নতির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে কায করা ভাল—দলাদলি ভাল নয়। বিভিন্ন মতবাদ বিভিন্ন দিক্ দিয়ে আলোচনা ভাল, দ্বেষাদ্বেষী ভাল নয়। দুপক্ষের উকিলের ঝগড়ায় উকিলদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় না।

শিক্ষা ও কর্ষণায় অসাধ্য সাধন হয়। মাত্র জন্মগত অধিকারে তা হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ। পরাশর জনককে বলছেন যে অপকৃষ্ট বর্ণে জন্মগ্রহণ করলেই অপকৃষ্টতা আসে না, যদি তার সঙ্গে তপস্যা থাকে। বশিষ্ট, ঋষ্যশৃঙ্গ, কশ্যপ, বেদতাণ্ড, কৃপ, কাক্ষীবান, কমঠ, যবক্রীত, দ্রোণ, আয়ু, মাতঙ্গ, দ্রুপদ, মৎস্য প্রভৃতি ঋষিরা ইহার উদাহরণ, দমগুণ ও তপস্যার বলেই তাঁরা বেদ্‌বিদ্‌ ব'লে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছিলেন। "(এতে স্বাং প্রকৃতিং প্রাপ্তা বৈদেহো তপসো শ্রয়াৎ। প্রতিষ্ঠাতাবেদবিদো দমেন তপসৈ চ" ॥ (পরাশর গীতা—পরাশর-জনক-সংবাদ দ্রঃ)। দমগুণ না থাকলে, বেদাধ্যয়ন বা বেদজ্ঞান না থাকলে, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায় না। আর্য-সমাজের ঐ প্রকার ব্যবস্থা গুণকর্ম্ম অনুসারে—উদ্দেশ্য, সকলকে ব্রাহ্মণত্বলাভে, ঋষিত্বলাভে সহায়তা করা। শুধু অপকৃষ্ট ক্ষেত্র নয়, কিন্তু পরাশর বলছেন 'উৎপাদ্য পুত্রান্ মুনয়ো নৃপতে যত্র তত্রহ,' এরকম ব্যক্তিরা তপস্যার দ্বারা "ঋষিত্বং বিদধুঃ পুনঃ"। ইতিহাস প্রমাণ করছে যে বহু অনার্য্য, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি বেদানুগ হওয়াতে কেবল দ্বিজ ব'লে গণ্য হন নি, তাঁরা দ্বিজ সমাজে স্থান পেয়েছেন পর্য্যন্ত; আবার অনেক দ্বিজ, শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন অথবা স্বেচ্ছায় শূদ্রত্ব স্বীকার করেছেন। রক্তবাদের অর্থাৎ বংশগত অধিকারবাদের প্রাধান্য যখন হ'তে দেখা

দেয়, সেই সময় সেই দ্বিজেরা—যাঁরা স্বেচ্ছায় শূদ্র হয়েছিলেন তাঁরা—আজও সমাজে হীন হয়ে রয়েছেন, অস্পৃশ্য হয়ে কোণঠাসা হয়ে রয়েছেন।

ভারতে তথা এশিয়ায় জাতির পরিচয় ধর্ম্মের নামে। আমরা হিন্দু, আমরা মুসলমান, আমরা খৃষ্টান ইত্যাদি। এখানে জাতি মানে ধর্মসংঘ—Spiritual community—বৃহৎ বৃহৎ সংহতিশক্তি। এই সকল জাতির লক্ষ্য এক, সাধনপ্রণালীর মূলনীতি অভিন্ন—ত্যাগ, তপস্যা, সংযম ইত্যাদি। পার্থক্য শুধু লৌকিক আচারে, জীবনযাপন রীতির খুঁটিনাটিতে। ব্যাপকভাবে দেখলে, অন্ততঃ ভারতে, সকলের জীবন-যাত্রা-প্রণালী প্রায় একরূপ, ঝগড়া কেবল প্রত্যেক সমাজের নঙর্থবোধক আচার নিয়ে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যেখানে আদর্শ-জীবন সেখানে আছে প্রীতি, সমদর্শিত্ব। ঐ সমস্ত জাতির মিলনক্ষেত্র ভারতে—সকলেই ভারতবাসী। মনুষ্যত্ব অর্জ্জন, দেবত্বের বিকাশ, পশুত্ব বর্জ্জন যদি সকলের কাম্য হয় সত্যসত্যই, অভ্যুদয়ের পথে যদি সকলেই মনমুখ এক ক'রে অগ্রসর হন, তা হলে গোঁড়ামি, পাগলামি ও বৃথা কলহ ক'রে পরস্পরের শক্তিক্ষয় করবার অবসর থাকে না এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুন শক্তি সৃজন করা অসম্ভব হয় না, ধর্ম্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার ও স্থান থাকে না। ধোলোর জাতি নিরূপণ হয়, ভৌগলিক সংস্থানের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত সমস্বার্থের রাজনীতিতে। ধোলোর Nation মানে রাজনৈতিক সংঘ—Political community, ঐ সব Nation বৃহত্তর ভৌগলিক জাতির (European দের) অনুজাতি স্বরূপ। তাঁদের প্রত্যেকের স্বার্থ পৃথক, উদ্দেশ্য—রাষ্ট্র বৃদ্ধি। সেখানে যে দ্বেষাদ্বেষীর ও ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বীতার ভাব বর্ত্তমান, তা ভারতে নেই—এশিয়াতেও নেই। সমদর্শীতলাভ ধোলোর আদর্শ নয়—স্ব স্ব সমাজের উর্দ্ধে Equality ও Brotherhoodএর স্থান নেই। সমস্ত ধোলো জাতির আচারগত সাদৃশ্য আছে, তাঁদের Equality পরস্পর আহার বিহারের মিলনে অর্থাৎ সামাজিক আচরণে। আর এক বিষয়ে তাঁদের ঐক্য আছে। সকলের উদ্দেশ্য যখন রাষ্ট্রবৃদ্ধি তখন দুর্ব্বলের উপর প্রভুত্ব স্থাপন বিষয়ে ঐক্য আছে। আচারগত সাদৃশ্য থাকায় তাঁদের সামাজিক সম্মিলন সহজ ও সুগম, রাজনৈতিক সমাজ-গঠনে

সকলের আদর্শ থাকায়, তাঁদের মধ্যে যে সামাজিক স্বাধীনতা আছে তা আমাদের নেই।

ইউরোপ ও আমেরিকা এক ধর্ম্মাবলম্বী হ'লেও, ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, রুষ বা আমেরিক আদির মধ্যে জাতীয় ঐক্যসূত্র অর্থাৎ ঐ সমস্ত অনু-জাতি-সমষ্টির ঐক্যসূত্র নেই—প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রজাতি, প্রত্যেক জাতির রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি, প্রগতি ও নীতি বা Policy এক রকম নয়; সেখানে প্রত্যেক জাতির church বা ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান, রাজশক্তি অথবা রাষ্ট্রশক্তির অধীনে পরিচালিত। ইংরাজি 'নেশন' কথাটি একটি স্বার্থদুষ্ট সীমাবদ্ধ ভাব; উহাকে 'ঈশাবস্যং' ক'রে নিতে হবে, অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান, পার্শী আদি সকলেই—ভারতবাসী মাত্রেই—ভারত মাতার সন্তান একটি বৃহৎ পরিবার বা জাতি (Nation)। এই নেশন=বিশ্বকল্যাণকামী সাধক—একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই সাধনার মূল-মন্ত্র—নিজেদের মুক্তি ও বিশ্বহিত। ঐ পরিবারের মর্য্যাদা রক্ষা করাই হবে প্রত্যেকের লক্ষ্য। এই পরিবারান্তর্গত হিন্দু, মুসলমান বা যে কোন সম্প্রদায়ের কুৎসা যিনি করবেন, তিনি ঐ পারিবারিক মর্য্যাদায় আঘাত করবেন। সমালোচনা ও কুৎসা এক জিনিষ নয়। সাধনাচার বা ধর্ম্মাচার এবং দেশাচার বা লোকাচার যে বিভিন্ন—দেশাচার যে পরিবর্ত্তনশীল—তাহা সর্ব্বদা মনে রেখে আত্মঘাতী পারিবারিক বৃথা কলহ হ'তে বিরত হ'তে হবে। ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় যিনি দেবেন, তিনি পরিবারের শত্রু। ধর্ম্মের নামে নিজ নিজ বিশেষত্ব রক্ষার অজুহাত ভেদবুদ্ধিরই কল্পনা। বিশেষত্ব রয়েছে সকল সম্প্রদায়ের নিজ নিজ সাধনাচারে, নেই তা লোকাচারে বা দেশাচারে। কেহ ছাড়তে বলেনা বিশেষত্ব বা সাধনাচার। আচারনিষ্ঠ হওয়া মানে সাধনা-চারনিষ্ঠা হওয়া—পবিত্র জীবন, যার প্রয়োগ অন্যান্য আচারে হ'লে জাতীয় জীবন সার্থক হবে ভারতে। চাই সংযম, চরিত্রবল ও চারিত্র্য। ধোলো সভ্যতার উত্থান হয়েছে নারীকে মর্য্যাদা দানে, যদিও ঐ মর্য্যাদা পর্য্যবসিত কামিনীর (যুবতীর) মর্য্যাদায় এবং ঐ সভ্যতার প্রসার-মূলে আছে কাঞ্চনলোভ। ভারতকে 'স্ব' লাভ করতে হ'লে কাম-কাঞ্চনের প্রলোভন হ'তে আত্মরক্ষা করতে হবে। এই আত্মরক্ষাই ভারতের ধর্ম্ম। ধনিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ ভারতের আদর্শ নয়। ধনিকের ধন-ব্যবহার প্রাচ্যের আদর্শমত হওয়া চাই—অর্থের

বিনিয়োগ চাই, ত্যাগ ও সেবাব ভাব চাই। ধোলোদেশে চিত্তবঞ্জন বা গান্ধি প্রভৃতিব ন্যায় ত্যাগব্রতী না হ'লে ও নেতা হওয়া যায়, ভাবতে তা হয় না। ভাবতে, বাঙ্গালী, মাবাঠি, পাঞ্জাবী, মাদ্রাসী প্রভৃতি আচাব ব্যবহাবে পৃথক হলেও—বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রেব অনুগামী হলেও—হিন্দুব ঐক্যসূত্র ধর্ম্মে; তাঁবা সকলেই বেদ মানেন, সকলেই শাস্ত্রোক্ত বিভিন্ন দেবতাব উপাসক, সকলেরই মিলনস্থান দেবালয়ে, তীর্থে। ভাবতীয় মুসলমানদেব স্বতন্ত্র আচাব হ'লেও, তাঁদেবও মেরুদণ্ড ধর্ম্মে, কোবাণেব যে অনুবাদ তাঁদেব দ্বাবাই প্রকাশিত হয়েছে, তাঁবা আবো যে সব ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপিয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে তাঁবাও বিবেক বৈবাগ্যকে পবম ধর্ম্মেব মূল ব'লে বিশ্বাস কবেন, আমবা যাকে বেদতত্ত্ব বলি, পবিত্র কোবাণশাস্ত্রেও সেই তত্ত্বেব অভাব নেই। যে সব খ্রীষ্টান ভাবতে বহু শতাব্দী হ'তে এখানে বসবাস কবছেন, তাঁদেব বংশধবেবা যিশু-জীবনাদর্শ—ত্যাগ বৈবাগ্যেব আদর্শ—ধ'বে আছেন। স্বামীজি তাই বলেছেন, "ধর্ম্মই আমাদেব জাতীয় জীবন-সঙ্গীতেব প্রধান সুব।" এই ঐক্যসূত্রকে ধবতে হবে, প্রয়োগ কবতে হবে। আমবা ভুল কবি প্রথা বা দেশাচাবকে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাচাব মনে ক'বে, অথচ প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে যে দেশভেদে, অবস্থাভেদে, আচাব পৃথক, সর্ব্বকালে এক আচাব থাকে না, আচাবেব পবিবর্ত্তন হয়, একই আচাব সকলেব জন্য হ'তে পাবে না। ধর্ম্ম কি সেই বকম? সামাজিক আচাব ও ধর্ম্মাচাব ভেদে আচাব দুবকম। ধর্ম্মাচাবেব উদ্দেশ্য ধর্ম্মজীবনকে সহায়তা কবা মাত্র, তাব দোহাই দিয়ে মানুষকে মানবধর্ম্মী ব'লে স্বীকাব না কবা অধর্ম্ম। সাধনাচাবই যথার্থ ধর্ম্মাচাব। সর্ব্বদেশে, সকল যুগে এই ধর্ম্মাচাবেব লক্ষ্য মানবতা। ইহাই আচাব-ধর্ম্ম। সামাজিক আচাবগুলি বিভিন্ন প্রকৃতি ও রুচিব পবিচায়ক। প্রকৃতিব নানা বৈচিত্র্যেব দিকে দৃষ্টি বাখলে যেমন বৈচিত্র্যেব মধ্যে ভেদই দৃষ্ট হয়, আচাবগুলিও সেই বকম। সব আচাবগুলি ভেঙ্গে এক কবাব চেষ্টা গোঁড়ামি, কাবণ, তাতে ঐক্যেব সন্ধান পাওয়া যেতে পাবে না, মনেব প্রীতি বর্দ্ধিত হয় না, ইহাও প্রত্যক্ষ। ধোলো দেশ ইহাব প্রমাণ।

বাহিবেব ঘাত প্রতিঘাতে, জয় পবাজয়ে, ভোগেব অন্বেষণে পাশ্চাত্যে যে সভ্যতাব উদ্ভব ও গঠন হয়েছে—যে সভ্যতাব মূল ইজিপ্ট ও গ্রীস—

তারির বিশিষ্ট সংস্কারের নাম ধোলো-'কালচার'। 'ধোলো'—কেন না, তাঁরা নিজেদের শ্বেতজাতি বলেন, কেন না, ঐ কালচারে কালো-ধোলোর প্রভেদ স্পষ্ট; অপিচ, ভূমার অনুসন্ধানে অগ্রসর হ'য়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে জয়ী হ'য়ে যে প্রতিভার বিকাশ ও ঋষিত্বের প্রকাশ এবং ফলস্বরূপ যে সংস্কারের উদয় বা অভ্যুদয় তারির বিশিষ্টতা ভারতের তথা এশিয়ার কালচার; ঐ কালচারের গতিতে যে প্রাণস্পন্দন এসেছিল তাকেই লক্ষ্য ক'রে ভারতের সভ্যতা গঠিত হয়। তাই ভারতের ইতিহাস প্রধানতঃ অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাস। মুসলমান সভ্যতাকে যদি পৃথক কেহ ধরেন, ঐ সভ্যতার ইতিহাস ঐ একই কথা বলবে। ভারতের কালচার সর্ব্বগ্রাসী, সকলকে আত্মস্থ করতে চায়, আপন ক'রে নিতে চায়—প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে। সেই জন্য দেখতে পাই, ভারতের কালচার বিভিন্ন সভ্যতাকে আত্মস্থ করতে করতে বরাবর অগ্রসর হয়েছে, আর, আজ ধোলা সভ্যতা আপন কালচারকেই ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে, জাতিতে জাতিতে বিষম প্রতিদ্বন্দ্বীতা এসেছে, প্রত্যেকে রণসজ্জায় আজ সজ্জিত। তবে, ধোলো কর্ম্ম-কৌশল জানেন, ধোলো কর্ম্মযোগী বিষয় ক্ষেত্রে। ভারত এখন কর্ম্ম-কৌশল ভুলেছেন। ধোলোর ঐ দিকটি আমাদের নিতে হবে, আদর্শ না ভুলে।

কর্ম্মের কৌশল যেমন যোগ, "সমত্বং যোগ উচ্যতে"—ইহাও কর্ম্মক্ষেত্রে সমান ভাবে সত্য। আদর্শ—সমদর্শীত্ব। কেন্দ্রাভিমুখী গতি হলে মহাশক্তির স্ফুরণ হয়, এইখানেই কর্ম্মকৌশলের প্রয়োগ দরকার। ব্যষ্টিতে ভেদ অপরিহার্য্য, তাই সমষ্টির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা চাই। এ ব্যবস্থায় কালো-ধোলো নেই। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—ধোলো বুলি, ধোলো ধুয়া, ফরাসী বিপ্লব হ'তে। ঐ সাম্যবাদ বিষমতাই এনেছে, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মূল উৎপাটন করেছে, Equality ও Brotherhood প্রাণহীন আজ, আজ ঐ নীতি একটি কূট রাজনীতিতে পর্য্যবসিত! ধোলো সভ্যতা কেন এখন সর্ব্ববিধ্বংসী প্রকাণ্ড দাবদাহের মুখে অগ্রসর হচ্ছে? ইহার কারণ, ধোলো সভ্যতার জন্ম নিষ্ঠুরতায়, বৃদ্ধি ও নিষ্ঠুরতায়, এমন কি ধোলো চিত্র-শিল্পের জন্মও যুদ্ধক্ষেত্রে! খৃষ্টান হয়েও, যিশুর জীবনদার্শ পেয়েও, তাঁরা ঐ নিষ্ঠুরতার সংস্কারকে পরাভূত করবার-চেষ্টা জাতীয় জীবনে করেন নি। ধোলো সভ্যতার একমাত্র রক্ষার উপায় আছে।

সে উপায়—শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ভারতের সঙ্গে আদান প্রদান। একটি মাত্র বড় জিনিষ ধোলোর কাছে আমাদের শেখবার আছে Organisation, ব্যবহারিকে সংহতিশক্তির প্রয়োগ। অন্নসমস্যাই বর্ত্তমান ভারতের প্রধান সমস্যা। আমরা দেখেছি, ঋষিরা 'অন্ন'কে কত বড় স্থান দিয়েছেন। 'অন্নং ব্রহ্ম' ইহা আমরা ভুলেছি। অন্নসংস্থানের কৌশল ধোলোর কাছে শিখতে হবে। ধোলো শিক্ষায় আমরা রাজনীতি-চর্চ্চা করছি, তাঁদের মত রাজনৈতিক চাল ও বুলি শিখেছি। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে আমরা রাজনীতির সহায়তা গ্রহণে অগ্রসর, এজন্য আমরা অনেক রকম আন্দোলন করছি; কিন্তু ঐ সমস্ত আন্দোলনই ভারতের (তথা এশিয়ার) সত্তাধার-সংস্পর্শ-শূন্য। পবিত্রতা ও চরিত্রবল—এই দুই প্রধান কর্ম্মজীবনের আদর্শের দিকে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার অভাব। আমরা ভোগাধিকারের ভাগ-বখরা নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করছি, কিন্তু যে প্রাদেশিকতার বিষ প্রদেশে প্রদেশে উদ্গীরিত হয়েছে ও যা ক্রমবর্দ্ধমান, যার জন্য শেষে প্রবল অন্তর্বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, তার দিকে আমাদের তেমন দৃষ্টি নেই, তাকে রোধ করবার কোন প্রচেষ্টা নেই! এই অন্তর্বিরোধের বীজ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক, ইহা হিন্দু মুসলমানের খোসা-নিয়ে-ঝগড়া অপেক্ষা বিষম, ভাগ-বখরার মত সম্প্রদায়-বদ্ধ নয়। আগে ঘর সামলাতে হবে; সমষ্টি-বোধ উদ্দীপিত করতে হবে। সব রকম সমস্যার সমাধানচেষ্টায় আমরা একসঙ্গে মিলিত হই; সেখানেও অন্তর্নিহিত থাকে ঐ প্রাদেশিকতার বুদ্ধি! মানব ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রতীক (Image), ইহা হিন্দু, মুসলমান, বা খৃষ্টান, সকলেই স্বীকার করেন। এই শ্রেষ্ঠ-প্রতীকের সেবা বা সেবাধর্ম্মের আচরণ ভিন্ন মনের সমস্ত কলুষ কি অন্য কোন উপায়ে সহজে ধৌত হ'তে পারে? "Equality ও Brotherhood" লোভবর্জ্জন করতে শেখায় না, ত্যাগশক্তির স্ফুরণ ভিন্ন সেবাধর্ম্মের আচরণ হয় না।

ধোলোর আজ জীবন-মরণ সমস্যা। তাঁদের মনীষীরা এই সমস্যার গুরুত্ব এখন বুঝেছেন। ধর্ম্ম মানে যে সম্প্রদায় নয়, ইহা তাঁরা কখন বোঝবার চেষ্টা করেন নি ব'লেই ধর্ম্ম হ'তে তাঁরা দূরে প'ড়েছেন। 'সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িকতা আনায়, বিরোধ আনায়, অতএব ধর্ম্মকে পৃথক ক'রে রাখ'—এইটি তাঁরা বুঝেছেন। সম্প্রদায় যে শুধু ধর্ম্মের এক একটি

রূপকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য ও তাতে প্রাণসঞ্চার করবার জন্য আবশ্যক হয় ইহা তাঁরা ভাবেন নি এবং আমরাও তা ভুলেছি আজ। কোন উচ্চ দৈবশক্তি ভিন্ন যে ঘোলোর উদ্ধার সম্ভব নয়, ইহাও কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে উদয় হয়েছে পূর্ব্বে। একজন মনীষী বহুপূর্ব্বে বলেছেন,—

["For although it is possible for men of genius to grope their way to the higher reaches in their respective lines of work and at particular times and places in the world's history, it is not possible for them either singly or in combination · to co-ordinate the separate movements of civilization into a working co-operative whole. That must depend upon some single ulterior Power sitting at the centre, and behind them all, and giving to each his appropriate place and function in the larger harmony"—History of Intellectual development"—(Introduction to the Second Edition—Crozier]

অর্থাৎ 'জগতের ইতিহাসে—বিশেষ সময়ে ও বিশেষ স্থানে—বিভিন্ন প্রতিভাবান্ মানব, যদিও স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চতর ভাব হাতড়েও পান, তবুও একজনের দ্বারা অথবা সংহতিশক্তি সহায়ে, সভ্যতার পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি পূর্ণ সহযোগে সূত্রাবদ্ধ ও কার্য্যকরী করা সম্ভব নয়, সভ্যতার ঐ সমস্ত গতির কেন্দ্রস্থলে ও আড়ালে অবস্থিত কোন এক প্রবল অদৃশ্যশক্তিই প্রতি প্রতিষ্ঠানের যথাযথ স্থান ও কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে বৃহত্তর সাম্য নির্দ্দেশ করতে সমর্থ।' ঐ উক্তি ঘোলোমনের একটি হাহাকার, একটি গুরুতর অভাব-বোধ—মহাশক্তি আবির্ভাবের প্রয়োজন-বোধ, সভ্যতার জটিল সমস্যা সমাধানে এক মহাশক্তির আবাহনমাত্র। জগৎ হ'তে ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হয়েছিল, তাই ধর্ম্মসংস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা নানা ভাবে ব্যক্ত হয়েছে মাত্র। এই পর্য্যন্ত এখানে বলতে চাই যে, সভ্যতার মধ্যে মহাসমন্বয়ের অভাব তীব্রভাবে মানবহৃদয়ে অনুভূত হলেই, অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বই ঠেলা দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন ও তখন মহাশক্তির প্রকাশ বুঝতে পারা যায়। সকল সভ্যতা-সমষ্টির কেন্দ্রস্থলেই ঐ মহাশক্তি

নিহিত। ধোলো কালচারের পুঞ্জীকৃত সংস্কার আজ মহাপ্রতাপে কায করছে, সভ্যতার প্রতি অঙ্গের মধ্যে সমঞ্জস বিধান করতে হলে, চাই ঐ কেন্দ্রস্থলকে পবিশুদ্ধ করা—চাই মহৎ হৃদয়, প্রেমপূর্ণ হৃদয়। যো সো ক'রে একটা রফা করবার চেষ্টায় সমস্যার মূল উৎপাটন হয় না।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—২

বর্ত্তমান যুগ বিচার চায়, ধোলো সভ্যতা বুদ্ধির বিকাশ চায়। বুদ্ধি বুদ্ধি ক'রে আমরা পাগল, অথচ এই বুদ্ধির কসরতে এসেছে জগতে আজ মহা অশান্তি। দরিদ্রই মানবের অন্নসংস্থান করে—গরীবই সকল সমাজের প্রাণ। বুদ্ধির কসরতে আজ সেই দরিদ্রনারায়ণ উপেক্ষিত, বুদ্ধির কসরতেই দুর্ব্বলের পীডন, প্রবলের আস্ফালন, দরিদ্রপেষণের নব নব উপায় উদ্ভাবন। ইহা অপেক্ষা নাস্তিকতা ধরা কখন দেখে নি। অত্যন্ত ব্যাপকভাবে হৃদয়ের সঙ্গে সংযোগহীন বুদ্ধির খেলা জগতে এই বোধ হয় প্রথম। বিচার—বুদ্ধির যুক্তি—আমরা ভালবাসি, কথার মারপ্যাঁচে আমরা নড়িচড়ি। হৃদয়ের যুক্তি আমরা চাই না—হৃদয়ের পরিচয় পাবার জন্য ব্যস্ত নই। আত্মারহত্যাও বুঝি মাথার দিক্ দিয়ে, হৃদয়ের দিক্ গণনার মধ্যেই আনি না। মাথার দিক্ যেন বেড়েই চলেছে, হৃদয় বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে, তাই আজ সকলের হাঁফ ধরেছে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার জন্য তাই আজ মানব ব্যাকুল হয়েছে।

এক ডাকাত ৫২টি খুন ক'রে পালায়। কোন এক সাধুর কৃপা ঐ ডাকাতের উপর হয়, ডাকাতের জীবনগতি ফিরে যায়; কিন্তু পূর্ব্বানুশোচনায় ডাকাতের মনে মহা অশান্তি। সাধু উপদেশ দিলেন "বাবা, যা বলেছি সেইভাবে জীবন যাপন কর, আর কখন খুন কোরো না, মনে শান্তি পাবে।" ডাকাত "যে আজ্ঞা" ব'লে তীর্থভ্রমণে বাহির হল। বনের মধ্যে যেতে যেতে, নারীর কাতর-কণ্ঠধ্বনি ডাকাতের কাণে এল। বিপন্না নারী সাহায্য চাইছেন। অগ্রসর হ'য়ে ডাকাত দেখলে যে এক দুর্বৃত্ত ঐ নারীর সতীত্ব হরণে উদ্যত! ডাকাতের এখন কি কর্ত্তব্য? ডাকাতের মাথা

গবম হ'যে উঠল। "যাঁহা ৫২, তাঁহা ৫২" ব'লেই. ভীষণ বেগে ডাকাত দুর্বৃত্তকে আক্রমণ কবলে; দুর্বৃত্ত মৃত হ'যে প'ড়ে গেল। ঐ নাবীকে মাতৃসম্বোধন ক'বে ও যথাস্থানে তাঁকে পৌঁছে দিযে ডাকাত গুরুবাসাভিমুখে যাত্রা কবলে। গুরুসাক্ষাতে, ডাকাত বিষণ্ণমুখে দণ্ডায়মান। গুরু—"বিষণ্ণ কেন ? কি হয়েছে ?" ডাকাত—"গুরুআজ্ঞা লঙ্ঘন কবেছি, যাঁহা ৫২, তাঁহা ৫৩ কবেছি।" গুরু অবাক্। সব কথা খুলে ব'লে ডাকাত জোড়হাতে গুরুআজ্ঞাব জন্য অপেক্ষা কবতে লাগল। গুরু—"যা কবেছ, ঠিক্ কবেছ। ইহাই ধর্ম্ম। আজ্ঞা লঙ্ঘন কব নি। যে উপদেশ পেয়েছ, তাতে হৃদয দিয়ে সব বুঝতে বলেছি। সব সময়ে, মাথা দিযে ন্যায় অন্যায়েব, ধর্ম্মাধর্ম্মেব বিচাব সিদ্ধ হয না। হৃদয়েব যুক্তি স্বতন্ত্র। মনেব অশান্তি দূব কব। এমন অবস্থা এব পব আসবে তোমাব, যখন ঐ বকম উপায অবলম্বন কববাব তোমাব দবকাবই হবে না।"

এক বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে। গৃহস্বামী একলা। লুঠেব পব দেখা গেল গৃহস্বামী পলায়ন কবেছে। সর্দ্দাব ডাকাত, অন্য ডাকাতদেব লুঠেব জিনিষ নিযে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যেতে আদেশ ক'বে, গৃহস্বামীব খোঁজে বেবিযে পড়ল; তাকে হত্যা কবা চাই, নতুবা ধবা পড়বাব ভয। দূব গ্রামে একজন তপস্বী নদীব ধাবে থাকতেন। সত্যপবাযণ জিতেন্দ্রিয় তপস্বীকে সকলেই ভক্তিশ্রদ্ধা কবত। কাতব ও ক্লান্ত হ'য়ে, ঐ গৃহস্বামী এই তপস্বীব শবণাগত হল। তাকে নির্দ্দোষ জেনে, তপস্বী তাকে একটি গোপন স্থান দেখিযে দিলেন। গৃহস্বামী সেইখানে লুকিযে বইল। কিছুক্ষণ পবে সর্দ্দাব ডাকাত এসে উপস্থিত। তপস্বীকে দেখে প্রণাম ক'বে কবজোড়ে সে জিজ্ঞাসা করলে "মহাত্মন্, আপনি এইদিকে কোন লোককে দেখেছেন ?" তপস্বী—'না'। সর্দ্দাব ঐ স্থান ত্যাগ ক'বে বিপবীত দিকে ধাবিত হল। গৃহস্বামীব প্রাণবক্ষা হল। সমাজবক্ষাব জন্য—সুবিধা অসুবিধাব দিক্ দিয়ে—বিচাব কবি ন্যায অন্যায়, সত্যমিথ্যা ঠিক কবি, আইন কবি। হৃদয়েব যুক্তি ঐ বকম সত্যমিথ্যাব পাবে। লৌকিক হিসাবে, তপস্বী মিথ্যা কথা বলেছেন জেনেশুনে, সুতবাং তাঁব অধর্ম্ম হয়েছে। হৃদয কিন্তু, নির্দ্দোষ আর্ত্ত শবণাগতকে বক্ষা কবাই ধর্ম্ম বলবে। তপস্বী ধর্ম্মেব পথই নির্দ্দেশ কবেছেন আচবণ দ্বাবা। অবশ্য আব এক

অবস্থা আছে, যেখানে সাধু মৌন হয়ে থাকতে পাবতেন। যাই হোক্, বুদ্ধিব কসবতে সব সময়ে কায হয় না। বুদ্ধিব গবিমা, বিচাবেব মহিমা প্রচাব কবি, শ্রীশঙ্কবকেও টেনে আনি ও বলি "তিনি বিচাবেব মাহাত্ম্য দেখিয়েছেন।" বুঝি না যে, শ্রীশঙ্কবেব বিচাববুদ্ধি জগতটাকেই অস্বীকাব কবে, সংসাবকে মোহেব বন্ধন মনে কবে—আমাদেব দেহাভিমানেব বুদ্ধি তাঁব নয়। ভুলে যাই আমবা যে, হৃদয় মানে দেহাভিমানাতিবিক্ত বুদ্ধি—"আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" সাধনাব বীজ। দেহাভিমান-তাডিত স্বার্থপব বুদ্ধিব চালাকিতে কোন মহৎ কায হয় না। মন, সংস্কাবেব পুঁটলি, মন চঞ্চল—সংকল্প-বিকল্পাত্মক। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি—এই পাঁচ উপকবণ নিয়ে আমবা বিচাব ক'বে সিদ্ধান্তে আসি। ইহাই আমাদেব বিদ্যা-বুদ্ধি বা জ্ঞান। জ্ঞান ও সংস্কাবেব নাম চিত্তবৃত্তি, সুতবাং আমাদেব বুদ্ধি—দেহাভিমানী বুদ্ধি। মহামানব—বিবেক-বুদ্ধি অর্থাৎ স্বৰূপ উপলব্ধি ক'বে—নির্লিপ্ত দ্রষ্টাব বুদ্ধি অবলম্বন করেন। সর্ব্বগত অহংই বুদ্ধিতত্ত্ব। প্রত্যেক পদার্থেব স্বাতন্ত্র্য আছে। সকল স্বাতন্ত্র্যেব কেন্দ্রস্থান, ঐ অহং বা আমিত্ববুদ্ধি—সর্ব্বপ্রকাব জ্ঞান বা বুদ্ধিব মূল স্থান। কেন্দ্রস্থান ব'লেই ঐ আমিত্ববুদ্ধিব দৃষ্টিতে সকল স্বাতন্ত্র্যেই বিবেকীব সমত্ব বোধ আসে—সমদর্শীত্ব দেখা দেয়। এই সর্ব্বত্র আত্মবৎ জ্ঞানই প্রেম বা পবমধর্ম্ম।

ধর্ম্মেব উদ্দেশ্য, সকল বকম সংস্কাবকে অতিক্রম কবা। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—দুইই সংস্কাব। ভগবৎ চিন্তা, মহাপুরুষ চিন্তা, উপাসনাদি অনুষ্ঠান—সমস্তই সংস্কাব, কিন্তু এই সংস্কাবগুলি চিত্তেব স্থিবতা আনায়, বুদ্ধিকে মার্জ্জিত কবে, জীবনে পবিত্রতা আনায়, তাই ঐগুলি বিদ্যাব সংস্কাব। বিদ্যা-সংস্কাবেব সাহায্যে অবিদ্যা-সংস্কাব দূব হ'লে, ঐ উভয় সংস্কাবকে অতিক্রম কবতে হয়। যদি বিবেকীব বিবেককে ও একটি সংস্কাব বলা যায়, তা হলে সে সংস্কার দগ্ধ-সূত্রবৎ, তাতে বন্ধন আসতে পাবেনা। ব্যবহাবিকে, 'অপব ধর্ম্মেব' উদ্দেশ্য, 'পবম ধর্ম্ম' লাভ কবা ও সর্ব্বসংস্কাব হ'তে বিমুক্ত হয়ে সত্যস্বরূপ হওয়া। বেদোক্ত ধর্ম্ম, উপনিষদোক্ত ধর্ম্ম, পুবাণোক্ত ধর্ম্ম, তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম, এই রকম ধর্ম্ম শব্দেব বিভিন্ন প্রয়োগ আছে, সেই বকম সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম ইত্যাদি, ধর্ম্মেব কল্পিত নামভেদ মাত্র সাধনপথে, সাধকের আচরণ বা আচারের পার্থক্য-জ্ঞাপক মাত্র। এই আচাব-ভেদের কারণ রুচি, প্রকৃতি ও

মানস-অধিকার বা গ্রহণ-সামর্থ্য। ধর্ম্ম একটি মানস ব্যাপার। সুতরাং মনমুখ এক ক'রে অর্থাৎ হৃদয় দিয়ে যিনি যে কোন উপায় অবলম্বন করুন না কেন, তাঁর মন কোন একটি বিষয়ের একাগ্র চিন্তার ফলে একাগ্রভূমিকায় আরূঢ় হলে, তিনি সত্যলাভ করবেন ইহা স্থির নিশ্চয়—সকল দেশের সকল মহাপুরুষগণই ইহার প্রমাণ। সত্যই সকল ধর্ম্মের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু, কারণ সত্য স্বতঃসিদ্ধ নিত্য বর্ত্তমান। শ্রীরামকৃষ্ণ জগদম্বাকে সবই অর্পণ করেছিলেন, কিন্তু 'মা এই নাও তোমার সত্য' বলতে পারেন নি বা বলেন নি; নিত্য-বর্ত্তমানের অর্পণ হয় না, ভগবান সত্যস্বরূপ। আমরা যে গুলিকে সত্য বলি, সে গুলি দেহমনাভিমানের সত্য—জাগতিক সত্য। যখন আমরা মাথা দিয়ে সত্যকে বুঝতে চেষ্টা করি, তখন সত্য ভাবরূপে অথবা বাস্তবরূপে বোধহয়। এইজন্য, সকলের অভ্যুদয়পথ উন্মুক্ত রাখা কেবল নয়, পরন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে পরস্পরে পরস্পরকে সাহায্য করতে অগ্রসর হওয়াই ধর্ম্ম; প্রত্যেকটি ধর্ম্মাচার যা অপর কোন ধর্ম্মাচারকে আঘাত করেনা বা মনকে সংকীর্ণ ও প্রেমবর্জ্জিত করেনা তাহাই ধর্ম্ম, যে কোন কর্ম্ম হৃদয়কে বিশাল করে তাহাই ধর্ম্ম; যে কোন কর্ম্ম স্বার্থ-তাড়িত না হয়ে সমষ্টির কল্যাণে প্রযুক্ত হয় তাহাই ধর্ম্ম; এই রকম, যে কোন প্রতিষ্ঠান—সে প্রতিষ্ঠান সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানই হোক্ বা জাতীয় প্রতিষ্ঠানই হোক—অপর কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করেনা, বরং আবশ্যক হ'লে সাহায্য করে—সেই উদার হৃদয়বান প্রতিষ্ঠানকে আপন জ্ঞান করা, সমাদর করা ও শ্রদ্ধা করাই ধর্ম্ম। তদ্বিপরীতই অধর্ম্ম, ঐসকল ধর্ম্মলক্ষণের বিপরীতই অধর্ম্ম লক্ষণ। সত্যের আদর্শ-বিচ্যুতিই অধর্ম্ম।

'ভাব' অনুভূয়মান সত্য। ইহার প্রকাশ বস্তুসাপেক্ষ—সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া বস্তু সাপেক্ষ। ক্ষুধার সময় খাবার জিনিষ দেখলে আনন্দ হয়; সেই হর্ষ মুখে চোখে প্রকাশ পায়। 'ভাব' বস্তুর পরিচায়ক। 'ভাব' ভিন্ন কোন বস্তুর প্রত্যয় হয় না। 'ভাব'ই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের মূল হেতু। প্রত্যয় বিনা কোন জ্ঞানই সম্ভব হয় না। সেই জন্য সাধনার দ্বারা যে ভাব দৃঢ় হয় তাকে শ্রদ্ধা করাই ধর্ম্ম। কারোর ভাবে আঘাত করতে নেই। ভাবে আঘাত করাই অধর্ম্ম।

অনন্ত ভাবময় ভগবানের 'ইতি' করা যায় না। 'ইতি' করতে যাওয়াতেই আসে সাম্প্রদায়িকতা। 'বাদ' ও 'আচার' জটিল মানবমনের অবশ্যম্ভাবী ফল। এইটি বুঝে আমাদের বৃথাবিবাদে শক্তি ক্ষয় নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে দরকার। এই রকম বৃথা কলহে ধর্ম্মের নামে বহু রক্তপাত হয়েছে ও হচ্ছে। বৃথা উৎপাৎ, বৃথা রক্তপাত অভ্যুদয়ের প্রতিকূল, সুতরাং অধর্ম্ম।

ভাব ও বাস্তবের মধ্যে ভাবই প্রধান, বাস্তবের মর্য্যাদা ভাবের জন্যই। প্রকৃতি অনুসারে, সত্যকে আমরা নানা ভাবে গ্রহণ করি। আমাদের সংস্কার অনুযায়ী যদি সত্যের শ্রেণীবিভাগ করা যায়, তা হ'লে আমরা নিম্নতর সত্য হ'তে উচ্চতর সত্যে অগ্রসর হচ্ছি স্বীকার করতে হয়—মিথ্যা হ'তে সত্যে যাচ্ছি না। ভাব ও ভাবোচ্ছ্বাস বা ভাবপ্রবণতা এক জিনিষ নয়। ভাব-প্রবণতা সব সময়ে অভ্যুদয়ের জন্য কর্ম্ম-প্রবণতা আনায় না, বরং অধিকাংশ স্থলে ঐ রকম পুরুষকার ভেদবুদ্ধি আনায়। ভেদবুদ্ধি ও সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বিপরীত-ধর্ম্মী। ভেদবুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ ক'রে, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা (Equality, Fraternity, Liberty) অথবা Equality and Brotherhoodএর বুলি নিরর্থক। এ প্রকার ভাব-প্রবণতায়—ভাব-প্রবণতার জন্যই—একটা দৃঢ়তা বা গোঁ-থাকতে পারে, কিন্তু সেখানে হৃদয়ের অভাব, তার, ফল হয় ধর্ম্মান্ধতা বা গোঁড়ামি। সাম্প্রদায়িকতার বিষ কম বেশী সমস্ত ধর্ম্মে প্রবেশ করেছে, তাই সর্ব্বত্র ধর্ম্মবিপ্লব। এই বিপ্লব রোধ করতে হলে ধর্ম্মকে মূল 'ভাব' বা 'তত্ত্বের' উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মুসলমান বা খৃষ্টান ধর্ম্মের ন্যায় যে সমস্ত ধর্ম্ম ব্যক্তি-প্রভাবের উপর ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠিত, মনে রাখতে হবে যে, সেই সব ব্যক্তি সত্যেরই অভিব্যক্তি মাত্র—সত্যময় জীবনের জন্যই তাঁদের পূজা, তাঁদের পবিত্র শরীররূপী আধারের মধ্য দিয়ে তত্ত্বের প্রকাশ হয়েছে—ভাবমুখেই তাঁরা সত্য প্রচার করেছেন।

ভারতে ধর্ম্মের নামে জাতি—ভগবৎপথে আগুয়ান এক একটি সম্প্রদায়। রাজনৈতিক চালে এই সব সম্প্রদায়কে খণ্ড খণ্ড 'নেশনের' রূপ দেওয়া হচ্ছে। ধর্ম্মকে রাজনীতির কবলে ফেলা হচ্ছে। আমাদের বুঝতে হবে যে যখন ধর্ম্মের নামে জাতি, তখন সকলকে ধার্ম্মিক

হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রত্যেকের প্রত্যেককে সাহায্য করতে হবে, যার যা সাধনাচার সম্পূর্ণ বজায় রেখে ব্যবহারিকে সাম্য আনতে হবে।

ধর্ম্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা-বিষ অপেক্ষা ব্যাপক বিষ, প্রাদেশিকতা (Provincialism)। ইহাতে জাতিরূপ 'পরিবার-বোধের' মূলে আঘাত দেওয়া হয়। সমগ্র পাশ্চাত্য এক খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী হ'য়েও, বহু সম্প্রদায় সত্ত্বেও, প্রাদেশিকতার জন্য প্রত্যেক খৃষ্টান দেশ আজ আপন আপন দেশের তলায় নিজেরাই মহাবিস্ফোরক স্থাপন করেছেন। ইহা দেখে প্রাদেশিকতা সম্বন্ধে সাবধান হ'তে হবে।

বহু বিভেদ সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের সকল দেশের শিক্ষার মধ্যে উদ্দেশ্যের একতানতা আছে। ঐ একতানতার জন্যই ওসব দেশে জড়-বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি। সেই রকম, সমগ্র ভারতে শিক্ষার মধ্যে একতানতা ও একটি ধারা চাই। শিক্ষার সার্থকতা তখনই দেখা দেবে যখন দীন, দুঃখী, দরিদ্র, নিপীড়িতদের জন্য ঐ বৃহৎ পরিবার কার্য্যকরী উপায় অবলম্বন করবেন। ঐ বুভুক্ষু, নিপীড়িত ও বেকাররাই ভারতের সংখ্যা-গরিষ্ঠ জাতি। ইহা ভোগবাদের কৃত্রিম সংখ্যা-গরিষ্ঠ বা সংখ্যা-লঘিষ্ঠের সমস্যা নয়। ধোলো বিদ্যায় শিক্ষিতেরাই আজ সংখ্যা-লঘিষ্ঠ। কিন্তু এই লঘিষ্ঠেরাই জনসাধারণকে ঠিক্ পথে পরিচালন করতে সক্ষম। তাঁদের আছে শিক্ষা, বুদ্ধি ও প্রতিভা, আর, তাঁদের মধ্যেই বেকার জীবনে অভাবের তাড়না বেশী। আজ তাঁদের মধ্যেও—মধ্য বিত্তদের মধ্যে—অন্নবস্ত্র-সমস্যা তীব্র। বর্ত্তমানে ভারতে যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নেই, সে সাম্প্রদায়িকতার কারণ ধর্ম্মবিদ্বেষ নয়, তার মূলে আছে রাজনৈতিক চাল্ ও ধনবাদের কৌশল, ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মাচারকে ও ধর্ম্মাচারভুক্ত সম্প্রদায়কে ঐ 'চাল' খাটিয়ে নিচ্ছে নির্ম্মম ভাবে। এই রকম বিবাদে হিন্দু-মুসলমানের অন্ন-সমস্যার মীমাংসা হবে না, দরিদ্র ভারতবাসীর দারিদ্র্য ঘুচবেনা। ধর্ম্ম-বিজ্ঞানে হিন্দুর উদারতা প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান হিন্দুর সমাজ দুর্ব্বল ও অনুদার, যদিও এখন হিন্দু নিজের ঘর সামলাবার চেষ্টা করছেন। হিন্দু কোন ধর্ম্মকে মিথ্যা বলেন না, সব মহাপুরুষেরই হিন্দুর শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু সমাজের অবস্থা প্রত্যক্ষ। মুসলমান সমাজে Equality ও Brotherhood

এব ভাব প্রবল, নানা ভেদ সত্বেও, স্ব-সমাজেব মধ্যে প্রত্যেকেব ঐ বোধ পবিস্ফুট। যদি তাঁবা ঐ বকম চালবাজীতে মাৎ হয়ে যান, তাঁদেব মূল ধর্ম্মনীতি—ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য (Equality ও Brotherhood) কালে বিপর্য্যস্ত হবে, তাঁদেব ধর্ম্মনীতি অন্য নীতিব দাস হয়ে যাবে। হিন্দু যদি ঐ 'চালেব' মধ্যে আপনাকে ধীব ও স্থিব বাখতে না পাবেন, যদি স্ত্রীশূদ্রেব বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা উন্নত কবতে না পাবেন, হিন্দুব দুর্ব্বল সমাজ কালে বিধ্বস্ত হবে। এই বিবোধকে প্রতিহত কবা—হিন্দু ও মুসলমান—উভয়েবই ধর্ম্ম। "এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও," ইহাই প্রত্যেক ভাবতবাসীব ধর্ম্মনীতি। 'এগিয়ে যাও'—প্রগতি, অগ্রগতি—সর্ব্ব-দিকে এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, নিজেব প্রাপ্য ববণ ক'বে নাও—'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য ববান্নিবোধত'—ইহাই বর্ত্তমান ভাবতেব ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মাচবণে পবস্পবেব সাহায্য চাই। সেবা-ধর্ম্ম চায় ত্যাগ-শক্তিব বিকাশ। দুর্ব্বলেব উদাসীন ভাব, দুর্ব্বলেব উপেক্ষাব ভাব—ধর্ম্ম নয়, উহা—জড়ত্ব। চাই মহাবজোগুণেব বিকাশ, চাই স্বার্থবলি—কামিনী-কাঞ্চনেব উপব প্রভুত্ব স্থাপন। কামিনী-কাঞ্চনেব কোন প্রলোভনেই যেন অগ্রগতিব পথ রুদ্ধ না হয়। চাই বিশ্বজয়েব সিংহনাদ, চাই বীবেব হর্ষধ্বনি, চাই সপ্রেম সহযোগিতা—পবমুখাপেক্ষিতা নয়। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—ইহাই ধর্ম্ম।

নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম সকলে কবতে পাবেন না। সত্বগুণী ব্যক্তিবাই নিষ্কাম কর্ম্মেব অধিকাবী, পবমধর্ম্ম বা মোক্ষেব তাঁবাই অধিকাবী যাঁবা কায়মনোবাক্যে নিষ্কাম। "কর্ম্মণা মনসা বাচা যঃ কর্ম্ম নিবতঃ সদা। অফলা কাঙ্ক্ষচিত্তো যঃ স মোক্ষমধিগচ্ছতি"। (শাক্তানন্দতবঙ্গিনী—১মউ.)। সকাম সাধক চান ইহলোকে সুখ বা ঐহিক সম্পদ এবং পবলোকে উত্তম গতি বা সুখ। সৎ গৃহস্থেব জন্য বেদেব কর্ম্মকাণ্ডে ধর্ম্ম উপদিষ্ট হয়েছে। মীমাংসাশাস্ত্র ঐ ধর্ম্মেব স্বরূপ, প্রমাণ ও ফল ব্যাখ্যা কবেছেন, মোক্ষধর্ম্মেব উপদেশ আছে উত্তবমীমাংসায় বা বেদান্তে। সকাম কর্ম্মকাণ্ডে ব্যাপক মোক্ষধর্ম্মেব কথা আলোচিত হয় নি। মীমাংসাশাস্ত্র মতে, ধর্ম্ম ক্রিয়ামূলক, কাবণ, ক্রিয়াপদেব দ্বাবাই বিধিবাক্যেব অর্থ নিরূপিত হয় (মীমাংসাদর্শন ১ম অ, ১ম পা ২৫ সূত্র)।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ—ইহাই হিন্দুর ধর্ম্ম। মুসলমান ধর্ম্মে পরমধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্মের কথা আছে, অন্য ত্রিবর্গের কথায় জোর দেওয়া ত আছেই। যিশুর ধর্ম্ম—নির্ব্বের বা মোক্ষধর্ম্ম—এক গালে চড় মারলে আর এক এক গাল পেতে দেবে। হজরৎ মহম্মদ ও তাঁর অনুবর্ত্তী শিষ্যগণের জীবনাদর্শ হ'তে আজ মুসলমান ভ্রাতারা দূরে পড়েছেন। খোলোর আছে আংশিকভাবে মীমাংসকের ধর্ম্ম। শুধু প্রবল রজোগুণের বিকাশ চিরস্থায়ী নয়। ইহা শেষে ধ্বংস আনায় বা ধ্বংসমুখী করে। ইহা অশান্তি, অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের জনক। খোলো-সভ্যতা ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। চাই সত্বগুণ স্পর্শ, কিন্তু ইহাও ঠিক যে মহারজোগুণের বিকাশ ভিন্ন সত্বগুণ লাভ হয় না। অতএব সত্বগুণ অর্জ্জনের জন্যই—উদ্দেশ্য ঠিক্ রেখে—রজোগুণের বিকাশ চাই। ইহাই অভ্যুদয়ের পথ। হিন্দু-সমাজ আজ এই অভ্যুদয়ের পথ ভুলে আছেন। হিন্দু কেবল "শেষের সে দিনের" চিন্তায় বৌদ্ধযুগ হ'তে নিজেকে নিমগ্ন রেখে জড়বৎ অকর্ম্মণ্য হয়ে বর্ত্তমান প্রতিদ্বন্দ্বীতা-সংগ্রামে সর্ব্বদিকেই পরাজিত হচ্ছেন! ইহাও প্রত্যক্ষ। বৌদ্ধগ্রন্থে একটি গল্প আছে। বুদ্ধদেবের সঙ্গে এক তাঁতির মেয়ের দেখা হয়। তিনি উপদেশ দেন "মৃত্যুর মত নিশ্চিত সত্য আর নেই, তুমি মৃত্যু চিন্তা কর, সেই চিন্তাই তোমাকে নির্ভীক করবে।" এই উপদেশ, অধিকারী হিসাবে ব্যক্তিগত উপদেশ; কিন্তু এই উপদেশই সাধারণ ভাবে গৃহীত হয়ে সমাজে স্থান পেয়েছে। ঐ উপদেশে মেয়েটিকে নির্ভীক করেছিল, আর হিন্দু-সমাজ 'অচলায়তনে' পরিণত। গীতায় অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের প্রথম উপদেশ—চতুর্ব্বর্গ সাধন; দ্বিতীয় উপদেশ, "হৃদয় দৌর্ব্বল্য ত্যাগ কর, ওঠ, লড়, যশ লাভ কর"; তৃতীয় উপদেশ—নির্ব্বের সাধনের বা মোক্ষধর্ম্মের। অভ্যুদয় ও মোক্ষ—এই উভয় ভাব গ্রহণ ভিন্ন ধর্ম্মের পূর্ণতা আসে না। জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ—এই তিন মার্গ মোক্ষ-ধর্ম্মের। মোক্ষ-ধর্ম্মের এই বিশেষত্ব অন্য কোন দেশের ধর্ম্ম-বিজ্ঞানে নেই। হিন্দুর এই ধর্ম্ম-বিজ্ঞান অত্যন্ত উদার, অত্যন্ত ব্যাপক, কিন্তু হিন্দুর বর্ত্তমান সমাজ-জীবন ঠিক্ ইহার বিপরীত। ছুৎমার্গ ও উচ্চবর্ণের আধিকারিক দাবি অধিকাংশ হিন্দুকে পদদলিত ক'রে রেখেছে। হিন্দু-সমাজের সঙ্গে সহানুভূতির অভাবে, হিন্দুর সমাজ-

জীবনে পৌরোহিত্যের এই অত্যাচার বন্ধ করতে বা নির্ম্মূল করতে দিগ্বিজয়ী মুসলমান-সভ্যতাও পারেন নি।

পুরুষকার অভ্যুদয় আনায়, কিন্তু কালাপাহাড়ী-পুরুষকারে ভেদই বর্দ্ধিত করে, চেঙ্গিস্থাঁর পুরুষকারে ধ্বংসই আনায়। গঠনমূলক কর্ম্ম হয় প্রেম ও সহানুভূতিতে। জগতের সঙ্গে আদান প্রদানে যদি ঐ দুই গুণকে কার্য্যকরী করা যায়, নতুন মানব-সমাজের জন্ম অবশ্যম্ভাবী। আত্মরক্ষার জন্য ও রজোগুণের প্রলয়ঙ্করী উন্মত্ত গতিকে রোধ করবার জন্য খোলোর দরকার অভ্যুদয়ের সঙ্গে মোক্ষধর্ম্ম গ্রহণ করা। 'সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব' কার্য্যকর হয়ে আবদ্ধ আছে মুসলমানের স্ব-সমাজের গণ্ডীতে। আত্মরক্ষার জন্য মুসলমানের দরকার, প্রেমধর্ম্মকে ব্যাপকভাবে সমাজে কার্য্যকর করা। হিন্দুকে দেখে মুসলমানের শিক্ষা হওয়া উচিৎ অর্থাৎ মুসলমানকে মুক্ত হ'তে হবে পৌরোহিত্যের (মোল্লার) অশিক্ষা হ'তে। সূতিকা-গৃহ হ'তে নারী-নির্য্যাতন সুরু ক'রে নারীর অধিকার হরণ করা এবং দরিদ্র-পেষণ ও তাদের হীন ক'রে রাখা পর্য্যন্ত সর্ব্ব প্রকার হীনবুদ্ধি হিন্দুকে প্রথম ছাড়তে হবে। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি-হীন অবশ্য-শিক্ষা প্রচলিত হওয়া দরকার, খোলোর অভ্যুদয়-উপায় গ্রহণ করা ও আত্মস্থ করা দরকার। এই রকম আদান প্রদানের ফলে, বিরাট মানব-সমাজের অন্তর্গত বহু জাতি ও ঐ সব জাতির নিজ নিজ সমাজ থাকতে পারে। যদি চিন্তার স্বাধীনতা থাকে—বিরাট মানব-সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন যন্ত্রগুলির সমঞ্জস-ক্রিয়া থাকে—তা হলে প্রত্যেক সমাজ বা গোষ্ঠি আপন আপন আদর্শ বজায় রেখে চলতে পারবেন। এই আদর্শকে বর্ম্ম-পরিণত করবার জন্য উদ্যম করাই বর্ত্তমান মানব-ধর্ম্ম।

জাতি ও সমাজ—১

জাতি—যাহা জাত হয়—বিভিন্ন কর্ম্মসংস্কারের সংযোগে নানা প্রকার জাতির উদ্ভব হয়। মানুষের মধ্যে বিভিন্ন গুণ-সংযোগে নানা রুচি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট মানুষ দেখা যায়। যাদের নিয়ে জাতি হয় তাদের নাম ব্যক্তি। সমরুচি-ও-প্রকৃতি-বিশিষ্ট মানুষ একত্রিত ও পৃথক হয়ে এক একটি

স্বতন্ত্র জাতি হয়। এই একত্রিত হওযাব নাম সংহত-শক্তি। জাতি একটি সংহত-শক্তি। সংহত-শক্তিব মূল, প্রয়োজন-বোধ। এই বোধ উজ্জীবিত না হলে সংহত-শক্তি আসে না। নানাবিধ কর্ম্মেব নানা রুচি ও প্রকৃতিব জন্যই আসে প্রয়োজন-বোধ। নানা প্রকাব কর্ম্ম, রুচি ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত কবা ও সংযত বাখাই সংহত-শক্তিব কাজ। ঐ শক্তিব আব একটি কায—কর্ম্মেব শ্রেণী বিভাগ ও যোগ্যতা অনুসাবে কর্ম্মী নির্ব্বাচন; অতএব দবকাব হয়ে পড়ে গুণকর্ম্মানুসাবে বর্ণ বিভাগ। এই বিভাগে জন্মগত অধিকাববাদেব বা পূর্ব্বাপবেব প্রশ্নই উঠতে পাবে না। কর্ম্ম ও কর্ম্মীব পবিশ্রমফল ভোগ কবে সংহত-শক্তি, সুতবাং সংহত-শক্তিব প্রয়োজন হয় ঐ পবিশ্রম লব্ধ ফলকে বক্ষা কবা। এই সংবক্ষণ-বৃত্তিই ক্ষাত্র-বৃত্তি।

ধোলো মনীষীবা মাথাব খুলি, বঙ্ ইত্যাদি বহির্মুখী লক্ষণ নিয়ে মানবেব জাতি নিরূপণ কবেছেন। তাঁদেব মতে মূল জাতি ৫টি—(১) ককেসিয়ান, (২) মঙ্গোলিযান, (৩) নিগ্রো, (৪) আমেবিকাব বেড্ ইণ্ডিয়ান। বেড্ ইণ্ডিয়ানদের তাঁবা পৃথক স্থান দিয়েছেন। প্রধানতঃ সাদা, কালো, হলদে, তামাটে, লাল প্রভৃতি বঙ্ ও মাথাব খুলি দেখে তাঁবা ঠিক কবেছেন যে, ইণ্ডো-ইউবোপিয়ান ও সেমিটিকবা ককেসিয়ানদেব অন্তর্গত। ইণ্ডো-ইউবোপিয়ান ও সেমিটিকদেব বিভিন্ন নাম—নর্ডিক, আইবিবিয়ান, আলপাইন; ইবানীয মিড্, পাবস্যজাতি, গ্রীক, বোমান্ প্রভৃতি জাতিবা ইণ্ডো-ইউবোপিয়ান। ইতিহাস প্রমাণ কবে আজ যে, ঐ সব জাতিবা কেহই মূল জাতি নয়—সবই মিশ্র জাতি।

সমাজই পবিণত হয় জাতিতে। ঐ সব পণ্ডিতেবা প্রমাণ কবেছেন—ইতিহাস হ'তে দেখিয়েছেন যে, Family বা পাবিবাবিক জীবনেই সমাজেব বীজ নিহিত। পাবিবাবিক জীবনই সমাজ-জীবনেব শিক্ষাগাব। সাধাবণতঃ স্ত্রী পুরুষ ও সন্তান সন্ততি নিয়ে একস্থানে বাস হলেই, সেটি হয় একটি পবিবাব; অনেকগুলি ব্যক্তি সেখানে একজনেব অধীন। অনেকগুলিব একত্রে একটি—এই সমষ্টিজ্ঞান আসে পাবিবাবিক জীবন হ'তে প্রথমে। একই বংশেব কতকগুলি পবিবাব-সমষ্টিব নাম clan বা দল; কিন্তু clanএ সমাজ বন্ধন স্ফুরিত হয় নি। clanএ মাত্র ঐক্যবোধ ও ব্যক্তিব উপব দায়িত্ব বোধ এসেছে। কতকগুলি clan একজন দলপতিব অধীনে চালিত হলে,

তার নাম হয় ট্রাইব (tribe)। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ট্রাইব, পারিবারিক-জীবন গঠিত হবার পূর্ব্বে ও ছিল। ট্রাইবে থাকে, সাধারণ ভাষা ও শাসননীতি এবং সকলেই একই উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে কায করে, যেমন যুদ্ধাদির সময়ে। ট্রাইব হ'তেই বর্ত্তমান বৃহত্তর সমাজ-জীবন এসেছে। প্রথম প্রথম পারিবারিক-জীবনে ব্যক্তির কোন মর্য্যাদা ছিল না। বর্ত্তমান সমাজে ব্যক্তির মর্য্যাদা সম্পূর্ণ স্বীকৃত।

মানুষ একসঙ্গে থাকতে ভালবাসে। আহার্য্যের অন্বেষণ ও আত্মরক্ষার ইচ্ছা মানুষকে একত্র করে। মানুষের বাধা বিঘ্ন দূর করবার নতুন নতুন কৌশল, মানুষের নানা দিকে বুদ্ধির প্রয়োগ, মানুষের সুখ-সৌন্দর্য্য-বোধ আদি হ'তে সমাজ-জীবন পরিণত হয় সভ্য-জীবনে ও সভ্য-জীবনই পরিণত হয় জাতিতে। সমাজের লক্ষ্য—ব্যক্তির উন্নতি। যোরোপ জন্ম হ'তেই ব্যক্তি-তান্ত্রিক, সুতরাং Nation বা জাতি অর্থে বোঝায়, (১) রাজনৈতিক ঐক্যবোধ (Political consciousness and political unity), (২) ক্ষমতা প্রয়োগের সামর্থ্য। যোরোপজীবনে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বক্ষেত্রে ঐ দুইটি প্রধান। ব্যক্তিহিসাবে যোরোপের ক্ষমতা-প্রয়োগের নাম Right বা 'অধিকার', যেমন conjugal right = বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই সহবাসের দাবি থাকে। যোরোপের ব্যক্তিজীবন নিজের জন্য। একই রকম সভ্যতা, ধর্ম্মবিশ্বাস, আচার-ব্যবহার, ভাষা, ও সাহিত্য ছাড়া যোরোপের Nationএ থাকা চাই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্বার্থ; ইহার জন্য যে সংহত-শক্তি বা শাসনযন্ত্রের প্রয়োজন হয় তার নাম গবর্ণমেণ্ট বা রাজ্যশাসনযন্ত্র। শাসন-যন্ত্রের পরিবর্ত্তন হ'তে পারে—এক দলের হাত হ'তে অন্য দলে গবর্ণমেণ্ট যেতে পারে, কিন্তু একটি জিনিষের পরিবর্ত্তন হয় না, সেটির নাম 'State'—'গণ' বা peopleএর সমগ্র ইচ্ছাশক্তি। গবর্ণমেণ্ট একটি যন্ত্রমাত্র, State, ঐ যন্ত্রের প্রাণ ও নিয়ন্তা। গবর্ণমেণ্ট ষ্টেটের একটি বিশেষ অঙ্গ—ষ্টেটের অধীন। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ব্যক্তির দাবি (rights) থাকতে পারে, নালিশ ক'রে, ব্যক্তি আপন অধিকার সাব্যস্ত করতে পারে, কিন্তু ষ্টেটের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। ষ্টেট্ একটি 'ভাব' মাত্র, গবর্ণমেণ্ট বাস্তব। ঐ ভাবকে রূপ দেবার যন্ত্রই গবর্ণমেণ্ট। গণ বা people অর্থে—একটি 'বর্গের' বা অনুজাতির ভাব (racial

concept)। ঐ ভাবের সঙ্গে রাজনৈতিক-ঐক্যবোধ যুক্ত হ'লে তার নাম হয় nation বা জাতি। নেশনের রাজ্য বা সাম্রাজ্য চাই। সেই রাজ্যের অধিবাসীবৃন্দই people বা 'গণ'। রাজ্যাধিপতির নাম রাজা। ফ্রান্স ও আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ষ্টেটস্ গণদ্বারাই শাসিত হয়। ইংলণ্ডের রাজা, গণ-নির্ব্বাচিত পার্লামেণ্টের ইচ্ছায় নিজনামে রাজ্যশাসন করেন। পণ্ডিতদের মতে, নেশন অর্থে বোঝায়, (১) যারা স্বাধীন রাজ্য উপভোগ করে, অথবা (২) যাদের স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা আছে। ধোলোর সভ্যতা নাগরিক। সভ্যতা বা civilisationএর মূল অর্থই নাগরিক। সভ্যতার বিস্তারে হয় প্রজারা সভ্য। এই সভ্য প্রজাই citizen (সিটিজেন)। শাসনযন্ত্র গবর্ণমেণ্টের হাতে, গবর্ণমেণ্টের অধীনে প্রজাদের একাধিক ধর্ম্মবিশ্বাস থাকতে পারে। বর্ত্তমান যুগে, গবর্ণমেণ্ট সকল ধর্ম্ম-বিশ্বাসে স্বাধীনতা প্রদান করেন। কিন্তু রাজ্যাধিপতির (রাজার) ধর্ম্মবিশ্বাসে অথবা বিবাহে স্বাধীনতা নেই। ইংলণ্ডের রাজাকে প্রোটাস্‌টাণ্ট হ'তেই হবে, কারণ ষ্টেটের ধর্ম্মনীতি প্রোটাস্‌টাণ্ট। স্বাবলম্বী ও প্রায় সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি ষ্টেট্ নয়, ঐগুলি ষ্টেটের বহির্নীতির (Foreign Policyর) অন্তর্গত। ইহার নাম 'কমনওয়েল্‌থ' (Common Wealth)। পার্লামেণ্ট-দত্ত অধিকারে উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা। ভারত ষ্টেট নয়। অতএব, ভারতের Native States (দেশীয় রাজ্যগুলির) State শব্দটির প্রয়োগ ভ্রমাত্মক, এই রকম Secretary of Statesএর State শব্দটিও মনভোলানো একটি কথা মাত্র বলা যেতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধের সময়, ভারতে প্রচার করা হয় যে ইংলণ্ড একটি Muslim power বা মুসলিম-শক্তি, কিন্তু ঐ power ব্রিটিশ ষ্টেটের তথা গবর্ণমেণ্টের অধীন—স্বাধীন নয়। যাই হোক্, হিন্দু জাতিকে নেশন বলা যায়, কারণ, (১) এই জাতির মধ্যে বহু উপজাতি বাস করেন, (২) এই জাতি নিজেদের নেশনে ব'লে আবহমানকাল বিশ্বাস করেন, (৩) বর্ত্তমানে তাঁরা স্বাধীনতাকামী। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সকলেই ঐ রকম স্বাধীনতাকামী কি না তার প্রমাণ এখনও সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নি। তবে মুসলমানের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বরূপ ধর্ম্মনীতি সকলের স্বাধীনতা চায়। বাঙ্গালী মুসলমানদের বিশেষত্ব এই যে, তাঁদের মধ্যে

অনেকেই সমগ্র ভারতকে একটি নেশনরূপে দেখতে চান। স্বাধীনতা অর্জ্জনে গণচেতনার জন্য চেষ্টা চাই, চাই গণ-দারিদ্র্য দূর করবার উপায় অবলম্বন। দেশ স্বাধীন হলেই দেশ ষ্টেট হয় না। পোলাণ্ড স্বাধীন দেশ, কিন্তু ষ্টেট নয়, পোলাণ্ডের বহির্নীতি, স্ববলে অপর কোন ষ্টেটের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ নয়। বর্ত্তমানে 'নেশন' কথাটির আরো ব্যাপক অর্থ দেবার চেষ্টা চলেছে, শুধু বংশধারা, রক্তের সম্পর্ক, ধর্ম্মবিশ্বাস, ভৌগলিক সংস্থান ও তজ্জনিত স্বার্থের উপর জোর দিয়ে সানাচ্ছে না।

এই ত গেল ধোলো হিসাবে রাজনৈতিক চেতনার দিক্ দিয়ে জাতি ও সমাজের মোটামুটি ইতিবৃত্ত। প্রাচীন ভারতের বা হিন্দুর, জাতি ও সমাজের ইতিবৃত্ত অন্যরূপ। ধোলোর বিচারপ্রণালী অনুলোমক্রমে (Analytical), হিন্দুর বিলোমক্রমে (synthetical)। মানবের দৈবোৎপত্তির কথা আমরা পূর্ব্বে বলেছি। 'Sudden variation', 'Mutation Theory'—হিন্দুর ঐ মূল নীতির বা ক্রমের বিরোধী নয়। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে মানবের আকস্মিক আবির্ভাবও একটি বিচিত্র সৃষ্টি।

আমরা দেখেছি, বেদের একস্থানে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টি বা বিশ্ব প্রথমে ছিল অসৎ। দার্শনিক অর্থে অসৎ হ'তে সৃষ্টি হ'তে পারে না। সাধারণ অর্থে সৎ=যা আছে, যা বর্ত্তমান, যা দেখা যাচ্ছে, অসৎ=যা দেখা যাচ্ছে না, যা বর্ত্তমানে নেই। শতপথব্রাহ্মণ মতে 'অসৎ'=কর্ম্ম-সংস্কারযুক্ত বহু ঋষিরূপী প্রাণসমূহ। ভূতসমূহ (উপাদানগুলি) নিয়ে প্রাণই সর্ব্ববিধ অবয়ব গঠন করেন, কোন্ কোন্ উপাদানের সংযোগে কোন্ কোন্ কর্ম্মসংস্কারের ফল পাওয়া যায়, সেগুলির দ্রষ্টা বা ঋষি, প্রাণ। পূর্ব্বে উক্ত হয়েছে যে প্রাণশক্তিই পঞ্চপ্রাণরূপে ব্যক্ত হন। পঞ্চপ্রাণযোগে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় শক্তি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তি, মন, অহংকার ও বুদ্ধিতত্ত্ব—এই আঠারটির নাম লিঙ্গ বা করণশক্তি। এই লিঙ্গ অনাদি। সাংখ্য, পঞ্চপ্রাণ স্থানে পঞ্চতন্মাত্র বলেছেন মাত্র। কর্ম্মসংস্কারযুক্ত প্রাণশক্তির দ্বারা যা জাত হয় তার নাম জাতি।

[ব্যাকরণেও দেখি, ক্রিয়া-সাধনকে—যা ছাড়া কর্ত্তা ক্রিয়া সম্পাদনে অসমর্থ, তাকে 'করণ'কারক বলে]।

বিভিন্ন কর্ম্মসংস্কারের জন্য মানুষের মধ্যে বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হয়, আর বিভিন্ন কর্ম্মসংস্কারের মিশ্রণে জাত্যন্তর-পরিণামও হ'তে পারে। ভারতধারায় (১ম ভাগে) দেখাবার চেষ্টা হয়েছে, কি রকম কর্ম্মসংস্কার নিয়ে ভারতে মানবের আবির্ভাব হয়। সেই কর্ম্মসংস্কারের ধারা ভারতে আজও বর্ত্তমান। অন্যত্র প্রথম বর্ব্বরযুগ, মানুষ পশুবৎ ও অশান্ত; ভারতে প্রথম সমষ্টিবোধ, মানুষ তপঃপরায়ণ ও শান্ত; ওখানে Family life বা পারিবারিক-জীবন, ব্রহ্মচর্য্যভাবহীন, এখানে প্রথম অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্য (যেমন সনাতনাদি), ওখানে পারিবারিক জীবনে নারী পুরুষের ভোগযন্ত্র-স্বরূপ; এখানে নারী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী, ওখানে নারী পুরুষের সঙ্গিনী মাত্র, এখানে নারী পুরুষের সহধর্ম্মিনী; ওখানে একজন দলপতির অধীনে Family-সমষ্টি বা কোন ধর্ম্মনীতিবিহীন অধিকতর পরিপুষ্ট দল, এখানে পরিবার-সমষ্টির মধ্যে প্রতি পরিবারের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বজায় রেখে—প্রতি পরিবার-সমষ্টি এক একজন ঋষিচালিত—প্রতি পরিবারে ধর্ম্মনীতির শৃঙ্খলা। ইহা হ'তেই এখানে গোত্রের উৎপত্তি, ওখানে ব্যক্তির উপর দায়িত্ব, নিজ নিজ দলের মধ্যেই ঐক্য, এখানে সমষ্টির মঙ্গলের জন্য, সমষ্টি-সেবার জন্য দায়িত্ববোধ ও উপায় নানা হলেও, গোত্রের একই লক্ষ্য, ওখানে শারীরিক বল ও যুদ্ধকুশলতা দেখে দলপতি নির্ব্বাচন, উদ্দেশ্য—অধিকার স্থাপন; এখানে গোষ্ঠপতির প্রয়োজন—সমাজ-জীবনের মধ্যে, নানা ভাবের মধ্যে, সমঞ্জসক্রিয়া আনাবার ও সমঞ্জসক্রিয়া সাধনের জন্য; ওখানে এক একটি ট্রাইবের এক একটি পৃথক দেবতা, এক ট্রাইবের দেবতা অন্য ট্রাইবের উপর বিদ্বেষপরায়ণ, নিষ্ঠুর ও ক্রূর, ট্রাইবগুলি নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য—ক্ষমতা বিস্তার করবার জন্য—সতত বিবদমান, হৃদয়হীন ও নির্দ্দয়; এখানে নানা দেবতার, নানা ভাবের মীমাংসা 'একংসৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি', উদ্দেশ্য—ধর্ম্মজীবন, ধর্ম্মকে কার্য্যকর করা—মানবতার বিকাশ, ওখানে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্থাপনের জন্য নগর স্থাপন, এখানে ধর্ম্মরক্ষার জন্য আশ্রম স্থাপন, লক্ষ্য—ঋষিজীবন, ঋষিত্বলাভ; ওখানে নগরের আদর্শে পল্লীসংগঠন, এখানে আশ্রমের আদর্শে পল্লী সংস্থাপন; ওখানে সভ্যতার উৎপত্তিস্থান নগর, এখানে সভ্যতার উদ্ভব নগরেও নয়, পল্লীতেও নয়—এখানে সভ্যতার জন্মস্থান 'আশ্রম'—

সভ্যতার উদ্ভব ঋষিজীবন হ'তে, ওখানে citizen নাগরিক সভ্যতার কল—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে সদা সচেতন, এখানে প্রজা মানে citizen নয়, এখানে প্রজা মানে হিরণ্যগর্ভের বা প্রজাপতির সেবক; প্রজা, বিশ্বের সেবক—কোন ধর্ম্মভাবের বিরুদ্ধে প্রজা যেতে পারেন না। (প্রজাপতির আদর্শ কি তাহা ভারতধারায়—১ম খণ্ডে উক্ত হয়েছে)। সমদর্শীত্বই প্রজাপতির বৈশিষ্ট্য, প্রজা-জীবনে ঐ আদর্শকে পরিস্ফুট করবার জন্যই প্রজাপতি। স্রষ্টার মানস সন্তানগণের সন্ততিরাই 'প্রজা'—জাত হয়েছেন, তাই 'প্রজা', জগৎ পিতা ও জগন্মাতার সন্তান ব'লেই 'প্রজা'। 'প্রজারাই' প্রথম জীবনাদর্শ লাভ করেন। স্রষ্টার প্রথম পুত্রগণ সকলেই প্রজাপতি, কারণ তাঁরাই তাঁদের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে আদর্শ স্থাপন করেন, তাঁরাই প্রথম গুরু ও প্রভু। ওখানে সভ্যতাপ্রাপ্ত দলপতিই রাজারূপে পরিণত—গণ-ইচ্ছায় রাজ্য পরিচালিত, এখানে রাজ্য 'ঋষিসংঘদ্বারা' পরিচালিত, ওখানে ব্যক্তির উদ্দেশ্য—ঐশ্বর্য্যলাভ, এখানে আত্মজ্ঞান; ওখানে আদর্শ ভোগমূলক, এখানে বেদমূলক; ওখানে জাতি চায় প্রতিপত্তি, কত বেশী ভোগ আহরণ ক'রে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারা যায় দেখতে, এখানে জাতি চায় সমগ্র বিশ্বে এমন কীর্ত্তি বা দাগ রেখে যেতে যার আদর্শে মানব শান্তি পায়—কত কম ভোগে, কত কম আহারে সুস্থ ও সবল দেহ ধারণ ক'রে ঐ কীর্ত্তি রেখে যেতে, ওখানে ব্যক্তি ও জাতি চায় প্রভুত্ব, এখানে—আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।

হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ হ'তে দক্ষিণ-সমুদ্র-উপকূল পর্য্যন্ত, পশ্চিম উপকূল হ'তে পূর্ব্ব অংশ পর্য্যন্ত, ভারতের সর্ব্বত্রই প্রত্যেক দেবতার স্ব স্ব বীজমন্ত্রে প্রত্যেক দেবতার উপাসনা হ'য়ে আসছে। ইহার জন্য ভারতে কখন রক্তের নদী প্রবাহিত হয় নি। এই রকম সমস্ত ভারতকে একই বর্ণনার মধ্যে আনা কি ক'রে সম্ভব হয়েছিল তখন, যখন সর্ব্বত্র যাতায়াত সহজ ছিল না, যখন রেল, জাহাজ, এরোপ্লেন আদির ন্যায় আধুনিক অনেক সুবিধা ছিল না? তা ছাড়া, প্রত্যেক তীর্থ-দেবতা, গ্রাম্য-দেবতা ও গৃহদেবতা ও তাঁদের পরস্পরের যোগসূত্র আছে। কিরূপে এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল যা আজও বর্ত্তমান, যা আজও

হিন্দুকে ধর্ম্ম বিষয়ে সচেতন ক'রে রেখেছে, সমস্ত হিন্দুকে একই সূত্রে গেঁথে রেখেছে ? হিন্দু একটি জাতি, আর ঐ যে বিহারী, উড়িয়া মারাঠি প্রভৃতি—ঐ গুলি প্রাদেশিক ভাষা ও আচারগত পার্থক্যের পরিচয় মাত্র—একই জাতির অন্তর্গত, একই সংস্কৃতির অন্তর্গত। ইহাই —ঐ ঐক্যসূত্রই—হিন্দু জাতির 'স্টেট্'—যদি ঐ নাম দেওয়া যায়। হিন্দুরাজা এই স্টেটের অধীন, এই ষ্টেটের নীতিকে কর্ম্ম-পরিণত করবার জন্যই 'স্মৃতির' আবির্ভাব—রাজাও স্মৃতির অধীন। বারবার গোঁড়ামির অত্যাচারে হিন্দুর মন্দিরাদি ধ্বংস হয়েছে, রাজার পরিবর্ত্তন হয়েছে, কিন্তু সেই সেই স্থানে আবার বড় বড় মন্দির উঠেছে, সোৎসাহে পূজা আবার সমানভাবে চলেছে, নতুন রাজা ঐ সবের সহায়তা করেছেন। ইহা কি সমগ্র হিন্দুজাতির পাগলামি, না, হিন্দু মনেপ্রাণে ঐ ষ্টেটনীতি বজায় রেখে চলেছেন ? ষ্টেট্ বদলায় নি।

আদর্শের প্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের জীবন গ'ড়ে উঠেছে। ভালমন্দের কথা নয়, কিন্তু এই কারণেই উভয়ের মধ্যে লৌকিক আচারেও পার্থক্য এবং এই জন্য উভয়ই উভয়কে ভুল বোঝেন অনেক সময়ে। হিন্দুর সদাচার চায় অভ্যন্তর শুচিতা, হিন্দু স্নান করে পবিত্রতার জন্য, ধোলোর স্নান পরিষ্কার হবার জন্য, হিন্দু আহারের বিচার করে চিত্তশুদ্ধির জন্য, ওখানে আহারের বিচার শরীর পুষ্টির জন্য। (এবিষয়ে সকলকে আমরা স্বামীজির 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পড়তে বলি।) ওখানে জাতীয়-জীবন অভ্যুদয়-পথে অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু চিত্তশুদ্ধির দিকে কোন লক্ষ্য নেই, ওখানে, এমন কি বৈজ্ঞানিক মহলেও, একটি সর্ব্ব-নিয়ন্তা শক্তির সত্তা বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে প্রমাণ ও স্থাপন করবার চেষ্টা চলেছে, প্রেতাত্মাদের নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হচ্ছে, কিন্তু কোন স্থানেরই লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি নয়! ওখানে জাতির উদ্দেশ্যকে সার্থক করবার উপায় রাজনীতি, এখানে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। হিন্দুরাজাও বর্ণাশ্রমের অধীন। বর্ণাশ্রম ছিল অভ্যুদয়ের সহায়ক। যখন ভারতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিরূপ দুই আদর্শ ছিল, তখন একদিকে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, ভীষ্ম বা বিদুরের মত গৃহস্থ, অপরদিকে শুকদেব, ব্যাস প্রভৃতি মহাজনগণের আবির্ভাব ভারতে সম্ভব হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্রের মত দাতার

গল্প কল্পনা নয়। বৌদ্ধযুগেব অশোক, হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতিব ন্যায় ধর্ম্মশীল, সর্ব্বধর্ম্ম-পালক বাজা আব কোন্ দেশে কতজন দেখা যায় ?

ওখানে সুখ-সুবিধাব জন্য জাতিব মধ্যে কর্ম্ম বিভাগ, এখানে সত্বাদিগুণ অনুসাবে কর্ম্মেব শ্রেণী বিভাগ। এখানে বর্ণ বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল অন্য বকম। রুচি ও প্রকৃতি বোঝবাব জন্য এখানে জ্যোতিষশাস্ত্রও চেষ্টা কবেছেন, 'বর্ণ' নিরূপণ কববাব চেষ্টা পেয়েছেন। ঐ বর্ণই যথার্থ বর্ণ, ঐ শাস্ত্র মতে। বংশগত হ'য়ে সমাজ খাড়া হবাব বহু কাবণ আছে, তাব মধ্যে একটি জিনিষ এই যে, বংশানুক্রমিক একটা জিনিষেব চর্চ্চা থাকলে সেই জিনিষেব বা বিদ্যাব (গুণেব) উৎকর্ষতা হয় ও সেই সঙ্গে বংশে একটা বিশেষত্ব দেখা দেয়। বর্ত্তমানে, অন্যত্রও ঐ বকম হ'তে চলেছে কোন কোন স্থলে। এক্ একটি ধাবা বজায় বাখতে হ'লে, কর্ম্মেব শ্রেণী বিভাগ দবকাব হয়; সেই শ্রেণীতে আবাব বংশানুক্রমিক ধাবা যোগ হলে তার বেগ দ্রুত হয়। যদি বংশে সেই সেই চর্চ্চা লোপ পায় বা সেই সেই শ্রেণীব দায়িত্ব লোপ পায় অথবা বংশ যদি সেই সব দায়িত্ব ঘাডে নিতে অপাবগ হয়, তবেই আসে অধঃপতন অর্থাৎ বর্ণের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যায়। সমাজ-শক্তি যদি জীবন্ত হয়, তেজীয়ান ও নির্ভীক হয়, তা হলে শ্রেণীগুলিকে সমাজ আবাব সাজাতে পাবে, নতুন প্রাণ এনে দিতে পাবে—নতুন ভাবেব ও নতুন কর্ম্মেব প্রেবণা দিয়ে। ভাবতেব সমাজ চায় সকলকে এমন ভাবে গ'ডে তুলতে যাতে মহাকর্ম্মেব মধ্য দিয়ে, অভ্যুদয়েব মধ্য দিয়ে, সকলে মুক্তিলাভ কববাব পথে—স্বরূপ অবস্থা লাভ করবাব পথে—নিজেবা নিজেবা স্বাধীন ভাবে যেতে পাবে। মন চায় সদা প্রসাবিত হ'তে। ভাবতেব স্বাধীনতার অর্থ তাহাই ছিল যাতে মন অনন্ত প্রসাবিত হ'তে পাবে, যাতে মন অহমিকা ও প্রবৃত্তিব দাস হয়ে না যায়। অতএব দেবত্বকে ফুটিয়ে তোলাই ছিল বর্ণেব কায। মুক্তিব পথে ওঠবাব ছিল চাবিটি পৈঠা। এই চাবিটির সাধাবণ নাম 'আশ্রম'। 'আশ্রম'—এই কথাটিব সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে এক মহান্ পবিত্র ভাব। মহান্ ও পবিত্র ভাব বাদ্ দিয়ে ধর্ম্ম অভ্যুদয় বা নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি লাভ হয় না। এখন 'বর্ণ' নেই—সবই একবর্ণ ভাবতে—শূদ্রবর্ণ। সমাজকে পুনর্গঠিত করতে হলে আনতে হবে ঐ আশ্রমেব 'ভাব', উদ্দীপিত করতে হবে আশ্রম-'বোধ'—নাই বোধ্ ঠিক

প্রাচীন যুগের মত আশ্রম। সকলের উন্নতির পথ উন্মুক্ত রেখে, শিক্ষার বিস্তার ক'রে হিন্দুকে আগে নিজের ঘর ঠিক্ করতে হবে। বিলোমক্রমে হিন্দুর এই জাতি ও সমাজ-তত্ত্ব দেখে হিন্দুর মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারা যায়। হিন্দু সমাজ-তান্ত্রিক।

[হিন্দুর বিবাহ "ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব তাহাই সমাজে প্রচলিত, তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।" (স্বামীজি)।]

ধোলোর বিবাহ নিজস্ব ব্যাপার—Private affair , সমাজ অর্থনৈতিক, ব্যক্তি স্বাধীন। হিন্দুর আপন জাতীয় মেরুদণ্ড ধর্ম্মের মধ্য দিয়েই, ঐ সব কারণে, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের উৎসাহ এসেছে। ধর্ম্মই যে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ড তা এখনও স্পষ্ট বোঝা যায় কুম্ভমেলা দর্শনে, কুম্ভমেলায় ভারতের সকল স্থানের, সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধুর সম্মিলন হয়।

[কথিত আছে, সমুদ্রমন্থনে যে সুধাকুম্ভ উত্থিত হয় ও যার জন্য দেবাসুর সংগ্রাম হয়—সেই কুম্ভ যে স্থানে গোপনে রাখা হয়—সেই স্থানেই আজও সাধু-সম্মিলন হয়, সাধুসম্মিলনে ঐ অমৃত কুম্ভের রস সকলে পান। ইহাই কুম্ভমেলা। শ্রীশঙ্কর এই মেলাকে ধর্ম্ম প্রচারের একটি নির্দোষ কেন্দ্ররূপে পরিণত করেন— এক এক স্থানে এক একবার কুম্ভমেলা হয়]।

প্রসঙ্গক্রমে গতবারের কুম্ভমেলার কথা এখানে একটু উল্লেখ করতে চাই। এলাহাবাদে সাধু-সম্মিলনীর ছয়জন 'মণ্ডলীশ্বর' বহু সাধু নিয়ে একস্থানে মহতী সভা করেন। সে সভায় বাঙ্গলার শ্রীরামকৃষ্ণকে কেহ কেহ অবতার, কেহ কেহ বা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, অথবা মহাপুরুষ ব'লে বরণ করেন, সেই সঙ্গে স্বামীজিকেও যথাযথ সম্মান দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী বা স্বামীজির গ্রন্থাবলী সংস্কৃতে আজও অনূদিত হয় নি। সাধু মণ্ডলী ইহার অভাব বোধ করেছিলেন।]

প্রধানতঃ চার রকম মতবাদ ভারতে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা করেছিল। ঐ মতগুলি সমস্তই বেদমূলক-ভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী—সবই বেদ পরবর্ত্তী। ঐগুলি—(১) বার্হস্পত্যবাদ, (২) স্বভাববাদ, (৩) লোকায়তবাদ, (৪) চার্ব্বাকবাদ। বার্হস্পত্যবাদ 'বিতণ্ডা' নামে খ্যাত। বৈদিক যুগেই এই মত প্রচারিত হয়। বৃহস্পতি ছিলেন প্রত্যক্ষবাদী। তাঁর মতে, 'যা প্রত্যক্ষ করা যায় না তা নিয়ে কোলাহল করা নির্ব্বুদ্ধিতা; অতএব

বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম না ক'রে আবৃত্তি বৃথা, এবং মোক্ষতত্ত্ব বোঝবার জন্য শক্তিক্ষয় না ক'রে পবিত্র জীবন ও হৃদয়ের প্রসার যাতে হয় তাই করা দরকার।' তাঁর রচিত কয়েকটি বেদমন্ত্রের ভাব বড় সুন্দর ও উচ্চ। অর্থ না বুঝে বেদের আবৃত্তি নিষ্ফল—এই মত গোড়া হ'তেই ভারতে ছিল। মনে রাখতে বলি যে বৃহস্পতি ছিলেন সুরগুরু—ভোগভূমি স্বর্গলোকের গুরু। জ্ঞান আহরণে একমাত্র অনুভূতিই মূল; কিন্তু যখন এই অনুভূতিকে, দৈহিক ক্রিয়া-জাত-বোধ ব'লে গৃহীত হয়. তখন স্বভাববাদ পরিণত হয় দেহাত্মবাদে। তারপর, আসে 'লোকায়তবাদ'। লোকায়তবাদে 'অনুমান'ই বস্তু-নিরূপণের প্রমাণ ব'লে স্বীকৃত। স্বাধীন চিন্তাবাদ, লোকায়তের প্রধান মতবাদ। লোকায়তের পরিণতি হয় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিবাদে বা বিষয় ভোগবাদে, স্বাধীনতার অর্থ করা হয় স্বেচ্ছাচারিতা। ভোগবাদ, স্থূলের অনুভূতিতেই বিশ্বাসী। লোকায়তের পর দেখা দেয় 'চার্ব্বাক' মত—'খাও দাও মজা কর, ঋণ ক'রেও ঘি খাও,—ঋণ শোধ দিতে পার আর না পার।'

সর্ব্ব জাতির প্রথম যুগে এই রকম নানা মতবাদ অন্যত্র পাওয়া যায়, সুতরাং সেখানে অনুলোম প্রণালীর বিচার স্বাভাবিক, কিন্তু ভারতের ঐ রকম মতবাদের উদয় বেদমতের পরে—ইহা কি আশ্চর্য্য নয়, ভাববার বিষয় নয়? বলা বাহুল্য, ঐ সব মতবাদ প্রচার হ'তে যুগব্যাপী বা আরো অধিক সময় লেগেছিল। একইকালে ঐ সব মত প্রচার হয় নি। বার্হস্পত্যবাদ ছাড়া, ঐ সব মতবাদ প্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান বুদ্ধদেব। বৃহস্পতি পরে তাঁর মত পরিবর্ত্তন করেন ও বেদমত গ্রহণ করেন। চার্ব্বাকের নাম মহাভারতেও পাওয়া যায়। জৈনবাদ ও বৌদ্ধবাদ ঐ সমস্ত মতগুলিকে আত্মস্থ করেন। বেদ-পূর্ব্ব যুগের ইতিহাস কোথায়? পণ্ডিতেরা বলেন, যা সর্ব্বত্র হয়েছে, ভারতেও তাই হয়েছে। তা হ'লে, ভারতে বেদ-পূর্ব্ব যুগ, বৈদিক সভ্যতার ও বেদপ্রচারের কত পূর্ব্বে? সমাজ-গঠন হ'তে, সভ্যতার প্রসার হ'তে, শান্ত ও অহিংসভাবে সমগ্র ভারত একটি ধর্ম্মসংঘের মধ্যে এসে একটি পূর্ণ জাতিতে পরিণত হ'তে কত লক্ষ বৎসর লেগেছিল কে বলবে? সে সব ইতিহাস কোথায়? ইতিহাসে দেখা যায়, বর্ব্বর জাতি সভ্য হয়েছে অপর কোন সভ্য জাতির সংস্পর্শে

এসে। সে কোন্ প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগের সভ্যজাতি যাঁরা আর্য্যকে 'আর্য্য' ক'রে তুলেছিলেন? সে কি কোন 'দেবজাতি'? কিন্তু এই দেবজাতিরাও ত ছিলেন আর্য্য—ইহাই প্রমাণ পাওয়া যায় না কি? আর্য্যজাতির এই অদ্ভুত সমাজ-গঠন, অদ্ভুত উপায়ে এক জাতিতে পরিণত হওয়া, জাতির মেরুদণ্ডে ধর্ম্মপ্রাণতার স্থিতির পূর্ব্বে এই জাতির মনোবৃত্তির, এই জাতির অত্যুদার কর্ষণার মূল কোথায়?

এই সব অতীতকে পশ্চাতে রেখে আজ মানবজাতি—হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানাদি সবাই—কি একই কর্ম্মক্ষেত্রে মিলিত হ'তে পারেন না? সময় এসেছে; সময় এসেছে এই বিজ্ঞানের যুগে—উদারভাবের, উদার আচরণের। জগতের শান্তি ইহার উপর নির্ভর করে। ভারতেই সকল ভাবের মিলন হয়েছে এবার, সুতরাং এবার কেন্দ্র ভারত। নতুন সভ্যতার, নতুন জাতির জন্ম অবশ্যম্ভাবী। পুরাণের কথায়, সেবার, অমিত-বলশালী সুন্দ উপসুন্দ—দুই ভাই—নষ্ট হয়, কামিনীর মোহে, কামিনীর লোভে, এবার তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাঞ্চন—'Almighty dollar'—সর্ব্বশক্তিমান কাঞ্চন; তার ফল, ধনিক সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকারবাদের দুরাকাঙ্ক্ষা, বিলাসের মত্ততা, সর্ব্ব সমাজের ক্রূরগতি, দরিদ্রের পেষণ, দরিদ্রের হাহাকার, প্রবল জাতিসমূহের কালো-ধোলো-রূপ কূট কৌশল, জাতিতে জাতিতে ভেদ সৃষ্টির কুটিল নীতি। বর্ত্তমান সন্ধিযুগের এই চাঞ্চল্য ঐ আগামী নবযুগকে, ঐ নতুন মানব জাতিকে সাদর-আহ্বানের লক্ষণ। এই সন্ধিযুগ তাহারই সূচনা, তাই আজ এই সন্ধিযুগে মানব চাইছে অবস্থার পরিবর্ত্তন। বৃথা আসেন নি শ্রীরামকৃষ্ণ, বৃথা হচ্ছে না মহাশক্তির লীলা, বৃথা সকল জাতি আজ জাগরোন্মুখ নয়, বৃথা তাদের স্বপ্নঘোর ভাঙ্গছে না।

জাতি ও সমাজ—২।

চামড়ার উপর রক্তের জোর খুব বেশী, কোটী কোটী অংশে রক্ত-মিশ্রণ হ'লেও, মঙ্গোলিয়ান ছাঁচের মুখ, গ্রীক-চক্ষু অনেক পুরুষ পরেও দেখা যায়। এটা হল রক্তের বৈজীক-শক্তি। শরীর গঠনে, তার আকার প্রদানে বৈজীক-শক্তির ক্ষমতা অদ্ভুত। বৈজীক-শক্তি যেন কিছুতেই নষ্ট হ'তে চায় না, কিন্তু এত আশ্চর্য্য ক্ষমতা সত্ত্বেও, ইহার মনের উপর প্রভাব খুব বেশী নয়। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গেই ঐ শক্তির আদিম ক্ষমতা আর থাকে না। যদি থাকত, সভ্যতা, ক্রমোন্নতি, সবই অসম্ভব হত। সভ্যতা মানেই মনের উৎকর্ষতা। বৈজীক-শক্তি মানে বৈজীক-সংস্কার। এই সংস্কারের প্রভাব দেহের উপর আছে ব'লেই, দেহগত বা ইন্দ্রিয়গত সভ্যতার উপরও ঐ সংস্কারের প্রতাপ দেখা যায়—মার্জ্জিত আকারে তাহা প্রকাশ পায়। এ রকম সভ্যতায় মন কাঁচাই থাকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গত জ্ঞানের ঊর্দ্ধে যেতে চায় না, যে মনটুকু ইন্দ্রিয়গত-মাত্র তা'রই উৎকর্ষতা দেখা দেয়। সভ্যতায় যেমন ধীরে ধীরে বৈজীক-সংস্কার মার্জ্জিত হ'তে থাকে, বদলাতে থাকে, পাকা মনে সেই সংস্কারকে এমনভাবে গ'ড়ে তুলতে পারা যায় যে তাহাই তখন মনকে পরারাজ্যে তুলে ধরতে সাহায্য করে। সংস্কার মনকে গড়ে না, গঠনকার্য্য হয় মনের দ্বারা। মনই সংস্কারকে গ'ড়ে নিতে পারে, রক্তকে উপযুক্ত আধারে পরিবর্ত্তিত করতে পারে।

ঘোড়া বিশেষজ্ঞেরা দেখিয়েছেন যে, যেখানে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হয়, নবদম্পতির সন্তানসন্ততির চেহারা, এমন কি নখচুল পর্য্যন্ত, মেয়েটির পূর্ব্বভর্ত্তার মত হয় অনেক স্থলে। ইহা মনের গঠনক্ষমতার পরিচয়। ইহা আরো প্রমাণ করে যে, মাতৃমনের গঠনক্ষমতা বিস্ময়কর—বৈজীক-শক্তি এখানে দমিত। সৎসঙ্গগুণে লম্পটের ছেলেও সাধু হয়—এরকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এক্ষেত্রেও বৈজীক-শক্তি পরাভূত, সংস্কারকে উপযুক্ত আধাররূপে গ'ড়ে তুলেছে মন। এক সাহেব-দম্পতি বহুকাল আফ্রিকায় বাস ক'রে ঘরে ফিরে আসেন। কয়েকবৎসর পরে মেয়েটির যে সন্তান হয়, সেটি যেন ঠিক কাফ্রিশিশু—বর্ণ, নখচুল সবই কাফ্রির মত। এই

ঘটনায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়; কিন্তু যখন অনুসন্ধানে জানা যায় যে দূরদেশস্থিত একটি কাফ্রিশিশুর উপর মেয়েটির বাৎসল্য ছিল, তখন সকলের ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়। এখানেও মাতৃমনের গঠনক্ষমতা বিদ্যমান, বৈজীক-শক্তির কোন প্রভাব নেই। মাতৃমনের পবিত্রতা থাকলে বৈজীক-শক্তিও পবিশুদ্ধ হয়ে যায় এই কারণে।

সংস্কার বা বৈজীক-শক্তি রক্তগত বা ইন্দ্রিয়গত হ'লেও, অসীম জ্ঞানভাণ্ডার, অনন্ত বীর্য্য—অর্থাৎ বেদ—আমাদের মধ্যেই আছেন, কারণ অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বসঞ্চারী। তার উপর কোন সংস্কারের প্রভাব থাকতে পারে না। সমাজে সেই অনন্ত শক্তির স্ফুরণচেষ্টাই ব্রাহ্মণত্ব, মন্ত্রদ্রষ্টৃত্ব, ঋষিত্ব।

এখন সমাজশক্তি ব'লে কিছুই নেই, যেটুকু আছে তাও প্রভাহীন। আগে সমাজকে শক্তিমান করা দরকার, সে জন্য গঠনমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে সংঘবদ্ধ হওয়া চাই। কেবল উচ্চবর্ণেরা সংঘবদ্ধ হলে চলবেনা, জনকতক অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তি সংঘবদ্ধ হলে হবেনা, স্ত্রীশূদ্রকে বাদ দিলে কোন কাযই অধিক দূর অগ্রসর হবে না। দরিদ্র, অন্ত্যজ আদিদের নিয়ে সংঘবদ্ধ হ'তে হবে কারণ সকলকে নিয়েই জাতি। বর্ত্তমানে গরীবদের মধ্যে নারীর অবস্থা হিন্দুমুসলমানের প্রায় একই, বহু স্থলে। আচারের দোহাই দিয়ে অপপ্রথার প্রশ্রয় দিলে আর চলবে না। ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষার প্রসার চাই, সে শিক্ষায় যাতে অন্নসমস্যার সমাধানও হয় তার ব্যবস্থা থাকা চাই। মনে রাখতে হবে যে পাত-ছোড়াছুড়ি ক'রে আহার করলেই ভালবাসা বৃদ্ধি পায় না, যথা-তথা রক্তমিশ্রণে সমাজে প্রীতি বাড়ে না। কর্ম্মক্ষেত্রে চাই—হৃদয়। বৃথা রক্তমিশ্রণে কোন ফল নেই। ঘটনার সমাবেশে বা ঘটনা পরম্পরার সমাবেশ-জনিত উত্তেজনায়, অথবা তজ্জনিত স্বার্থ-স্বপ্নপর ভাবাবেশের বশবর্ত্তী হ'য়ে অযথা রক্তমিশ্রণে সমাজের ক্ষতি করাই হয়, সমাজকে দুর্ব্বল করা হয়, সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করবার পথ রুদ্ধ করা হয়—বিপরীত ভাবের আগমনে। প্রত্যেক সমাজকে আপন আপন্ ভাবে গ'ড়ে তোলাই সহজ ও নিরাপদ উপায়। "তুম্ ভি বুদ্ধ, হাম্ ভি বুদ্ধ, সাদী কর'—এই রকম ধরণের নীতি বৌদ্ধযুগে হিন্দুসমাজের যে ক্ষতি করেছে, সে ক্ষতির এখনও

পূবণ হয় নি। তাতে হিন্দুব বৌদ্ধপ্রীতিও হয় নি, বৌদ্ধদেব হিন্দুপ্রীতিও বাড়েনি, ববং উভয় সমাজেব মধ্যে বিষমতা এসেছে। ধর্ম্মমূলক সমাজে যথা-তথা বিবাহে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পায় না। এবকম আচবণ গঠনমুখী নয়। প্রত্যেক পাবিবাবিক জীবনেব একটা শিক্ষা আছে, একটা ধাবা আছে, সেটি সেই সেই পাবিবাবিক ধারাব বিশেষত্ব। উচ্চবর্ণগুলিব মধ্যে ঐ বিশেষত্বেব উপব একটা মোহ আছে। বংশেব পব বংশ ধ'বে যে পবিবাবে একটা শিক্ষা, একটা ভাবেব অনুশীলন, একটা নিজস্ব শীল চলে আসছে, সেই পবিবাব স্বভাবতঃই বক্তমিশ্রণেব সময় আপন ভাবেব লোক স্বপবিবাব-ভুক্ত কবতে চায়। মোহ বলেছি, কাবণ, যে গুণেব জন্য বংশেব মর্য্যাদা বাড়ে, দু তিন পুরুষ পবেই হয়ত, বংশই কারণ হয়ে দাঁড়ায় মর্য্যাদাব—গুণ থাকুক আব নাই থাকুক। গুণগত ও বংশগত বিচাব চুল চিবে কবতে গিয়ে সমাজকে এত বিভক্ত কবা হয়েছে, এক একটি শ্রেণীব মধ্যেও এত বেশী ব্যবধান সৃষ্টি কবা হয়েছে যে তাতে সেই শ্রেণীকে সামাজিক ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ করা দুরুহ ব্যাপাব, এখানেও গুণ ভুলে গিয়ে শ্রেণীবই প্রাধান্য এসে পড়েছে। এক সময়ে ও বকম কবা কতকটা দবকাব হয়েছিল, কিন্তু ঐ সব ব্যবস্থাকে 'অচলায়তনে' পরিণত কবায় সমাজ-শক্তি হীনপ্রভ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ত্তমান সময়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়াই বেশী দবকাব। ঐ মোহ থাকাতে, প্রত্যেক শ্রেণী গতিহীন ও স্থিব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কাবোকে উচ্চ হ'তে উচ্চতম পথে নিয়ে যেতে পাবছেনা। গবীব ও হীনবর্ণদেব মধ্যে ইহা বীভৎসরূপ দেখা দিয়েছে। ইহা বৈজীক-শক্তি নয়, ইহা স্ব স্ব শ্রেণীগত মোহ। এই মোহেব পীড়নে বিদ্যাহীন, শিক্ষাহীন, সহানুভূতি-বর্জ্জিত দবিদ্রকুল নিপীড়িত। জাতিব উত্থান কি জাতিব সংখ্যাগবিষ্ঠকে ছেঁটে ফেলে সম্ভব হয়, কখন হয়েছে? সেইজন্য ঘব সাম্‌লানো আগে চাই।

বৈশিষ্ট্য বজায় বেখে চলা অত্যাবশ্যক, কিন্তু বজায় বাখবার সামর্থ্য অর্জ্জন কবতে হয়। বৈশিষ্ট্য বজায় বাখা মানে, বংশপবম্পবায় সদ্‌গুণরাজির কর্ষণা কবা। এটি মনোবৃত্তি অনুশীলনের কথা, ইহার সঙ্গে বৈজীক-শক্তির বড় বিশেষ সম্বন্ধ নেই। সুসংস্কাবের ধারাবাহিকত্বে যে সংস্কার উৎপন্ন হয় তার নাম 'বিদ্যাসংস্কার' বা জ্ঞানসংস্কার। এই সংস্কারে সভ্যতার বৃদ্ধি হয়।

এই সংস্কার অনুশীলন সাপেক্ষ; অনুশীলনে এই সংস্কার সজীব থাকে। সভ্যতা মানে ব্যাপক সংযত জীবন। দোহাই দিতে থাকলে, বৃথা দম্ভই, জড়ত্বজনিত মোহই, প্রকাশ পায়। তখনই বৈজীক-শক্তির বিনিয়োগ হ'তে পারে, যখন বিদ্যাসংস্কারের সাহায্যে অর্থাৎ জ্ঞানসংস্কার-বলে বৈজীক-শক্তি কার্য্যকরী হয়, নতুবা সভ্যতাও অধোগামী হয়ে ক্রমশঃ আদিম অবস্থায় ফিরে যায়।

প্রাচীন আর্য্যভাবাপন্ন বা আর্য্যান্বিত জাতিকে আমরা 'আর্য্য' আখ্যা দিয়েছি। মিতান্নিরাজ প্রথম আর্ত্ততমের মেয়ের বিবাহ হয়, মিশররাজ ৪র্থ থুতমিসের সঙ্গে; ঐ মেয়ের ভাইঝির বিবাহ হয় মিশররাজ ৩য় আমেনহোতেপের সঙ্গে; এই আমেনহোতেপের পত্নীর ভাই 'দশরত্তের' সঙ্গে বিবাহ হয় ৪র্থ আমেনহোতেপের (ইকন্-আটন্ এর)। ইকন্-আটন্এর সময় একেশ্বরবাদ প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদ মিশরের ধর্ম্মমতে সর্ব্বপ্রথম দেখা দেয়। ৩য় আমেনহোতেপের আর এক পত্নী ছিলেন বাবিলোনের কাশীয় রাজবংশের কন্যা। আর্য্যরক্ত মিশ্রণের ফলে, মিশরের অভ্যুদয়-পথ অনেকটা মুক্ত হল, কিন্তু মিত্তানিরা ও কাশীয়রা ক্রমশঃ হীনবীর্য্য হয়ে গেল।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের রক্তমিশ্রণে বিভিন্ন ফল হয়। সমজাতীয় আদর্শ তথা সম-পারিবারিক আদর্শ বা ভাবযুক্তশ্রেণী—অনুশীলনের ফলে—এই সবের মধ্যে রক্তমিশ্রণে জাতির বলবীর্য্য বর্দ্ধিত হয়; বিপরীত আদর্শের সঙ্গে রক্তমিশ্রণে যদি উচ্চ বা ব্যাপক-আদর্শ-সংখ্যার ব্যক্তি কম হয়, রাজনৈতিক বা অন্য কোন কারণে যদি ঐ আদর্শে জাতিগত করবার ক্ষমতা না বর্ত্তায়, তা হলে অনুশীলন অভাবে উচ্চাদর্শ হীনতা প্রাপ্ত হয়—যদিও জ্ঞানসংস্কার-বলে অপর আদর্শ লাভবান হয়। প্রাচীন মিত্তানি বা কাশীয় জাতি, প্রধানতঃ, ঐ কারণে আজ লুপ্ত—ক্রমাগত অধোগতিতে হীনবীর্য্য হয়ে লুপ্ত। অবশ্য সর্ব্বক্ষেত্রে শক্তিশালী পুরুষে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিন্তু উহা ব্যক্তিগতই হয়, সাধারণ হয় না। আর্য্যের বিবাহাদর্শের বিপরীত আদর্শই ছিল অন্যত্র। অন্য সব স্থানে, দলপ্রীতি ও দলপুষ্টিরূপ ভাবের ঐক্য একটা ছিল—জাতীয় আদর্শ বিশেষ কিছু ছিল ব'লে প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঐ সব কারণে

উত্তর আফ্রিকার বের্বের জাতি ও আরব জাতির সংমিশ্রণে 'মূর' জাতির ইতিহাস গৌরবময়। নির্বৈর-আদর্শভ্রষ্ট অসভ্য খৃষ্টান-ইউরোপে এই মুসলমান মূরজাতিই স্পেনের (spainএর) মধ্য দিয়ে ইউরোপবাসীকে সদাচার শিক্ষা দেয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শেখায় ও ধর্ম্মে উদারতা আনায়।

ঐ সমস্ত আর্য্য বা আর্য্যায়িত জাতির বিলুপ্তি—'পরধর্ম্ম ভয়াবহ'এর উদাহরণ, শুধু রক্তমিশ্রণ নয়, স্বপ্রকৃতিকে রোধ ক'রে পরানুকরণে পর-প্রকৃতি অনুসারে মনকে গঠন-চেষ্টার বিষময় ফল। বৈজীক-শক্তি এখানে দুর্ব্বল, বিদ্যাশক্তির স্বেচ্ছাকৃত বিপর্য্যয়। পারিবারিক সংস্কার লৌকিক সংস্কার ব'লেই রক্তমিশ্রণে সাবধানতা দরকার। সুসংস্কৃত পারিবারিক সংস্কার—লৌকিক সংস্কার হলেও—বিদ্যার সংস্কার। এই সংস্কার বৈজীক-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই সংস্কার-জাত-প্রথম-ফল—গুণের আদর ও কুলমর্য্যাদা-বোধ, তারপর, পরে পরে জাগে আত্মমর্য্যাদা, জাতীয়মর্য্যাদা ও মানবতা। সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা-সংস্কারের মূল উৎস সংযমে—মানবের অন্তর্নিহিত জ্ঞানভাণ্ডারের বিকাশ চেষ্টায়। ঐ মূল উৎস স্পর্শ করতে হলে চাই তপস্যা, চাই সাধনা। সাধনায় আত্মশ্রদ্ধা জাগরিত হয়। আত্মমর্য্যাদা-বোধ আত্মশ্লাঘা নয়, শ্রদ্ধা জাগলে জাতীয়-মর্য্যাদা-বোধ স্বার্থদুষ্ট হয় না। এই সাধনার সংস্কারই আধ্যাত্মিকতা, অতএব, আধ্যাত্মিকতা সকল রকম সংস্কারের উপর প্রভুত্ব করে ও তার শক্তি সুতরাং অসীম। আধ্যাত্মিকতার সংস্কার হৃদয়ে দৃঢ় হলে যে চারিত্র্য আসে, তার ক্ষমতা অসীম আর তারির নাম বৈরাগ্য, তাই সমস্ত সংস্কার বৈরাগ্যের কাছে হীনপ্রভ হ'য়ে যায়। বৈরাগ্যই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অভিব্যক্ত করতে সমর্থ। ইহা জড়ত্বের বিপরীত, মোহের বিপরীত। বৈরাগ্য মানে প্রভুত্ব, নির্ভীকত্ব—মোহবিধ্বংসকারী ও জড়তার মূল উচ্ছেদকারী শক্তি। এই আধ্যাত্মিকতায় সকলের জন্মগত অধিকার, এখানে কোন অধিকারবাদ নেই। আধ্যাত্মিকতা প্রত্যেক ব্যক্তির, কিন্তু ইহাকে জাতিগত করতে হলে, ইহা ব্যবহারগম্য হওয়া চাই অর্থাৎ এমন একটি প্রণালী থাকা চাই যার মধ্য দিয়ে জাতির শিক্ষালাভ হয় ও জীবন আদর্শানুরূপ গঠিত হয়। সেই প্রণালীর নাম ছিল 'আশ্রম'। তাই তখন ব্রহ্মচারী যৌবনে বিবাহ ক'রে, কয়েক বৎসর পরেই, বাণপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ সহজে করতে পারতেন।

আশ্রমবিভাগ এখন লুপ্ত হলেও, উহার ফলে সমগ্র জাতির মধ্যে সরলতা ও বিশ্বাস এবং বহু অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিকতার পথ আজও সুগম ক'রে রেখেছে। আছে মাত্র সন্ন্যাসাশ্রম ভাবতে; এখনও সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে বহুকাল অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে অবস্থান করতে হয়। যুগ যুগ ধ'রে শিক্ষা পেয়ে হিন্দুসমাজ খাড়া হয়ে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার উপর। আধ্যাত্মিকতাই জাতিগত সংস্কাররূপে, শতসহস্র বাধা, শত সহস্র বিপত্তি ঠেলে নবনব মূর্ত্তিতে বারবার আত্মপ্রকাশ করছে। ঐ সংস্কার এত বলবান যে, কোন হিন্দু আজীবন অধ্যাত্মজীবন হ'তে নিজেকে দূরে রেখে চললেও, শেষমুহূর্ত্তে তাঁর ইচ্ছা হয় গঙ্গাতীরে বা তীর্থে বাস করতে, ভগবচ্চিন্তায় দিন যাপন করতে, নিত্য গীতা ও চণ্ডীপাঠ করতে ও মৃত্যুকালে গঙ্গাজল স্পর্শ করতে!

'কালোর' প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ধোলোর নব সভ্যতা ও সংস্কৃতি—এই দুই শক্তির সম্মিলন হ'তে চলেছে। এই দুই শক্তির সহায়তা করা, সেবা করা, ভারতের জীবন আহ্বান করছে। ইহার জন্য চাই ধীরতা, উদারতা ও সাবধানতা।

[তাই স্বামীজি বলেন, "যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্য বীর্য্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জ্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়, ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্ত্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়—ভয় হয় পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইয়া যাই—

এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে, যাহাতে—আসাধারণ—সকলে তাঁহাদের পিতৃধন সর্ব্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্ব্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক্ চারিদিক্ হইতে রশ্মিধারা, আসুক্ তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্ব্বল, দোষযুক্ত তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্য্যবান, বলপ্রদ তাহা অবিনশ্বর—তাহার নাশ কে করে?

কত পর্ব্বতশিখর হইতে কত হিমনদী, কত উৎস কত জলধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশাল সুরতরঙ্গিণীরূপে মহাবেগে সমুদ্রাভিমুখে যাইতেছে। কত বিবিধ প্রকারের ভাব, কত শক্তিপ্রবাহ, দেশদেশান্তর হইতে কত সাধুহৃদয়, কত ওজস্বি মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়া—নররঙ্গক্ষেত্র কর্ম্মভূমি—ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

লৌহবর্ত্ম-বাষ্পপোতবাহন ও তড়িৎ সহায়—ইংরেজের আধিপত্যে বিদ্যুদ্বেগে নানাবিধ ভাব, রীতিনীতি, দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অমৃত আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরলও আসিতেছে—ক্রোধ কোলাহল, রুধিরপাতাদি সমস্তই হইয়া গিয়াছে, এ তরঙ্গ রোধের শক্তি হিন্দুসমাজের নাই। যন্ত্রোদ্ধৃত জল হইতে মৃত জীবাস্থিবিশোধিত শর্করা পর্য্যন্ত সকলই, বহু বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও, নিঃশব্দে গলাধঃকৃত হইল, আইনের প্রভাবে, ধীরে ধীরে, অতিযত্নে রক্ষিত রীতিগুলিরও অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে—রাখিবার শক্তি নাই। নাই বা কেন? সত্য কি বাস্তবিক শক্তিহীন? "সত্যমেব জয়তে নানৃতং"—এই বেদবাণী কি মিথ্যা? অথবা যেগুলি পাশ্চাত্য বা রাজশক্তির উপপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে—সেই আচারগুলিই অনাচার ছিল? ইহাও বিশেষ বিচারের বিষয়। …]"

"কার্য্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে, কেবল আমরা বলি—হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর, হে বীর্য্যস্বরূপ, আমাদিগকে বীর্য্যবান কর, হে বলস্বরূপ? আমাদিগকে বলবান কর।" (স্বামীজি)।

জাতি ও সমাজ—৩।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন জাতি আজও তার বৈশিষ্ট্য, তার ধারা বজায় রেখে চলেছে—এই বাস্তব ব্যাপারই কি বড় প্রমাণ নয় যে হিন্দুর মধ্যে অদ্ভুত জীবনীশক্তি বর্ত্তমান, যে, হিন্দু তার বৈশিষ্ট্য জগতকে দেবার জন্যই বেঁচে আছে? জাতির বৈশিষ্ট্য কোথায় আমরা বোঝবার চেষ্টা করছি নানা দিক্ দিয়ে, ইহার জন্য তুলনামূলক আলোচনা কিছু দরকার হয়। কারণ, বৈশিষ্ট্যই স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক। জাতিকে বুঝতে হলে, তার স্বাতন্ত্র্যের দিক্ দিয়ে, আদর্শের দিক্ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। জাতির মেরুদণ্ডের সন্ধান আদর্শের দিক দিয়ে বুঝলেই পাওয়া যায়, খোসা নিয়ে আলোচনায় বাদবিতণ্ডাই বেড়ে যায়, সমস্যার সমাধান হয় না। অঙ্কশাস্ত্রকে বুঝতে হলে, অঙ্কশাস্ত্রেরই বিশিষ্টতার দিক্ দিয়ে বুঝতে হবে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে 'Historical sense'—ঐতিহাসিক-বোধ; এই বোধটি উদয় না হলে ইতিহাসের যথার্থ রূপটি বোঝা কঠিন হয়। জাতির জাতীয়ত্ব কোথায় বুঝতে হলে, জাতির বিশেষ রূপটি চিনে রাখতে হবে। আমরা

ভারতের রূপটি কোথায় অনুসন্ধান করছি। বুঝতে হবে যে, আমাদের ঐ ধারাটি অসংখ্য প্রণালীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে আবার শেষে সমস্তই ঐ মূলধারায় মিশেছে। আমাদের মধ্যে যে অহমিকা উঁকি মারে—যে অহমিকাকে আমরা আমাদের ব্যক্তিত্ব ব'লে ভুল করি—সেই অহমিকাকে আশ্রয় ক'রে সমষ্টিকে ভুলে, সমষ্টির অহংকে আড়াল রেখে, যেদিন হ'তে আমরা জাতির রূপটি দেখবার বা ধরবার চেষ্টা করতে আরম্ভ করেছি, যেদিন হ'তে ঐ প্রণালীগুলিকে মূলধারা মনে ক'রে আচারবাদ নিয়ে—উপায়কে সিদ্ধান্ত মনে ক'রে—আত্মকলহে রত হয়েছি, রক্তকেই আত্মমর্য্যাদার একমাত্র নিদর্শন মনে করতে আরম্ভ করেছি, সেই দিন হ'তে আমরা আমাদের অধঃপতনের বীজ রোপণ করেছি, সেই দিন হ'তে আমরা আমাদের ঐহিক উন্নতির সকল পথ প্রায় রুদ্ধ করেছি। এখন আমাদের জাতীয়-সূত্র আবার ধরতে হবে, উঠতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে, প্রত্যেক প্রণালীকে মূল ধারাভিমুখে চালিত করতে হবে—সমস্তকে 'ঈশাবাস্যং' ক'রে। আর একটি জিনিষ বোঝবার আছে। সকল দেশের আইন (Law) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রধানতঃ দুটি জিনিষের উপর—convention ও fiction—সংস্কারজাত আচার ও কল্পনা। হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় যে স্মৃতিশাস্ত্রের ভিত্তি বেদ—সত্যে প্রতিষ্ঠিত। তাই আচারাদি তার স্বপ্নজগৎ মাত্র। Convention ও fictionকে আমরা তাদের নিজ নিজ আকারেই বুঝেছি ব'লে আমরা জোর ক'রে বলতে পেরেছি—ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা! কিন্তু স্বপ্ন বা স্বপ্নঘোর যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ স্বপ্ন যে বাস্তব, ততক্ষণ দেহমনের উপর স্বপ্নের ক্রিয়াও যে মিথ্যা নয়, যতক্ষণ ব্যবহারিক জগৎ ও ব্যবহারিকের উপর পূর্ণ জাগ্রত-বুদ্ধি রয়েছে ততক্ষণ ব্যবহারিকও যে কঠোর বাস্তব সত্য—ইহা আমরা ধীরে ধীরে বিস্মৃত হ'তে থাকি আমাদের অধঃপতন যুগ হ'তে, স্বপ্নজগৎকে একেবারেই শূন্য মনে ক'রে সত্যকে পাবার উপায় একমাত্র আচার, ইহাই স্থির করায় আচারবাদের মত্ততাই গ্রাস ক'রে রেখেছে আমাদের সেই সময় হ'তে, আমরা উন্মত্ত, দিগভ্রান্ত হয়েছি তখন হ'তে। সৌভাগ্যক্রমে আদর্শজীবন দেখা দিয়ে আমাদের আত্মচেতনা আনবার বারবার চেষ্টা হয়েছে।

রচিত গল্প কিম্বা কল্পনা এবং আদর্শ-জীবন—এই দু'য়ে প্রভেদ আকাশ পাতাল। আদর্শ-জীবন সমাজের গতি ফিরিয়ে দিতে পারে, মানবচিত্তেও আলোড়ন আনতে পারে। ভারতের বাইরের ইতিহাস প্রায় এক ছাঁচে ঢালা। যদিও বিশিষ্ট কোন প্রমাণ নেই যে সর্ব্বস্থানের প্রত্যেক আদিম অসভ্য জাতি কলহপ্রিয় ছিল, তবু খোলো মনীষীরা অনুমান করেন যে বর্ব্বর মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দল বেঁধে ঘুরে বেড়াত, একদল অন্য দলের সঙ্গে লড়াই করত, এমন প্রমাণ বহুস্থানে পাওয়া যায়। প্রত্যেক দলের এক একজন দলপতি থাকত। দলপতি হত সেই লোক, যে দলের সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান ও সাহসী। দল তৈরী হত স্বার্থের তাড়নায়। খোলো সমাজ-বিজ্ঞান বলে consciousness of kind অর্থাৎ সমজাতীয়ত্বের বোধ হ'তেই মানুষ দল বাঁধে। কিন্তু শুধু সমজাতীয়ত্বের বোধে হয় না, চাই তার সঙ্গে সমপ্রকৃতির বা সমরুচির বোধ, এইটি মনে রাখতে হবে। সমরুচি-বোধের সঙ্গে সম-স্বার্থ জড়িত।

শিশু তার মার কোলেই বর্দ্ধিত হয়, মার কাছেই প্রথম শিক্ষা পায়। শিশু প্রথম প্রথম একমাত্র তার মাকেই চেনে, অন্য শিশু তার কাছে এলেও, মার কাছছাড়া সে হ'তে চায় না, বরং আগন্তুককে আঁচড়ে কামড়ে তাড়াবার চেষ্টা করে। এখানে সমজাতীয়ত্ব-বোধ বা স্বাজাত্য-বোধ (Consciousness of kind) অস্ফুট থাকলেও—বোধটা প্রকৃতি-দত্ত হলেও—শিশু, আগন্তুকের 'সমপ্রকৃতি' বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়। শিশুর সম্বন্ধে শিশুর মাই শিশুর সমপ্রকৃতির মানুষ। শিশু, জননীর একটা অংশ। এ অংশটি মাত্র দেহ নিয়ে নয়। শিশুর অভাব অভিযোগ, সুখদুঃখ আদির অনুভূতির সঙ্গে মাতৃ-অনুভূতির একটা ঐক্য আছে। এই ঐক্য-বোধটি আছে ব'লেই মা, মা, সন্তান, সন্তান। ব্যাপক হ'য়ে ঐ ঐক্য-অনুভূতিই শেষে সমাজ গড়ে। রুচির হিসাবটি আসে পরে—কিশোরকালে ও যৌবনে, সুতরাং তখন দেখা দেয় স্বার্থ। সব শেষে আসে সমজাতীয়ত্ব-বোধ। এই স্বাজাত্য-বোধ নিয়ে একত্র হবার সঙ্গে সঙ্গে সমরুচিত্বের সমস্যা আসে। তখন হয়ত দল ভেঙ্গে যায়, সমরুচির লোক নিয়ে দল খাড়া হয়। এই রুচির জন্য যেমন আচার ব্যবহারের পার্থক্য থাকে, তেমনি মানসিক পছন্দেরও তারতম্য থাকে। মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, ঝড়, বন্যা ইত্যাদি দেখে আদিম মানুষ

বুঝতে পাবে যে ঐ গুলিব উপব তাব কোন অধিকাব নেই, তাবা সকলেব চেয়ে বলবান, এত বলবান যে মুহূর্ত্তে তাকে ধ্বংস কবতে পাবে। তখন সে ভয়ে ভয়ে তাদেব কাছে মাথা নত কবে। এই প্রকাবে আদিম মানুষেব মধ্যে দেবতা-বোধেব উৎপত্তি হয। দেবতাদেব মধ্যে কে প্রবল, কে দুর্ব্বল ঠিক্ ক'বে দেয় সেই মানুষ যে পবে দলপতি হয়, অথবা দলেব মধ্যে সেই ভাব-প্রবণ মানুষ যে দেবতাদেব তাণ্ডব নৃত্য দেখে ভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে, সুতবাং কচি অনুসাবে এক একটি দলেব এক একজন দেবতা থাকে অর্থাৎ রুচি অনুসাবে ভিন্ন ভিন্ন রুচিব ও ভাবের বা প্রকৃতিব লোকই দল বাঁধে। বিভিন্ন সমকচি-বা-প্রকৃতি-বিশিষ্ট দল হয়ত অন্য দলেব সঙ্গে লড়াই-এ হেবে গেল। যে দল হেবে গেল, সে বিজিতেব দলে ভিড়তে বাধ্য হল আব সঙ্গে সঙ্গে তাব দলদেবতা-ও বিজিতেব দল-দেবতাব সঙ্গে মিশে গেল বা তাব অধীনস্থ ব'লে স্বীকৃত হল। এই প্রকাবে দল-পুষ্টি হ'তে লাগল। ঐ উপায়ে বেড়ে গিযে দল বড হওয়াটা অনেকটা নিবাপদ, কিন্তু ঐ বকম আব একটি বড দল এলে বা প্রতিদ্বন্দ্বী হলে আবাব আবম্ভ হয় সংঘর্ষ। দলেব সঙ্গে সঙ্গে দেবতাবও পবিবর্ত্তন হ'তে থাকে। এই সব নানা ঘটনায, দল ও দেবতা নিযে নানা কাহিনীব উদ্ভব হয।

সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশেব মানুষ স্বপ্ন দেখে শিশু কাল হ'তেই। মানুষ যে চিরজীবী নয়, এটিও বোঝে মানুষ। স্বপ্নবোধটি মানুষেব প্রথম, মৃতেব বোধটি পবে। স্বপ্ন দেখে মানুষ প্রথম আভাস পায একটি স্বতন্ত্র জীবনেব, যাব অস্তিত্ব ও ক্রিয়া-কলাপ ইহলোকেব ন্যায় নয়। মৃতেব বোধ হ'তে মানুষ প্রথম বোঝে যে যাহা ছিল জীবন্ত তাহা এখন নেই। স্বপ্ন দেখে পবলোকেব বোধ হয়, মৃত দেখে সে বোধটি দৃঢ় হয়। বর্ব্বব মানুষ দল—দেবতাকেও, পবপাবেব অতি সামর্থ্যবান পুরুষ মনে কবে। দল-দেবতাব সামর্থ্য ও প্রকৃতি অনুসাবে দলেব প্রত্যেকেব জীবন, দেবতাব সংস্কাবানুযায়ী নিয়মিত হত। দেবতা-সংস্কারেব বোধে যে মনোভাবেব উদ্ভব হয়, তাব ইংবাজি নাম বিলিজিন্ (Religion)—যা দলকে ও দলেব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে শৃঙ্খলিত কবে (religion to bind) ও পুষ্ট কবে। ভাবতে ধর্ম্ম বলতে যা বোঝায় তা বিলিজন নয়। যাই হোক্, এই বকমে দলস্থ প্রত্যেকেব সংস্কাবেব মধ্যে একটি

ঐক্য আসে। বড় বড় দল যখন গঠিত হয়, তখন প্রবলের সংঘর্ষে শক্তিক্ষয় না ক'রে সব দলের মধ্যে ঐক্যসূত্র খুঁজে তার মধ্যে সামঞ্জস্য আনবার চেষ্টা হয় সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে। এই ব্যাপারের নাম দেওয়া হয় সাম্য ও মৈত্রী। এক জাতীয় স্বার্থ বা ঐক্যসূত্র খোঁজবার ফলে যে অভিজ্ঞতা আসে ও সেই স্বার্থ রক্ষার চেষ্টাতে যে ভূয়োদর্শনজাত প্রসারিত-জ্ঞান, তার নাম 'সভ্যতা', ভারত অভ্যুদয় স্বীকার করেন, যে অভ্যুদয় হ'তে নিঃশ্রেয়স কল্যাণ আসে। ঐ ভূয়োদর্শনজাত প্রসারিত-জ্ঞান, ভগবদ্বুদ্ধি প্রেরিত অথবা পবিত্রতা-মণ্ডিত হওয়াই ভারতের লক্ষ্য, আর তাহাই ভারতীয় সভ্যতা। ভারতের বুদ্ধি মানবতার অনুসন্ধান করতে চায় মনে প্রাণে—বচনে নয়, ভারত চায় সত্যকার মৈত্রী। শরীর ও মন, এই দুই নিয়েই মানুষ, অতএব, এই দু'য়ের উৎকর্ষতা বা অভ্যুদয় বিনা সামঞ্জস্য আনবার চেষ্টা বৃথা। দ্রঢিষ্ঠ-বলিষ্ঠ-কর্ম্ম-কঠোর শরীর ও অধ্যাত্ম বলে বলীয়ান নির্ভীক মন—দুই-ই চাই। ইহাই চায় ভারত।

বলেছি, সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে ঐক্যসূত্রের সাহায্যে নানা দলের মধ্যে সামঞ্জস্য আনবার চেষ্টা হয়। সমপ্রকৃতি-বিশিষ্ট একটি বড় দলের মধ্যে যে ঐক্য আসে, তাতে গ'ড়ে ওঠে 'সমাজ-চিত্ত'; সমাজ-চিত্তের সঙ্গে স্বাজাত্য-বোধ স্পষ্টভাবে যুক্ত হলে, আসে সংঘে আত্মবোধ। তখন সংঘকে আপনার প্রিয়তম প্রাণবান 'সমষ্টি-ব্যক্তি' ব'লে মনে হয়—সমাজের প্রত্যেকের। সমাজ-চিত্তে বিধি-ব্যবস্থা অর্থাৎ শৃঙ্খলা এলে, তার নাম হয় 'সংঘ'। সমাজ-চিত্ত মানে, দলের সমষ্টি মন (Group mind); সংঘ মানে শৃঙ্খলার দ্বারা নিয়মিত ঐ চিত্ত (Organised group mind বা Social mind)—ঐক্যমূলক। ট্রাইবের থাকে 'Herd mind'—দৈহিক স্বার্থ বিষয়ে সজাগ মন, ইহারই পরিণতি সমাজ-চিত্ত প্রভৃতি। সংঘবদ্ধ সমাজে আত্মবোধ উদয় হলে, সমাজকে আপন জন মনে হলে, সংহত-শক্তির প্রয়োজন হয়। এই সংহত-শক্তির প্রতাপ অসাধারণ। 'White man's burden', ধোলোর বোঝা, ধোলের দায়িত্ব, ধোলোর স্বার্থ ইত্যাদি কথাগুলি দল-চিত্তের (group mindএর) দৃষ্টান্ত। অনেকে Herd mind ও Group mindএর প্রভেদ স্বীকার করেন না। ধোলো-মন মানে, অতএব, বোঝায় এমন এক জাতীয় স্বার্থ, দায়িত্ব ও বোঝা, যা

অন্য জাতীয় স্বার্থাদিব মত নয়। সংহতি-শক্তিব উদয় হ'লে সংঘবদ্ধ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি, সমাজকে নিজেরই অভিব্যক্তি ব'লে ধাবণা করতে পারে এবং ঐ কাবণেই তাকে আপন জন মনে হয়। সংহতি-শক্তি থাকলে তবে সমাজ-চিত্তেব আশা আকাঙ্ক্ষা সার্থক হয়।

বর্ত্তমান সময়ে আমবা যে আমাদের সমাজকে অত্যাচাবী মনে কবি, তাব কাবণ, (১) আমাদেব সমাজে ঐ সংহতি-শক্তিব :একান্ত অভাব, (২) যেথানে সমাজ-বিধি ব্যক্তির ত্যাগ দাবি কবে, কোন পবিত্র স্মৃতিব উদ্দেশ্যে তুঃখ কষ্টকে স্বেচ্ছায় ববণ ক'রে নিতে বলে, শিক্ষিতদেব মধ্যে এমন লোক আছেন যিনি 'সবই কুসংস্কাব' এই অজুহাতে সমাজকে একেবারে উপেক্ষা ক'বে চলেন, অথচ শিক্ষিতেবাই সমাজ-সংস্কারে অগ্রসব! (৩) স্বার্থে আঘাত পডলে, যথন-তথন—সময়ে-অসময়ে—আমবা সমাজকে আঘাত কবতে ছাড়ি না, অথচ তুর্ব্বল সমাজকে সবল কববাব চেষ্টাও কবি না বা দাস-সুলভ-সমাজের হীনতাব সম্মুখে নির্ভীকতা ও আদর্শ দেখিযে সমাজেব সেই দোষ ক্ষালণ কববাব চেষ্টাও কবি না। সমাজ-সেবাব প্রবৃত্তি চাই। দেশ কাল ও অবস্থাব পবিবর্ত্তনে, অনেক নতুন ভাব, নতুন চিন্তা আসে, তথন সমাজ-চিত্ত নিজেব মতো ক'রে, ঐ সব ভাবধাবাব সঙ্গে তাল দিয়ে অগ্রসব হ'তে চায়। সংহতি-শক্তি না থাকলে সমাজ-জীবনেব দোষ সংশোধন হয না সহজে, গুণও ধবা পড়ে না সকলেব চ'থে, সমাজকে সুতবাং নীবস মনে হয়। বর্ত্তমানে আমাদের হয়েছেও তাই। স্বাজাত্যবোধ, সমপ্রকৃতিব-ও-রুচিব বোধকে ভিত্তি ক'বে এক একটি সমাজ গ'ড়ে ওঠে।

অবস্থানুসারে, সমাজেব সংস্কাব দবকাব হয়। এই প্রয়োজনবোধ সমাজ-চিত্তে আসা চাই। এই প্রয়োজন-বোধকে সজাগ করবাব জন্য চাই শিক্ষা, শিক্ষার বিস্তাব ও বহুল প্রচাব। নতুবা, কর্ম্মীব সহানুভূতিশূন্য কঠোর সমালোচনাব বিপবীত ফল হয়। যুগ যুগ ধ'রে, নিজ নিজ বিশিষ্টতা নিয়ে সমাজে আসে অনেক সংস্কার। এই সংস্কার-সমষ্টি, সমাজেব বৈশিষ্ট্য আনায়; অতএব, সামাজিক-বিশেষত্ব মানে, সমস্ত অতীতেব কেন্দ্রীভূত সংস্কাব যা ঘাতপ্রতিঘাতে বর্ত্তমান আকাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমবা যে জাতিব মধ্যে জন্মাই, সেই জাতিব ভাষা আমবা

পাই উত্তরাধিকারসূত্রে। জাতীয় ভাবেই হয়, প্রতি কথাটির অর্থ; এদিক্ দিয়েও, অতীত-ধারাই বর্ত্তমান আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। ভূয়োদর্শন, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সমস্তই উন্নতিপথের দিগদর্শন; যে জাতির মধ্যে আমরা জন্মাই, সেই জাতির চিন্তাধারা আমরা পাই মাতৃক্রোড় হ'তে। কোনটি প্রয়োজন, কোনটি অপ্রয়োজন, ঐ ধারাই বাছাই ক'রে নিতে পারে। অতীত আর ফিরে আসবে না, অতীতের মোহ কাটিয়ে নতুন ভাব দিয়ে সমাজকে গড়তে হবে—এসব বড় ঠিক কথা, কিন্তু তার মানে ইহা নয় যে সমাজের ভিত্তিশুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে বা আদর্শকেও ছেঁটে ফেলতে হবে। যদি নিজের মেরুদণ্ডকে বাতিল ক'রে দেবার আহাম্মকি কারোর হয়, তা হলে, সে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে ডেকে আনছে বলতে হয়। যে সব কারণে আমি বিদ্রোহী হচ্ছি, সেই সব কারণ দূর হয় যদি সংহতি-শক্তি আনতে পারা যায়, যদি সংঘকে আমাদের প্রতিনিধি ব'লে বরণ করি, ঐ সংহতি-শক্তিকে অবলম্বন ক'রে সমস্ত জিনিষ বিচার করি, সমালোচনা করি ও সিদ্ধান্তে উপনীত হই। এই রকম হলে তবে সে সমাজের সামাজিক-মর্য্যাদা (social value) থাকে, সে সমাজের আদর হয়, সে সমাজকে কেহই তুচ্ছ করতে পারে না। সংহতিশক্তির কার্য্যকুশলতায় উন্নতির পথ মুক্ত হয়।

সংহতি গঠনে চাই শিক্ষার প্রসার, চাই একতা। একতার শক্তি ভালবাসা। ভালবাসার বিনিয়োগ দরকার, চাই সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ, উদারতা, ক্ষমা। এগুলির অবশ্যম্ভাবী ফল, পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। ঐক্যশক্তির ফলে আসে শক্তিমান সংহতিশক্তিতে নেতার প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস, নেতাও প্রেমপূর্ণ হৃদয় নিয়ে সম্মিলিত জনশক্তির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন ও বহুর মতকে পরিচালিত করেন। এক্ষেত্রে বিশ্বাসের কারণ আদর্শ-জীবন। কিন্তু যেখানে একতা মানে একমাত্র সমস্বার্থের মিলনভূমি, সেখানে ভালবাসা অপেক্ষা ভেদবুদ্ধির কদর বেশী হয়। সেখানে ন্যায়ধর্ম্ম মানে, সমস্বার্থের দিক্ দিয়ে ন্যায় অন্যায় বুঝতে চেষ্টা করা। এক্ষেত্রেও নেতার উপর বিশ্বাস চাই, নেতাও বহুর মতে অনুগামী হন; তাঁর আচরণ, তাঁর জীবন তখন স্বার্থতাড়িত স্বাজাত্য-বোধের কষ্টি পাথরে যাচাই হয়।

উন্নতিব সঙ্গে মানুষের—সমপ্রকৃতি মানুষেব মধ্যেও—পবিবর্ত্তন আসে, রুচি ও পছন্দেব তাবতম্য হয, শাখা-প্রশাখায কচি ও পছন্দ নানা আকাবে প্রকাশ পায়। দল যখন বড হয, অন্যান্য বহুদলকে গ্রাস ক'বে বিপুলাকাব ধাবণ কবে, তখন ঐ সংহতি-শক্তিকে বাঁচিয়ে বাখবাব জন্য তাব মধ্যে ঐক্য-সূত্র খুঁজতে হয। সেই ঐক্যসূত্র তখন হয 'বিলিজন'। এই প্রণালীতে এক একটি জাতিব সৃষ্টি হয়। বিদ্যাচর্চ্চাব ফলে ও জ্ঞানবৃদ্ধিব সঙ্গে সেই সেই 'বিলিজন' সমালোচিত হ'তে থাকে, হযত প্রাচীন 'বিলিজনেব' মতবাদ চূর্ণ হ'য়ে যায়। এই রকম ধ্বংস ব্যাপাব কঠিন হয়—প্রায অসম্ভব হয—যদি বাস্তব আদর্শ-জীবনেব উপব সেই 'বিলিজনটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ধ্বংসব্যাপাব সাধিত হ'তে পাবে তখন, যখন ঐ বিলিজনেব অন্তর্ভূক্ত অধিকাংশ ব্যক্তি আদর্শ-জীবনকে কার্য্যতঃ না মানে, যখন উদাবতা যায, ও স্বার্থকেই শ্রেয় ব'লে মনে কবে এবং এইরূপে আদর্শ-জীবন জন্মান বন্ধ হয়ে যায়। আদর্শ-জীবনানুগ 'বিলিজন' খাডা হলে, মতবাদেব যতই সমালোচনা হোক, বাস্তব জীবন ও তাব আদর্শকে উডিয়ে দেওয়া যায় না।

সমাজেব উন্নতি ও শিক্ষাব বিস্তাব হলে, ব্যবহাবিক জীবনে বহু আদর্শ দেখা দেয়, কিন্তু সার্ব্বজনীন ঐক্যসূত্রেব আদর্শ বদলায না। এই ঐক্যসূত্রেব আদর্শকে সমাজে ফুটিয়ে তোলবাব উপায় আবিষ্কাব করতে হয়, যাতে ঐ আদর্শ-জীবনেব অনুরূপ আবো বড বড় জীবন জাতিব মধ্যে দেখা দেয়। যদি সার্ব্বজনীন বাস্তব আদর্শেব বদলে অন্য আদর্শ তাব স্থান অধিকাব কবে ও জাতিকে নতুন আদর্শে নতুন সমাজ গড়তে হয়, তখন প্রথম আদর্শ কার্য্যতঃ পবিত্যক্ত হ'লেও, সেই আদর্শকে ঐক্যসূত্র ব'লে গ্রহণ না কবলেও, তাব উপব একটা শ্রদ্ধাব ভাব থাকে, মহাত্যাগাদর্শই সকলেব শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবে; এই জন্যই তখন ঐ প্রথম ঐক্যসূত্রকে, সংহতিশক্তিব একটি নীতিমাত্র ব'লে গৃহীত হয়, যাব নামে সংহতি-শক্তি পবিচিত হয়—সংহতি-শক্তির একটি নামকবণ হয়। 'বিলিজনকে' তখন সমাজেব একটা বিশিষ্ট কোঠায ফেলা হয, অর্থাৎ সেটি তখন জাতীয নীতিব (National policyব) অন্তর্গত হয এবং নতুন আদর্শেব্ দ্বাবা ক্রমশঃ নিযমিত হ'তে থাকে। ঐ ভাবে সার্ব্বজনীন বাস্তব ঐক্যসূত্রেব বদলে অন্য আদর্শ গ্রহণ তখনই সম্ভব হয়, যখন জাতীয়-আদর্শ ঠিক্ হয়নি—জাতিব সংহতি-শক্তিব

মধ্যে ভোগাদর্শ ছাড়া অপর কোন মহত্তর আদর্শ প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেনি। এক কথায়—যখন সংহতি-শক্তির আশা আকাঙ্খা সার্ব্বজনীন আদর্শ পূর্ণ করতে 'পারেনা ও পারবেনা' ব'লে সমাজ-চিত্ত স্বীকার করে—তখনই নতুন আদর্শ গৃহীত হ'তে পারে, যে আদর্শ জাতির আবহমান-অর্জ্জিত-সংস্কারের পরিপোষক হয়। ট্রাইবের মধ্যে যদি কেবল লুণ্ঠনবৃত্তি ও আহার্য্যসংগ্রহের উদ্দেশ্য প্রবলতম থাকে, কোন আদর্শই যদি তখন ঐ ট্রাইবে দেখা না দিয়ে থাকে অথবা কোন আদর্শে নিষ্ঠা না থাকে, অথচ ঐ ট্রাইবটির অংশ-বিশেষ একটা আদর্শ চায়, তা হলে ঐ ট্রাইবের ঐ অংশ যখন যে দেশে যায়, সেই অংশ সেই দেশের আদর্শ খুব উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করে, নতুন জীবন পেয়ে। ইহা সম্ভব হয় যদি ঐ সব দেশে জাতির একটা অপেক্ষাকৃত বড় আদর্শ থাকে।

যে দেশে যিশু জন্মালেন, সে দেশ যিশুর ভাবগ্রহণের উপযুক্ত ছিল না—যিশুর ভাব তাদের সংস্কারোপযোগী নয়। পরে যে সব স্থানে তিনি প্রচারিত হলেন, সে সব স্থানে সমাজ-চিত্তের সংস্কার ছিল অন্যরূপ। সব জায়গায় ছিল দ্বৈতসংস্কার—ভোগমূলক সংস্কার। গ্রীস-রোমে যিশুর ভাব প্রচারিত হল, কিন্তু সে সব স্থানের জাতীয়-সংস্কার যিশুর অধ্যাত্ম-জীবনাদর্শ ধ'রতে পারলে না, ভোগাদর্শও ত্যাগ করতে পারলে না। ইহার ফল জাতিলোপ। ইউরোপেও পাদরীরা খুব উৎসাহের সঙ্গে নানা উপায়ে যিশুকে প্রচার করলেন, নতুন ভাবে সমাজাদর্শ গঠনের চেষ্টা চলতে লাগলো। মধ্যযুগে কয়েকজন মহাজন যিশুর জীবনাদর্শ নিয়ে আবির্ভূত হলেন। ইউরোপের তখনকার সংস্কার ছিল অন্য রকমের, তাই ইহার বহু পূর্ব্বেই রাজশক্তির সঙ্গে 'চার্চ্চের' বা পোপের বিরোধ আরম্ভ হয়, ক্রমে রাজশক্তিরই জয় হয়। বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হল, বিজ্ঞান একে একে প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করতে আরম্ভ ক'রে নিজের বিভূতি-শক্তি প্রমাণ করলে। চার্চ বা 'রিলিজনকে' কনষ্টান্টাইনের (Constantineএর) সময় হ'তে ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছিল, ফলে, সমাজ-জীবন পূর্ব্ব সংস্কার অনুযায়ী গ'ড়ে উঠতে সুরু হল। বিজ্ঞানের সঙ্গে খোলো-আদর্শ ঘোষণা করলে "প্রাকৃতিক শক্তিকে খাটিয়ে কত বেশী আরাম, কত বেশী ভোগসুখ, কত বেশী আহার-বিহার ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায়

তাই দেখতে হবে, তারির অনুকূল উপায় গ্রহণ করতে হবে" ইত্যাদি। যে নীতি অবলম্বিত হল, তার নাম হল Economy of Nature—জড়শক্তিকে খাটিয়ে নেওয়া। পূর্ব্ব-আদর্শকে বলা হত Christian Economy; সামাজিক-মূল্য সম্বন্ধে যিশুর উক্তি "What is a man profitted though he gains the whole world, and loses his own soul? For what should a man give in exchange for soul?"—'সমস্ত পৃথিবীর অধিকার পেয়েও যদি তোমার অধ্যাত্ম-জীবন নষ্ট হয় তাতে কি লাভ? কারণ মানুষ অধ্যাত্ম-জীবনের বিনিময়ে কি দিতে সমর্থ?" এই Christian Economy বা যিশুনীতির পরিবর্ত্তে আর একটি নীতি প্রচারিত হল—Political Economy—নিজদেশের ও অধীনস্থ দেশের রাজনৈতিক আর্থিক ব্যবস্থা। যিশুর বৈরাগ্যনীতি 'বচন' মাত্রে থেকে, জাতির পূর্ব্বসংস্কার প্রবল হওয়ায় মুশা প্রচারিত নীতিই গৃহীত হল, যার নাম Mosaic Economy বা Jewish Economy; এই নীতি মতে, সেই কর্ম্মই করণীয় যাতে মানুষ তার আচরণ বা কর্ম্মের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মূল্য বা মর্য্যাদা পায়—সে আচরণ ভগবৎ সেবারূপেই হোক্ অথবা ব্যবহারিক জীবনের সার্থকতালাভ করবার জন্য অন্য যে কোন কর্ম্ম হোক্। এই ধরণের সমাজে ব্যক্তির মূল্য বেড়ে গেল। ইহার ফল, ব্যবহারিকে স্বজাতির মধ্যে সামাজিক উদারতা, মহত্ত্ব, বীর্য্য প্রভৃতি গুণরাজির প্রকাশ। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমাজে—ব্যক্তির মূল্য বা মর্য্যাদা ঐ দিক্ দিয়ে। সমাজ হল, সুতরাং ব্যক্তি-তান্ত্রিক। সংহতিশক্তি রক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব-পণ-করতেও সদাপ্রস্তুত, ক্ষেত্রবিশেষে, ঐ সব সমাজের কিন্তু অপরের সঙ্গে ব্যবহার ক্রূরতা বর্জ্জিত নয়—বিজিতকে সম-আসন দিতে কুণ্ঠিত। ইংরেজের একটি বচন "Give him an inch and he will take an ell"—'আস্কারা দিলে আরো চেয়ে বসবে'। এই মনোবৃত্তি রাজনীতি ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হয়; ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত রাজনীতি-বিশারদ পণ্ডিত মেচিয়াভেলির (Machiavelia—১৪৩৯-১৫২৭) রাজ্যশাসন বিধিতে 'Divide and govern'—'ভেদসৃষ্টি কর ও শাসন কর'—এই নীতি প্রয়োগের উপদেশ আছে। ঐ নীতি প্রাচীন রোমেও অনুসৃত হত। অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা হ'তে যে সংহতি-শক্তির আবির্ভাব হয় তার মূলে থাকে ভয়, সুতরাং সে সহসা অপরকে

বিশ্বাস করেনা, সদা সন্দিগ্ধ থাকে এবং স্বসমাজের বা অপর সমাজ হ'তে আগত গল্প-গাথার মধ্যে উর্ব্বর কল্পনার সাহায্যে যেমন সুন্দর অর্থই দেওয়া হোক্ না কেন, সে সব অর্থ শিক্ষিত মনকেই আকর্ষণ করে—আকর্ষণ করে মাত্র—ও জন-সাধারণ ঐ শিক্ষিত মনের অর্থ মাত্র গ্রহণ ক'রেই তৃপ্ত থাকে; কিন্তু আদর্শময় বাস্তব জীবন অভাবে ঐ সব কল্পিত অর্থ ধীরে ধীরে জাতির অধঃপতন আনায় ও একটা প্রবল আঘাতে, একটা বিরাট সংঘর্ষে, চূর্ণ হয়ে যায় ও হয়ত লোপ পায়। জাতীয় সংস্কারের সঙ্গে খাপ না খেলে জীবনও সুষ্ঠুভাবে গ'ড়ে উঠতে পায় না, 'রিলিজন' ও আচরণ (conduct) সে ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে পারেনা, অপরন্তু, বাস্তব আদর্শময় জীবন দে'খে অনুষ্ঠানাদিতে যে সব অর্থ দেওয়া হয় অর্থাৎ তদ্‌ভাব-বঞ্চিত গল্প-গাথার মধ্যে যে সব অর্থ দেওয়া হয়—তাতে অবশ্যম্ভাবী অভ্যুদয় আনায়, জীবনের গতি ফিরে যায়, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাচরণে অসামঞ্জস্য থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিক্ষা, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক অবস্থাভেদে ধর্ম্মাচার নানা রকম হ'লেও, যেখানকার যা আচার তার পালনেই ধর্ম্ম—এই উদার নীতি গৃহীত হয়, কোন আচারের সঙ্গে ধর্ম্মের বিরোধ থাকে না। ইহাই হিন্দুর ভাব।

মা ও শিশুর মধ্যে ঐক্যসূত্রের কথা গোড়ায় বলেছি। সে ঐক্যসূত্রটি ভালবাসার। ভালবাসা আসছে দুটি প্রাণী হ'তে অর্থাৎ দুটি 'অহং' হ'তে। অহং-বোধটি ঐ দুটিতেই পরিস্ফুট, ঐ অহং-বোধের শক্তিই ভালবাসা, যা দুটিকে একই সূত্রে গেঁথে রেখেছে। স্বপ্নে শিশু আর এক রাজ্যের সন্ধান পায়। সে রাজ্যে সে হয়ত হাসে বা কাঁদে, খেলা করে বা জেগে উঠে তার অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। অজ্ঞাতসারে তার অহংটির পরিধি বেড়ে যায়, জ্ঞাতসারে সে অহংটিকে বাড়াবার চেষ্টা পায়। ইহা সে পরিধার বুঝতে আরম্ভ করে কিশোর অবস্থা হ'তে। পরিধি বেড়ে যাবার সঙ্গে একটি জিনিষ জোর ক'রে তাকে বুঝিয়ে দেয়—সে বেশ বুঝতে পারে যে, তার ছোট্ট অহং, অন্য সব অহং এর উপর নির্ভর করে, অন্য সব অহংএর মধ্যেই সে বেঁচে আছে, নতুবা মাত্র ছোট্ট অহং নিয়ে সে বাঁচতেই পারত না। অপরাপর অহংগুলি দে'খে, তার মধ্যে একটি অহং অর্থাৎ সবগুলি নিয়ে একটি অহং—এই বোধ উদয় হয়, পরে বোঝে যে সেটি

সম-প্রকৃতি-মিলিত-সমাজ-চিত্তেরই ছায়া—যার নাম 'অহংচিত্ত' দেওয়া যায়। সম-প্রকৃতি মানে, অন্য সব চিত্তে নিজ-অহংএরই প্রতিবিম্ব। সে তখন অস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারে যে, সমষ্টির অস্তিত্বেই ব্যষ্টির অস্তিত্ব, যে, সমষ্টির জন্যই ব্যষ্টির কর্ম্মপ্রেরণা। এ অবধি কিশোর বা যুবার ঐ 'সমষ্টি' মানে 'দলচিত্ত' (Group mind)। দলচিত্তের শক্তি তাকে একটি প্রীতিসূত্রে গ্রথিত করেছে। যে সমাজ ঐ মূল স্বার্থহীন ভালবাসার সূত্রকে অবলম্বন ক'রে গ'ড়ে ওঠে, সে সমাজ-চিত্ত মানে Group mind বা দলচিত্ত নয়, সে সমাজ মানে মানব-চিত্ত, সেই 'অহং-চিত্ত' তখন মানবতারই দ্বিতীয় মূর্তিরূপে আত্মবিকাশ করতে চায়—মানবতা বিশ্বচিত্ত রূপে প্রতিভাত হ'তে চায়। প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা সকলকেই মোহগ্রস্ত করে। নৈসর্গিক প্রচণ্ডতা দেখে যে সমাজ ভয় পায় ও তার উপাসনা করে, সে সমাজ ক্ষমতারই উপাসনা করে ও তার 'রিলিজন' বা রিলিজনের সংস্কার বিভূতি-বহুল হয়—সে বিভূতিরই উপাসনা করে, সে সমাজ, অতএব, ক্ষমতার বিস্তারকেই আদর্শ ক'রে নেয়, বিভূতিকে খাটিয়ে আপন ভোগসুখে লাগাতে চায়, কিন্তু যে সমাজ ঐ ভালবাসা-সূত্রের রহস্যোদ্ঘাটন-রত হয়, সে সমাজ ঐ সমস্ত প্রচণ্ডতাকে এবং প্রকৃতির কোমলতা, মৃদুতা, ও সৌন্দর্য্য-সুষমাকে আপন ক'রে নিতে চায়, তখন সুরকেন্দ্র স্পর্শে বিভোর হ'য়ে সিংহনাদে সে ঘোষণা করে, "ঐ যা দেখছ, সবই একেরই বিকাশ, একেরই বহুরূপে প্রকাশ—প্রভেদ শুধু মাত্রায়, আধার-জনিত অধিকারে, ঐ যে প্রকৃতির 'একাধারে' ভীষণতা ও কোমলতা, নিষ্ঠুরতা ও অনুকম্পা, তাকে ভগবচ্ছক্তিই বল আর যাই বল, সেখানে আধার ও আধেয় একই বস্তু।" সুতরাং, সমাজ, ঐ 'একাধারে' নৃশংসতা ও কমনীয়তার উপাসনা করে। সে যখন নিজের ঐহিক বল-সামর্থ্যের সঙ্গে তুলনা করে, সে দেখতে পায় যে দিব্য-বিভূতির বল অসীম, সুতরাং সে আপন বল ও সামর্থ্য অপেক্ষা উচ্চাধিকারের কাছে মাথা নত করে, কিন্তু জানে সে যে, ঐ 'একাধার'টি তার অহং-চিত্তেরই ভিন্ন প্রকাশ, যে প্রত্যেক মানুষই এক একটি শক্তিকেন্দ্র।

সমাজের অভ্যুদয় সম্ভব হয় সংহতি-শক্তির যথাযথ প্রয়োগ কুশলতায়। এই প্রয়োগের নাম বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। বৃত্তিভেদে বর্ণ ছিল চারিটি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। বৃত্তির নিরূপক ছিল গুণ ও কর্ম্ম। দ্বিজ মানে

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। এই চারিবর্ণ ছাড়া বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত অপর সকলের সাধারণ নাম ছিল অনার্য্য, যবন প্রভৃতি। সমাজ ছিল বেদানুগ। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম—এই চারিটি পৈঠা। আধ্যাত্মিকতাকে জীবন্ত ক'রে রেখেছেন ভারতের সন্ন্যাসীরা আজও। আশ্রম বিভাগও এক রকম অধিকারবাদ। এ অধিকারবাদ একটি দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় ছিল না। প্রথম আশ্রম হ'তেই একেবারে ৩য় বা ৪র্থ আশ্রমে যাবার অধিকার ছিলঃ বৈরাগ্যবানের। হস্তামলকের মত মহাজন আবার সর্ব্ববিধি বহির্ভূত। আজন্ম কুমার বা ব্রহ্মচারীও অনেকে থাকতেন। এরকম অধিকারবাদ মানে, মানসিক শক্তি বিকাশের জন্য, যোগ্যতা অর্জ্জন করবার জন্য, বিভিন্ন শ্রেণী, বিভিন্ন শিক্ষা। গুণকর্ম্মানুসারে স্ব স্ব বর্ণের আচরণেরই নাম 'স্বধর্ম্ম'। ঐ গুণকর্ম্মের ব্যতিক্রম, স্বপ্রকৃতির বিপর্য্যয়, সর্ব্বদাই 'ভয়াবহ'! যাঁরা বেদ-বিদ্যালাভ করতেন, যাঁরা তপস্যার দ্বারা অধ্যাত্ম জ্ঞান অর্জ্জন করতেন, তাঁরাই ছিলেন দ্বিজ। শিক্ষার জন্য তখন 'কর' বা 'টেক্‌সো' দিতে হ'ত না, বিদ্যার্থীর অন্নবস্ত্রের জন্য ভাবনাও ছিল না, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অর্থাৎ প্রথম শিক্ষার্থীকে নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করতে হত। গুরুই শিক্ষার্থীদের সকল ভার নিতেন। যাতে অন্নবস্ত্রাভাবে আশ্রম অচল না হয়ে পড়ে, তা দেখতেন রাজা ও ধনীরা। শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত থাকলেও, গুরুগৃহে বাস সবাই করতে পারত না। যারা তা না পারত তারাই ছিল শূদ্র। আশ্রমে যে বিদ্যা শেখান হত, তার নাম ছিল ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা। চরিত্র বল ও চারিত্র্য থাকলে, অজ্ঞাত ব্যক্তিরও আশ্রমে প্রবেশ ক'রে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করবার কোন বাধা থাকত না। ব্রহ্মবিদ্যার রহস্য মুখে-মুখে গুরু পরম্পরায় চলে আসত। রহস্য মানে সাধনতত্ত্ব।

মোক্ষ-ধর্ম্মের অধিকারী ছিলেন সন্ন্যাসী। কিন্তু যখন কোন অধিকার-গ্রহণ-শক্তির বিচার না ক'রে সর্ব্বক্ষেত্রে এ মোক্ষধর্ম্ম জোর ক'রে চালান হ'ল বৌদ্ধ-যুগে, যখন এক একটি মঠে অসংখ্য অসংখ্য সন্ন্যাসীর দলে দেশ পূর্ণ হ'তে লাগল, তখন হ'তে বর্ত্তমান অধঃপতনের যুগ আরম্ভ হ'ল। অধ্যাত্ম বিদ্যার সঙ্গে লৌকিক বা অপরা বিদ্যাও জড়িত, কিন্তু সেই বিদ্যাকে তখন হেয় ব'লে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হ'তে লাগল। যে বেদ অন্নকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন ও ব্রত করতে বলেছেন, সেই অন্নকরী বিদ্যাকে উপেক্ষা ক'রে—

'ক্ষণভঙ্গুব জীবনে অত আয়োজনেব কি দবকাব'—ইত্যাদি নীতিবই বহুল প্রচাব-ফলে ভাবতে এসেছে জডতা, হিন্দুকে সকল দিকে পঙ্গু কবে বেখেছে। "সোঽন্নবসময়"—তিনি অন্নবসময়—এই ভাব নিয়ে গৃহস্থকে অর্থেব জন্য উত্তম কবতে হত। আদর্শ হ'তে গৃহী দূবে থাকতেন না, আদর্শেব সঙ্গে তাঁব ছিল নিকট সম্পর্ক। ভালবাসা-ৰূপ সূত্রেব বহস্যোদ্ঘাটন ব্যাপাবটি ভাবুকতা বা অন্ধ আচবণ ও তাব সংস্কাব (convention) নয়।

গৃহস্থাশ্রমেব পব বানপ্রস্থাশ্রম। বন মানে নিবালাস্থান—সংসাবেব নানাবকম কোলাহল হ'তে দূবে—জঙ্গল নয়। যাঁবা ঋষিত্ব লাভোদ্দেশ্যে ঐ বকম স্থানে বাস কবতেন তাঁবাই বানপ্রস্থাবলম্বী। বানপ্রস্থাশ্রম ছিল ঋষিব আশ্রম। গৃহস্থ ঋষিও ছিলেন। নদীব অপব পাবে পুরুষেবা (ঋষিবা) বৎসবেব কযেক মাসেব জন্য বা দীর্ঘকালেব জন্য তপস্যা কবছেন, এ পাবে ঋষিপত্নী ও ঋষি কন্যাবা, দেব-আবাধনায়, তপস্যায় ও অন্যান্য নানা কাজে অতি আনন্দে দিন যাপন কবছেন, নিজ নিজ পতিব বা পিতাব মঙ্গল কামনা কবছেন—এবকম দৃষ্টান্তও বিবল নয। এই আশ্রমগুলিব নাম ছিল ঋষিব আশ্রম—ঋষিত্বলাভ কববাব আশ্রম। এই সব তাপসকুল হ'তে যে 'আবণ্যক-বিদ্যা' প্রকাশ হয়, তা আজও বৈদিক যুগেব মহিমা ব্যক্ত কবছে। ভাবত অবণ্যকেও তপস্যা-ভূমিতে পবিণত কবেছিলেন।

প্রথম আশ্রম হ'তেই আবম্ভ হত সংযম শিক্ষা। সংযম মানে, মনকে সংস্কাবেব দাস হ'তে না দেওয়া। গৃহস্থ এমন সন্তান চাইতেন, যাব দ্বাবা কুল পবিত্র হয়, দেশ ধন্য হয়, মানবেব কল্যাণ হয়। এই বকম সন্তান কামনাব নাম প্রজাবর্দ্ধন-ইচ্ছা। আজও ব্রহ্মচর্য্যপবায়ণ গৃহীব আদর্শ ভাবতে বিলুপ্ত হয নি। গৃহীকে বীবেব মত জীবন সংগ্রামে আদর্শময় জীবনযাপন কবতে হত। আদর্শ সকল সময়েই, সর্ব্বক্ষেত্রে, ঐ ভালবাসা-ৰূপ-ঐক্যসূত্র। ঐ সূত্র ধ'বেই সকল আশ্রমীদেব চলতে হত, পথ ছিল—ত্যাগ। গৃহস্থ জীবনে, পতি সম্পর্কেই সতিব সহধর্ম্মিণীত্ব ও সতীত্ব, অন্যান্য সম্পর্কে সতী বিশ্বমাতা! ঐ ঐক্যসূত্র জীবনপণ ক'বে ধ'বে থেকে পবিত্রতা ও নিষ্ঠা বক্ষাব জন্য সদা-প্রস্তুত-সর্ব্বস্ব-ত্যাগ্-কবতে, এই দৃঢতা ও তাব ফলে ঐ ঐক্যসূত্রেব সঙ্গে নিজেব ঐক্যানুভূতিব জন্যই সতীত্বেব মহিমা ঋষিমুখে, সাধুমুখে ও শাস্ত্রমুখে ব্যক্ত। সতীত্বে বিদ্রোহ ভাবেব স্থান নেই।

সতী শ্রদ্ধারূপিনী। ঋষিযুগে (বৈদিক যুগে) ব্রহ্মবাদিনী নারীও ছিলেন। নারী মানে ছিল তখন নেত্রী। সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেদমন্ত্রের কয়েকটি মন্ত্রের ঋষি—নারী। সেই যুগে, নারীকেও গুরুগৃহে গিয়ে বিচার করতে দেখা যায়। মদালসা ছিলেন রাজরাণী। তিনি তাঁর ছেলেদের সন্ন্যাসগ্রহণোপযোগী শিক্ষা দেন, একে একে তাঁর পুত্রগুলি সন্ন্যাসী হয়ে যান। শেষে তাঁর একটি পুত্র হয়। পতির ইচ্ছাতে অর্থাৎ রাজার ইচ্ছাতে, মদালসা তাঁর এই শেষ বংশধরকে মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ দেননি। শেষে স্বামীর ইচ্ছায় মদালসা তাঁর সঙ্গে বানপ্রস্থাবলম্বন করেন। সন্তানবতী হ'য়েও কি নির্ব্বিকার নারী ছিলেন তিনি, কি পতি-আনুগত্য ছিল তাঁর, কি প্রজাবৎসল ছিলেন তিনি, কি স্বাধীনচিত্ত ছিল তাঁর। ভালবাসা-রূপ ঐক্য-সূত্রের সঙ্গে একাত্ম হওয়ায় ইহা সম্ভব হয়েছিল। ভারতে গোড়া হ'তে ভোগের আদর্শ ছিলনা, ছিল "ঈশাবাস্যং" ক'রে নেবার আদর্শ। দ্রঢিষ্ঠ-বলিষ্ঠ-শরীর প্রয়োজন অভ্যুদয়ের জন্য—বিলাস-বাসনা তৃপ্তির জন্য নয়। সন্ন্যাস আশ্রমই ছিল শেষ আশ্রম।

শিক্ষার উদ্দেশ্য, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে পূর্ণপ্রকাশ করা—'ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য'। এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হলে চাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। শিশু-জীবন, কিশোর-জীবন, যৌবন—সবই নানারকম সংস্কার-বিড়ম্বিত মনের গতি, তারপর আছে পারিবারিক জীবন, পারিবারিক সংস্কার, সামাজিক জীবনের সংস্কার, জাতীয় সংস্কার প্রভৃতি বহু-বহুধা-বিভক্ত অসংখ্য সংস্কার। এই সমস্ত সংস্কার-ভার নিয়ে মানবতা লাভোদ্দেশ্যে, অধ্যাত্ম-সংস্কার সহায়ে সর্ব্বপ্রকার গণ্ডীবদ্ধ সংস্কারকে ঠেলে আত্মবিকাশ করা, সমস্ত সংস্কারের উপর প্রভু হয়ে থাকা—এই রকম সংস্কার-বর্জ্জনের বা সর্ব্বসংস্কারের উপর আধিপত্য স্থাপনের নামই সন্ন্যাস। সাধারণতঃ মনে হয় ঐ সব সংস্কার জয় করা অসম্ভব, কিন্তু ভারত বারবার প্রমাণ করেছেন যে, অধ্যাত্ম-সংস্কার ও আদর্শ-জীবন এই অসাধ্য-সাধন করে, অসম্ভব সম্ভব করে, জগতের মহাপুরুষ-জীবন সর্ব্বকালে প্রমাণ করেছে যে, এই অসাধ্য-সাধনে জীবন আনন্দময় হয়ে যায়। সন্ন্যাস একটি আশ্রম—প্রাণময় অধ্যাত্ম-সংহতি-শক্তি। যিনি যে সম্প্রদায়ের লোকই হোন না কেন, সন্ন্যাসী হলেই তিনি স্বাধীন, সর্ব্বত্রচারী, ও যতক্ষণ না তিনি

সমস্ত সংস্কার হ'তে মুক্ত হ'তে পারেন, তিনি আশ্রমবাসী। আশ্রমাতীত অবস্থা-লাভ করা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার অধীনতা হ'তে মুক্ত হওয়ার নাম 'পরমহংস' অবস্থা। সংস্কার-মুক্ত হ'লে 'অহংচিত্ত' হয়ে যায় 'বিশ্ব-চিত্ত'—সমাজচিত্তের সিদ্ধি, সমাজ-চিত্ত-সংস্কারকে অতিক্রম করা।

সন্ন্যাসী, সমাজচিত্তের পূর্ণরূপ, অপরূপ রূপ, সমাজ-চিত্তের চলমান বিগ্রহ। নিজের জন্য সন্ন্যাসীর কোন কর্ম্ম থাকে না, তাঁর সমস্ত কর্ম্ম লোকহিতায়, সর্ব্বপ্রকার বিধি-নিষেধের পার, সর্ব্বসংস্কার বিমুক্ত আশ্রমাতীত 'পরমহংস' সন্ন্যাসাশ্রমের চরম ফল। 'পরমহংস' শরীর ধারণ ক'রে থাকেন একমাত্র আনন্দকে অবলম্বন ক'রে; কারণ, সংস্কার-বিমুক্তির পর কোন একটা অবলম্বন বিনা শরীর থাকতে পারেনা। শরীর রক্ষা করা তাঁর ইচ্ছা সাপেক্ষ। এই 'পরমহংস' অবস্থার মধ্যে বিশেষ আধিকারীক পুরুষ তাঁরাই যাঁরা ঐ ব্রহ্মানন্দ-জনিত আনন্দ বিশ্বে বিলিয়ে দিয়ে যান।

জাতি, সমাজ ও সভ্যতা

হিন্দু সমাজ ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বৌদ্ধ প্লাবনে। তখন মঠে মঠে লাখ লাখ সন্ন্যাসী, ভারতের দুই তৃতীয়াংশ বৌদ্ধ। ভিক্ষুদের কঠোর নিয়মে সমগ্র সমাজকে নতুন ভাবে গড়বার চেষ্টায়, সমাজ-শক্তি বিধ্বস্ত হয়, যোগ্যতানুযায়ী অধিকারে বা আশ্রম-বিভাগে প্রচণ্ড আঘাত পড়ে; শিক্ষায় স্তর বিভাগের আবশ্যকতায় সন্দেহ এসে শিক্ষা বন্ধ হবার উপক্রম হয়, ফলে, জাতির মধ্যে জড়তা আসে। এই জড়তা কি আজও দূর হয়েছে? ঐ প্লাবনের এই সব দোষ সত্ত্বেও—

"পশুমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি বহুল কর্ম্মকাণ্ডের প্রাণ-নিষ্পীড়ক ভার হইতে সমাজকে সদাচার ও জ্ঞানমাত্রাশ্রয় জৈন, এবং অধিকৃত জাতিদিগের নিদারুণ অত্যাচার হইতে নিম্নতরস্থ বৌদ্ধ-বিপ্লব ভিন্ন কে রক্ষা করিত? কালে যখন, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল সদাচার মহা অনাচারে পরিণত হইল ও সাম্যবাদের আতিশয্যে স্বগৃহে প্রবিষ্ট নানা বর্ব্বর জাতির পৈশাচিক নৃত্যে সমাজ টলটলায়মান হইল, তখন যথাসম্ভব পূর্ব্বভাব পুনঃ স্থাপনের জন্য শঙ্কর ও রামানুজের চেষ্টা।" (বর্ত্তমান ভারত—স্বামীজি]। "পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষা বিস্তার সত্ত্বেও শূদ্র-জাতির অভ্যুত্থানে

একটি বিষম প্রত্যবায় আছে, সেটি গুণগত জাতি। ঐ গুণগত জাতি এতদ্দেশেও প্রচার থাকিয়া শূদ্রকুলকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শূদ্রজাতির একে বিদ্যার্জ্জন বা ধন সংগ্রহের সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে দুই একটি অসাধারণ পুরুষ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হয়, অভিজাত সমাজ তাহাকে তৎক্ষণাৎ উপাধি মণ্ডিত করিয়া আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লয়। তাহার বিদ্যার প্রভাব, ধনের ভাগ, অপরজাতির উপকারে যায়, আর তাহার নিজের জাতি তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ধনের কিছুই পায় না। শুধু তাহাই নহে, উপরিতন জাতির আবর্জ্জনা রাশি স্বরূপ অকর্ম্মণ্য মনুষ্য সকল শূদ্রবর্ণে নিক্ষিপ্ত হয়।

বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবর ব্যাস, অজ্ঞাত পিতা কৃপ, দ্রোণ, কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা ও বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল, তাহাতে বারাঙ্গনা, দাসী, ধীবর বা সারথিকুলের কি লাভ হইল বিবেচ্য। আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকুল হইতে পতিতেরা সততই শূদ্রকুলে সমানীত হইত।

আধুনিক ভারতে শূদ্রকুলোৎপন্ন মহা পণ্ডিতের বা কোটীশ্বরের ও স্বসমাজ ত্যাগের অধিকার নাই। কাজেই তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির ও ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইয়া স্বীয় মণ্ডলীর উন্নতি কল্পে প্রযুক্ত হইতেছে। এই প্রকার ভারতের জন্মগত জাতি, মর্য্যাদা অতিক্রমে অসমর্থ হইয়া বৃত্তমধ্যগত লোক সকলের ধীরে ধীরে উন্নতি বিধান করিতেছে। যতক্ষণ ভারতে জাতিনির্ব্বিশেষে দণ্ডপুরস্কার-সঞ্চারকারী রাজা থাকিবেন, ততক্ষণ এই প্রকার নীচ জাতির উন্নতি হইতে থাকিবে।" (ঐ ঐ)। গুণগতজাতির দোষের দিক্ যা স্বামীজি দেখিয়েছেন, সেই দিকে ভবিষ্যৎ সমাজ-সংস্কারকগণের দৃষ্টি পড়া বিশেষ আবশ্যক। সামাজিক ব্যবস্থা যদি একরকম হয় যে যাঁরা 'স্বসমাজ' হ'তে' উত্তোলিত' হবেন, তাঁদের 'স্বসমাজের' উন্নতির চেষ্টা করতেই হবে তাহলে বোধহয় সমস্যার সমাধান অনেকটা হয়। এই ধরণের একটা ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়।

"এই মোক্ষ মার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই। এই জন্য, ঐ যে কথা শুনেছ যে মুক্ত পুরুষ ভারতেই আছে, অন্যত্র নয়, তা ঠিক। তবে পরে অন্যত্রও হবে। সে ত আনন্দের বিষয়। · হিন্দুশাস্ত্র বলেছেন যে, 'ধর্ম্মের' চেয়ে 'মোক্ষটা' অবশ্য অনেক বড়—কিন্তু আগে ধর্ম্মটি করা চাই।...পূর্ব্বেই বলেছি যে 'ধর্ম্ম' হচ্ছে কার্য্যমূলক। ধার্ম্মিকের লক্ষণ হচ্ছে সদা কার্য্যশীলতা।... 'ঈশ্বর ধ্যানে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি,' হরিনামে সর্ব্বপাপ নাশ' 'শরণাগতের সর্ব্বাপ্তি', এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্য সাধুবাক্য

অবশ্য সত্য; কিন্তু দেখতে পাচ্ছ যে লাখো লোক 'ওঁকার জপে মচ্ছে, হরিনামে মাতওয়ারা হচ্ছে, দিনরাত 'প্রভু যা করেন' বলছে এবং পাচ্ছে ঘোড়ার ডিম্। তার মানে বুঝতে হবে যে কার জপ যথার্থ হয়? কার মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ? কে শরণ যথার্থ নিতে পারে? যার কর্ম্ম ক'রে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, অর্থাৎ যে ধার্ম্মিক।...সত্ত্ব প্রাধান্য অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরম ধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃ প্রাধান্যে ভালমন্দ ক্রিয়া করে, তমঃ প্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় জড় হয়। এখন বাইরে থেকে, এই সত্ত্বপ্রধান হয়েছে কি তমঃ প্রধান হয়েছে কি ক'রে বুঝি বল? সুখ দুঃখের পার ক্রিয়াহীন শান্তরূপ সত্ত্ব অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণহীন, জড়প্রায়, শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন, মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে, চুপ করে ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছি, এ কথার জবাব দাও—নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। জবাব কি আর দিতে হবে—'ফলেন পরিচীয়তে'। সত্ত্ব-প্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, শান্ত হয়, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়, সে শান্তি মহাবীর্য্যের পিতা। সে মহাপুরুষের আর আমাদের মত হাত পা নেড়ে কাজ করতে হয় না, তাঁর ইচ্ছামাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই পুরুষই সত্ত্বগুণ প্রধান ব্রাহ্মণ, সর্ব্বলোক পূজ্য, তাঁকে কি আর 'পূজা কর' বলে পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়াতে হয়? জগদম্বা তাঁর কপাল ফলকে নিজের হাতে লিখে দেন যে, এই মহাপুরুষকে পূজা কর, আর জগত অবনত মস্তকে শোনে। সেই মহাপুরুষই 'নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ' ইত্যাদি। আর ঐ যে মিনমিনে পিন্‌পিনে ঢোঁক গিলে কথা কয়, ছেঁড়া ন্যাতা সাতদিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না, ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ।...মোক্ষমার্গ ত প্রথম বেদই উপদেশ করেছেন। তারপর বুদ্ধই বল, আর যিশুই বল, সব ঐখান থেকেই ত যা কিছু গ্রহণ। আচ্ছা, তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী—'নির্বৈর সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'—বেশ কথা, উত্তম কথা। তবে জোর করে দুনিয়া শুদ্ধকে ঐ মোক্ষমার্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেন? ঘসে মেজে রূপ, আর ধরে বেঁধে পিরীত কি হয়? যে মানুষটা মোক্ষ চায় না, পাবার উপযুক্ত নয়, তার জন্য বুদ্ধ বা যিশু কি উপদেশ করেছেন বল—কিছুই নয়। হয় তুমি মোক্ষ পাবে বল, নয় উৎসন্ন যাও, এই দুই কথা।...কেবল বৈদিক ধর্ম্মে এই চতুর্ব্বর্গ সাধনের উপায় আছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।.. বৌদ্ধধর্ম্মের আর বৈদিক ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক। তবে বৌদ্ধ মতের উপায়টি ঠিক নয়। উপায় যদি ঠিক হত, ত আমাদের সর্ব্বনাশ কেন হল? 'কালেতে' হয় বল্লে কি চলে? কাল কি কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ছেড়ে কাজ করতে পারে?

অতএব উদ্দেশ্য এক হলেও, উপায়হীনতায় বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষকে পাতিত করেছে।...উপায় হচ্ছে—বৈদিক উপায়,—'জাতিধর্ম্ম,','স্বধর্ম্ম' যেটি বৈদিক ধর্ম্মের বৈদিক সমাজের ভিত্তি...এই 'জাতি ধর্ম্ম,' 'স্বধর্ম্ম' সকল দেশে সামাজিক কল্যাণের উপায়, মুক্তির সোপান। ঐ 'জাতিধর্ম্ম,' 'স্বধর্ম্ম' নাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশটার অধঃপতন হয়েছে। তবে নিধুরাম সিধুরাম যা জাতিধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম বলে বুঝেছেন, ওটা উল্টো উৎপাৎ। নিধু জাতিধর্ম্মের ঘোড়ার ডিম্ বুঝেছেন, ওঁর গাঁয়ের আচারকেই সনাতন আচার বলে ধারণা কচ্ছেন, নিজের কোলে ঝোল টানছেন, আর উৎসন্ন যাচ্ছেন। আমি গুণগত জাতির কথা বলছি না, জন্মগত জাতির কথা বলছি।...আপাততঃ এইটি বোঝ যে, জাতিধর্ম্ম যদি ঠিক্ ঠিক্ থাকে, ত সে দেশের অধঃপতন হবেই না। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে আমাদের অধঃপতন কেন হল? অবশ্যই জাতিধর্ম্ম উৎসন্ন গেছে। অতএব যাকে তোমরা জাতিধর্ম্ম বোলছো, সেটা ঠিক্ উল্টো উৎপাৎ।"

'জাতি ধর্ম্ম ঠিক থাকলে দেশেব অধঃপতন হবেই না'—স্বামীজিব এই বাণী প্রত্যেক স্বদেশ ভক্তেব হৃদয়ে গেঁথে বাখা উচিত।

"পূর্ব্বেই বলেছি যে, প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষের প্রতিভাবলে, প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতিনীতি, সেই উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী হ'য়ে গড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতির জীবনে ঐ উদ্দেশ্যটি এবং তদুপযোগী উপায়রূপ আচার ছাড়া, আর সমস্ত রীতিনীতিই বাড়ার ভাগ। এই বাড়ার ভাগ রীতিনীতি গুলির হ্রাস বৃদ্ধিতে বড় এসে যায় না, কিন্তু যদি আসল উদ্দেশ্যটিতে ঘা পড়ে, তখুনি সে জাতির নাশ হয়ে যাবে।"]

স্বামীজির এই সাবধান বাণী প্রত্যেক ভারতবাসীর সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

["হিন্দু বলছেন কি যে, রাজনৈতিক, সামাজিক স্বাধীনতা বেশ কথা কিন্তু আসল জিনিষ হচ্চে পারমার্থিক স্বাধীনতা—মুক্তি। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য, বৈদিক বল, জৈন বল, বৌদ্ধ বল, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত যা কিছু বল, সব ঐখানে একমত। ঐখানটায় হাত দিওনা, তা হলেই সর্ব্বনাশ, তা ছাড়া যা কর চুপ ক'রে আছি। লাথি মার, কাল বল, সর্ব্বস্ব কেড়ে নও, বড় এসে যাচ্ছে না। এই দেখ বর্ত্তমান কালে পাঠান বংশেরা আসছিল, যাচ্ছিল কেউ সুস্থির হয়ে রাজ্য কর্ত্তে পাচ্ছিল না। কেন না,—ঐ হিঁদুর ধর্ম্মে ক্রমাগত আঘাত কচ্ছিল। আর মোগল রাজ্য কেমন সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠ, কেমন মহাবল হ'ল। কেন? না মোগলেরা ঐ যায়গাটায় ঘা দেয় নি। হিন্দুরাই ত মোগল সিংহাসনের ভিত্তি; জাহাঙ্গীর, সাজাহান,

দাবাসেকো, এদের মা যে হিন্দু। আর দেখ, যেই পোড়া আবঙ্গজেব ঐ খানটাই যা দিলে, অমনি অত বড় মোগল রাজ্য স্বপ্নের ন্যায় উড়ে গেল।" স্বামীজি বলছেন যে হিন্দুর 'প্রাণ পাখীটি' রয়েছে ধর্ম্মে। "আচ্ছা, একজন দেশী পণ্ডিত বলছেন যে, ওখানটায় প্রাণটা রাখবার এত আবশ্যক কি? সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতায় রাখনা কেন?"

"যদি তর্কচ্ছলে স্বীকার করা যায় যে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব মিথ্যা, তা হলেও কি দাঁড়ায় দেখ। অগ্নি ত এক, প্রকাশ বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য সুবিচার বিস্তার, আর হিঁদুর প্রাণে মুক্তি লাভেচ্ছারূপে বিকাশ হয়েছে। কিন্তু, এই মহাশক্তির প্রেরণায় শতাব্দী কতক নানা সুখ দুঃখের ভেতর দিয়ে, ফরাসী বা ইংরেজ চরিত্র গড়ে গেছে এবং তারি প্রেরণায় লক্ষ শতাব্দীর আবর্ত্তনে হিঁদুর জাতীয় চরিত্রের বিকাশ। বলি, আমাদের লাখো বৎসরের স্বভাব সোজা, না, তোমার বিদেশীর দু পাঁচশ বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা? ইংরেজ কেন ধর্ম্মপ্রাণ হক্ না, মারামারি কাটাকাটিগুলো ভুলে শান্তশিষ্টটি হয়ে বসুক না কেন?......এইটি বেশ করে বোঝ, এইটি আগা গোড়ার তফাৎ—হিন্দুর সেই যে অন্তর্দৃষ্টি তা আগা পাস্তলা সমস্ত কাজে। হিঁদু—ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে; বিলাতী, সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে। হিঁদুর শরীর পরিষ্কার হলেই হল, কাপড় যা তা হক্। বিলাতীর কাপড় সাফ্ থাকলেই হল, গায়ে ময়লা রইলই বা। হিঁদুর ঘর দোর ধুয়ে মেজে সাফ্ তার বাইরে নরক-কুণ্ডু থাকুক না কেন। বিলাতীর মেজে কারপেটে মোড়া ঝকঝকে, ময়লা সব ঢাকা থাকলেই হল।।.......চাই কি? ....পরিষ্কার শরীরে পরিষ্কার কাপড় পরা।.......ঘর পরিষ্কার করা চাই।.......পরিষ্কার রাঁধুনি, পরিষ্কার হাতের রান্না চাই। · পরিষ্কার মনোরম স্থানে পরিষ্কার পাত্রে খাওয়া চাই। আচারঃ প্রথমো ধর্ম্ম, আচারের প্রথম আবার পরিষ্কার হওয়া, সব রকমে পরিষ্কার হওয়া। আচার ভ্রষ্টের কখন ধর্ম্ম হবে? .. এত ওলাউঠা, এত মহামারী, ম্যালেরিয়া, কার দোষ? আমাদের দোষ। আমরা মহা অনাচারী।

আহার শুদ্ধ হলে মন শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হলে আত্মসম্বন্ধী অচলা স্মৃতি হয়—এ শাস্ত্র বাক্য আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়েই মেনেছেন। তবে শঙ্করাচার্য্যের মতে আহার শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, আর রামানুজাচার্য্যের মতে ভোজ্যদ্রব্য। সর্ব্ববাদী সিদ্ধান্ত এই যে, দুই অর্থই ঠিক। বিশুদ্ধ আহার না হলে ইন্দ্রিয় সকল যথাযথ কার্য্য কি করেই বা করে? কদর্য্য আহারে ইন্দ্রিয় সকলের গ্রহণশক্তির হ্রাস হয় বা

বিপর্য্যয় হয় এ কথা সকলেরই প্রত্যক্ষ।......সেই প্রকার কোনও বিশেষ আহার বিশেষ শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা উপস্থিত করে, তাও ভূয়োদর্শন সিদ্ধ। আমাদের সমাজে যে এত খাদ্যাখাদ্যের বিচার, তার মূলেও এই তত্ত্ব, যদিও অনেক বিষয়ে আমরা বস্তু ভুলে, আধারটা নিয়েই টানা হেঁচড়া করছি এখন"।

"রামানুজাচার্য্য ভোজ্য সম্বন্ধে তিনটি দোষ বাঁচাতে বলছেন। জাতিদোষ...আশ্রয় দোষ... ..নিমিত্ত দোষ।...এর মধ্যে জাতি দোষ এবং নিমিত্ত দোষ হ'তে বাঁচবার চেষ্টা সকলেই কর্ত্তে পারে, আশ্রয় দোষ হতে বাঁচা সকলের পক্ষে সহজ নয়। এই আশ্রয় দোষ থেকে বাঁচবার জন্যই আমাদের দেশে ছ্যুৎমার্গ—ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।' তবে অনেক স্থানেই 'উল্টা সমঝলি রাম' হয়ে যায়, এবং মানে না বুঝে, একটা কিম্ভূত কিমাকার কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। এ স্থলে লোকাচার ছেড়ে লোকগুরু মহাপুরুষদের আচারই গ্রহণীয়।·জাতিদুষ্ট অন্ন ভোজন সম্বন্ধে, ভারতবর্ষের মত শিক্ষার স্থল এখনও পৃথিবীতে কোথাও নাই।...এখন সর্ব্ববাদি সম্মত মত হচ্ছে যে পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয় এমন খাওয়া দরকার]।"

[জাতিদোষ—'যে দোষ ভোজ্যদ্রব্যের জাতিগত'—উগ্র, উত্তেজক, বুদ্ধি-ভ্রংশকারী। আশ্রয়দোষ ব্যক্তিবিশেষের (যেমন, দুষ্টলোকের) স্পর্শাদিজনিত দোষ। নিমিত্ত-দোষ—ভোজ্যদ্রব্যে কয়লা, পোকা বা চুল থাকলে যে দোষ হয়। এই ত্রিদোষ বর্জ্জিত আহার চিত্ত-বিক্ষেপ নিবারণের সহায়]।

["জম্বুদ্বীপের তামাম্ সভ্যতা—সমতল ক্ষেত্রে, বড় বড় নদীর উপর অতি উর্ব্বর ভূমিতে উৎপন্ন—ইয়ংচিকিয়ং, গঙ্গা, সিন্ধু, ইউফ্রেটিস তীর। এ সকল সভ্যতার আদ্ ভিত্তি চাষবাস। এ সকল সভ্যতাই দেবতা-প্রধান। আর ইউরোপের সকল সভ্যতাই প্রায় পাহাড়ে, না হয় সমুদ্রময় দেশে জন্মেছে—ডাকাত আর বোম্বেটে এ সভ্যতার ভিত্তি, এতে অসুর ভাব অধিক।..ক্রমে জম্বুদ্বীপের নরস্রোত ইউরোপের উপর পড়তে লাগল। কোথাও কোথাও অপেক্ষাকৃত সভ্য জগতের অভ্যুদয় হলো, রুষদেশান্তর্গত কোনও জাতির ভাষা ভারতের দক্ষিণি ভাষার অনুরূপ।"

স্বামীজি এই স্থলে নানা জাতির উত্থান পতনের বিবরণ দিয়েছেন, মুসলমান সভ্যতাই ইউরোপকে সর্ব্ববিষয়ে সভ্য করে। এইরূপে এশিয়ার সভ্যতা নানা দিক দিয়ে ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মেন প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ ক'রে তাদের সুসভ্য করে তোলে।

["ইউরোপীয় সভ্যতা নামক বস্ত্রের এই সকল উপাদান। এর তাঁত হচ্ছে—এক নাতিশীতোষ্ণ পাহাড়ি সমুদ্রতটময় প্রদেশ, এর তুলো হচ্ছে—সর্ব্বজাতি মিশ্রিত,

বলিষ্ঠ, নানাজাতের মিশ্রণে এক মহাখিচুড়ি জাত। এব টানা হচ্ছে—যুদ্ধ, আত্মবক্ষার জন্য ধর্ম্মবক্ষাব জন্য যুদ্ধ। যে তলওযাব চালাতে পাবে, সে হয় বড: যে তলওয়ার না ধরতে পাবে, সে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে কোনও বীবের তলওয়ারেব ছায়ায় বাস ক'বে জীবন ধাবণ কবে। এব পোড়েন বাণিজ্য। এ সভ্যতাব উপায় তলওযাব, সহায় বীবত্ব, উদ্দেশ্য ইহ পাবলৌকিক ভোগ।.. অতি বিশাল নদনদীপূর্ণ উষ্ণপ্রধান, সমতল ক্ষেত্র—আর্য্য সভ্যতাব তাঁত। আর্য্যপ্রধান, নানা প্রকাব সুসভ্য, অর্দ্ধসভ্য, অসভ্য মানুষ—এ বস্ত্রের তুলো, এব টানা হচ্ছে বর্ণাশ্রমাচাব। এব পোড়েন—প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব. সংঘর্ষ নিবারণ।"

"...এখন ইসলামেব প্রথম তিন শতাব্দী ব্যাপী ক্ষিপ্র সভ্যতা বিস্তাবের সঙ্গে খৃষ্ট ধর্ম্মেব তুলনা কব। খৃষ্টধর্ম্ম প্রথম তিন শতাব্দীতে জগৎ সমক্ষে আপনাকে পরিচিত কর্ত্তে যখন পাবেনি, এবং যখন Constantine এর তলওয়াব ইহাকে রাজ্যমধ্যে স্থান দিলে, সে দিন থেকে কোন্ কালে কৃশ্চানি ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক বা সাংসাবিক সভ্যতা বিস্তাবের সাহায্য কবেছে? যে ইউবোপী পণ্ডিত প্রথম প্রমাণ কবেন যে. পৃথিবী সচল, কৃশ্চানধর্ম্ম তাঁব কি পুবস্কাব দিয়েছিল? কোন্ বৈজ্ঞানিক্ কোন্ কালে কৃশ্চানী ধর্ম্মের অনুমোদিত? কৃশ্চানী সংঘেব সাহিত্য কি দেওয়ানী বা ফৌজদাবী, বিজ্ঞানেব, শিল্প বা পণ্য-কৌশলেব অভাব পূবণ কবতে পাবে? আজ পর্য্যন্ত 'চর্চ্চ' প্রোফেন (ধর্ম্মভিন্ন বিষয়াবলম্বনে লিখিত) সাহিত্য প্রচাবে অনুমতি দেন না। আজ যে মনুষ্যেব বিদ্যা এবং বিজ্ঞানে প্রবেশ আছে তাব কি অকপট কৃশ্চান হওয়া সম্ভব? New Testament এ প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষভাবে কোনও বিজ্ঞান বা শিল্পের প্রশংসা নাই। কিন্তু এমন বিজ্ঞান বা শিল্প নেই যাহা প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষভাবে কোবাণ বা হদিশের বহু বাক্যেব দ্বারা অনুমোদিত এবং উৎসাহিত নয়। • ধর্ম্ম সকলের উন্নতির বাধকত্ব বা সহায়কত্ব বিশেষরূপে পরীক্ষীত হউক, দেখা যাবে, ইসলাম যেথায় গিযাছে. সেথাবই আদিম নিবাসীদেব রক্ষা কবেছে। সে সব জাত সেথায় বর্ত্তমান। তাদেব ভাষা. জাতীয়ত্ব আজও বর্ত্তমান।

খৃষ্ট ধর্ম্ম কোথায এমন কাজ দেখাতে পাবে? স্পেনেব. আবাব অষ্ট্রেলিয়াব এবং আমেবিকাব আদিম নিবাসীবা কোথায়? কৃশ্চানবা ইউবোপী য়াহুদিদেব কি দশা এখন কবেছে? এক দান-সংক্রান্ত কার্য্য প্রণালী ছাড়া ইউরোপের আর কোনও কার্য্য পদ্ধতি, গস্‌পলেব অনুমোদিত নয়—গস্‌পেলের বিরুদ্ধে সমুত্থিত। ইউবোপে যা কিছু উন্নতি হয়েছে তার প্রত্যেকটিই খৃষ্টধর্ম্মেব বিপক্ষে—বিদ্রোহ দ্বাবা।

আজ যদি ইউরোপে কৃশ্চানীর শক্তি থাকত, তা হ'লে 'পাস্তের' এবং 'বকের' ন্যায় বৈজ্ঞানিক সকলকে জীবন্ত পোড়াত; এবং ডারউইন কল্লদের শূলে দিত। বর্ত্তমান ইউরোপে কৃশ্চানী আর সভ্যতা আলাদা জিনিষ।·· ইহার সহিত ইসলামের তুলনা কর। মুসলমান দেশে যাবতীয় পদ্ধতি ইসলাম ধর্ম্মের উপর সংস্থাপিত এবং ইসলামের ধর্ম্ম শিক্ষকেরা সমস্ত রাজকর্ম্মচারীদের বহু পূজিত এবং অন্য ধর্ম্ম শিক্ষকেরাও সম্মানিত।]"

স্বামীজি, মুসলমান ও খৃষ্টান সভ্যতাব মূল বহস্য ব্যক্ত কবেছেন। ইহা পাঠে অনেকেব অনেক বিষয়েব ভ্রম ধাবণা দূব হবে নিশ্চয়।

["পাশ্চাত্য দেশে লক্ষ্মী সরস্বতীর এখন কৃপা একত্রে। শুধু ভোগের জিনিষ সংযোগ হলেই এরা ক্ষান্ত নয়, কিন্তু সকল কাজই একটু সুচ্ছবি চায়। খাওয়া-দাওয়া ঘরদোর সমস্তই একটু সুচ্ছবি দেখতে চায়। আমাদেব দেশেও ঐভাব একদিন ছিল, যখন ধন ছিল। এখন একে দারিদ্র্য, তার উপর আমরা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হয়ে যাচ্ছি। জাতীয় যে গুণগুলি ছিল, তা যাচ্ছে—পাশ্চাত্য দেশেরও কিছুই পাচ্ছি নি। চলা বসা কথা বার্ত্তায় একটা সেকেলে কায়দা ছিল, তা উৎসন্ন গেছে, অথচ পাশ্চাত্য কায়দা নেবারও সামর্থ্য নাই।···আমরা এই মধ্যরেখার দুর্দ্দশায় এখন পড়ে। ভবিষ্যৎ বাঙ্গলা দেশ এখনও পায়ের উপর দাঁড়ায় নি। বিশেষ দুর্দ্দশা হয়েছে শিল্পের। সেকেলে বুড়ীরা ঘরদোর আলপোনা দিত, দেয়ালে চিত্র বিচিত্র করত।...সে সব চুলোয় গেছে বা যাচ্ছে শীঘ্র শীঘ্র॥ নতুন অবশ্য শিখতে হ'বে, কর্ত্তে হবে, কিন্তু তা বলে কি পূরোণ গুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে নাকি? নতুন ত শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাক্যিচচ্চড়ি॥ কাজের বিদ্যা কি শিখেছ? ·আমাদের এখন ওদের মত শিল্প সংগ্রহে কাজ নাই, কিন্তু যেগুলো উৎসন্ন যাচ্ছে, সে গুলোকে একটু যত্ন করতে হবে? না—না?" (উদ্ধৃত অংশগুলি স্বামীজির 'প্রাচ্য পাশ্চাত্য' হতে।]

স্বামীজিব উক্ত বাণীগুলিব পব হ'তে দেশেব হাওয়া ফিরতে আবম্ভ করেছে, কিন্তু বাঙ্গলাদেশ কি আজও পায়ের উপব দাঁডাতে পেরেছে?

জাতীয় অধঃপতনের কারণ—১

যথাসম্ভব তুলনামূলক আলোচনা কববাব চেষ্টা কবা যাচ্ছে। জাতির অধঃপতনে, শুধু অধঃপতনই আনায় না; ইহাতে জাতিব বিনাশ—জাতিলোপেব—আশঙ্কাও থাকে। যদি আমবা অধঃপতনেব কাবণ বুঝতে পাবি, আমাদেব পক্ষে ঐ কাবণের কার্য্যফল বোঝাও সহজ হয় ও আমরা সব স্পষ্ট বুঝতে পাবি যে সেই কার্য্যফলকে বৃথা আঁকডে ধ'বে বাখা আব উচিত নয়। ধোলো-সভ্যতা আজ বিপুল সংঘর্ষেব সম্মুখীন। বাবান্তবে আমবা বোঝবাব চেষ্টা কববো, কি বকম সংস্কাব-প্রাবল্যে তাঁদেব সভ্যতাব এই বিষম পবিণাম-আশঙ্কা উপস্থিত হ'যেছে।

হিন্দু জাতিব পতনাবস্থা বহুবাব হ'য়েছে, বাববাব আবাব জাতির অভ্যুত্থানও হয়েছে। বলেছি, আদর্শাভিমুখী সাধনাই—পাবিবাবিক-জীবন হ'তে জাতীয় জীবন অবধি প্রচেষ্টাই—সাধনাব সংস্কাব বা অধ্যাত্ম-সংস্কার; সমস্ত অভ্যুত্থানেব মূলে ঐ সাধনাব সংস্কাব, বর্ণাশ্রমেব কাঠাম পর্য্যন্ত না থাকলেও, সাধনাব সংস্কাব আজও জাতিব মধ্যে বর্ত্তমান। এখন অনেকে ঐ সংস্কাবেব কার্য্যকরী শক্তিতে বিশ্বাস হাবিয়ে, তাব স্থানে আনতে চান চামড়াব সংস্কাব। প্রমাণেব জন্য বেশী দূব যেতে হবে না। আজ চামডার মোহিনীরূপ বিবাজ কবছেন, আমাদেব জাতীয় সাহিত্যেব একাংশে—উপন্যাসে, নাটকে। অথচ সমগ্র ধবা অধ্যাত্ম-সংস্কাব গ্রহণ করবাব জন্য আঁক পাঁক্ কবছে আত্মবক্ষাব জন্য! সহস্র সহস্রধা বিভক্ত ভাষাব ও আচাবেব মধ্যে ভাবতেব একটি প্রবল যোগ-সূত্র বযেছে—সংস্কৃত সাহিত্য, যাতে সমগ্র হিন্দু জাতিকে পবিত্রতা, সংযম, তীর্থ, দেবমন্দিব আদিব সঙ্গে মিশিয়ে বেখেছে। সুতবাং, হিন্দু কখনই সংস্কৃত সাহিত্যকে উপেক্ষা কবতে পাবেন না। হিন্দু-সংস্কৃতি, সংস্কৃত সাহিত্যেই বয়েছে, আব তা বক্ষা ক'বে এসেছেন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বক্ষণশীল, বক্ষণশীলতাই হিন্দু সমাজকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমানের এবকম উদার-ভাব-বর্জ্জিত প্রাণহীন, অধ্যাত্মচর্চ্চা-বিবত কৃত্রিমতা আব জাতিব উন্নতিব বা বক্ষাব কারণ হওয়া সম্ভব নয়।

একই নামেব লোক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেক থাকতে পাবে। একই নামেব জনকয়েক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে থাকতে পাবেন। এইবকমে

নামের ধাঁধা সৃষ্টি করা যায়। পুরাণে একই নাম, কিন্তু ভিন্ন চরিত্রের লোক দেখা যায়। হরিবংশে, অবতার-বর্ণন প্রসঙ্গে একজন যাজ্ঞবল্ক্যের নাম পাওয়া যায়। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে 'যাজ্ঞবল্ক্য-সহচর কল্কী' প্রথমে বৌদ্ধদের তর্কে পরাভূত ক'রে, পরে যুদ্ধে তাঁদের সংহার করবেন। কল্কীকে যাজ্ঞবল্ক্য-সহচর বলা হয়েছে ও তাঁরা উভয়ে মিলে ধর্ম্মসংস্থাপন করবেন। এই যাজ্ঞবল্ক্য আর যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সম্বাদের যাজ্ঞবল্ক্য যে একই যাজ্ঞবল্ক্য তা বলা যায় না। এই রকম যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার মৈথিলী ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্য যে ঐ একই ব্যক্তি ইহাও বলা যায় না। জীবন দেখে, চরিত্র দেখে, ভাবের দিক্ দিয়ে এসব বিচার আমাদের ক'রে নিতে হয়। তবে এটা ঠিক যে এইরকম নামের সুবিধা পেলে প্রক্ষেপের সুযোগ উপস্থিত হয় এবং চরিত্রকেও সুবিধামত রূপান্তরিত করবার বাধা কম থাকে। এইরকম ব্যাপার বেশী হয়েছিল বৌদ্ধপ্লাবনে। সমাজ-বিপ্লবের অনেক কারণ থাকে, তার মধ্যে সাহিত্যে আবর্জ্জনা প্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া, আদর্শকে খাটো করা, জাতীয় সাহিত্যে প্রক্ষেপ করা প্রভৃতি বহু প্রবল কারণ থাকে। যে সব চরিত্রের বহুল প্রচার হয়ে পড়ে, সে সব চরিত্রে প্রক্ষেপ করা সহজ হয় না। সে সব চরিত্রে প্রক্ষেপ করতে হলে, নতুন নতুন কাল্পনিক ঘটনা যোগ করতে হয়, কারণ, ইহা সকলেই জানে যে কোন জীবনচরিত-লেখক জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে পারেন না, অন্যত্রও অনেক ঘটনা পাওয়া যেতে পারে যা জীবনচরিত-লেখকের জানা সম্ভব নয়। দুষ্ট মতলব থাকলে এইরকম উপায় অবলম্বন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। তাতে মূল ঘটনা অবিকৃত থাকলেও, অন্যান্য ঘটনার দৃষ্টিতে সে চরিত্রের মধ্যে হীনতা দেখা যায়, খাপ্ খাইয়ে বলতে পারলে, কথার মাঝেও যা তা ঢোকান যায়। ভাবের দিক দিয়ে, সঙ্গতির দিক দিয়ে প্রধানতঃ বিচার করাই নিরাপদ, ভাষা ও ছন্দ পরে বিবেচ্য। শক্তিশালী লেখক ভাষার প্রয়োগ নানা ভাবে করতে পারেন, উচ্ছ্বাসের মুখে কোনও গভীর তত্ত্বালোচনার সময় নতুন নতুন ছন্দ দিতে পারেন, ইহা আমরা বর্ত্তমান সময়েও দেখেছি। একই ভাবধারার অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকে; সাম্প্রদায়িকতার বুদ্ধি অপর সম্প্রদায়ে আপন ভাব প্রক্ষেপ করতে পারে। সরল সহজ অর্থ ছেড়ে ব্যাকরণের সাহায্যে ধাত্বর্থে নানা

অর্থেব মধ্যে একটি অর্থে বিশেষ জোর দিয়ে নিজমত প্রচলন কববাব চেষ্টাতেও সাম্প্রদায়িকতা বোঝা যায়। কোন লেখক নিজ ভাব-পবিপুষ্টিব জন্য অন্য স্থান হ'তে অনুকুল ভাবানুসবণ কবলে তাকে প্রক্ষেপ বলা যায় না।

বৌদ্ধ-প্লাবন আব যাই হোক্, সে প্লাবন মোক্ষেব আদর্শে আঘাত দেয় নি। আব এখন? জাতীয়-আদর্শে-শিক্ষাবিহীন এ-চামড়া-সংস্কাবেব—কামিনী-কাঞ্চনেব—প্লাবন আবো ভযানক! এই ভযাবহ অবস্থাব বিরুদ্ধে দাঁড়ান স্বামীজি; বৌদ্ধপ্লাবনে যে আমাদেব বিষম ক্ষতি কবেছে, ইহা জোব ক'বে আমাদেব জানান প্রথম স্বামীজি—শ্রীশঙ্কবেব পবে। এখন এই বিষয় নিয়ে অনেকে আলোচনা কবছেন, কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতিব দিক্ দিয়ে বৌদ্ধ-প্লাবনেব ইতিহাস বাঙ্গলায কেহ লেখেন নি। সুপণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচাবী মহাশয়, বহুদিন পূর্ব্বে, এসম্বন্ধে সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যদিও খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁব তুএকটি মতেব অল্পবিস্তব প্রতিবাদ হ'য়েছে,[৮] বৌদ্ধপ্লাবনে সাহিত্যে প্রক্ষেপ সম্বন্ধে তাঁব মূল যুক্তিব কোন প্রতিবাদও হয নি, আলোচনাও বিশেষ হয নি। আপনাদেব আজ তাঁব প্রবন্ধ হ'তে কিছু কিছু শোনাব।

["উত্তর কুরু সুমেরু বা Arctic zone নহে—উহা Chinese Tartary অথবা Mongoliaব নিকটবর্ত্তী কোন স্থান। এই স্থান হইতেই প্রাচীন পারস্যের প্রাচীন বাজগণের উৎপত্তি হয়—Cambysus, Arctaxerecus, Cyrus প্রভৃতি বাজগণই পারস্যে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। Darius দবায়ুস যখন পঞ্চনদ জয় করিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন কবেন তখন তাঁহারা আপনাদের উত্তর কুরুবাসী বলিয়া প্রচারিত কবিয়াছিলেন। ইহাবা বৈদিক আর্য্যগণেব দেবদেবীর নাম, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি বিপবীত ভাবে ব্যবহার করিলেও ইহারা আর্য্যবংশীয় কিনা তাহাতে সন্দেহ হয়। একটি উদাহবণ দ্বারা একথাটি স্পষ্ট কবিয়া দিতেছি—বৈদিক বৃত্রঘ্ন শব্দের অর্থ ইন্দ্র। এই শব্দেই জেন্দাবস্তার 'বেরেথ্‌ঘ্ন' আকার ধারণ করিয়াছে, অথচ উহার অর্থ ইন্দ্রশত্রু অসুব। · ইহাতে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হয় যে পাবস্যগণেব পূর্ব্ব পুরুষ কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে আর্য্যগণেব সহবাসে আসিয়া নিজ ভাষা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদের ভাষা সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহাদের বর্ণমালা আর্য্যগণের বর্ণমালা হইতে গৃহীত হয় নাই—উহা হিব্রু বর্ণমালা হইতে গৃহীত। এই সেমিটীয় ভাষার সহিত আর্য্যগণেব সংস্কৃত ভাষার ঘুণাক্ষবেও কোন সম্বন্ধ নাই।...

যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়নের উদ্ধত ভাগিনেয়, তিনি মাতুলের প্রতিকূলতা করেন। বৈশম্পায়ন জনক রাজার পুরোহিত ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য একবার জনকের যজ্ঞশালায় গিয়া অর্দ্ধ দক্ষিণা সবলে হরণ করেন। জনক বা তাঁর সভা পণ্ডিতগণ এর কোন প্রতিরোধ না করায় বৈশম্পায়ন ক্ষুণ্ণ হইয়া তাঁর পৌরোহিত্য ত্যাগ করিয়া হস্তিনাপুরে রাজা জনমেজয়ের পুরোহিত হন। তাঁর ও তাঁর সম্প্রদায়ের মুনি সংঘের চেষ্টায় নানা আখ্যায়িকা ভূয়িষ্ঠ হইয়া ভগবান ব্যাসদেবের ভারত মহাভারত আকার ধারণ করে।...যাজ্ঞবল্ক্য জ্যেষ্ঠ মাতুল তিত্তিরির রচিত যজুঃ তৈত্তিরীয় সংহিতা হইতে ভাব ও বচন আহরণ করিয়া তাঁর শুক্ল যজুর্ব্বেদ দাঁড় করান অথচ সাধারণে প্রচার করেন যে সূর্য্যদেব তাঁকে উহা প্রদান করেন, প্রাপ্তিকালে সূর্য্যরশ্মিতে তিনি ঝলসিয়া যান। ভারতে ইনিই প্রথমে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবঞ্চনা ও চাতুরী আরম্ভ করেন। রামায়ণ মহাভারতের ভাষাও দুর্ব্বোধ ছিল। কিন্তু ঐ বইখানির সময়ে সময়ে প্রতিসংস্কার হওয়ায় উহার দুর্ব্বোধতা রহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ দুই খানিতে আবর্জ্জনা ও অনেক প্রবেশ লাভ করিয়াছে।...আমাদের বড় দুর্ভাগ্য এই দুই খানি ও চরক সুশ্রুতের শেষ প্রতিসংস্কার বিদেশী বিধর্ম্মীগণ দ্বারা সম্পাদিত হয়। তখন ভবভূতি কালিদাস গতাসু...। মহাশাল শৌনকের দ্বাদশ বার্ষিকী সত্রে সম্মিলিত যে তথা কথিত ঋষি সংঘ উপস্থিত হন তাঁরা আর্য্য ঋষিগণের বংশধর নন—তাঁরা পারসীক বংশীয়। এই সময়েই রামায়ণের উত্তরকাণ্ড রচিত হইয়া মূল ছয় কাণ্ডের সহিত সংযোজিত হয় কারণ পূর্ব্বে রামায়ণের নাম পৌলস্ত্যবধ ছিল। মহাভারতেও প্রথমে ঐশিক পর্ব্ব পর্য্যন্ত রচনা ছিল—অশ্বমেধ আশ্রমবাসিক, মুষল প্রভৃতি শেষ পর্ব্বগুলি পরে সংযোজিত হয়। বর্ত্তমান মহাভারতে পাণ্ডবদের দুই বংশাবলী দৃষ্ট হয়—একটি পদ্যে, অপরটি গদ্যে। এই গদ্যেই ভরত বংশকে ভারত বর্ণিত হইয়াছে। পরে পাণ্ডবগণ ও ভারত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন। তার পরে যে দুর্ব্বাসাকে সকল অনর্থের মূল করা হইয়াছে তিনি পাণ্ডুরাজার সময়ের মুনি নন—তিনি জাবালের সমসাময়িক, জাবাল যাজ্ঞবল্ক্যের ছয় পুরুষ অধস্তন ('তত্র পরমহংসো নাম সংবর্ত্তকারুণিশ্বেতকেতুদুর্ব্বাসাঋভু নিদাঘ জড় ভরত দত্তাত্রেয় রৈবতক চ প্রভৃতয়োঽব্যক্ত লিঙ্গ'—জাবাল উপনিষদ্—৬) অর্থাৎ তিনি অনুমান খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ২২০০ বৎসরের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হন আর পাণ্ডুরাজা তার ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।...আবার চরকের সূত্রস্থানের প্রারম্ভের ঋষি সম্মিলন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাঁরাও ছদ্ম ঋষি। চরকের প্রতি স্থানের প্রতি অধ্যায়ে 'ইত্যাহ ভগবান আত্রেয়' আবৃত্তি করিয়া তাঁর বর্ণন আরম্ভ করা হইয়াছে আর তিনি তাঁর ছয় শিষ্যের মধ্যে অগ্নিবেশকেই সম্বোধন করিয়া তাঁর গ্রন্থের

উত্তর এবং ভ্রান্তি নিরসন করিতেছেন। সূত্রস্থানের প্রারম্ভে লিখিত আছে ভরদ্বাজ ঋষিগণের অনুমতি লইয়া ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ লাভ করিতে যান এবং উহা প্রাপ্ত্যন্তর ঋষিগণের মধ্যে প্রচারিত করেন। এই দুই পরস্পর বিরোধী কথা।...সুশ্রুত নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হয়।...নাগার্জ্জুন পারিযাত্র পর্ব্বত ও তৎসংলগ্ন ভূমির অধিপতি ছিলেন। এঁর স্তাবকগণ এঁকে ইন্দ্র বলিতেন। সুশ্রুত সংহিতা শল্যশাস্ত্র। কাশিরাজ দিবদাস ধন্বন্তরী উহা শিষ্য সুশ্রুতকে বর্ণনা করেন। এই কারণে প্রতিসংস্কর্ত্তা নাগার্জ্জুন, কাশিরাজ ও ধন্বন্তরী নামে ও পরিচিত।...নাগার্জ্জুন হীনযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন।...তিনি যেমন অনাচারী তেমনি নিষ্ঠুর ছিলেন। সাংখ্য যতিগণ ভগবান পাণিনীর জন্মস্থান ভারতের উত্তর পশ্চিমস্থ শালাতুরে গমন করিতেন। তাঁহাদের এই নাগার্জ্জুন ডালকুকুর লেলাইয়া দিয়া নিধন করাইয়া আমোদ দেখিতেন। সিয়াপোষ কাফিরদের পূর্ব্ব পুরুষ কালখঞ্জদের বিনা অপরাধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। যুবতীর গর্ভ বিদারণ করিয়া প্রাণ হত্যা করিতেন। অবশেষে পিতামাতাকেও হত্যা করেন। এ সকল কথা কৌশীতকী উপনিষদে ইন্দ্রের আত্মশ্লাঘারূপে লিখিত হইয়াছে। অবশেষে নাগার্জ্জুনের বিরক্তা মহিষীর বিষদিগ্ধ নূপুরের খোঁচায় প্রায়শ্চিত্ত হয়। (কৌশী উ. ৩।১ 'বিষ-প্রদিগ্ধেন চ নূপুরেন দেবী বিরক্তা কিল কাশীরাজং...' বৃহৎসংহিতা)। হিন্দুগণের সপ্তর্ষির অন্যতম অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি, তিনি ইন্দ্রের গুরু। মহাভারতে বৃহস্পতি পুত্রের নাম কচ লিখিত আছে। তিনি দৈত্যগুরুর নিকট মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিতে গমন করেন। দেবগুরু বৃহস্পতির উতথ্য নামে কোন জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিল না, আর তিনি নিজ গর্ভবতী ভ্রাতৃজায়ার শয্যাও কলঙ্কিত করেন নাই।...যে জাতির মধ্যে লক্ষ্মণের ন্যায় দেবর, ভীমার্জ্জুনের ন্যায় সহোদর ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বলশালী, সংযমী ও ত্যাগী আদর্শ পুরুষের অস্তিত্ব ছিল, কলুষ হৃদয় ও কুচরিত্র লোকগণই তাহাতে দুর্নীতির বিষাক্ত বীজ ছড়াইয়া দিয়াছে।...সুতরাং শাস্ত্র হইতে কলুষিত রচনা নিষ্কাষণ বা আমুল পরিবর্ত্তন করিতে দ্বিধাবোধ করা উচিত নহে।

চরক ও সুশ্রুতের সম্পূর্ণ উদ্ধার হওয়া অসম্ভব। পতঞ্জলি মুনি চরকের বিস্তৃত ভাষ্য লিখিয়াছিলেন বিধর্ম্মীগণ তাহাও, লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। চরকে বাদরায়ণ অনেক আবর্জ্জনা রাখিয়া ভাল বিষয় বাদ দিয়াছিলেন। পুণ্যাত্মা দৃঢবল অব্যবহিত প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁর সময়ের অন্যতন্ত্র হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া যান।...বিধর্ম্মীগণ কালিদাসের রঘুবংশ ও অশ্বঘোষের বুদ্ধ চরিতে আবর্জ্জনা অনুপ্রবিষ্ট করিতে ছাড়ে নাই।...

বিদেশীগণ যে সংঘ সৃষ্টি করেন তার অগ্রণী নাগার্জ্জুন ছিলেন। এই সংঘের জনকতক সভ্যের নাম এই—বাদরায়ণ, জৈমিনী, কুশীতক, গৌতম, ভৃগু ইত্যাদি। ইহারা সকলেই অথর্ব্ববেদ ব্রাত্যগণের ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহা ঐতরেয় মহিদাস কর্তৃক রচিত হয়। ইহা ঋগ্বেদের শ্লোক ও জেন্দাবস্তার ভাব জ্ঞাপক সংস্কৃত শ্লোকে পূর্ণ। তাঁর সময়ে ইহাতে ত্রয়োদশটি অধ্যায় ছিল—তার পর উহাতে সময়ে সময়ে অধ্যায় যোগ করিয়া ২০ অধ্যায় পূর্ণ করা হয়।...তিনি (জৈমিনী) যে মীমাংসা দর্শনের রচয়িতা ইহা অনেকেই শুনিয়াছেন, আর শবর স্বামী যে তাহার ভাষ্য লেখেন ইহাও শুনিয়াছেন। আশ্বলায়ন শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কল্প গ্রন্থ। বৃত্তিকার ইহার ব্যাখ্যা করিয়া যান। তিনি শবর স্বামীর আচার্য্য ছিলেন। তিনি গ্রন্থের নাম দেখিয়া ঋষির রচনা জ্ঞানে প্রবঞ্চিত হন। সূত্রকার যজ্ঞে গোবৎস বধের বিধি দিয়াছেন, ভাষ্যকার স্বীয় স্বর্গীয় আচার্য্যের বচন উদ্ধার করিয়া উহা খণ্ডন করিয়াছেন। যজ্ঞকারী যজমান সশরীরে স্বর্গে যান—ভাষ্যকার এ কথারও প্রতিবাদ করেন—তিনি বলেন স্বর্গে জীবাত্মাই যান, যজমানের বহিঃশরীর চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। সূত্রকারের মতে দেশাধিপতিই রাজা। শবর ইহারও প্রতিবাদ করিয়া আর্য্য-বিশিষ্টগণের ও অন্ধ্রগণের রাজ শব্দের বুৎপত্তি ব্যাখ্যা করেন—তাঁর মতে দুর্ব্বৃত্তের নিধনকারী ও প্রজাপালক ও রক্ষকই রাজশব্দের ধাতুগত অর্থ—করগ্রাহী শোষক প্রজাপীড়ক শাসক রাজশব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

……জৈমিনী ধরা পড়েন। ধর্ম্মশাস্ত্র কলুষিত করিবার অভিযোগের বিচারে তাঁর প্রতি হস্তিপদ-দলনে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়। ('মীমাংসা-কৃত্ত মুন্মনাথ সহসা হস্তিঃ মুনিং জৈমিনীং')। তাঁরা সদলবলে দাক্ষিণাত্যে নির্ব্বাসিত হন।

……মহাভারতে…শ্বেতকেতুর আখ্যায়িকা আছে। তিনি উত্তরকুরুবাসী। তিনি পিতামাতার সহিত আসীন আছেন, এমন সময়ে জনৈক ঋষি (?) আসিয়া তাঁর মাতাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। তা হ'তেই তিনি স্ত্রীজাতির একপতিত্বরূপ মর্য্যাদা প্রবর্ত্তন করেন। ইহা আর্য্যঋষিগণের সামাজিক প্রথা নহে, তাঁহাদের সামাজিক, ব্যবহারিক, রাজনীতিক ধর্ম্মনীতিক, আধ্যাত্মিক সকল বিধিনিষেধই ভগবান মনু বহুপূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত করিয়া যান এবং ভৃগুবংশীয় ভার্গবী ও হারীতগণই তাহাই প্রয়োগ করিতেন এবং সময়ে সময়ে আবশ্যক হইলে তাহার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতেন। এখন যেমন মনুস্মৃতিতে উদার-অনুদার মতের একসঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে পূর্ব্বে সেরূপ ছিলনা।……অনুদার মত যে কপটচরিত্র শূদ্রবেষী প্রক্ষেপকারিগণের কার্য্য তাহাতে কিছুই সন্দেহ নাই।……ভগবান পাণিনি অষ্টাধ্যায়ীতে প্রাচীন জাতির

উল্লেখ করিয়াছেন—তাঁদের জীবিকা অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ এবং তাঁরা ব্রাহ্মণেতরা কন্যা ও রাজন্যের সহবাসে উৎপন্ন। (৫।৪-১১৪) ।......মহাভারত কর্ণপর্ব্বে বাহীক পিশাচ ম্লেচ্ছ এক পর্য্যায় মধ্যে গণিত হইয়াছেন, তাঁরা বিপাশব ঝিলাম নদীর তীরে মদ্রদেশের রাজধানী শাকলে বাস করিতেন। (মহা কর্ণ. ৪৫।৪১) ।

যখন (৫১২ খৃঃ পূঃ) পারস্য অধিপতি দরায়ুস (Darius Hestas) পঞ্চনদ জয় করিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করেন তখন বাহীকদের সহিত তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনের মিলন ঘটে। কালক্রমে ইহারা আপনাদের অগ্নিকুল ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচার করেন তারপর উহাদেরই মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যজাতিত্রয়ের বিভাগ হয়। উহাদের মধ্যে শূদ্র নাই—তাঁহারা শূদ্রকে ঘৃণা করেন। ইহাদেরই এমজন লেখক 'সনক সুজাত গীতায়' সেই আক্রোশ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁর মতে মহাত্মা বিদুর শূদ্রজাতীয় সুতরাং তিনি ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনা সত্বেও তাঁকে পারমার্থিক জ্ঞানের উপদেশ দিতে পারেন না। ইহা মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্বে আছে অথচ মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে, সতী, কাগাবগা ভস্মকারী দৃপ্ত ব্রাহ্মণকে মিথিলার ব্যাধের নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপদেশ দিতে সংকুচিত হন নাই "] ।

উদ্ধৃতাংশ একটু আগু পিছু করা হয়েছে মাত্র, পাঠকের সুবিধার জন্য। পাদটীকায় লিখিত একটি অংশও এখানে কিছু দেওয়া হল।

["গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে সামের মধ্যে তিনি রথন্তর সাম ......এগুলি দল বাঁধিয়া গীত হইত।......এগুলিও লুপ্ত হইয়াছে। শৌণকের চরণ-ব্যূহের অনুকরণে প্রবঞ্চনামূলক পরাশরী চরণব্যূহ রচিত হয়। তাহাতে লিখিত আছে ইন্দ্র সামের সহস্রশাখা সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধন করেন। এ ইন্দ্র পাটলিপুত্র অধিপতি নাগার্জ্জুন। ভগবান পাণিনীর মামাত ভাই ব্যাড়ি ও সাংখ্য যতি ছিলেন। তিনি দশ হাজার শ্লোকযুক্ত বৃহৎ প্রাচীন 'সংগ্রহ' নামে অভিধান প্রণয়ন করেন। তাহাও লুপ্ত। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের পর তথাকথিত পণ্ডিত সমাজের মনোবৃত্তি এরূপ কলুষিত হইয়া যায় যে তাঁহারা যে যে গ্রন্থে ভাষ্যকারের কথার বিরোধোক্তি দেখিয়াছেন তাহাই লুপ্ত করিয়া দিয়াছেন।......পঞ্চতন্ত্রে জৈমিনীর নিধনবার্ত্তা থাকায় উহার লোপ সাধিত হয়—আর তার স্থানে হিতোপদেশ রচিত হয় ও তার পঠন পাঠন আরম্ভ হয়।... ..বামন ও সত্যব্রত পুত্র মদন রাজার নির্ম্মল আত্মা স্বর্গে চিরশান্তি ভোগ করুক, তাঁরা প্রাচীন গ্রন্থের লুপ্তোদ্ধার করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।" (সচিত্র শিশির ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম সপ্তাহ দ্রঃ] ।

ব্রহ্মচারী মহাশয় যে সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত ক'রে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ

কবেছেন, সেগুলি সবই ভাববার বিষয়, শুধু তাই নয়, সংস্কৃতজ্ঞ শাস্ত্রাধ্যায়ী যে সমস্ত পণ্ডিতকুল আছেন, তাঁদেব অতঃপব শাস্ত্র হ'তে সত্য উদ্ধাবে প্রযত্ন আবশ্যক। যাই হোক্, ব্রহ্মচাবী মহাশয়ও নামের ধাঁধায় পড়েছেন মনে হয়। যে নামগুলি কবেছেন, সেই নামগুলি যে জাল নাম নয়, তাব প্রমাণ কি? শবর স্বামী যাঁব প্রতিবাদ কবেছেন তিনি যে জাল জৈমিনী নন তাব প্রমাণ কি? ব্রহ্মচাবী মহাশয়েব মতে যাজ্ঞবল্ক্যেব আবির্ভাব কাল খৃঃ পূঃ ২৩৮০ ও তিনি পাণিনীব সম-সাময়িক। ইনি কোন্ যাজ্ঞবল্ক্য?

দবায়ুস, একাধিক ব্যক্তির নাম ছিল পাবস্য বাজ্যে। দবায়ুস হেস্টাব নাম তাঁব শিলালিপিব সহিত জড়িত। তাঁব অনুশাসন কতকগুলি শিলা-লিপিতে উৎকীর্ণ কবেছেন (খৃঃ পূঃ ৫৬৬)। ঐ শিলালিপি হ'তেই জানা যায় যে তিনি 'অহুবামজদাব' উপাসক ছিলেন। তিনি কেবল নিজেরই বিজয় গৌবব ও আপন বাজ্যেব মহিমাই প্রচাব কবেছেন। ঐ শিলালিপিগুলি আর্য্য, পাবসী, সুমান্ ও আসুবীয়—সেমীযলিপিব ন্যায়। দবায়ুসেব শিলালিপি ও কয়েক শতাব্দীব পবে অশোকেব শিলালিপি—এই দুই শিলালিপিতে ভাবেব কত পার্থক্য! একজন আত্মপ্রশংসায় উৎফুল্ল, আব একজন শান্তিব বাণী ছড়াচ্ছেন। একজন অভাবতীয়েব শিলালিপি আত্মশ্লাঘাময় পূর্ণ, ভাবতেব সন্তান মানবেব চিত্তশুদ্ধি যাতে হয় তাব জন্য ব্যাকুল! ভাবতেব বৈশিষ্ট্য যে অন্তর্মুখী। নাগার্জ্জুন নাম ও একাধিক পাওয়া যায়, সবাই হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না।

শ্রীবুদ্ধেব বহু বহু পূর্ব্ব হ'তে ভাবতে অনেক ভাবেব তবঙ্গ আসে। যাঁবা আর্য্যেব সঙ্গে ঝগড়া ক'বে একসময়ে পৃথক হয়ে যান, সেই পাবসীকদের মধ্যে অনেকে আর্য্যান্বিত হন ও তাঁবা অথর্ব্ববেদীগণেব অন্তর্ভুক্ত হন। পাবসীকদের 'অহুব' মানে 'অসুব'—সেমিটিক সংস্পর্শে এসে নিজেদেব 'অসুব' আখ্যা দেন। আসুবীয় জাতিদেব (Assyrians) প্রধান দেবতাব নাম ছিল 'অসুব'। (খৃঃ পূঃ ৩০০০) নিনেভাতে 'অসুর' দেবতাব নামে উৎসর্গীকৃত মন্দিব হ'তেও ইহা জানা যায়। এই 'অসুব' শব্দটি সংস্কৃত। আসুবীয়েবা তাকে 'অহুব' করেন নি, অতএব তাঁবা পাবসীকদেব নিকট হ'তে ঐ শব্দটি পান নি। আসুবীয়েবা ভাবতের সংস্পর্শে এসেও যে তাঁবা তাঁদের নিজেদেব পর্ব্বতসংকুল দেশ হতে কখনও ভারত আক্রমণ করতে [illegible]

হয়েছিলেন তাব প্রমাণ এখনও পাওযা যায় নি। তাঁদেব ইতিহাস এসম্বন্ধে নীবব। সম্ভবতঃ অসুবেবা ভাবত ত্যাগ কববার পব এক বড দল গিয়ে ঐ দেশে উপনিবিষ্ট হয়। তাবা ছিল বর্ব্বব প্রকৃতিব ও নিজেদেব ধর্ম্মবিশ্বাস ছাড়া অন্যেব ধর্ম্মবিশ্বাস সহ্য কবত না। ঐ সমস্ত জাতিবও ভাবতবর্ষে ভাবতে আসে; সে সব ভাব ভাবত আত্মস্থ কবেন, কিন্তু যে ভাব-সংগ্রাম আবম্ভ হয় বুদ্ধদেবেব সময় হ'তে, সেটি কঠোবতম হ'য়ে দাঁড়ায় বুদ্ধদেবেব ৩০০ বৎসবেব বহু পবে। হর্ষবর্দ্ধনেব সমযেও (খৃষ্টাব্দ ৩৬৮ সমসমযেও) বৌদ্ধবাদ পৃথকভাবে প্রচাবিত হয় নি, যদিও অশোকেব পব গ্রীক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি জাতিরা এসে ভাবতে রাজ্য কবতে থাকে। এই বৌদ্ধ-প্লাবন দফায় দফায় ভাবতেব বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ পেয়েছিল। প্রক্ষেপ-কার্য্যে কথকেব অত্যাচারও কম হয় নি। কথকদেব না আছে ঐতিহাসিক কাল-বোধ, না আছে বিচাবেব ক্ষমতা; বৌদ্ধপ্লাবনেব যত আবর্জ্জনা কথকেব মুখে বড় বড চবিত্রে আবোপ কবা হয় আজ পর্য্যন্ত, আব আমবাও সেই সব শুনে তাব প্রতিকাবেব চেষ্টা ত কবিই না, ববং তাহাতেই আমোদ পাই।! শাস্ত্র উদ্ধাব-কার্য্য হাতে নিতে হলে চাই সংঘবদ্ধ হওয়া, চাই প্রচুব অর্থবল, চাই সাধনবল, অন্ততঃ, ভারতেব সাধনতত্ত্ব বলতে কি বোঝায় তাব বোধ, আব চাই তুলনামূলক আলোচনা।

ব্রহ্মচাবী মহাশয়ের গীতা ও উপনিষদাদি বিষয়ের মতামত সম্বন্ধে এখানে এইমাত্র বললেই হবে যে, আমাদেব মনে কবাই ভুল যে শাস্ত্রাদি সর্ব্বত্র একই কথা বলেছেন বা একই ভাবেব বা একই তত্ত্বেব প্রচাব কবেছেন।

জাতীয় অধঃপতনের কারণ—২

চবিত্র বিকাশেব চেষ্টায় লেখকেব উদ্দেশ্য ধরা পডে। বামাযণে অহল্যাব উপাখ্যান আছে। এই অহল্যা, তপঃসিদ্ধ ঋষি গৌতমেব স্ত্রী। বিশ্বামিত্রেব সঙ্গে বামচন্দ্র তাঁকে দেখতে যান। বামাযণে আছে যে বামচন্দ্র অহল্যাকে দেখলেন যেন ধূমমধ্যে দীপ্তশিখা, দেববদানব বা কাবোর সাধ্য নেই যে তাঁকে কলুষিত নেত্রে দেখে, তাঁব তপস্যাব তেজে সে স্থান উদ্ভাসিত। অহল্যা প্রস্তববৎ সমাসীন। ইহা নিঃসন্দেহ দেবীব সমাধি অবস্থার বর্ণনা। বামচন্দ্রেব পাদস্পর্শে দেবীব বাহ্য চেতনা ফিবে আসে। পবে বামলক্ষ্মণ ও

বিশ্বামিত্র, দেবীব পাদবন্দনা কবেন। সমাধিস্থ দেখে বামচন্দ্রের ভাব সমাধি হওয়া, ও সেই অবস্থায় ভাবমুখে দেবীব অঙ্গে পা তুলে দেওয়া অসম্ভব নয়, তাবপব উভয়েব বাহ্যজ্ঞান এলে, দেবীকে প্রণাম কবাও বিচিত্র নয়। এ হেন অহল্যাব চবিত্রকেও ইন্দ্রের সঙ্গে ব্যভিচাব-বত কবা হয়েছে!! এতে দুটো উদ্দেশ্য প্রক্ষেপকাবীব সিদ্ধ হয়েছে, সতীধর্ম্মেব ওপব আঘাত দিয়ে, ভাবতে সতীব আদর্শ হীন কবা হয়েছে এবং ইন্দ্রদেবতাব চবিত্র কলুষিত কবা হয়েছে, ত্রেতা যুগেব বর্ণনাব কাল হ'তেই।

[বেদে ইন্দ্রেব স্থান উচ্চ। প্রাণের একাংশই তেজ, সৃষ্টির আদিভূতাকাবণ সেই তেজই ইন্দ্র। পুবাণে ইন্দ্র নানাভাবে চিত্রিত, প্রক্ষেপকাবীদেব হাতে পড়ে দেবতাগুলির নানা অবস্থা। অহল্যা পঞ্চকন্যার মধ্যে একজন। পঞ্চকন্যা—অহল্যা, তাবা, মন্দোদরী, কুন্তী, দ্রৌপদী]।

সব বামায়ণে অহল্যাব কথা নেই, অন্য অনুরূপ কাহিনী আছে। অন্য সেই চবিত্রকে সেখানে কলুষিত কবা হয়েছে। একটি অতি সংক্ষিপ্ত বামায়ণ আছে। কথিত আছে এই সংক্ষিপ্ত বচনা নারদেব। ইহাই প্রথম বামায়ণ। এই বামায়ণ নাম পবে সর্ব্বত্র গৃহীত হয় ও পৌলস্ত্যবধ নাম লোপ পায়। বাল্মিকী বচিত বামায়ণেব মূল ঐ নাবদেবই বামায়ণ। নাবদেব বামায়ণে অহল্যাব কোন প্রসঙ্গ নেই, যে উত্তবকাণ্ডে বামচন্দ্রকে খাটো কবা হয়েছে, সেই উত্তবকাণ্ড, ঐ 'নাবদেব বামায়ণে' বা 'পৌলস্ত্যবধে' নেই। যাই হোক, বামচন্দ্রেব সঙ্গে অহল্যাব সাক্ষাৎকাবেব বর্ণনা অন্য অনেক স্থানেও আছে। যে মনোবৃত্তি এ বকম প্রক্ষেপ কবেছিল, সেই মনোবৃত্তিই 'পঞ্চকন্যাব' চবিত্রে কলঙ্ক কালিমা অর্পণ কবেছে। বামচন্দ্রেব কীর্ত্তিকথাব বহুল প্রচাব হলেও, তাঁব প্রভাব বিস্তাব লাভ কবলেও, প্রক্ষেপকাবীবা বামচন্দ্রকেও ছাড়েন নি। সব বামায়ণে সীতাদেবীর অগ্নিপবীক্ষাব কথা নেই। আর্য্যশাস্ত্রে কোথাও সতীব পবীক্ষায় অগ্নি-পবীক্ষাব কথা নেই। অগ্নি-পবীক্ষাব বিধান আছে বৌদ্ধ তান্ত্রে। যিনি ঐ অগ্নি-পবীক্ষার গল্পটি প্রক্ষেপ ক'বেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য হয় ত ছিল দেবীকে নিষ্পাপ প্রমাণ কবা। উদ্দেশ্য ভাল হলেও, তাঁব মাথা যে বৌদ্ধভাবে ভাবিত সেমিটিক মাথা, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। রামায়ণের অন্য কোন স্থানে বাম লক্ষণের আলাপে বা রামসীতার আলাপে

কোথাও অগ্নি-পরীক্ষার উল্লেখ পর্য্যন্ত নেই, এত বড় ব্যাপারে সবাই আজীবন নীরব! অগ্নি-পরীক্ষার কথা যেখানে আছে, সেখানে বলা হয়েছে যে স্বয়ং বৈশ্বানর আবির্ভূত হয়ে দেবীকে শুদ্ধা ও পবিত্রা বলেন অথবা বলা হয়েছে যে ছায়া-সীতাই পরীক্ষা দিয়েছিলেন, আসল সীতা অগ্নির মধ্যেই ছিলেন ও রাবণ বধের পর সেই আসল সীতাকে রামচন্দ্র পুনর্লাভ করেন। এটি স্পষ্টতঃ রূপক, এ রকম রূপকের সুন্দর অর্থ দেওয়া যায় নানা ভাবে। ঐ ক্ষেত্রে সীতার আত্মগোপন যেন স্বেচ্ছাকৃত, রামচন্দ্রকে রাবণ বধে প্রেরণা দেবার জন্যই, দুষ্কৃতনাশ ও ধর্ম্মস্থাপনে প্রেরণা দেবার জন্যই যেন দেবীর আত্মগোপন। যদি ঘটনার বিবরণ দেখে চরিত্র নিরূপণ করতে হয়, আদর্শের দিক দিয়ে তা করা উচিত, বিশেষ যেখানে অলৌকিকত্ব থাকে, নতুবা জাতির ইতিহাস-অনুসন্ধানটি পণ্ডশ্রম হয় মাত্র। এ সকল বিষয়ে শ্রীচৈতন্য বা শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় নরোত্তমেরা কি বলেছেন, কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন, তাহাই অনুসরণ করা উচিত।

রামচন্দ্রের বিপদাশঙ্কায় লক্ষণের-প্রতি সীতা দেবীর উক্তি বা গালাগালি, যা, মায়ামৃগ বধের সময় সীতা দেবীর মুখ দিয়ে বার করা হয়েছে, তা, সম্ভব বলা যেতে পারত যদি তখন দেবর-বিবাহবিধি থাকত (যা তখন আর্য্যের মধ্যে কল্পনায়ও আসে নি)। সীতাদেবী লক্ষণকে, লক্ষণ সীতাদেবীকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন ইহা প্রক্ষেপকারীদের মাথায় আসে নি। রঘুকুলের সকলের জ্ঞাতসারে সীতারাম ও লক্ষণ যে একসঙ্গে বনে যান ইহাই কি তাঁদের পরস্পরের অগাধ বিশ্বাস, অসীম প্রীতি প্রমাণ করে না? আর রাম লক্ষণের কথা? রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, এই চার ভাই যেন জমাট্ বা অখণ্ড একটি সত্তা—চতুর্ধা দৃষ্টমাত্র। চরিত্র তাঁদের আলোচনা করলে এই সত্যটাই প্রকাশ পায় না কি? এ রকম মূর্ত্ত সৌভ্রাত্রের উদাহরণ আর কোথায়? ধরা অপেক্ষাও ধৈর্য্যশীলা, সহনশীলা সীতার কথা ভাষায় প্রকাশ করতে যাওয়া ধৃষ্টতা। মনে রাখতে হবে যে, মহৎ জীবন আদর্শকে ক্ষুণ্ণ হ'তে দেন না, কায়মনোবাক্যে আদর্শকে রক্ষা করেন। মানবীয় দুর্ব্বলতার দোহাই খাটে না এক্ষেত্রে, ক্রোধের মুখে কোন কথা বললেও, তার একটা মাত্রা থাকে, সম্পর্কজ্ঞানও থাকে আর ক্রোধেরও যথেষ্ট সুসঙ্গত কারণ থাকে। রামচন্দ্রকে চিনেছিলেন

বশিষ্ঠাদি সাতজন ঋষি। এহেন চরিত্র কখন 'ভেড়িয়া-ধসন্' হয় না, গতানুগতিক ভাবে চলে না, এ রকম মহামানব আদর্শ দিতেই আসেন। রামায়ণের উত্তরকাণ্ড যারা রচনা করে তারাই শূদ্রক বধের উপাখ্যান লিখেছে ঐ উত্তরকাণ্ডেই, তারা রামচন্দ্রকে সদা সমাজ-ভীত করেছে। যে সত্যনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিষ্ঠ রামচন্দ্র স্বেচ্ছায় পিতৃ সত্য রক্ষার জন্য নিজেকে নির্ব্বাসিত করেন, সত্যের জন্যই যিনি পিতামাতা বা কারোর অশ্রুকেও ভ্রূক্ষেপ করেন নি, যিনি সমস্ত 'টোটেম' জাতিকে প্রেমে আপন ক'রে নিয়েছিলেন, যিনি শবরীদত্ত অন্নকে উপেক্ষা করেন নি, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন দিয়েছিলেন ও তার অতিথি হ'তেও কুণ্ঠা বোধ করেন নি, যিনি ব্রাহ্মণত্বের-বৃথা-গর্ব্বে-স্ফীত পরশুরামের দম্ভ ও দর্প চূর্ণ করেছিলেন, সেই রামচন্দ্রে কলঙ্ক লেপনের বৃথা চেষ্টা করেছিল তারা, যারা মহাভাগবত বিদুরকে চণ্ডালরূপে বর্ণনা ক'রে তাঁর অধিকার-হীনতার দাবি উপস্থাপিত করতে সাহসী হয়েছিল, যারা কৌশলে সত্য এবং কাল্পনিক ঘটনার সংযোগ ক'রে ঐ যুগের কাহিনীকে বৌদ্ধ-প্লাবনের ক্রূর রাজধর্ম্মাচাররূপে দেখাবার চেষ্টা করেছে, যারা শিবাংশে জন্ম ঋষি-দুর্ব্বাসাকে অতি ক্রোধন স্বভাবের হীনচেতা মানুষরূপে বর্ণনা করেছে, তারাই নির্দ্দোষ তপস্বীকে বধ সাধন করিয়েছে রামচন্দ্রকে দিয়ে!

পরবর্ত্তী যুগের কবিরা ঐতিহাসিক নাটকও অনেকে লিখেছেন, কিন্তু তাঁরা মূল চরিত্রে নতুন আলোক দিয়ে তাকে পরিস্ফুট করবার চেষ্টাই করেছেন, মূল চরিত্রকে বিকৃত করেন নি। কালিদাসের কুমারসম্ভবকে প্রকৃতি-বিপর্য্যয় দোষ-দুষ্ট বলা হয়—সম্ভোগ বর্ণনার জন্য। বাঙ্গলার বৈষ্ণব কবিরাও ঐ একই দোষ-দুষ্ট বলা যায়, কিন্তু বাঙ্গলার সাধক, কবিতার মধ্যে প্রাকৃত-ভাব বর্জ্জিত 'রস' পেয়েছেন। তা ছাড়া, ইহাও বলা যেতে পারে যে কুমারসম্ভবের মিলন বৈধ মিলন। ৭০০ শতাব্দীর সম-সম সময়ে কাশ্মিরী সৈন্য কাণ্যকুব্জ অধিকার করে, সেই সময়ে তারা সেখানকার মহাকবি ভারত গৌরব ভবভূতিকে নিয়ে যায়। ভবভূতি উত্তররাম চরিত লেখেন। রাবণ বধের পরবর্ত্তী ঘটনা ও সীতা নির্ব্বাসন প্রসঙ্গ নিয়ে বইটি লেখা হয়। ভবভূতি রামচন্দ্রকে কোমল হৃদয় দেব-মানব রূপেই চিত্রিত করেছেন, আর্য্যআদর্শই দেখিয়েছেন।

বক্ত হিসাবে রাবণ আর্য্য হলেও, তাঁব বাজধানি লঙ্কা অযোধ্যা অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী হলেও, বাবণকে বলা হয় অনার্য্য—তাঁব অনার্য্যজনোচিত বহু কর্ম্মেব জন্য। বালী ত 'টটেম্‌' জাতীয—অনার্য্য, বক্ত হিসাবে। বাবণ বা বালীব আর্য্য-শিক্ষা ছিল, বোধ হয় এই জন্য তাঁবাও ঐ সব প্রক্ষেপ-কাবীদেব মত ক্ষুদ্রচেতা ছিলেন না। অনার্য্যেব মধ্যে দেবব-বিবাহ প্রচলিত ছিল। তাই মন্দোদবী ও তাবাব পুনর্ব্বিবাহেব কাহিনী দেখতে পাই। বামচন্দ্র সকল আচারকে যথাযোগ্য সম্মান দিতেন। আর্য্য আচাব বড, অনার্য্য আচাব ছোট—এ প্রশ্নই তিনি তোলেন নি। এই ত গেল আচাব ও বামচন্দ্রেব কথা। কিন্তু দুটি জিনিষ এখানে লক্ষ্য কববাব বিষয আছে, (১) নাবদেব বামায়ণে মন্দোদবী বা তাবা—এই দুই বিধবাব পুনর্বিবাহেব কোন প্রসঙ্গ নেই, (২) বিভীষণ বা বালীব ঔবসে, মন্দোদরী বা তাবাব কোন সন্তান হয় নি।

যুধিষ্ঠিব, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবেব মা ছিলেন কুন্তীদেবী ও মাদ্রীদেবী, তাঁদেব স্বামী ছিলেন পাণ্ডুবাজ। প্রথম তাঁবা অপুত্রক ছিলেন। স্বামীব ইচ্ছায় কুন্তীদেবী পুত্রার্থে তপস্যা আবম্ভ কবেন। এই তপস্যাব ফলে, ধর্ম্মবাজেব ববে, তাঁব প্রথম পুত্র হয়। স্বামীব ইচ্ছায তিনি দ্বিতীযবাব তপস্যা আবম্ভ কবেন, পবন দেবতাব উদ্দেশ্যে, ববলাভ কবেন ও ২য পুত্র হয়। ঐ বকম ৩য় বাব ইন্দ্রদেবতাব উদ্দেশ্যে তপস্যাব ফলে তিনি ৩য পুত্রলাভ কবেন। এই ত মূল ঘটনাব বিববণ। প্রক্ষেপকাবীদেব অসম সাহস হয়েছে বলবাব যে কুন্তী দেবীব সঙ্গে দেবতাদেব প্রত্যেকবাবে একে একে দেখা হয ও তাঁদেব 'ঔবসে' দেবীব এক একটি পুত্র হয।। প্রক্ষেপকাবীবা তাঁদেব দুর্ব্বুদ্ধিব দৌড এই অবধি দেখিযে ক্ষান্ত হন নি। কুন্তীদেবীব সপত্নী মাদ্রীদেবীও ছিলেন অপুত্রক। কুন্তীদেবীব তপস্যাব সাফল্য দেখে, তিনি কুন্তীদেবীব কাছে তপস্যাব নিয়ম ও মন্ত্রাদি শেখেন ও পুত্রার্থে তপস্যা আবম্ভ কবেন। অশ্বিনীকুমাবদ্বয দেবতাদেব ববে তাঁব যমজ পুত্র হয়; লেখা হল যে কুন্তীব বহুস্বামী এবং মাদ্রীব তিন স্বামী!! ইহাব কিছুদিন পবে, পাণ্ডুবাজেব দেহত্যাগ হলে এই মাদ্রীদেবী সহমৃতা হন, ইহাও মহাভাবতে আছে। কুন্তীদেবী সম্বন্ধে প্রক্ষেপকাবীদেব 'সুব' আব এক পর্দ্দায উঠেছে। বালিকা বয়স হ'তেই কুন্তীদেবী ছিলেন তপঃপবায়ণ। কুমাবী

অবস্থায় তিনি সূর্য্যদেবতার উদ্দেশ্যে তপস্যা করেন। এই ঘটনাটুকু পেয়েই গল্প রচিত হল যে, সূর্য্যদেব দেখা দিয়ে কুমারী কুন্তির গর্ভোৎপাদন করলেন। এই পুত্রই নাকি বিখ্যাত বীর কর্ণ। এই কর্ণ পরে বরাবর দুর্য্যোধনের সভা অলঙ্কৃত ক'রেছিলেন ও পরমভক্তরূপেও ইনি বর্ণিত। কুরুক্ষেত্র সমরের পূর্ব্ব হ'তেই তিনি যুধিষ্ঠির আদি সকলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কর্ণ নাকি তাঁর জন্মবৃত্তান্ত জানতেন এবং কুন্তিদেবীও নাকি কর্ণকে চিনতে পেরেছিলেন, একবার নাকি কুন্তিদেবী তাঁর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। গল্পের মজা এই যে, শ্রীকৃষ্ণও নাকি সমস্ত ব্যাপার জানতেন। কর্ণ, পাণ্ডবদের বিপক্ষে ও দুর্যোধনের পক্ষে সমরে যোগ দিয়েছিলেন। ইনি ছিলেন মহাবীর অর্জ্জুনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। সবাই সব ব্যাপার জানতেন, অথচ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত সব কথা যুধিষ্ঠিরাদির কাছে গোপন রেখেছিলেন অতদিন ধ'রে। এই গল্পটি রচনা ক'রে শ্রীকৃষ্ণ হ'তে আরম্ভ ক'রে সমস্ত বড় চরিত্রকে হীন করা হয়েছে ও দেখাবার চেষ্টা হয়েছে যে আর্য্যসমাজে বড় ঘরেও নিয়োগ-প্রথা ছিল। ✓1

আধ্যাত্মিকতার সংস্কার আছে ব'লেই ভারত স্বরভ্রষ্ট হন নি, আর, সেইজন্যই বৌদ্ধ-প্লাবন হ'তে ভারত রক্ষা পেয়েছেন। বৌদ্ধ প্রক্ষেপকারীদের সময় এখনকার মত ইতিহাস আলোচনা ছিল না, আলোচনারও সুযোগ বড় ছিল না, তাই অহল্যা চরিত্রকে রক্ষা করতে কুমারিল ভট্ট ঐ চরিত্রের রূপক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তখন চিত্রিত-ঘটনার ঘোর বিপর্য্যয় ধরা পড়ে নি। গৌতমী অর্থাৎ অহল্যা, ব্রহ্মবাদিনী নারী, তপস্বিনী ও সাধ্বীরূপে নানা স্থানে বর্ণিত, অন্যত্র তাঁকে বিশ্বাসঘাতিনী কামুকী কুলটা করা হয়েছে— দুই বর্ণনাই রয়ে গেছে। তার পর নিয়োগপ্রথার কথা। অনেকে বলেন, অনার্য্য-সংস্পর্শে হয় ত মহাভারতের সময় নিয়োগ-প্রথা এসে থাকবে, কিন্তু অনার্য্যদের মধ্যে কি তা পতির আদেশ সাপেক্ষ ছিল? নিয়োগ-প্রথা বেশ কায়েমী ভাবেই ছিল ভারতের বাইরে। ইজিপ্ট, বাবিলোনিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশে স্বামী-স্ত্রীর ধারণা হিন্দুভাব হ'তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নিয়োগ-প্রথা ভারতে যে সব স্থানে দেখা দেয়, সে সব স্থানেও উহা স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষ ছিল। এই অনুমতি প্রার্থনার সঙ্গে লাইকারগাস-প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্র-আইন সঙ্গত অনুমতি আদায় করার

পার্থক্য আকাশপাতাল। হিন্দুর আদর্শধারা বৈদিক যুগ হ'তে চলে আসছে; তা ছাড়া, হিমালয়ের পার্ব্বত্য জাতির আচার যে পাঞ্চাল রাজ্যে ছিল তার কোন প্রমাণ নেই, বরং বিরুদ্ধ প্রমাণ বর্ত্তমান, ঐ পার্ব্বত্য জাতির তখনকার আচার যে অনুরূপ ছিল তাহাও জানা যায় নি।

নারী জাতি সম্বন্ধে এক অদ্ভুত ধারণা আর্য্যের ছিল। অদ্ভুত, কেন না বর্ত্তমান সময়ে আমরা সে ভাব হারিয়েছি। বেদে বশিষ্ঠের নাম আছে। তিনি বলেন, 'নারী সর্ব্বদাই পবিত্র, কখন দূষিতা হন না, কারণ তিনি সোমদেবতা, গন্ধর্ব্বদেবতা ও অগ্নিদেবতার দ্বারা উপভুক্তা হবার পর মানুষের সঙ্গে বিবাহিতা হন, অর্থাৎ মানবরূপী বিবাহিত স্বামী নারীর চতুর্থ পতি, প্রথম তিন পতি—সোম, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নি।' বশিষ্ঠ আরো বলেন 'সোমদেবতা নারীদের শৌচ বা পবিত্রতা দেন, গন্ধর্ব্ব শীলতা দেন ও প্রিয়ভাষিনী করেন, অগ্নি—সর্ব্বভক্ষত্ব হেতু—তাঁদের নিষ্কলঙ্ক করেন অর্থাৎ নারী সর্ব্বথা দেবতার নির্ম্মাল্য, ভোগ যেমন দেবতাকে নিবেদন করলে, সেই নির্ম্মাল্য দেবতারই, নারীও সেই রকম পবিত্র নির্ম্মাল্য।' নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক পবিত্রতা, মধুরত্ব ও নিষ্কলঙ্কত্বই নারীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পতি—সূক্ষ্মপতি, মানবই স্থূল পতি, যাঁর সাহচর্য্যে তিনি স্থূল বিশ্বের স্থিতি ও পালনী শক্তি।

["পূর্ব্বং স্ত্রিয়ঃ সুরৈর্ভুক্তা সোম গন্ধর্ব্ব বহ্নিভিঃ। ভুঞ্জিতে মানবাঃ পশ্চান্নতা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ। স্ত্রিয়ঃ পবিত্রমতুলং নৈতা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ॥"

পুনঃ—"তাসাং সোমো দদচ্ছৌচংগন্ধর্ব্বঃ শিক্ষিতাং গিরম্।
অগ্নিশ্চ সর্ব্বভক্ষত্বং তস্মান্নিষ্কলঙ্কাঃ স্ত্রিয়ঃ॥"]।

(ঋগ্বেদ ১০ম, ম দ্রঃ)

নারী সম্বন্ধে এই রকম ধারণা বহুকাল হিন্দুদের ছিল। ৯৬৫—৬৭ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে যামুনাচার্য্য নামে একজন প্রতিভাশালী যুবক ছিলেন। তাঁর গুরু শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন। সেই সময়ে পাণ্ড্যরাজের একজন প্রিয় ও তর্কে-পটু সভাপণ্ডিত, 'বিদ্বদ্‌জনকোলাহল' নামে বিদিত ছিলেন। পাণ্ড্যরাজের সভায় উভয়ের তর্কযুদ্ধে 'বিদ্বদ্‌জন্' হেরে যান। সেই সভায় যামুনাচার্য্য বলেন, 'রাণীর অষ্টপতি সত্ত্বেও রাণীমাতা সতী; ঐ অষ্টপতির নাম অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্র।

ঐ-ঐ দেবতাবা অষ্টদিক্‌পাল, অষ্টদিক্‌পাল প্রভাবেই বাজা বাজত্ব কবেন।' বাজা ও রাণী এ কথায় প্রীত হন।

দেশে এই প্রকাব ধাবণা, প্রক্ষেপকাবীদেব উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায় হয়েছিল। সামাজিক ব্যাপাবে, বিশেষ বিবাহব্যাপাবে, আর্য্যেবা আর্য্যেতর ভাব সহজে গ্রহণ কবেন নি—সতী-সীতাব আদর্শকে কখন ক্ষুণ্ণ হ'তে দেন নি। শুধু নিয়োগপ্রথা নয়, দ্রৌপদীচবিত্রেও, অত বড বীবাঙ্গনা বহুগুণশালিনী মহাধৈর্য্যশালিনী নাবীচবিত্রেও তিব্বতীয় আচার প্রবিষ্ট কবান হ'য়েছে নানা প্রকাব উদ্ভট গল্পে—জন্মজন্মান্তরেব কথা এনে সেই আচাবকে সমর্থন কবা হ'য়েছে, আবার ঐ বকম আচারেব প্রবর্ত্তক খাডা কবা হ'য়েছে আকুমাব মহাবীব মহানুভব ভীষ্মদেবকে, পাণ্ডববংশে, ঐ অনার্য্যাচাবেব যন্ত্র কবা হ'য়েছে ব্যাসদেবকে। আব, তখনকার শক্তিমান সমাজ বিনা আপত্তিতে ঐ অনার্য্যাচাব স্বীকাব ক'বে নিলেন!! পাণ্ডুবংশ ছিল ধার্ম্মিক, সত্যপবায়ণ ও বীব। কৌবববংশেব উপব কোন দোষ চাপান হয় নি, যদিও সেই বংশই ছিল অত্যাচাবী, দুর্ম্মতিপবায়ণ, গান্ধাবীও এসেছিলেন গান্ধাব হ'তে। সে বংশে নেই তিব্বতীয় আচাব, আব যে বংশেব সঙ্গে ঐ রকম অনাচারেব কোন সম্বন্ধ নেই, সেই বংশেই প্রক্ষেপ কবা হ'য়েছে অনাচাব!!

ব্রাহ্মণগ্রন্থে একটা গল্প আছে। বাজা হবিশ্চন্দ্রেব ছেলে হয় নি। শেষে বরুণেব ববে তিনি পুত্রমুখ দেখলেন, কিন্তু পূর্ব্ব অঙ্গীকার বা সর্ত্ত মত বরুণদেবকে ছেলে দেওয়া হ'ল না। বড় হ'য়ে ছেলেটি বনে পালাল। বাজাব উদবী হ'ল। বনেব মধ্যে আজীগর্ত্ত নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাজপুত্র বোহিত সেই ব্রাহ্মণেব মধ্যম ছেলে শুনঃশেপকে খবিদ কবলেন। নববলিব জন্য বাজা যজ্ঞেব আয়োজন কবলেন। নববলি দেবাব লোক পাওয়া গেল না। বলি দেবাব লোক পাওয়া গেল না দেখে, ও, বেশী মূল্য পাওয়ায়, আজীগর্ত্ত নিজের ছেলেকেই বধ কবতে উদ্যত হন! আর্ত্তশবণাগত হ'য়ে শুনঃশেপ দেবতাকে ডাকতে লাগলেন। তাঁব কণ্ঠ দিয়ে বক্ত নদ নির্গত হ'তে লাগল। ঋত্বিকদেব মধ্যে ছিলেন ঋষি বিশ্বামিত্র। এতক্ষণ তিনি সব ব্যাপাব বুঝতে না পেবে চুপ ক'বে ছিলেন। এইবাব তিনি শুনঃশেপকে কোলে নিলেন, আজীগর্ত্তকে 'পিশাচ' ব'লে ভৎসনা করলেন, যজ্ঞ পণ্ড হওয়ায় খুশী হলেন ও শুনঃশেপকে পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন।

তাঁর পুত্রদের মধ্যে শুনঃশেপই আদরে, যত্নে, শিক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'য়েছিলেন ও পরে ঋষি দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ হন।

প্রায় সমস্ত পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে ঐ আখ্যানটিতে নরবলির কথা পরবর্ত্তীকালে রচিত হ'য়ে ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হয়। নরবলি তখন ছিল না ব'লেই দেখান হ'য়েছে যে বলি দেবার লোক পাওয়া গেল না। যারা নরমেধ যজ্ঞ ভারতে প্রবর্ত্তন করে (পরবর্ত্তীকালে যে নরবলি একমাত্র রাজাই দিতে সমর্থ ছিলেন এই বিধি হয় এবং তাও বেশীদিন চলে নি—তারাই বৈদিক সমর্থন পাবার জন্য ঐ কাণ্ড করেছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে প্রাক্‌বৈদিকযুগের অনুষ্ঠানাদিতে হয়ত নরবলি ছিল, কারণ, তাঁদের মতে, সমস্ত বর্ব্বর, অর্দ্ধসভ্য, এমন কি সভ্যজাতির মধ্যেও যখন নরবলি প্রথা ছিল, তখন ভারতেও নিশ্চয়ই ছিল! ঐ রকম উক্তি সম্বন্ধে এইমাত্র বললেই হবে যে সমাজ-শক্তিহীন অসংযত মানবের ঐ আচার যে সংযত আর্য্য-আচার নয়, ইহা নিশ্চিত: বেদের মধ্যে যে সব 'পুরাণ' (প্রাচীন) কথা আছে, তাতে প্রাক্‌বৈদিক যুগের অতি সামান্য আভাস যা পাওয়া যায়, তাতেও আর্য্যসভ্যতার বীজরূপী বৈশিষ্ট্য বিরাজিত। ঐ রকম বীভৎস আচার যে সভ্যতার অঙ্গ ছিল, সে সভ্যতার অর্থ এখনও ভারত বুঝতে পারে না।

পুরাণেও রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান আছে। হরিশ্চন্দ্রচরিত্র সেখানে কতবড় মহৎ চিত্তের উদাহরণ! আর ঐ গল্পে? পুরাণে বিশ্বামিত্রচরিত্রও আছে, কিন্তু সেই চরিত্রের জোড়া একমাত্র ক্রোধপরায়ণ জ্ঞানী দুর্ব্বাসায় দেখা যায়। একস্থানে হরিশ্চন্দ্রচরিত্র কলুষিত, অপর স্থানে বিশ্বামিত্র-দুর্ব্বাসাচরিত্র! জ্ঞানী বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে জড়িত করা হ'য়েছে। তামাশা এই যে ঐ উভয় জ্ঞানী চরিত্রে, উভয়ের অদ্ভুত বিভূতির বল দেখান হ'য়েছে, যে বিভূতির লোভ সিদ্ধির বা ঋদ্ধিলাভের অন্তরায়। ব্রাহ্মণগ্রন্থের হরিশ্চন্দ্র-কথা, নরবলির গল্প, পুরাণে রূপান্তরিত হ'য়ে যযাতি-নহুষের কাহিনীতে নরবলির প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। নরবলির প্রথা বিদেশ হ'তে আমদানী, ভারতে স্থায়ী হয় নি। নরবলির প্রথা ছিল মেক্সিকোতে, সেখানে রাজায় রাজায় যুদ্ধ ঘোষণা করা হত, সত্যকার যুদ্ধ হত, কিন্তু যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল তামাশা দেখা অর্থাৎ আহত ও পরাজিতদের সংগ্রহ

ক'রে নরবলির জন্য লোক সংগ্রহ করা, ঐ সব দুর্ভাগাদের একবৎসর ভোগে রাখার পর বলি দেওয়া হ'ত আর সেই সময়ে জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে দর্শকদের সামনে বক্তৃতা দেওয়া হত। সেমিটিক জাতির মধ্যে নরবলির প্রথা ছিল। রোম সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির সময়েও সম্রাট এলগাবেলাস নতুন ক'রে নরবলি প্রচলন করেন! ভারতেও বহু আর্য্যেতর জাতির বাস বরাবর আছে, কিন্তু তাদের মধ্যেও যে নরবলির প্রথার বহুল প্রচলন ছিল তা প্রমাণিত হয় নি। অনেকে প্রথম 'পুরুষমেধ' যজ্ঞকে নরমেধ যজ্ঞ ব'লে ভুল করেছিলেন। খোলো পণ্ডিতেরাই ঐ ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করেছেন। অশ্বমেধযজ্ঞেও প্রথম অশ্ব বলিদান হ'ত না।

[শতপথ ব্রাহ্মণে পুরুষমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা আছে। মনীষী কোলব্রুক সাহেব স্পষ্টই বলেন "Ashwamedha and Purushmedha, celebrated in the manner directed by this Veda, are not really sacrifices of horses and men"—'এই বেদে অশ্বমেধ ও পুরুষমেধ যজ্ঞে যে ব্যবস্থা বিহিত আছে, তাহা অশ্ব ও নরবলি নয়।" অশ্বমেধ যজ্ঞে ৬০৯টি পশু দরকার হত ২১টি স্তম্ভ নির্ম্মিত হত, থামের সঙ্গে অনেক জাতীয় সাপ বেঁধে রাখা হত, তারপর মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হলে, ঐ সমস্তগুলিকে জীবন্ত ও অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হ'ত। বলা বাহুল্য, তাদের যত্নে রাখা হত। পুরুষমেধ যজ্ঞে ১৮৫ জন দরকার হত, জাতি নির্ব্বিশেষে লোক সংগ্রহ করা হত। ১১টি থামের মধ্যে তাদের আটক্ রেখে, নারায়ণের পূজান্তে তাদের সকলকেই ছেড়ে দিয়ে হোমাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হত। পূজান্তে পূজাস্থলে উপস্থিত সমস্ত লোকের অঙ্গে 'শান্তিজল' প্রক্ষেপ করা হয়, সকলের কল্যাণোদ্দেশ্যে। কল্যাণ হয়—এই বিশ্বাস বৈদিক যুগ হ'তে চলে আসছে। ঐ সব যজ্ঞেও, মূল প্রেরণা—কল্যাণইচ্ছা, হত্যা নয়। পরবর্ত্তীকালে যজ্ঞের নামে ঐ প্রকার যে সব বলি দেওয়া হত (হত্যা ক'রে), সেগুলি পণ্ডিতদের মতে প্রক্ষিপ্ত। কোলব্রুক সাহেব বলেন, "Human sacrifices were not authorised by the Veda itself but in later times fabricated by persons who in this as in other matters, established many able practices on the foundation of emblems and allegories which they misunderstood—'বেদে নরবলির সমর্থন নেই, কিন্তু পরে কতকগুলি দুষ্ট লোকেরা ঐ সব যজ্ঞের মধ্যে রূপকে বর্ণিত উচ্চ ভাব বুঝতে না পেরে, অর্থ [illegible], বেদে

নিজেদের কল্পনা চালিয়ে দেওয়ায় সেগুলি পবে প্রবল হয়ে উঠল'। ঐ সাহেব-প্রমুখ পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন যে অশ্বমেধেব অশ্ব=বিবাজরূপী ঈশ্বব ("The Primeval and Universal manifested Being')। এখানে ও মূল তত্ত্বটি আগে, অর্থ এসেছে বহু পরে—বলি-প্রথা প্রচলিত হবাব বহু পবে।]

আমাদেব দুর্ভাগ্য যে ঐ সব আবর্জ্জনা এখনও কথকেব মুখে, যাত্রায়, থিয়েটাবে, 'টকিতে' ও অন্যান্য স্থানে প্রচাবিত হচ্ছে। কথককুলেব মধ্যে অনেকে সংস্কৃতে পণ্ডিত। পণ্ডিত-সমাজও আজ আত্মবিস্মৃত! একটি কথা কথককুলেব বোঝা উচিত। ধোলো-শিক্ষায় শিক্ষিত বহু ব্যক্তি তাঁদেব কথকতা শোনেন, জনসাধাবণ ত শোনেই। তাঁদেব বাক্‌চাতুবী, বলবাব ভঙ্গী, হাস্যবস, বীববস বা করুণবস অবতারণার কৌশল অনেককে মুগ্ধ কবে, তাঁদেব বাহবাও সকলে দেন, কিন্তু যে সব চবিত্রকে তাঁবা জাতীয় চবিত্ররূপে বর্ণনা কবেন, সে সব চবিত্রেব কতকগুলিতে রুচি, শীলতা ও সদাচারের অভাব দেখে ঐ সব শিক্ষিত জনেবা বিবক্ত হন ও জাতীয দেবচবিত্রে বিশ্বাস হাবান এবং সাধাবণেব মধ্যেও নাস্তিকতা আসে। কথক মহাশয়দেব জানা উচিত যে ধোলো-শিক্ষায় শিক্ষিতজনেব অধিকাংশ ব্যক্তিবা দেশকে যথার্থ ভালবাসেন ও তাঁবা সত্যসত্যই জাতিব মঙ্গলকামী, ত্যাগশক্তি তাঁদের মধ্যেই দেখা দিচ্ছে বেশী—তাঁদেব আচরণ ও মতভেদ সত্ত্বেও। আবো দুঃখেব বিষয় যে যাঁবা শক্তিশালী লেখক, যাঁদেব লেখাব মধ্যে মৌলিকত্বও আছে, তাঁদেব মধ্যে অনেকে সাহিত্যক্ষেত্রে, ধোলো-মাপকাঠিতে জাতির চবিত্র চিত্রিত কবেন, তাঁদেব লেখা বহির্দৃষ্টিব উর্দ্ধে যায না, বৌদ্ধ-প্লাবনপ্রসূত গল্পগাথাব ছাঁচেব উর্দ্ধে যায না। হিন্দুজাতিব জাতীয-অন্তর্দৃষ্টি তাঁদেব কোথায? তাঁদেব লেখায় আমবা জাতীয় আদর্শ কতখানি পেতে আশা কবি, তা কি তাঁদেব ভাবা উচিত নয়? সংকীর্ণতা আনায় অধঃপতন। মিলনেব পক্ষে সংকীর্ণতাই প্রবল বাধা। শিল্পের একটা নতুন দিক্ দেখিয়েছেন ভাবতেব মুসলমান। অনেক মুসলমান কবি ও ভাবতে জন্মেছেন। আজও বহু মুসলমান কবি ভাবতীয় সাহিত্যেব মুখোজ্জ্বল কবছেন। তাঁবা সকলেই উদাব, তাঁদেব দৃষ্টি সংকীর্ণতা-দোষ-দুষ্ট নয়। কিন্তু আজ তাঁদেব মধ্যে একশ্রেণীব উদয় হয়েছে, যাঁবা আর্টেব দিক্ দিয়ে, কবিত্বেব দিক্ দিয়েও জিনিষকে বোঝাবাব বুদ্ধি হাবিযেছেন মনে হয়।

জাতির অধঃপতনের কারণ উপস্থিত হয়, যখন জাতি নারীকে অবহেলা করে, নারীকে হীনচক্ষে দেখে। ইউরোপে মধ্যযুগের 'সেন্ট'রাও নারীকে ঘৃণার চক্ষে দেখতেন, ধোলো-সমাজও অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য-সাধনকে উৎসাহ দেন নি—'সেন্ট যুগের' বিলোপ-সাধন হ'তেও বেশী দেরী হয় নি। ভাবতে, ভগবানে মাতৃত্ব আরোপ হয় কেন? অন্যত্র সে ভাব নেই কেন? নারী এখানে শক্তিরূপে কল্পিত কেন? জননী, দুহিতা ও জায়া—নারী, এই তিন কল্যাণময়ীরূপে, সমাজে বর্ত্তমান। বৈদিকযুগে, মাতৃভাব যথেষ্ট থাকলেও, অপর দুই ভাব অধিকতর পরিস্ফুট, উপনিষদে ভক্তিতত্ত্ব যথেষ্ট থাকলেও, পুরাণে তার ফল-ফুল-শোভিত চিত্তহারী রূপ, বৈদিক যুগের মাতৃত্ব সেই রকম তন্ত্রে চমৎকারিণী রূপ ধরেছেন। সমাজ-চিত্তের শ্রেষ্ঠ ফল সন্ন্যাস। সমদর্শিত্ববোধ পুরুষে দেখা দিলে, তিনি শরীরধর্ম্মী অহংকে পৃথক রেখে নারায়ণজ্ঞানে সেবারত হন, নারীর আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হলে, তাঁর শরীরধর্ম্মী অহং বিশ্বমাতৃত্বে ডুবে থাকে। মাতৃত্বেই বিশ্বের স্থিতি। মাতৃত্বের বীজই ক্রমবিকশিত হয়ে নারীতে প্রস্ফুটিত। মাতৃত্বেই—বাৎসল্যেই—সমাজ ও সভ্যতার উদয়। সন্তান প্রসবেই নারীর মাতৃত্ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। বিশ্ববাৎসল্যই নারীর মাতৃত্ব, সেইখানেই তাঁর সমদর্শীত্ব। জায়া মানে, মাত্র পতিব্রতা থাকা নয়, সহধর্ম্মিণীত্ব থাকা চাই। মানুষের মনুষ্যত্ব চাই। স্বামীর বল, বীর্য্য, সাহস ও মনুষ্যত্বের বিকাশে সহায়তা করা, পবিত্রতা ও চারিত্র্য বলে বলবতী থাকাই সতি-ধর্ম্ম—পতিনিষ্ঠা যার অবশ্যম্ভাবী ফল। সর্ব্বক্ষেত্রে, ভারতে—এশিয়ায়—চারিত্র্য ও ধর্ম্মসংস্থানের বোধ আগে এসেছে, এমন কি, এখানে চতুর গুণ্ডা দলপতি রাজায় পরিণত হয় নি। এই সমস্ত জাতীয় বিশেষত্বের দিকে বর্ত্তমান সাহিত্যিকের কি দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য নয়? স্বাধীন চিন্তার নামে জাতীয়-মর্য্যাদাকে ছোট ক'রে দেখানতে আমাদেরই হীনতা আসে। আমরা কি ধোলো-ভাঁওতায় দিশেহারা হ'য়েই থাকবো?

বৌদ্ধপ্লাবনের যুগে আমরা আমাদের মাতৃভাষা ছাড়ি নি, সংস্কৃত সাহিত্যকেও মর্য্যাদা দিয়েছি, মুসলমান যুগেও আমরা মাতৃভাষা বা সংস্কৃত সাহিত্যচর্চ্চা হ'তে বিরত হই নি, কিন্তু ধোলো-বিদ্যা প্রসারের সঙ্গে আমরা আমাদের মাতৃভাষার স্থান দিয়েছি ধোলো ভাষার নিয়ে, সংস্কৃত সাহিত্যকে উপেক্ষা করেছি, তার ফল হয়েছে আত্মবিস্মৃতি, যা হ'তে এসেছে এই সর্ব্বদিকে দিশেহারার ভাব।

প্রক্ষেপকারীদের আত্মকথা

কোন ভাবকে জনসাধারণ-গম্য করবার মতলব—রাজনৈতিক বা অন্য কিছু—এঁটে আদর্শখাড়া করবার চেষ্টা করলেও, ভারতে তা স্থান পায় না। বর্ত্তমানকালে এইজন্য নতুন 'রাখিবন্ধন' ও নতুন 'অরন্ধন' প্রথা প্রচলন হল না। শিক্ষিত সমাজের দ্বারা ঐ সব প্রচলন-চেষ্টা, শিক্ষিত বাঙ্গালীর জাতীয় ভাব-ধারা হ'তে বিচ্ছিন্ন ঐ রকম চেষ্টা, বিফল হয়েছে। ভারত জীবন চান, ঋষি-চরিত্র চান। পবিত্র বীর হৃদয়ের কাছে ভারত শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। পশ্চিমা হিন্দুস্থানীরাই এখন কোন কোন ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর ঘরে 'রাখি' নিয়ে যান, গরীব ব্রাহ্মণেরা পয়সার লোভে 'রাখি' দিয়ে যান। ঐ 'পশ্চিমা রাখির' সঙ্গে বীরহৃদয়ের ত্যাগার্ঘ্য আছে। সতী, সীতা, দময়ন্তীর কথা হিন্দুর ঘরে ঘরে, কিন্তু কবি-কল্পনা-প্রসূত অমন সুন্দর 'শ্রীবৎস চিন্তার', চিন্তার নাম, সতী, সীতা বা সাবিত্রীর সঙ্গে ভারতময় বলা হয় না। ভারতে, আদর্শ—মাত্র পুঁথিগত নয়; সেই আদর্শকে সজীব ও মূর্ত্ত করবার জন্য ব্রত এবং সাধন-প্রণালীও রয়েছে।

অনুগীতার যে সব 'সম্বাদ' আছে, সেইগুলিকে 'ইতিহাস' বলা হয়েছে। তখন ইতিহাস বলতে যা বোঝাত, বর্ত্তমানে তা বোঝায় না। ঐ সব সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়েছেন তার 'বোধ'টি সাধন-পথের অনুভূতিগম্য চিরন্তন সত্য। এই সত্যই যথার্থ 'ইতিহাস'। সংশয়—মনের বিশেষ ধর্ম্ম, ধ্যানচিত্তের বিশেষ ধর্ম্ম—বুদ্ধি, সন্ন্যাসই—জ্ঞানের অসাধারণ ধর্ম্ম। সংকল্প, বিকল্প, সন্দেহ—মনের সাধারণ অবস্থা; উপলব্ধির পথে আগুয়ান চিত্তে আসে বিশ্বাস, আনন্দজনিত নিশ্চয় বুদ্ধি, আদর্শের তুলনায় আর সবই তুচ্ছ, হেয়, অলীক বোধহয়; জ্ঞানে স্ফুরিত হয় সন্ন্যাস—সত্যের রূপ। ঐ সত্যই 'ইতিহাস'। ঐ সত্য প্রকাশের কার্য্যকারণও 'ইতিহাস'। সাধক বলেন, সতী-সীতার ভাবনায়, সাধন ফলে, তাঁরা রূপময়ী হ'য়ে প্রত্যক্ষ হন, কল্পনার চরিত্রে তা হয় কি কখন? সাধক আরো বলেন যে প্রত্যেকেই ইচ্ছা করলে সাধন-ফল পরীক্ষা ক'রে নিতে পারেন। উপন্যাস নাটকাদিতে যে সব চরিত্র চিত্রিত থাকে, যদি

সেগুলি সামাজিক সত্য অর্থাৎ সমাজ-জীবনেব সত্য হয়, সেগুলি সমাজে অল্পবিস্তব প্রভাব বিস্তাব কবে, যদি সেগুলি সমাজ-চিত্তেব প্রকৃত ছায়া হয়, সমাজে সেগুলি আদব পায় ও তাব প্রভাব প্রসাবলাভ কবে। সমাজ-চিত্তের বা সমাজ-জীবনেব বিকৃত চিত্র উত্তেজনাব সৃষ্টি কবে, উহা সমাজে যে আলোড়ন আনায় তাতে সমাজ-শবীবকে দূষিত কবে, এগুলি সমাজেব ব্যাধি। ব্যাধিকে বড ক'বে দেখালে বোগীব অনিষ্টই হয় যদি তাব সঙ্গে ঔষধ ও পথ্যেব ব্যবস্থা না থাকে, হৃদয়েব সাহস না থাকে।

কৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদেব মত অনেক সম্বাদ, অনেক আখ্যান, ভাবতে ববাববই চলিত ছিল। অনেক গল্প-গাথা বা আখ্যান বৌদ্ধেবা পালি ভাষায় লিখে গেছেন। পালি ভাষায় ঐ সব গল্প-গাথাব উৎপত্তি স্থল—বামচন্দ্রেব লীলাভূমি অযোধ্যা প্রদেশ। নাবদ-বাল্মীকি-সম্বাদে, বাল্মীকিব বীণার ঝঙ্কাব হয় প্রথম ঐ কোশল বাজ্যে। নাটকেব গান, বাজনা, নৃত্য, আমোদ-প্রমোদ সবই নিষিদ্ধ হয় জৈন ও বৌদ্ধবাদে। অশোক ও হর্ষবর্দ্ধনেব সময় পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র বৌদ্ধবাদ জোব কবেনি, তাই সে সময়ে সংঘাবামে বুদ্ধ-চবিত্র নাটকাকাবে অভিনীত দেখতে পাই, অন্য বহু নাটকেবও আবির্ভাব দেখতে পাই, কিন্তু সে সমস্ত নাটকেব মধ্যে অল্পই অবশিষ্ট আছে। একদিকে, বৌদ্ধ-প্লাবনেব যুগে ঐ সব আমোদ-প্রমোদ নিষিদ্ধ হয়, অপব দিকে, জৈন নাস্তিকবাদ ও নাস্তিকবাদেব বিরুদ্ধে শ্রীশঙ্কবেব অভ্যুত্থান, বৌদ্ধ অত্যাচাব হ'তে শাস্ত্র বক্ষাব জন্য ব্রাহ্মণ সমাজেব প্রাণপণ চেষ্টা, বৌদ্ধ-অত্যাচাবেব প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ কোন কোন হিন্দুবাজগণ দ্বাবা স্থানে স্থানে বৌদ্ধ-নিপীড়ন, হিন্দুবাজসহায় হিন্দু সমাজেব পুনরুত্থান-চেষ্টা প্রভৃতি বহু কাবণে বৌদ্ধ নাটক জীবিত থাকতে পায় নি।

চীন পরিব্রাজক ইৎসিং (I-tsing) ভারতে এসে কান্যকুব্জে 'নাগানন্দ' নামে এক নাটকের অভিনয় দেখেন। হর্ষবর্দ্ধন ছিলেন বিদ্যানুরাগী, তাই তিনি বৌদ্ধ জাতকের গল্পকে জাতীয় সাহিত্যে পরিণত করবার চেষ্টা পান। তিনি বৌদ্ধ নাটক সংস্কৃতে লিখতে পণ্ডিতদের আহ্বান করেন, ফল সামান্য হয়। পরে একজন রাজকবি 'নাগানন্দ' লেখেন। নাটকে গরুড়কে কি ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে ও একজন ব্রাহ্মণের মুখে জোর ক'রে মদ ঢেলে দিয়ে ব্রাহ্মণকে অপদস্থ ক'রে হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে তা উপভোগ্য।

বৌদ্ধ-গল্প-গাথায় গরুড়ের কথা অনেক আছে।. গরুড় হচ্ছেন হিন্দু শাস্ত্রে 'প্রজ্ঞা', বিষ্ণুর দক্ষিণে তাঁর স্থান। পরে পুরাণে গরুড়কে বিষ্ণুর বাহনরূপে দেখতে পাই। বাহন অর্থে যদি ইংরাজি Vehicle বা Medium বোঝায়, তা হলে পুরাণের বাহন কথাটিতে তত দোষ হয় না। যাবানী (Javanese) বা যবদ্বীপবাসীদের মধ্যে গরুড়ের কথা ভারত হ'তেই যায়। সেখানে গরুড় মানে 'জ্ঞান', যার বড় বড় দুই পাখা আকাশের চারিদিক পূর্ণ ক'রে রয়েছে ও ঐ পাখা নিয়ে গরুড় উর্দ্ধ হ'তে উর্দ্ধতম দেশে যান। মালয় দ্বীপে গরুড়ের অর্থ বিকৃত ভাবে আছে। এই গরুড় 'নাগানন্দে' একটি বৃহদাকার হিংস্র গৃধিনী বিশেষ। গরুড়ের দ্বারা ভক্ষিত-পর্ব্বত-প্রমাণ সর্পাস্থি অহিংসাব্রতী যুবরাজ জীমূতের কৃপায়, দেবতার অমৃত সিঞ্চনে জীবিত সর্পে পরিণত হল। বৌদ্ধেরা মাতলামি ও এই সব হিংসার অনাচার বন্ধ করতে উদ্যত—ইহাই দেখান হয়েছে। ধোলো পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে বেদে যেমন প্রকৃতির উপাসনা আছে, এটাও সেই ভাবে লেখা, অর্থাৎ জিমূৎ মানে ঝোড়ো মেঘ, (আর গরুৎ শব্দ হ'তে) গরুড় মানে বিদ্যুতের তির্য্যক গতি (সাপের মত)। প্রাকৃত-গল্প-সংগ্রহ 'বৃহৎ-কথা' হর্ষবর্দ্ধনের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ঐ সব উপাখ্যান ভারতের বাইরে ও যায়। ভবভূতির বহু পরে কোন নাট্যকার 'মালতী মাধব' নামে নাটক লেখেন। তাতে দেখান হয়েছে যে কুমারী মালতীকে কালিদেবীর মন্দিরে বলি দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে ও সেখানে তন্ত্র ও অথর্ব্ববেদ হ'তে মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে! অবশ্য বলি দেওয়া মাধবের জন্য সম্ভব হয় নি। তন্ত্রে, কুমারী সাক্ষাৎ দেবীরূপে আরাধ্যা। কুমারী পূজায় বর্ণ বা জাতি বিচার নেই। নারী-বলির কথা দূরে থাকুক, তন্ত্রে স্ত্রী-পশু বলিও নিষিদ্ধ অথচ দেখান হয়েছে নারী-বলি আবার দেখান হয়েছে কুমারী-বলি !!

জাতীয় নাটক নামে যে সব নাটক সে সময় রচিত হয়, তার মধ্যে একটিতে আছে পরশুরামের কথা। পরশুরাম একসময়ে মালাবার উপকূলে বেড়াচ্ছেন। সমুদ্রদেবতা তাঁর পথ রোধ করলেন। পরশুরাম চ'টে পাহাড়ে এমন জোরে পরশুর আঘাত করলেন যে পাহাড়ের স্থানে স্থানে বড় বড় ফাঁক হ'য়ে গেল, সমুদ্র তার মধ্যে প্রবেশ ক'রে ঠাণ্ডা হল, পরশুরামও স্বস্থানে গেলেন। পাহাড়ে ফাঁক সৃষ্টির কথা আর এক ভাবে অন্য একটি গল্পে আছে। বাল্মীকির

রামায়ণকে জাতীয় নাটকে পরিণত করেন হনুমান। সেটি সংস্কৃত নাটক। হনুমান সমস্ত নাটকটি পশ্চিম ঘাটের পর্ব্বতগাত্রে খোদিত ক'রে রাখেন। এইবার গল্পটি বল্‌ছে যে হনুমানের রচনা দেখে বাল্মীকির উদ্বেগ হয়, পাছে হনুমানের লেখার চল্ হয় ও তাঁর রচনা অচল হয়ে যায়। হনুমান বাল্মীকির মনোভাব বুঝতে পেরে নিজের লেখা পর্ব্বত-সমেত সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। কথিত আছে, হনুমানের দ্বারাই পর্ব্বতগাত্র ফাঁক হয়। যাই হোক, পর্ব্বত-গাত্রে খোদিত লিপির কাহিনীটি একেবারে মিথ্যা নয়। ১১০০ শতাব্দীতে ভোজরাজের কয়েকজন নাবিক দৈবাৎ ঐ লিপির কতক অংশ সমুদ্রগর্ভ হ'তে উদ্ধার ক'রে ভোজরাজকে উপহার দেয়। ঐ নাটকটির অভিনয় দেখবার ইচ্ছা হয় ভোজরাজের, তিনি রাজকবি দামোদরকে সেই সব ভগ্নাংশ পূর্ণ ক'রে সম্পূর্ণ নাটকে পরিণত করতে আদেশ করেন। দামোদরের চেষ্টা বিফল হয়—(তাঁর ১৪টি অঙ্ক মাত্র প্রত্নতত্ত্ববিদের কাযে লাগতে পারে)। বাল্মীকিকে একজন ঈর্ষাপরায়ণ ঋষি দেখান হয়েছে !

[অপ্রাসঙ্গিক হলেও, আপনাদের অনুরোধে, আপনাদের কুতূহল নিবারণের জন্য, কিছু বলবো এখানে। মালয় দেশে হনুমান সম্বন্ধে একটি প্রবাদ এখনও প্রচলিত। রামচন্দ্রাদির দেহরক্ষার পর, হনুমান সন্ন্যাসীর বেশে যবদ্বীপে যান ও তাঁর শেষ জীবন সেইখানে অতিবাহিত করেন। বল্কল প'রে তাঁর প্রভু পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে গিয়েছিলেন ও ফলমূল খেয়ে দিন যাপন ক'রেছিলেন, হনুমানও বল্কল প'রে থাকতেন, মৃগচর্ম্মের আসন ছিল তাঁর, ফলমূল খেয়েই তিনি দিন কাটিয়েছিলেন। এখনও যাবানীরা হনুমানের বাণপ্রস্থস্থানে তীর্থ যাত্রা করে। দক্ষিণ-ব্রহ্মদেশে এখনও রাম-কথা প্রচলিত। ঐ দেশবাসীদের পুরাণকারেরা শ্রীরামচন্দ্রকে ব্রহ্মদেশস্থ দক্ষিণ-সমুদ্র হ'তে সেতু নির্ম্মাণ করিয়েছেন।

বহু সদ্‌গুণরাশির মধ্যে ধর্ম্মসংস্থাপন রূপ বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, শাস্ত্র তাঁকে 'অবতার' আখ্যা দেন। ভাগবত মতে অবতার অসংখ্য। খণ্ডাবতার বা অংশাবতারের কথাও কেহ কেহ বলেন। মহারাজ পৃথুকে 'বিষ্ণুর অবতার', 'খণ্ডাবতার' বলা হয়। পৃথু জানতেন পৃথিবী রত্নগর্ভা, তাঁর গর্ভে বীর্য্যবান ওষধির স্থান। একবার পৃথুর রাজ্যে মহামারী দেখা দেয়। সমস্ত প্রজাকুলকে রক্ষার জন্য তিনি পৃথ্বীকে তাড়া করলেন, ভয়ে পৃথ্বী গাভী রূপ ধারণ করলেন। তখন পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎসরূপে সামনে রেখে, পৃথ্বী দোহন ক'রে প্রজাকুলকে রক্ষা করেন। এই দৃষ্টান্ত থেকে পৃথিবীর অন্তর

স্থান পৃথ্বীকে দোহন করতে শেখে। সবাই নিজ নিজ বৎস ঠিক করেন। পর্ব্বত কুলের মধ্যে হিমালয় হন বৎস, দোগ্ধা মেরুপর্ব্বতমালা। পুরাণ মতে, স্বর্ণ ও মণিমুক্তাদিতে পূর্ণ মেরুপর্ব্বত, সপ্তদ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত, অতি উচ্চ ঐ পর্ব্বত শিখরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের আবাস। বহু পণ্ডিতদের মতে, ঐ পর্ব্বতটি বর্ত্তমান (Altai) অল্টাই পর্ব্বত, মঙ্গোলিয়ার উত্তর পশ্চিম প্রদেশে। ঐ আখ্যানটি হ'তে আমরা দুটি জিনিষ পাই, (১) আর্য্যসভ্যতা, পৃথিবীর আদি নৃপতি পৃথুর সময়েও কতদূর বিস্তার লাভ করেছিল, (২) পৃথু হ'তেই অপর সমস্ত দেশ পৃথ্বীকে দোহন করতে অর্থাৎ হলচালনা করতে ও কৃষি-বিদ্যা শেখে। উক্ত বিশ্বাস হিন্দুদের বরাবর আছে, ইহাই প্রমাণ হয়। পৃথুরাজের মধ্যে স্থিতি ও পালনী শক্তি ছিল, যে শক্তি অন্নচিন্তার হাত হ'তে প্রজাকুলকে যথাসময়ে রক্ষা করেছিল। শঙ্করাবতারের ও হাহাকার নিবারণের সামর্থ্য থাকা চাই।]

পরশুরামও অশেষ গুণভূষিত ছিলেন। তাঁর সময়ে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ছিলেন মহাপ্রতাপশালী ও মহাবীর ক্ষত্রিয় রাজা। তাঁরও বহু সদ্‌গুণ ছিল, কিন্তু শেষে তিনি ঘোর দাম্ভিক, অত্যাচারী ও বিলাসী হয়ে দাঁড়ান। পরশুরামের পিতা, পিতামহাদি ব্রাহ্মণ ও ঋষি হলেও তিনি ছিলেন সে সময়ে যুদ্ধ বিদ্যায় অদ্বিতীয়। তাঁর হাতে ঐ অর্জ্জুন নিহত হন, প্রজারা অত্যাচার ও পীড়ন হ'তে রক্ষা পায়। কিন্তু পরশুরাম আরম্ভ করেন ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করতে। ক্ষত্রিয়কুলের ঘোর আতঙ্ক উপস্থিত হয়, ক্ষাত্র-ধর্ম্ম প্রায় লোপ হবার উপক্রম হয়। ক্ষাত্র-ধর্ম্মের ব্যতিক্রমে ঐ সময়ে, দ্রাবিড়, আভীর, পুণ্ড্র ও শবরদেশী ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন, ব্রাহ্মণেরাও ঐ সুযোগে ধর্ম্ম রক্ষার অছিলায় বিধবা ক্ষত্রি রমণীতে পুত্রোৎপাদন করতে সুরু ক'রে দেন! সেই সব পুত্রেরাও ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হয়। পরশুরাম এই আদর্শচ্যুতি সহ্য করতে না পেরে, বারবার বালক, যুবা, শিশু, এমন কি রমণীর গর্ভস্থ ভ্রূণকেও হত্যা করেন। সর্ব্বসমেত এইরূপে ২১ বার ক্ষত্রিয়-বধ-কার্য্য অতি উৎসাহের সঙ্গে তিনি করতে থাকেন। তাঁর অত্যাচারে শেষে ঋচিক প্রভৃতি ঋষিরা ও পিতৃগণ, মহা বিরক্ত হন ও তাঁকে নিবৃত্ত করেন। তিনি ছিলেন তখন কার্য্যতঃ ধরার অধিপতি। কাশ্যপকে পৃথিবী দান ক'রে তিনি যোগমার্গ অবলম্বন করেন। পরে রামচন্দ্রের ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার শুনে

তাঁর পূর্ব্ব-সংস্কার জেগে ওঠে, রামচন্দ্র তাঁর দর্পচূর্ণ করেন ও পরশুরাম আবার তপস্যায় রত হন ও সিদ্ধিলাভ করেন।

পরশুরাম নবজাত ক্ষত্রিয়কুল নাশ করেন, কিন্তু আদর্শচ্যুতি ঘটিয়েছিলেন ঐ সব নবজাত ক্ষত্রিয়ের পিতারা—ব্রাহ্মণেরা। পরশুরাম ব্রাহ্মণ-সমাজকে কিছু বলেন নি, বরং ব্রাহ্মণসমাজকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, একের অপরাধে সমস্ত ক্ষত্রিয় সমাজের উপর আক্রোশ প্রকাশ করেছিলেন। হিন্দুর জাতীয় ইতিহাসে এমন ঘটনা নেই যেখানে রাজশক্তির বলে বলীয়ান কোন ক্ষত্রিয় রাজা, পরশুরামের মনোবৃত্তি নিয়ে ব্রাহ্মণ জাতির উপর বারবার ঐ রকম অত্যাচার করেছেন। রামচন্দ্রের পূজা আজ ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, সিংহলে আজও রামচন্দ্রের স্মৃতি বেশী রক্ষিত, রামচরিত্রের নাটক সেখানকার জনসমাজের প্রিয়, যাবানীরা ও বহির্ভারত, তাঁর স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত বজায় রেখেছেন, আর পরশুরামের স্মৃতি, পরশুরামের পূজা ? কতটুকু স্থানে তা আজ আবদ্ধ ?

পরশুরাম ছিলেন পিতৃভক্ত, তিনি ছিলেন উচ্চদরের সাধক। সিদ্ধ-দৃষ্টির পরিচয় স্বরূপ তাঁর 'পরশুরাম কল্পসূত্র', তন্ত্রসাধকের কাছে আজও আদৃত। যখনই তিনি নিজ আচরণের ভ্রম রামচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে বুঝলেন, তখনই তিনি যে তপস্বী ছিলেন সেই তপস্বীই হলেন, তাঁর অন্তর্প্রকৃতি বদলে যায় নি, অন্তর্প্রকৃতিতে পাথরের দাগ বসে নি। পরশুরামকে 'খণ্ডাবতার' বলা হয়, আবার কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনও অংশাবতার। কারোর কারোর মতে ব্রাহ্মণেরা পরশুরামকে খণ্ডাবতার করেছেন এবং ক্ষত্রিয়েরা করেছেন এই অর্জ্জুনকে। দক্ষিণের অনেক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ আজও নিজেদের পরশুরাম বংশ সম্ভূত ব'লে পরিচয় দেন, আজও তাঁরা ক্ষত্রিয়োচিত তেজ, বীর্য্য ও রাজনৈতিক-বুদ্ধির পরিচয় দেন। রামচন্দ্র-পরশুরাম-প্রসঙ্গ নিয়ে প্রক্ষেপকারীরা পরে অনেক গল্প রচনা করবার সুবিধা পেয়েছেন।

[বক্তৃতার মাঝখানে একজন হনুমানের ল্যাজের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। ল্যাজের ইতিহাস জানা নেই। ল্যাজত্ব বোধ হয় প্রাচীন ঈজিপ্টে পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরে সম্রাট মেনেসের অভিষেকোৎসবটি ল্যাজের উৎসব নামে পরিচিত ছিল, এই উৎসব মুকুটের পূর্ব্বেও ছিল। এই সময়ে রাজা বা সম্রাট সিংহের ল্যাজ পরতেন। ভারতে ল্যাজ রাজাদের পশ্চাৎ আটকায় নি এ পর্য্যন্ত ভক্ত-সাধক ল্যাজ নিয়ে টানাটানি করেন নি। সাধক-ভক্ত ল্যাজ দেখেন না, দেখেন

চরিত্র। ল্যাজ সত্ত্বেও মহাবীর-চরিত্র হিন্দুর অতুল সম্পত্তি। মানুষের ভ্রূণ অবস্থার ক্রম পরিণতি কালে ল্যাজ দেখা দেয়, অতএব ল্যাজের কথায় বা ল্যাজ সংস্কারে লজ্জা পাবার কিছু নেই, আর ডারউইনকল্পদের মত ত আছেই]।

পূর্ব্ব প্রসঙ্গে আসা যাক্। তুরাণী ভাষা হ'তে যে সব ভাষার উৎপত্তি হয়েছে তার মধ্যে ভারত সম্পর্কে এসে চীন ও তামিল ভাষাতেই মধ্যম শ্রেণীর নাটক আছে। তামিল নাটক রামচরিত্রের পক্ষপাতী আজও। প্রাকৃতে যে সব নাটক রচিত হয়েছে, তার মধ্যে নির্ব্বোধের মত যা তা ঢোকাবার চেষ্টা হয়েছে। একজন বলছেন যে, বনে শকুন্তলার পিতার যজ্ঞকালে, বিশ্বামিত্রের আহ্বানে, জনক রাজা এসেছেন তাঁর মেয়ে সীতাকে নিয়ে এবং এসেছেন ঋষি গৌতম, তাঁর স্ত্রী অহল্যা ও রাম লক্ষণ দুই ভাই। এইখানেই ঘটনাচক্রে রামের সঙ্গে সীতার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, আর সেই যজ্ঞস্থলে অদৃশ্যভাবে আছেন দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার সঙ্গে ব্যভিচারে রত। গৌতম ব্যভিচার ধ'রে ফেলেন ও অহল্যাকে দুর্গম পাহাড়ে পরিণত করেন! অন্য একজন করেছেন পরশুরামকে সীতাপ্রার্থী!

শাস্ত্রাদিকে প্রতিসংস্কৃত ক'রে বিকৃত করেছে যারা, তারাই তাদের আত্মকথা—আত্মচরিত—প্রকাশ করেছে বৌদ্ধ-গল্প গাথায় ও প্রাকৃত ভাষার নাটকে। সংস্কৃত ভাষা পণ্ডিত কুলের, কিন্তু প্রাকৃত জনসাধারণের ভাষা। উভয় ভাষাতেই প্রক্ষেপকারীদের আত্মকথা—ব্যাপক কূটনীতির পরিচয়। এ সব জঞ্জাল পরিষ্কার করবার সময় এসেছে। আমরা বাঙ্গলার যুবশক্তিকে এই কায হাতে নিতে আহ্বান করছি। গৌড়ীয়গণ প্রাচীন লেখকদের লেখা বিকৃত করাকে মহাপাপ মনে করতেন। এখন পর্য্যন্ত পণ্ডিত সমাজ গৌড়ীয় পাঠের সমাদর করেন। বাঙ্গালীর এই সুনাম বাঙ্গলার যুব-শক্তিই বজায় রাখতে পারেন। এই সন্ধিযুগে জাতীয় অধঃপতনের সুযোগ নিয়ে, জাতির আবর্জ্জনার দিক দেখাতে পটু একদল যেমন জাতিকে একেবারে জাহান্নামে পাঠাবার চেষ্টায় আছেন, তেমনি আর এক দলের মধ্যে ত্যাগশক্তিও স্ফুরিত হয়েছে, যাঁদের মহাপ্রাণতায় আজ ভারত মুগ্ধ। পূতিগন্ধময় এই সব আবর্জ্জনা তাঁরা দূর করুন। এই সংস্কারকার্য্যে, আবশ্যক হলে, বিদ্রোহীর মনোভাব নিয়ে তাঁরা অগ্রসর হোন্, জাতির স্বাস্থ্য সম্পদ রক্ষা করুন।

[গৌড়মণ্ডলে (বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, মগধ, মিথিলা, গোর খপুরবস্তী, গোণ্ডা, বরাইচ, ছাপরা প্রভৃতি স্থানে) এক ভাষা ও এক বর্ণমালা প্রচলিত ছিল। ধারেশ্বর ভোজের সমসময়ে টীকাকার ক্ষীরস্বামী গৌড়ীয়গণের জ, য ব, ব ণ, ন, শ, ষ, স ইত্যাদির একরূপ উচ্চারণের বিদ্রূপ ক'রে গেছেন। অন্যত্র অন্য রকম হলেও, বাঙ্গালীর উচ্চারণ ভঙ্গিটি পূর্ব্ববৎই আছে। বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ হলেও তাঁর বিশেষত্ব ছাড়েন নি। কাব্যে ৪ রকম রীতির মধ্যে গৌড়ীয় রীতির প্রবর্ত্তক বাঙ্গালী। (বৃক্ষানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রঃ)। তাই আমরা বাঙ্গলার যুব-শক্তিকে বাঙ্গালীর সুনাম রক্ষা করতে আহ্বান করছি। বাঙ্গালী, ভাবকে খাঁটি রাখবার চেষ্টা বরাবর করেছেন।]

আর দুচারিটি কথা ব'লে এ প্রবন্ধের উপসংহার করব। অতি দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, বাঙ্গলায় যিনি নতুন ছন্দের আমদানি ক'রে বাঙ্গলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন ও তার মর্য্যাদা বাড়িয়েছেন, যাঁর বীরত্ব গাথা বাঙ্গলার গৌরব, যাঁর ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মধুর ঝঙ্কারে বাঙ্গালী মুগ্ধ, সেই মহাকবি মাইকেল মধুসূদন, মধুচক্রের স্রষ্টা সেই বাঙ্গালীর মধুসূদন, খৃষ্টান হয়ে—ধোলোভাবে পূর্ণ হয়ে রামায়ণের চিত্রকে বিকৃত ভাবে চিত্রিত ক'রে সাহিত্য জগতে বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর মর্য্যাদা এই দিক্ দিয়ে ক্ষুণ্ণ করেছেন। তবে, কেন যে তিনি রাবণ-ইন্দ্রজিৎকে বড় ক'রে দেখিয়ে রাম লক্ষণাদিকে ছোট করবার জন্যই ছোট ক'রে চিত্রিত করেছেন, কেন যে জাতীয়ভাবের ও জাতীয় আদর্শের বিরুদ্ধে এ রকম মনোবৃত্তি হয়, তা আমরা বুঝতে পারি, পণ্ডিত হয়েও কেন তাঁর এ ভ্রম হয়েছিল তা আমরা বুঝতে পারি। অনেকের ধারণা, বিশেষ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করলে, যে, পরিত্যক্ত ধর্ম্মাদর্শকে ছোট ক'রে দেখালেই গৃহীত ধর্ম্মাদর্শকে বড় ব'লে প্রতিপন্ন করা হয় অর্থাৎ গৃহীত ধর্ম্মাদর্শে বিশ্বাস ঐ উপায়েই প্রমাণ করা যায়! মনোভাব অর্থাৎ রুচি ও প্রকৃতির উপর যে ধর্ম্মাচারে অনুরাগ নির্ভর করে, এটি তাঁরা ভুলে যান, ভুলে যান তাঁরা যে প্রত্যেক ধর্ম্মেই মহাজন জন্মেছেন—প্রত্যেক ধর্ম্মই মহৎ, প্রত্যেক ধর্ম্মেই আদর্শ-জীবন দেখা যায়। তাঁরা বহিরাচারকে 'ধর্ম্ম' মনে ক'রে ভ্রমে পড়েন। ঐ সত্য ভুলে গিয়ে বিস্তর সাম্প্রদায়িক বিষ উদ্গীরণ হয়েছে, বৃথা তর্কজালের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তারা কোন

পক্ষের গৌরব নয়। ভারতে আজ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী আছেন। ঐ সমস্ত ধর্ম্ম এখন ভারতের নিজস্ব জিনিষ। শুধু প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান নয়, প্রত্যেক ধর্ম্মাদর্শ প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্পত্তি, এই সম্পত্তির সমাদর ও রক্ষা করার ভার প্রত্যেক ভারতবাসীর উপর ন্যস্ত, ইহা মনে রাখলে অনেক গোলযোগের, অনেক জটিল সমস্যার সমাধান সহজ হয়। মধুসূদনের সময় হ'তে পরে বহুকাল পর্য্যন্ত মিশনরিরা হিন্দুর আদর্শকে নানাভাবে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন। নবদীক্ষিত মধুসূদন তাঁদের মতই ভ্রমে পড়েছিলেন তখন। কিন্তু তিনি প্রক্ষেপকারীদের ন্যায় নারী চরিত্রে কলঙ্ক অর্পণ করেন নি, তাঁর স্বজাতি-প্রীতিতে ভেল্ ছিল না। সমালোচনা এক জিনিষ, চরিত্রকে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা অন্য জিনিষ। ইংরাজ উপন্যাস ও নাট্যকারগণ স্কটল্যাণ্ড আদি স্থানের আচার ও প্রাদেশিক উচ্চারণ-ভঙ্গী নিয়ে কতই হাসি তামাসার তরঙ্গ তুলে থাকেন, কিন্তু কি ইংরাজ, কি স্কচ, ঐগুলিকে সকলেই একটি রঙ্গ-রসের পরিচয় মনে করেন। উভয়েই আমোদ উপভোগ করেন। এই প্রকার মনোবৃত্তি আমাদেরও হওয়া দরকার।

প্রাচীন ও বর্ত্তমানে রুচির পার্থক্য থাকলেও, বর্ত্তমান যুগেও, ঐতিহাসিক নাটকে যা তা করা যায় না, ইতিহাসের মূল তথ্য বজায় রাখতে হয়। বড় বড় কবি বা লেখকেরা কেউ তা করেন নি, ঐতিহাসিক চরিত্র বিকৃত করা যায় না। বৈদিক যুগে ভারতেই প্রথম 'যাত্রার' সৃষ্টি হয়, সেই যাত্রা রূপ বদলে আজও বেঁচে আছে, কিন্তু কোথাও মহাপুরুষ চরিত্রে হীনতা আনাবার চেষ্টা নেই।

[ঋগ্বেদে ও সামবেদে 'যাত্রার' সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, এক সঙ্গে নাচ, গান, অভিনয় হচ্ছে, দেবতারা দলবদ্ধ হ'য়ে চলেছেন। বাঙ্গলা দেশে মালদহের 'গম্ভীরা' সেই যাত্রারই স্মৃতি, তার একটি বিশেষ ঢং আছে আজও—যা অন্য কোন যাত্রায় নেই।]

সভ্যতার কথা—১

আমবা হিন্দু ও আর্য্যসভ্যতাব রূপ দেখবাব চেষ্টা কবেছি, তাব মূল কোথায় তাও বোঝবাব চেষ্টা কবেছি। আজ যে সভ্যতা ও সভ্যতাব প্রভাব ধবাকে আচ্ছন্ন কবেছে, তাব মূল কোথায় এইবাব বোঝবাব চেষ্টা কবা যাবে। অণুই মহৎ হয়, অতি সামান্য বীজই বটবৃক্ষে পবিণত হয়। আমাদেব মধ্যে যে অসীম শক্তি আছে তাব প্রমাণস্বরূপ আমাদেব সামনে রয়েছে এই বর্ত্তমান সভ্যতা, যাব শক্তি এখনও ক্রমবিকশিত হচ্ছে। এই সভ্যতাব প্রাণশক্তি—ধোলো বিজ্ঞান, আব ঐ যে ঘটিকাযন্ত্র বা ঘড়ি, উহাই ঐ সভ্যতায় ব্যক্তিজীবন-যাপনেব যন্ত্র।

ধোলো মনীষীবা সভ্যতাব উৎপত্তিস্থান অনুসন্ধান ক'বে যে সব সিদ্ধান্তে এসেছেন, তাঁবা মনে কবেন সেইগুলি সকল সভ্যতায় সমান প্রযুজ্য। Family ও Tribe (পবিবাব ও দলেব) এব কথা পূর্ব্বে বলেছি। Family বলতে এখন যা বোঝায়, আদিম অবস্থায় তা বোঝাত না। এই Family কথাটি Osque (অস্ক) ভাবাব Famul ধাতু হ'তে নিষ্পন্ন, অর্থ 'দাস' বা গোলাম (slave)। ইংবাজি familiar মানে এখন 'পবিচিত', পূর্ব্বে অর্থ ছিল, 'ডাইনির পিশাচ' অর্থাৎ 'যে দাঁড়কাক ও বিডালাদি মূক জন্তুব রূপ আশ্রয় ক'বে ডাইনিব আজ্ঞাবহ হয়ে থাকত', Famulus মানে সেইরূপ, 'আজ্ঞাবহ দাস-সহচর', Familiar spirits মানে 'আজ্ঞাবহ ভূতপ্রেতাদি'। পূর্ব্বে family বা পবিবাব ছিল tribe এব (দলেব) আজ্ঞাবহ দাস অর্থাৎ পবিবাবান্তর্গত সকলেই ছিল tribe এব দাস। দল হ'তে বেবিয়ে না গেলে, 'পবিবাবেব' সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত না হলে বা নিজেকে উত্তরাধিকার-সূত্র হ'তে বঞ্চিত না কবলে, দাসেব দাসত্ব ঘুচত না, দাস মুক্তি পেত না। ব্যক্তির সম্বন্ধ ছিল ট্রাইবের সঙ্গে. তাবপর হ'ল, তাব মাব সঙ্গে, তাবপর হ'ল তাব বাপেব সঙ্গে। ঐরূপে প্রথম গঠিত হয় মাতৃতন্ত্র সমাজ, পুরুষ খেটে খুটে যা আনত, নাবী নিজেব সন্তান পালনেব জন্য তাই নিত। উত্তরাধিকার-সূত্র ঠিক হ'ল মায়েব দিক হ'তে। কাবণ, তখন সন্তানের পিতা নিরূপণ হ'ত না। মাতৃতন্ত্র সমাজে মার মমতা, সন্তানের

উপর, অপ্রতিহত ছিল। নারীর কাছ হ'তে যখন পুরুষ ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সকলকে বশ্য করবার ভার নিলে, তখন হ'তে তৈরী হল পিতৃ-তন্ত্র পরিবার (patriarchal family) ; পিতৃতন্ত্র পরিবারে, পিতা, পুত্র-কন্যাকেও হত্যা করতে পারতেন। আর্য্যের মধ্যে, প্রাক্‌বৈদিক যুগেও, পিতৃতন্ত্র পরিবার ছিল। ঐ পরিবারে, গৃহপতি পিতা কখন সন্তান-হত্যার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। কোথায় কে ক্রোধের বশে ছেলের চোখ্ কাণা ক'রে দিয়েছিল, এই রকম একটা আধটা উদাহরণে সমগ্র সমাজের বা জাতির পরিচয় পাওয়া যায় না। সভ্য-যুগেও, নিজের ছেলেকে বধ ক'রে মা নিজে সিংহাসনে বসেছে, তারও দৃষ্টান্ত আছে, তাতে যেমন জাতির পরিচয় বা নারী-হৃদয়ের পরিচয় খোঁজা বৃথা, ঐ রকম ক্ষণিক উত্তেজনার নজিরও তাই। প্রাচীন রোমানদের বিবাহ প্রথমে নরনারীর যদৃচ্ছা মিলনে অথবা কোন রূপ বৈধ-মিলনের উপর নির্ভর করত না, রক্ত সম্পর্কের উপরও নির্ভর করত না, কিন্তু নির্ভর করত ক্ষমতার উপর। বর্ব্বর বা আদিম জাতিদের মধ্যে 'বিবাহ' কথাটির কোন প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না (যেমন প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জের ও কালিফোর্নিয়া অধিবাসীদের মধ্যে)। ইউরোপে জাতির উৎপত্তি হয় পর্ব্বত-গুহাবাসী জঙ্গলী বোম্বেটে হ'তে। আদিম Indo-Europeansদের মধ্যে 'কনে' (bride) কথার প্রতিশব্দ বা ঐ ভাবার্থ-বোধক কোন শব্দ নেই, আছে 'যুবতী' কথাটি। যখন বিবাহ-প্রথা আরম্ভ হ'ল, তখন বিবাহের নিয়মও তৈরী হল। অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা বহু পরিবারে বিভক্ত, সেখানে একই পরিবারের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। প্রাচীন ঈজিপ্টে আইন তৈরী হল যে, রাজপরিবারে, ভাই বোনকে বিবাহ করতে বাধ্য থাকবে। উত্তরাধিকার-সূত্র-প্রাপ্ত টলে-মিকদেরও ঐ ব্যবস্থা, তবে ঈজিপ্টবাসীরা এক-পত্নীক থাকত, স্বামীর জীবৎকাল পর্য্যন্ত স্ত্রীও একস্বামী নিয়ে ঘর করত। প্রথমে এখানেও মাতৃতন্ত্র সমাজ ছিল।

["In the Royal family of Egypt as among the Ptolemics who entered on its heritage the brother was compelled by law and custom to marry his sister."—The Religion of Ancient Egypt

and Babylonia—A. H Sayce. D. D L L D Professor of Assiriology Oxford—Introduction]

পুরুষেরা সর্ব্বত্র বরাবর বহু বিবাহ ক'রে এসেছে। বহু-বিবাহ হ'তে আসে কন্যাক্রয়-প্রথা। নারী পণ্যদ্রব্যের ('chattel'এর) সামিল হয়ে দাঁড়ালেন, নারীর হীনতা এখানেই ক্ষান্ত হয় নি। পুরুষের ক্ষমতা-প্রিয়তা, তার ক্ষমতার গর্ব্ব ও পরে তার আভিজাত্য-গর্ব্ব ইত্যাদি নানা কারণ, নারীর আত্মবোধকে দাবিয়ে রেখে এসেছে বরাবর ও সর্ব্বত্র। বর্ব্বর সমাজে অনেক স্থলে নারীর মূল্য দিতে হত—মূল্য দিয়ে নারী ক্রয় করতে হত, সেই জন্য সেসব স্থলে নারীকে একটি 'সম্পত্তি রূপে' গণ্য করা হত; মূল্য ছাড়া নারীকে অনেক কিছু দিতে হত। সুতরাং 'divorce' অর্থাৎ নারীকে বিদায় করতে হলে পুরুষের লোকসান হত। অনেকের মতে ঐ রকম বিবাহে বা নরনারীর মিলনে, ব্যবসায়ে পরিণত হবার পূর্ব্বে, একটা 'ধর্ম্মের' ছোঁয়াচ ছিল অনেক স্থলে। টিউটন ও স্কাণ্ডিনেভিয়ান (Teutons and Scandinavians) ধনীরা ঐ রকম বিবাহের জন্য বহু নারী ক্রয় করত। ধোলোর প্রাচীন আইনে 'Buying a maid', মধ্যযুগে Germanyতে 'Buying a wife' কথাগুলি প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছিল। ইংলণ্ডের রাজা Alfredএর সময় ঐ রকম ক্রয়-প্রথা ছিল, সেই জন্য Canute আইন করেন যে কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিভাবকেরা বিবাহের জন্য কন্যা বিক্রয় করতে পারবে না। যিশু জন্মাবার পরেও কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত বিবাহ ছিল উভয় পক্ষের মধ্যে একটা বন্দোবস্তের মত ('civil contract'), পুরোহিতের দরকার হত না, কারণ এটা ছিল একটা ঘরোয়া পারিবারিক বিষয় ('private family matter')! অন্ততঃ দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত, বিবাহ কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে পরিগণিত হয় নি। যখন হল, তখন বিবাহ হত গির্জ্জার দরজার সামনে, পুরোহিত দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ ক'রেই দরজা বন্ধ করে দিতেন। কি ফ্রান্সে, কি জার্ম্মানীতে—সর্ব্বত্রই ঐ রকম গির্জ্জা-দ্বারের সামনেই উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমে ঐ ভাবে বিবাহ হত, এই প্রথা ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। Edward VI ও Elizabeth এর সময়ে স্মৃতিকারেরা (চার্চ-বিধি সংগ্রাহকেরা) গির্জ্জার মধ্যে বিবাহ

হওয়ার আবশ্যকতা দেখান ও সেই অবধি গির্জ্জার মধ্যে বিবাহ চলে আসছে।

["For some hundreds of years after Christ, marriage remained a civil contract, in which no priest took any part...It was not until the 10th century in England, at least, that a marriage became an ecclesiastical institution and a priest took any part in the marriage service. Even then the marriage rites were performed before the door of a church, where the priest closed the ceremony with a blessing. Throughout the Middle Ages the principle act of the marriage celebration—that is to say the consent of the parties—was conducted at the porch of the church in England, France and Germany And marriages continued to be celebrated at the church door until the 16th. century, when the liturgies of Edward VI and Elizabeth first required the ceremony to be performed in the Sacred building"—Harmsworth's Popular science—Group II —Society (Educational Book Co Ltd)]

পরবর্ত্তী যুগে উত্তর ইউরোপবাসীরা, রোমানরা ও দক্ষিণের জাতিরা ঐ রকম বিবাহকে এক-পত্নীক বিবাহে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছেন। পণ্ডিতেরা বলেন যে সিংহলের বেদ্দারাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন আদিম জাতি; কিন্তু তাদের মধ্যে এখনও এক-পত্নীক বিবাহ রয়েছে, দম্পতির মধ্যে দাম্পত্য-জীবনের সুখও বর্ত্তমান, যদিও তারা অতি দরিদ্র ও উলঙ্গ অরণ্যবাসী। বর্ব্বর-মনেও যে অপেক্ষাকৃত উচ্চভাব থাকতে পারে, সেই উচ্চভাবে দৃঢ় নিষ্ঠা থাকতে পারে, তার প্রমাণেরও অভাব নেই, অতএব সকল আদিম জাতি যে একই নিয়মে, একই ভাবে গ'ড়ে উঠেছে অথবা তারা সবাই একই প্রকার রুচি ও প্রকৃতির মানব তার কোন প্রমাণ নেই। সভ্যতার বিকাশ সব যায়গায় একই রকম ভাবে হয় নি। Australiansদের মত আদিম জাতিদের একই দলের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। যখন মানব আদিম অবস্থা হ'তে একটু উন্নত হয়, তখনই সম্ভব ঐরকম বিধির প্রচলন হওয়া, কারণ ঐ রকম নিষেধ-বিধি—আত্মরক্ষার নীতি। তাই পণ্ডিতেরা

বলেন যে উন্নত অবস্থায় ঐ রীতির প্রমাণ সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। ঐ বিধি না থাকলে, একই শ্রেণীতে ক্রমাগত রক্তমিশ্রণের ফলে জাতিলোপ হত। দলকে বিভিন্ন পর্য্যায়ে ভাগ করা আরো বুদ্ধির পরিচয়। পণ্ডিতদের মতে, 'টোটেম' ট্রাইবের মধ্যে নানা পর্য্যায়ে বিভক্ত হ'য়ে দলবদ্ধ ভাবে থাকার রীতিই আদি সামাজিক-বিধি। দুই বিভিন্ন স্থানের 'Kangaroo tribes' ('কাঙ্গারু দল') যদি পরস্পর শত্রুও হয়, রক্ত হিসাবে তারা ভাই বলে গণ্য হত। দল হত, একজন পুরুষ, একজন নারী ও তাদের সন্তান সন্ততি নিয়ে। বিপদের সময় সব দলই একত্র হত। আদিম জাতিদের মধ্যে এই প্রথা এখনও বর্ত্তমান। গরিলা আদি বানর শ্রেণীর মধ্যেও এইরকম নিয়ম। সন্তান সন্ততি বড় হলে, স্বাবলম্বী হলে, পিতামাতার আশ্রয়স্থান ছেড়ে চলে যায়। ইউরোপের দুএকটি স্থান ছাড়া, নানা কারণে, আজ সভ্যতা-গর্ব্বিত ধোলো-সমাজে গরিলাদের ন্যায়ই পারিবারিক জীবনপ্রণালী। ইহা যেন ইতিহাসের পরিহাস। বর্ত্তমান যুগের স্বার্থনীতি, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অর্থনীতি, কূটরাজনীতি প্রভৃতি কারণে সর্ব্বত্র, কেবল যে যৌথ-পারিবারিক-নীতি শিথিল করেছে তা নয়, একই আদর্শে গঠিত মানবের মধ্যে নানা পর্য্যায় সৃষ্টি ক'রে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঈর্ষ্যার দাবানল সৃষ্টি করেছে।

বর্ত্তমান ধোলো সভ্যতার মূলস্থান গ্রীস। গ্রীস হ'তে সভ্যতা রোমে সংক্রমিত হয় ও ক্রমশঃ ইউরোপময় ছড়িয়ে যায়। খৃষ্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, ফিনিসিয়াবাসী ইনকোস গ্রীসে আসেন ও আর্গস নগর স্থাপন করেন। খৃঃ পূঃ ১৫৫৬ বর্ষে এথেন্স নগর স্থাপন করেন ঈজিপ্টবাসী Cesrops (সেস্রপস)। ৪৬ বৎসর পরে লেলেক্স নামে আর একজন ঈজিপ্টবাসী ল্যাসিডিমন বা স্পার্টানগর প্রতিষ্ঠা করেন , তার ২০ বৎসর পরে, ফিনিসিয়াবাসী ক্যাডমস্, থিবস্ সহর স্থাপন করেন। ফিনিসিয়া ও ঈজিপ্টের প্রভাব ও সভ্যতা এই রকমে গ্রীসে প্রতিষ্ঠালাভ করে। ঐ সভ্যতায়, বলবান দৃঢ় পেশীযুক্ত সুগঠিত শরীরের আদর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। নানা দেশের সভ্যতা, নানা ভাব ঈজিপ্টে প্রবেশ করে। সাম্রাজ্য-সংগঠনের ভাব ও রাজনৈতিক ভাব আসে ব্যাবিলনের নিকট হ'তে। ব্যাবিলনিয় ঈজিপ্সিয়ানদের প্রথম পোত নাইল নদীতে আসে। তাদের

নদীকূলই প্রিয় বাসভূমি হ'য়ে যায। তাদেব পূর্ব্ববাসভূমি এসিয়া, সম্ভবতঃ তারা ঈজিপ্টে আসে বাবিলোনিয়া হ'তে। তাবাই কৃষিব উন্নতি কবে, মন্দিবাদি বড বড ইমাবত তাদেবই কৃতিত্ব-পবিচয়। ঈজিপ্টেব ভাস্কর্য্যে, শিল্পে এবং যে সমস্ত ছবি পিবামিড যুগেবও (খৃঃ পূঃ ৪৭০০—৪০০) পববর্ত্তী সময়ে পাওয়া যায তাতে মাত্র প্রকৃতিব যথাযথ অনুকবণ চেষ্টাই বর্ত্তমান। ভাব ফুটিযে তোলবাব চেষ্টা কবে গ্রীক-মন। গ্রীক ভাবপ্রবণ আগে দেশ শাসন কবতেন একজন বাজা। এথেন্সবাজ কড্রাস ছিলেন উচ্চমনা, তিনি এথেন্সবাসীদেব মঙ্গলেব জন্য প্রাণ দেন। কড্রাসেব পদাঙ্ক অনুসবণ ক'বে, এথেন্স বাজশক্তিব অবসান কবে এবং জুপিটাবই প্রধান দেবতারূপে স্বীকৃত হয়। পবে সমগ্র গ্রীসে প্রজাতন্ত্রেব উদ্ভব হয়। স্পার্টাতে ছিল বাজতন্ত্র। খৃঃ পূঃ ৮৮৪ বৎসবে লাইকাবগাস বাজতন্ত্রেব নায়ক হন। কোন কাবণে তিনি স্বজাতিব অপ্রিয় হওযায় দেশত্যাগ কবেন ও গ্রীসেব মঙ্গলসাধনোদ্দেশ্যে ভ্রমণে বাহিব হন। এই স্বদেশপ্রেমিক প্রথমে ক্রীটে যান, ক্রীট হ'তেই গ্রীকবা বাজ্যশাসনপ্রণালী ও নৌবিদ্যা পায়। ক্রীট হ'তে তিনি ঈজিপ্টে যান; সেখানকাব রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি খুব সূক্ষ্মভাবে আলোচনা কবেন, তাবপব এসিয়ামাইনব হ'তে যখন আবাব স্পার্টায় ফিবে আসেন, তখন, জ্ঞানগবিমা ও বিদ্যাব জন্য স্পার্টানবা তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ কবেন। লাইকাবগাস এইবাব স্বজাতিব উন্নতিব জন্য বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন কবেন। তাঁব প্রভাবেই জাতিব উন্নতি আবম্ভ হয প্রথম। লাইকাবগাসেব নীতি আজও ধোলো দেশে অনেক পবিমাণে গৃহীত হয়ে বযেছে। তিনিই প্রথম বাজ্যশাসন প্রণালীতে নির্ব্বাচনপ্রথাব স্রষ্টা। ভোটেব দ্বাবা বাজা ও প্রজাব মধ্যে সামঞ্জস্য আনাবাব ইহাই প্রথম চেষ্টা। ভোটাভুটি নিযেই আজও সাম্রাজ্য শাসিত হয়। লাইকাবগাস বুঝেছিলেন যে অধ্যবসায ও মিতব্যয়িতাগুণে বাষ্ট্র সুখী হয়, কিন্তু যে বাষ্ট্রে তথা বাষ্ট্রাধীন সমাজে বিলাসিতাব বীজ ঢোকে, সেই বাষ্ট্র বা সমাজ ধ্বংসমুখে অগ্রসব হয়। নানা কৌশলে, লাইকাবগাস তাঁব প্রিয় সমাজকে বিলাসিতা হ'তে বক্ষা কবেছিলেন।

বিবাহবিধি সম্বন্ধে লাইকাবগাস কতকগুলি নিযম কবেন। পবে ঐ নিয়মগুলি সমস্ত জাতি গ্রহণ ও স্বীকাব কবে। পবিণত বযস্ক কন্যাকে

'বর' হরণ ক'রে নিয়ে যেতে পারত, 'বর' বিলাসী বা পাপাসক্ত হবে না; ৩।৪টি সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত, বর, অপরাপর পরিজনের অসাক্ষাতে অল্পক্ষণের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করত, পরে অন্যত্র শয়ন করত। ইহা ছিল সামরিক শিষ্টাচার, সুতরাং সকলেই এই প্রথার সম্মান করত ও এই আচরণ পালন করত। লাইকারগাসের নীতি অনুসারে, বৃদ্ধ বা অক্ষম স্বামীর যুবতী স্ত্রী থাকলে স্বামীর ইচ্ছা অনুসারে স্ত্রীর মনোনীত কোন সুন্দর যুবক ঐ যুবতীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে পারত এবং সেই সব সন্তানেরা বিবাহিত স্বামীর সন্তান ব'লে গণ্য হত। ইহাই গ্রীসের 'নিয়োগ-প্রথা'। দৃঢ়শরীর, সাহসী ও বিলাসাদি দোষবর্জ্জিত যুবকই ছিল তখনকার 'চরিত্রবান পুরুষ', অপরপক্ষে, যদি ঐ রকম কোন 'চরিত্রবান পুরুষ' কোন বিবাহিত নারীর রূপগুণে মুগ্ধ হ'ত, সেই যুবক 'চরিত্রবান পুরুষ'টি, ঐ নারীর স্বামীকে জানিয়ে ঐ বিবাহিত নারীতে সন্তান উৎপাদন করতে পারত। এসব আচরণ দূষণীয় বলে গণ্য হত না। লাইকারগাসের মতে (১) সন্তানসন্ততিরা রাষ্ট্রের সম্পত্তি, অতএব রাষ্ট্রকল্যাণে রাষ্ট্রের দাবী প্রধান, পিতামাতার দাবী গৌণ, (২) যারা স্ত্রীকে স্বামীর সম্পত্তি মনে করে বা যারা স্ত্রীকে আবদ্ধ রাখে তারা ভাবে না যে দুর্ব্বল বা অক্ষম স্বামীর দ্বারা যে সন্তান হয়, সেই সব বংশধরের দ্বারাই শেষে রাষ্ট্রশক্তি দুর্ব্বল হ'য়ে যায়। প্লুটার্ক বলেন যে এই সব বিধির ফলে দেশ হ'তে নারীর মধ্যে ব্যভিচার একেবারে নির্ব্বাসিত হয়।

লাইকারগাসনীতি এবং তার পূর্ণ সফলতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা গ্রীক সমাজ-চিত্তের পরিচয় পাই, বর্ত্তমান ধোলো সভ্যতার মধ্যে ঐ নীতির কোন্‌গুলি ঐ সভ্যতায় এখনও উঁকি মারছে এবং কোন্‌গুলি দল-চিত্তের মার্জ্জিত সংস্করণ, তাও আমরা চিন্তা ক'রে বোঝবার চেষ্টা করতে পারি। ভারতের সমাজ-চিত্ত ছিল অনুরূপ। আর্য্যের মধ্যে নিয়োগ-প্রথা ভারতে হঠাৎ আসেনি। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে সমাজ-চিত্তের বিপরীত ও বিরুদ্ধ ভাবের আগমন, তার সময় ও কারণ নির্ণয়, এবং প্রক্ষেপকারীদের প্রক্ষেপের-কাল নিরূপণ ক'রে দেখা কর্ত্তব্য।

যতগুলি প্রতিষ্ঠান সে সময় দেশে ছিল, সকলগুলিরই একই উদ্দেশ্য ছিল—শরীরকে দৃঢ়, পেশল ও কঠোর-কষ্টসহিষ্ণু করা এবং বুদ্ধিকে

আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বদা সচেতন রাখা। সমস্ত জাতি কঠোর সৈনিকে পরিণত হয়েছিল। প্রত্যেক বালককে অন্য বালকের জিনিষ, খেলাধুলার সময়, চুরি করতে শেখান হত ও তাতে উৎসাহ দেওয়া হত এইজন্য যে চুরিবিদ্যাটি যুদ্ধের সময় কাযে লাগে। ইহার ফলে, জাতির মধ্যে দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণের বিকাশ তেমন হয়নি। যাই হোক, লাইকারগাস যখন দেখলেন যে স্পার্টানরা তাঁর বিধিব্যবস্থা অনুসরণ ক'রে জীবন যাপন করছে, তখন তিনি দেশবাসীর কাছে বিদায় নিয়ে অন্যত্র যাবার সংকল্প করলেন। বিদায়কালে দেশবাসীকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে তিনি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত যেন তাঁরা তাঁর বিধিব্যবস্থানুযায়ী জীবন গঠন করেন। তাঁরা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে সর্ত্তটি মেনে নিলেন। লাইকারগাস স্পার্টা ত্যাগ করলেন। কিন্তু তাঁর ফিরে আসবার ইচ্ছা ছিল না, পাছে ফিরে এলে স্পার্টানরা অন্যরকম ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে ও জাতি দুর্ব্বল হয়ে যায়; সুতরাং তিনি প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করলেন। স্পার্টানরা এই সংবাদে বিচলিত হল। সমস্ত জাতি লাইকারগাসের নীতিকে দেবপ্রেরিত নীতি মনে ক'রে এসেছে বরাবর। সামাজিক উন্নতির জন্য প্রায়োপবেশন এই প্রথম।

[কথিত আছে, ভারতে চৌর্য্য-বৃত্তিকে বিজ্ঞানে পরিণত করেন দেব-সেনাপতি কার্ত্তিক। দুর্ভেদ্যদুর্গ আক্রমণকালে ঐ বিদ্যা খুব কাযে লাগত]।

"এই দেহের দ্বারা যখন ভগবান লাভ হল না, তখন ছার এই দেহ; কি দরকার এ দেহের?"—এই রকম ভাব নিয়ে প্রায়োপবেশন ভারতে কোন কালে বিরল নয়। যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার ন্যায় দেহকে ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দিয়ে দেহ-রক্ষা ভারতে নতুন নয়। গাজীপুর নিবাসী পওহারী বাবার কথা অনেকেই জানেন। ঐ মহাপুরুষ থাকতেন একটি গুহার মধ্যে। একদিন সকলে দেখে, গুহা হ'তে ধূম নির্গত হচ্ছে। ইহা সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে চামড়া পোড়ান গন্ধ পেয়ে, গুহার ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেখা যায় যে ঐ মহাপুরুষ জলন্ত অগ্নির মধ্যে স্থির হয়ে ব'সে আছেন! তাঁর শরীর ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই উপায়ে দেহ-রক্ষা, দেহের উপর আসক্তি হীনতার পরিচয়, আদর্শলাভের জন্য তীব্র আর্ত্তির পরিচয়। লাইকারগাসের আত্মত্যাগে যেমন সমগ্রদেশ সচেতন হয়ে ওঠে, ঐ রকম আত্মাহুতি সেই রকম জগতের জড়তায় আঘাত করে।

লাইকারগাসের অদ্ভুত স্বদেশপ্রেম, তাঁর ত্যাগ,—তাঁর স্বজাতিকে আত্মশ্রদ্ধ ক'রেছিল। কিন্তু, পেশীল ক'রে তোলাই জাতির লক্ষ্য থাকলে, একমাত্র শারীরিক বলকে জাতীয়ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ মনে করলে সে জাতির বিপদ ঘরের মধ্যেই ঠেলে ওঠে। স্পার্টানদেরও হয়েছিল তাই পরে।

গ্রীসের বহির্বাণিজ্য ছিল। সাধারণ স্থানে একত্রে পান-ভোজনের প্রথা, 'স্বাস্থ্য-পান' প্রথা, সভা ক'রে বক্তৃতা দেবার প্রথা, ঘোড়দৌড়, লাফ্ঝাঁপ, ঘুসোঘুসি প্রভৃতি খেলার প্রথা—সবই গ্রীসে ছিল, যা আজও ধোলো সমাজে বর্ত্তমান।

বজ্রহস্ত মেঘবাহন ঈগল পাখীর সখা ছিলেন জুপিটার। তিনি একটুতেই রুষ্ট হতেন। তাঁর চরিত্রবল ছিল না, শিখিবাহনা বথাকঢা তাঁর স্ত্রী জুনো কিন্তু ছিলেন নারীমর্য্যাদার রক্ষাকর্ত্রী। এই রকম অনেক দেবতা ছিল। ঐসব দেবোপাসনাই ছিল গ্রীকদের 'রিলিজন' (ধর্ম্ম)। গ্রীক্-সভ্যতার উন্নতির যুগে গ্রীসে বড বড় মনীষী জন্মেছিলেন। এরিস্টট্‌ল ছিলেন বিখ্যাত এলেকজাণ্ডারের গুরু। তাঁর মতে সব জিনিষের উৎপত্তির কারণ চারিটি—প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ও অবিনাশী জড। সক্রেটিস মারা যান খৃঃ পূঃ ৪০০ বৎসরে। জীবৎকাল পর্য্যন্ত তিনি গ্রীসে নৈতিক-বল আনাবার চেষ্টা করেছিলেন। মানুষের শিক্ষণীয় বিষয় মানুষ—এই ছিল তাঁর শিক্ষা। রাজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি ন্যায়পর হ'তে ও ব্যবহারিকে রাজনীতির কথা বলতেন। ইউরোপে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অভ্যুদয়কালে এরিস্টট্‌ল্-নীতি জড-বিজ্ঞানে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। সক্রেটিস-নীতির বুলি, আজ ধোলো সভ্যতার বুলি—'ন্যায়পর হও', কিন্তু তার সঙ্গে অন্যরকম অনেক বুলি উঠেছে ঐ সভ্যতায়, যথা 'Civilization cannot be sacrificed for justice'—'ন্যায়পরতার জন্য সভ্যতাকে বলি দেওয়া যায় না,' 'Knows which side his bread is buttered'—'বেশ জানা আছে, কিসে ভাল হয়'। ইউনাইটেড্-স্টেট্‌স্-অব-আমেরিকায় (U. S. A) ১৮৫৩ সালে একটি গুপ্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, তার উদ্দেশ্য ছিল, ওখানকার আদিম অধিবাসী ('Native') দের সরকারী চাকরী পাওয়াকে দুরূহ ক'রে দেওয়া। এই সমিতি 'Know Nothings' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 'Know Nothings'—'কিছুই জানিনা' অর্থাৎ রাজকর্মচারীদের

প্রশ্ন করা হ'লে ঐ উত্তর আসত, 'এর চেয়ে আর বেশী বলবার কিছুই নেই', 'কিছুই জানিনা', 'রাজকীয়ভাবে কিছুই জানিনা' ইত্যাদি। বর্ত্তমান সভ্যতাকে উন্নত সভ্যতা বলা হয়, কিন্তু উন্নত গ্রীকমনের বুলিগুলির এই উন্নত সভ্যতায় কি পরিণতি!

প্লেটোর জন্ম হয় সক্রেটিসের দেহত্যাগের ২৯ বৎসর পূর্ব্বে। অল্পবয়সেই সক্রেটিসের পূর্ণ প্রভাব তাঁর মধ্যে দেখা দেয়। প্লেটোর আসল নাম এরিস্টক্লিস। মহাবীরের যেমন হনু ভেঙ্গে যাওয়ায় নাম হয় 'হনুমান', এরিস্টক্লিসের কাঁধ্ উঁচু ছিল ব'লে নাম হয় Platon বা Plato (প্লেটো)। তিনি জড় ও চৈতন্য এবং তাদের মধ্যে ঐক্য মানতেন। তিনি ছিলেন সুন্দরের উপাসক, তিনিই প্রথম গ্রীসে বলেন যে নরনারীর মিলন, প্রাকৃত-সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত হ'তে পারে। আরো বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি জন্মেছিলেন গ্রীসে। ইহা সত্বেও গ্রীসে মহাজন জন্ম বন্ধ হয়ে যায়, যেমন পরে ধোলোদেশ হ'তে 'সেণ্ট' যুগের তিরোধান হয়। গ্রীস সমাজ-চিত্ত অতবড় উচ্চভাব গ্রহণে অশক্ত ছিল। ধোলো সমাজ-চিত্ত যিশুর আদর্শ পেয়ে ঐ ভাব গ্রহণোন্মুখ হয়েছিল মাত্র, গ্রহণ করতে পারে নি।

ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার অভাবে কেহই ঐ ভাবকে আয়ত্ত করতে পারে নি। ঈজিপ্টে 'নিওপ্লেটোনিষ্ট ও গ্রীসে পাইথাগোরাস ব্রহ্মচর্য্যের ভাব ভারত হ'তেই পান। তারপর ইউরোপে ব্রহ্মচর্য্যের ভাব অল্পবিস্তর ছড়ায়। পারসীকরা এই ভাব ভারত হ'তেই পান। বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবের জীবনাদর্শের সঙ্গে ঐ ভাব প্রচার করেন। ঈশানীদের (এসিনিদের) এবং নিওপ্লেটোনিষ্টদের নিকট হ'তে খৃষ্টানদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের বীজ রোপিত হয়। সে সময়ে খৃষ্টানেরা ঐ ভাব বিস্তার করেন। তার পূর্ব্বে ভাগবৎ সম্প্রদায়ের দ্বারাও ঐ ভাব প্রসার লাভ করে। যতদিন ব্রহ্মচর্য্যের ভাব ঐ সব দেশে ছিল, তত দিন যাবৎ মহাপুরুষ জন্মান বন্ধ হয় নি ঐ সব স্থানে। তিব্বতে ও চীনে তন্ত্রের সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য ও অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যের ভাব বিস্তার লাভ করে শ্রীজ্ঞান দীপঙ্করের (অতিশার) দ্বারা (১০৩৮ খৃষ্টাব্দ)। ইহার পূর্ব্বে খৃঃ ১ম শতকে নাগরাজ-শিষ্য, মাধ্যমিক সম্প্রদায় (মহাযান) প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুন (যার জন্য মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়), তিব্বতে যোগবিদ্যা নিয়ে যান। অন্ততঃ তিনজন (মহাযানের) নাগার্জ্জুনের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তিব্বতীয়দের

বিশ্বাস যে ঐ নাগার্জ্জুন ৬০০ বৎসর জীবিত ছিলেন। কথিত হয় যে নাগরাজ শ্রীবুদ্ধ-কথিত যোগবিদ্যার তথা ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যার উপদেশ গুরু-পরম্পরায় পান। জগতের জ্বালা নিবারণের জন্য শ্রীবুদ্ধ সংসার ত্যাগ ক'রেছিলেন, কিন্তু 'প্রত্যেক-বুদ্ধ' মানে হল যিনি কেবল নিজের মুক্তি চান। জীবনাদর্শ ও তার প্রভাবের কথা দূরে ফেলে ধোলো-সমাজে প্রচার হল যে, বৈরাগ্য, সমাজ-বিপ্লবকারী সমাজদ্রোহী স্বার্থপর ভাব। সন্ন্যাসকে সমাজ-বিধ্বংসী জনহিত-বিরোধী ভাব ব'লে প্রচার করা হল প্রোটাস্টাণ্ট ধর্ম্মে। প্রচারকরা ভুলে গেলেন যে বুদ্ধদেব, যিশু প্রভৃতি মহাজনেরা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন—জনকল্যাণে রত ছিলেন। স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য-ব্রত যাঁরা গ্রহণ ক'রেছিলেন, তাঁরা—ঐ সব দরিদ্র-মূর্ত্তিরা—যে কত পবিত্র ও শুদ্ধাত্মা তা অনুমান করবার সামর্থ্য ছিল না ঐ সব প্রচারকদলের। তাঁদের ধারণা ছিল ঠিক্ বিপরীত অর্থাৎ তাঁদের কাছে দরিদ্র-মূর্ত্তি মানে দুষ্ট-মূর্ত্তি, মূর্ত্তিমান পাপ। ভারতের সমাজ-চিত্ত তথা এসিয়ার মন কখন দারিদ্র্যকে ওভাবে গ্রহণ করেনি।

প্রাচীন মিশরে একাদশ রাজবংশের (11th Dynastyর) শেষ ভাগে, হঠাৎ একজন রাজবংশীয়ের প্রচারক আবির্ভূত হ'য়ে সগুণ ব্রহ্মবাদ প্রচার করেন। সেই সময়ে দেবমূর্ত্তিতে গূঢ় অর্থ আরোপ করা হয়। পণ্ডিতদের মতে, ঐ সগুণ ব্রহ্মবাদ এসেছিল এসিয়া হ'তে। জীবন গঠনের চেষ্টা না ক'রে, রাজবিধি বা রাজশক্তি বলে ঐ মত প্রচারের চেষ্টা হ'য়েছিল। কারোয়া-খু-ন-এটেন ঐ মত প্রচার করেন, তিনি ছিলেন সৌর—সূর্য্য-উপাসক। তাঁর মা ছিলেন এসিয়ার মেয়ে। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলেও, মিশরীয় পণ্ডিতেরা ঐ দেবতাগুলির 'অর্থ'—গূঢ়-অর্থমাত্র—অঙ্গীকার করলেন। দেব-মূর্ত্তিগুলি বজায় রাখা হ'ল। বাবিলন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে কারডুয়ানিক সভ্যতায় 'দেবোৎপত্তিবাদ', প্রচারিত হ'ল। ব্যক্তি বিশেষ দেবতা ব'লে পূজিত হ'তে থাকেন। মৃত্যুর পর রাজা দেবতা ব'লে গণ্য হ'তেন। বাবিলনের সম্রাট ডুঙ্গি এইরূপে দেবতা হন। লেগাস নগরীর প্রধান পুরোহিত ও রাজপুত্র সেমিটিক বংশ সম্ভূত না হলেও, সম্রাট ডুঙ্গির দাস গুডিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় দেবতারূপে পূজিত হন। বাবিলনের অধিকাংশ দেবতা সেমিটিক বংশের। রাজাকে দেবতা বলা বা দেবতার সম্মান দেওয়ার প্রথা ও সংস্কার সেমিটিক জাতি হ'তেই আসে। রাজাকে দেব-ভাবে

পূজা কবাব প্রথা বাবিলনে খৃঃ পূঃ ৩৮০০ বৎসবেও ছিল। পণ্ডিতেবা অনুমান কবেন যে ঐ বিশ্বাস সুমেবদেব মধ্যে সেমিটিক জাতি হ'তে আসে অথবা জাতি-সংমিশ্রণের ফলে উদ্ভুত হয়। (The Religions of Ancient Egypt and Babylonia—Sayce দ্রঃ)। ফাবওয়া, পৃথিবীব দেবতা। পেরু দেশের ইন্কাসেব ন্যায় তিনিও সূর্য্যবংশ সম্ভূত। বাবিলোনে দেবতাবা নবাকৃতি, কিন্তু ঈজিপ্টে ঠিক্ ইহাব বিপরীত। ঈজিপ্টে প্রায় সকল দেবতাব পশুব আকাব, যথা হোবাস (বাজপাখী), নেখ (গৃধিনী), ইউবিন (সাপ) ইত্যাদি। ভাবতেও রাজশবীবে দেবত্ব আবোপ কবা হয, কিন্তু এখানে বাজা ধর্ম্মশাস্ত্রের অধীন। 'বাজা অন্যায় করতে পাবেন না'—এ ধাবণা আর্য্যেব ছিল না। বৈদিক যুগেও বাজা যথেচ্ছাচাবপবায়ণ হ'তে পাবতেন না। বাজ্যেব প্রধান ব্যক্তিবা যেখানে পবামর্শ কবতেন তাব নাম ছিল 'সভা', গ্রামেব প্রধানদেব পরামর্শস্থান ছিল 'সমিতি', এই সভা ও সমিতিব মিলিত-পবামর্শ অনুসাবে বাজাকে চলতে হ'ত। হযত তখন অনেকগুলি গ্রাম নিযে রাজ্য হ'ত। গ্রামেব মোড়ল ছিলেন 'গ্রামণী'। তাব পব ছিল 'পবিষদ', 'বিদথ', 'সঙ্গতি'। ঐ সব স্থানে জনমত উপস্থাপিত কবা হ'ত,—'ব্যবস্থাপন বিভাগ' যাব দ্বাবা আইন প্রণয়ন হ'ত। সামাজিক বিধি সমাজপতিবাই কবতেন। বৈদিক ধাবা ববাবর চলে এসেছে। অর্থশাস্ত্রও বলছেন যে কার্য্যাবম্ভেব পূর্ব্বে মন্ত্রণা দবকাব, সেজন্য মন্ত্রগুপ্তি বিশেষ দবকাব। "সন্ধিবিগ্রহোর্যোনিমণ্ডলম্" (অর্থশাস্ত্র—১ম অঃ। ৪৮)। ৭ জন বা ১২ জন বাজায় মণ্ডল হয, এই সব মণ্ডলই সন্ধি বা বিগ্রহেব কাবণ। দুটি মণ্ডলেব নাম 'যোনি'। অর্থশাস্ত্র পানাসক্ত ও কামাসক্তকে অর্থেব কাযে নিযুক্ত কবতে মানা কবেছেন। যদিও দণ্ড-পবিচালন বাজাব একটি বিশেষ কায, কঠোব দণ্ড সর্ব্বথা নিন্দনীয় (ঐ ১ম অঃ ৭৫ । ও ২য় অঃ ৪৩ দ্রঃ)। বাজা জিতাত্মা হওয়া চাই, পূর্ব্বে বলা হয়েছে। সহায় সেই লোক যে পবেব সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী। অতএব মন্ত্রী নির্ব্বাচনে ঐ বকম লোক নির্ব্বাচন করতে হবে এবং বাজা নিজেব গুণানুরূপ প্রতিপত্তি ও শৌর্য্যশালী ব্যক্তিকে মন্ত্রী নির্ব্বাচন কববেন (ঐ ১ম অঃ ১৯।২০)। অর্থাৎ মন্ত্রীও জিতাত্মাদি গুণভূষিত হবেন। মন্ত্রণাব সময়ে মাৎসর্য্য প্রকাশ নিষেধ,

মন্ত্রীদেব মধ্যে বিচক্ষণ তিনজনেব একমত হ'লে সেই মতে কায হ'বে (১ম অঃ ৩১।৩২)। ভোটাভুটিব ব্যাপাব ছিল না। মনু, পবাশর, বৃহস্পতি আদির পবিষৎ গঠনে সংখ্যা সম্বন্ধে ভিন্ন মত থাকলেও কৌটিল্য বলেন যে যথাশক্তি যোগ্য মন্ত্রীদ্বাবা পবিষৎ গঠিত হলেও তিনজন বিশেষজ্ঞেব মতই গ্রহনীয়। কৌটিল্য আবো বলেন যে বাজনীতিক্ষেত্রে নীচলোকদেবও সাহায্য গ্রহণীয়, গুণ দেখলে শত্রুকেও সমাদব কববে। ঐ প্রকাব বাজনীতিজ্ঞান খৃঃ পূঃ ৩২০ বর্ষেও বর্ত্তমান ছিল।

লাইকারগসেব কথা আব একটু বলব। ত্যাগেব পথেই তিনি স্বজাতিব অভ্যুদয় দেখতে পেলেন। তাঁব ত্যাগেব ফলে তাঁব স্বজাতি বীব হ'য়ে উঠল। তখন সমস্ত গ্রীস একটি জাতিতে পবিণত হয় নি—দলে বিভক্ত ছিল। লাইকাবগাসেব ত্যাগ স্পার্টানদেব বেশী দিন রক্ষা কবতে পাবে নি। যে আদর্শেব জন্য ঐ ত্যাগ, তাতে দেশকে সাহসী বা দুৰ্দ্ধৰ্ষ ক'বে তুলতে পাবে, কিন্তু তাতে হৃদয় শুষ্ক হ'য়ে যায়। শত্রুব সঙ্গে ব্যবহাব স্পার্টানদেব নিষ্ঠুব ছিল। এথেন্স হ'যে দাঁডায় স্পার্টাব প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। আলস্য ও বৃথা নবহত্যাব জন্য এথেন্স-রাজ ড্রেকো প্রাণদণ্ডাজ্ঞাব নিয়ম কবলেন, যাতে তাঁব দলে আলস্য না আসে, যাতে সকলে বৃথা-ক্রোধ দমন কবতে শেখে। এখানে ত্যাগেব বা জীবনাদর্শেব কোন দৃষ্টান্ত নেই, আছে বাজবিধি। ইহার ফলে ঐ দলেব মধ্যে লোভ ও বিশ্বাসঘাতকতা আসতে বিলম্ব হয় নি। স্পার্টান-কঠোবতা তবু কয়েক শতাব্দী জীবিত ছিল। যে উদ্দেশ্যে লাইকাবগাস ত্যাগ ববণ ক'বে নিয়েছিলেন তা' সফল হয়েছিল। মাত্র শাবীবিক বলে কোন জাতির অভ্যুত্থান হয় না; সে জাতিব জীবনকালও নির্দ্দিষ্ট থাকে। মানুষেব বিশেষ অধিকাব বিচাব-বুদ্ধি-প্রয়োগ-ক্ষমতায়, চবিত্রবলে, ও সকলকে আপন ক'বে নেবার শক্তিতে। মানব-চিত্তেব এই ঐক্যসূত্রেব দিক্‌ দিয়ে যে ত্যাগ স্বীকাব কবা যায় তাতে অমৃতত্বই আনায়, তাহা অমবত্ব প্রদান কবে, কারণ সে চিবন্তন সত্যকে আদর্শ কবে, যে আদর্শ কোন অবস্থাব পবিবর্ত্তনে ক্ষুণ্ণ হয় না, যেমন হয় গণ্ডীবদ্ধ আদর্শে।

পাইথাগোবাস ভাবতে এসেছিলেন, বিভূতিপ্রিয় ছিলেন, জন্মান্তরবাদ স্বীকার করতেন। তাঁর দেশে তিনিই বশীকরণবিদ্যা (mesmerism)

সেখান, পর্দার আড়ালে যেখান হ'তে তাঁকে দেখা যেত না সেই খানে ব'সে তিনি যে সব বাছাই করা লোকদের শিক্ষা দিতেন, সেই শিক্ষার নাম ছিল এসোটোরিক—অন্তরঙ্গ। তাঁর মতে দেহের তিন অবস্থা আছে, (১) পার্থিব শরীর—এই দেহ, (২) জ্যোতির্দেহ—মৃত্যুর পর পাপ-ফল ভোক্তা, (৩) আকাশ-দেহ দিব্য-আনন্দময়-শরীর। তিনিই প্রথম প্রচার করেন যে সূর্য্যের একটা গতি থাকলেও, সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে গ্রহগুলি ঘুরছে।

খৃঃ পূঃ ৭৫২ বর্ষে রোম স্থাপিত হয়। রোম পরে গ্রীসকে জয় করে। রোমানদের বিবাহ ছিল একটা চুক্তি ('contract'), সাক্ষি রেখে। রোমান আইনে অবিবাহিত থাকবার উপায় ছিল না। গ্রীসের মত রোমানদেরও অনেক দেবতা ছিল, কিন্তু সর্ব্বত্রই গোঁড়ামি ও নিষ্ঠুরতা—দলদেবতাপ্রীতি ও দল-চিত্তের সংস্কার। গ্রীকদের আদিম অবস্থায় শবদাহ প্রথা ছিল। মৃত্যুতেই সব শেষ এই ধারণাই ছিল। শবদাহ প্রথা সাধারণ-তন্ত্রের সময় সর্ব্বত্র গৃহীত হয়। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের পর শবকে কবরস্থ করার প্রথা আরম্ভ হয়। যতদিন দেহটা থাকে ততদিন আসল মানুষটি ঐ শরীরে অবস্থান ক'রে ভোগসুখ পায়—এই বিশ্বাসে ঈজিপসিয়ানরা শরীরকে সযত্নে রক্ষা করত। এই দেহ-প্রীতি হ'তেই পিরামিডের উৎপত্তি। হিন্দু বলেন, এই প্রকার দেহ-প্রীতি যাদের, তারাই ম্লেচ্ছ বা সেমিটিক্। সুমের জাতি পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতা বিস্তার করবার পর ব্যাবিলনে বাস করায় সেখানকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে অবাধ রক্তমিশ্রণের ফলে যে নবজাতির উদ্ভব হয়, সেই নতুন জাতিই সেমিটিক জাতি নামে প্রসিদ্ধ। আর্য্যের ভাব অন্যরকম। শরীর নশ্বর, অতএব তার স্মৃতির জন্য দেহকে রক্ষা করবার দরকার নেই, দাহ করাই ঠিক, কিন্তু যে দেহে অর্থাৎ যে আধারে আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হয় সেই দেহের স্মৃতি রক্ষা করা দরকার বোধে, হিন্দু সাধুশরীরকে সমাহিত করেন। ভাবের পার্থক্য কত বেশী! সেমিটিক প্রভাব যখন পারস্য জাতিতে দৃঢ় হয়, তখন, পারস্য ও গ্রীকদের মধ্যে বৎসরের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কবরের পাশে এসে পান-ভোজন ও আমোদপ্রমোদ করার প্রথা প্রচলিত হয়, তাদের এই বিশ্বাস ছিল যে ঐরূপ উপায়ে মৃত ব্যক্তি কবর হ'তে পুনরুত্থিত হয়।

[শাস্ত্রমতে, 'বর্ণ'গুলি বিরাটের অঙ্গ, অতএব মানবের চার বর্ণ ছাড়া অন্য 'বর্ণ' হয় না। ভারতের অধঃপতন যুগে 'পঞ্চম'বর্ণের কল্পনা করা হয় ও একটি পৃথক বর্ণ সৃষ্টি করা হয়, কেবল এই বর্ণকে দাবীয়ে রাখবার জন্য। গীতায় চতুর্বর্ণেরই উল্লেখ আছে। অতএব 'অনার্য্য', 'যবন', 'ম্লেচ্ছ' আদি জাতিরা শূদ্রবর্ণেরই শাখা প্রশাখা মাত্র। ম্লেচ্ছ আদি কথাগুলি 'হিদেন' কথার মত দুষ্ট-অর্থযুক্ত নয়। গ্রীকরা নিজেদের Ion বা যবন বলতেন, আর্য্যেরা তাই তাঁদের যবন বলতেন। পরে 'যবন' ও 'ম্লেচ্ছ' প্রায় একার্থবোধক হয়ে দাঁড়ায়]।

মানবতা আদর্শ যাঁদের তাঁরাই আর্য্য, সুতরাং শূদ্রাদির মধ্যে সকলে আর্য্য নয়। বর্ণ যেমন গুণকর্ম্মগত, 'সেমিটিক' আদি নাম ও সেই রকম ভাবগত বলতে চাই। আর্য্যরক্ত থাকলেই আর্য্য হয় না, অনার্য্য বা আর্য্যেতর রক্ত থাকলেই তাকে 'অনার্য্য' বলা যায় না। রক্ত, বংশধারার একটি সুযোগ মাত্র। যিশু রক্ত সম্পর্কে সেমিটিক, ভাবসম্পদে তিনি আর্য্য। গুণকর্ম্ম হিসাবে মানবের শ্রেণী বিভাগ এবং রক্ত অথবা রাজনৈতিক হিসাবে শ্রেণী নির্ণয়—এই দু'রকম বিভাগে ও, জাতির মনোবৃত্তি বোঝা যায়। ধোলো ঐতিহাসিক সব যায়গায় ঠেঙ্গানি বৃত্তি দেখতে পান আদিম অবস্থায় ও পরে। নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতায় ধোলো সভ্যতার জন্ম। তাই ধোলো, লাইকারগাসের ন্যায় মৃত্যুপণ-কঠোরতা বুঝতে পারেন, কঠোরতা থাকলে ধোলোর কাছে আদর্শ গ্রহণ-যোগ্য হয়। ঐ কারণেই যিশুর নিষ্ঠুর হত্যায় যিশু-জীবনের মর্য্যাদা তিনি বুঝতে পারেন। ঐ একই কারণে ধোলো-চিত্তের কাছে আর্য্যের ত্যাগ বা ঐ ত্যাগের অর্থ মহিম্ন নয়। আর্য্যের আদর্শময় শান্ত জীবনে সে তিল তিল আত্ম-বলিদানে সংযম ও কঠোরতা থাকলেও, তাতে তাঁদের মর্ম্মভেদী ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ঘটে নি ভারতে, কোনো হিন্দুর অত্যাচারে। ভারতে বিবেক-বৈরাগ্য-জন্য ত্যাগ ধোলো সহজে বুঝতে পারেন না, যদি তাতে মরণ-যাতনা দৃষ্ট না হয়। এই সব নানা কারণে ধোলো আর্য্যভারতকে আজও বুঝতে সমর্থ হন নি।

টোটেম জাতির কথা বলেছি। তারা সবাই অসভ্য বা বর্ব্বর ছিল না, অন্ততঃ ভারতে। রামচন্দ্রের সৈন্য-বাহিনীই তার প্রমাণ। ইজিপ্টের পুরাণে বহু টোটেম জাতির কথা আছে। এখন অবশ্য ঐ সব জানোয়ারের নামে কোনো সভ্য দল নেই, কিন্তু বর্ত্তমান কালেও কয়েকটি আমেরিকান্

প্রদেশেব এক একটি অদ্ভুত ডাকনাম আছে এবং সেই সেই নামে তাবা আজও পবিচিত; যথা আলবামাব (Albamaব) নাম 'লিজার্ড' (Lizzard বা 'গিবগিটী'), দেলওয়েয়াবেব (Delwareব) নাম 'মাস্ক-ব্যাট্‌স্ (Musk-rats বা ধেড়ে ইঁদুর), মেনেব (Maineএব) নাম 'ফক্সেস্' ('Foxes' বা খ্যাঁকশিয়াল) ইত্যাদি। যুগ যুগ পবে হয়ত ঐ সব নামেই ঐ সব দেশের পবিচয় হয়ে যাবে ও তখন তাবাও হয় ত টোটেম বলে গণ্য হবে।

কোন কোন ধোলো পণ্ডিতদেব মতে বাঙ্গালীব দেহে আর্য্যবক্তেব সঙ্গে দ্রবিড ও মঙ্গোলিয়ান বক্ত আছে এবং বাঙ্গালী ছিল গোড়ায় টোটেম জাতিব অন্তর্গত, 'পক্ষী' জাতি। অর্থাৎ তাঁবা দেখাতে চান বক্তেব দিক দিয়ে—যেটি তাঁবা বোঝেন ভাল—যে, বাঙ্গালী খাঁটি আর্য্য নয়। কতকাল পূর্ব্বে বিভিন্ন মানবকুলেব উৎপত্তি হয়েছে, কতকাল ধ'রে বিভিন্ন জাতি একসঙ্গে কতবাব মিশেছে কে বলতে পাবে। রক্তমিশ্রণেব দিকটা দেখিয়ে কোন কিছু স্থিব কবতে যাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতা। একথা কেহই বলতে পাবেন না যে মানবকুলেব মধ্যে কোন এক যায়গায বক্ত-মিশ্রণ ঘটে নি। ঐ সব ধোলো পণ্ডিতেব মতে, আর্য্যেব ভাবতে আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভাবতে ছিলেন। বাঙ্গালীব লাঠিচালনার কৌশল ও নৌচালনাব দক্ষতা এবং উভয় বিদ্যায় অত্যন্ত ক্ষিপ্রকাবিতার জন্যই বাঙ্গালী 'পক্ষী' জাতি বলে গণ্য হ'তেন কিনা কে বলতে পাবে? বাঙ্গালী যে গোড়ায় টোটেম তাব প্রমাণ কোথায? ইংবাজ বণিক জাতি; বাঙ্গালীব পোত পাল তুলে সমুদ্রে দ্রুত চলত, তাই কি বাঙ্গালী 'পক্ষী' এই আখ্যা পান?

সভ্যতার কথা—২

Family বা 'পবিবাব' Famul বা 'দাস' ইত্যাদিব কথা বলা হয়েছে। ধোলো পাবিবাবিক-সংস্কৃতি ঐ বকম পাবিবাবিক-জীবন হ'তে গড়ে ওঠে। তাব পব যখন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচাব হয়, তখন দলসমষ্টিব পাবিবাবিক-জীবন বা খৃষ্টান সমাজ তথা খৃষ্টীয সভ্যতা নিযন্ত্রিত হ'ত 'চার্চ্চেব' বা পোপেব ব্যবস্থানুযায়ী। যিশুব জীবনাদর্শে খৃষ্টীয় সমাজ বা সভ্যতা গঠিত হয় নি। যিশুর নাম ও ভাব

প্রচাবেব আয়োজন ও উদ্যোগ, ঐ সভ্যতা যে ভাবে আবম্ভ কবেন, তা বন্ধ হয়ে যায় কনষ্টানটাইনেব পব হ'তে অর্থাৎ ও সব ব্যাপাবেব ভাব থাকে একমাত্র 'চার্চ্চেব' উপব—চার্চ্চ পৃথক হয়ে যায়। তাই সমস্ত পাবিবাবিক জীবন গ'ডে উঠতে লাগল বাজনৈতিক আদর্শে। বাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাবিবাবিক সম্বন্ধেব কোন মূল্য নেই অর্থাৎ বাপ্ মাব সঙ্গে সন্তানেব সম্বন্ধ, স্ত্রীব সঙ্গে স্বামীব সম্বন্ধ—এ সবই বাজনৈতিক পদমর্য্যাদাব কাছে গৌণ, ঐ পদমর্য্যাদা সকল সম্পর্কেব মধ্যে বিপর্য্যয় ঘটাতে পাবে। দাস-ব্যবসা ভাবতেতব দেশে যে ভাবে ছিল, আর্য্যেব মধ্যে দাস-প্রথা সে ভাবে ছিল না। 'Slave' শ্লেভ কথাটির অর্থ পূর্ব্বে ভাল ছিল, ইহা 'slav' ধাতু হ'ত নিষ্পন্ন, মানে—মহৎ। Dnieper নিপাব নদীব ধাবে slavi (শ্লেভি) নামে একটি জাতি বাস কবত। বোমান সাম্রাজ্যেব জয়-পতাকা যখন ঐ সাম্রাজ্যেব জয় ঘোষণা করছে, সে সময়ে বোমানবা slavi দেব কয়েদ ক'বে দাসদাসী রূপে ইউরোপে ছড়িয়ে দেয়, slave বা দাস-ব্যবসায়েব সূত্রপাত হয়। বহু পূর্ব্বে যে সব অসভ্য ও বর্ব্বব জাতি ছিল, তাদেব মধ্যে দাস-প্রথা ছিল।

সিথিয়ান নামে এক জাতি ছিল। হেরোডোটাসেব বর্ণনানুসাবে সিথিয়ানরা ছিল যেমন নোংরা তেমনি নিষ্ঠুব, যুদ্ধে নিহত শত্রুদেব বক্ত পান কবত, খুব উৎসাহেব সহিত তববাবী পূজা কবত। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী, এই সব ছিল তাদেব দেবতা। দেবতাগুলিব সাধাবণ নাম ছিল Hercules (হাবকিউল্স্)। এক সময়ে তাবা ইউবোপ ও এসিয়াব সর্ব্বস্থানেই লুঠপাট ক'বে বেড়াত। সিথিয়ানদেব মধ্যে নববলিব প্রথা খুব প্রচলিত ছিল। তাবা চীনাদেব মত এসিয়াব লোক নয়। হেবোডোটাসেব মতে সমস্ত দক্ষিণ ইউবোপেব নাম ছিল সিথিয়া। Xenophon (জেনোফন্) বলেন, কাস্পিয়ান হ্রদেব সমস্ত দক্ষিণাংশও সিথিয়া। তাতার দলান্তর্গত হুনবা ৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কাস্পিয়ান হ্রদেব পূর্ব্ব দিকে এসে বসবাস কবে। পারসীকদেবও সিথিয়ান বলত। দাস-প্রথা ইউবোপে প্রায় ববাববই ছিল। পূর্ব্বে দাস-প্রথাব মূলে নীতি ছিল 'যাব লাঠি, তাব জমি', পবেও ঐ নীতি প্রবল ছিল।

দাসের সঙ্গে সুব্যবহাব করাব নীতি, ভাবতের বাইবে, প্রথম প্রবর্ত্তন কবেন হজরৎ মহম্মদ (জন্ম ৫৭০ খৃষ্টাব্দে)। মুসলমান হলেই দাসত্ব শৃঙ্খল যায়, দাসও সিংহাসনে বসেছেন, এ দৃষ্টান্ত মুসলিম ইতিহাসে বিরল নয়। হজরৎ

বলেছেন যে দাসেব সঙ্গে নির্দ্দয ব্যবহাব কবলে, এমন কি দাসেব উন্নতিব পথে বাধা প্রদান কবলে স্বর্গবাস হয় না। উত্তব আফ্রিকাব বের্ব্বেব জাতি ও আববেব বক্তমিশ্রনে যে নতুন জাতিব সৃষ্টি হয় তাব নাম 'মূব' জাতি। মূববা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ ক'বে মুসলমান সভ্যতা পায়। এই মূব জাতি কৃষ্ণকায় নয়। গথ জাতি যখন স্পেনেব অধিপতি তখন মূব জাতি স্পেন অধিকাব কবে। এইভাবে মুসলমান সভ্যতা যখন স্পেনে যায়, সে সময়ে খৃষ্টানেব মুসলমান-প্রজাবা সর্ব্ব অধিকাব হ'তে বঞ্চিত শ্রমজীবি দাস মাত্র ছিল। মুসলমান সভ্যতা প্রবেশ মাত্রই তাবা দাসত্ব হ'তে মুক্তি পায়। মুসলমান সভ্যতাব দ্রুত বিস্তাবেব ইহাও একটি কাবণ। 'ইসলাম' মানে 'সলামেব' বিশেষ, স্বধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম কবা ও শান্তিতে থাকা। 'শান্তি' অর্থে নিবাপত্তা ও বন্ধন-মুক্তি; পবে মানে হয় 'খোদায় আত্মসমর্পণ'। বর্ত্তমানে অনেকে ইহাব অর্থ কবেন 'ধর্ম্মানুবক্তি ও সত্যপ্রিয়তা।' স্পেন বিজযে মুসলমান সভ্যতা কার্ডোভা নগবকে কেন্দ্র ক'বে ইউবোপে জ্ঞান ও বিজ্ঞানেব আলোক আনায়। সে সমযে মুসলমান কাবোব ধর্ম্ম বিশ্বাসে আঘাত দেন নি। কিন্তু তখনকাব খৃষ্টান যেমন গোঁড়া, তেমনি অনুদাব ছিল।

পূর্ব্বে আমবা দেখেছি যে ঋগ্বেদে 'দাস' নামে একটি স্বতন্ত্র জাতিব উল্লেখ আছে, ভাবতে দাস-প্রথাব দাস ছিল পাবিবাবিক জীবন-যাত্রাব অঙ্গ বিশেষ, দাস ঘবেব ছেলেব মত প্রতিপালিত হত, ঘবেব ছেলেবা তাব সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে সেই বকম ব্যবহাব কবত। পাবিবাবিক জীবনে প্রবেশ লাভেব সুযোগ পেয়ে অনেক অজ্ঞাতনামা লোকও ঋষি হযেছেন। ঘবেব ছেলেবা যেমন সংসাবেব ভবিষ্যৎ সম্পত্তি, দাস তেমনি সংসাবেব আজীবন সম্পত্তি। সেদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র—এখনও সুদূব পল্লীগ্রামে—ঘবেব ছেলেবা চাকবকে 'দাদা' 'কাকা' ইত্যাদি সম্বোধন কবত ও এখনও কবে। ভাবতে 'নোকব' 'চাকব' ও 'দাস' একার্থ বোধক, ইংবেজি slave ও servantএব ন্যায় দুই পৃথক ভাব-ব্যঞ্জক কথা নেই। vasal কথাটিব অনুরূপ কথাও নেই। দাসীকে বাঙ্গলায বলা হয ঝি, মানে মেয়ে। দাস-দাসী বাড়ীব ছেলে-মেয়ে।

বাইবেলে দেখি (Gen. XXII), ঈশ্ববেব 'আদেশে' আব্রাহাম তাঁব একমাত্র পুত্র Isaac (অইজাক) কে জিহোভাব কাছে বলি দিতে অগ্রসব হয়েছেন। অবশ্য শেষে আইজাকেব পবিবর্ত্তে একটি ভেড়াকে বলি দেওয়া

হয়, মহম্মদের মতে ঐ ভেড়াটি স্বর্গে স্থান পায়। ঐ ভাবে বলি দেওয়াব প্রথা য়াহুদিব মধ্যে ছিল, ‘বুন্’ ধর্ম্মেও ছিল। ভাবতে বলি প্রদত্ত হয় কাবোব আদেশে নয়। যাঁবা কর্ণেব উদাহবণ দেখান তাঁদেব জানা উচিত যে ঐ বকম কদাচিৎ কোন দৃষ্টান্তেব কথা বর্ণিত হয়েছে ভক্তের বিশ্বাস ও নির্ভরতা দেখাবাব জন্য। অতিথিরূপী নাবায়ণে ঠিক্ ঠিক্ ‘নাবায়ণ’ বোধ না এলে ওবকম আচবণ সম্ভব হয় না। দ্রৌপদীব বস্ত্র-হবণেব উদাহবণও সেই বকম। ইহাব অর্থ এ নয় যে পাণ্ডবেরা কাপুরুষ ছিলেন বা সমাজ ঐ বকম বীভৎস ব্যাপাব সমর্থন কবতেন অথবা মহাবীব কর্ণ বৃদ্ধ অতিথিব ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলেন। সেই বকম বিল্বমঙ্গল নাটকে, বণিকেব স্ত্রীকে পূর্ব্বসংস্কারাচ্ছন্ন বিল্বমঙ্গলেব কাছে প্রেবণ কবাব উদাহবণ। ইহাব অর্থ এ নয় যে নাবীকে তখন একটি ‘পণ্যদ্রব্য’ মনে কবা হত। ঐ স্থলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েবই পূর্ণ নির্ভবতা দেখান হয়েছে, সদা মঙ্গলকামী ভক্ত স্বামীব উপব সাধ্বী স্ত্রীব অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা ঐখানে দেখানো হয়েছে। পূর্ণনির্ভবতা—মনমুখ এক—যেখানে, সত্যই সেখানে ভগবান সহায় হন, ভক্তেব ‘যোগক্ষেম’ বহন কবেন—এই চিত্র যেখানে, সেখানে ‘পণ্যদ্রব্যেব’ মত যুক্তিব স্থান নেই। তা ছাড়া সাধক-ভক্ত-জীবন বা ঐ বকম নির্ভরতাময় জীবনেব মনস্তত্ব আধুনিক উপন্যাস বা নাটকে বিবল। উপলব্ধিবিহীন সাধাবণ জীবনে ঐ বকম চবিত্র দেখা দিতে পাবে না। এই সব নজির যাঁবা দেন, তাঁবা কি ঐগুলিকে সত্য ব’লে বিশ্বাস কবেন? যদি না করেন, এসব তর্ক কেন? অন্যান্য দেশেব সঙ্গে ভাবেব পার্থক্য যা, তা সর্ব্বক্ষেত্রে তুলনা কবতে বলি ও চিন্তা কবতে বলি। ভাবতে, পদমর্য্যাদা অপেক্ষা আদর্শ জীবন যাপনে রাজাব সম্মান অনেক বেশী। জনক বাজা ক্ষত্রিয় হলেও শতপথব্রাহ্মণ তাঁকে ব্রাহ্মণ বলেছেন। ধোলো সভ্যতা শিখিয়েছে এবং আমবা ও তাই কপ্‌চাচ্ছি যে ‘ধর্ম্ম’ ‘ধর্ম্ম’ ক’বে, ‘অধ্যাত্ম’ ‘অধ্যাত্ম’ ক’বেই ভাবতে জড়তা এসেছে। তাঁদের মতে, গৃহস্থ একমাত্র দুনিয়াদাবী ও বিষয় নিয়ে থাকবে ও অবসব মত ভগবানকে ভালবাসবে বা ভাববে; অধ্যাত্ম-বিদ্যা একমাত্র সন্ন্যাসীব জন্য ইত্যাদি। তাঁরা ভুলে যান যে নির্ভরতা বা অধ্যাত্ম জীবনেব উদাহবণ সব দেশে দেখতে পাওয়া যায়, তাঁবা

বোঝেন না যে ভালবাসা জিনিষটি অবসর মত হয় না; তাঁরা দেখেও
দেখেন না যে মানব-কল্যাণের জন্য অমানুষিক কর্ম্ম ক'রে, দেহপাত ক'রে
গেছেন সন্ন্যাসীরা-ই ভারতে ও অন্যত্র, তাঁরা ভুলে যান কর্ম্মযোগের আদর্শ,
তাঁরা বোধ হয় জানেন না যে অধ্যাত্ম বিদ্যার, ব্রহ্মবিদ্যার—পূর্ণ স্বাবলম্বীভাবের
—উদ্ভব পর্ব্বতগুহায় বা নিভৃত অরণ্যে শুধু নয়, ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রচার হয়
সিংহাসন হ'তে, ঐ বিদ্যার প্রথম প্রকাশ ব্যস্ত রাজজীবনের মধ্যে, ক্ষত্রিয়ের
মধ্যে। জড়তার কারণ, ব্রহ্মবিদ্যাকে কর্ম্মপরিণত করতে না পারা। যাঁরা
অধ্যাত্মকে ভারতের অধঃপতনের কারণ মনে করেন, তাঁরা জানিয়ে দিন
কতদিন ধ'রে, কত সহস্র বৎসর ধ'রে, ভারত 'অধ্যাত্ম' 'অধ্যাত্ম' ক'রে
উন্নত ছিল।

যিশু এসিয়ার, কিন্তু খৃষ্টান বা ধোলো-সভ্যতাটি এসিয়ার নয়। মুসলমান
সভ্যতা, এসিয়ার সভ্যতা, অধ্যাত্ম পারিবারিক জীবনাদর্শে এই সভ্যতার
মূল প্রতিষ্ঠিত। মহা বিশৃঙ্খলার মধ্যে, নিতান্ত বিপরীত ভাবের মধ্যে, ও
সামাজিক আচরণে, ইসলাম প্রথম জীবনে সাম্যনীতিকে পুষ্ট করেছেন,
সাম্যনীতির আদর্শকে কর্ম্মে পরিণত করেছেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার কি
ক'রে সম্ভব হয়েছিল? অধ্যাত্ম জীবনহীন আরবদের দুর্দ্দশা দেখে হজরৎ
যে মহাবেদনা হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন, সেই বেদনাই ঐসব পতিতদের
মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিল। আংশিক ভাবেও, ঐ রকম
বেদনা অনুভব যেদিন মুসলমান অখণ্ড ভারতের জন্য করতে শিখবেন, সেই দিন
হ'তে তাঁদের যথার্থ কায ভাবতে আরম্ভ হবে, তাঁদের মুসলমান নাম
সার্থক হবে। আমরা এখন এক অভিনব সভ্যতার সম্মুখীন। আজ সমস্যা,
অধ্যাত্ম-সভ্যতা কি রাজনৈতিক সভ্যতাকে নতুন রূপ দিয়ে আত্মস্থ করবে,
না, জেতার সভ্যতা বিজিতের সভ্যতাকে দাবিয়ে রাখবে বা গ্রাস করবে,
না, উভয় সভ্যতাই পাশাপাশি থেকে নিজ নিজ ভাবে বর্দ্ধিত হবে, যেমন
মুসলমান সভ্যতা ভারতে হয়েছিল? ফল যাই হোক্, হিন্দুর মনে রাখতে
হবে যে, সামাজিক আচরণে সাম্যনীতির অভাবে, অখণ্ড ভারত—বেদপন্থি
ভারত—খণ্ডিত হয়েছে—সর্ব্বদিকে ভারত খণ্ডে খণ্ডে পরাজিত হয়ে
এসেছেন—ধর্ম্মে উদারতা সত্ত্বেও। মুসলমানকে মনে রাখতে হবে যে তাঁর
ধর্ম্ম-বিশ্বাস ছাড়া অন্য সব বিষয়ে তিনি ভারতবাসী, তাঁর মধ্যে এখন ঐ

ধর্ম্ম-বিশ্বাস ছাড়া আরব-সংস্কৃতির কিছুই নেই। যে আরব তাঁর ধর্ম্ম-গুরু-স্থান, সেই আরবকে তিনি নতুন ধর্ম্মতত্ত্ব দিয়েছেন—যে ধর্ম্মতত্ত্ব হিন্দু ধর্ম্মতত্ত্বের বিরোধী নয়। তিনি ভারতে এসে সঙ্গীতচর্চ্চা করেছেন, সঙ্গীত বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যার বহু উৎকর্ষসাধন করেছেন ও সেইগুলিতে যে রূপ দিয়েছেন সেগুলি হিন্দুসংস্কৃতির বিরোধী একটিও নয়, সেগুলিও ভারতের নিজস্ব।

অভ্যুদয়ের আদর্শে পার্থক্য

ধর্ম্মমতবাদ

বৈজিক-শক্তির কথা পূর্ব্বে বলেছি, কয়েকটি সংস্কারের কথাও সেখানে বলা হয়েছে (১) বৈজিক-সংস্কার বা শক্তি—রক্তের শক্তি চামড়ার উপর, (২) বিদ্যা বা জ্ঞানসংস্কার—বৈজিক-শক্তির নিয়ামক, (৩) সাধনার সংস্কার বা অধ্যাত্মশক্তি—সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের প্রভু। আর্য্যভারতের লক্ষ্য ছিল যেন তেন প্রকারে অধ্যাত্মশক্তি অর্জ্জন করা, অন্যান্য জাতির প্রচেষ্টা অপর দুই শক্তির মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে। ইহাতে এটা বোঝায় না যে অন্যান্য দেশে ভগবানে একান্ত নির্ভরশীল ভক্ত বা সাধু জন্মান নি বা অন্যান্য দেশে সংস্কারমুক্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় নি। বলবার উদ্দেশ্য এই যে, যত মহাপুরুষ এসিয়াতে জন্মেছেন, তত অধিক মহাপুরুষের আবির্ভাব অন্যত্র হয় নি, আবার যত মহাপুরুষের আবির্ভাব ভারতে হয়েছে, এসিয়ার কোন স্থানে তত হয় নি। ভারতে অভ্যুদয়ের চরম লক্ষ্য নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি-লাভ, অন্যান্য দেশের সমাজ কিন্তু অভ্যুদয়ের এই শেষটি চান নি।

আমরা তিনটি সংস্কারের কথা ব'লেছি। আর একটি প্রবলতম সংস্কার আছে, সেটি জীব-ভাবের সংস্কার, যার নাম দেওয়া যেতে পারে 'জৈবিক সংস্কার'। একমাত্র অধ্যাত্মসংস্কার জৈবিক সংস্কারকে উর্দ্ধে নিয়ে যেতে পারে। ক্ষুৎ-পিপাসা ও কাম—এই কয়টি থাকে জৈবিক সংস্কারের প্রথম অবস্থায়। এইজন্য নিম্নস্তরের জীবে ইন্দ্রিয়বোধের তীক্ষ্ণতা তীব্র। প্রয়োজন-বোধ দুরকমের—শরীরের ও মনের। প্রয়োজন-বোধ, অন্তর্নিহিত

উদ্ভাবনী শক্তিব জন্মদাতা। মানুষে দেখা দেয়, মনেব প্রযোজন-বোধ; তাই মানুষেব মধ্যে ইন্দ্রিয়গত তীক্ষ্ণতা তুলনায় অনেক কম। জৈবিক সংস্কাবকে অতিক্রম কববাব বীজ এইখানে। জৈবিক সংস্কাবকে চালনা কবে বৈজিক সংস্কাব। অন্যান্য দেশে বিদ্যা-সংস্কাবেব খেলা দেখা যায, ভাবতেই প্রথম দেখা দেয় মোক্ষ-ধর্ম্ম। সর্ব্বপ্রকাব সংস্কাব ঐ জৈবিক সংস্কাবেব সূক্ষ্মতব, সূক্ষ্মতম রূপ। যতক্ষণ শবীব থাকে ততক্ষণ জীবভাবেব সংস্কাব একেবাবে যায় না। যাবা জৈবিক সংস্কাবেব কবল হ'তে মুক্ত হ'তে চায় না, তাদেব বলা হয 'বদ্ধজীব'। যে সমাজ, জৈবিক সংস্কাবকে অতিক্রম কবতে চায না, অনেকে সেই সমাজেব সাধাবণ নাম দেন 'সেমিটিক সমাজ' ও সেই সভ্যতা 'সেমিটিক সভ্যতা'। ঐ স্থলে সমাজ-চিত্ত, নিজেব সুখসুবিধাকে জীবনেব চবম লক্ষ্য কবে। এই হিসাবে বর্ত্তমান সভ্যতাকে সেমিটিক সভ্যতা বলা যায়।

জৈবিক সংস্কাবকে ঠেলে উঠে সংস্কাবমুক্ত হবাব চেষ্টাই 'ব্যক্তিত্ব'-লাভ-চেষ্টা এবং ঐ প্রচেষ্টাব সার্থকতাই 'ব্যক্তিত্ব' আর্য্যমতে। ব্যক্তিত্বই মনুষ্যত্ব। ধোলো Individuality মানে তা নয়। এখানেই অভ্যুদয়েব আদর্শে পার্থক্য। সংক্ষেপে প্রশ্নোত্তবে পার্থক্য দেখালে বুঝতে সুবিধা হ'তে পাবে। ধোলো—"আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই, আমাবই ইন্দ্রিয় দিযে আমিই দেখছি জগৎ, আমাবই ইন্দ্রিয় সাহায্যে, আমাবই বুদ্ধিব সহায়তায় আমি জগতেব সর্ব্ববস্তুকে বিশ্লেষণ ক'বে দেখছি যে জগতেব মধ্যে যে সব শক্তিব বা ক্রিয়াব লম্ফ ঝম্প আছে, সেগুলিকে একে এক আমি আযত্তে আনছি; সেগুলিকে আয়ত্তে এনে আমি প্রভু হব, আমাব ইন্দ্রিয়েব তৃপ্তি সাধন কবব।" আর্য্য—"বালক! প্রমাণ ভালবাস তুমি, প্রমাণ চাও তুমি। বলছো তুমি 'আমাব ইন্দ্রিয়,' প্রমাণ তাব কৈ? আমি দেখছি তুমিই ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয় তোমাব নয, তুমি ইন্দ্রিয়েব দাস, তাব তৃপ্তিব জন্যই তোমাব প্রতিভা নিয়োজিত, বালক! ওঠ, খাড়া হও, হও ইন্দ্রিয়েব প্রভু। ইন্দ্রিয় দিয়ে জগৎ দেখছ, বুঝছ, এই সত্যটা আমিও অস্বীকাব কবি না; কিন্তু তোমাব ইন্দ্রিয়দাস 'অহং'টি শান্তিব মূল খুঁজে পাচ্ছে না, ঘুবে ফিবে ইন্দ্রিয়মুখেই বুদ্ধিব পরিচালনা কবছে। চক্ষুব গোলক সম্পূর্ণ বজায় থাকলেও হয়ে যায় অন্ধ, যদি Optic nerveটি কেটে দেওয়া যায়, এই

রকম অন্য সব বিষয়ে, অতএব ইন্দ্রিয় আছে তোমার ভেতরে। দর্শন-কেন্দ্রের সাহায্যে বাইরেই দেখছ, দেখতে শেখ ভিতরটা তারির সহায়ে। ইন্দ্রিয়ের প্রভু হও, সংস্কারের প্রভু হও তবে ত তোমার ব্যক্তিত্ব, তবে ত বুঝব যে হয়েছে তোমার শক্তির অভিব্যক্তি। এই প্রভুত্ব লাভ না করা পর্য্যন্ত তুমি অশান্ত থাকতে বাধ্য। তোমার Individuality, তোমার সংস্কারের বিশেষত্ব মাত্র।"

(উক্ত সংজ্ঞার) সেমিটিক সভ্যতার মূল সেমিটিক সংস্কার। সেমিটিক সংস্কারে সেমিটিক জাতীয়ত্ব; ভারতীয় সংস্কারে ভারতের জাতীয়ত্ব। সেমিটিকের রাষ্ট্রবোধ গণ্ডীবদ্ধ। সেমিটিক-সংস্কার যাতে পরিপুষ্ট হয় তা করাই সেমিটিকের লক্ষ্য। এই বিষয়ে সেমিটিক জাতি সমূহের ঐক্য আছে। এই ঐক্য বোধ সত্বেও তাঁরা গোঁড়ামি মুক্ত নন। তাঁদেরও ভয়ানক জাতিভেদ আছে, সেটি টাকার জাতিভেদ। তাঁদের মধ্যেও বর্ণবিদ্বেষ আছে, সে বর্ণ মানে চামড়ার রঙ্। তাঁদের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিপ্রসূত জাতিভেদ ছিল ভীষণ, আজও তার বীজ নষ্ট হ'য়েছে কি? যাই হোক, খোলো-রাষ্ট্রবোধে খোলো-জনশক্তি জাগরিত হয়েছে, ঐ রাষ্ট্রবোধের ধাক্কায় ভারতের জনশক্তিকেও বিনিদ্র করেছে। এখন দরকার ঐ রাষ্ট্রবোধকে আপন ক'রে নেওয়া ভারতের তথা এসিয়ার ভাব দিয়ে।

ভারত হ'তে ভাব সঞ্চরিত হয়েছে, নানা ভাবে নানা স্থানে সেই ভাব রূপান্তরিত হ'য়ে গৃহীত হয়েছে। ভাব-সঞ্চরণের কথা গোড়ায় বলা হয়েছে। অভ্যুদয়ের মূল কারণ এক এক জাতির চিন্তা-ধারা। এই চিন্তা-ধারা অনুসরণ করলে পার্থক্য স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

(Heraclitusএর) হেরক্লিটাসের এক শিষ্যের নাম ক্রতিলাস (Cratylus), তাঁর জন্যই প্রথম জীবনে প্লেটো হেরাক্লিটাসের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁর প্রভাব বিশেষরূপে প্লেটোর উপর পড়ে। হেরাক্লিটাস ছিলেন এসিয়ামাইনরের লোক। তিনিই (খৃঃ পূঃ ৫০৪ বা ৫০৩) গ্রীক দর্শনে প্রথম সুস্পষ্টভাবে 'লোগোসবাদ' সন্নিবিষ্ট করেন। ফাইলো ছিলেন য়াহুদি। হেরাক্লিটাসের যখন কিশোর কাল, সেই সময়ের ও বহু পূর্ব্ব হ'তে অহুরা মজদার পূজা শুধু এসিয়ামাইনরে নয়, আরো বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করেছিল ও পারস্য সৈন্যের জয় পতাকা ইজিপ্টের দ্বার পর্য্যন্ত

অগ্রসব হয়েছিল। পাবস্য-বাজ Darius এব সঙ্গেও হেবাক্লিটাসের সাক্ষাৎ হয়েছিল।

পাবমিনাইডস্ (Parmenides—খৃঃ পূঃ ৫০৪—৫০০):—'লোগাস' বা সিদ্ধান্ত সত্যে উপনীত হওয়া যায় 'reason' বা বিচাবেব দ্বাবা, Being'—সত্তা বা অস্তিভাবই সর্ব্ববস্তুব মূল কাবণ, হেবাক্লিটাসেব মতে 'Becoming'—হয়ে যাওয়াটাই 'Existence'—বিদ্যমানতাব মূলকাবণ, ক্রতিলাস তাই প্রশ্নের উত্তবে আঙ্গুল নেড়ে ইঙ্গিত কবতেন, কথা কইতেন না। Parmenides গতিবাদ পছন্দ করতেন না, পববর্ত্তী 'লোগাস'বাদেব আভাস ও তাঁব ছিল না, হেবাক্লিটাসেবও পবিষ্কাব ছিল না।

এফিসিয়াস (Epheseus, খৃঃ পূঃ ৪৭৮—৪৭০):—'লোগাস'বাদেব যথার্থ বীজ ইহাব মধ্যেই প্রথম দৃষ্ট হয়। তিনিই প্রথম বলেন যে প্রকৃতিব অবশ্যম্ভাবী প্রভুত্বজ্ঞাপক গতি-প্রকৃতিব ক্রিয়া ও প্রকৃতিব ক্রমবিকাশ ইত্যাদিব মধ্যে একটা ছন্দ আছে।

এম্পিডোক্লিস (Empedocles জন্ম, খৃঃ পূঃ ৪৮০):—ইহাব মতে, গতির দুটি কাবণ—ভালবাসা ও ঘৃণা, ভালবাসায় বস্তু একত্রিত হয়, ঘৃণায় পৃথক বস্তুকে আবো পৃথক কবে।

ডেমোক্রিটাস (Democritus—খৃঃ পূঃ ৪৬০—৪৫৬):—ইহাব মতে 'লোগাস'ই সর্ব্ববস্তুব মূল কাবণ; অসংখ্য সাবযব পবমাণু এবং মহাশূন্য বা অবকাশ—এই দুই সত্য—আব সব মিথ্যা। পবমাণু সদা পতনশীল ও বিভিন্ন গতি-বিশিষ্ট, এই জন্য নানা বস্তুব উৎপত্তি হয়। 'Soul' এব অণু আছে। সেটি আগুনেব ফিন্‌কিব মত সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ গতিযুক্ত, গোল ও মসৃণ। 'Law' বা প্রাকৃতিক বিধিই জ্ঞানেব পবিচয়। ইহাই প্রজ্ঞা অর্থাৎ সিদ্ধান্ত সত্য। পববর্ত্তী Epicurus তাঁব Soul বাদটি গ্রহণ কবেন।

এনাক্সাগোবাস (Anaxagoras—খৃঃ পূঃ ৫০০—৪২৮):—ইনি Eleaব Zenoব (জিনোর) সঙ্গে বহু বৎসব বাস ক'বেছিলেন। আবেস্তায় 'জ্রুনিআকারুন' (Zruniakarun)=জড, যা অনন্তকাল হ'তে নিশ্চল ছিল, পবে মন (Yovs) এসে ঐ জড়ে ঘূর্ণীপাক দিয়ে নেড়ে দেয়। এই মতটি এনাক্সাগোবাস অবিকল গ্রহণ কবেছেন। গতি-শক্তি, অতএব, জড় জগতেব উর্দ্ধে ও বাইবে। ইহাই 'লোগাস'।

সক্রেটিশ (Socrates):—যেটি কারণ-পরম্পরার সংযোজক তাহাই 'লোগাস।' দুই বস্তু আছে Goodness ও Demiurge, Goodness = সাধুতা, শুভেচ্ছা ও দয়া প্রভৃতি গুণ। বিশ্ব-স্রষ্টার Goodness বা সাধুতাই জগতের কারণ। Goodness এর জন্যই জগৎ উৎকৃষ্টতম ভাবে শ্রেণীবদ্ধ রয়েছে। বিশ্ব-স্রষ্টা ও সৃষ্টবস্তুর মধ্যে কারণ-পরম্পরা, অনুক্রম ও পর্য্যায় আছে; এইগুলির মধ্যে Goodnessটি প্রথম ও Demiurgeটি সর্ব্বশেষ বস্তু। এই মতের সঙ্গে আমেশাস্পেণ্টাসের (Ameshaspentus এর) কিছু সাদৃশ্য আছে।

প্লেটো (Plato):—প্লেটোর 'জ্ঞানবাদ' এর 'জ্ঞান' মানে যুক্তি-জন্য অভিজ্ঞতা, জ্ঞান = চেতন বস্তু। তাঁর 'অপরিহার্য্যতাবাদ' এ 'অপরিহার্য্যতা' = জড়বস্তু। তাঁর ঐ দুটী বাদের মধ্যে ভেদ ও ব্যবধান স্পষ্ট; ইহাই প্লেটোর দ্বৈতবাদ। সক্রেটীসের 'জড়' ও 'গতিবাদ', যা প্লেটো নবভাবে পরিণত করেন, সেটি কিন্তু আমেশাস্পেণ্টাসের বা জরথুষ্ট্র মতবাদের বিপরীত। প্লেটোর 'লোগাস' সেই তত্ত্ব যা সাক্ষাৎ ভগবদ্রাজ্য হ'তে জড়রাজ্যে অবতরণ করতে পারে। প্লেটো এই অবতরণ ব্যাপারটিকে পছন্দ করতেন না, তাঁর বন্ধুরা ইহাকে ভগবদ্বিরোধী ভাব বলতেন ও হীনচক্ষে দেখতেন। প্লেটোর মতে দ্বন্দ্ব সদা বর্ত্তমান, জড়ই ভাবরাজ্যের আবরণমুক্তির প্রতিবন্ধক। দেবতারা আত্মার মর্ত্ত্য-অংশে নিম্মিত হয়ে অস্তিত্বশীল; আত্মার অবিনাশী অংশই বিশ্বাত্মায় পরিণত হয়েছে, প্রতি আত্মা বিশ্বাত্মার অংশ অথবা বিশ্বাত্মা হ'তে উপজাত না হ'য়ে বিভিন্ন মূল উপাদান-সংমিশ্রণ-হেতু উদ্ভূত হয়েছে। সক্রেটিসেরও অনুরূপ মত ছিল। হেরাক্লিটাসে প্লেটোর 'জ্ঞান' ও 'অপরিহার্য্যতা' মিশে একত্রে এসেছে।

এরিস্টটল (Aristotle):—ইনি প্লেটোর মতবাদে নতুন ভাব দিলেন। ইহার Design বাদ:—জগতের মধ্যে একটি design (গঠন-কৌশল) স্বতঃই বর্ত্তমান, এই কৌশল—চিন্তা বা অনুধ্যানের ফল অর্থাৎ 'Reason' বা বিচার-ফল এবং ইহা প্রকৃতির অতীত। যাতে সমস্ত 'Reason'-সঙ্গত হয় তারির জন্য প্রকৃতির ক্রিয়া। আরিস্টটলের 'লোগাস' জড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী, সেখানে ঐ 'অপরিহার্য্যতা' নিশ্চল ও স্থির, কিন্তু Designটি প্রধান। ঈশ্বর সেই চেতন পুরুষ বা 'individual'

(ব্যক্তি) যিনি Design বা কৌশলকে কার্য্যক্ষম কববাব আদি প্রেবণা দেন। তাঁব 'অনুধ্যান' বা চিন্তাবাদেব সঙ্গে জড সত্তাবই সম্বন্ধ জড়েব নয়, ঐ সত্তা = অস্তি—প্রকৃতিব অতীত হযেও প্রকৃতিব নিয়ামক। এই অনুধ্যান ও অস্তি = লোগাস।

গ্রীক দ্বৈতবাদ—'জড' ও 'ঈশ্বব' নিয়ে, জবথুষ্ট্রবাদ—সৎ ঈশ্বব ও অসৎ নিয়ে, এবিস্‌টটলেব-ঈশ্বব, স্রষ্টা নন, তিনি শুদ্ধ-আত্ম-ধ্যান-পবায়ণ-মহৎ (বুদ্ধি) (Self-Contemplating Intelligence), তাঁব দ্বৈতবাদ 'Being' ও 'Becoming' নিয়ে। প্লেটোব মতে Becoming—ইন্দ্রিয়জজ্ঞানসম্ভূত, তাঁব Idea বাদ বা 'ভাববাদই' প্রধান। ভাবই বস্তুব সাব। তিনি দৃষ্টান্ত দেন, যেমন, 'বিন্দু' (Point) লিখে বোঝান যায না, কিন্তু ঐ 'Point' নিয়ে একটি বিজ্ঞান বয়েছে. অতএব 'Point' (বিন্দু) মানস-জ্ঞান বা ভাব (idea) মাত্র।

একলেক্‌টিক্‌স্ (Eclectics খৃঃ পূঃ ৬৯ সম সম সময়ে) :—এই সময়ে এন্টিয়োকাসেব (Antiochusএব) মৃত্যু হয়। 'ঐশ্ববিক ক্ষমতাব সমাবেশ'—সম্বন্ধে মতটি তাঁর গ্রন্থেই প্রথম, ফাইলোব লোগাসবাদেব মধ্যে—প্রবিষ্ট হয়। ইহাই তাঁব 'লোগাস'। তাঁব গ্রন্থ হ'তেই গ্রীসেব বিরুদ্ধে পাবস্থ অভিযানেব ইঙ্গিত পাওয়া যায়—যে অভিযান সিবিয়া ও ঈজিপ্ট পর্য্যন্ত যায়। তাব পব ১৯৩-২১১ খৃষ্টাব্দে এফ্রোডিসিযাস (Aphrodisius) হ'তে আরম্ভ ক'বে অনেকের নাম পাওয়া যায়। এই এলেক্‌জাণ্ড্রিযান সম্প্রদায়েব (Alexandrian Schoolএব) মহাজনেবাই বাইবেলেব প্রাচীন অংশে (Old Testamentএ) দর্শনতত্ত্ব প্রবেশ কবান। পণ্ডিতেবা বলেন যে Old Testamentএব আসল ভাবকে প্রচ্ছন্ন বেখে এই সময়ে Old Testamentএব মধ্যে গ্রীক-মন বিশেষ রূপে সন্নিবিষ্ট হয়। ইতিপূর্ব্বে এবিষ্টবিউলাস (Aristobulus, খৃঃ পূঃ ১৬০) বাইবেলের সঙ্গে তাৎকালিক Science বা জড বিজ্ঞানেব সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা পান। নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধিব জন্য তিনি বাইবেলেব উক্তিকে ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন কবেন। তাঁব 'লোগাস' গ্রীক ভাবাপন্ন। এই লোগাস = বাক্‌রূপী সৃজনী শক্তি। চার্চ্চ বা পুরোহিত সম্প্রদাযেব মতে, তিনিই Alexandrian Schoolএব প্রতিষ্ঠাতা।

সলমন (Solomom) :—Stoicsদেব প্রভাব সল্‌মনে বিশেষ রূপে বর্ত্তমান। সলমনেব প্রজ্ঞা বা 'Wisdom,' ভগবানেব স্ত্রীশক্তি—সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমতী,

তাঁব শাসনেব ফল সর্ব্বত্র উৎকৃষ্টতম। তিনি সর্ব্ব বস্তুতে নব নব রূপ প্রদান কবেন ও মানবকুলেব, বিশেষতঃ ধার্ম্মিকেব, ভাগ্য পবিচালন করেন, কিন্তু সৃষ্টি-কার্য্যে তিনি নির্ব্বিকার—স্রষ্টা বা ভগবানেব সঙ্গে স্বতন্ত্র। তাঁব প্রজ্ঞা=লোগাসেব সমান্তব ক্ষেত্রে অবস্থিত শক্তি। বাইবেলেব The Book of Wisdomএ বাবত্রয় লোগাসেব কথা দেখা যায়। পণ্ডিতেবা এই সব লোগাসবাদে সন্তুষ্ট হন নি, তাঁবা হেবাক্লিটাসেব মতবাদ নিয়ে বেশী আলোচনা কবেছেন।

হেবাক্লিটাসেব 'তাপ'=নিত্য অগ্নি, যা একই নিয়মে দীপ্ত হয় ও নিভিয়ে যায়। ইহা অনেকটা হেসিয়ডেব (Hesiodএব) "The abundant loveliness of the tongue that moves in rhythmic order" জিহ্বাব প্রচুব কমনীয়তা যা ছন্দানুবর্ত্তী হয়ে চলেছে। জিহ্বা=বহ্নিশিখা। (য়াহুদিবা ঈশ্বরকে 'অগ্নিজিহ্ব' বলতেন। সাতদিন ব্যাপী যে উৎসব হত তাব নাম 'পেন্টিকষ্ট'। ঐ উৎসবে প্রজ্জলিত অগ্নিব মধ্যে বাছুব, ভেড়া গম প্রভৃতি ফেলে দেওয়া হত। পবে খৃষ্টানেরাও ঈশ্বরকে অগ্নিজিহ্ব বলতে আবম্ভ কবেন')। Heraclitusএব (হেবাক্লিটাসেব) দর্শনে প্রাকৃতিক নিয়মেব প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক বিধিতে নিত্য সংঘর্ষ বর্ত্তমান, সুতবাং লোগাস=প্রকৃতিব মধ্যে ভূতসমূহেব সংঘর্ষজনিত অনন্ত গতিশীলতা। এই সংঘর্ষে ভেদ সত্বেও পবে মিলন হয়, সংঘর্ষে জীবন আবম্ভ হয়, বোগ দূব হয়, বোগের পব স্বাস্থ্য আসে ও জীবনকে স্ফূর্ত্তিময় কবে। তিনি আবো বলেন যে উচ্চতা ও গভীবতা ব্যতীত সামঞ্জস্য আসে না, যুদ্ধ ভিন্ন শান্তি আসে না, লোগাসই 'ভাগ্য', কিন্তু অন্ধ ভাগ্য নয়, দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম আছে ব'লেই 'লোগাস' বা ভাগ্যই সর্ব্ববস্তুর স্রষ্টা, ন্যায়পবতা (Justice) মানে যুদ্ধ বা সংগ্রাম, যা সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ ন্যায়পরতা—নিবপেক্ষ ও নির্ভুল। এই ভ্রান্তি-শূন্যতাই 'তাপ'—ওতপ্রোত ভাবে প্রকৃতিতে নিত্য-বিদ্যমান-অগ্নিব ফল। এই 'তাপে'ব নিজস্ব বিধি আছে। 'তাপেব' প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত ও ধৃত হয়ে রয়েছে। ঐ বিধিব ছন্দময় বোধ বা জ্ঞান আছে, এই জ্ঞানই লোগাস। গ্রীক সাহিত্যেব ইতিহাসে 'লোগাস'বাদের ইহাই দার্শনিক মত। হেরাক্লিটাসের মতে ভগবান বা অন্য কেহই বিশ্বস্রষ্টা নন, কিন্তু প্রত্যেক বস্তুই যখন স্পন্দনশীল বা গতিশীল, তখন এই স্পন্দনশীলতাই বস্তুর নানা আকার

প্রাপ্তির কারণ, যখন সবই পরিবর্ত্তনশীল ও গতিশীল তখন Becomingটাই সত্য। তাঁর এই গতিবাদ দার্শনিক মহলে খুব আদর পায়। ভাবসমাবেশ করবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল জয়থুষ্ট্রের। তাঁর 'দুষ্ট-ঈশ্বরে' (Evil Godএ) কোন রফার ভাব নেই; প্রকৃতির কঠোর ভাব তিনি সত্য ব'লেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে এই কঠোরতাই প্রকৃতির প্রাণ। তাঁর এই দ্বৈতমতই এনেক্সাগোরাস, প্লেটো ও পরে ফাইলোর মতবাদ গঠনের সহায়তা করেছিল। ধোলো মনীষীদের মতে হেরাক্লিটাসের 'লোগাস' ও বৈদিক 'ঋত' একার্থবোধক। উক্ত মনীষীরা বৈদিক 'ঋত' ভাল বোঝেন নি। 'ঋত', 'লোগাস' অপেক্ষা আরো অনেক কিছু বোঝায়। 'ঋত' ও 'লোগাস'-উভয়ই শৃঙ্খলাবোধক, এই হিসাবে উভয়ের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। যদিও লোগাস=word বা বাক্, তবু 'ঋত', একাক্ষরী-ব্রহ্ম=ওঁকার, এ ভাব 'লোগাসে সেই। 'ঋত' ও 'সত্য-এই দুটি কথা পৃথক ভাবে ব্যবহৃত হলেও, ঐ দুই কথা একসঙ্গে যুক্ত হলে দুটিতে একটি বোঝায়। ছোলার দুটি দানা পৃথক দেখালেও, একসঙ্গে যুক্ত থাকে। পৃথক হয়েও যুক্ত থাকে এই ব্যাপারটি 'ঋত'। দুটি দানার গুণ ও আকার একই। ঋত শৃঙ্খলার স্বরূপ-ভাব, শৃঙ্খলা প্রসূত হয় 'ঋত' হ'তে। সোমস্তুতিতে (ঋগ্বেদ নবম ম-দ্রঃ) বলা হয়েছে যে সোমই দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা, বিপ্রদের মধ্যে ঋষি ইত্যাদি, এই যে একেরই বিভিন্ন ভাব—ইহাই 'ঋত'। সোম 'ঋতস্য গোপা'- 'ঋতের রক্ষা কর্ত্তা, তাঁরই মাথায় বরুণদেবের জিহ্বাগ্র "ঋতস্য তন্তুর্বিতত পবিত্রে', ঋতের তন্তু পবিত্রোপরি বিস্তৃত। এই ঋতের ভাব 'লোগাসে' নেই। ঋতের তন্তু-একেরই ভিন্ন প্রকাশ। "তুমি ঋত ব'লে থাক, সত্য বলে থাক"—"ঋতং বদন" "সত্যং বদন", ঋত বাক্য=সত্যবাক্য, কিন্তু ঠিক উপযোগী শৃঙ্খলাযুক্ত বাক্য। 'ঋত' ভিন্ন সত্য স্পষ্ট হয় না। ঋতসত্য, রসস্বরূপ, উগ্র, মহৎ ও ঋতসত্যের রসধারা সোমরূপে সর্ব্বত্র ক্ষরিত হচ্ছে— সোমই রসস্বরূপ ইত্যাদি। এই একেরই নানা প্রকাশরূপ সমগ্র ব্যাপারটিই 'ঋত'। সোম কর্ত্তৃক 'ঋত' বাররার নবজগতে প্রকাশিত হন। এই অবতরণ প্রণালীটিও ঋত—ঋতই অবতরণ করেন। সোম=কারণার্ণব-নিহিত-শক্তি=কারণার্ণবের কেন্দ্র-শক্তি বা আনন্দ। পুরাণেও দেখি,

সমুদ্র মন্থনে সোমের উৎপত্তি। এ সব ভাব 'লোগাসে' নেই। গায়ত্রী "ছন্দসাংমাতঃ"—ছন্দ প্রসূতি; হেরাক্লিটাসের 'লোগাসে' ছন্দের কথা আছে, কিন্তু গায়ত্রীর ভাব নেই, 'গায়ত্রী বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ'—এ ভাবেরও অভাব, 'এষা গায়ত্রী অধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠাতা'—এ ভাবও স্পষ্ট নেই। ব্রহ্মচারী বালকই গায়ত্রীর (সাবিত্রী মন্ত্রের) অধিকারী—এই ব্রহ্মচর্য্য-পালনের ভাব নেই। . ঋত=ধর্ম্মস্বরূপ—এ ভাবও অন্যত্র পাওয়া দুষ্কর। বৌদ্ধমতে, ধর্ম্মই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাই জগত-কারণ প্রাণের সারতত্ত্ব। য়াহুদিদের ছিল হুকুমবাদ—ঈশ্বরের হুকুমে জগতের সৃষ্টি। আলেক্জেণ্ড্রিয়ার য়াহুদিরা এই হুকুমবাদের নাম দেয় 'মেমরা' (Memra), ফাইলো ছিলেন প্রতিভাবান গ্রীকভাবাপন্ন য়াহুদি। তিনি 'লোগাসকে' মেম্‌রার সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। ফাইলো খৃষ্টান ছিলেন না, কিন্তু খৃষ্টান ছিলেন জন (John), যাঁর কথা 'জোহান লিখিত সুসমাচার' নামে পরিচিত। তিনি 'লোগাস' বা Word (বাক্) কে রক্ত মাংস দিলেন, "Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of Grace and Truth"—'বাক্ শরীর ধারণ করলেন, আমাদের মধ্যে বাস করলেন; তাঁর মহিমা আমাদের দৃষ্টি-গোচর হল, পরম পিতা হ'তে একমাত্র জাত সেই মহিমা সত্যময় ও করুণাময়'। খৃষ্টানদের 'লোগাস'. আমাদের 'মনু' (মানব বা সমষ্টি মানুষ) খুব জোর জীবাত্মার মত, "the Logos before Incarnation was Man" 'অবতীর্ণ হবার পূর্ব্বে-'লোগাস' মানবরূপে (জীবাত্মা) রূপে ছিলেন। যিশু এই লোগাসের অবতার। ('যজ্ঞ-কথা' দ্রঃ)।

জরথুষ্ট্র ধর্ম্মের 'মিথ্র'-দেবতা, মানব-ত্রাতা ('Saviour'), তিনি আবার 'অহুর মজদ্' ও মানবের মধ্যস্থ ('Mediator'), তিনি পাপ-ক্ষালন কর্ত্তা (Redeemer'), করুণাময় তিনি! প্লেটোর মতকে সময়োপযোগী ক'রে যে মতের উদ্ভব হয়, তার নাম Neo-platonic বাদ; একটি ত্রিভুজ ছিল তার প্রতীক।. 'One', 'Logos', 'World-Soul',—'একম্' 'বাক্', 'বিশ্বমন'—এই ত্রিতত্ত্ব ঐ বাদের। ঐ ত্রিভুজের বাহু তিন, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ও অসমান। হিন্দুর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—তিনে এক,

একে তিন,—ভেদমাত্র বহু হিসাবে। তন্ত্রের ত্রিশক্তিও তাই, খৃষ্টান Clement ও Origen (ক্লিমেণ্ট ও অরিজেন) ঐ ত্রিতত্ত্বকে করলেন 'Father', 'Son', 'Holy Ghost'—'পিতা', 'পুত্র', 'পবিত্রাত্মা'। এইবারে হল সম ত্রিবাহু—"The Persons are of the same Essence Power and Eternity. Each is God"—'তিনে একই সত্তা, একই শক্তি, তিনই অসীম, প্রত্যেকেই ঈশ্বর'। যিশুর আর একটি নাম হল 'Mediator' (মধ্যস্থ), তিনি Saviour ও Redeemer দুইই।

নিওপ্লেটোনিকবাদের (Neo-platonism এর) জন্মস্থান মিশরের আলেক্জান্ড্রিয়ায়, খৃষ্টীয় ৩য় শতকে আলেক্জান্ড্রিয়ান্ সম্প্রদায়ের ঈশ্বর (Alexandrian School এর God) সর্ব্বগুণ বিবর্জ্জিত, সর্ব্বচিন্তা বিবর্জ্জিত নিরবয়ব পুরুষ, সকল বস্তুর ('Nons' এর) ছাঁচ সেই 'পুরুষ' হ'তে নির্গত হয়েছে ('Archtype of all existing things'), ইহা একেবারে চার্চ-বিরোধী মত। উক্ত সম্প্রদায়ে ঐ মত-সাধনার নাম 'Ecstasy' বা আনন্দ। সমস্ত খৃষ্টান সমাজ তাঁদের সমগ্র শক্তি দিয়ে এই মতকে গোড়া হ'তে দমন ক'রে এসেছেন। প্লটিনাসের 'Great Soul' (মহৎ বা মহান আত্মা) অচঞ্চল-মহা-নিস্তব্ধতার মধ্যে ভাসমান।

সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ভারত হ'তে সমস্ত গৃহীত হলেও, গ্রীক্ মন, পুরুষ-প্রকৃতিবাদ অথবা আর্য্যের যে কোন দ্বৈতবাদ, গ্রহণ করতে পারে নি। এমন কি প্লেটোর 'ভাববাদ' ও-নয়। 'কাম' ও 'ঈক্ষণ'—ঐ-দুই কথার মধ্যে যে অনুকম্পার ও করুণার ভাব আছে, তা' 'ভাববাদে' নেই। ইহার একমাত্র কারণ, গ্রীক মন বহিঃপ্রকৃতির দিক্ দিয়ে সব বোঝবার চেষ্টা করেছে—গ্রীক্ মন বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন; তা ছাড়া ব্রহ্মচর্য্যের ও সাধনার অভাব। গ্রীস অথবা কোথাও গায়ত্রীর ভাব নেই, যে বাক্‌দেবী অম্ভৃণ ঋষির কন্যারূপে এসেছিলেন, 'দেবী-সূক্তে' যাঁর বাণী প্রত্যেক হিন্দুর, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর প্রাণসঞ্চারিণী শক্তিরূপে বর্ত্তমান, সেই বাক্‌দেবীরও ভাব নেই। ঐ সব দর্শনশাস্ত্রে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এ ভাবও নেই। খৃষ্টানের 'Father' পিতা—'Maker' বা স্রষ্টা, কিন্তু তাঁর পুত্র 'Begotten' অর্থাৎ গর্ভজাত; 'Father' এখানে 'Begetter'—পুত্র সম্বন্ধে তিনি 'Maker'

নন। ফাইলোর, ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় ('arovus'), আচারাতীত, অস্তিমাত্র, নামহীন, বোধহীন, দেশকালাতীত, নিত্য, আত্মপূর্ণ ('Self-sufficient'); কিন্তু তার পরেই তিনি বলছেন যে ঈশ্বর, সর্ব্বদোষ ও সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়, সর্ব্ব-কল্যাণময়, সর্ব্বমনচারী ও নিশ্চল, জড়ের মধ্যে তাঁর কার্য্যকরী শক্তির দ্বারা তিনি বিশ্ব সৃজন করেন। ছোট ছোট দেবতারাই পাপতাপের কারণ। ফাইলোর 'লোগাস' এই সমস্তই বোঝায়। এই 'লোগাসের' দুই অংশ। নিষ্ক্রিয় ঈশ্বর অসীম, বিশ্ব সসীম, অতএব সসীমের উপর ক্রিয়াশক্তি = লোগাসের অর্দ্ধ—স্ত্রীশক্তি। এই স্ত্রীশক্তির নাম Sophia (সোফায়া বা সোফিয়া)। [এই Sophia হ'তে এসেছে ইংরাজি Theosophy (থিয়জফি) কথাটি]। ঐ সব ছোট ছোট মাঝের দেবতা, Sophia ও নিষ্ক্রিয় ঈশ্বর—এই কয়টির উপর ঐ লোগাস-বাদ স্থাপিত। প্লেটোর 'সুন্দরের' কল্পনা ও গতিবাদ ফাইলোর মতকে পুষ্ট করেছে। প্লেটোর 'ভাব-বাদের' 'ভাব'—অজ্ঞাত। প্লেটোর Idea (ভাব) ও এরিষ্টটলের Form প্রায় একার্থবোধক = বস্তুর স্বরূপ। ফাইলোর মতে ভাব (Idea) ঈশ্বরের চিন্তা বা ভাবনা হ'তে উদ্গত। বৌদ্ধ 'প্রজ্ঞাত্মা' এখানে 'প্রজ্ঞামাতা'। ফাইলোর 'লোগাস' হচ্ছে আদি জীব, অন্য জীব যার ছায়ামাত্র।

এই প্রকারে ভারতের 'বাক্‌দেবী' সর্ব্বত্র বিচরণ করেছেন, তাঁকে যিনি যে ভাবে নিয়েছেন তাঁর কাছে তিনি সেই ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছেন—তাঁর 'নৃশংস' মূর্ত্তিকে শুধু অন্যত্র লোকেরা অন্য ভাবে দেখেছেন। বেদে দেখতে পাই যে, যে সোম ঋতের রক্ষাকর্ত্রী সেই সোমকে দেবী গায়ত্রী এনেছিলেন, সেই সোম গন্ধর্ব্বলোকে, আকাশে, দ্যুলোকে, ভূলোকে দীপ্তিমান—চিরযৌবন তাঁর, এবং সেই সোমই মর্ত্ত্যে যজ্ঞে বিনিয়োগ হয়, ওষধি হ'তে বার ক'রে সোমরস পীত হয়—"ব্রহ্মাণো বিদুঃ ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন"—'যে ব্রহ্মপরায়ণ সাধক সোমের গূঢ় রহস্য জানেন, তিনি জানেন যে সোম কেহই পান করতে পারেন না—' "নতে অশ্নাতি পার্থিবঃ"। অন্য স্থানে যজ্ঞ ও যজ্ঞাগ্নির কথা আছে, পান-ভোজনের কথা আছে, ঐ ভাব নেই, আছে 'Word was made flesh', নেই রক্তমাংস দেহধারী বাক্‌রূপী অস্তৃণ ঋষির মেয়ের মত জোরের

বাণী—"অহং এব বাত ইব প্রবামি, আরভ্‌মনা ভুবনানি বিশ্বাঃ··· ।" এত বড় সাহস, এত বড় অনুভূতি অন্যত্র হয়নি। তাই বেদ-চর্চ্চারত বহির্মুখী খোলো পণ্ডিতদের 'দেবী সুক্ত'টি নজর এড়িয়ে গেছে, আর নজরে পড়েছে 'পুরুষ-সূক্ত' যেটির সম্পর্ক বিশ্বের সঙ্গে! শক্তি বা শক্তিকে স্ত্রীশক্তি রূপে বর্ণনার কথা আছে, ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞান—এই ত্রিশক্তি হ'তেই সব, এ ভাব নেই; আদর্শানুরূপ জীবন যাপন—'Being and Becoming', এ ভাবও নেই। সাধক ভক্ত সব যায়গায় আছেন ও হয়েছেন বরাবর, আছে তাঁদের কাতর প্রার্থনা, আছে তাঁদের আর্ত্তির কথা, নেই তার সঙ্গে একাত্ম অনুভব করার ভাব, যা আছে ভারতের দ্বৈতভাবের (ভক্তিমার্গের) মধ্যেও!

বিচারপ্রণালী ও অন্যান্য কথা

আপনারা যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, তার জন্য আজ সংক্ষেপে কতকগুলি পুনরুক্তি করতে হবে।

সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান আহরণের দুরকম বিচারপ্রণালীর ধারা আছে। বিশেষ বিশেষ বা এক একটি বস্তু নিয়ে বিচার ক'রে তাদের মধ্যে একটি সাধারণ সত্য আছে দেখা যায়। এই প্রণালীতে বিচার ক'রে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর ভাবে শ্রেণীবিভাগ করতে করতে আমরা অগ্রসর হই, যদি ঐ করতে করতে কোন স্থানে ঐ সত্যের ব্যতিক্রম দেখি, আমরা বলি 'এটার নিয়ম ঐ রকম'। সাধারণ সত্য হ'তে আমরা সার্ব্বভৌমিক সত্যে উপনীত হই। যেটি বারবার পরীক্ষা ক'রে একই ফল প্রদান করে, আমরা তাকে বলি 'প্রাকৃতিক বিধি'। এই এক রকম বিচার প্রণালী। অপর প্রণালী হচ্ছে বস্তুর স্বভাব হ'তে অর্থাৎ তার নিজ প্রকৃতি হ'তে তথ্য নিরূপণ করা। প্রথম প্রণালীকে আমরা 'বৈজ্ঞানিক প্রণালী' বলি। অধ্যাত্ম সত্য নিরূপণ করতে হ'লেও আমরা এই প্রণালী অবলম্বন করি। এই রকমে আমরা ভগবানে মানবীয় ভাব অর্পণ করি, তিনি তখন একজন 'ব্যক্তি' বা 'পুরুষ' (Personal God)=সগুণ ব্রহ্ম। ইনি চৈতন্যময়। এখানে জড় ও চেতনকে পৃথক ক'রে দেখা হয়েছে। ঐ ভাবে সার্ব্বভৌমিক সত্যে উপনীত হ'তে গেলে, ঐ রকম একটির পর

একটি ধ'রে বিচারের ফলে, আমরা জড়কে পৃথক সত্তা মেনে নিয়ে অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বকে আলাদা রেখে (বাদ দিয়ে) কেবল একটি অর্থাৎ চেতন সত্তার কথাই বলি। এই প্রণালীতে এই দোষ বর্ত্তমান। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা ধরা যাক্। পাথর উর্দ্ধে ছুড়ে দিলে মাটিতে পড়ে। এক সময়ে ধোলো দেশের অজ্ঞ লোকেরা মনে করত যে ওটা ভূতের কায। পাথর ও পৃথিবী, এই দুই জিনিষের প্রকৃতি হ'তে যে সত্যে উপনীত হওয়া গেল, তার নাম দেওয়া হল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি' অর্থাৎ বোঝা গেল যে পৃথিবী আকর্ষণ করে, পাথরও আকর্ষণ করে, পাথর ছোট, তাই পাথর পড়ে। ইহাকে 'Law' বা প্রাকৃতিক বিধি বলা হল। এই বিচার ধারা নির্দ্দোষ নয়, কিন্তু ভূতবাদের চেয়ে অনেক ভাল। ঐ রকম বিচার প্রণালী যে নির্দ্দোষ নয় তা স্বামীজি বহু পূর্ব্বে বলেছেন, আজ বৈজ্ঞানিকেরা ইহা প্রমাণ করছেন। স্বামীজির জ্ঞান যোগ আপনাদের দেখতে বলি। অজানা বিষয় বুঝতে হ'লে একটা সম্ভবপর-হেতু (Hypothesis) ধ'রে নিতে হব। ঐ সম্ভবপর-হেতু সহায়ে কোন বস্তু কতক প্রমাণিত হ'লে, তখন সেটি হয় একটি Theory বা 'বাদ' (উপপত্তি)। ঐ বাদকে তথ্য (fact) মনে করাই ভুল। বৈজ্ঞানিকেরা কতকগুলি তথ্য নেন ও তাদের প্রকৃতি ধ'রে একটা 'প্রাকৃতিক-বিধি' দেখতে পান। ঐ রকম বিচার ফলে ক্রমাগত নতুন নতুন তথ্য এসে পড়লে আগেকার Theoryটি বদলে যেতে পারে।

মানবীয় গুণকে খুব বাড়িয়ে দিয়ে যে চৈতন্যময় পুরুষকে বুঝি ও তাঁর সম্বন্ধে বলি যে তাঁর ইচ্ছা হ'ল আর সৃষ্টি হ'ল—যেমন বাইবেলের সৃষ্টিবাদ—তাতে মেনে নিতে হয় যে, 'শূন্য' হ'তে অর্থাৎ সৃষ্টির উপকরণের অভাব সত্বেও, সৃষ্টি হল, ইহাও মেনে নিতে হয় যে কারণ-পরম্পরা ও তার ফল, কারণ-পরম্পরার পরিণতি নয় অর্থাৎ কারণ ও কার্য্য দুটি পৃথক সত্তা! আজ ধোলো প্রমাণ করেছেন যে 'ফল' কারণেরই আর এক রূপ। এই চৈতন্যময় পুরুষ ও সৃষ্টিবাদ—শূন্য হ'তে সৃষ্টি—ইহাই ধোলো-একেশ্বরবাদ (Monotheism)।

হিন্দুর 'ইচ্ছাবাদ' অন্যরকম। ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞান—এই তিনের মধ্যে 'ইচ্ছা'টি সৃষ্টির উপকরণ সাপেক্ষ। ছোট ইচ্ছা বড় ইচ্ছার অধীন থাকে।

ছোট ইচ্ছা বড় ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়, ইহা আমরা নিত্য দেখছি। "সে অপার ইচ্ছা সাগর মাঝে, অযুত অনন্ত তরঙ্গ বাজে, কতই রূপ কতই শক্তি কে করে গণন!" এই 'ইচ্ছা'কে সমুদ্র বলা হয়েছে, এই সমুদ্রে তরঙ্গ, রূপ, শক্তি আদির খেলা হচ্ছে। সৃষ্টি ব্যাপার চলেছে, তারির মধ্যে রয়েছে ওঠানামা (তরঙ্গ), গড়া, ভাঙ্গা, নানারূপ অসংখ্য শক্তির খেলা। ইহাই ইচ্ছা সমুদ্র (অভিব্যক্তচিৎ)। ইহাই বৃহত্তম ইচ্ছা, এই ইচ্ছার অধীন সব। কারণ এই ইচ্ছার অন্তর্গত অন্য সব ইচ্ছা, এই ইচ্ছাই সমষ্টি-ইচ্ছা। সকল রকম ইচ্ছা, ছোট বড়, শেষে ঐ বৃহত্তম ইচ্ছার মিশে যায়। কর্ম্মবাদ শিক্ষা দেয় যে কর্ম্মই সৃষ্টির কারণ, এবং ইচ্ছাই কর্ম্মের মূল। অতএব সৃষ্টির মূলে ইচ্ছা বর্ত্তমান। এই ইচ্ছা সুতরাং সর্ব্বপরিচালক বা সর্ব্বপরিচালিকা শক্তি। বিশ্বের বন্ধন মুক্তির জন্যই ননাভাবে এই শক্তির পরিচালনা হয়। সকল ইচ্ছাই সৃষ্টি কার্য্যের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে, এই বড় ইচ্ছাই কেবল সৃষ্টির মূলে। ইচ্ছার দরকার সৃষ্টির জন্য। ইচ্ছাও নেই, সৃষ্টিও নেই। ইহাই হিন্দুর 'ইচ্ছাবাদ'। সন্তান সম্পর্কে মা স্বাধীন, কিন্তু তাঁর সমস্ত কার্য্য সন্তানের মঙ্গল সাপেক্ষ। সেই রকম এই 'ইচ্ছা' স্বাধীন, কিন্তু 'ক্রিয়া' ও 'জ্ঞান' বিশ্বকল্যাণে নিয়োজিত। আমরা 'স্বাধীন ইচ্ছা' 'স্বাধীন ইচ্ছা' ব'লে অনেক তর্ক তুলি। আমাদের এই স্বাধীন ইচ্ছা আকাশ কুসুমের ন্যায়। গরুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলে দড়ির দৈর্ঘ্য হিসাবে গরুর গতিবিধির স্বাধীনতা থাকে, তার বেশী নয়। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাও ঐ রকম, সীমার মধ্যে নড়া চড়া।

আমাদের নিজেদের দিক ধরা যাক্। আমার দেহ আছে, মন আছে, অহং বোধ আছে। রজ্জুতে সর্পভ্রমের উদাহরণ সর্ব্বজনবিদিত। রজ্জু বোধটি যখন থাকে, সর্পবোধটি থাকেনা তখন, আবার যখন সর্পবোধটি প্রবল হয়, তখন রজ্জুবোধটি থাকে না। জগৎ বোধ যখন দৃঢ় হয়, জগতাতীতের বোধ থাকে না, যখন আবার জগদাতীতের বোধ দৃঢ় ভাবে আসে, তখন জগৎ বোধ থাকে না। সাধারণ সত্য যাকে বলা হয়, তার সঙ্গে তুলনা ক'রে বিশেষ বিশেষ বস্তুর মধ্যেও যদি একই সত্য দেখি, ঐ ঐ বস্তুর সম্বন্ধে তাকেই আমরা সাধারণ সত্য ব'লে গ্রহণ করি। মানুষ সম্বন্ধেও বলা যায় যে মানুষ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুইই; দেহমন ও চৈতন্যসত্তা এই দুই নিয়ে মানুষ। মানুষ

"Personal and Impersonal" ব্যক্ত ও অব্যক্ত, সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই—সসীমত্ব ও অসীমত্ব দুই নিয়ে মানুষ। জড়ের অভিব্যক্তি—শরীরী বা দেহধর্ম্ম-বিশিষ্ট এবং অহং-বোধরূপ-চেতনসত্তা দুইই। জড় ও চিৎ—এই দুয়ের গ্রন্থি—চিজ্জড়গ্রন্থি। ঐ গ্রন্থিই জৈবভাবের বা জৈবিক সংস্কারের কারণ।

দুরকম—(অনুলোম ও বিলোম, Analytical and Synthetical) প্রণালীতেই ভারত বিচার করেছেন। সহজ কথায় একটি নীচের থাক হ'তে উপরে ওঠার প্রণালী, অপরটি সর্ব্বোচ্চ থাক্ হ'তে ক্রমশঃ নীচে আসার প্রণালী। দুই প্রণালী থাকলেও আর্য্যের বিশেষত্ব বিলোম প্রণালীতে। এই প্রণালীই গোড়ার কথা। অন্যান্য স্থানে গোড়ায় বিলোম প্রণালীর ভাব কোন কোন স্থানে দেখা যায়, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত।

সকল সভ্য জাতির মধ্যে ঈশ্বরবাদ আছে ও সেই সেই বাদের শাস্ত্রও আছে। ঐ সমস্ত শাস্ত্র মতে, গোড়ায় পবিত্র ভাব ছিল, পরে সেটি বিকৃত হয়, মানুষ গোড়ায় সরল ও পবিত্র ছিল। আদাম ইভের কথা ইহার প্রমাণ। স্বর্গচ্যুতি হয়েছিল পাপে। এটা উপর হ'তে নীচে নেমে আসারই কথা। পাপভাবাক্রান্ত হওয়াতেই জলপ্লাবন হয়। জলপ্লাবনে ধরা ডুবে যাওয়ার কথা সর্ব্বদেশে আছে। পাপের অত্যাচারে সোডাম নগর ধ্বংস হয়, তাঁর ইঙ্গিত বাইবেলে আছে ও ভবিষ্যৎ আশঙ্কার কথাও বলা হয়েছে। এইরকম যত আখ্যান আছে, সমস্তই পাপের ফল বলা হয়েছে অর্থাৎ পাপ পরে এসেছে।

[মোহেন-জো-দাড়ো (বা-দারু) আবিষ্কারের পর, অনেকে বলছেন যে জলপ্লাবনের কাহিনী ভারত হ'তেই সর্ব্বত্র যায়। সিডিন নগর ধ্বংস হয়ে মৃত সাগরে (Dead Sea তে) পরিণত হয় ও সেই সময়ে গোবি সাগরও মরুভূমি হয়ে যায়। কথিত আছে ক্রেটাবজন নামে কোন ব্যক্তি স্তাম্বুল-বাস (Constantinople-এর বাসী) মেহমেদ কমনেনাস (গ্রীক্ সাম্রাজ্যের অধিপতি) কে, এক বিরাট-চীন তকলামাকান বালুর-সাগরের কথা লিখে পাঠান, লেখেন যে ঐ বালুকার নীচে সুগন্ধ মাছ পাওয়া যায় এবং উক্ত সাগর হ'তে তিন মাইল পথ অতিক্রম করলে একটি পাহাড় দেখা যায়, ঐ পাহাড় হ'তে অনবরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরের ডেলার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে ও পাথরগুলি গড়াতে গড়াতে ঐ বালির সমুদ্রে এসে পড়ছে। কমনেনাস, এলিসিয়াস নামেও পরিচিত ছিলেন।]

উপব্ হ'তে নীচে আসাব কথা বর্ত্তমান ধোলো সভ্যতা বা ধোলো বিজ্ঞান, অস্বীকাব কবেন। ধোলো বৈজ্ঞানিক-মন স্বতই বলে যে যদি পবীক্ষাগাবে পাঁচটা জিনিষ মিশিয়ে জীব সৃষ্টি কবা যায়, তাহলে সৃষ্টিব কাবণ দৈবোৎপত্তি, ইহা মানবাব কোন সার্থকতা থাকে না। চূণে হলুদে মেশালে লাল হয়, একটা জিনিষেব সঙ্গে আব একটা জিনিষ মেশালে তাপ হয—এই বকম ক'বেই জীব সৃষ্টি কবা যায পবীক্ষাগাবে। বিভিন্ন বস্তুব যথাযথ সংযোগে ও সমাবেশে, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব হ'যেছে তাঁবা দেখেছেন। কিন্তু ঐ সংযোগ ও সমাবেশেব ফলে ইহাই ববং প্রমাণিত হয যে প্রকৃতি ঐ বকম সংযোগ বা সমাবেশ স্বীকাব করলেই অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিধিতেই, জড়ে জীবনেব চিহ্ন দেখা দেয়। ধোলো-মন চিৎ ও জড়কে আলাদা দেখছে। ধোলোব, সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে ধাবণাব গোলেই, যুক্তিতে গণ্ডগোল এসেছে। একজন শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বপ্রকাব গুণসম্পন্ন, সর্ব্বঐশ্বর্য্যপূর্ণ Personal God এব ধাবণাই ধোলো-যুক্তিব মূলে। আর্য্যেব ধাবণা, যদি নীচেব দিক্ হ'তে ধবা যায়, এই 'অহং'ই অতি-বিস্তাব লাভ ক'বে সর্ব্বব্যাপী হয়ে আছে এবং গন্ধ, রূপ, বস আদিব মধ্য দিয়েই 'অহং' নিজেকে অসংখ্য বিভক্ত দেখছে; 'আমিই স্রষ্টা, আমিই সৃষ্টি'—'বিকাশবচনা'ই আমাব সৃষ্টি। যখন 'সর্ব্ব' বোধ নেই, তখন ব্যাপ্তিব বোধ ও নেই, আছে মাত্র 'অহং'—দ্বন্দ্বাতীত—আনন্দ। আনন্দ হ'তেই সৃষ্টি। সৃষ্টি মানে শক্তিব বচনা। পাঁচটি মিশিয়ে আব একটিব উৎপত্তি, বিভিন্ন প্রকাবের সংযোগ, বিভিন্ন অবয়ব, এসব কিসে হয়? স্বীকাব কবতে হবে যে ঐসব শক্তিব বচনা; দেহাত্ম বা ইন্দ্রিয়াত্মবোধেব জীব, বচনা কবতে পাবে না। জৈব-সংস্কাব নিয়েও জৈব-সংস্কাবেব ভিত্তিতেই ধোলো-বিজ্ঞানেব উদ্ভব ও ঐ বিজ্ঞান দণ্ডায়মান। তাই তাঁবা এখনও গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুবে বেড়াচ্ছেন।

ঈজিপ্ট, গ্রীস, রোম আদি স্থানেব সভ্যতা অথবা সেমিটিক আবব সভ্যতা তথা মূব সভ্যতা—সমস্তই বহির্মুখী। ঐ সব সভ্যতাব ফল বর্ত্তমান ধোলো সভ্যতা। বহির্মুখী ব'লেই এই সভ্যতায় অনুলোম বিচাব প্রণালী প্রধান। যে সব মহাপুরুষদেব জীবন-প্রভাব ঐ সব জাতিতে সময়ে সময়ে দেখা দিয়েছে, তার সংখ্যা এত অল্প ও বহির্মুখী-জাতিগুলিব

বহির্মুখী-ভাব এত প্রবল যে সেই সব মহাজনদের অন্তর্মুখীভাব উক্ত বহির্মুখী-ভাবপ্রবাহে ভেসে গেছে, জাতিগুলিও স্থিরচিত্তে তাঁদের ভাব ধারণ করবার উপায় আবিষ্কারে সমর্থ হন নি। ধোলো-ব্যক্তিত্ববাদের নীতি (Individualism) ধোলোকে এখন এমন অবস্থায় এনে ফেলেছে যে তার তাড়নায়, শুধু সমস্ত ধোলো জাতি বিক্ষুব্ধ হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাতিতেও অশান্তি এসেছে। রুষ সব পুরাতন ঝেড়ে ফেলে নব ভাবে জাগরিত হচ্ছে। রুষ রাজনীতি ক্ষেত্রে ধোলো Collectivism বা সাম্যনীতিবাদ, যা ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবারণ করতে চায়, সম্পত্তিকে সর্ব্বত্র সমভাগে বিস্তৃত দেখতে চায় ইত্যাদি নীতি গ্রহণ ক'রে, সমাজ গঠনেও, ঐ নীতি প্রয়োগ করতে বসেছেন মনে হয়। বিবাহ ও করব না, ব্রহ্মচর্য্য ও করব না, বিবাহপ্রথা তুলে দোবো—এই সব নীতি অন্তর্মুখী ভারতে—শুধু ভারতে কেন, এশিয়ায়—চলবেনা। চামড়ার আকর্ষণকে প্রধান স্বীকার ক'রে, চামড়ার আকর্ষণকে ভালবাসা নাম দিয়ে চামড়ার আকর্ষণের উপর যদি সমাজ খাড়া করা হয়, তা হলেও, চামড়া-নীতি রক্ষা করবার জন্য, ঈর্ষ্যা-প্রতিযোগিতা হ'তে বাঁচবার জন্য একটা সমাজ-শক্তি দরকার, অথবা 'ষ্টেট্' বা রাজশক্তি সহায়ে জাতীয় শক্তির দরকার. সে ক্ষেত্রে কোথায় থাকবে 'ব্যক্তিত্ব' বা 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা'-র আধুনিক বুলি? লাইকারগাস-নীতির ফল আমরা দেখেছি; বৌদ্ধ-প্লাবনেও, হিন্দুসমাজকে একটি মাত্র নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা, ও তার ফলও আমরা দেখেছি।

সকল ক্ষেত্রে ধোলোর বিচার-প্রণালী অনুলোম। কয়েক বৎসর মাত্র, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, ধোলো আরম্ভ করেছেন বিলোম, কিন্তু সেখানেও উদ্দেশ্য স্বার্থ, সেখানেও ঐ প্রণালীটি বস্তু-জগতের ঊর্দ্ধে যায় নি। ধোলো ঠেকে শিখছেন। পূর্ব্বে সেমিটিক্ প্রভাবাচ্ছন্ন ধোলো ভাষা-তত্ত্ববিদেরা সব জায়গায় সেমিটিক প্রভাব দেখতেন, এমন কি বৈদিক অক্ষরেও সেমিটিক্ আকার দেখতেন। পহ্লবী ভাষার উপরও ঐ রকম সেমিটিক প্রভাব দেখতে গিয়ে দেখলেন যে পহ্লবী ভাষার এমন একটি বিশেষত্ব আছে যা সেমিটিক প্রভাব-প্রসূত নয়। তাঁরা ঠেকে শিখলেন। পণ্ডিতেরা প্রমাণ করলেন যে খলদে ভাষা, সিরিয়ার ভাষা, আরব ভাষা, হিব্রুভাষা,

সামারিটান ভাষা, ইথিওপিয়ার ('সূর্য্যদগ্ধদেশ'=ইজিপ্ট বা আফ্রিকার) ভাষা ও প্রাচীন ফিনিসিয়া আদি জাতির ভাষা সেমিটিক্, কিন্তু তাঁরা আশ্চর্য্য হ'লেন দেখে যে পারসীক ধর্ম্মে বৈদিক প্রভাব, কিন্তু ভাষায় সেমিটিক প্রভাব, বাবিরুষেরা (বাবিলোনিয়নেরা) পারসীক ধর্ম্মাবলম্বী হলেও, তাঁদের ভাষায় আর্য্যপ্রভাব; সেই রকম প্রাচীন সুমের ও আক্কাদদের আদিম অবস্থায় স্পষ্টতঃ বেদের ভাষা। এই রকম অনুলোম ক্রমে বিচার ফলে পণ্ডিতেরা ঠিক্ করলেন যে ভাষা সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল নিশ্চয় একটা সাঙ্কেতিক প্রণালী। তাঁরা ইজিপ্টের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলেন যে সেখানে ও অন্যান্য স্থানে ছিল Heiroglyphic বা সাঙ্কেতিক ভাষা প্রথমে। হিব্রুভাষায়—ষাঁড় হলেন 'আলেফ', ইজিপ্টে হলেন 'শ্বেতশকুণী' (Ibis)। এই আলেফ হয়েছেন ইংরাজির 'A', 'B' হচ্ছেন—ইজিপ্সিয়ানদের সাঙ্কেতিক ভাষায়—ভেড়া। ষাঁড়, ভেড়া এঁকে দেখান হত। হিব্রু ভাষায় 'B' হলেন বাড়ীর কাঠাম (এঁকে দেখান হত)। এই রকম প্রতি অক্ষরের এক একটি সাঙ্কেতিক অর্থ আছে। ষাঁড়, ভেড়া, হাতের চেটো, বাতাস চলাচলের জন্য তখনকার জানালা দরজা আদি গঠনের আদর্শ হ'তে ইজিপ্ট আদি দেশের অক্ষরোদ্ভব। বণিক ফিনিসিয়ানরা মিশরে এসে মিশরের লিপি-কৌশল শিখলেন। মিশর ও বাবিলন—এই উভয় সভ্যতার প্রভাব তাঁদের উপর পড়ে। প্রাচীন গ্রীক ভাষার বর্ণমালা ঐ ফিনিসিয়ানদের অবদান। বহির্মুখী জাতির ভাষার সৃষ্টি হল, ষাঁড় ভেড়া প্রভৃতি স্থূল সঙ্কেত হ'তে।

পণ্ডিতদের মতে, 'দেব-ভাষা' নামে প্রাচীন ভাষার মার্জ্জিত বা সংস্কৃত সংস্করণই সংস্কৃত ভাষা। ভাষার উদ্দেশ্য মনের ভাব প্রকাশ করা। পাখীর স্বর-বৈচিত্র্যই পাখীর সাঙ্কেতিক ভাষা, সেই ভাষাতে সে নিজের প্রিয়কে ডাকে, সেই ভাষাতেই সে বিরহ জানায়। হর্ষ বিষাদের উচ্ছ্বাসে জানায় মনোভাব মূকেরা। কেবল সঙ্কেতের দ্বারা, মনের ভাব কতক প্রকাশ করা যেতে পারে, কিন্তু মনের প্রসারে মন চিন্তারাজ্যে প্রবেশ করলে, যে সব বিচিত্র, সরল ও জটিল চিন্তারাশি এসে পড়ে তার জন্য তখন অতি আবশ্যক হয় কথ্য ভাষা। ভাষার জন্য দরকার হয় তখন বর্ণমালা। দেবভাষা বা সংস্কৃত বর্ণমালার উৎপত্তি কোথা হ'তে? সংস্কৃত বর্ণমালা 'মাহেশ্বরী সূত্র' কেন? ঋগ্বেদের ভাষা 'ছান্দস' কেন? অন্তর্মুখী আর্য্যের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল ঐ শঙ্করের দিকে, যিনি ভাবকে প্রথম

রূপ দেন সুরে। ভাষা ভাব-প্রকাশক ধ্বনি মাত্র, এই ধ্বনি বাইরের আহত ধ্বনি। কিন্তু হর্ষ বিষাদ বা বিরহের যে ভাষা অন্তরে গুমরে গুমরে ওঠে, সেটি অন্তরের সুর যার কেন্দ্র 'অনাহত'। অতীন্দ্রিয়দর্শী দেবাদিদেব শঙ্কর অনাহত ধ্বনির মধ্যে ভাষার উৎপত্তি স্থান দেখলেন! ধ্বনির উৎপত্তি স্থান হিসাবে বর্ণমালা বা অক্ষরের সৃষ্টি হল, গণেশ তা প্রচার করলেন। ধ্বনির উচ্চারণ-স্থানের মূল অনুসারে হল ভাষার উচ্চারণ। এই উচ্চারণের মূল-স্থান হিসাবে উচ্চারণের শ্রেণী বিভাগ (স্বর ও ব্যঞ্জন) হল। কি সুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রণালী! এই প্রণালীর উদ্ভব অনুলোম ক্রমে নয়। আর্য্যের দৃষ্টি বরাবর সেই 'ঊর্দ্ধমূলের' দিকে সর্ব্বক্ষেত্রে। পূর্ব্বে বলেছি, যদি সাঙ্কেতিক লিপি ও তার অর্থ খুঁজতে হয় তন্ত্রের দিকে চাইতে হবে—তন্ত্রই সে স্মৃতি বজায় রেখেছেন। ধোলো ভাষায় ধ্বনি অনুসারে অক্ষরের প্রয়োগ ও উচ্চারণ হয়, অক্ষরের নিজস্ব নির্দ্দিষ্ট ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য নেই। এই রকম বানান ও ধ্বনি অনুসারে উচ্চারণ অবৈজ্ঞানিক (বেদ ১। দ্রঃ)। বলা হয় ইহাতে অক্ষরের সংখ্যা ক'মে যায়, এবং ইহাই মস্ত সুবিধা, কিন্তু উচ্চারণকে ঠিক রাখবার জন্য ধোলো অভিধানে অনেকগুলি চিহ্ন, একই অক্ষরে নানারকম চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। আর্য্য মূলস্থান স্পর্শ করেছেন। প্রত্যেকটি ধ্বনি ব্রহ্মবাচী।

স্বস্তিক চিহ্ন ছিল পবিত্র, যজ্ঞে এই চিহ্ন ব্যবহৃত (বিনিয়োগ) হত। এই স্বস্তিক বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যায় যে পবিত্র-ভাবোদ্যোতক ধ্বনিই ভাবতে বর্ণাত্মক ভাষা এনেছে। পণ্ডিতদের মতে, ঐ বৈদিক সঙ্কেত (স্বস্তিক) হ'তেই ক্রুশ ('Cross') চিহ্নের উৎপত্তি। প্রথমে প্রাচীন ঈজিপ্টে ক্রুশ চিহ্ন ছিল পবিত্র-ভাবোদ্যোতক, ক্রমে হ'য়ে দাঁড়াল সেটি পুং-স্ত্রী-সংযোগ চিহ্ন। এজটেক্স্ (Aztecs) ও মেক্সিকানরা ইহাকে খুব পবিত্র মনে করতেন। এইরকম অনেক দেশে ক্রুশের ব্যবহার ছিল। শেষে এটি হল খুন করবার একটি যন্ত্র। খৃঃ পূঃ ৩০০ বর্ষেও দেখি গ্রীকরা বহু ভারতীয় বীরকে ক্রুশ বিদ্ধ ক'রে হত্যা করেছে। য়াহুদিদের মধ্যেও ছিল এই ভাব। ভারত চিরদিনই অন্তর্মুখী। সেই জন্য বহির্মুখী জাতিরা ভারতকে আজও ভাল বুঝতে পারেন না। এই পরিবর্ত্তন হল ভাবের, এত বড় বড় বিপ্লব গেল আর্য্যের উপর দিয়ে, কিন্তু ভারতে আজও প্রাচীন-ধারা বর্ত্তমান, স্বস্তিক এখনও পবিত্র—সাধন-সহায় রূপে ঐ সঙ্কেত বর্ত্তমান।

ভাবতেব উপাসনা-স্থলেব নামানুৰূপ কথা অনেক জাতিব মধ্যে আছে আজও। ভাবতেতব প্রাচীন জাতিদেব মধ্যে উৎসবে ও আমোদে, দেবতাকে আহ্বান কবা হ'ত। প্রাচীন কেল্ট (Celt) ও জার্ম্মাণ জাতিব উপাসনাব স্থান ছিল চক্রাকাব। গ্রীক ভাষাব kirkos ও ওলেস্ (Welsh) ভাষাব cyrch, ফ্রেঞ্চ ভাষাব crique, স্কচ ভাষাব kirk সমস্তই ছিল একার্থ-বোধক = চক্রাকাব এঙ্গলো-স্যাক্ষণ ভাষাব circol ও circe কথাগুলিরও ঐ অর্থ। ঐ কথাগুলি হ'তে church (চার্চ) কথাটি এসেছে। সংস্কৃত 'চক্র' মানেও তাই। বৈদিক যজ্ঞে বা হোমে এখনও চক্রাকাবে ব'সে সাধকেবা মন্ত্র পাঠ কবেন ও আহুতি দেন। তন্ত্র, চক্রেব ভাব বজায় আজও বেখেছেন।

ভাব ভেদে কর্ম্ম প্রেবণাব উদ্দেশ্য হয় বিভিন্ন, সুতবাং দৃষ্টি-কোণ হয় ভিন্ন। প্রাচীন কালে অনেক স্থানেই স্বর্ণেব ব্যবহাব কিছু কিছু প্রাচীন জাতিবা জানতেন। ধোলো ঐতিহাসিকেবা দেখলেন যে ঐ সব জাতিবা স্বর্ণেব ব্যবহাব জানলেও, তাঁবা অন্য ধাতুব ব্যবহাব জানতেন না, উন্নত শিল্পজ্ঞানও তাঁদেব ছিল না। পণ্ডিতেবা এই সাধাবণ সত্যে উপনীত হয়ে একটা Theory খাড়া কবলেন। কিন্তু ভাবতেব বেলায় এ নিয়ম খাটল না। ঋগ্বেদে (১০ম, ৩১।৮) দেখি ছিন্নপদা বিস্পলাকে লৌহ চবণ দিয়ে তাঁকে চলচ্ছক্তি বিশিষ্টা কবা হয়েছে। অন্য দেশে উপন্যাসের নায়ক নায়িকাব ভাবে পুবাণেব চিত্র অঙ্কিত, ভাবতেব পুবাণ শাস্ত্রে 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি' এই দুই নায়ক নায়িকা— সাধাবণ নায়ক-নায়িকা নয়। আর্য্যেব ঐতিহাসিক-চেতনা ধর্ম্মে বা অধ্যাত্ম সংস্কাবে, ধোলেব Historical Sense ঘটনায়। ধোলোব Historical Sense সমস্ত আত্মবিস্মৃত জাতিব চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে, জাতীয় জীবনে নতুন কর্ম্মপ্রেবণা আনিয়েছে, ইহাও সত্য। এই ভাবটি আমাদেব সাদবে গ্রহণ কবতে হবে নিজেব আদর্শ সম্মুখে বেখে। 'কর্ম্মে তোমাব অধিকাব, ফলে' নয, ইহা ভাবতেব কর্ম্মাদর্শ। এই কর্ম্মাদর্শ সামনে বেখে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যশোলাভে উৎসাহিত কবেছেন, তাই অর্জ্জুনেব সেই অবসন্নতা বা বিষাদ মোড ফিবে 'যোগে' পবিণত (বিষাদযোগ)। শ্রীশঙ্কব মোহমুদ্গবে বৈবাগ্যেব অতুলনীয গান গেযেছেন। ত্যাগ-বৈবাগ্যপূত জীবনই জাতিতে অদ্ভুত কর্ম্ম সঞ্চাব কবতে পাবে। শ্রীশংকব ছযমাস ব্যাসগুহায় থেকে তাঁব বড বড গ্রন্থ শেষ কবেন, সমস্ত ভাবত পবিভ্রমণ কবেন। তাঁব মত কর্ম্মী ক'জন জন্মগ্রহণ

করেছেন অন্যত্রে? বহির্মুখী ভোগবাদীদের সঙ্গে এই কারণে হয় ব্যবহারিক জীবন যাপনের আদর্শে পার্থক্য, অভ্যুদয়ের আদর্শে পার্থক্য। এখন দরকার আদান প্রদানের। নির্ভরতার জীবন, অভ্যুদয়ের পথে বহুদূর আগুয়ান। সর্ব্বপ্রকার আদর্শের মূলে থাকা চাই প্রয়োজন-বোধ। এই প্রয়োজন-বোধের তীব্রতায় হয় মহাশক্তির আবির্ভাব: মহাশক্তি গুনিখোরের মত নিশ্চেষ্ট থাকেন না। কিন্তু চায় কে তাঁকে? কোথায় প্রয়োজন-বোধ? ধর্ম্মের গ্লানি হলেই যে তাঁর আবির্ভাব হয়, অন্য সময়ে হয় না, তা নয়—চাই প্রয়োজন-বোধ। বহু স্থানে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও ধর্ম্মের গ্লানি হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজন-বোধ অনুভূত না হওয়ায় বহু জাতি লোপ পেয়েছে—তাঁর আবির্ভাব হয় নি। কারণ সে সব স্থলে কেহ তাঁকে চায় নি। ইহাও সত্য যে ধর্ম্মের গ্লানি সব চেয়ে বড় প্রয়োজন-বোধ আনায়। ধর্ম্মের গ্লানি মানবতার পরিপন্থি, তাই ধর্ম্মের গ্লানিতে মানব-হৃদয় স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হয়, জীবন যাপনে শৃঙ্খলা থাকে না। প্রয়োজন-বোধের কম বেশীতে হয় অভ্যুদয়ের আদর্শে পার্থক্য। সকল আদর্শই হয় মধুময়, যদি 'ঈশাবাস্যং' ক'রে নেওয়া হয়। অধ্যাত্ম-সংস্কার মানবের প্রয়োজন, বিশ্বশান্তির জন্য। মানব-মন সেই দিকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অগ্রসর হচ্ছে। বিদ্যাসংস্কারের অদ্ভুত ফল—ধোলো বিজ্ঞান, এই বিজ্ঞানও আজ ঐ পথ ধরছে। ধোলো বিজ্ঞান আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেটি 'শক্তি'—মহাশক্তির একটি রূপ—ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু ঐ শক্তি ধোলোর বহির্মুখী প্রতিভায় জড়বাদের ব্যাপক ভাবনায়।

এই রকম ভাব-ভেদে, আর্য্য বুঝেছেন এক দিক্ দিয়ে, ধোলো বুঝেছেন অন্য দিক দিয়ে. উভয় ভাবের মূল মহৎ, উভয়েই জগতকে নতুন নতুন চিন্তা, নতুন নতুন কর্ম্মপ্রেরণা দিয়েছেন। এক এক জাতির পছন্দের তারতম্য দৃষ্ট হয়, কেন এক এক বিষয়ে এক এক জাতির ঝোঁক থাকে, কেন সবাই এক রকমের হয় না? ধোলোর উত্তর 'প্রাকৃতিক-বিধি', হিন্দুর উত্তর 'কর্ম্ম'।

বর্তমানে একটা প্রশ্ন উঠেছে—উভয় ভাবই যদি মহৎ হয় কি দরকার অধ্যাত্মবিদ্যার? যিনি যে ভাব নিয়ে আছেন, যে ভাব তিনি পুষ্ট করেছেন, থাকুন না তিনি সেই ভাব নিয়ে? অত [illegible] প্রচারের আবশ্যকতা কি? [illegible] উত্তরে এখানে ইহাই বলতে হবে যে উভয় ভাবই মহৎ ভিন্ন ভিন্ন—

দিক্ দিয়ে, একটি বড় ভাব নিলে, আর একটিকে কি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করা দরকার নয়? ব্যবহারিক জগতে আদান প্রদানে জাতিতে নব বল আসে। যদি ভাবের ঘরে চুরি না থাকে, ইহাতে উভয় পক্ষ লাভবান হয়। একজনের যেটি নেই, সেটি পেলে তার অভাব দূর হয়। ইহাকে উপেক্ষা করা কি সঙ্গত? এই মহা জীবনসংগ্রামের যুগে, সম্ভব কি উপেক্ষা করবার? আদানপ্রদান হচ্ছে, ইহা প্রত্যক্ষ। ইহাকে ঠেকায় বা উপেক্ষা করে কার সাধ্য। অতএব উপেক্ষার নামে জড়তার প্রশ্রয় না দিয়ে যুগ-মহিমাকে বরণ ক'রে নিয়ে, সচেতন হ'য়ে, সর্ব্ববিষয়ে অগ্রসর হওয়াই সর্ব্বজাতির সর্ব্বকল্যাণের নিদান। ইহার জন্য দরকার সৎসাহিত্যের সৃষ্টি, যার উদ্দেশ্য হবে 'চিত্তশুদ্ধি', যে সকল ধর্ম্মবিশ্বাসে মনস্তত্ত্ব নেই অথবা ছড়িয়ে আছে, সে সব স্থানে ঐ তত্ত্বান্তর্গত সত্যগুলিকে একত্র ক'রে দর্শনশাস্ত্র রচনা ক'রতে হবে। এ রচনার ভার, ঐ সব ধর্ম্মবিশ্বাসীরাই গ্রহণ করুন। ধোলো, politics (রাজনীতি) ও ধর্ম্মকে স্বতন্ত্র কোঠায় ফেলেছেন। আমাদেরও ঐ রকম করতে বলা হয়। ভারতে ধর্ম্মের নামে জাতি। ভারত, সংস্কৃতিকে বিভাগ ক'রে ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র-ও-সংস্পর্শশূন্য কোঠায়, পরিণত করতে পারেন না। এত কাল গোলযোগ হয়েছে সাধনাচার ও লৌকিকাচারের সম্বন্ধ না বুঝে। রাজনৈতিক কূটনীতির (policyর) প্রয়োগও একটি লোকাচার, যার উদ্দেশ্য হয়ত জটিল হ'তে পারে, বাহ্য আচারে যে মনস্তত্ত্ব আছে, সেই মনস্তত্ত্বের মধ্যে বিষম ভেদ আনাবার উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সকল সাধনাচারের উদ্দেশ্য 'মিলন'। ঐ উদ্দেশ্য ঠিক থাকলে সেবাধর্ম্ম পালন দ্বারা লৌকিক আচারকেও আমরা 'ঈশাবাস্যং' ক'রে নিতে পারি সহজে।

পারিবারিক জীবন

পিতা, মাতা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী ও তাদের সন্তানসন্ততি এই সমস্ত নিয়ে হয় পরিবার (family)। সমাজ ও সভ্যতার উদয় হয় বাৎসল্য হ'তে, মাতৃত্ব হ'তে, শিশু হ'তে নয়। শিশু নিমিত্ত মাত্র। জীবের মধ্যে মানবদেহেই অদ্ভুত মাথা ও হৃদয়ের বিকাশ। নারীতে বাৎসল্য চিরস্থায়ী। এই নারীত্ব বা মাতৃত্বই সমাজের স্রষ্টা। মাতৃবাৎসল্যই সন্তানের লালন-পালন ও পোষণের মূলে। পিতৃবাৎসল্য, অপেক্ষাকৃত ধীরে স্ফুরিত হয় ও মাতৃবাৎসল্যের মত গভীর সর্ব্বক্ষেত্রে নয়। বাৎসল্যের প্রেরণায় হয় মানব সংঘবদ্ধ, শিশুরক্ষার জন্য। বর্ব্বর মানুষও সংঘবদ্ধ হয় ঐ জন্য। ধীরে ধীরে পারিবারিক জীবন গঠিত হ'তে থাকে সেখানে। আবার, বাৎসল্যের জন্যই জীবনে পবিত্রতা রক্ষার আবশ্যকতা অনুভূত হয়। এই পবিত্রতা-বোধ বিকশিত হ'লে, পারিবারিক জীবন আরম্ভ হয়। এই পবিত্রতা-বোধে পুং-স্ত্রীর একত্রে স্থিতির সার্থকতা আসে, বিবাহিত জীবন আরম্ভ হয়, বিবাহ-বিধির সৃষ্টি হয়, সমাজ গঠিত হয়, সভ্যতার উদয় হয়। পারিবারিক জীবনে, বিবাহিত জীবন ভিন্ন নারীর বাৎসল্যের স্ফূর্ত্তি হয় না।

সকল সমাজে, সর্ব্বদেশে, নারী বহু বিবাহের বিরোধী, নারীর বহু বিবাহ নারীজাতি পছন্দ করেন না। নারীর বহু বিবাহের প্রথম ফল বন্ধ্যাত্ব, বংশলোপ। পুরুষের বহু বিবাহে সে দোষ নেই। ব্যভিচার জীবনের ফল স্বাস্থ্যহানি। ব্যভিচারজীবনে রক্ত দূষিত হয়, কঠিন কঠিন ব্যাধির উৎপত্তি হয়, অতএব, প্রবল পুরুষ-সমাজে—সমাজশক্তি যার হাতে সেই পুরুষ-সমাজে—পুরুষের বহু বিবাহে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। কিন্তু উভয়ের বহু বিবাহে বিভিন্ন স্বার্থের সমাবেশে ভবিষ্যৎ সমস্যা জটিল হয়, উচ্ছৃঙ্খল জীবনে ভবিষ্যৎ বংশের স্বাস্থ্য বিকশিত হয় না, শিশুরক্ষায় সে রকম বাৎসল্যের পবিত্র প্রেরণা থাকে না। ভবিষ্যৎ বংশের এই রকম অধোগতিতে গ্রীস ও রোমের সর্ব্বনাশ হয়। জীবনের উৎকর্ষ ও তার মর্য্যাদা বজায় রাখা চাই; [illegible] সমাজতাত্ত্বিকদের মতে 'quality of life' ঠিক রাখা চাই। সেই জন্য সর্ব্বদেশের মনীষিগণ বিবাহে বাছাই করার নীতি অত্যাবশ্যক মনে করেন। বাছাইয়ের চেষ্টা

যেখানে না থাকে, সেখানে যথেচ্ছাচার-বিবাহের নাম 'বর্ণ-সঙ্কর'। এইভাবে বিপরীত রক্ত-মিশ্রণের ফলে বংশের উৎকর্ষতা নষ্ট হয়। ধোলো সমাজ-তত্ত্ববিদেরাও ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন যে "Reversed selection spoils the breed"—'বিপরীত রক্তমিশ্রণ বংশধারা নষ্ট করে।' ভূয়োদর্শন-জাত জ্ঞানের মাত্র একাংশ নিলে, জ্ঞান আংশিক হ'লে, তাতে ভ্রম থাকে। রক্তমিশ্রণ ব্যাপারে—যথেচ্ছাচার বিবাহে—আমরা এই ভুলটাই করি। রক্তমিশ্রণে ভাবতে হয় যে ভবিষ্যৎ বংশীয়ের আহার ও প্রতিপালন, শিক্ষা ও ধর্ম্মবিশ্বাস, সমাজে স্থান ও সুযোগ বা সুবিধা কি রকম হবে। একই জাতিসম্ভূত সন্তানসন্ততির রীতিনীতি ও আচারাদির অনুরূপ ব্যবস্থা অপর পক্ষের থাকা চাই, রক্তমিশ্রণের সময় ইহা দেখ্‌তে হয়। আন্তর্জাতিক রক্তমিশ্রণে 'বর' ও 'কনে' দুটি জাতির প্রত্যেকের ঠিক্ ঠিক্ প্রতিনিধি হওয়া চাই। ভূয়োদর্শন ফলে ধোলো সমাজবিদেরা দেখেছেন যে যদি পিতার চরিত্রবল ও অন্যান্য সদ্‌গুণ থাকে আর বিজাতীয় মাতা তদ্বিপরীত ভাবাপন্ন হয়, দুজনের অভ্যাস ও জীবনের আচরণ যদি বিভিন্ন হয় বা বিকৃত হয়, সেইমিশ্রণের ফল হ'তে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না, অর্থাৎ জাতীয় চরিত্রের কোন ফলই তদ্‌জাত সন্তানেরা প্রকৃষ্টরূপে পায় না। এই সব কারণেই শ্রীকৃষ্ণ বর্ণসঙ্করে ভয় পেয়েছেন আর এই সব কারণেই হিন্দুর রক্তমিশ্রণে এত সাবধানতা।

ধোলো শুধু স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থা দেখতে চান, ভারত, শরীর মন দুইই দেখতে চান, ভারতের কাছে পবিত্রতাই প্রধান, তার পর স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থা। আর্য্যের কাছে নারীর পবিত্রতা সর্ব্বপ্রধান, পবিত্রতার ধারণা আর্য্যের একরকম, ধোলোর অন্যরকম। দাম্পত্য-জীবনের পবিত্রতা ও প্রীতি পারিবারিক জীবনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। সর্ব্বত্র, দাম্পত্যজীবনে, দেহের আকর্ষণ অর্থাৎ জৈব-সংস্কার প্রধান নয়, জৈব-সংস্কারের ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত গাঢ় প্রীতি, যার অবশ্যম্ভাবী ফল পবিত্রতা ও একনিষ্ঠতা; জৈব-সংস্কার সেখানে গৌণ। ঐ পবিত্র গাঢ় একনিষ্ঠ ভাবের নাম দেওয়া হয় 'ভালবাসা', 'প্রেম'। এই প্রেমের ভাব, নারীতেই প্রধানতঃ প্রস্ফুটিত।

ধোলো সমাজে এক-পত্নীক ভাব কারা এনেছে তা পূর্ব্বে বলেছি। ঐ সমাজে, বিবাহ ঘরোয়া-ব্যাপার হ'তে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অন্তর্গত কখন হ'তে

হয়েছে তাও বলা হয়েছে। ভারতে বিবাহ একটি সমাজ-ধর্ম্ম। বৈদিক যুগ হ'তে ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠানের অন্তর্গত একটি 'সংস্কার'। বেদ-পন্থী সমাজ রাজবিধি বা আইনের দ্বারা কারোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান করায় নি, ধর্ম্মাচারের মধ্য দিয়ে ঐ সমাজ মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধির উন্মেষ চেষ্টায় সামাজিকতা বজায় রাখত। এই কারণে দ্বিজের অবশ্য-শিক্ষাটি সহজেই হ'ত। গৃহ্যসূত্র ও শ্রৌতসূত্র ছিল সমাজের বিধি। বৌদ্ধ-প্লাবন ফলে ঐ দুইই বর্ত্তমানে লুপ্তপ্রায়, তবে গৃহ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান আজও বিবাহ আদিতে প্রয়োগ করা হয়। এখন বিবাহকালে পুরোহিতেরা সব মন্ত্র পড়ান না, কোন মন্ত্রের অর্থ বা ভাব বুঝিয়েও দেন না, 'বর' ও 'কনে' যদি দ্বিজ না হন, তা হলে মাত্র 'দানের' মন্ত্র পাঠ ক'রে শেষ করেন।

আর্য্যের কাছে, কন্যা লক্ষ্মীরূপিণী, তাই বিবাহকালে কন্যাকে সালঙ্কারা সম্প্রদান করতে হয়। এই প্রথা বরাবর চলে আসছে। আংটিটিও দান সামগ্রীর অন্তর্গত, তার জন্য কোন পৃথক মন্ত্র নেই, তার অন্য কোন বিশেষ অর্থ নেই; কিন্তু ধোলোর বিবাহে, ধোলো, তার মধ্যে একটা অর্থ দেখতে পান—পুংস্ত্রী-সংযোগের সঙ্কেত। Church of England এর The Book of Common Prayerএ (বিলাতের ধর্ম্মানুষ্ঠান গ্রন্থে), দেখা যায়, বধূকে আংটি পরাবার সময় বরকে বলতে হয়, "With this Ring I thee wed, with my body I thee worship and with my worldly goods I thee endow, 'এই আংটিটির দ্বারা আমি তোমাকে বিবাহ করছি, এই ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমার দেহ সসম্মানে তোমাকে নিবেদন করছি এবং পার্থিব সম্পত্তির সহিত আমি আমার ক্ষমতা তোমাকে অর্পণ করছি।'

এক-পত্নীক ভাবের সমাদর ধোলো বরাবর ক'রে আসছেন এতাবৎ, কিন্তু, যদি ও ধোলোসমাজে এক-পত্নীর বিধি আছে, তবু বিবাহ-বিচ্ছেদের (divorceএর) সংখ্যা দিন দিন ঐ সমাজে বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ প্রকারান্তরে পুরুষ ও নারী উভয়েরই বহু বিবাহ চলেছে। যে বহু বিবাহ (Polygamy) ও যথেচ্ছাচার (Promiscuity) কে ধোলো বরাবর ঘৃণা ক'রে তাঁদের সমাজ ও সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছেন, আজ পবিত্রতা-বোধ—বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা-বোধ, শিথিল হওয়ায় সমাজে এসেছে আইনসম্মত বহু-চারিতা ও যথেচ্ছাচারিতা (legalised polygamy and legalised

promiscuity) ! ব্যক্তি-তান্ত্রিক সমাজেব একদল আবার এই সময়ে খাড়া হয়েছেন, যাঁদেব মতে, স্থায়ী-বিবাহিত-জীবনে ব্যক্তিত্বেব বিকাশ হয় না। ব্যক্তিত্ব মানে যেন স্বার্থবুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব যেন সমাজ-ছাড়া সমাজেব অভিব্যক্তি। এবকম জীবনে উচ্চ প্রকৃতিব স্থান কোথায় ? ধোলো চিন্তা শীল মহাজনেবা সমাজের এই অবস্থাব জন্য দায়ী করছেন বর্ত্তমান লাভ-লোকসান-খতান বেণেবুদ্ধিব বেণেসভ্যতাকে। তাঁদেব মতে বেণে বা কাঞ্চন-সভ্যতাই সকল যায়গায় ঘব ভাঙ্গছে, সর্ব্বত্র বেকাব সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছে, দাবিদ্র্যেব হাহাকাব তীব্রতব ক'বে তুলেছে, ধনসম্পত্তি জনকতকেব মধ্যে আবদ্ধ থেকে ও ছড়িয়ে যেতে না পাবায়, চোব ডাকাত ও বিপ্লবেব আশঙ্কা হ'তে বক্ষা পারাব জন্য পুলিশ ও সৈন্য বাডছে। ঐ সব কারণে, পাবিবাবিক-জীবন সঙ্কীর্ণ হয়েছে। ঐ জীবন নষ্ট-প্রায় হওয়ায়, বেণেবুদ্ধির বিকাশমুখে, দবিদ্রতা আদি সামাজিক নানা দোষ নিবাবণেব জন্য Poor law (দবিদ্র আইন) হয়েছে ধোলোব দেশে ; ঐ আইনে কতকগুলি ব্যবহাবিক সুবিধা হয ত আছে, কিন্তু তাতে সমাজেব অগ্রগতি রুদ্ধ প্রায়, পাবিবাবিক-জীবন বিচ্ছিন্ন প্রায়। দরিদ্র-আইন, দরিদ্রকে আশ্রয় দেয। যে সব দবিদ্র আশ্রয় ভিক্ষা চায় না, দবিদ্র-আইনেব অধীনতা স্বীকাব না ক'বে স্বাধীন ভাবে থাকে, তাবা বহুদিন বেকাব থাকলে, সমাজে বিপ্লব আনায, অনাচাব বাড়ে, দস্যুবৃত্তি বাড়ে, পাবিবাবিক সমাজ উদ্বাস্ত হয়। ঐ সমস্ত দোষ নিবাবণেব জন্য, ভাবতে পাবিবাবিক জীবনকে দৃঢ ভিত্তিতে স্থাপন কবা হয়েছে। ভাবতে, অতিথি-সংকাব ও মুষ্টি-ভিক্ষাব প্রথায বহু দোষ দেখাতে পারা যায়, কিন্তু তাতে সমাজে বেকাব অর্থাৎ অভুক্ত কেহ থাকে না। ঐ প্রথায় যে সব দোষ হিন্দু-সমাজেব এই দুর্দ্দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে, সে গুলি দূব কববাব উপায় অনেক সহজ হয় যদি পাবিবাবিক-জীবনে পবিত্রতাব ভাব ও উভয় পক্ষেব একনিষ্ঠাব ভাব দৃঢ হয়, পবিত্রতা ও নিষ্ঠায সমাজ-শক্তি গঠিত হয়। সমাজ-শক্তি দেখা দিলে, ঐ সংহত-শক্তিব দ্বারাই সমাজেব নানাদোষ সংশোধনেব চেষ্টা হয়। অলসের সংখ্যাধিক্য কোন সমাজেব পক্ষে মঙ্গল নয়, ইহা সত্য, কিন্তু 'ব্যক্তিত্বের' নামে অসংযত খেয়ালী-জীবন আবো ভযঙ্কর। ভোগ-বিলাসেব আদর্শ, সমাজেব কোন্ স্তবেব কথা ? দবিদ্র

বুভুক্ষু ভারতের পক্ষে এই রকম খেয়ালী জীবন আত্মহত্যা ছাড়া আর কি? বেকার সমস্যা কাছে কাছেই দিন দিন গুরুতর আকার ধারণ করছে সর্ব্বত্র। উপায় আবিষ্কার না ক'রে, পথ না দেখিয়ে, গালাগালিতে কোন ফল নেই। 'State care' (রাষ্ট্রের দ্বারা পোষণ) এক ধুয়া উঠেছে ধোলোদের মধ্যে। State care এ মাথা থাকতে পারে, কিন্তু পারিবারিক জীবনের পবিত্র সংস্পর্শ অভাবে, সেখানে বাৎসল্যের বিকাশ হয় না, নারীর নারীত্ব, নারীর মর্য্যাদা সেখানে স্থান পায় না। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন ভবিষ্যতে পশুবৎ-সাহসে State রক্ষায় সাহসী হ'তে পারে, কিন্তু সেখানে হৃদয়ের স্থান কতটুকু থাকতে পারে, যদি পুরুষানুক্রমে চলে? নারী কি পুরুষের ক্রীড়া-পুত্তলি? পুরুষ কি শুধু state এর দাস? শিশু কি পিতামাতার কেহ নয়, মানবের কিছু নয়, কেবল State এর জমিদারী? যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ পারিবারিক জীবনে হয় না ব'লে একদল আশঙ্কা করেন, State care এর ঐ রকম বন্দোবস্তে কি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হ'তে পারে? হৃদয়ের বিকাশ ভিন্ন ব্যক্তিত্ব নিরর্থক, হৃদয়হীন ব্যক্তিত্ব, পশুত্ব। পশুত্ব, সমাজ ও সভ্যতা, উভয়েরই ধ্বংস আনায়। সংহত-শক্তির অতুল প্রতাপ। হৃদয়হীন সংহত-শক্তি, গরিলা আদি পশুর আত্মরক্ষার জন্য জোট্ বেঁধে একত্র হওয়ার মত। তাতে সমাজ থাকতে পারে না—পারিবারিক-জীবন দূরের কথা,—মানুষ ক্রমশঃ বর্ব্বর যুগে ফিরে যায়, সভ্যতা চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যায়।

'সমষ্টির অস্তিত্বে ব্যষ্টির অস্তিত্ব'—এই মহাসত্য আর্য্য ঋষিরা ঘোষণা করেছেন। সমষ্টির জন্যই ব্যষ্টির মূল্য। মাথা ও হৃদয় নিয়ে যে সংহত শক্তি গ'ড়ে ওঠে, সেই সংহত-শক্তিতে ব্যক্তির মূল্য ঠিক নিরূপণ হয়। সমাজের সংহত-শক্তি যত ভাল, ব্যক্তির মমতাও সেখানে তত বেশী, পারিবারিক-জীবনও সেখানে দৃঢ়। রোমক-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল প্যারি (Paris), বিলাসেরও ফ্যাশানের কেন্দ্রস্থল ব'লেই সাধারণের ধারণা, কিন্তু সেখানে পারিবারিক-জীবনে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা আছে, সেখানে—ব্যক্তি-তান্ত্রিকতার প্রাধান্য সমাজে—ব্যক্তির মূল্য, ব্যষ্টিত্বের (individuality) মূল্য যেমন বেশী, সংহত-শক্তিও তত বেশী, ঐ অদ্ভুত ফ্রান্সে। এজন্যও ফ্রান্সে পারিবারিক-জীবনের পবিত্রতাবোধ প্রবল। (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্রঃ—স্বামীজি)। ভারতে, পারিবারিক-জীবন দৃঢ় হ'ল, সংহত-শক্তি নষ্ট হ'ল;

প্রতাপ সর্ব্বদিকে কল্যাণ আনাতে সমর্থ হবে ও ব্যক্তির ক্ষমতাও বাড়বে, তখন ঐ 'ব্যক্তি' যদি সংহত-শক্তির মধ্যে নতুন প্রেরণা এনে সমাজে নতুন জীবনী শক্তি আনতে চান, তাঁকে পারিবারিক-জীবনে জাতীয়-আদর্শ সম্মুখে রেখে প্রেম ও আত্মত্যাগরূপ মহাশক্তির আদর্শ দেখাতে হবে, যার বলে সমাজ মানবতার দিকে অগ্রসর হ'তে পারে।

আর্য্যমতে, বিবাহ সমাজ-ধর্ম্ম, কারণ ইহাতে সমাজের অভ্যুদয় হয়। বিবাহ অর্থাৎ ইহাতে বিশেষ রূপে ভারবহন সামর্থ্য থাকা চাই। ভারবহন শুধু ভরণ-পোষণের ভার বোঝায় না। বিবাহে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই গুরুদায়ীত্ব আছে, দুটি প্রাণ এক হ'য়ে একই লক্ষ্যে চলে। দম্পতির মধ্যে পতি. স্ত্রীর গুরু, পতি, স্ত্রীকে নির্দ্দিষ্ট পথে নিয়ে যাবার ভার নেন অর্থাৎ স্ত্রীর লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হবার সহায়তা করেন। পত্নী পতির শিষ্যা, পতির অনুগতা হয়ে সেই পথে অগ্রসর হন, তিনি সহধর্ম্মী। সহধর্ম্মীত্ব ও তার দায়িত্ব বজায় রেখে তিনিও পতিকে সঙ্গে নিয়ে যান। পতির আদর্শ ক্ষুন্ন হলে, পত্নীই স্বামীকে স্ব আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করবার ভার নেন। আর্য্যের কাছে, সতীত্ব মানে, শরীরকে মাত্র কলুষ হ'তে রক্ষা ক'রে যাওয়া নয়, আত্যন্তিক নিষ্ঠা, দেহ-মনের পবিত্রতা, ও মনের একাগ্র সপ্রেম শ্রদ্ধার সঙ্গে সতীর দায়িত্ব জ্ঞান থাকা চাই। নতুবা পারিবারিক-জীবনের কোন সার্থকতা থাকে না। সতীত্বের আদর্শ আজও বর্ত্তমান, কিন্তু নষ্টপ্রায় পারিবারিক-জীবনে, নারীর দায়িত্ব-বোধ, পতিকে ঠিক পথে পরিচালিত করবার শক্তি বহুদিন যাবৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তাই, সতী, পতির ইচ্ছানুসারে কার্য্য ক'রেই এখন নিবৃত্ত হন। তিনিও যে সমাজের অভিব্যক্তি, এটি এখন নারীও ভুলেছেন। বহুকালের সামাজিক চাপে তাঁর চিন্তার গতি রুদ্ধ হয়েছে আজ। সেইজন্য, পারিবারিক জীবনকে পুনর্জীবিত করতে হলে চাই শিক্ষার বিস্তার।

["সমাজের নিকট, ব্যক্তির—নিয়মের ও শিক্ষার শাসন দ্বারা চির-দাসত্বের ও বল পূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জনের কি ফল ও পরিণাম, আমাদের মাতৃভূমিই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এদেশের লোক শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে জন্মায়, ভোজনপানাদি আজীবন নিয়মানুসারে করে, বিবাহাদিও সেই প্রকার, এমন কি, মরিবার সময়ও সেই সকল শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে প্রাণত্যাগ করে। এ কঠোর শিক্ষায় একটী মহৎগুণ

ছে, আর সবরই দোষ। গুণটি এই যে, দুটা একটা কার্য্য পুরুষানুক্রমে প্রত্যহ ভ্যাস করিয়া অতি অনায়াসে সুন্দর রকমে লোকে করিতে পারে। তিনখানা টির ঢিপি ও খানকতক কাঠ লইয়া এদেশের রাঁধুনি যে সুস্বাদ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত রে তাহা আর কোথাও নাই। একটা মান্ধাতার আমলের এক টাকা দামের তাঁত একটা গর্ত্তের ভিতর পা, এই সরঞ্জামে ২০৲ টাকা গজের কিংখাব কেবল এদেশেই হওয়া সম্ভব। একখানা ছেঁড়া মাদুর, একটা মাটির প্রদীপ, তায় রেড়ির তেল, এই পাদান সহায়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত এদেশেই হয়। খেঁদা বোঁচা স্ত্রীর উপর সর্ব্বসহিষ্ণু ব ও নির্গুণ মহাদুষ্ট পতির উপর আজন্ম ভক্তি এদেশেই হয়। এই ত গেল গুণ। ন্তু এই সমস্ত গুলিই প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হয়ে মনুষ্যে করে; তাতে নোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, আশার তরঙ্গ নাই, চ্ছা শক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্র সহানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, ভাবনী শক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিসের াদর নাই। এ হৃদয়াকাশের মেঘ কখন কাটে না, প্রাতঃসূর্য্যের উজ্জ্বল ছবি কখনও নকে মুগ্ধ করে না। এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কি না, মনেও াসে না আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না উদ্যোগ ইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়। নিয়মে চলিতে পারিলেই দি ভাল হয়, পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে সমাগত রীতিনীতির অখণ্ড অনুসরণ করাই যদি র্ম্ম হয়, বল, বৃক্ষের অপেক্ষা ধার্ম্মিক কে? রেলের গাড়ীর চেয়ে ভক্ত সাধু কে? প্রস্তর খণ্ডকে কে কবে প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিতে দেখিয়াছে? গো মহিষাদিকে ক কবে পাপ করিতে দেখিয়াছে?...

...বিদ্যা শিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া? না। নানাবিধ জ্ঞানার্জ্জন? তাও নয়। য শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছা শক্তির বেগ ও স্ফূর্ত্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা। এখন বোঝ, যে শিক্ষার ফলে এই ইচ্ছাশক্তি ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে লপূর্ব্বক নিরুদ্ধ হইয়া এখন লুপ্ত প্রায় হইয়াছে যাহার শাসনে নূতন ভাবের কথা দূরে থাকুক, পুরাতন গুলিও একে একে অন্তর্হিত হইতেছে, যাহা মনুষ্যকে ধীরে ধীরে যন্ত্রের ন্যায় করিয়া ফেলিতেছে, সে কি শিক্ষা?... আর এই দুর্ব্বল, [illegible] প্রাণহীন [illegible] নয়, [illegible] [illegible] কি [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

আত্মত্যাগ ধর্ম্ম নহে? বহুর জন্য একের সুখ, একের কল্যাণ উৎসর্গ করা কি একমাত্র পুণ্য নহে?...যে বীর, সেই ত্যাগ করতে পারে, যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে এক হাতে চোখ্ মুচ্ছে আরএক হাতে দান করছে; তার দানে কি ফল? ..

.. অতএব একজনের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারলে তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা কহা উচিত, তার আগে নয়। সকাম থেকেই নিষ্কাম হয়। কামনা না আগে থাকলে কি কখন তার ত্যাগ হয়? অন্ধকার না থাকলে কি কখন আলোকের মানে হয়? সকাম সপ্রেম পূজাই প্রথম। ছোটর পূজাই প্রথম, তারপর আপনা-আপনি বড় আসবে।" (স্বামীজির পত্রাবলী)।]

ত্যাগ ও উদারতা, এই দুই ছিল আর্য্যের মূলমন্ত্র সর্ব্বক্ষেত্রে। সমাজে, গৃহস্থাশ্রমে, অথবা সন্ন্যাসাশ্রমে—যেখানে ঐ মূলমন্ত্রের প্রয়োগ না হয়েছে, সেখানেই তার গণ্ডী সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে, অধঃপতনের বীজ উপ্ত হয়েছে। পারিবারিক-জীবন হ'তেই মানব প্রথম পায় ঐ মূলমন্ত্রের বীজ। শান্ত দাস্য আদি যে সমস্ত ভাব, ভক্ত যেগুলি ভগবানে প্রয়োগ করেন, তার শিক্ষাস্থল পারিবারিক-জীবন। মাতৃত্বই পারিবারিক-জীবনের কেন্দ্রস্থল। মাতৃত্ব হ'তেই ত্যাগবুদ্ধির বিকাশ। পারিবারিক জীবনে, সতীত্বেই মাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত, কারণ, পারিবারিক-জীবন তথা সমাজ বা সভ্যতা মানে শৃঙ্খলা ও সংযম। অসংযত নারী-জীবনে মাতৃত্বের সার্থকতা হয় না, মাতৃত্ব সঙ্কুচিত হয়। বাৎসল্য নারীর প্রকৃতিগত, কিন্তু সতীত্বের বিকাশ হয় নারীর পারিবারিক-জীবনারম্ভে। 'বহুর জন্য একের সুখ, একের কল্যাণ উৎসর্গ করা'—ইহার বীজ মাতৃত্বে, 'একজনের জন্য আত্মত্যাগ' ইহার বীজ সতীত্বে। পারিবারিক-জীবনের, সমাজের, সভ্যতার ও জাতির প্রাণ সতীত্বে নিহিত।

["ভারতে যখন আমরা আদর্শ রমণীর কথা ভাবি, তখন একমাত্র মাতৃভাবের কথাই আমাদের মনে আসে—মাতৃত্বেই তাহার আরম্ভ এবং মাতৃত্বেই তাহার পরিণতি। নারী শব্দ উচ্চারণেই হিন্দুর মনে মাতৃভাবের উদয় হয়।...পাশ্চাত্যে নারী স্ত্রীশক্তি। নারীত্বের ধারণা সেখানে স্ত্রী শক্তিতেই কেন্দ্রীভূত। ভারতের একটা সাধারণ মানুষের কাছেও সমস্ত নারী-শক্তি মাতৃত্বে ঘনীভূত। পাশ্চাত্যে স্ত্রী পরিবারকে শাসন করেন; পরন্তু ভারতের পরিবার মাতার শাসনাধীন। পাশ্চাত্য পরিবারে মা আসিলে তাঁহাকে স্ত্রীর অধীনে থাকিতে হয়, কারণ স্ত্রীই সেই পরিবারের সর্ব্বে-সর্ব্বা। মা সর্ব্বদা আমাদের পরিবারেই থাকেন এবং স্ত্রীকে

তাঁহার অধীনে থাকিতে হয়।...আমি শুধু তুলনায় ইঙ্গিত করিতেছি এবং উভয় পক্ষ তুলনা করার জন্য সত্য বিবৃত করিতেছি। এখন নিজেরাই তুলনা করুন। আপনারা যদি প্রশ্ন করেন, স্ত্রী হিসাবে ভারতীয় মহিলার স্থান কোথায়? ভারতবাসীও প্রশ্ন করে মা-হিসাবেই বা আমেরিকান মহিলার স্থান কোথায়? সেই মহিমাময়ী কিরূপ, যাঁহার নিকট হইতে আমরা শরীর পাইয়াছি? সে তিনি, যিনি আমায় দশমাস গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন? তাঁহার স্থান কোথায়, যিনি প্রয়োজন হইলে আমার জন্য সহস্রবার জীবন দিতে প্রস্তুত? তাঁহার স্থান কোথায়, যাঁহার স্নেহ আমার শত অপরাধ, শত পাপ সত্ত্বেও চিরকাল সমধারায় প্রবাহিত হয়? যে স্ত্রী একটু দুর্ব্যবহারেই বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য বিচারালয়ে ছুটিয়া যায় সেই স্ত্রীর সঙ্গে তুলনায় মায়ের স্থান কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? হে আমেরিকান মহিলাগণ। বলুন, তাঁহার স্থান কোথায়? এদেশে আমি তাঁহাকে পাইবার ভরসা করি না।...মরণকালেও আমরা স্ত্রী পুত্রকে মায়ের স্থান অধিকার করিতে দিই না।...নারী নামের তাৎপর্য্য কি শুধু এই রক্তমাংস শরীরের সহিত জড়িত? মাংস মাংসকে আঁকড়াইয়া থাকিবে, এমন আদর্শ চিন্তা করিতেও হিন্দু ভয় পায়। না, না, নারী। তোমায় রক্ত মাংসের সহিত কখন জড়িত করিতে পারির না। তোমার নাম চিরকালের মত পবিত্র হইয়া গিয়াছে, কারণ মা, এই একটি শব্দ ছাড়া আর এমন কোন কথা আছে যাহার নিকটে কাম ঘেঁসিতে পারে না বা যাহাকে পশুত্ব স্পর্শ করিতে পারে না? ভারতের হইল উহাই আদর্শ।...ভারতে নারীত্বের পরাকাষ্ঠা হইল মাতৃত্বে—সেই অপূর্ব্ব স্বার্থলেশহীনা, সর্ব্বংসহা ক্ষমারূপিনী মাই আমাদের আদর্শ। স্ত্রী তাঁহার পশ্চাদনুসারিণী ছায়া। মায়ের আদর্শে জীবন গঠনই তাহার কর্ত্তব্য। মা—ভালবাসার আদর্শ স্বরূপা, তিনি পরিবারের কর্ত্রী, পরিবার তাঁহারই। ভারতে পিতাই অন্যায় ও কুকর্ম্মের জন্য প্রহার করেন মা নন কখনও। এই দেশে কিন্তু শাসনের ভার পড়িয়াছে মায়ের উপর, আর পিতাকে হইতে হয় রক্ষাকর্ত্তা।...ভগবানকে 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা' না বলিয়া, আমরা সর্ব্বদাই 'মা' বলিয়া থাকি। এই শব্দ এবং এইভাব হিন্দুর মনে অপার ভালবাসার সহিত জড়িত, কারণ এই মর জগতে মায়ের ভিতরেই আমরা ভগবানের ভালবাসার আভাস সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাই।...বধূ তাঁহার কন্যাস্থানীয়া হইয়া গৃহে আসেন। একদিকে মায়ের নিজের কন্যা যেমন বিবাহের পর পর গৃহে চলিয়া গেলেন, অন্যদিকে তেমনি পুত্র বিবাহ করিয়া তাঁহাকে একটি কন্যা আনিয়া দিলেন। [illegible] মায়ের শাসন মানিয়া চলিতে হইবে।...মা না হওয়া [illegible] অপেক্ষা করুন, [illegible] সে ও উহার সমান পাইবে।...মাতৃত্বই [illegible]

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিঃস্বার্থপরতা শিক্ষা ও নিঃস্বার্থপর কার্য্য করিবার অবসর প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবৎ প্রেমই কেবল মায়ের ভালবাসা হইতে উচ্চতর, আর সবই নিম্নশ্রেণীর।...সেই পুরুষ বাস্তবিক ধন্য, যে স্ত্রীলোককে ভগবানের মাতৃভাবের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া দেখিতে সক্ষম। সেই স্ত্রীলোকও ধন্য, যিনি মানুষকে ভগবানের পিতৃভাবের প্রতিমূর্ত্তিরূপে দেখিতে পারেন। সেই সন্তানেরাও ধন্য, যাহারা তাহাদের পিতামাতাকে ভগবানের প্রকাশ রূপে দেখিতে সক্ষম।...জাতির জীবনে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রথম বৈবাহিক সম্বন্ধকে পবিত্র ও বিচ্ছেদহীন করিতে হইবে।" (ভারতীয় নারী—স্বামীজি)।]

এখন বাঙ্গালায় যে সমস্ত উপন্যাস, নাটক ও কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে সেগুলির অধিকাংশের মধ্যে মা কৈ? ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ কোথায়?

বিবাহ

ধোলো-বিবাহের কথা বলেছি। আররদের বিবাহ একটি চুক্তি মাত্র (contract), কিন্তু হিন্দু-বিবাহের আদর্শ বৈদিক যুগ হ'তে আজ পর্য্যন্ত ঠিক্ চলে আসছে, মূল নীতি বদলায় নি। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আলোচনায় আমরা দেখেছি যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের' পর গৃহস্থাশ্রম, এই গৃহী-জীবন ছিল কয়েক-বৎসর মাত্র স্থায়ী, কারণ, "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ", এই নিয়মানুসারে গৃহী বাণপ্রস্থাবলম্বন করতেন। মোক্ষই হিন্দু-জীবনের আদর্শ, সেই জন্য ভোগ-বিলাস তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারত না। তিনি জানতেন যে কিছু দিন সংসারাশ্রম করবার পর তাঁকে নিত্যবস্তুর সন্ধানে তপস্যায়-রত হ'তে হবে, মনকে একাগ্রাভিমুখী করতে হবে। প্রথম জীবনের শিক্ষা তাঁর সহায় হত সর্ব্বত্র। তিনি জানতেন যে, বিবাহিত-জীবনে মোহ আনায়, দুর্ব্বলতা আনায়, এবং সে দুর্ব্বলতা তাঁকে পরিহার করতে হবে। লক্ষ্য স্থির থাকায় বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর চিত্তে অবসাদ আসত না-সহজে।

ভোগ্যবস্তুর যে কোন প্রয়োজনীয়তা নেই তা-নয়, ভোগের স্বরূপ-বোধ থাকা চাই, ভোগ করতে জানা চাই। নতুবা, ভোগাভিমুখী-শক্তি বহুধা বিভক্ত হ'য়ে পড়লে, সহজে কেন্দ্রাভিমুখী হ'তে চায় না। মোক্ষ মানে

বন্ধন হ'তে মুক্তি, তাতে চাই চিত্তের স্বাধীনতা, চিত্তবৃত্তিকে একাভিমুখী করা। নারী-সমস্যা সমাধানে, নারীকে ঐ আদর্শের দিকদিয়ে বুঝতে হবে—নারীর নারীত্ব বুঝতে হবে। নারীর অন্তর্মুখী বৃত্তি সমুদায়ের পূর্ণ বিকাশ যাতে হয় তা করতে গেলে ভাবতের নারীকেই এ-ভার নিতে হবে। আমরা হিন্দুনারীর কথাই বলছি। শুভ লক্ষণ যে সে ভার নারীরাই এখন নিতে আরম্ভ করেছেন। হিন্দু বালিকাকে হিন্দুর আদর্শানুরূপ শিক্ষা দেবার জন্য, পরমারাধ্যা শ্রীগৌরীপুরী দেবী প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের মত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলার গৌরব।

অভিব্যক্তিতে সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যের প্রকাশ ও ব্যক্তাবস্থা। ঐ অভিব্যক্তির তিনটি রূপ—সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস। ধ্বংস মানে নতুন সৃষ্টি। প্রথম বিকাশ সৃষ্টির দ্যোতনা, স্থিতির লক্ষণ—শৃঙ্খলা-স্থাপন, ক্রমপ্রসার ও ক্রমোন্নতি, শৃঙ্খলার বিচ্যুতি, এলোমেলো গতি, মৃত্যুর চিহ্ন। অভিব্যক্তি হয় বৈচিত্র্যে, নানাত্ব বোধ আসে এই বিশিষ্টতায়। ইহাই ব্যক্ত প্রকৃতি। এই লক্ষণাক্রান্ত ব'লেই নারী প্রকৃতিরূপা—শক্তিরূপা। একাভিমুখী গতিকে কেন্দ্রস্থ করতে পারলে, চিত্তবৃত্তি নিরোধের ফলে যে শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়, তাতে অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়, শ্রদ্ধা জেগে ওঠে, অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ হয়। শক্তিরূপিনী নারী-সমাজে যাতে আত্মবিস্মৃতি না আসে, আত্মশ্রদ্ধা সুপ্ত হয়ে না পড়ে, তার জন্য বেদপন্থী-সমাজে নারীর 'পতি-যোগ' সাধনাই সর্ব্বোত্তম উপায় ব'লে শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে। এই 'যোগ' মানে, সমষ্টি-বোধ আনবার জন্য একাভিমুখী গতি, স্বামী স্ত্রী—একেরই দু' প্রকাশ, আপাতপ্রতীয়মান ভেদ মাত্র! সমাজ যাতে আত্মবিস্মৃত না হয়, ধ্বংসের দিকে না যায়, কালের মত যাতে সমাজের অনাদি প্রবাহ বর্ত্তমান থাকে তার জন্য সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে আদর্শ সম্মুখে রেখে, সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে ইহা সেই প্রকৃতিরূপারই ছায়া—যেথা বিচিত্র শক্তি প্রকাশের মূলে বিলাসিতা সেই মহামায়া! প্রকৃতির উদ্ভিন্ন-চিত্ত লালসবিলাসে, চিত্তবৃত্তির অশান্ত যৌন প্রতিমা নারায়, সমাজ শুধু [illegible] পেলেও, বর্ত্তমান সভ্যতায়, সমাজে আদর্শ স্থাপন অনেকটা কঠিন হয়। [illegible] উন্নতি নয়, [illegible] শান্তির চিহ্ন নয়, আত্ম[illegible], চরিত্রবলে, [illegible]

চিহ্ন নয়, ক্রমবিকাশ নয়। স্থিতিশীল হ'য়ে, সংযত জীবন যাপন ক'রে, শান্তির আশ্রয়ে শ্রী ও শ্রীর অন্বেষণে অগ্রসর হওয়াই ক্রমবিকাশের লক্ষণ।

নারী কেন আবহমান কাল পুরুষের অধীন, ইহার বিবাদ নিষ্প্রয়োজন। পুরুষ ও নারী, উভয় নিয়েই সমাজ। সমাজ স্থাপনের মূলে নারী, কারণ নারী হ'তেই সন্তান পালন ও সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ-চেষ্টায় স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই হৃদয়ে স্থিতিশীলতার আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়, যার ফলে মানবমনে সূক্ষ্ম বৃত্তির অভিব্যক্তি হয়—স্নেহ প্রীতি করুণাদিতে; আসে তাতে স্বার্থ-বিসর্জ্জন-বুদ্ধি ও ত্যাগ। প্রসারমুখে, সমাজে নারীর প্রয়োজনীয়তাই বেশী, ঐ সূক্ষ্ম মনোবৃত্তিকে কার্য্যকরী করবার জন্য, শৃঙ্খলা আনবার জন্য, নারীর বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্য সমাজে অবশ্যম্ভাবী। অথচ গোড়া হ'তেই সমাজ-বদ্ধ নারী, পুরুষের অধীন থাকতে বাধ্য হন! গর্ভধারণ, প্রসবভোগ ও সন্তান পালনাদি ব্যাপারে নারী, পুরুষের ও আত্মীয় স্বজনের সাহায্য নিতে বাধ্য হন—বাৎসল্যের জন্যই মহাশক্তি নম্রা!

বৈদিক যুগে, বিবাহের মন্ত্র হ'তে গৃহীজীবনে নারীর স্থান কোথায় তার আভাষ আমরা পাই, বিবাহের সময় সপ্তপদী গমনের বৈদিক মন্ত্রগুলি শ্রীকিরণ চাঁদ দরবেশ কর্ত্তৃক অনূদিত হয়েছে (ভারতবর্ষ—ষষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ-সংখ্যা দ্রঃ)। এক এক চরণক্ষেপে এক একটি মন্ত্র বধূকে বলতে হয়। প্রথমে বর বধূকে চরণক্ষেপ ক'রে নিজ গৃহপানে আসতে আহ্বান করেন। বর বলেন "বিষ্ণুরূপ আমি প্রিয়ে। গৃহের সমস্ত আহার্য্য সামগ্রী তোমার সেবার জন্যই নিযোজিত থাকবে", "আজি হ'তে তুমি গৃহ অধিষ্ঠাত্রী হবে—প্রথম চরণক্ষেপ মম গৃহপানে কর দেবী।" দ্বিতীয় পদক্ষেপের সময়েও বর বলেন "বিষ্ণুরূপ আমি প্রিয়ে! আমি তোমার ভার গ্রহণে সমর্থ।' প্রথম উক্তির উত্তরে বধূ নিজের আনন্দ প্রকাশ করেন, দ্বিতীয় উক্তিতে তিনি বলেন "চিরদিন শক্তিরূপে বিরাজিব আমি তব বাম পার্শ্বভাগে। দুঃখে ধৈর্য্য ধরি, হ'য়ে হৃষ্টচিত্তা সুখে তোমার কুটুম্বগণে নিত্য হাসিমুখে নিরত করিব সেবা।' এই রকম ৪র্থবারে বরের উক্তি, "ধীরে সতী ধীরে। চতুর্থ চরণ ফেলে, মোর গৃহ পানে চল সুখে অবহেলে তবালোকে লুকাইবে আঁধারের রাত্রি, সকল সুখের মোর তুমি অধিষ্ঠাত্রী।" ষষ্ঠপদক্ষেপনের সময় বধূর উক্তি "সর্ব্বকার্য্যে তব বামে করি অধিষ্ঠান, সম্পাদিব মনের হরষে! যা করাবে

তুমি, তব অনুগামী আমি—সেই ভাবে করিব পালন। আমি তব অর্দ্ধাঙ্গিনী আমি তব দাসী।" সপ্তম পদ গমনের সময় বরের উক্তি,—"প্রিয়তমে লো সঙ্গিনী। এ মহামুহূর্ত্তে তুমি এস সপ্তপদ। ভূ-আদি সপ্তলোকে যা কিছু সম্পদ তোমার অধীন হোক্। আমি বিষ্ণুরূপ। হে অনুগামিনী, তুমি বুঝিবা স্বরূপ, এস মোর গৃহপানে এস গৃহলক্ষ্মী।" বধূর উক্তিও মহান্। সপ্তপদ গমনের পর বর বলেন "আমরা সপ্তপদ গমন করেছি, আমরা পরস্পর পরস্পরের সখা, আমরা যেন অবিযুক্তই থাকি, যেন আমরা উভয়ে পরামর্শ ক'রে সংসার পথে বিচরণ করি' ইত্যাদি। বিবাহের কয়েকটি মন্ত্র আছে।

["ওঁ মমব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু। সামমসম্যূহস্য মূহমস্মি। সাত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী। মনোঽহমস্মি বাক্ ত্বং। সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং। মামনুব্রতা ভব। পুংসে পুত্রায় বেত্তবে শ্রিয়ৈ পুত্রায় বেত্তবে এহি সূনৃতে ।১। ওঁ সংনাহঃ সংহৃদয়ানি সং নাভিঃ সংত্বচঃ। মামনুব্রতা ভব সহচর্য্যা মম ভব ।২। ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্যস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্ ।৩। পুন :—"মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু ।৪। ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্ ।৫। অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা। বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে ।৬। যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব" ।৭।]

অর্থাৎ "আমাদের মনোদেহ এক হোক, আমাদের অবিভক্ত যুগ্মহৃদয়ের দ্বারা আমাদের জীবন-ব্রত সিদ্ধিলাভ করুক, তুমি ঋক্, আমি সাম, তুমি ভূলোক, আমি দ্যুলোক, আমি মন, তুমি ভাষা। তুমি আমার অনুব্রতা হও। হে সত্যপ্রিয়ে। তুমি শ্রীরূপে, ঐশ্বর্য্য ও পুত্রজননীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হও। যুগ-আত্মা আমাদের অভেদ, যুগ-হৃদয় আমাদের অভেদ, নাভি, শরীরও অভেদ, তুমি আমার অনুব্রতা হও। আমার অস্থির দ্বারা তোমার অস্থি, মাংস দ্বারা তোমার মাংস, অস্থির দ্বারা তোমার অস্থি—আমার প্রাণের দ্বারা তোমার প্রাণ ধারণ করছি। আমার ব্রতে তোমার হৃদয় প্রতিষ্ঠিত হব, আমার চিত্ত তোমার চিত্তানুগামী হোক্। একই ধ্রুব-ভূমিতে দ্যুলোক, ভূলোক ও সমস্ত জগত প্রতিষ্ঠিত সেইরূপ অচল ধ্রুবরূপ পরম কল্যাণের দ্বারা এই স্ত্রী পতিকুলে সুপ্রতিষ্ঠিতা হয়ে বিরাজ করুক। অন্নের ফেরের দ্বারা, মণির প্রাণসূত্রের দ্বারা, সত্যগ্রন্থির দ্বারা আমি তোমার হৃদয়কে বেঁধে

ফেলেছি, তোমাব হৃদয় আমাব হোক, এই আমাব হৃদয় তোমার হোক্।" কন্যাগৃহে বব বধূর দিকে চেয়ে, বধূব অবযব নিবীক্ষণ ক'বে বলেন, ('অঘোব পতিঘ্নোষি...চতুষ্পদ') "বধূ! তুমি স্নিগ্ধদৃষ্টিসম্পন্ন হও, পতিকুলেব কল্যাণদায়িনী হও, তোমাব হৃদয় অমৃতে পূর্ণ হোক্, তোমাব দৃষ্টি জ্যোতিঃ ক্ষবণ করুক, তুমি দেবভক্ত হও, তোমাব কীৰ্ত্তি বিশ্বব্যাপিনী হোক্, তুমি আমাব প্রিয় পবিজনেব এবং গবাদি পশুব আনন্দদাযিনী হও।"

বিবাহে কন্যা-গ্রহণের সময় ববকে 'কামস্তুতি' পাঠ কবতে হয়। কন্যাকে লক্ষ্য কবে বব এই 'কামস্তুতি' বলেন।

["ওঁ ক ইদং কস্মা আদাৎ কাম ঃ কামায়াদাৎ। কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিবেশ। কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্ণামি কামৈতত্তে।"]

"কে ইনি? কাকে কে দিল? কামই কামকে দিল। কাম দাতা, কাম প্রতিগ্রহীতা (সৃষ্টিব প্রাক্‌কালে) কাম সমুদ্রে প্রবেশ কবেছিল, কামেব দ্বাবাই তোমাকে প্রতিগ্রহণ কবছি, হে কাম, এই 'কনে' তোমাবই।" (অথৰ্ব্ববেদ—৩।২৯।৭)। ঐ জাতীয় আবও মন্ত্র অথৰ্ব্ববেদে আছে। সামবেদীয বিবাহে ঐ অথর্ব্বোক্ত মন্ত্র প্রয়োগ হয, যজুৰ্ব্বেদীয় বিবাহে অনুরূপ অর্থেব আব একটি মন্ত্র বলা হয, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেব বিবাহকালীন মন্ত্র আব একটি। এই সমস্ত স্থানেই 'কামস্তুতিব' কাম শব্দটিব অর্থ এখনকাব পুবোহিতেবাও ভুলেছেন বোধ হয।

[উক্ত মন্ত্রে বলা হয়েছে যে কাম সমুদ্রে প্রবেশ কবেছিল। "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্তাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিববিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবযো মনীষা"॥ (ঋগ্বেদ ১০।১২৯।৩১) অগ্রে মনেব বীজ স্বরূপ কাম ছিল অর্থাৎ কাম= মনেব বীজ, 'ঋষিবা প্রজ্ঞাসহায়ে হৃদয় অন্বেষণ ক'বে সতেব বন্ধনকে অসতে এনেছিলেন।' সাযন মতে, কাম সমুদ্রবৎ অসীম ব্যাপ্ত। (সৃষ্টিতত্ত্ব—বেদ ও তন্ত্র দ্রঃ)। শতপথ ব্রাহ্মণেব অনুবাদক পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় মতে 'কাম' =বৌদ্ধদেব 'তনহ' বা তৃষ্ণা, মনের বীজ ব্রহ্মে লীন হলে শান্তি আসে (গীতা ২।৭০)। ('আত্ম ও অনাত্মবাদ' —প্রবাসী, ১৩৩৬ আশ্বিন সংখ্যায় উক্ত পণ্ডিত মহাশয়েব প্রবন্ধ দ্রঃ)। বুদ্ধদেবেব 'গহকারক'=গৃহ নির্ম্মাতা, কামই বিশ্বনির্ম্মাতা, এই বিশ্বনির্ম্মাতাই দাতা, গ্রহিতা ও বিশ্বকল্যাণে ইহা বিনিযুক্ত।]

সামবেদীয় দৈবত ব্রাহ্মণে একটি ঋক, "ওঁ কামদেব, নাম মদো নামাসি, সমানয়া মূং সুরা তে অভবৎ পরমত্র জন্মাগ্নে তপসো নির্ম্মিতোঽসি স্বাহা," শরীর-প্লাবনে বিনিযুক্ত হয়। "তপসো নির্ম্মিতোঽসি স্বাহা" পদটি লক্ষ্য করবার বিষয়। বিবাহের পর ব্রহ্মচর্য্য অবশ্য-পালনীয় ছিল, সাধারণতঃ ত্রিরাত্র পালনীয়, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র মতে, ত্রিরাত্র বা দ্বাদশ রাত্র, কিন্তু ঋষি-কল্প পুত্র প্রার্থী হলে বিবাহান্তে সম্বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবশ্য-পালনীয়। কাত্যায়ন বলেন যে সম্বৎসর ব্রহ্মচর্য্যই বিধি, আর ত্রিরাত্র, ষড়রাত্র বা দ্বাদশরাত্র বিকল্পে। ব্রহ্মপুরাণে বরকন্যার বয়স হিসাবে পৃথক পৃথক বিধান আছে। 'হৃদয়-সমার্জ্জন' মন্ত্রে বলা হয়েছে, "হে বিশ্বদেবগণ, আমাদের হৃদয় সংযুক্ত কর, বায়ু ও ব্রহ্মা আমাদের যুগ্মহৃদয়ের ঐক্য সম্পাদন করুন, আমাদের হৃদয়মনের পূর্ণ ঐক্য সম্পাদনকারী বাক্যাবলী এই সময়ে দেবী সরস্বতী আমাদের প্রদান করুন।" 'সমাবেশন মন্ত্রে'র মধ্যে অপত্য উৎপাদনের একটি উদ্দেশ্য বলা হ'য়েছে, "আমি এই বিশ্বভুবনের অন্তর্গত হ'য়ে পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য জায়াতে অপত্য উৎপাদন করি।...চল আমরা দেবতার পরিচর্য্যা করি।"

[বৈদিক আচারের কতকগুলি আচার এখন পরিত্যক্ত হয়েছে। যেমন 'যোনি বিবৃণনম উপসংবেশন' আদি নয়। সম্ভবতঃ ঐ সব মন্ত্রগুলি পরে যুক্ত হয় অথবা ঐগুলি অসংযত ব্যক্তির জন্য।]

অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ দম্পতি যখন ভারতে সব সময়েই একেবারে বিরল নয়, তখন দম্পতি যে ইচ্ছা করলে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ব্রতী হতেও পারতে পারেন, এরূপ মন্ত্র স্পষ্ট থাকা উচিত। এ সব স্থানে নতুন মন্ত্র হওয়া দরকার, স্থান বিশেষে মন্ত্র পাল্টান দরকার। আজকালকার পুরোহিতেরা 'কামস্তুতির' অর্থ বিপর্য্যয় করেন, সামবেদীয় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ কালে কেবল তিলদানের সময় 'স্বস্তি' উচ্চারণ করা হয় ও ঐ 'কামস্তুতি'র মন্ত্র প'ড়ে ব্রাহ্মণের [illegible] সময় তাঁরা 'কামস্তুতির' মন্ত্র বলান কোন্ অর্থে? আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রে "সমানং ব্রহ্মচর্য্যং" অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের একই ব্রহ্মচর্য্যের বিধান ছিল, তবে কেন ঐ মন্ত্রটির ভাব আজও বিবাহের সময় পড়া হয় না?

[পুরোহিত কে যেমন, [illegible] দিয়ে থাকি। [illegible] মানব-প্রকৃতির একটা দিকের [illegible] আমাদিগকে এই সকল দুটিই একত্রে লইতে হইবে, [illegible]

হয়ত এমন কোন জাতির উদ্ভব হইবে, যাহাতে বিভিন্ন জাতির লব্ধ বিশেষ বিশেষ অপূর্ব্ব সিদ্ধি মিলিত হইবে এবং এমন এক নবজাতির সৃষ্টি হইবে যাহা জগৎ পূর্ব্বে স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।" (ভারতীয় নারী—স্বামীজি]।

বিবাহে, সামাজিক রীতি-নীতি সর্ব্বস্থানে এক নয়, যা এক সমাজে দূষণীয়, অন্য সমাজে তা দূষণীয় নয়। আদর্শ কোন স্থানে বহির্মুখী, কোন স্থানে অন্তর্মুখী। পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য—পিতৃ ঋণ হ'তে মুক্ত হবার জন্য আর্য্য করেন বিবাহ, এমন কি 'সপ্তপদী' গমনের সঙ্গে শক্তির (কুণ্ডলিনীর) সপ্তচক্র ভেদের সম্বন্ধ বর্ত্তমান। এ ভাব আর্য্য ছাড়া অন্যত্রে নেই। পিতৃঋণ কখনও শোধ হয় না, কিছু পরিশোধ হয় সন্তান হ'লে। কারণ, সন্তান হ'লে তখন পিতামাতার বাৎসল্য কেমন বুঝতে পারা যায়। বিশ্বমাতার ভালবাসার কণাই মাতৃহৃদয়ে বর্ত্তমান। বাৎসল্যের অনুভূতি বিশ্বমাতার দিকে এগিয়ে দেয়। তাই আর্য্য পুত্রার্থী। মানুষ কতকগুলি ঋণ নিয়ে জগতে আসে। তার মধ্যে পিতৃঋণ একটি, এই সমস্ত ঋণই পরিশোধ হয় একমাত্র সন্ন্যাসে, কারণ, বিশ্বমাতার সমদর্শীত্ব তখন সন্ন্যাসী লাভ করেন। আর্য্য জাতি ছাড়া এভাবও কোন স্থানে নেই। 'অসিরিস আই-সিস্' হ'তে আরম্ভ ক'রে, বর্ত্তমান ধোলো সভ্যতায় বিবাহের আদর্শ মার্জ্জিতাকার ধারণ করেছে, কিন্তু এখনও সেখানে বিবাহের উদ্দেশ্য তিনটি, (১) 'Procreation of Children' বা বংশবৃদ্ধি, (২) 'a remedy against sin' বা পাপের প্রতিষেধক, (৩) 'to avoid fornication' বা ব্যভিচার হ'তে আত্মরক্ষা।

ব্রত অনুষ্ঠানাদি জাতির মধ্যে অধ্যাত্মশক্তির বীজ, জাতীয়ত্বের বীজ জনশক্তি ধ'রে রেখেছে আজও। শিক্ষিতাভিমানীদের মধ্যে ঐগুলির আদর ক'মে এলেও সৎ সন্তানের জন্য ভগবানের কাছে কামনা করেন মা।

["আমাদের স্মৃতিকার ভগবান্ মনু 'আর্য্য' সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা দিয়াছেন 'সৎসন্তান কামনার ফলে যাহার জন্ম হইয়াছে, সেই আর্য্য'। ভগবানের নিকট সন্তানগণের কামনা না করিয়া যাহাদের জন্ম হয় স্মৃতিকারের মতে তাহারা অনার্য্য। সন্তানের জন্য ভগবানের নিকট কামনা করিতে হইবে। অভিশাপ অসন্তোষের মধ্যে যাহাদের জন্ম, সংযমের অসামর্থ্য হেতু, উত্তেজনার অতর্কিত সুযোগে যাহারা জগতে আবির্ভূত হয়, সেই সব সন্তানের কাছে আবার কি আশা করা যায় ?" (ঐ. ভারতীয় নারী)।]

দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন, পুত্র পাবার জন্য। অনেক ব্রত ও অনুষ্ঠান এখন বিলুপ্ত হ'লেও আজও সন্তানবতী নারী ষষ্ঠী পূজাদি করেন ভবিষ্যৎ সন্তানের মঙ্গলের জন্য, তুলসী তলায় বা বিল্বমূলে ব'সে তিনি সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত নিত্য জপ ধ্যানে রতা থাকেন. ইহা ছাড়া গ্রাম্য-দেবতার কাছে, তীর্থ-দেবতার কাছে সন্তানের জন্য 'মানত' করা ত আছেই। বিবাহের মন্ত্রে আমরা দেখেছি দম্পতির সম্বন্ধ। গর্ভাধানের মন্ত্রে, সত্ত্বগুণবিশিষ্ট আত্মানন্দময় সন্তানের কামনা করা হয়। ঋতুমতী কন্যা ভিন্ন গর্ভাধান হয় না। গর্ভাধানের মন্ত্র,

["ও বিষ্ণুর্যোনি কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতি ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥ ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবলী গর্ভং ধেহি সরস্বতী। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবা বাধত্তাং পুষ্কর স্রজৌ॥"]

'বিষ্ণু, তোমার গর্ভস্থানকে শক্তি দান করুন, ত্বষ্টা তোমার গর্ভে রূপ নির্ম্মাণ করুন, ভগবতী সিনীবলি। এই বধূতে গর্ভাধান কর. পদ্মমালাধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার গর্ভাধান করুন—যে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অধিষ্ঠানে সমুৎপন্ন সন্তান দেবকুলের প্রিয়, স্বভাব-নম্র, বিনয়ী, সত্ত্বগুণযুক্ত, সম্পদশালী ও আত্মানন্দময় হয়।'

["অশেষ দুঃখ ক্লিষ্টা সর্ব্বংসহা মায়ের ভালবাসাই আমাদের আদর্শ এই কথা লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম। মাতৃভক্তির উহাই মূল উৎস। এই তপস্বিনীই আমাকে জগতে আনিয়াছেন, আমি আসিব বলিয়া বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া তিনি দেহ পবিত্র রাখিয়াছিলেন, মন পবিত্র রাখিয়াছিলেন, অশন ভূষণ, চিন্তা পবিত্র রাখিয়াছিলেন—তাইত তিনি আমার পূজ্যা।' (ঐ, ঐ)।

দেহমনকে পবিত্র ও সংযত করে পুত্রকামী হতে হয়। কারণ 'মাতার প্রাণালীন প্রভাব সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের বিধান।...যে অনুষ্ঠানের দ্বারা সন্তানের উৎপত্তি হয় তাহা ভগবানেরই পবিত্র প্রতীকস্বরূপ। একটি নূতন জীবাত্মা যদি প্রথম হতে পবিত্র সংস্কার লইয়া জগতে আসিয়াছে। একটি পবিত্র নূতন জীবাত্মাকে জগতে আনিবার জন্য আশীর্বাদ মিলন—ইহাই, ভারতের নিকট ইহা ঈশ্বরের নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ প্রার্থনা,...এটি [illegible] কথা; কেবল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি না, এই [illegible]।" (ঐ, ঐ)।

কে জানে, যে সন্তান জন্মিবে সে কোন সাধু, দেবতা, যোগীন্দ্র কোন মহাজন অথবা অবতারকল্প পুরুষ কি না? এই সব সন্তান আগমনে

হিন্দুর পূজাদি অনুষ্ঠান হয়, এই জন্যই ভার্য্যা,—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্র পিণ্ড প্রযোজনম্।" পুত্রের কথা বলা হয়েছে, কারণ, মেয়ে অন্য সংসারে যায়, এই পুত্রই পিণ্ডের জন্য দরকার, এই পুত্র হ'তেই বংশ ও কুলধারা বজায় থাকে, পিতৃগণের তৃপ্তি হয়, পিতৃঋণ পরিশোধ হয়; এই 'প্রজোৎপাদনই' "ধর্ম্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ" (গীতা স. অ—১১)। বিশ্ব কল্যাণের জন্য, এই ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কামই বিশ্ববীজ—"বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতম" (গীতা, ঐ ১০।)। অনার্য্য বা অসুর সন্তানের জন্য বিবাহ নয়। হরিবংশে গার্গ্য নামে এক মুনির কথা আছে। তিনি ছিলেন বৃষ্ণি ও অন্ধকদের আচার্য্য। তিনি ছিলেন তপস্বী, তাঁর স্ত্রী ছিলেন তপস্বিনী। শ্যালকের উত্তেজনায় তিনি বৃষ্ণি ও অন্ধকদ্বেষী হয়ে ঘোর তপস্যা করেন; রুদ্রদেব প্রসন্ন হয়ে বর দেন যে আশু যুদ্ধে বৃষ্ণি ও অন্ধক নিপাতী এক মহাতেজা তাঁর পুত্র হবে। গার্গ্য বর পেয়ে নিজ পত্নীর কাছে ফিরে এলেন। স্বামীর পুত্র কামনায় স্ত্রী কোন প্রশ্রয়ই দিলেন না, বরং জানালেন যে তিনি ব্রহ্মচারিণী ও তপস্বিনী হয়েই থাকতে চান। (ভারতধারা ১ম খ. পৃঃ ১৩৮ দ্রঃ). গার্গ্যকে অন্যত্র যেতে হয়েছিল। ওরকম মনোভাবে অসুরকল্প সন্তানই জন্মায়। গার্গ্য-পত্নী সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য ক'রেছিলেন।

["পুরুষগণের পক্ষে একটি বিপদাশঙ্কা এই যে তাঁহারা উদারমনা হইতে গিয়া নিজেদের ধর্ম্ম খোয়াইয়া বসিতে পারেন, কিন্তু নারীগণ সেখানে যাহা কিছু ভাল আছে তাহার প্রতি সহানুভূতি হেতু এই উদারতা লাভ করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহাদের নিজ ধর্ম্ম হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না।" (ভারতীয় নারী—ঐ)]।

[সতী, তাঁর অন্তরেস্থিত সৌন্দর্য্য যে ঐ "কুৎসিৎ পুরুষের উপর প্রক্ষেপ করিতেছে, আর সে যে সেই কুৎসিৎ পুরুষকে পূজা করিতেছে ও ভালবাসিতেছে তাহা নহে, সে তাহার নিজের আদর্শের পূজা করিতেছে।...মহাশক্তি আমাদের পশ্চাদ্দেশ হইতে আমাদিগকে ভালবাসিবার জন্য প্রেরণ করিতেছেন—আমরা জানিনা—কোথায় সেই প্রেমাস্পদ বস্তু খুঁজিব—কিন্তু এই প্রেমই আমাদিগকে উহার অনুসন্ধানে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

মানবীয় প্রেমের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের প্রেমই সর্ব্বোচ্চ, স্পষ্টাভিব্যক্ত প্রবলতম ও মনোহর। স্ত্রীপুরুষের এই মত্ত ভালবাসা সাধু মহাপুরুষগণের উন্মত্ত প্রেমেরই ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি মাত্র।

শাস্ত্র বলেন জগতে একমাত্র আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে। সেই আকর্ষণী শক্তি ঈশ্বর। পতির পরম অনুরাগিণী রমণী জানেনা যে তাহার পতির মধ্যে সেই মহা আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে। তাহাই তাহাকে তাহার স্বামীর দিকে টানিতেছে।

তখনই মানুষ যথার্থ ভালবাসিতে পারে যখন সে দেখিতে পায়, তাহার ভালবাসার পাত্র কোন মর্ত্ত্য জীব নহে। তখনই মানুষ যথার্থ ভালবাসিতে পারে, যখন সে দেখিতে পায়, তাহার ভালবাসার পাত্র—খানিকটা মৃত্তিকা খণ্ড নহে, স্বয়ং ভগবান। স্ত্রী স্বামীকে আরও অধিক ভালবাসিবেন যদি তিনি ভাবেন,—স্বামী সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। স্বামী ও স্ত্রীকে অধিক ভালবাসিবেন যদি তিনি জানিতে পারেন,—স্ত্রী স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ। তিনিই স্ত্রীর মধ্যে, তিনিই স্বামীতে বর্ত্তমান। তোমার স্ত্রী থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই। তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই, কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। পুরুষ স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পুরুষকে যে ভালবাসা দিয়া ভালবাসিয়া থাকে, সেই ভালবাসা ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে।...ভারতের দৃষ্টিতে, বিবাহ স্ত্রীপুরুষের অনন্তকালের সম্বন্ধ ঘটাইবার একটা সামাজিক ব্যবস্থা...যদি তাহাদের কেহ জীবনে অত্যধিক পিছাইয়া পড়ে তবে সেই স্ত্রী বা স্বামী যতদিন পর্য্যন্ত তাহার সহধর্ম্মী বা সহধর্ম্মিনীর সমকক্ষ না হইতেছে ততদিন অগ্রগামীর পক্ষে অপেক্ষা করিয়া থাকা ভিন্ন উপায় নাই।

...ভারতীয় রমণীগণের যেরূপ হওয়া উচিত সীতা তাহার আদর্শ, রমণীচরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে সবই এক সীতার চরিত্রে কেন্দ্রীভূত, আমরা সকলেই সীতার সন্তান, আমাদের নারীগণকে আধুনিক ভাবে গঠিত করিবার যে সকল চেষ্টা চলিতেছে, যদি সে সকল চেষ্টার মধ্যে তাহাদিগকে সীতাচরিত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে। ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আপনাদের উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে—ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।

...সমগ্র ভারতবাসীর সমক্ষে সীতা যেন সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশ বলেন—'কর্ম্মকর, কর্ম্ম করিয়া তোমার শক্তি দেখাও।' ভারত বলেন 'দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া তোমার শক্তি দেখাও। এই দুইটি আদর্শই এক এক ভাবের চরম সীমা। সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধি স্বরূপা, যেন মূর্ত্তিমতী ভারতমাতা। ভগবান বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন,—'আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত করিলে সেই আঘাতের কোন প্রতিকার হইল না, উহাতে কেবল জগতে একটি পাপের বৃদ্ধিমাত্র হইবে।' ভারতের এই বিশেষ ভাবটি সীতার প্রকৃতিগত ছিল। তিনি অত্যাচারের প্রতিশোধের চিন্তা পর্য্যন্ত কখনও করেন নাই।" (ঐ ঐ)।]

ধোলো ব্যক্তি-তান্ত্রিক, তাঁব বিবাহ একটি ঘবোযা ব্যাপাব, সুতবাং তাঁব 'ভালবাসা' বা রুচিব উপবই তাঁব বিবাহে নাবী-নির্ব্বাচন নির্ভব কবে।

[সমাজ-তান্ত্রিক হিন্দু বলেন যে, যখন দম্পতীকে "সমাজে থাকিতে হয়, তখন তাহাদের বিবাহেব উপর আমাদের অনেক শুভাশুভ নির্ভব করে। তাহাদের ছেলে ঠিক অসুরেব মত ঘরপোড়া, খুনে, চোর, ডাকাত, মাতাল বদমায়েস বা জঘন্য হইতে পারে। সুতরাং ভাবতবাসীব সামাজিক প্রথার ভিত্তি কি? সেই ভিত্তি হইল বর্ণাশ্রম। আমাব জন্ম ও জীবন আমি যে বর্ণভুক্ত, তাহাব জন্য।...যে যে-বর্ণে জন্মিবে সারাজীবন তাহাকে তাহার আইন মানিয়া চলিতে হইবে। এখন শাস্ত্র বলেন—আমি যদি পুরুষের যথেচ্ছ বিবাহেব স্বাধীনতা দেই, তাহা হইলে ফল কি দাঁড়াইবে? তুমি ত প্রেমে পড়িলে, কিন্তু রমণীর পিতা যে পাগল বা যক্ষ্মাবোগী তাহা ভাবিবে কে? কোন বালিকা হয়ত কোন পুরুষের মুখ দেখিয়া মুগ্ধ হইল। কিন্তু তাহার পিতা হয়ত ঘোব মাতাল। এবিষয়ে বিধি কি? বিধি এই যে এই সব বিবাহই অবৈধ। মাতাল, যক্ষ্মারোগী বা পাগলের সন্তানের বিবাহ অসঙ্গত। শাস্ত্র বলেন, পঙ্গু, কুব্জ, বাতুল ও মূঢ়ের বিবাহ একেবারেই হইতে পারে না...আমাদের শাস্ত্র বলেন যে, যতই দূবসম্পর্ক হউক সগোত্র-বিবাহ অবৈধ। ইহা হওয়া একেবারেই উচিত নয়, সুতরাং আমাদেব শাস্ত্র ঐ রূপ বিবাহ অবৈধ বলিয়া ব্যবস্থা দিলেন। বিবাহ বিষয়ে আমাব বা আমার ভগিনীর কোনও কথা চলে না। বর্ণই এসকলেব নিয়ন্তা।" (ঐ ঐ)।]

বৈদিক যুগে সব সময়েই যে যৌবন-বিবাহ হত তা বলা যায় না। পণ্ডিতেবা বলেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাল্য বিবাহ প্রচলিত হয়। ব্রহ্মপুবাণে অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার বিবাহেব কথা যেমন আছে তেমনি ২০ বৎসব বয়স্ক মেয়েব বিবাহেব কথাও আছে। বাল্য বিবাহ দেওয়া হয় কেন?

"বর্ণেব নির্দ্দেশ এই যে মতামতের অপেক্ষা না বাখিয়া যদি বিবাহেব ব্যবস্থা করিতে হয়, তবে প্রণয়-বৃত্তি জাগ্রত হওয়ার পূর্ব্বে বাল্যকালেই বিবাহ দেওয়া ভাল। যদি অল্প বয়সেই বিবাহ না দিয়া ছেলেমেয়েদেব স্বাধীনভাবে বাড়িতে দেওয়া হয়, তবে তাহারা এমন অপব কাহারও প্রতি আসক্ত হইতে পারে, যাহাদের সহিত বিবাহ বর্ণ অনুমোদন করিবেন না, সুতরাং তাহাতে অনর্থ সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং বর্ণ বলে উহাকে গোড়াতেই থামাইতে হইবে।...সুতবাং বাল্যকালে বিবাহ হইলে বালক বালিকার ভালবাসা রূপ গুণেব উপব নির্ভব না করিয়া স্বাভাবিক হইবে। আপনারা হয়ত বলিবেন 'পরস্পরেব ভালবাসায় পড়িয়া স্ত্রীপুরুষ যে অপূর্ব্ব ভাব সম্ভোগ করে, তাহার অনেকটাই তাহাদেব ভাগ্যে ঘটিবে না। অভ্যাস এবং সঙ্গ হইতে এই যে ভাইবোনের

মত ভালবাসা ইহা ত নিতান্তই নীরস'। কিন্তু হিন্দু বলে হয় হউক, আমরা সমাজ-তান্ত্রিক। একজন স্ত্রী বা একজন পুরুষের স্ফূর্ত্তির জন্য শত শত ব্যক্তির ঘাড়ে দুঃখের বোঝা তুলিয়া দিতে পারি না।" (ঐ)। বাল্যবিবাহ প্রথায় হিন্দুকে দুর্ব্বল করেছে, শারীরিক সম্বন্ধে অধোগামী করেছে, কিন্তু "বাল্যবিবাহ জাতিকে সতীত্ব ধর্ম্মে সমধিক ভূষিত করিয়াছে। তুমি কোনটি লইবে?...অপর দিকে ইউরোপী ও কি নিজপক্ষে বিপদ-শূন্য? কখনই না। কারণ, সতীত্বই জাতির জীবনী-শক্তি।

বাল্যবিবাহের মূলতত্ত্বটি অবশ্য নির্দ্দোষ, কিন্তু এখন আমরা সেই মূলতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছি। বাল্য-বিবাহ-প্রথা যে সকল মূল ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল ভাব অবলম্বনেই প্রকৃত সভ্যতার সঞ্চার হইতে পারে, অন্য কিছুতেই নহে। যদি প্রত্যেক নরনারীকেই অপর যে কোন নর নারীকে পতি বা পত্নীরূপে গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া যায়, যদি ব্যক্তিগত সুখ, পাশব প্রকৃতির পরিতৃপ্তি সমাজে অবাধে চলিতে থাকে, তাহার ফল নিশ্চয়ই অশুভ হইবে—দুষ্ট প্রকৃতি, অসুর স্বভাব সন্তান সমূহ উৎপত্তি হইবে। - আর যতদিন তুমি সমাজে বাস করিতেছ ততদিন তোমার বিবাহের ফল নিশ্চয়ই আমাকে এবং আর সকলকে ভোগ করিতে হয়, সুতরাং তোমার কিরূপ বিবাহ করা উচিত, কিরূপ উচিত নয়—এ বিষয়ে তোমাকে আদেশ করিতে সমাজের অধিকার আছে।...

আমার মত এই যে, বাল্য বিবাহের মূলতত্ত্বটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা না করিয়া মেয়ে পুরুষের সকলেরই বেশী বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চাই। তা না হইলে অনাচার ব্যভিচার আরম্ভ হইবে।

ভালমন্দ সব দেশেই আছে। আমার মতে সমাজ, সকল দেশেই আপনা আপনি গড়ে। অতএব বাল্য-বিবাহ তুলিয়া দেওয়া, বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মাথা না ঘামাইয়া আমাদের কার্য্য হইতেছে স্ত্রী, পুরুষ সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া, সেই শিক্ষার ফলে তাহারা নিজেরাই কোনটি ভাল, কোন্‌টি মন্দ সব বুঝিতে পারিবে ও আপনারাই মন্দটা করা ছাড়িয়া দিবে। তখন আর জোর করিয়া সমাজের কোন বিষয় ভাঙ্গিতে গড়িতে হইবে না।" (ঐ ঐ)।

[বৈধব্য বিশেষ চির বৈধব্য, কষ্টকর। সমাজের সব বিধবাই যে আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট তা হ'তে পারে না। যেগুলিকে আমরা সামাজিক হিসাবে 'শুভকার্য' বলি সেই সব কার্যে বিধবা যোগ দিতে পারেন না। এসব ছাড়া আরো অনেক কারণ আছে যাতে বিধবার জীবন কষ্টকর। কিন্তু বিধবার জীবনকে কষ্টকর ক'রে তুলেছে আত্মবিস্মৃত সমাজ আর ক'রে তুলেছে পুরুষের অত্যাচার-পীড়িত অশিক্ষিত নারী-

সমাজ। বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কি উচিত নয়, কোন শ্রেণীর বিবাহ উচিত, কোন শ্রেণীর উচিত নয়—এসব প্রসঙ্গের এখানে দরকার নেই। আমরা আদর্শ ভুলেছি। সন্ন্যাসী, সামাজিক কোন শুভ কাযে যোগ দেন না যে কারণে, আমাদের বিধবারা ও ঐ কারণেই সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম হ'তে আপনাদের দূরে রাখেন, কিন্তু এই মূলতত্ত্বটি সমাজ ভুলেছেন, আমাদের নারীরাও ভুলেছেন। মনে রাখতে হবে যে বিধবার পতির সংখ্যার উপর জাতির উন্নতি নির্ভর করে না। সকলকেই এগিয়ে যেতে হবে আদর্শ সামনে রেখে। বিধবারা যে সন্ন্যাসিনী, ইহা তাঁদের বোধ থাকলে সমাজ সে বিষয়ে সচেতন থাকলে, বৈধব্য-জীবন অত ক্লেশকর মনে হবে না নিশ্চয়]।

["এইবার আমরা নারীর কন্যা ভাবের বিষয় লইয়া আলোচনা করিব। হিন্দু পরিবারে কন্যাকে লইয়াই যত মুস্কিল। কন্যা এবং বর্ণ এই দুইটি হিন্দুর সর্ব্বনাশ করে; কারণ তাহাকে একই বর্ণে এবং উহার মধ্যে আবার সমান কুলে বিবাহ দিতে হইবে। সুতরাং মেয়েকে বিবাহ দিবার জন্য বাপকে অনেক সময় ভিখারী হইতে হয়।...হিন্দুর জীবনে কন্যাকে লইয়াই যত সমস্যা।...সংস্কৃতে কন্যাকে দুহিতা বলে। শব্দটির ব্যুৎপত্তি এই,—পুরাকালে পরিবারে কন্যাই গোদোহন করিত, সুতরাং দোহার্থক 'দুহ' ধাতু হইতে 'দুহিতা' শব্দ আসিয়াছে, এবং দুহিতা শব্দে প্রকৃত পক্ষে 'গোদোহনকারিনীই বুঝায়। কিন্তু পরে গোদোহনকারিনী 'দুহিতা' শব্দের আর এক নূতন অর্থের সৃষ্টি হইল। এই দ্বিতীয় অর্থ এই যে—দুহিতা অর্থে, যে পরিবারের সকল সার পদার্থ দোহন করিয়া লইয়া যায়।" (ঐ. ঐ)।]

পুত্র অপেক্ষা কন্যা কত বেশী স্নেহশীলা, তা সকলেই জানেন। কন্যা পিতামাতার বাধ্য হয়, তাঁদের শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে বেশী, সেবা ও যত্নে সকলকে তুষ্ট করে। আমরা কুমারী পূজা করি, কিন্তু কন্যার অনাদর করি! বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিলুপ্ত হ'লেও, বর্ণের অনিয়ন্ত্রিত প্রভাব আজ বর্ত্তমান, সমাজ শক্তিহীন আজ। সংস্কারপ্রার্থী লোক কই? যাঁরা আছেন, জনশক্তির উপর-তাঁদের প্রভাব কৈ? সে চরিত্র-বল কৈ? গঠনমুখী সে প্রতিভা কৈ?

["নারীর সম্বন্ধে আর্য্য ও সেমিটিক আদর্শ চিরদিনই সম্পূর্ণ বিপরীত। সেমাইটদের মধ্যে স্ত্রীলোকের উপস্থিতি উপাসনার ঘোর বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত। তাহাদের মতে স্ত্রীলোকের কোনরূপ ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার নেই, এমন কি আহারের জন্য পক্ষী মারাও তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। আর্য্যদের মতে সহধর্ম্মিণী ব্যতীত পুরুষে কোন ধর্ম্মকার্য্য করিতে পারে না।...বেদেও সন্ন্যাসের বিধি ছিল, কিন্তু ঐ বিষয়ে নরনারীর কোনও প্রভেদ করা হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্যকে জনক রাজার সভায় কিরূপ প্রশ্ন করা



হইয়াছিল, তাহা স্মরণ আছে ত? তাঁহার প্রধান প্রশ্নকর্ত্তা ছিলেন বাক্‌পটু কুমারী বাচক্নবী…। তিনি বলিয়াছিলেন 'আমার এই প্রশ্নদ্বয় দক্ষ ধনুষ্কের হস্তস্থিত দুইটী শাণিত তীরের ন্যায়', এই স্থলে তাঁহার নারীত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত তোলা হয় নাই। আর আমাদের প্রাচীন আরণ্য শিক্ষাপারিষদ্ সমূহে বালক বালিকার সমানাধিকার ছিল, তদপেক্ষা অধিকতর সাম্যভাব আর কি হইতে পারে? আমাদের সংস্কৃত নাটকগুলি পড়—শকুন্তলার উপাখ্যান পড়—তার পর দেখ—টেনিসনের 'প্রিন্সেস্' হইতে আর আমাদের নূতন কিছু শিখিবার আছে কিনা।" (ঐ. ঐ)।

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"—গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়—ইহা কত সত্য। উহার বিচার করিতে হইবে উহার কেন্দ্রস্থানীয় সেই চৈতন্যময় প্রকৃত স্তম্ভের দ্বারা—যাহা গৃহস্থালীর প্রকৃত অবলম্বন,—আমি নারীগণের কথা বলিতেছি।" (ঐ. ঐ)]

বর্ত্তমান সমাজ হ'তে এই গৃহিণী প্রায় দূরে অপসারিত হচ্ছেন। এখন গৃহিণী নেই, আছেন ঘরণী। গৃহিনী ছিলেন নিজ সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সকলের মা, ছিল তাঁর গৃহে অতুল প্রতাপ, তাঁর প্রভাবে তাঁর সংসার নিয়ন্ত্রিত হ'ত, ছিল তাঁর মায়ের মত সমদৃষ্টি। নানা কারণে হিন্দুর যৌথ-পারিবারিক আদর্শে আঘাত পড়ায়, গৃহিণীর আদর্শও সমাজে ক'মে আসছে। গৃহিণী ছিলেন গৃহস্থালীর প্রকৃত অবলম্বন। তাঁর স্নেহ-করুণ-দৃষ্টি আত্মীয়স্বজন, পল্লি ও দরিদ্রের উপর সমভাবে নিপতিত হ'ত। 'কর্ত্তা' ছিলেন গৃহিণীর সহায় মাত্র; তাঁর কায বাহিরের শৃঙ্খলা রক্ষা ও সংসারে অন্নসংস্থানের উপায় করা। যখন প্রাচীন 'আশ্রম'-বিভাগ ভেঙ্গে যায়, তখনও ছিল ঐ রকম জীবন।

মাঝে মাঝে শোনা যায় যে হিন্দু নারীর প্রভাব গৃহকোণেই আবদ্ধ ছিল। সত্যই কি তাই? নারীত্বের আদর্শ কি নারীর দ্বারাই ভারতে আবিষ্কৃত হয় নি? গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা নারী বৈদিক সমাজে, ঋষি সমাজেও সম্মানিতা হন কিরূপে? ব্রহ্মবাদিণীর আদর্শ শুধু গৃহকোণেই অচল থাকে নি; সীতাদেবীর আদর্শ অযোধ্যা রাজকুলেই আবদ্ধ নেই। মতিচ্ছন্ন নলের রাজ্য-পরিচালন করবার জন্য, রাজ্যের প্রধান সচিবকে দময়ন্তীর পরামর্শ গ্রহণ করতে দেখি—দময়ন্তীর বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ একমাত্র নলের পরিচর্য্যায় সমাপ্ত হয় নি। গান্ধারীর তেজের নিকট দুর্দ্দান্ত দুর্য্যোধনও সভামধ্যে নির্ব্বাক্ থাকতে বাধ্য হয়—রাজসভায় গান্ধারীর পরামর্শ নারীর তথাকথিত অন্তঃপুরাবদ্ধ-চিত্ত-

'সঙ্কীর্ণতাব' পরিচায়ক নয়। মদন মিশ্রের স্ত্রী উভয়ভাবতীব কথা প্রসিদ্ধ। এই সেদিন পর্য্যন্ত চিতোবেব বাণী পদ্মাবতীব কথা শুনলে আজও নাবীব প্রাণে বিদ্যুৎ খেলে যায়, কাশ্মীবাধিপতি মহাবাজ তুঞ্জিনেব মহিষী বাক্‌পুষ্টা বাজকার্য্যে প্রধান সহায়, প্রজা বক্ষা-কার্য্যে বাক্ পুষ্টাব আত্মশ্রদ্ধা ও ভগবন্নির্ভবতাই তুঞ্জিনেব কার্য্যতৎপবতাব প্রাণ! মধুব স্ত্রী কবি ভক্তিমতী সন্ন্যাসিনী মীবাব কর্ম্মক্ষেত্র মানব-হৃদয়! টোডাব বীব-নাবী তাবাবাই, ইংবাজেব সহিত সংগ্রাম-পব ঝান্সীব বাণী, প্রাতঃস্মবণীয়া অহল্যাবাই প্রভৃতি নাবীকুলেব কর্ম্মক্ষেত্র অতি বিস্তৃত, অথচ তাঁদেব কাবোব জীবনে নাবীত্বেব খর্ব্বতা দেখা যায় না। শ্রীবামকৃষ্ণেব তন্ত্র-সাধনাব সহায বিদুষী দেবী ব্রাহ্মণী ভৈরবীব কথা পূর্ব্বে বলেছি। কুম্ভমেলায় এখনও বিদুষী সন্ন্যাসিনী নাবীকুল স্বচ্ছন্দে বিচবণ কবেন। হিন্দুব সমাজ-চিত্তে নাবীর আদর্শ আজ পর্য্যন্ত সজীব আছে, জাতিব স্পন্দন ঠিক্ আছে।

["আমাদের নাবী ও পুরুষদের মধ্যে অধিকাব বৈষম্যের কারণ সৃষ্টি হইয়াছিল বৌদ্ধ ধর্ম্মেব অবনতিব সময়।" (ঐ. ঐ)। "ঋষি, মুনি, দেবতা কাহাবও সাধ্য নাই যে সামাজিক নিয়মের প্রবর্ত্তন কবেন। সমাজের পশ্চাতে যখন তাৎকালিক আবশ্যকতার বেগ লাগে, তখন আত্মবক্ষাব জন্য আপনা আপনি কতকগুলি আচাবের আশ্রয লয। আত্মবক্ষার জন্য মনুষ্য যেমন অনেক সময় তৎকালে বক্ষা পাইবাব উপযোগী অনেক আগামী-অহিতকাবী উপায় অবলম্বন করে, সেই প্রকার সমাজও অনেক সময় সেইরূপে সেই সময়ের জন্য রক্ষা পান, কিন্তু যে উপায়ে বাঁচেন তাহা পবিমাণে ভয়ঙ্কব হয়।" (ঐ. ঐ)।

কোন সমাজই নির্দ্দোষ নয়। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বহু মাবাত্মক দোষ ঢুকেছে। এই দোষেব জন্য অনেকে হিন্দুব বিবাহপ্রথাকে দায়ী কবেন, হিন্দু-নারীত্বেব আদর্শকে দায়ী করেন। যাঁবা এই সব বলেন, তাঁবা হিন্দুব জাতীয জীবনেতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ বলতে হয়।

["একটি আপেল গাছ ও তাহার ফলের গুণাগুণ বিচাব কবিতে হইলে, যে সকল অপর,অপরিণত কীটদষ্ট ফল মাটিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পডিয়া থাকে—তাহাদের সংখ্যা অধিক হইলেও তুমি কি তাহাদের সাহায্য লও? যদি একটিও সুপক্ক ও পবিস্ফুট ফল পাওয়া যায় তবে সেই একটিব দ্বারাই ঐ আপেল গাছের শক্তি, সম্ভাবনা ও উদ্দেশ্য অনুমিত হয়—যে শত শত ফল অপরিণতই রহিয়া গিয়াছে, তাহাদের দ্বারা নহে।···

এমন পাশব ভাব কি আছে, পবিত্রতা ও সতীত্ব যাহা জয় করিতে না পারে? যে কল্যাণী সতী স্ত্রী নিজ স্বামী ব্যতীত সকলকেই তাঁহাব ছেলের মত দেখেন, আর সকল লোকের প্রতিই জননী ভাব পোষণ করেন, তিনি পবিত্রতা শক্তিতে এতদূব উন্নত হন যে এমন পশু প্রকৃতিব লোক নাই, যিনি তাঁহার সমক্ষে পবিত্রতার হাওয়া না অনুভব করিবেন।...তোমরা কি বলিতে চাও, রমণীর মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে তাহাকে ঠকাইতে পারা যায়, তাহা কখনও হয় নাই, হইতেও পারে না। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসাবে উহা সর্ব্বদাই আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। উহা অব্যর্থভাবেই সমুদয় জুয়াচুরি কপটতা ধরিয়া ফেলে, তাহা অভ্রান্ত ভাবে সত্যের তেজ, আধ্যাত্মিকতাব আলোক ও পবিত্রতাব শক্তি উপলব্ধি কবিয়া থাকে। যদি প্রকৃত ধর্ম্মলাভ করিতে হয়, তবে এইরূপ পবিত্রতা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আবশ্যক।" (ঐ)।]

অপকৃষ্ট ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ ক'বেও অনেকে ঋষিত্ব পর্য্যন্ত লাভ কবেছেন, ইহাব একমাত্র কারণ সাধুসঙ্গ, মহাপুরুষ-সংশ্রয়, কর্ষণা, পবিত্রতা ও কঠোব সাধনা, সংযম ও সত্যে নিষ্ঠা। ঐ সব ঋষিবা বা তাঁদেব পিতা-মাতাবা কেহই ভাবতেব ভাবধাবা হ'তে বিচ্ছিন্ন হননি। শকুন্তলার বিবাহে, 'বর্ণ' নিয়ামক নয়, শকুন্তলা ঋষি-পালিতা, ঋষিব আশ্রমে বৰ্দ্ধিতা, সুতবাং ঋষিজনোচিত শিক্ষা ছিল তাঁব মধ্যে, শকুন্তলার বিবাহেব মূল কাবণ গুণ ও কর্ম্ম—ঋষিকন্যাব। জীবন ঐ সব স্থলে বৈজিক-সংস্কাব, অধ্যাত্ম-সংস্কাব বলে শক্তিহীন হ'লেও, উকি মাবতে ছাড়েনি এক আধবাব।

পশুত্বেব তেজ ও দেবত্বেব তেজে আকাশ পাতাল প্রভেদ। বিক্ষুব্ধ চিত্তবৃত্তিব বহিঃপ্রকাশে যে স্বেচ্ছাচাবিতা, যে সংযমহীনতা—যাব মধ্যে থাকে কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতাব বীজ—সেটা কি তেজ, না, ব্যভিচাব? উচ্ছৃঙ্খলতাব নাম তেজ নয়, উহাব নাম দম্ভ। যখন যথার্থ তেজেব বিকাশ হয়—সে যেখানেই হোক্—তখনই মোহেব আকর্ষণে স্বেচ্ছাচাবীব স্বেচ্ছাচাবভাবও ক্ষণেকেব জন্য সংযতভাব ধাবণ করে, আব যাঁদেব জীবনই, সংযমেব ও আদর্শেব অনুসন্ধানে বত, তাঁদেবই মধ্যে তেজেব পূর্ণবিকাশ সম্ভাবনা, ইহা যে বোঝাতে হয় ইহাই আশ্চর্য্য। সতীত্বেব তেজে পশুও দেবতা হ'য়ে যায়, আর অসংযমীব সংস্পর্শে দেবতাও পশু হয়।

ভগিনী নিবেদিতা, স্বামীজি সম্বন্ধে লিখেছেন যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেব উপব

স্বামীজিব যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও, তিনি 'পুনর্ব্বিবাহ দ্বাবা ব্রতভঙ্গ' জিনিষটি মোটেই পছন্দ কবতেন না।

["বৈধব্যের শ্বেতবাস তাঁহার নিকট সর্ব্বপ্রকার পবিত্রতা ও সত্যের চিহ্নস্বরূপ ছিল। সুতরাং যে শিক্ষা-প্রণালী এই সকল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাহাকে তিনি স্বভাবতঃ শিক্ষা বলিয়া গণ্য কবিতেন না। চপলমতি, বিলাসিনী এবং জাতীয়তা-ভ্রষ্টা নারী শত বাহ্য পবিপাট্য সত্ত্বেও তাঁহার মতে শিক্ষিতা নহে, ববং অধঃপতিতা। পক্ষান্তবে কোনও আধুনিক ভাবাপন্ন স্ত্রীলোক সেই প্রাচীনকাল সুলভ একান্ত নির্ভরতা ও পরমভক্তির সহিত স্বামীর জীবনসঙ্গিনী হইলে এবং শ্বশুবগৃহেব পরিজনদিগের প্রতি প্রাচীন নিষ্ঠা বজায় রাখিলে, তিনি তাঁহার মতে 'আদর্শ হিন্দু পত্নী' বলিয়া বিবেচিত হইতেন।" (ভারতীয় নারী—পরিশিষ্ট)।]

নিষ্ঠা খুব ভাল, কিন্তু শ্রদ্ধা আবো বড জিনিষ। নিষ্ঠায় গোঁড়ামি আনাতে পাবে, নিজেবটি ছাড়া আব সব ঘৃণ্য মনে হ'তে পাবে; শ্রদ্ধায় তা হয় না। সতীব নিষ্ঠা শ্রদ্ধায় পবিণত। যেখানে সতীত্ব, সেইখানেই সতীব মস্তক ভক্তিতে অবনত হয়। ইহাই শ্রদ্ধা, ইহাই নাবীব 'পতিযোগ-সাধনা'।

["পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বাহ্যজাতির সংঘর্ষে ভাবত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগরূকতার ফল স্বরূপ স্বাধীন চিন্তাব কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে প্রত্যক্ষ শক্তিসংগ্রহরূপ-প্রমাণ বাহন, শতসূর্য্যজ্যোতিঃ, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেব দৃষ্টিপ্রতিঘাতি প্রতিভা; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহুমনীষী উদ্‌ঘাটিত, যুগযুগান্তরের সহানুভূতি যোগে সর্ব্বশবীবে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্ব্বপুরুষদিগেব অপূর্ব্ব বীর্য্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্ল্লভ অধ্যাত্মতত্ত্ব কাহিনী। একদিকে জড বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত কবিয়াছে, অপর দিকে এই কোলাহল ভেদ করিয়া ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী স্ববে, পূর্ব্বদেব দিগেব আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ কবিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী অপূর্ব্ব বাসনা উদয় করিতেছে; আবাব মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান, উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপব স্বাধীনতা, অপবদিকে আর্য্য সমাজেব কঠোব আত্মবলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে যে সমাজ আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্র কি ? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য— ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায় রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায় ত্যাগ। বর্ত্তমান

ভারত একবার যেন বুঝিতেছে—বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মকল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্ব্বনাশ করিতেছি, আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছে,—

'ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ।
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥'

একদিকে নব্য ভারত ভারতী বলিতেছেন, পতি-পত্নী নির্ব্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত, কারণ, যে বিবাহ আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ, তাহা আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নির্ব্বাচন করিব, অপরদিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন, বিবাহ ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। ইহাই এ দেশের ধারণা। প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত, তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।

একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই, আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন হইব, অপর দিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, মূর্খ, অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জ্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না, সিংহচর্ম্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দ্দভ সিংহ হয়?

একদিকে নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য জাতিরা যাহা করে, তাহাই ভাল, ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপর দিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী, বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান।

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের কি চেষ্টা যত্ন করিবার কিছুই নাই? --শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।' যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।—আছে, কিন্তু ভয়ও আছে।

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে সর্ব্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে, 'বুঝি কোনও ইংরাজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল।'

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য অনুকরণ মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভালমন্দের জ্ঞান, আর বুদ্ধি, বিচার, শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়

না। শ্বেতাঙ্গে যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল ; তাহারা যাহা নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় কি ?

.. বলবানের দিকে সকলে চায়, গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোনও প্রকারে একটু ও লাগে, দুর্ব্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপী বেশভূষা মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত !!...আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র-আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্য্য জাতি !! উহারা আর আমাদের নহে !!!

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে ? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে ? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজ ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র, ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর'।" (বর্ত্তমান ভারত—স্বামীজি)।

উপসংহার

ধাবাবাহিক বক্তৃতা শেষ হয়েছে। আজ সংক্ষেপে আপনাদেব গুটিকতক প্রশ্নের উত্তব দিয়ে, কিছুদিনেব জন্য আপনাদেব কাছে ছুটি চাই। (প্রশ্নগুলি দেওয়া হইল না)।

স্বদেশহিতৈষিণা (Patriotism) :—স্বদেশহিতৈষিণা ধোলো সভ্যতাব বিশেষ দান। কিন্তু উহা নিছক ভৌগলিক। দখলীকৃত ভূমি ও নাবীকে বক্ষার ভাব হ'তেই ধোলো স্বদেশহিতৈষণাব উদ্ভব। ভূমি ও নাবী নিয়েই, প্রধানতঃ, সমাজেব সৃষ্টি। তাব রক্ষাকল্পে শক্তিকে কেন্দ্রীভূত কববাব প্রয়োজন হয়। সমাজ যত বডই হোক্, তাব শক্তি যত প্রচণ্ডই হোক্, সভ্যতাব জন্ম সংযম হ'তে, সূক্ষ্মবৃত্তিসমূহের ক্রমপ্রসাব হ'তে। তাই সংযমকেই যেখানে প্রথম হ'তে সমাজেব প্রতি অঙ্গে ফুটিয়ে তুলে কার্য্যকবী কববাব চেষ্টা হয়, সেখানে নানা দেবতার উপাসনা, খুব জোব এক একটি মতবাদে পবিণত হয় মাত্র। সেখানে অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মশক্তিবই প্রাধান্য দেওয়া হয়। সুতবাং সেখানে নাবীবও একটা বিশিষ্ট স্থান থাকে। নাবীকে—স্ত্রীদেহ-মাত্রকেই—চিন্ময়রূপিণী, শক্তিরূপিণী অথবা শক্তিব অংশরূপিণীরূপে দেখবাব প্রয়াসে, উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কবকে আদর্শরূপে প্রতিফলিত কববাব উদ্যমে, কিম্বা ভূমিকে সেই সব মহান্ আদর্শেব লীলাবিলাসপূত লীলাস্থল বোধে যে স্বদেশহিতৈষিণাব উদয় হয়—শক্তিব মর্ম্মস্থল স্পর্শে যে ধন অর্জ্জিত হয়—যে স্বদেশপ্রীতি দেখা দেয়—তাব দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকতে পাবে না; ইহা আজ আমবা ভুলতে বসেছি, সভ্যতার স্বরূপকে উপেক্ষা ক'বে দলাদলি কবছি!

ধোলোদেব বিভিন্ন রাষ্ট্রান্তর্গত প্রত্যেক জাতিব জাতীয় উন্নতিব মূলে Patriotism, ইহাই ধোলোব বিশেষত্ব। কিন্তু খণ্ডদৃষ্টিব ফলে যে বিপদাশঙ্কা তা আমবা দেখতেই পাচ্ছি। ভারতেব স্বদেশহিতৈষিণা ছিল অন্য বকমেব। ভাবতেব একটি নাম 'কর্ম্মক্ষেত্র', কর্ম্মক্ষয় করবাব ক্ষেত্র। যেখানে এত বকম ধর্ম্মমত আবিষ্কৃত হয়, যেখানে জাতীয় চেষ্টা অমৃতেব

অনুসন্ধানে ব্যস্ত, সেই স্থান ভিন্ন কর্ম্মক্ষয়ের আর প্রশস্ত স্থান কোথায়? দেবতাদেরও এই ভারতে জন্মগ্রহণ করতে হয় মুক্তির জন্য। সুতরাং, ভারতের উপর যে সকলের গাঢ় প্রীতি, অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা জাগরিত হবে তাতে আশ্চর্য্য কি? ইহাই ভারতের স্বদেশহিতৈষিণা। আদর্শ-প্রীতিই ইহার মূল। এই স্বদেশহিতৈষিণা সকলেই গ্রহণ করতে পারেন—জাতিবর্ণধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে। ধোলো একই সময়ে একসঙ্গে দুটি 'state'এর সভ্য (member) হ'তে পারেন না, কিন্তু হিন্দুর 'state'এর অন্তর্গত হ'তে গেলে ঐ নিয়মও বিঘ্ন দিতে পারে না।

বেদপন্থী সমাজে, গৃহস্থাশ্রমের পর বাণপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম। অতএব, পারিবারিক জীবন বা বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্য, বিবাহিত জীবনকে অতিক্রম করা।

বাল্যবিবাহ, বিশেষ নারীর বাল্যবিবাহের কথা পূর্ব্বে আলোচিত হ'য়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহ-কথাও আপনারা শুনেছেন। অতবড় বিচারশীল সাধক যে বিনা উদ্দেশ্যে বিবাহ ক'রেছিলেন তা হ'তে পারে না। বাল্যবিবাহের মূল তত্ত্ব বজায় রেখে বিবাহপ্রথা প্রচলন, ব্যক্তি, জাতি ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর, ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহব্যাপার হ'তে বোঝা যায়। বাল্যকালই শিক্ষার সময়, চরিত্রগঠনের সময়। গোড়া হ'তেই যেখানে দম্পতির—উভয়ের—অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনই লক্ষ্য থাকে, সেখানে বাল্যবিবাহ ও যৌবনবিবাহে প্রভেদ থাকে না।

"আমরা মানুষ, আমাদের দেবতা ক'রে তুলো না'—এই রকম বাক্যের কোন অর্থ নেই, মানুষের মধ্যে পশুত্ব ও দেবত্ব দুইই আছে, তার মধ্যে দেবত্বকেই ফুটিয়ে তুলতে হয়। প্রকৃতির বৈচিত্র্যে অনুভূতির বৈচিত্র্য—সুন্দর, অসুন্দর, সুখ, দুঃখ। চাই আমরা সুখের স্থায়িত্ব, চাই না পরিবর্ত্তন-শীলতার প্রহেলিকা, মন চায় 'সত্যং শিব সুন্দরমকে'। পরিবর্ত্তনের পার, দ্বন্দ্বের পার যা তাই সর্ব্বসুন্দর, তাই সত্য—"সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ সৌমেভ্য-স্তৃতি সুন্দরী।"

সাবিত্রী সত্যবানের কথা আপনারা জানেন। সাবিত্রী রাজার মেয়ে। নিজের পতি নির্ব্বাচন করতে বলা হল। সাবিত্রী সত্যবানের গুণে মুগ্ধ ছিলেন, জানালেন তিনি যে সত্যবানই তাঁর স্বামী হবেন। সত্যবান,

অল্পায়ু, নাবদ ব'লেছিলেন। অল্পায়ু জেনেও, সাবিত্রী পিতাব আপত্তি শুনেও, সত্যবানকে পতিত্বে ববণ কবলেন। পিতাকে জানালেন যে তাঁব মনপ্রাণ তিনি সত্যবানকেই অর্পণ কবেছেন, তিনি দ্বিচাবিণী হ'তে পাবেন না! সতী, অনিত্যেব মধ্যে নিত্যকেই অনুসন্ধান কবেছেন।

বিবাহের পব বধূ ঘবে আসেন, বধূব প্রধান লক্ষ্য, পতিব মর্য্যাদা, পতিকুলেব মর্য্যাদা বা বংশমর্য্যাদামাত্র বক্ষা কবা নয়, কিন্তু যাতে পতিকুলেব গৌবব বৰ্দ্ধিত হয় তা দেখা। একটি ঐতিহাসিক ঘটনাব কথা বলছি। সদ্যবিবাহিত দম্পতি দলবল নিয়ে ফিবছেন, বিবাহটি হয়েছিল হঠাৎ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাজস্থান যশল্মীবেব অন্তর্গত পুগল নামক মরুভূখণ্ডেব প্রতাপশালী বাজা ছিলেন অনঙ্গদেব, তাঁব ছেলেব নাম সাধু— ভট্টিজাতিব শ্রেষ্ঠ বীব। সাধু কোন যুদ্ধ জয় ক'বে ফিবছেন। মাহিল-বংশীয় মাণিকবাও, তাঁব বাজধানী অবস্তিনগবে, পুগলকুমাবকে সাদবে আহ্বান কবলেন। মাণিকবাওয়েব সুন্দবী কন্যা কর্ম্মদেবী সাধুর বীরত্বে ও সাধুব গুণে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকেই পতিত্বে ববণ কবলেন। মাণিকবাও, বহু যৌতুকসহ ববকন্যাকে বিদায় কববার সময়, জামাতাব সঙ্গে ৪০০০ হাজাব মাহিল সৈন্য দিতে চাইলেন। সাধু নিজেব বীবত্বেব উপব নির্ভব ক'বে ঐ সৈন্য নিলেন না, নিজেব ৭০০ শত ভট্টিসৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন। বাঠোব বাজবংশীয় মান্দাব বাজকুমার অবণ্যকমলেব ববাবব ইচ্ছা ছিল কর্ম্মদেবীকে লাভ কবতে, এখন, অবণ্যকমল ঐ বিবাহেব কথা শুনলেন, পথিমধ্যে চন্দনগ্রামে ৪০০০ হাজার বাঠোব সৈন্য নিয়ে সাধুকে আক্রমণ কবলেন। কর্ম্মদেবী, তাঁব বীব পতিকে উত্তেজিত কবলেন, দ্বন্দ্বযুদ্ধে সাধু বীবশয্যা গ্রহণ কবলেন, অবণ্যকমলও বিষম আহত হলেন। এইবাব তেজস্বিনী বীববালাব পালা, ধীবভাবে, অবিচলিতচিত্তে, দেবী নিজ বাহু ছেদন কবলেন, পতিব একজন বিশ্বস্ত সৈনিকেব হাতে সেই বাহুটি দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ কবলেন,—"যাও বীব এই বাহু নিয়ে আমাব শ্বশুরেব কাছে, বলবে তাঁকে সব কথা, আব বলবে, তাঁর পুত্রবধূ এইরূকমই ছিল।" দেবীব অপব বাহুটিও কেটে ফেলতে তিনি আদেশ কবলেন, আদেশ প্রতিপালিত হল, দেবী স্বামীব সঙ্গে চিতায় আবোহণ কবলেন! পতিকুলেব মর্য্যাদা, শ্বশুবকুলেব প্রতিষ্ঠা, বীবত্বেব গৌরব, এইরকম ক'বেই বধূ বক্ষা

করতেন সেদিন পর্য্যন্ত। কি মহারাষ্ট্রদেশে, কি বাঙ্গলায়, শ্বশুরবংশের গৌরব রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের উদাহরণ অনেক আছে। ঐ যে হঠাৎ বিবাহ, হঠাৎ সব শেষ, ইহাতে পতিপত্নীর ভোগাকাঙ্ক্ষা কোথায়? প্রধান সেখানে কোনটি? আর ঐ যে পতির নিশ্চিত মৃত্যু জেনেশুনে, সাবিত্রীর পতিনির্ব্বাচনে দৃঢ় সংকল্প, সেখানে প্রধান কোনটি? ঐ যে সাবিত্রীর যমরাজের সম্মুখীন হওয়া, মৃত্যুরেও উপেক্ষা ক'রে মৃত্যুর পারে যাবার চেষ্টা—এই যে কাহিনী ইহাতে কি প্রমাণ করে? এই যে এখন বলা হয় যে অত্যাচারীর পীড়নভয়ে, কলুষস্পর্শের ভয়ে জহরব্রত পালিত হত, এ কল্পনার মধ্যে সত্য কতটুকু? যাঁরা ঐ ব্রত পালন করতেন, তাঁরা কি অস্ত্র ধারণ করতে জানতেন না? মহাবীর Alexander-ও ভারতে নারীর বীরত্ব দেখে গেছেন। কে বলবে যে ঐ রকম ব্রত, বীরত্বের, মর্য্যাদা-জ্ঞানের, নির্ভীকত্বের নিদর্শনস্বরূপ আদর্শ রক্ষার জন্য পালিত হত না? জীবনের চরম আদর্শের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ভারতের সাধু প্রায়োপবেশনে দেহরক্ষা করেন, শরীরকে অপ্রয়োজনীয় বুঝে—উপলব্ধি ক'রে—সাধু স্বেচ্ছায় নিজদেহকে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, কে বলতে পারে যে সতীও—পতি অভাবে নিজ দেহ অপ্রয়োজনীয় বোধে, পতির সঙ্গে মিলিত হবার দৃঢ় বিশ্বাসে—ঐভাবে আত্মাহুতি স্বেচ্ছায় দিতে পারেন না?

আকবর যে নীতি অবলম্বন ক'রেছিলেন, তাতে রাজনৈতিক কূটকৌশল থাকলেও, তাঁর চরিত্রের দোষগুণ সত্ত্বেও, তিনি ছিলেন উচ্চমনা, তিনি কারোর ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দেননি। তিনি হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন, হিন্দুর ধর্ম্মাচারের বিরোধী ছিলেন না। এই সব কারণে, হিন্দু ছিল তাঁর রাজ্যের প্রধান সহায়। আকবরের নীতি বাধা না পেলে জাতিভেদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা বিষ, উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রাণহীন আভিজাত্যগৌরব, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রীতিনীতি বা আচার-স্বাতন্ত্র্যের জন্য পৃথক স্বার্থরূপ ভেদকল্পনার বিষ আজ এত প্রবলাকার ধারণ করত না, উভয় সমাজই নিজ নিজ দোষগুণ বুঝে, নিজ নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ বজায় রেখে, বল, সঞ্চয় করত ও সমভাবে সুখদুঃখের ভাগী হ'য়ে একই স্বদেশপ্রীতিতে গ্রথিত হত হয়ত। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদনীতি প্রয়োগ করেন ঔরংজেব। সেই ভেদবুদ্ধি

তীক্ষ্ণ হয় তাঁর মুসলমান ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মের গোঁড়ামিতে। স্থলবিশেষে, কূট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁর উদারতা দৃষ্ট হ'লেও, তিনি কারণে ও অকারণে যথা তথা হিন্দুর ধর্ম্ম বিশ্বাসে আঘাত করেছিলেন, পক্ষপাতদুষ্ট হ'য়ে রাজধর্ম্মের অবমাননা করেছিলেন এবং এই সব নানা কারণে, বীরত্ব সত্ত্বেও, অত বড় সাম্রাজ্য ধ্বংসমুখে দাঁড়াল, মুসলমানশক্তি অন্তর্হিত হল, যার ফল এখনও মুসলমান ভোগ করছেন। ভারতবাসীর বা হিন্দু-মুসলমানের জাগরণ ঔরংজেবের উদ্দেশ্য ছিল না। মহারাষ্ট্রশক্তির উত্থানে হিন্দু মিলিত হননি, মুসলমানশক্তির উত্থানে মুসলমানও মিলিত হ'তে পারেন নি, ভারতে উভয় শক্তির মিলন সম্ভব হ'তে পারত, যদি আকবরনীতির বীজ বিকশিত হত।

সহমরণ প্রথা :—[এ সম্বন্ধে ৺দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় বিশদ আলোচনা করেছেন। (পৃথিবীর ইতিহাস—ভারতবর্ষ দ্রঃ)]। সতীদাহ সম্বন্ধে যে আন্দোলন উঠেছিল, সংক্ষেপে সেই কথা আপনাদের জানাব। ঋগ্বেদ (১০ম. ম.—১৮ সূ।৭।৮) ঋকের 'যোনিমগ্নে' কথাটি নিয়ে গোল বাধে। সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে দুষ্ট ব্রাহ্মণেরা বা পুরোহিতেরা মূল 'যোনিমগ্রে' স্থানে 'যোনিমগ্নে' করেছে, অতএব ঐ অশাস্ত্রীয় প্রথা বন্ধ করতে হবে। সে সময়ে মহানুভব Sir William Bentinck ছিলেন গভর্ণর জেনারেল। ইনি ঐ বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিতে, ঐ প্রথা আইন ক'রে বন্ধ করলেন ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে। ইহাই সতীদাহ-নিবারণ-আইন। সমাজকে সচেতন করবার চেষ্টা না ক'রে, সমাজ সংস্কারে ঐ প্রথম ধোলোর হাত পড়ল। ঐ আন্দোলনের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন তখন মনীষী রাজা রামমোহন। সাব্যস্ত হল যে 'যোনিমগ্রে' পাঠটিই ঠিক্। কিন্তু তার বহুপূর্ব্বে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে হেনরী কোলব্রুক সাহেব Asiatic Researches পত্রিকায় ঐ দুই ঋক্ উদ্ধৃত ক'রেছিলেন, তাতে 'যোনিমগ্নে' কথাটিই আছে। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে উইলসন সাহেব 'যোনিমগ্নে' পাঠই নিয়েছেন। কিন্তু, সতীদাহ-নিবারণ-আইনের সময় কোলব্রুক্ বা উইলসন সাহেবের কথা হিন্দু পণ্ডিতেরা উল্লেখ করেন নি। আইন পাশ হবার পর বৎসরে রামমোহন বিলাত যান। মোক্ষমুলার সাহেব, রামমোহনের মতকে সমর্থন করেন ১৮৮১ সালে; ইহার পর অনেকে ঐ মত সমর্থন করতে আরম্ভ করেন। 'যোনিমগ্রে'-বাদীরা

বলেন যে বৈদিক যুগে সহমবণ প্রথা ছিল না, তাঁদেব মতে উক্ত ঋক্‌দ্বয়েব সাবার্থ এই, 'পত্নী তাঁব পতিব প্রতি সব কর্ত্তব্যই পালন করেছেন জেনে, মৃতেব জন্য বৃথা শোককাতব না হ'য়ে, বৃথা বৈধব্য-দুঃখ ভোগ না ক'বে, বিধবা, বসনভূষণে উত্তমরূপে সজ্জিত হয়ে ঘবে ফিবে আসুন' ইত্যাদি। 'যোনিমগ্রে'-বাদীবা বলেন যে উক্ত ('যোনিমগ্রে) পাঠ ববাবরই আছে, অর্থাৎ ৭ম ঋকেব অর্থ এই যে, বিধবা, বৃথা বৈধব্য-ভোগ না ক'বে, সধবার বেশে অগ্নিব আশ্রয় গ্রহণ করুন। ৮ম ঋকেব অর্থ সম্বন্ধে কোন মতভেদ নেই; উক্ত ঋক বলেন যে মেয়েটি উঠুক্, সংসাবে ফিবে আসুক্, বুঝুক যে এতদিন সে পতিসেবায় অবহেলা কবে নি। 'যোনিমগ্রে' পাঠে, ৭ম ঋকে অগ্নির আশ্রয় নিতে বলা হচ্ছে, ৭ম ও ৮ম ঋক্ মিলিয়ে পডলে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে যাঁরা স্বেচ্ছায় সহমৃতা হতেন, তাঁদের বাধা দেওয়া হয় নি, কিন্তু যাঁবা অসমর্থ বা সহমৃতা হবাব যাঁদেব ইচ্ছা নেই, তাঁবা বৃথা শোকাভিভূত না হ'য়ে ঘবে ফিবে আসুন। যাঁবা সহমরণ-প্রথা বন্ধ কবতে চান, তাঁদেব মতে অর্থ হয় যে স্বামী মৃত হলেও, মৃত পতিকে শশ্মানে বেখে, বিধবা ভাল ক'বে সেজে গুজে ঘবে ফিবে আসুন!! প্রথম ঋকে "ইমানাবীববিধবা' সুপত্নীবাঞ্জনেন " ইত্যাদিব অর্থ "এই সকল স্ত্রী অবিধবা অর্থাৎ বৈধব্য বহিত হ'য়ে চক্ষে অঞ্জন লাগিয়ে পতি-শোভনা হয়ে··" ইত্যাদি, 'অগ্নে'-বাদীরা বলেন যে ঐ বকম সধবাব ('অবিধবা') বেশেই মেয়েটিকে অগ্নিব আশ্রয় নিতে বলা হয়েছে, আব, 'অগ্রে'-বাদীদেব মতে, ঐ বকম বেশ ভূষায ভূষিত হয়ে মেয়েটি 'অগ্রগামী' হয়ে ঘবে ফিবে আসুন। বস্ত্রভূষণে ভূষিত হবাব কথাটি পবে আছে, অর্থাৎ অলঙ্কার প'বে, চক্ষে অঞ্জন লাগিয়ে অগ্রগামী হয়ে—দৌড়ে সকলেব আগে ঘবে ফিবে আসুন বিধবা, এই অর্থই স্পষ্ট দাঁডায় 'অগ্রে'-বাদীদেব মতে!! এই অসম্ভব অর্থ দেখে পবে অনেকে বিদ্রূপ কবেছেন; বিধবা হ'য়ে, নাবী কাঁদবেও না, আবাব সেজে গুজে, চক্ষে অঞ্জন লাগিয়ে ঘবে ফিবে আসবে তক্ষুণি—এত আহ্লাদ পতি হাবিযে? এ ভান্‌টা কেন, আব হাসতে হাসতে ফিরে আসতে বলা হল কেন? মৃতের স্মৃতিকে সদ্য অপমান কবতে?

৭ম ঋকে 'আবোহন্তু' কথাটি আছে মূলে, 'অগ্নেবাদীবা' বাক্যার্থ ধ'বেই—যেমনটি আছে সেই রকম অর্থ করেন, "চিতায় আবোহণ করুন;" 'অগ্রে'বাদীবা

অর্থ কবেন 'অগ্রগামী হয়ে ঘবে প্রবেশ করুন।' বলা বাহুল্য যে 'আবোহন্তু' কথাটিব অর্থ 'প্রাপ্নবন্তু' কবলে দুদিকেই মানে কবা যায়। 'যোনিমগ্নে' পাঠ সমেত ঐ দুটি ঋক্ যজুঃ সংহিতায়, অথর্ব্ব সংহিতায, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় আবণ্যকে (ষষ্ঠ প্রপাঠক, ১০ম অনুবাকে) আছে।

'অগ্নে' স্থলে যাঁবা 'অগ্রে' কবেছেন, তাঁদেব 'সংস্পৃশ্যন্তাম' স্থলে 'সম্বিশন্তু,' 'অনশ্রয়ঃ' স্থলে 'অনশ্রব', 'সুশেবা' স্থলে 'সুবত্ন' পাঠ কবতে হয়েছে—যা 'বাজাব' উদ্ধৃত ঋকে আছে।

দুর্ব্বল সমাজে তখন পাপ ঢুকেছিল, অনেক স্থলেই বলপ্রযোগ কবা হত। সমাজ-সহায় পুরুতেবা নাবীকে জোব ক'বে ধর্ম্ম কবাচ্ছেন মনে কবতেন। পুরুষেবা নিজেদেব দিক্ দেখতে পেতেন না, জডপ্রায় সমাজেব বুদ্ধি ও জডপ্রায় হযে গিয়েছিল। অবাধে নাবী হত্যা চলেছিল। এই নাবী-হত্যারূপ মহাপাপেব ফল আজও আমবা ভোগ কবছি। সমাজেব এই শোচনীয় অবস্থাব প্রতিকাব বিশেষ দবকাব হয়েছিল। কথিত আছে, ১৮১৭ সালেই সাতশত বিধবা সহমবণে দেহ-বক্ষা কবেন। বলপ্রকাশেব করুণ দৃশ্য ও বীভৎস আচবণ হৃদয়বান বামমোহনকে বিচলিত কবেছিল। কত বড় সাহস নিয়ে, কত বড প্রাণ নিয়ে, তিনি তখনকাব সমাজেব প্রবল বাধাকে তুচ্ছ ক'বে, নাবীহত্যা বন্ধ কবতে বদ্ধপবিকব হয়েছিলেন, তা ভাবলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। সহমবণ-প্রথা বন্ধ হয়ে ভালই হয়েছে। ঐ বকম ভাবে নাবী-হত্যায় সমাজ দ্রুত ধ্বংসমুখে অগ্রসব হচ্ছিল। বামমোহন সমাজকে ধ্বংসমুখ হ'তে সে সময়ে বক্ষা কবেছেন। বামমোহনেব মহাপ্রাণতা সম্বন্ধে সন্দেহ হ'তে পাবে না। কিন্তু অপপ্রথা বন্ধ হওয়া এক কথা, আব শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে পাঠান্তবেব আশ্রয়ে সমাজেব উপব ধোলো প্রভাব বিস্তাব কবতে দেওয়া আব এক কথা। ঐ পাপ-প্রথা বন্ধ কবতে গিয়ে বামমোহন যে উপায় অবলম্বন ক'বেছিলেন, তাহা অনেকে সমর্থন করেন না। তিনি ঐ সব পাঠান্তব কোথায় পেয়েছিলেন, তাব কোন উল্লেখ নেই, প্রমাণও নেই। এ কথাও ঠিক্ যে রামমোহন যে উপায় অবলম্বন ক'বেছিলেন, সেই উপায় ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে গোঁড়া সমাজকে তাঁবপক্ষে বক্ষা কবা সম্ভব হ'ত না, সেই জন্যই আইনেব সাহায্য দবকাব হয়েছিল।

ভাবতেব সকল সংস্কাবকই ধর্ম্মবীব বলে গণ্য। জনসমাজ মনস্বী

রামমোহনকে ধর্ম্মবীর ব'লে সে সময়ে অঙ্গীকার করে নি, কারণ (১) বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপরে তাঁর প্রীতি ছিল না; (২) তিনি মুসলমান কন্যার পাণিগ্রহণ ক'রেছিলেন, (৩) তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ক'রেছিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম তন্ত্রের বা অদ্বৈত বেদান্তের ব্রাহ্মধর্ম্ম নয়। (৪) তিনি লোকাচারকেই হিন্দুধর্ম্ম মনে ক'রে বিষম ভ্রমে পতিত হয়েছিলেন। এই সব নানা কারণে তিনি হিন্দু সমাজে নিজ চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। পণ্ডিত সমাজেও তখন এমন কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না যে তাঁরা রাজার পাণ্ডিত্য বা যুক্তির সম্মুখে স্থির থাকতে পারেন। তখনকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজে বেদচর্চ্চা বিরল ছিল, তাছাড়া যখন পণ্ডিত সমাজ দেখলেন যে রাজা সংস্কৃত-সাহিত্য প্রচার অপেক্ষা ইংরাজি বিদ্যার প্রসারকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিলেন ও সংস্কৃত গৌণ হ'য়ে গেল, তখন তাঁরা রামমোহনকে আর বিশ্বাস করতে পারলেন না, বিশেষ যখন তিনি হিন্দুসমাজ হ'তে পৃথক হ'য়ে দাঁড়ালেন।

'সহমরণ'কে বরাবর ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্গত ব'লে ভারতে স্বীকার করা হত। স্মৃতি-শাস্ত্র স্বেচ্ছাবৃত সহমরণকে নিন্দা করেন নি, বলপ্রয়োগকেও সমর্থন করেন নি। স্পষ্ট উক্ত হয়েছে যে অসমর্থে নারী দশ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে শুদ্ধ হবেন। কঠোর ভাবায় বলপ্রয়োগের নিন্দা নেই, কারণ, সে সময়ে বলপ্রয়োগের কোন প্রশ্নই ওঠে নি—সহমরণে যাওয়া না যাওয়া স্বেচ্ছাধীন ছিল। রামায়ণে কৌশল্যা-দেবী দশরথের সঙ্গে সহমরণে যেতে চান, কিন্তু গুরু বশিষ্ঠদেব নিষেধ করায় দেবী নিবৃত্ত হন। মহাভারতে, দেবী মাদ্রী সহমৃতা হয়েছিলেন, কুন্তীদেবী হন নি। বিষ্ণুপুরাণে, বৃদ্ধ রাজা বাহুক ঊর্ব্ব ঋষির আশ্রমে দেহত্যাগ করেন, তাঁর স্ত্রী সহমৃতা হবার জন্য উৎসুক হন। ঋষির নিষেধে রাণী সহমৃতা হন নি। স্ত্রীকে স্বামীর চিতা সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হত, তারপর পতি-ধ্যান ক'রে নদীতে স্নান তর্পণাদি করবার পর সধবার বেশে অর্থাৎ নিজে তখনও সধবা জেনে, স্বেচ্ছায় চিতা আরোহণ করতে হত, সেই সময়ে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করা হত। শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের স্ত্রীরাও সহমৃতা হন। (পৃথিবীর ইতিহাস দ্রঃ—দুর্গাদাস)।]

শাস্ত্রে সহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্মচারিণী হ'য়ে জীবন যাপনকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হত—"সগচ্ছত্যুত্তমং স্থানং ন চেহ জায়তে পুনঃ" (মনু), মনুর মতে, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালনে মুক্তি হয়—আর সংসার জ্বালায় দগ্ধ হ'তে হয় না। "মৃতে ভর্ত্তরী সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা" (মনু ৫ম অঃ)। বিধবার শ্বেতবাস এখনও

অনেকে সম্মানের চক্ষে দেখেন। একজন নারীকে বলতে শুনেছি, "সত্ত্বগুণী বিষ্ণুর শ্বেতবাস, স্বামী বিষ্ণুরূপ, অতএব বিধবার শ্বেতবাস (বা অঙ্গাবরণ) সর্ব্বদা পবিত্র।"

বলপ্রয়োগে মৃতের পাশে ঠেলে দেওয়া যাতে না হয়, তা দেখতেন রাজকর্ম্মচারীরা। সতীদাহ আইন প্রথম প্রথম কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয় নি, ঐ আইন পাশ হবার পরও (Dr. Sleeman) ডাঃ স্লিম্যান সাহেব ও তাঁর পত্নী দেখেছেন নারীকে স্বেচ্ছায় সহমৃতা হ'তে কলিকাতায়। স্লিম্যান সাহেব ঠগী দমন ও সতীদাহ নিবারণ আইনদ্বয়কে কার্য্যে পরিণত করবার ভার গ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং তাঁর চক্ষে অনেক ঘটনাই পড়ত। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট। একবার সাহেব দম্পতির সাগ্রহ অনুরোধ-উপরোধ, তাঁদের সহৃদয় যুক্তি, আত্মীয় স্বজনের অশ্রু, সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানের আর্ত্তনাদ, ঐ শিশুটিকে সাহেব-দম্পতির দ্বারা মাতার কোলে বসিয়ে দেওয়া প্রভৃতি কিছুতেই নারীকে তাঁর সহমৃতা হবার দৃঢ়সংকল্প হ'তে প্রতি নিবৃত্ত করতে পারে নি। সংযুক্তার স্বেচ্ছাসহমরণের কথা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এই সব বীর্য্যবতী নারী কি সহমৃতা হ'তেন কলুষস্পর্শ ভয়ে?

যে সব বিদেশী পর্য্যটক ভারতে এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই হিন্দুর শৌর্য্য বীর্য্যের, নারীর সতীত্বের ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। ধোলোদের মধ্যে কেহ কেহ বলতে আরম্ভ করলেন যে তখন জাতির মধ্যে একটা কুসংস্কার ছিল যেমন 'মিথ্যা কথা বললে বংশ লোপ হয়।' এই কুসংস্কারের ভয়ে জাতি মিথ্যা কথা বলত না। তাঁরা ভুলে যান যে ঐ সব পর্য্যটকেরা সাধারণ হিন্দুচরিত্রই বর্ণনা করেছেন। দেশে সে সময়ে বিচারালয় ছিল, যুদ্ধ বিগ্রহও হ'ত। বিচার হত কাদের? পাছে বেশী কথায় মিথ্যা কথা বলা হয়, এই জন্য সে দিন পর্য্যন্ত অনেকে আদালতে যেতে চাইতেন না। এখনও অনেকে জীবনে কখন সাক্ষী দিতে যান নি বা আদালতে যাবার তাঁদের দরকার হয় নি। জাতির সত্যনিষ্ঠা ছিল ব'লেই তখন জাতির সম্মান সর্ব্বত্র ছিল।

বাল্য-বিবাহ:—বাল্য-বিবাহ ও তার মূলনীতি সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করেছি। বাঙ্গলাদেশে এক সময়ে হিন্দুর এমন সঙ্কটকাল এসেছিল যখন নারীর বাল্য-বিবাহের সঙ্গে উল্কিপরার বহুল প্রচার হয়েছিল (ভারতবর্ষের ইতিহাস দ্রঃ)। যে সময়ে বাঙ্গালা দেশে মুসলমানদের

ঘোর অত্যাচার আরম্ভ হয়, পণ্ডিতেরা বলেন, সে সময়ে বাঙ্গলায় দুটি সামাজিক প্রথা প্রবল হয়, (১) শিশু-বিবাহ, (২) মেয়েদের উল্কিপরা। ইসলামের শাসন অনুসারে, কোন মুসলমানই অন্যের বিবাহিত পত্নীকে বিবাহ করতে পারেন না; ঐরূপ স্থলে বিবাহ হ'লে, মুসলমান স্বসমাজচ্যুত হ'তেন ও পতিত বলে গণ্য হ'তেন। হিন্দুর divorce ('তালাক্' বা বিবাহ-বিচ্ছেদ) নেই, স্বামী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করলেও, স্ত্রী স্বধর্ম্মেই থাকতে পারেন হিন্দুমতে অথচ স্বামীর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ-জন্য স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর কোন প্রকার দৈহিক সম্পর্ক না থাকলেও, স্ত্রী স্ত্রীই থাকেন, বিবাহ অসিদ্ধ হয়ে যায় না। সে ক্ষেত্রে সহধর্ম্মিনী হিসাবে, স্ত্রী, স্বামীর ধর্ম্মান্তর গ্রহণের জন্য পতির মঙ্গল কামনায় ব্রহ্মচারিণী হয়ে জীবন যাপন করেন। যাই হোক্, মেয়েদের বিবাহ দিলেই যখন সে অত্যাচারী মুসলমানদের হাত হ'তে রক্ষা পায়, তখন বিবাহ দেওয়াটাই রক্ষা পাবার সহজ উপায়, আর উল্কিপরা নারী মুসলমানের কাছে অস্পৃশ্যা 'হাবসী'। ঔরংজেবের ভেদনীতির ফলে মুসলমান রাজশক্তির মধ্যেও প্রবল হিন্দুবিদ্বেষ, মুসলমানদের মধ্যে আত্মকলহ, ঘোর স্বার্থপরতা, কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতিতে সমগ্র দেশে অরাজকতার তাণ্ডব নৃত্য হ'তে থাকে, মুসলমানশক্তি ছিন্ন ভিন্ন ও চূর্ণ হয়ে যায়। এই সময়ে বহু প্রথা প্রচলিত হয় আত্মরক্ষার জন্য ও অন্যান্য কারণে, যে প্রথাগুলিকে আজ আমরা 'কুসংস্কার' বলি।

বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের দানও সামান্য নয়। মুসলমান শাসকদের মধ্যেও অনেকে বাঙ্গলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন। হিন্দুর যেমন আরবী ও ফার্সিতে অনুরাগ ছিল, মুসলমানেরও সেই সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যে অনুরাগ ছিল; সুতরাং উভয়ের মধ্যে প্রীতি, সৌহার্দ্দ্য ও ঐক্য ছিল— বাঙ্গালীর গৌরব রক্ষা করতে তাঁরা একত্র হ'তেন। কিন্তু আজ তাঁরা নারীর অপমান বন্ধ করার জন্য কি করছেন?

"ভারত হ'তেই বিদ্যা যায় মুসলমানদের কাছে, মুসলমানরা সেই বিদ্যা ছড়িয়ে দেন ইউরোপে। আরব মিশ্র মূরেরা স্পেন জয় ক'রে সেখানে আট শতাব্দী রাজত্ব করেন। সেই সময়ে তাঁরাই ইউরোপে, নারীর পূজা, শক্তির পূজা প্রবর্ত্তন করেন। ক্যাথলিক সম্প্রদায় সাদরে সেই পূজা গ্রহণ করেন"। তাই হ'তে "ইউরোপে সভ্যতার উন্মেষ, শক্তি পূজার অভ্যদয়। মূর ভুলিয়া গেল—শক্তিহীন, শ্রী হীন হইল, স্বস্থানচ্যুত হইয়া

আফ্রিকার কোণে অসভ্য প্রায় হইয়া বাস করিতে লাগিল—আর সেই শক্তির সঞ্চাব হইল ইউরোপে, মা মুসলমানকে ছাড়িয়া উঠিলেন কৃশ্চানের ঘবে।" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-স্বামীজি।]

ক্যাথলিকদেব মধ্যে প্রথম প্রথম মাতৃভাবেব পূজা—সর্ব্বক্ষেত্রে শক্তি-পূজা, কথায় নয়, কিন্তু, আচবণে ঐ পূজা যথার্থ প্রচলিত হয়, তখন পববর্ত্তী কালেব মত 'Grande Dame' পূজা ছিল না, তাব প্রমাণ পাওয়া যায় সে সময়কাব ইটালীয় গ্রন্থে। পবে এই শক্তি পূজা হয়ে দাঁড়ায় যৌবনেব পূজা, যা এখনও দেখা যায়।

বিভ্রান্ত ত্যাগ-শক্তি খণ্ডীকৃত হ'লে ফলও খণ্ডীকৃত হয়, স্থায়ী হয় না, সমষ্টিবোধ জাগে না। কিন্তু ইহা দূব কবতে হলে চাই আত্মাদরবোধ, চাই জাতিব উপব শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। নানা বিপ্লবেব অগণিত অপসংস্কাব বাশিব আবর্জ্জনা আমাদেব জাতীয় চেতনাকে রুদ্ধ ক'বে বেখেছে। মানবতাব আদর্শই এই আবর্জ্জনাব চাপ সবাতে সমর্থ। এই আদর্শ সহায়ে ঐ চাপ সবালে, হবে তখন ঐ ধাবাব সঞ্চিত বেগে নতুন সাড়া।

প্রাচীন পেরুভিয়ানদেবও ত্রিতত্ত্ববাদ ছিল, নাম তাব "তঙ্গ তাঙ্গ"—একেই তিন, তিনেই এক—এক তনু, এক অঙ্গ। দেবতাও ছিল, নাম তাঁব বীবকোচ। আমেবিকার 'প্রাচীন মায়ান্' সভ্যতায় 'ইডা' 'পিঙ্গলা', 'সুষুম্নার' যথার্থ ভাবোদ্যোতক কথা পাওয়া যায়।

পিতৃপুরুষের পূজা অনেক দেশেই আছে। হবিবংশ হ'তে জানা যায় যে ভাবতে সনৎকুমাবই শ্রাদ্ধ ও পিতৃপুরুষেব পূজা প্রবর্ত্তন কবেন। ভাবতেব সংস্পর্শে যে সব জাতি এসেছেন ও ভাবতেব সঙ্গে বহুকাল ভাবেব সম্বন্ধ বেখেছেন, সেই সব জাতি ছাড়া পিতৃলোকেব এ বকম পবিত্র ভাব অন্যত্র পাওয়া যায় না।

হিন্দু জাতির স্বধর্ম্মসংস্কাব পবিত্যাগে জাতিব ক্ষতি-আশঙ্কাব কথা উঠেছে। উহাব সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে লোক ভয়, অন্নাভাবেব ভয়, মানহানিব ভয়, ইত্যাদি অনেক ভয় সমাজেব পক্ষে কল্যাণকব—এই ধাবণা এত দিন সর্ব্বত্র ছিল, কিন্তু তাতে নতুন উদ্দেশ্য উত্যক্ত হয় না। যে সমাজ যত অধিক দিন পথ বিশেষকে অবলম্বন ক'বে এসেছে, তাব পক্ষে নতুন কোনও পথাবলম্বন কবা ততই কঠিন, এতএব এই বলশালী সমাজ-ভিত্তি সৃষ্টি কবতে হলে,

নতুন উপনিবেশ স্থাপন করাই শ্রেষ্ঠ উপায়, যে স্থানে নব নারী প্রাক্তন সংস্কারাপেক্ষা ও কঠিনতর বন্ধনরূপ সমাজ শাসন হ'তে দূরে থেকে নতুন উৎসাহ, নতুন উদ্যোগ প্রয়োগ ক'রে নব বলে বলীয়ান হবে।

ভারতের বাইরে উপনিবেশের কল্পনা এখন পাগলামি, কিন্তু দেখতে পাই যে বাঙ্গালী সাঁওতাল পরগণা ইত্যাদি স্থানে বহু দিন হ'তে উপনিবিষ্ট হয়েছেন। ঐ সব স্থানে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে কোন সংহতি-শক্তির চেষ্টা নেই, উপনিবেশের ভাবও নেই। সব যেন ছোড়ভঙ্গ, এক একটি পৃথক কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, সে সব কেন্দ্রে প্রাণ নেই, গতি নেই, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যও নেই! প্রবাসী বাঙ্গালীরা চেষ্টা করলে অতি কম বাধায় সেখানে সংহতি-শক্তি সৃষ্টি করতে পারেন, নতুন সমাজ উল্লিখিত আদর্শে গড়তে পারেন। কিছুদিন পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য, কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি অনেক জমি নিয়েছেন, সেখানে তাঁরা সকলকে আধুনিক প্রণালীতে শিল্প ইত্যাদি শিক্ষা দেবেন। জাতীয় ভাবে জাতিকে স্বাবলম্বী হয়ে নতুন সমাজ গড়তে হলে, দরকার গৃহস্থ প্রচারক তৈরী করা।

পূজা পাঠ, ব্রত ইত্যাদি অনেক জিনিষের জন্য ব্রাহ্মণের দরকার আজও; আজও জন-শক্তির উপর ব্রাহ্মণের অল্পবিস্তর প্রভাব আছে। চরিত্রবান তপঃ-পরায়ণ ব্রাহ্মণের প্রভাব স্বতঃসিদ্ধ আজও ভারতে। মনে রাখতে হবে, ব্রাহ্মণও হিন্দু-জাতিরূপ-বৃহৎ-পরিবারের বিশিষ্ট অঙ্গ ও তাঁদের মধ্যে, ধোলো-বিদ্যায় শিক্ষিতগণ অপেক্ষা, নিষ্ঠার দৃঢ়তা আছে, কেবল শিক্ষার অভাবে ও নানা কারণে তাঁদের এই বর্ত্তমান অবস্থা। অতএব তাঁদের মধ্যে প্রাচীন শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা সহজ ভাবে বিস্তার আবশ্যক। ব্রাহ্মণকে বাদ দিলে, ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত আর সমস্ত বর্ণ একত্রিত হয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষের ন্যায় এক নতুন ধর্ম্ম সৃষ্টি করবে। তার ফলে আসবে সমাজে ঘোর বিপ্লব ও উচ্ছৃঙ্খলতা, মতবাদের স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি। বৌদ্ধ প্লাবন অপেক্ষাও ইহার বেগ শতগুণ হবে, জাতি বালকত্ব প্রাপ্ত হবে। (বেলুড় মঠের নিয়মাবলীর সব কথা এখনও অপ্রকাশিত)।

Politics (রাজনীতি)কে যদি সমাজনীতিতে প্রয়োগ করা হয়, তা হলে ইহাকে এই ভোগতারতম্য সমুত্থিত অধিকার প্রাপ্ত ও অধিকার নিরাকৃত

জাতি সমূহের সংগ্রাম বলতে হয়। তাছাড়া আমাদের সকলকে বুঝতে হবে যে, আজ যা Political policy (রাজনীতি কৌশল), কাল সেই policy সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। অতএব ঐ policy নিয়ে দাপাদাপিতে কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যেতে পারে না। ইহা হিন্দু মুসলমান বা খৃষ্টান সকলকে মনে রাখতে হবে। ঐ রকম সংগ্রামে হিন্দু বৃথা বলক্ষয় করেছেন মুসলমান যুগে, সংগ্রামে পরাস্ত হয়ে হিন্দু আজ গত-প্রাণ, পতিত। আর বলক্ষয়ের সময় নেই। এখন চাই বলসঞ্চয়। শিক্ষার বিস্তারে সকল সমস্যাই করায়ত্ত হতে থাকবে। মুসলমান বা অন্য কেহ যদি জাতির ঐক্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে, অন্যদিকে বৃথা বলক্ষয় করতে থাকেন, তাঁদেরও সুবিধা হবে না।

শিশ্নোপাসনা ও তন্ত্রের লিঙ্গোপাসনা এক নয়। সত্যকাম জাবালকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেন একে একে বৃষ, অগ্নি ও হংস। এই বৃষ-প্রতীক প্রাচীন ঈজিপ্ট আদি দেশেও ছিল। কিন্তু সে সব স্থানে বৃষ=কাম-প্রতীক, বৃষ, কাম-সহায়। যুগ যুগ পরেও, শেষোক্ত ভাব ঐ সব দেশে বরাবর ছিল। একটা অবস্থা হ'তে অন্য অবস্থায় ক্রম পরিণত হওয়া, সব সময়ে উন্নতি বা অগ্রগতির লক্ষণ নয়। Evolution ও Progress এক জিনিষ নয়। সমাজ অচলায়তনে পরিণত হওয়াটা Evolution, কিন্তু উহা সমাজের Progress নয়।

সমষ্টির কল্যাণে ব্যষ্টির কল্যাণ। এই কল্যাণের মর্য্যাদা টাকার হিসাবে নিরূপণ হয় না। ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে জাতি খুব সস্তা জিনিষ উৎপাদন ক'রে, অর্থ সঞ্চয় করতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি খাঁটি জিনিষ পায় না, হয়ত উহাই জাতির মধ্যে সূক্ষ্ম কলা-বিদ্যার বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। লোভ স্বার্থ আদি কল্যাণের কারণ হয় না। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজিত জাতি পরাভূত হয়। তখন আসে দারিদ্র্য। দারিদ্র্য-সমস্যা সমাধান করবার জন্য চেষ্টা হয় অর্থনীতির দিক্ দিয়ে, কিন্তু যদি ঐ নীতি, জাতির সমাজ-চিত্তের মূল ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, সমস্যা অল্পদিন পরে বিভিন্ন স্বার্থ-সংঘাতে জটিলতর হয়ে দাঁড়ায়। স্বার্থ-সংঘাত জাতির মধ্য হ'তেই উদ্ভূত হতে পারে।

সমন্বয় মানে যা তা ক'রে একটা মিল বা সামঞ্জস্য খাড়া করা নয়। রকম রকম বাদ্য যন্ত্র আছে, প্রত্যেকটির আকার ও ধ্বনি বিভিন্ন। গানের সময়

প্ৰত্যেকটিৰ নিজ নিজ স্বাতন্ত্ৰ্য সম্পূৰ্ণ বজায় ৰেখে একসূত্ৰে সব বেঁধে নিতে হয়। এই সূত্ৰে-বাঁধাটি অৰ্জ্জন কৰতে হয়। ইহা সমাজ-চিত্তেৰ কাষ। সমাজ-জীবনে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্ৰ্য নষ্ট হয় না, কাৰণ ব্যক্তি-সমষ্টিৰ ঐক্যসূত্ৰ থাকে সমাজ-চিত্তে। উচ্চতৰ ঐক্যসূত্ৰ আবিষ্কাৰই উন্নত সমাজ-চিত্তেৰ লক্ষণ, সমাজেৰ প্ৰগতি বা উন্নতিৰ মূল। মানৰ, মানৰ-ধৰ্ম্মী, কিন্তু মানৰ-সমাজ-চিত্ত এখনও গঠিত হয় নি। মানৰ-সমাজ-চিত্তেৰ ঐক্যসূত্ৰ আবিষ্কৃত হলেও, তাকে কখন কৰ্ম্ম-পৰিণত কৰা হয় নি। ভবিষ্যৎ সভ্যতাৰ জন্ম নিৰ্ভৰ কৰছে এই মানৰ-সমাজ-চিত্ত গঠনেৰ উপৰ। ঐ ঐক্যসূত্ৰকে কৰ্ম্মে পৰিণত কৰতে হলে, বিভিন্ন সমাজ-চিত্তেৰ সমগ্ৰ শক্তি ঐ উদ্দেশ্যে, ঐ দিকে প্ৰযুক্ত হওয়া দৰকাৰ, সেবা, নিঃস্বাৰ্থপৰতা ও প্ৰত্যক্ষানুভূতিৰ বলে স্বাৰ্থেৰ বিভিন্ন গণ্ডীকে অতিক্ৰম কৰা দৰকাৰ। পথ দিয়ে মোটৰ, বাস, ট্ৰাম, গাড়ী প্ৰভৃতি চলাচল কৰে। অবাধে সকলগুলিকে অনিয়মিত গতিতে চলতে দিলে, ঐ পথ মুহূৰ্ত্তে নৰককুণ্ডে পৰিণত হয়। স্বাধীনতা তাহাই যখন প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকেৰ দাবী বা অধিকাৰ অঙ্গীকাৰ কৰে, প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেককে হৃদয়েৰ দিক্ দিয়ে বোঝাবাৰ চেষ্টা কৰে, অৰ্থাৎ প্ৰণালীবদ্ধ সহৃদয় নিয়মেৰ মধ্য দিয়ে অগ্ৰসৰ হলে আসতে পাৰে সমন্বয়। এই সমন্বয়ই জগতে শান্তি আনতে সমৰ্থ।

দেশাচাৰকে ধৰ্ম্ম মনে ক'ৰে ৰাণাপ্ৰতাপ ভুল কৰেছিলেন। তাঁৰ ত্যাগ-শক্তি খণ্ডীকৃত দেশ-প্ৰীতিতে পৰ্য্যবসিত হয়েছিল। কিন্তু যে মুসলমানেৰা ভাৰতকে স্বদেশ ব'লে স্বীকাৰ ক'ৰে নেন্ তাঁদের সঙ্গে পৃথক থাকলে স্বদেশ-প্ৰীতি কি বৰ্দ্ধিত হত? স্ত্ৰীশূদ্ৰেৰ অভ্যুত্থানেৰ কথা কে ভেবেছিলেন তখন, হিন্দু বা মুসলমান? এক অখণ্ড ভাৰতেৰ কথা কে চিন্তা কৰেছিলেন? অখণ্ড সমাজ-চিত্তেৰ কথা কাৰ মনে উদয় হয়েছিল? আকবৰেৰ নীতি বজায় থাকলে, পৰে হয়ত তা সম্ভব হত।

এগিয়ে যেতে হবে। সাধু ভক্ত সৰ্ব্বদেশে জন্মগ্ৰহণ কৰেন। সমাজ বা সম্প্ৰদায় তাতে এগিয়ে যায়। এই ৰকম সৰ্ব্ববিষয়ে। যে সব বড়লোক আসেন, তাঁৰা এক এক বিষয়ে এক একটা দিক্ দেখিয়ে যান। সেই সেই পথ ধ'ৰে মানুষ এগিয়ে যায়। মহামানৰ আসেন বিশ্ব কল্যাণকামী হয়ে। জগৎ আদৰ্শ পায়। এসব আমৰা বৰাবৰ দেখছি। সত্যই কি মানবেৰ চিৰ অভাব

কিছুতে দূব হয় ? জগৎ যেমন চলে, সেই চলাব নিয়মেব কিছু স্থায়ী পবিবর্ত্তন আছে কি ? মানবেব কি ক্রমোন্নতি সত্যই হচ্ছে, না, সমষ্টি হিসাবে মানব যেমন তেমনই আছে ? ঐ বকম উদ্যমেব ফল কি, যদি ঐ সব মহা উদ্যমে স্থায়ী ফল না হয়ে থাকে ? 'কুকুবেব ল্যাজ' টেনে সোজা ক'বে ছেড়ে দিলেই আবাব যেমন তেমনি। আপনাবা একবাব 'ল্যাজতত্ত্ব' জানতে চেয়েছিলেন। ইহাই লাঙ্গুলতত্ত্ব ঠিক্ ঠিক্। এক বকম ভাবে জগৎ চলছেনা। জগৎ মানে বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্য গেলেই জগতও উপে যায়। উত্থান ও পতন, বন্যা ও শুষ্কতা, পব পব আসে, এই বৈচিত্র্যেব জন্য। উন্নতি মানে, শুষ্কতায় বাবি সেচন কবা, পতনকে উত্থানমুখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ইহাও ঐ বৈচিত্র্যেব আব এক রূপ। বিশ্বকল্যাণ মানে বিশ্বগ্লানিব মুখ স্বাভাবিক দিকে ফিবিয়ে দেওয়া, মোড ফিবিয়ে দেওযা, এগিয়ে দেওয়া। উন্নতি, কল্যাণ—এসব সাময়িক—দশ বিশ, না হয়, শত সহস্র বৎসব, এই পর্য্যন্ত। তারপব সেই কুকুবেব ল্যাজ এযে হ'তেই হবে, কাবণ, বৈচিত্র্য বয়েছে। দেহেব যেখানে ঘা, যেখানে বেদনা, মনটি সেখানেই প'ডে থাকে। মহামানব ঐ বেদনার স্থানে অষুধ দেন, যাতে বোগ সাবে। শবীর অমব হয় না,—বিশ্বই অমব নয়। বৈচিত্র্য মানে ওঠা নামা। কর্ম্ম এই বৈচিত্র্য নিয়েই, এই বৈচিত্র্যেব মধ্যেই ঐ কুকুবের ল্যাজ টেনে সোজা কবা বা ছেড়ে দেওয়া নিয়েই। এই একটা বড খেলা, বড মজা—মজা, মজা, মজা। এই মজা যখন যিনি 'বোধ' কবেন, তখন তাঁব কর্ম্মস্পৃহা ক'মে যায়। "চিবশিশু বিশ্বনাথেব খেলুড়ে" হয়ে যান তিনি। ঐ বৈচিত্র্যই তাঁব পূর্ব্ব কর্ম্ম-প্রেবণাব মূলে ছিল, ঐ বৈচিত্র্যই আবাব তাঁকে শান্ত বাখাচ্ছে। মজা, ইহাই মজা, বড মজা। এগিয়ে যেতে হয়, কর্ম্ম কবতেও হয় ঐ মজাব পায়ে লুটিয়ে পডবার জন্য, ঐ মজাব বোধটি হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য। স্থিব কিছুই থাকে না। এগিয়ে যেতেই হবে, পেছিয়ে গেলে বৃথা সময় নষ্ট হয়। স্থিব শান্ত অবস্থাব চাবিকাটি ঐ মজায়। এটাও মজা। মা মজাময়ী। বিশ্ব যে তাঁবই রূপ, মজায় দেখাচ্ছে নানা, মজায় বোধ কবাচ্ছে বৈচিত্র্য, মজায় ভোগ কবাচ্ছে সুখ দুঃখ, মজাই চশমা চোখে দিয়ে দেখাচ্ছে উত্থান পতনেব নানা রঙেব খেলা। মজাই হচ্ছে চশমা, মজাই হয়েছে সব, বৈচিত্র্যই যে মজা;

শরীরটাই যে মজা, বোধটাও যে মজা। মজাই চেপে ধরবে ঘাড়, করাবে উদ্যম, ছেড়ে দেবে মজার বোধটি আনিয়ে। মহামানব কর্ম্ম করেন। মজার সঙ্গে একাত্মবোধ থাকে বিশেষ আধিকারীক পুরুষদের গোড়া হ'তেই, কিন্তু তাঁরা বুকে হাঁটু দিয়ে মানবের মুখে ঢেলে দেন এই মজার অমৃত। মানব মজাটি বোঝে না, দেখতে পায় না তখন। তিনি তখন শান্ত হ'য়ে চঞ্চল মানব-শিশুর মজা দেখেন, শিশু যাতে সাবালক হয়ে দাঁড়ায় তার উপায় ক'রে দিয়ে পালান। এও একটা অতি বড় মজা, 'যদা যদাহি' হদ্দ মজা!! প্রলয় আর এক মজা, বৈচিত্র্য নতুন ভাবে সাজেন। যতক্ষণ এই বৈচিত্র্য, ততক্ষণ এই মজা। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, আরো কত কি কে জানে? তাঁর ইতি হয় না। 'বাস্তব সত্যের বিবৃতিতে' কেমন মজা?



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাং ১৩৪৬ সালের ফাল্গুন মাস—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমাস—পর্য্যন্ত আর্য্য-প্রভা ও ভারতধারা অল্পমূল্যে দেওয়া হবে।

বিশেষ সুবিধা—ঐ সময়ের মধ্যে যাঁরা ভারতধারা দুই খণ্ড একত্রে নেবেন তাঁরা উহা ১॥০ টাকায় পাবেন (ভি. পি. স্বতন্ত্র)। এবং যাঁরা আর্য্য-প্রভা ও ভারতধারা ২ খণ্ড একত্রে নেবেন, তাঁরা ঐ তিনখানি পুস্তক নামমাত্র মূল্য ৪৸০ আনায় পাবেন। (ভি. পি. স্বতন্ত্র)। উক্ত সময়ের মধ্যে আর্য্য-প্রভার মূল্য চারিটাকা মাত্র। ভিঃ. পিঃ. স্বতন্ত্র।
